রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

প্রশান্তকুমার পাল

রবিজীবনী

চতুর্থ খণ্ড

১৩০১-১৩০৭

প্রশান্তকুমার পাল

শ্রীযুক্ত শঙ্খ ঘোষ
পূজনীয়েষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

রবিজীবনী (১ম-৯ম)

মুখবন্ধ

রবিজীবনীর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হল। ১৩০১ থেকে ১৩০৭ বঙ্গাব্দ—রবীন্দ্রজীবনের চৌত্রিশ থেকে চল্লিশ এই সাতটি বৎসর বর্তমান খণ্ডের উপজীব্য। এই খণ্ডে রবীন্দ্রজীবনের অর্ধাংশের পরিক্রমা সমাপ্ত হল। পরবর্তী খণ্ডের সূচনা বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করবেন—তাঁর জীবনের শেষ অর্ধাংশ প্রধানত এই আশ্রম বিদ্যালয়ের বিশ্বভারতীতে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। নদীবিধৌত উত্তর-মধ্য-বঙ্গের সুধাশ্যামলিম পারের জীবনৈশ্বর্য ছেড়ে রাঢ়ের মরুতীরবর্তী রিক্ততার মধ্যে আন্তর-সম্পদের সন্ধানের শুরুও তখন। সুতরাং এই চতুর্থ খণ্ডে আমরা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রজীবনের একটি বিশিষ্ট পর্যায়ের সমাপ্তিতে এসে পৌঁছেছি।

অবশ্য বহু খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে প্রতিটি খণ্ড যে সর্বদা এইরূপ নির্দিষ্ট পর্যায়কে চিহ্নিত করতে পারবে, এমন আশা রাখি না। বস্তুত প্রথম থেকেই খণ্ডের আকার লেখক অথবা প্রকাশকের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল থেকেছে—বিবেচনায় রাখতে হয়েছে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার কথাও। তাই খণ্ড-বিভাগের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে লেখক অসহায় বোধ করবেন। বিশেষত রবীন্দ্রজীবনের শেষার্ধ এতই ঘটনাবহুল যে তাকে যথাযথভাবে বিবৃত করতে গেলে অধ্যায়গুলির আকার-সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন। সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই খণ্ডের আকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই চলতে হবে—সম্ভব হবে না জীবনের বাঁকগুলি সুচিহ্নিত করা। আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনটিকে আমরা তাঁর বয়স অনুযায়ী ধারাবাহিক একাশিটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে বর্ণনা করছি, প্রতিটি অধ্যায় বা খণ্ড কেবলমাত্র কালানুক্রমিকতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ—তার অন্য কোনো তাৎপর্য নেই। পৃষ্ঠাঙ্কের ধারাবাহিকতা থাকলে লক্ষ্যটি হয়তো আরও স্পষ্ট হত, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে সংযোজন-সংশোধনের জন্য পৃষ্ঠাঙ্কের পরিবর্তন ঘটতে পারে ভেবে পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয় নি।

জীবনকথায় বাংলা সাল ও তারিখের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একথা ঠিক যে, আমরা ব্যবহারিক জীবনে খৃস্টীয় সাল ও তারিখ ব্যবহারেই অভ্যস্ত, সেই দিক দিয়ে বাংলা সাল-তারিখের ব্যবহার কিঞ্চিৎ অসুবিধাজনক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ২৫ বৈশাখ বলে আমাদের পরিকল্পনানুযায়ী বৈশাখে বর্ষারম্ভ ও বাংলা সাল অনুসারে অধ্যায় বিন্যাসের সুবিধা বেশি। তাছাড়া জমিদারি-নির্ভর পারিবারিক প্রথা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ নিজে, পরনির্ভর শেষজীবন ছাড়া, বাংলা তারিখ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন—এমন-কি, বিদেশে গিয়েও তিনি বাংলা পঞ্জিকা পাঠাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন—তাঁর অধিকাংশ রচনা বাংলা তারিখ-সংবলিত। এইসব কারণে আমরা বাংলা সাল ও তারিখকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছি—অবশ্য প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুদ্রাকরের অসুবিধা ঘটিয়েও রোমান হরফে আনুষঙ্গিক খৃস্টীয় সাল-তারিখটিও প্রদত্ত হয়েছে—সুতরাং পাঠকের অসুবিধার কারণ আছে বলে মনে হয় না। তবু একজন বিশিষ্ট সমালোচক প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন বলে এত কথা লেখার দরকার হল।

অপর একজন সমালোচক প্রথম দু'টি খণ্ডের তুলনায় তৃতীয় খণ্ডে তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের প্রবণতা দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আমাদের ক্ষমতা ও লক্ষ্য সম্পর্কে আমরা সর্বদাই সচেতন এবং সেইজন্যই রবীন্দ্রসাহিত্যের রস-বিশ্লেষণকে লক্ষ্যের বহির্ভূত রেখে সেই কাজ রসজ্ঞ সমালোচকের জন্য তুলে রাখতে চেয়েছি। কিন্তু বস্তুজগৎকে মায়া বলে ভাবতে অভ্যস্ত এদেশীয় রসাভিলাষীরা অনেক সময়ে জ্ঞাত তথ্য সম্পর্কেই সচেতন থাকেন না, পরিশ্রমের দ্বারা লভ্য অজ্ঞাত তথ্য সন্ধানের প্রয়াসের কথা তো না তোলাই ভালো। বর্তমান জীবনীগ্রন্থের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অজ্ঞাত তথ্যের অনুসন্ধান ও জ্ঞাত তথ্যকে যাচাই করে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা। এই কাজ করতে গিয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কখনও কখনও আমাদের তত্ত্ব ও রসের নিষিদ্ধ জগতে পদার্পণ করতে হয়েছে, কিন্তু চেষ্টা করেছি ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে ক্ষান্ত হতে। যদি কোথাও মাত্রা অতিক্রম করে থাকি তার জন্য দায়ী চিরাগত পদ্ধতিতে বাংলা সাহিত্যের পাঠগ্রহণ ও পাঠনার মজ্জাগত অভ্যাস। সংস্কারকে পুরোপুরি ত্যাগ করা বড়োই কঠিন!

রবিজীবনীর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই চতুর্থ খণ্ড লেখা ও প্রকাশ করা সম্ভব হল বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য ড নিমাইসাধন বসু ও আনন্দবাজার পত্রিকা-গোষ্ঠীর প্রধান অভীককুমার সরকারের অকৃপণ আনুকূল্যে, তাঁরা তৃতীয় বর্ষের জন্য অশোককুমার স্মৃতিবৃত্তি প্রদান করে আমাকে আকাঙ্ক্ষিত অবসর দান করেছেন। আনন্দমোহন কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন, এর জন্য তাঁরাও ধন্যবাদার্হ। বিশ্বভারতীর গুণগ্রাহী উপাচার্য মহাশয় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত অপ্রকাশিত উপাদান ব্যবহারে অনুমতি দিয়েও আমাকে বাধিত করেছেন। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার বাদল বসুর কাছেও আমি ঋণী, তাঁর তাগিদ আমাকে নিরবচ্ছিন্ন কর্মে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করেছে।

রবীন্দ্রভবনের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের কাছে আমি যথারীতি সর্বপ্রকার সাহায্য পেয়েছি। প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড নরেশ গুহ, প্রাধিকারিক দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অবেক্ষক ড সনৎ বাগচী, গ্রন্থাগারিক সুপ্রিয়া রায়, শ্রুতি-দৃশ্য বিভাগের প্রধান অজিত পোদ্দার সর্বদা লক্ষ্য রেখেছেন যাতে আমার কাজের কোনো অসুবিধা না হয়। তাছাড়া আশিস হাজরা, তুষার সিংহ, দিলীপ হাজরা, ইন্দ্রাণী দাস, তপন দাশগুপ্ত, শুচিস্মিতা মজুমদার, জবা সোরেন, নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় যেভাবে আমার জন্য পরিশ্রম করেছেন, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেব ও বীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের স্বপনকুমার ঘোষ প্রাতিষ্ঠানিক কর্তব্য ছাড়া আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতেও আগ্রহ দেখিয়েছেন, অবশ্য এব্যাপারে তাঁর ঔদার্যের ভাগীদার অনেকেই। রবীন্দ্রভবনের উপ-অবেক্ষক ড গৌরচন্দ্র সাহা কোনো স্বার্থ ছাড়াই আমার গবেষণা-কর্মের সহকারিত্বের পরিশ্রম সাগ্রহে বহন করে চলেছেন। সুবর্ণরেখা-র ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সাহায্য ছাড়া শান্তিনিকেতনে থেকে বই ছাপানো শক্ত হত। এঁদের আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাই। 'নির্দেশিকা'-প্রস্তুতে আমার দুই কন্যা কল্যাণীয়া শ্রাবণী ও শ্যামলী অনেক সাহায্য করেছে। তাদের শুভ কামনা করি।

আধুনিক মুদ্রণপদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য পাদটীকা ব্যবহারের পূর্বানুসৃত পদ্ধতি বর্তমান খণ্ডে পরিত্যাগ করা হয়েছে। উল্লেখ-সূত্রগুলি পৃষ্ঠার নিম্নে বিন্যস্ত না করে ধারাবাহিক সংখ্যানুক্রমে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে 'উল্লেখপঞ্জী'তে সমাহৃত হল। এতে পাঠকের অসুবিধা সামান্যই, কিন্তু মুদ্রণের সুবিধা প্রচুর।

তা সত্ত্বেও পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত টীকাগুলি তারকা [*]-চিহ্নযোগে পাদটীকা রূপেই সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম দুটি খণ্ডের সংস্করণ-সৌভাগ্য ঘটলে সেক্ষেত্রেও বর্তমান রীতিই অনুসৃত হবে।

প্রথম খণ্ডের খসড়া রচনার সময় থেকেই কবি-অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ মহাশয়ের নিরন্তর আনুকূল্য লাভ করে আসছি। সুচিন্তিত পরামর্শ ও উপদেশ, পাণ্ডুলিপির পরিমার্জনা, গ্রন্থের নামকরণ, প্রকাশনার ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিটি কার্যেই তাঁর সহায়তা ছাড়া আমার পক্ষে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল। বর্তমান খণ্ডটি বিনম্র চিত্তে তাঁকেই উৎসর্গ করছি।

প্রশান্তকুমার পাল

১ বৈশাখ ১৩৯৫

রবীন্দ্রভবন

শান্তিনিকেতন-৭৩১২৩৫

বিষয়সূচী

পাঠ-নির্দেশ

এই গ্রন্থ রচনায় রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পুস্তকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণে পৃষ্ঠাঙ্কের সামান্য ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠকের পক্ষে উদ্ধৃতি বা উল্লেখের মূল খুঁজে পেতে খুব বেশি অসুবিধা হবে না ভেবে সংস্করণ বা মুদ্রণ-তারিখ নির্দেশিত হয় নি। অন্যান্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে উল্লেখপঞ্জীতে প্রথম উল্লেখের স্থানে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ-সন দেওয়া হয়েছে। দণ্ড চিহ্নের পরের সংখ্যাটি পৃষ্ঠাঙ্ক-সূচক।

গ্রন্থের মূল পাঠে তৃতীয় বন্ধনীর অন্তর্গত তারিখগুলি সাধারণত পুরোনো পঞ্জিকা বা Ephimeris অবলম্বনে নির্ধারিত। চিঠির ক্ষেত্রে তারকা-চিহ্নিত তারিখগুলি খাম বা পোস্টকার্ডের উপরে প্রদত্ত ডাকঘরের মোহর থেকে সংগৃহীত। উদ্ধৃতির মধ্যে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যস্থ শব্দ বা শব্দগুলি আমরা যোগ করেছি। মূলের বানান সাধারণত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। লেখা বা ছাপা ভুল বানানের প্রতি '[যদ্দৃষ্টং]' শব্দ-যোগে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। [?]-চিহ্ন সংশয়-সূচক। উদ্ধৃতি ছাড়া অন্যত্র খৃস্টাব্দ সর্বদাই ইন্দো-আরবীয় হরফে [1, 2, 3... ইত্যাদি] লিখিত, 'শক'-শব্দটির ব্যবহার না থাকলে বাংলা হরফে লেখা অব্দগুলিকে বঙ্গাব্দ বুঝতে হবে।

শব্দ-সংক্ষেপণ

চৈতালি ৫। ৪৬ : রবীন্দ্র রচনাবলী ৫ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'চৈতালি' গ্রন্থ, পৃ ৪৬।

চিঠিপত্র ৮। ২০১, পত্র ১৬৯ : চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ১৬৯-সংখ্যক পত্র, পৃ ২০১।

ব্রহ্মমন্ত্র অ-২। ১৮৪ : রবীন্দ্র রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত 'ব্রহ্মমন্ত্র' গ্রন্থ, পৃ ১৮৪।

র°র° ১ [প.ব.]। ১০৮-১০ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী-র আধুনিক সংস্করণ ১ম খণ্ডের পৃ ১০৮ থেকে পৃ ১১০।

'পিতৃস্মৃতি', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [১৩৭৫]। ১৫২ : ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধ, পৃ ১৫২।

বি. ভা. প. ১৮। ৪। ৩৮৯ : বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৩৮৯।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সা-সা-চ ৩। ৪৫। ১০ : সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৩য় খণ্ড ৪৫ সংখ্যক 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থের পৃ ১০।

অগ্র° : অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ব° : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

গীত : গীতবিতান।

স্বর : স্বরবিতান।

গবেষণা-গ্রন্থমালা : রবীন্দ্রসংগীত-গবেষণা-গ্রন্থমালা, প্রফুল্লকুমার দাস রচিত।

ত্রিবেণীসংগম : রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম, ইন্দিরা দেবী-রচিত।

সাধনা ও সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য, ড অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য রচিত।

রবিজীবনী

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

১৩০১ [1894-95] ১৮১৬ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের চতুস্ত্রিংশ বৎসর

বর্তমান বৎসরের বৈশাখ মাসে কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় আত্মহননের দশম বর্ষ পূর্ণ হল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই নারীর ভূমিকা কতখানি সে-প্রসঙ্গে আমরা বহুবার মন্তব্য করেছি। তাঁর মৃত্যুর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসবাস করা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন। ফলে কাদম্বরী দেবীর স্মৃতিবিজড়িত তেতালার ঘরটি রবীন্দ্রনাথের অধিকারে আসে। আমরা আগের অধ্যায়েই দেখেছি, দীর্ঘকাল উত্তরবঙ্গে অবস্থানের পর চৈত্র মাসের শেষে তিনি আবার যখন জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসেন, তখনই বৎসরের শেষ দিনটিতে তাঁর অন্তরে কাদম্বরী দেবীর 'স্নেহস্মৃতি'র উদ্বোধন হয়েছে। এর পরে কয়েক দিন তাঁর অবস্থান সেই স্মৃতির জগতে।

১ বৈশাখ [শুক্র 13 Apr] জোড়াসাঁকোয় লেখা 'নববর্ষে' কবিতাটি [দ্র সাধনা, বৈশাখ। ৪৬৯-৭৩; চিত্রা ৪। ৩৯-৪২] অবশ্য নূতন বর্ষের আবির্ভাবে নূতন সংকল্পে নিজেকে উজ্জীবিত করার গতানুগতিক রীতিকেই অনুসরণ করেছে। কিন্তু মৃত্যুর আভাস এখানেও দুর্লক্ষ্য নয়।

এরপর ৫ বৈশাখ [মঙ্গল 17 Apr] লিখিত হল দু'টি কবিতা—'দুঃসময়' [দ্র চিত্রা ৪। ৪৩-৪৪] ও 'মৃত্যুর পরে' [দ্র সাধনা, জ্যৈষ্ঠ। ১-১১; চিত্রা ৪। ৪৪-৫৩]দু'টিই জোড়াসাঁকোয় লেখা। 'সোনার তরী-চিত্রা'র পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 129] 'দুঃসময়' কবিতাটির উপরে লেখা আছে : 'Late, late, too late, thou canst not enter now!'—'বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার' ছত্রটি দিয়ে আরম্ভ করে সম্পূর্ণ কবিতাটি যেন উক্ত পংক্তিটিকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে মিশেছে কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি, যে অনাকাঙ্ক্ষিত স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য পরিবারের আর সকলেই তৎপর :

> তোমারে আজিকে ভুলিয়াছে সবে,
> শুধাইলে কেহ কথা নাহি কবে,
> এ হেন নিশীথে আসিয়াছ তবে
>   কী মনে করে।

'মৃত্যুর পরে' কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত নাম 'শান্তি'; সেখানে কবিতাটির আকারও অনেক ছোটো—১, ২, ৪, ৬, ৭, ২০ ও ২১ এই সাতটি স্তবকে সম্পূর্ণ। লক্ষণীয়, এই সাতটি স্তবক একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক—সেই শোচনীয় মৃত্যুস্মৃতিকে ঘিরে আবর্তিত:

> তুলিয়া অঞ্চলখানি

মুখ'পরে দাও টানি,
ঢেকে দাও দেহ
করুণ মরণ যথা
ঢাকিয়াছে সব ব্যথা,
সকল সন্দেহ।

এই আকুলতায় কবিতাটি রচনা হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে মনের উপর সান্ত্বনার প্রলেপ পড়েছে, বাকি স্তবকগুলি মনের সেই অবস্থায় লেখা। কয়েকদিন আগে [30 Mar 1894 ১৮ চৈত্র ১৩০০] ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'বড়ো দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠতে থাকে, মনের সমস্ত দলবল সমস্ত ধৈর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে—তখন দুঃখের মাহাত্ম্যের দ্বারাই তার সহ্য করবার বল বেড়ে যায়।'[১] এই কবিতাটির পরে লেখা স্তবকগুলির ক্ষেত্রেও এইরূপই হয়েছে ব'লে আমাদের ধারণা।

৮ বৈশাখ [শুক্র 20 Apr] 'কীর্ত্তনের সুর'-এ যে-গানটি—'ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ' [দ্র গীত ১।১৮৯-৯০; স্বর ৪]—লিখিত হ'ল তার মধ্যে মনকে শান্ত করবার প্রয়াস লক্ষণীয়। উপরে উদ্ধৃত পত্রের পরবর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'সুখের ইচ্ছা যখন নিস্ফল হয় তখন আত্মত্যাগের ইচ্ছা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সেই ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধন করবার অবসর পেয়ে মনের ভিতরে একটা উদার উৎসাহ সঞ্চার হয়।' 'সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে—/তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।/ আমি কী আর কব' ইত্যাদি ছত্রে এই আত্মসমর্পণের সুরটি শোনা যায়। Ms. 129-এ গানটি রচনার স্থানকালের উল্লেখ আছে : '৮ বৈশাখ। ১৩০১।/ যোড়াসাঁকো।'

'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি সাধনার জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় মুদ্রিত হলে পাঠকসমাজের একাংশে যে গুঞ্জন ওঠে, তার পরিচয় আছে নিত্যকৃষ্ণ বসুর ডায়েরিতে; ১৮ জ্যৈষ্ঠ [31 May] তিনি লিখেছেন : 'জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাধনায়" রবীন্দ্রনাথ বাবুর একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটির নাম "মৃত্যুর পরে"। বোধ হয় স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা লিখিত হইয়াছে।'[২] ৫ আষাঢ় [[18 Jun] তিনি পূর্বমত সংশোধন করে লিখলেন : কবিতাটি কাহার মৃত্যুর পরে লিখিত, তাহা স্পষ্ট বুঝিবার যো নাই। অথচ সাধারণ ভাবে লইলে আদ্যোপান্ত অর্থ তত সঙ্গত হয় না। দু একটা কথা বারংবার পুনরুক্ত হইয়াছে। তাহা ব্যক্তিগত বলিয়াই বোধ হয়। আমি প্রথমতঃ বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুই উপলক্ষ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে গোপাল বাবুর কথা শুনিয়া উহা যে *** মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ দৃঢ়রূপে প্রতীত হইতে লাগিল।'[৩] সমাজে সুপরিচিত হওয়ার বিপদ কম নয়!

ব্যক্তিগত শোকের পর্ব শেষ হতে-না-হতেই রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় শোকে অংশগ্রহণ করতে হল। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ২৬ চৈত্র ১৩০০ তারিখে। চৈতন্য লাইব্রেরি ও বীডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাবের উদ্যোগে স্টার থিয়েটারে ১৬ বৈশাখ [শনি 28 Apr] একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। প্রথমে স্থির হয় যে, রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্ত গুপ্ত ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভায় প্রবন্ধ পাঠ করবেন এবং সভাপতি হবেন বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন কবি নবীনচন্দ্র সেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র শোকসভা করার প্রস্তাবেই আপত্তি করেন ও সভাপতি হ'তে অস্বীকৃত হন। তিনি লিখেছেন : "সভা-শ্রাদ্ধ গড়াইতে গড়াইতে এখন ইংরাজের অনুকরণে শোকসভা পর্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর জন্য 'শোক-সভা' হইবে, রবিবাবু শোক-প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহার সভাপতিত্ব

করিতে আমি আহূত হইয়াছিলাম। আমি উহা অস্বীকার করিয়া লিখিলাম যে, সভা করিয়া কিরূপে শোক করা যায়, আমি হিন্দু তাহা বুঝি না।···এ সকল কথা শুনিয়া রবিবাবু স্বয়ং লিখিলেন যে, আমার সভাপতিত্বের ছায়ায় তিনি তাঁহার শোক-প্রবন্ধ উক্ত সভায় পাঠ করিতে চাহেন।···'শোক-সভা' সম্বন্ধে আমার উপরোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া, রবিবাবুর 'সাধনা'তে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।"[৪] নবীনচন্দ্র যে-প্রবন্ধের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, 'শোকসভা' [দ্র আধুনিক সাহিত্য পরিশিষ্ট ৯।৫২৯-৩৬] নামক সেই প্রবন্ধটি সাধনার জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় [পৃ ২৫-৩৭] মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটি নবীনচন্দ্রের মতের বিরোধিতা করার জন্যই লেখা, কেবল প্রতিবাদের তীব্রতা কমাতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে : 'যাঁহারা বঙ্কিমের বন্ধুত্বসম্পর্কে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন এমন অনেক খ্যাতনামা লোক সভাস্থলে শোকপ্রকাশ করা কৃত্রিম আড়ম্বর বলিয়া তাহাতে যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছেন এবং সভার উদ্‌যোগিগণকে ভর্ৎসনা করিতেও ক্ষান্ত হন নাই। এরূপ বিয়োগ উপলক্ষ্যে আপন অন্তরের আবেগ প্রকাশ্যে ব্যক্ত করাকে বোধ করি তাঁহারা পবিত্র শোকের অবমাননা বলিয়া জ্ঞান করেন।' এই মতের বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত দু'টি যুক্তি উপস্থিত করলেন। তাঁর মতে, কেবল 'য়ুরোপীয়তা নামক মহদ্দোষে দুষ্ট বলেই এই প্রথাকে নিন্দা করা চলে না এবং কিছু পরিমাণ কৃত্রিমতা সমাজবন্ধনের জন্যই অপরিহার্য। সুতরাং 'যেমন আমাদের দেশে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক পিতৃহীন ব্যক্তির পিতৃশোক ব্যক্ত করা প্রকাশ্য কর্তব্যস্বরূপে গণ্য হয় তেমনি পাব্লিকের হিতৈষী কোনো মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রকাশ্য সভায় শোকজ্ঞাপন একটা সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।' আর এই দায়িত্ব নেওয়া উচিত সেই মহৎ ব্যক্তির বন্ধুদের, তাঁরাই পারেন দেবলোকে নির্বাসিত মহৎ ব্যক্তিদের 'রক্তমাংসের মনুষ্যরূপে সুনির্দিষ্ট-পরিচিত' করতে—'সহস্র ভালোমন্দের মধ্যেও আমরা যদি তাঁহাদিগকে মহৎ বলিয়া জানিতে পারি, তবেই তাঁহাদের মনুষ্যত্বের অন্তর্নিহিত সেই মহত্ত্বটুকু আমরা যথার্থ অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারি, তাঁহাকে ভালোবাসি এবং বিস্মৃত হই না।' এই কাজ যদি বন্ধুরা না করেন তবে 'পাব্লিক'ই তাঁদের বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ আনতে পারে, কারণ, তাঁহারা বঙ্কিমের নিকট হইতে কেবলমাত্র উপকার পান নাই, বন্ধুত্ব পাইয়াছেন, তাঁহারা কেবল রচনা পান নাই, রচয়িতাকে পাইয়াছেন।···তাঁহাদের বন্ধুকে কেবল তাঁহাদের নিজের স্মরণের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যথার্থ বন্ধুঋণ শোধ করা হইবে না। সৌভাগ্যক্রমে নবীনচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই মতভেদ মননামালিন্যে অবসিত হয় নি।

নবীনচন্দ্র সভাপতিত্ব করতে অস্বীকৃত হলেও ডঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মত হলেন। সম্ভবত এই সব গোলমালের জন্যই সভার বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে। The Indian Mirror-এর 29 Apr-সংখ্যায় সভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত হয় : A meeting of the Chaitanya Library and Beadon Square Literary Club was held at the Star Theatre, yesterday afternoon in memory of the late Rai Bankim Chunder Chatterji, Bahadur, C.I.E. Babu Robindra Nath Tagore, Pandit Haraprosad Sastri, M.A., and Pandit Rajani Kanto Gupta addressed the meeting on the occasion. The Hon'ble justice Guru Das Bannerji presided'. পত্রিকাটির 1 May-সংখ্যার বিবরণ একটু বিস্তৃততর: '…there were about fifteen hundred gentlemen present on the

occasion. Pandit Rajani Kanta Gupta read an eloquent biographical sketch of the departed novelist. Babu Rabindranath Tagore, in a masterly address, which occupied more than [an] hour, dwelt upon the inestimable services rendered by Bankim Babu to the Bengali literature. A memoir from the pen of Babu Jogendra Chunder Ghose was read before the meeting.' নিত্যকৃষ্ণ বসু এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ডায়েরিতে লিখেছেন : সভাস্থলে উপস্থিত হইতে আমার প্রায় ৫-৩০ বাজিয়া গেল। তখন রজনী বাবুর বক্তৃতা শেষ হইয়া রবীন্দ্রবাবুর রচনা-পাঠ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে নিতান্ত স্থানাভাব।···রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা প্রায় এক ঘণ্টা কাল চলিল।···সু-চন্দ্র হস্তলিপিখানা লইয়া আসিয়াছেন। আর "সাধনা"তেও ছাপা হইতেছে। ···রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা পাঠ করিবার কায়দা আছে। সুরটি বেশ মিষ্ট। তার উপর আবার সুন্দর চেহারার সম্মিলন। ইহাতে যে অনেকটা কাজ হয়, তাহা বলাই বাহুল্য।'[৫] নবীনচন্দ্র সেন সভার একটি বর্ণনা দিয়েছেন সম্ভবত শোনা কথার উপর ভিত্তি করে : 'যাহা হউক শোকসভা হইল, রবিবাবু বিনাইয়া বিনাইয়া দীর্ঘ শোক করিয়া যখন অশ্রু মুছিয়া বসিলেন, শুনিলাম—অমনি শ্রোতৃমণ্ডলী চারি দিক্ হইতে বলিতে লাগিল—"রবি ঠাকুর! একটা গান কর।" শোকের এই বিচিত্র পরিণতি দেখিয়া সভাপতি মাননীয় গুরুদাসবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন যে, রবিবাবুর গলা আজ ভাল নাই, তিনি গাইতে পারিবেন না।'[৬] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [1877-1938] এই সভায় প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন, তিনিও অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন : 'তাঁর বক্তৃতার পর সমস্ত শ্রোতা চীৎকার করতে লাগলেন—"রবি-বাবুর গান, রবি-বাবুর গান।"···শোকসভার গাম্ভীর্যহানির আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই গান গাইলেন না।'[৭]

'চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে পঠিত' পাদটীকা-সহ প্রবন্ধটি 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে [দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯।৩৯৯-৪১০] সাধনার বৈশাখ ১৩০১-সংখ্যার শেষ রচনা [পৃ ৫৩৬-৬৪] হিসেবে মুদ্রিত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রবন্ধটি সম্পর্কে লেখেন : '···বঙ্কিম বাবুর বিষয়ে এ পর্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, রবীন্দ্র বাবুর "বঙ্কিমচন্দ্র" তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্কিম বাবুর বিষয়ে আমরা এরূপ রচনা দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্র বাবু, বাঙ্গলা সাহিত্যের মুখ রাখিয়াছেন। যথার্থ সাহিত্যসেবীর মত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যমূর্তির উজ্জ্বল নিখুঁত চমৎকার ছবি আঁকিয়াছেন।···এরূপ প্রবন্ধ ভাষার গৌরব।'[৮]

গদ্যগ্রন্থাবলী-র অন্তর্গত 'আধুনিক সাহিত্য' [১৩১৪] গ্রন্থে সংকলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির বিস্তৃত অংশ পরিত্যাগ করেন। রবীন্দ্ররচনাবলী-র 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে [পৃ ৫৪৭-৫৬] বর্জিত অনুচ্ছেদগুলি সংকলিত হয়েছে।

উক্ত শোকসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েকদিন পরে ২২ বৈশাখ [শুক্র 4 May] টাউন হলে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আর একটি সভা হয়। সভার উদ্দেশ্যটি বর্ণিত হয়েছে পরের দিনের The Indian Mirror পত্রিকার সংবাদে : 'A public meeting...was held at the Town Hall last evening at half past five o'clock for the purpose of considering what step should be taken to perpetuate the eminent service rendered to his country by Rai Bankim Chunder Chatterji.'

শোকপ্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর আর একটি প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সদস্যদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ ঘোষাল, আশুতোষ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামও দেখা যায়।

বৈশাখ মাসের বাকি কয়েকটি দিনে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির সংবাদ দু'বার পাওয়া যায়। ২৭ বৈশাখ [বুধ 9 May] নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন : সকালে রবীন্দ্র বাবুর সাক্ষাৎ পাইয়া দুই চারিটা শিষ্টালাপ'[৯]—সাক্ষাৎকারের স্থান তিনি উল্লেখ করেননি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বাড়িতে হওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় উল্লেখটি পাওয়া যায় 13 May-র the Indian Mirror পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে : 'On the 10th May [বৃহ ২৮ বৈশাখ] Mr. Gnanendra Nath Gupta, C.S., Assistant Magistrate of Hughly was married to the daughter of Mr. R.C. Dutt, the Commissioner of Burdwan, at Mr. Dutt's residence in Calcutta, 37, Park Street. Among the distinguished guests...Sir Romesh Chunder Mitter, Justice Chandra Madhub Ghosh, K.G. Gupta,...T. Palit,...S. Sinha, O.C. Dutt, Babus Rabindra Nath Tagore, Krishna Behari Sen, Sarat Chunder Das, C.I.E....' রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথমা কন্যার বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিতির কথা আমরা স্মরণ করতে পারি [দ্র রবিজীবনী ২।১৯৯]। উক্ত বিবাহটি নিয়ে সমাজে কিছু আলোড়ন উঠেছিল, বর্তমান বৈদ্য-কায়স্থ বিবাহেও চাঞ্চল্যের অভাব ঘটেনি। নিত্যকৃষ্ণ বসু ২৮ বৈশাখের ডায়েরিতে লিখেছেন : 'সন্ধ্যার প্রাক্কালে সু-চন্দ্রের সন্ধান করিলাম। শুনিলাম, বাবুজী যতীশ ভায়ার সহিত মুন্নীর [জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের ডাক নাম, ইনি রবীন্দ্রনাথের বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভাই] বিবাহ-উৎসবে বিরাজমান হইতে গিয়াছেন। দুই দিন ধরিয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বিবাহস্থলে উপস্থিত হইবার মতটা যে স্থির করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে, আর কিছু না হউক, মনের দ্বিধাটা ত মিটিয়া গেল।····আমি এইরূপ Intermarriage-এর পক্ষপাতী বটে। কিন্তু মুন্নীর বিবাহের অনুমোদন করিতে পারি নাই।'[১০] সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মনের একাংশে হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি বাসা বেঁধে ছিল, সেইটি স্পষ্ট করার জন্য আমরা ডায়েরির অংশটি উদ্ধৃত করেছি। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হার্দ্য-সম্পর্ক থাকলেও পরবর্তীকালে তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধিতার অনেকটাই এই গোঁড়ামি থেকে উদ্ভূত। আমরা আগেও দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের গল্পে-প্রবন্ধে যেখানে হিন্দু-সংস্কারের প্রতি আঘাত আছে, সুরেশচন্দ্র সেখানেই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

সাধনা, বৈশাখ ১৩০১ [৩।৬] :

৪৬৯-৭৩ 'নববর্ষে' দ্র চিত্রা ৪।৩৯-৪২

৫৩৬-৬৪ 'বঙ্কিমচন্দ্র' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯।৩৯৯-৪১০

মিশ্র ভৈরবী কাওয়ালি সুর-তালে বিধৃত 'হেলাফেলা সারাবেলা' [দ্র গীত ২৩।৯০; স্বর ৫০] গানটির ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি এই সংখ্যায় [পৃ ৪৮২-৮৪] মুদ্রিত হয়।

[রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : ১৩০১ গ্রীষ্মকালের অধিকাংশ সময় কাটিল কলিকাতায়; তবে মাঝে কয়েকদিনের জন্য যান কার্সিয়াঙ্। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে তথায় তাঁহার সহিত কয়েকদিন কাটাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।'[১১] তিনি তাঁর তথ্যসূত্র হিসেবে 'রবি, ত্রৈমাসিক পত্র। ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ (১৩৩২) আগরতলায় কিশোর-সাহিত্য-সমাজে কবি-সম্রাটের বাণী। উদ্ধৃতি, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, ১৩৬৮, পৃ ৩৬১' পাদটীকায়। উল্লেখ করেছেন। আমরা উক্ত পত্রিকা ও গ্রন্থ অনুসন্ধান করে দেখেছি, ১৩০১ বঙ্গাব্দে গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথের কার্সিয়াং যাওয়ার কোনো উল্লেখ সেখানে নেই; 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে রবীন্দ্রজীবনী ও জীবনীকারের পত্র অবলম্বনে উক্ত সময় উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত বীরচন্দ্রের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ কার্সিয়াং-এ যান ১৩০৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে, সেই সম্মিলনের যথেষ্ট প্রমাণও আছে। কিন্তু ১৩০১-এর গ্রীষ্মকালে অনুরূপ ভ্রমণের কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রের সন্ধান রবীন্দ্রজীবনীকার দেননি। অবশ্য বীরচন্দ্র রাজকার্যে ও অন্যান্য কারণে কলকাতায় এলে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করতেন, বীরচন্দ্রের পার্ষদ ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মার লেখায় তার উল্লেখ আছে।]

৬ জ্যৈষ্ঠ [শনি 19 May] রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় বসে লিখলেন 'ব্যাঘাত' [দ্র চিত্রা ৪।৫৩-৫৫]—'মৃত্যুর পরে'-র এক মাস পরে লেখা কবিতা। আমাদের সন্দেহ হয়, 'মৃত্যুর পরে' কবিতার রেশ থেকে গেছে এইটিতে:

> আজি হতে সবে দয়া করে
> ভুলে যাও, ঘরে যাও চলে,
> করিয়ো না মোরে অপরাধী।
> মাঝখানে থামিলাম বলে।
> আমি চাহি আজি রজনীতে
> নীরব নির্জন;
> ভূমিতলে ঘুমায়ে পড়িতে
> স্তব্ধ অচেতন।

—এ যেন কাদম্বরী দেবীর জবানীতে লেখা।

এর কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথের মনে সুরের ঢল নামল। ১২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 25 May] দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারুবালা দেবীর বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই দিন ঝিঁঝিট খাম্বাজ সুরে গান রচনা করলেন 'বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে' [দ্র গীত ২।২৮১-৮২; স্বর ৫০]। কাব্যগ্রন্থাবলী [১৩০৩]-তে এই গানটি ও পরে-লেখা আরও কয়েকটি গান 'চিত্রা' কাব্যখণ্ডের অন্তর্গত ও শিরোনামাঙ্কিত হয়ে মুদ্রিত হয়—সেখানে এই গানটির নাম 'বিকাশ' [পৃ ৩৬১]। Ms. 129-এ গানটির পাণ্ডুলিপির নীচে 'সুধীর বিবাহ দিনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখে রেখেছেন। অন্য গানগুলিও এই পাণ্ডুলিপিতে লেখা হয়েছে। ইন্দিরা দেবীর 'গানের বহি'তেও রবীন্দ্রনাথ গানগুলি রচনাক্রম অনুযায়ী লিখে দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে তারিখ দেননি।

অন্য গানগুলি আমরা তালিকাবদ্ধ করে দিচ্ছি :

১৩ [শনি 26 May] বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে' দ্র গীত ৩।৮৯৩; স্বর ৫০; 'বিস্ময়' [কানেড়া]—কাব্যগ্রন্থাবলী। ৩৬২।

১৪ [রবি 27 May] 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি' দ্র গীত ২।২৮৩; স্বর ১০; 'বন্দনা' [ইমনকল্যাণ]—কাব্যগ্রন্থাবলী। ৩৬২; গানটির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপি সাধনার ভাদ্র-সংখ্যায় [পৃ ২৭৯-৮২] প্রকাশিত হয়।

১৬ [মঙ্গল 29 May[কত] কথা তারে ছিল বলিতে' দ্র গীত ২।২৮৫; স্বর ১০; 'মনের কথা' [মিশ্র রামকেলী]কাব্যগ্রন্থাবলী। ৩৬২।

১৭ [বুধ 30 May] 'ওগো পুরবাসী/আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী' দ্র গীত ২।৬০২; স্বর ২৮; গানটি কাব্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'বিসর্জন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে অপর্ণার কণ্ঠে ব্যবহৃত হয় [পৃ ২৬০-৬১]।

১৯ [শুক্র 1 Jun] 'আমারে কর তোমার বীণা দ্র গীত ২।২৮৩; স্বর ১০; 'আত্মোৎসর্গ'—কাব্যগ্রন্থাবলী। ৩৬২; গানটির ইন্দিরা দেবীকৃত স্বরলিপি ['খাম্বাজ-একতালা'] সাধনার আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যায় [পৃ ৪৮৭-৮৯] প্রকাশিত হয়।

৩০ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 12 Jun] 'রাজা ও রানী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল :

রাজা ও রাণী।/(দ্বিতীয় সংস্করণ)/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও/প্রকাশিত।/৫৫ নং চিৎপুর রোড/৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ সাল।/মূল্য ১ এক টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২+১১২।

কয়েকদিন পরে 16 Jun [শনি ৩ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ডে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন : 'তোমাকে আমার ছোট গল্প প্রথম খণ্ড, রাজা ও রাণীর দ্বিতীয় সংস্করণ এবং সাধনা পাঠান যাচ্চে। রাজা ও রাণী দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তৃত পরিবর্তিত হয়ে গেছে, একবার চোখ বুললেই দেখ্‌তে পাবে। যা ছিল, আয়তনে তার অর্দ্ধেক হয়ে গেছে।'[১২] আয়তনে অর্ধেক না হলেও পরিবর্তনের পরিমাণ ব্যাপক—প্রথম সংস্করণের ৩১টি দৃশ্যের জায়গায় দ্বিতীয় সংস্করণে মাত্র ১৮টি দৃশ্য আছে, তার মধ্যে কয়েকটি আবার আগের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। ভাষাও স্থানে স্থানে মার্জিত হয়েছে। নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর ২৮ শ্রাবণের ডায়েরিতে এই সব সংশোধন সম্বন্ধে লিখেছেন : রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সংস্করণ "রাজা ও রাণী" দেখিলাম। ইহাতেও সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়াস দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু সকল স্থলে সংশোধনগুলি সমীচীন নহে। বর্তমান সংস্করণে সঙ্গীত ও গদ্যাংশগুলি প্রায়শঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা মন্দ নহে। গ্রন্থের গল্পাংশে কোনও পরিবর্তনই সংসাধিত হয় নাই। অমিত্রাক্ষরের উন্নতিসাধন করিতে গিয়া কবি অনেক স্থলেই খারাপ করিয়া ফেলিয়াছেন। "এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথসাগরে" এই ছত্রের পরিবর্তে "এ নিস্তব্ধ অন্তরের অনন্ত নিশীথে" এই কটমট লাইনটি দেখিয়া আমি উন্নতির স্থলে অধোগতিই অনুভব করিলাম। রবিবাবু আপন রচনা সম্বন্ধে আগে যেরূপ অন্ধ ছিলেন, এখন দেখিতেছি, তিনি ততোধিক মমতাহীন হইয়া পড়িয়াছেন। কাটিয়া, ছাঁটিয়া, উড়াইয়া, গুঁড়াইয়া তিনি যেন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। এতদূর নির্ম্মম হইয়াও তিনি যে সর্ব্বত্র সুবুদ্ধি ও সুবিচারশক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।'[১৩] নিত্যকৃষ্ণের অভিযোগের সঙ্গে সকলে একমত না

হতে পারেন, কিন্তু কত মনোযোগের সঙ্গে তিনি এবং তাঁর মতো আরও অনেকে রবীন্দ্র-রচনার অনুশীলন করতেন তার পরিচয়টি শ্রদ্ধার্হ।

সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ [৩।৭] :

১-১১ 'মৃত্যুর পরে' দ্র চিত্রা ৪। ৪৪-৫৩

২৫-৩৭ 'শোক সভা' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৫২৯-৩৬

সাময়িকতা-দুষ্ট বলে রবীন্দ্রনাথ 'শোকসভা প্রবন্ধটিকে গদ্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে 'পরিশিষ্ট' অংশে এটি সংকলিত হয়েছে।

কলকাতায় থাকলে রবীন্দ্রনাথ কী-ধরনের জীবনযাপন করতেন তার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা 16 Jun-এর পূর্বোক্ত পত্রে। আমরা আগে দেখেছি, কলকাতায় থাকার সময়ে ৫২/২ পার্ক স্ট্রীটে পিতার কাছে যাওয়া তাঁর প্রায় নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন আবার কাছেই ৫০ নং বাড়িটি সত্যেন্দ্রনাথ ভাড়া নিয়েছেন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সহ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সপরিবারে সেখানে বাস করছেন। সুতরাং সেখানে গিয়ে প্রাত্যহিক সান্ধ্য-আড্ডা ও কখনও কখনও রাত্রিবাস করায় রবীন্দ্রনাথ কার্পণ্য করতেন না। প্রমথ চৌধুরীকে তিনি লিখছেন : গতকল্য আষাঢ়স্য প্রথম দিবস গেছে। তার আগের দিন থেকেই রীতিমত ঘনঘটা করে বজ্রবিদ্যুৎ সহকারে নববর্ষার আবির্ভাব হয়েছে। দিনটা খুব সুদীর্ঘ এবং মেঘস্নিগ্ধ-সন্ধ্যাবেলাটি ঘন অন্ধকার এবং রিমঝিম্ বর্ষণে বেশ জমাট। প্রায় সে সময়টা বহুবিধ আত্মীয়-বন্ধুমণ্ডলী-পরিবৃত হয়ে পঞ্চাশ নম্বর পার্ক স্ট্রীটেই যাপন করা যায়। ঠিক গাড়িতে উঠ্‌বার সময়সময় মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়, অনেক রাত্রি পর্যন্ত বৃষ্টিশান্তির অপেক্ষা করতে হয়—তদবসরে সেই তাকিয়া-পরিবৃত নীচের বিছানায় তাসের মজলি জমে যায়—এবং গোল টেবিলটার কাছে আমাদের মত একদল অনভিজ্ঞ লোকের সভা বসে। গত দুদিন ধরে শারাড্ অভিনয় চল্‌চে, তাতেও আমাদের বর্ষার সভা খুব সরগরম হচ্চে। ···গত সন্ধ্যাবেলার জনসংখ্যার একটা তালিকা দিলেই বুঝ্‌তে পারবে পঞ্চাশ নম্বরের সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি বই হ্রাস হয়নি। কুমুদ, লোকেন, সতু, তারকবাবু, লিল, সত্য, অরু, নরু, আমি, ছোট বউ, আমার সব কটি সন্তান (শেষটিকে তুমি দেখনি), বড়দিদি, বলু, সরলা, এবং এবাড়ির স্থায়ী অধিবাসীবর্গ। আজকাল দুই একটি করে ইংরাজেরও সমাগম হচ্চে। তন্মধ্যে বাঁড়ুয্যের পুত্রবধূ, Miss Valentine নাম্নী একটি কুমারী, এবং Miss Forbes নাম্নী অপর একটি ইংরাজকুমারী প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য।'[১৪] মেজ জ্যাঠাইমা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বাড়ির পরিবেশ ও সেখানে যাওয়া-আসার স্মৃতিচারণ করে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'The world in which my second uncle Satyendranath's family lived, almost next door to that of my grandfather the Maharshi and my eldest uncle Dwijendranath, was of a quite different flavour. Aunt Jnanadanandi presided over the *Inga-Banga Samaj* consisting of English-educated Indians.... The afternoons would start with tennis and tea and end with supper....My father owned a carriage drawn by an old piebald mere. Almost every afternoon we would drive to Park Street. On the return journey

through the lonely streets late at night the rhythmic clatter of the hooves and the weird effect of light and shadow alternately cast by the gas lamps would at first cause my sensitive mind to imagine all sorts of fairy-tales. This, however, was followed by a deep slumber out of which my mother would shake me when the carriage turned into the all-too-familiar lane leading to our house.'[১৫] কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারবর্গের জীবনযাত্রার একটি স্পষ্ট রূপ এই বিবরণে ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের গানে harmony-র প্রয়োগ এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আষাঢ়-সংখ্যা সাধনা-য় [পৃ ১১৬-১৯] মায়ার খেলার অন্তর্গত 'পথ হারা তুমি পথিক যেন গো' গানটির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত একটি অভিনব স্বরলিপি মুদ্রিত হয় : 'সুর রচয়িতা—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মিশ্রমিল-রচয়িতা—সিয়োঁর 'মান্‌যাটো'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ harmony-র প্রতিশব্দ রূপে 'মিশ্রমিল শব্দটি ব্যবহার করে আকার-মাত্রিক স্বরলিপির এই বিশিষ্ট রূপটি ব্যাখ্যা করেন 'মিশ্রমিল অলঙ্কারযুক্ত সুরের স্বরলিপি (পৃ ১১২-১৫] রচনায়। তিনি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় (পৃ ৭৯-৮২] ঐকতানিক স্বর-সংগ্রহ' ['দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। "ডডায়ার্কিন এণ্ড সন" কর্তৃক প্রকাশিত] গ্রন্থটির সমালোচনা করেছিলেন। সম্ভবত এরই সূত্রে আকার-মাত্রিক স্বরলিপিতে মিশ্রমিল প্রকাশ করার ইচ্ছা থেকে রবীন্দ্রনাথের গানে harmony সৃষ্টির প্রয়াস ঘটে। সিয়োঁর মান্‌জাটো-কে সংগ্রহ করে আনেন অবনীন্দ্রনাথ। তিনি তখন, ওয়েলি পার্কের কাছে ইটালিয়ান আর্টিস্ট গিলার্ডির কাছে ছবি আঁকা শিখছিলেন, সে বাড়ির নীচের তলায় থাকে মান্ধাটা নামে এক বুড়ো ইটালিয়ান মিউজিক মাস্টার আর তার মেয়ে। বুড়ো বাপেতে মেয়েতে থাকে বেশ, রোজ সকালে মেয়ে পিয়ানো বাজায়, বাপ বাজায় বেহালা।'[১৬] অবনীন্দ্রনাথ যাঁকে মান্ধাটা নামে অভিহিত করেছেন, তিনিই এই মিশ্রমিল-রচয়িতা সিয়োঁর মান্‌জাটো।

ব্যাপারটি ঠাকুরপরিবারে কিছু উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী-তেও [পৃ ১৮৩-৮৬] সরলা দেবীকৃত রবীন্দ্রনাথের 'সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে' গানটির অনুরূপ স্বরলিপি প্রকাশিত হয়, তিনি অবশ্য harmony-র পরিভাষা করেন স্বরমিলন'—"মিল'টি তাঁরই রচনা। জীবনের ঝরাপাতা'য় এ-সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন, আমরা তা আগেই উদ্ধৃত করেছি [দ্র রবিজীবনী ২। ২৫৩]।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু' বিহারীলাল চক্রবর্তীর মৃত্যু হয় ১১ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 24 May] ৬০ বছর বয়সে। কিছুদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর শোকার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে, বিহারীলালের মৃত্যুর পর তিনি রচনা করলেন 'বিহারীলাল' প্রবন্ধ [দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪১১-৩২]—সাধনার আষাঢ়-সংখ্যায় (পৃ ১২৬-৫৫] তাঁর একমাত্র রচনা। বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিহারীলালের বিশিষ্ট অবদান-যে আমাদের আলোচনার অঙ্গীভূত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটিকেই তার পথপ্রদর্শক বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

আরও একজন বিশিষ্ট বাঙালি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান হয় ২ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 15 May] তারিখে। ভূদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সশ্রদ্ধ হলেও তাঁর তিরোধানে কোনো প্রবন্ধ তিনি লেখেন নি। অনেক দিন পরে ১১ আশ্বিন ১৩১৮ [28 Sep 1911] কলকাতায় অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তের [1875-

1936] সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রসঙ্গটি ওঠে, রবীন্দ্রনাথ বলেন : '…"চন্দ্রনাথ [বসু] হিন্দু ছিলেন সত্য, কিন্তু ভূদেববাবুর মত wide outlook, সেরকম Philosophic depth তাঁহার ছিল না। ভূদেববাবুর মত মানুষ সচরাচর দেখা যায় না।"/ আমি বলিলাম, "ভূদেববাবুর সম্বন্ধে আপনি কিছু লিখিলে ভাল হয়।"/ রবিবাবু বলিলেন, "রামেন্দ্রবাবুও আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। দেখি, লিখিবার ইচ্ছা আছে।"'[১৭] কিন্তু এই ইচ্ছা কোনোদিন পূর্ণ হয় নি।

আষাঢ় মাসের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট সম্মান লাভ করলেন। The Bengal Academy of Literature নামে একটি সাহিত্য-সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ [রবি 23 Jul 1893] তারিখে। ২/২ নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে অবস্থিত শোভাবাজার রাজবাটী ছিল এই প্রতিষ্ঠানের কার্যস্থল। কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব [1866-1912] সভাপতি, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও L. Liotard সহ-সভাপতি এবং ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। যে সতেরো জন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা-দিবসে উপস্থিত ছিলেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী [?—1903] ছাড়া অন্যদের সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি না থাকলেও এদের উদ্যোগে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হল তার জন্য বাঙালি-মাত্রই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রথম দিকে এর কাজকর্ম সবই চলত ইংরেজি ভাষায়, অ্যাকাডেমির মুখপত্র *'The Bengal Academy of Literature'*ও প্রকাশিত হত প্রধানত ইংরেজিতে। রাজনারায়ণ বসু ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবে 'বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ' নামটি গৃহীত হয় 18 Feb 1894 [৭ ফাল্গুন ১৩০০] তারিখে অনুষ্ঠিত এয়োবিংশ অধিবেশনে, কিন্তু পরবর্তী March-সংখ্যার [no. 8] মুখপত্রটি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' শিরোনাম নিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরিষদের কাজে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকায় সভাপতি কুমার বিনয়কৃষ্ণ পরিষদের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন : '…পরিষদের কল্যাণোদ্দেশে আগামী ১৭ই বৈশাখ রবিবারে [29 Apr 1894] অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়ে, শোভাবাজার রাজবাটীতে এক সাধারণ সভা হইবে। আমার সবিনয় অনুরোধ আপনি ঐ সভায় উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিবেন। সভায় সকল খ্যাতনামা বাঙ্গালা লেখক আহূত হইবেন। সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বাঙ্গালার চিন্তাশীল মনীষিগণ পরিষদের উদ্দেশ্য, কার্যবিবরণ ও নিয়মাবলীর আলোচনা করিবেন; যদি পরিষদ প্রতিষ্ঠা তাঁহাদিগের মনোনীত হয় তবে যাহাতে ইহা জাতীয় ভাবে সংগঠিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং বাঙ্গলা ১৩০১ সালের জন্য সভাপতি, সহকারী সভাপতি সম্পাদক প্রভৃতি নির্বাচন করিবেন।'[১৮] এই পত্র নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের নিকটও প্রেরিত হয়েছিল।* তিনি উক্ত অধিবেশনের সময়ে কলকাতায় উপস্থিতও ছিলেন, কিন্তু সভায় তাঁর উপস্থিতির কোনো প্রমাণ নেই। এই সভায় রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও নবীনচন্দ্র সেন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। নিয়ম অনুযায়ী আর-একটি সহ-সভাপতির পদ খালি ছিল। সেটি পূরণ করা হয় 17 Jun 1894 [রবি ৪ আষাঢ়] তারিখে অনুষ্ঠিত নবগঠিত পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে। এই দিনের কার্যবিবরণীর চতুর্থ দফায় লেখা হয় : 'দুইজন সহকারী-সভাপতির একজন পূর্ব্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অন্য জনের নির্বাচন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অন্যতর সহকারী-সভাপতির পদে নির্বাচিত করা হইল।'[১৯] কে তাঁর নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করেছিলেন বিবরণে তার উল্লেখ নেই। রবীন্দ্রনাথ এই দিনও কলকাতায় ছিলেন, কিন্তু

পরিষদের সভায় যাওয়ার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। বস্তুত সহ-সভাপতি রূপে নির্বাচিত হওয়ার পরই তাঁর সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, এই সম্পর্ক সারা জীবন রক্ষিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ৮ আষাঢ় [বৃহ 21 Jun] শিলাইদহে যান। কয়েক দিন আগে 16 Jun প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন : 'আমি অবিলম্বে শিলাইদহ অভিমুখে যাত্রা করচি। সেখানে বর্ষাটা বোটের মধ্যে একাকী যাপন করতে হবে। অনেকগুলি কেতাব এবং গুটিকতক খালি খাতা সঙ্গে যাবে।'[২০] 24 Jun [রবি ১১ আষাঢ়] শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'সবে দিন চারেক হল এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই—মনে হচ্ছে আজই যদি কলকাতায় যাই তা হলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব···আসলে, কলকাতা থেকে এখানে এলে সময়টা চতুর্গুণ দীর্ঘ হয়ে আসে—কেবল আপনার মনোরাজ্যে বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিক চলে না। ভাবের তীব্রতা অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়—কোনো কোনো ক্ষণিক সুখ দুঃখ মনে হয় যেন অনেকক্ষণ ধরে ভোগ করছি।'[২১] 26 Jun [মঙ্গল ১৩ আষাঢ়] আর-একটি চিঠিতে বর্ষার নদীর বর্ণনা ['ধান কাটবার জন্যে কাস্তে হাতে চাষারা মাথায় টোকা পরে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে খেয়া নৌকোয় পার হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সোনার তরী' কবিতার সমালোচনার কথা আবার মনে করিয়ে দেয়] দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "এতক্ষণ কোনো কাজ না থাকাতে নদীর দিকে চেয়ে গুন্ গুন্ স্বরে ভৈরবী টোড়ি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজন-পূর্বক আপন মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটা অনির্বচনীয় ভাবের এবং বাসনার আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তবিক জীবন এবং বাস্তবিক জগৎ আগাগোড়া এমন একটা মূর্তিপরিবর্তন করে দেখা দিলে, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার এমন একটা সংগীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল, এবং এই সুরের ছিদ্র দিয়ে নদীর উপর জলের তরল পতনশব্দ অবিশ্রাম ধ্বনিত হয়ে এমন একটা পুলক সঞ্চার করতে লাগল—জগতের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন একটিমাত্র প্রাণীকে ঘিরে আষাঢ়ের অশ্রুসজল ঘনঘোর শ্যামল মেঘের মতো 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা এমনি স্তরে স্তরে ঘনিয়ে এল যে, হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠতে হল যে, "থাক্, আর কাজ নেই, এইবার Criticism on Contemporary Thought and Thinkers পড়তে বসা যাক। কিন্তু বাদলার সকালে একেবারে অতটা-দূর পর্যন্ত বীরত্ব দেখানো আমার মতো দুর্বল লোকের কর্ম নয়।"[২২] এই অংশটি রসিকতার ভঙ্গীতে লেখা হলেও গানের প্রেরণা ও মোহ এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের মনে সঞ্চারিত হত তার বহু প্রমাণ আছে। 10 Sep [২৬ ভাদ্র] এইরকমই মানসিক অবস্থায় তিনি 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে' গানটির কয়েকটি মাত্র ছত্র রচনা করেছিলেন [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৩৩১-৩২ পত্র ১৫২]—সম্পূর্ণ আকারে গানটি রচিত হয় গীতাঞ্জলি-র যুগে অগ্র° ১৩১৪-তে। বোঝা যায়, মিশ্র রামকেলি রাগে রচিত গানটি এত বছর ধরে তাঁর মনে গুঞ্জরিত হয়েছে বর্তমান পত্রে বর্ণিত 'ভৈরবী টোড়ি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী'র আলাপে এই গানটিই রূপ নিচ্ছিল কিনা তা কে বলতে পারে?

পত্রের শেষ অনুচ্ছেদটি ছিন্নপত্র-তে সংকলিত হয় নি, পাণ্ডুলিপিতেও কালি বুলিয়ে কাটা : আজকাল আমার নিজের কতবার ইচ্ছে করে যে, কোনোমতে নির্জন নিঃশব্দ খ্যাতিহীনতার মধ্যে ফিরে যাই। নিদেন, আমি যতদিন বেঁচে থাকি আমার জীবনের সমস্ত খ্যাতিকীর্তি কেবল আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকে। তা হলে বেশ

আরামে থাকতে পারি। ছিন্নপত্র-এর যুগে [১৩১৯] বিখ্যাত কবির লেখায় এ ধরনের কথা অনাবশ্যক বিনয় বলে গণ্য হতে পারে ভেবে রবীন্দ্রনাথ হয়তো অনুচ্ছেদটি বর্জন করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী যুগের কৌতূহলী গবেষকদের কাছেও গোপন করতে চেয়ে কালি বুলিয়ে কেটে দিয়েছিলেন এটিও লক্ষণীয়। কিন্তু ছিন্নপত্রাবলীর সম্পাদকীয় অনুসন্ধিৎসা তাঁর নিভৃতচারী ব্যক্তিত্বটি উদঘাটনে সহায়তাই করেছে।

পরদিন 27 Jun [বুধ ১৪ আষাঢ়]* রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছেন : আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছু না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হলে বোধ হয় পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়।···গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি, ···আমার বোটে আমলাবর্গের আগমন হল—তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, তবু সে মনের মধ্যে আছে।'[২৩] গিরিবালা মেঘ ও রৌদ্র' [দ্র সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক। ৩৫৫-৯৩; গল্পগুচ্ছ ১৯। ২১০-৩৫] গল্পের নায়িকা। গল্পটি এইদিন লেখা শুরু হলেও শেষ হয় সম্ভবত আরো পরে। নায়ক শশিভূষণের জীবনের কয়েকটি ঘটনা ও মাস-দুয়েক পরে রচিত 'এসো এসো ফিরে এসো' কীর্তনাঙ্গের গানটি [? ১৪ ভাদ্র] এরূপ অনুমানের কারণ।

সাধনার প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের লেখনী যে-রকম সচল ছিল, গত কয়েক মাস ধরে তা যথেষ্টই মন্থর। ফলে শিলাইদহের নির্জন পরিবেশে সময় কাটানোর সমস্যা তাঁকে কিছুটা পীড়িত করছিল। ইন্দিরা দেবীকে লেখা কয়েকটি চিঠিতেই দেখা যায়, কলকাতা থেকে চিঠি যথাসময়ে না আসায় তিনি চঞ্চল হয়েছেন। 'অনেকগুলি কেতাব এবং গুটিকতক খালি খাতা' তাঁর সঙ্গে এলেও চিঠিগুলি থেকে বোঝা যায় তাদের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার হচ্ছিল না। একটি বইয়ের নাম রবীন্দ্রনাথ নিজেই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, আরও দু'টি বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে, দু'টিতেই অর্ধ-নামপত্রে তাঁর স্বাক্ষর আছে : 'Rabindranath Tagore/ June 1894/ Shilaidah'। একটি হল J. E.Gore-প্রণীত *The Worlds of Space* [1894] ও অপরটি Sir Robert Stawell Ball [1802-57]-এর লেখা *The Story of the Sun* [1893]। Robert Ball-এর লেখা আর-একটি জ্যোতির্বিদ্যার বই *In Starry Realms* [1892]ও তাঁর সংগ্রহে আছে, এটি তিনি কিনেছিলেন আরও আগে—অর্ধ-নামপত্রে তাঁর স্বাক্ষরের নীচে তারিখ : August/1892। বইগুলিতে দাগ ও লেখা বিশেষ কিছু নেই—যেটুকু আছে তাও সম্ভবত অন্য কোনো ব্যক্তির—কিন্তু কত মন দিয়ে তিনি বইগুলি পড়েছিলেন সেকথা লিখেছেন বহুদিন পরে 1 Aug 1911 [১৬ শ্রাবণ ১৩১৮] মীরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে : রথী তোদের Ball-এর Astronomy পড়ে শোনাচ্ছেন? ও বইটা প্রথম যখন পড়েছিলুম তখন আমার এত ভাল লেগেছিল যে,আমার আহার নিদ্রা ছিল না।'[২৪] কিন্তু বর্তমান সময়ে তাঁকে দেখা যায় সময় কাটানোর অন্য উপায় সন্ধান করতে, 27 Jun-এর চিঠিতেই তিনি লিখছেন : 'দিনযাপনের আজ আর-এক রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে। আজ বসে বসে ছেলেবেলাকার স্মৃতি এবং তখনকার

মনের ভাব খুব স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে করবার চেষ্টা করছিলুম।' যথেষ্ট পরিমাণ রচনার তাগিদ মনের মধ্যে না থাকায় চিঠি লেখা ও অলস চিন্তার বাহুল্য দেখা যায় এই সময়ে।

পারিবারিক স্নেহপ্রীতির আকাঙ্ক্ষাও আছে মনের মধ্যে : 'তোর এবারকার পত্রে অবগত হওয়া গেল আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমাটি [মীরা দেবী, বয়স সাড়ে পাঁচ মাস] তাঁর ক্ষুদ্র ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছেন। আমি সে চিত্র বেশ দেখতে পাচ্ছি। তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে আমার মুখটা নাকটা চোখটা যেন তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে আছে।' একই কথা এই দিন তিনি লিখেছেন মৃণালিনী দেবীকে : 'আজকের বিবির চিঠিতে তোমাদের কতকটা বিবরণ পেলুম। সে লিখেছে তোমরা প্রায়ই সেখানে যাও—এবং আমার ক্ষুদ্রতম কন্যাটি মেজবোঠানের কোলে পড়ে পড়ে নানা বিধ অঙ্গভঙ্গী এবং অস্ফুট কলধ্বনি প্রকাশ করে থাকে। তাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে। আমি যদি আষাঢ় মাস মফস্বলে কাটিয়ে যাই তাহলে ততদিনে তার অনেক পরিবর্ত্তন এবং অনেক রকম নতুন বিদ্যে শিক্ষা হবে।'* এর পরে পুত্র-কন্যার সংগীত-শিক্ষা সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে লিখেছেন : 'তুমিও তোমার পুত্রকন্যাদের সঙ্গে একত্র বসে সা রে গা মা সাধ্‌তে আরম্ভ করে দাও না—তার পরে বর্ষার দিনে আমি যখন ফিরে যাব তখন স্বামী স্ত্রীতে দুজনে মিলে বাদ্‌লায় খুব সঙ্গীতালোচনা করা যাবে।' অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পারিবারিক গণ্ডীতে সংগীতচর্চার জন্য কারোরই বিশেষ পরিচিতি নেই।

আগের বছর আষাঢ় মাসে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লিখেছিলেন : 'কবিত্বে এক পয়সা খরচ নেই (যদি না বই ছাপাতে যাই)'—এবছর সেই বই ছাপানোর জন্যই তাঁকে ঋণী হতে হয়েছে : 'কাল ডিকিন্সন্‌দের বাড়ি থেকে আবার তাগিদ্ দিয়ে আমার কাছে এক একশো বিরাশি টাকার বিল এবং চিঠি এসেছে। আবার আমাকে সত্যর শরণাপন্ন হতে হল। তা হলে তার কাছে আমার ন শো টাকার ধার থাক্ল।' কিছুদিন আগে রাজা ও রানী-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং কড়ি ও কোমল-এর দ্বিতীয় সংস্করণ এই সময়ে ছাপাখানায়—এই কারণেই কাগজের দোকানের দাবী মেটাতে গিয়ে তাঁর প্রধান উত্তমর্ণ সত্যপ্রসাদের কাছে ঋণ করতে হয়েছে। কলকাতায় ফিরে তিনি এই ঋণের কিয়দংশ শোধ করেছেন, ৫ শ্রাবণ সত্যপ্রসাদ তাঁর হিসাব-খাতায় লিখেছেন : 'রবিমামার হাওলাত আদায় ২৯৩'।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের একাকী বাসের সময়ে 'নির্জনতার একটা প্রোগ্রাম ক্রমশই পাকাপাকি বাঁধা হয়ে' আসছিল, কিন্তু কয়েকদিন অতিথি-সমাগমের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় তিনি মানসিকভাবে কিছুটা চঞ্চল : 'এখন আমি আমার কাজের অবসরগুলি কল্পনা দিয়ে ভরাট করে নিয়েছি—সে জায়গায় হঠাৎ মানুষ এসে পড়লে ভারী একটা গোলোযোগ বেধে যায়।···আমার এই ক্ষুদ্র নির্জনতাটি আমার মনের workshop-এর মতো, তার নানাবিধ অদৃশ্য যন্ত্রতন্ত্র এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চার দিকে ছড়ানো রয়েছে—বন্ধু যখন আসেন তখন সেগুলি তাঁর চোখে পড়ে না, কথ্‌ন কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই, দিব্যি অজ্ঞানে হাস্যমুখে বিশ্বসংসারের খবর আলোচনা করতে করতে আমার অবসরের-তাঁতে-চড়ানো অনেক সাধনার সূক্ষ্ম সূত্রগুলি পট্ পট্ করে ছিঁড়তে থাকেন—যখন স্টেশনে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে পুনর্বার একাকী আমার কর্মশালায় ফিরে আসি তখন দেখতে পাই আমার কত লোকশান হয়েছে।'[২৫] রবীন্দ্রনাথ জানেন 'এ-সব অসামাজিক কথা

প্রকাশ না করাই উচিত', কিন্তু 'তাঁর জীবন-রচনা'র পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি-স্বভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এটিকে বুঝতে না পেরেই অনেকে তাঁর সমালোচনা করেছেন।

আমরা জানি না কারা অতিথি হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আপ্যায়নের বিস্তৃত বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন গগনেন্দ্রনাথকে একটি তারিখ-হীন [? ২৩ আষাঢ় শুক্র 6 Jul] চিঠিতে : 'আমার অতিথিরা দুদিন ধরে বিস্তর মুরগি, টিনের মাছ, সসেজ, শ্যাম্পেন ক্ল্যারেট এবং হুইস্কি সমাপ্ত করে গেছেন। ভেবেছিলুম সাহাজাদপুরে যদি দৈবাৎ কোন অভ্যাগত উপস্থিত হয় তাদের জন্যে শ্যাম্পেনজাতীয় দুই একটা তরল পদার্থ অবশিষ্ট থাক্‌বে —কিঞ্চিৎ আছে কিন্তু সে একেবারেই যৎকিঞ্চিৎ। ডেপুটিবাবু খুব জমে গিয়েছিলেন। এখানে তাঁর আগমনে আমলা ও প্রজারা কিছু মনের সন্তোষে আছে, মৌলবীর ত কথাই নেই।'[২৬] এই মৌলবীর পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের কাছে শিলাইদহে মৌলবী ও তাঁর মতো কত বিচিত্র লোকের আবির্ভাব হত, তার একটি সরস বর্ণনা আছে ছিন্নপত্রাবলী-র ১২৭-সংখ্যক [6 Jul শুক্র ২৩ আষাঢ়] পত্রে [পৃ ২৭৮-৮০]।

চৈত্র ১২৯৯ পর্যন্ত গুণেন্দ্রনাথের সম্পত্তির একজিকিউটর ছিলেন তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী দেবী এবং ভগ্নীপতি-দ্বয় যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও নীলকমল মুখোপাধ্যায়। বৈশাখ ১৩০০ থেকে সম্পত্তির মালিক হন গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তিন ভাই—যদিও এজমালি সম্পত্তি দেবেন্দ্রনাথের অধীনে দেখাশোনা করতেন রবীন্দ্রনাথ। এই জন্য গগনেন্দ্রনাথকে জমিদারির বিস্তৃত খবর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রে লিখেছেন : 'এ বৎসরের আরম্ভে এখানে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের ভাব দেখা যাচ্চে—তাই আমাকে শীঘ্র সাহাজাদপুরে পালাতে হচ্চে। পুণ্যাহের টাকা গুজস্তামত আদায় হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে আদায়ের কোন গোল হবে না—শস্য বেশ যথেষ্ট হয়েছে সম্প্রতি দুদিন বৃষ্টি হয়ে অনেক উপকার হয়েছে।' ইসবশাহী বা ইউসুফশাহী পরগণার অধীন সাজাদপুরের জমিদারি গগনেন্দ্রনাথের ভাগেই পড়বে এ-কথা হয়তো মৌখিকভাবে আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, তাই সেখানকার কর্ম্মচারী-নিয়োগ-সংক্রান্ত খবরও জানিয়েছেন : 'সাজাদপুরের জন্যে একটি ভাল গোছ ভাবী পেশ্‌কার যোগাড় করেছি—···তার দরখাস্ত ও Testimonials বোধ হয় তোমাদের ওখানে পাঠানো হয়েছে।'

এর পরে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'আহা, তোমাদের ফ্রেঞ্চ মাষ্টারটির মৃত্যুসংবাদে বড়ই কষ্ট হল। ভালমানুষ গরিব বেচারী বিদেশে এসে মারা পড়ল!' এই 'ফ্রেঞ্চ মাষ্টারটি' হচ্ছেন সুইডেন-বাসী কার্ল এরিখ হ্যামারগ্রেন, যাঁর সম্পর্কে কিছু কথা আমরা আগেই বলেছি। ২০ আষাঢ়। [মঙ্গল, 3 Jul] কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হলে তাঁরই অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে নিমতলার শ্মশানঘাটে হিন্দুরীতিতে তাঁর মৃতদেহ দাহ করা হয়। *The Statesman*-এর 5 Jul-সংখ্যায় খবরটি প্রকাশিত হয় :

Cremation of a European By Hindoos.

For the first time in the history of Calcutta, it is believed, a European has been cremated at Nimtolla-ghat in the Hindoo fashion. On Tuesday the Brahmos consigned to the flames, according to Brahmo rites, the body of Karl Hammergren, a Swedish gentleman, and a

member of their body. The deceased came out to this country in July last year, to study more closely the history and principles of the Brahmo Somaj, which he had joined in Sweden. He was a highly educated man, a master of many languages and was becoming eminently useful to his church by infusing into it a spirit of high culture. He was cremated at his own wish.[২৭]

The Indian Messenger থেকে জানা যায়, ২৪ আষাঢ় [শনি 7 Jul] সন্ধ্যায় ৬১/১ রাজাবাজার স্ট্রীটে ডাঃ মোহিনীমোহন বসুর বাড়িতে ও পরদিন সকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তাঁর 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ বসু তাঁর প্রস্তাবিত রামমোহন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার্থে ১০০ টাকা দান করেন।

কিন্তু হিন্দুর পবিত্র শ্মশানঘাটে বিদেশী ম্লেচ্ছের মৃতদেহ দাহ করায় 'হিন্দু' সংবাদপত্রগুলি সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি দুর্লভ বলে ঠিক কোন্ ভাষায় সেগুলি এই কাজকে সমালোচনা করেছিল, আমাদের জানা নেই। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য'-শীর্ষক যে-প্রবন্ধ [দ্র সাধনা, শ্রাবণ। ২৫৩-৬০; সমাজ-পরিশিষ্ট ১২। ৪৮৪-৮৯] লেখেন, তার থেকে বিষয়টি অবগত হওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "শাস্ত্রমতে অগ্নি যদিও পাবক এবং কাহাকেও ঘৃণা করেন না, তথাপি হিন্দুর পবিত্র নিমতলায় ম্লেচ্ছদেহ দগ্ধ হয় ইহাতে কোনো কোনো হিন্দুপত্রিকা গাত্রদাহ প্রকাশ করিতেছেন। বলিতেছেন এ-পর্যন্ত মৃত্যুর পরে তাঁহারা 'হাড়িডোম' প্রভৃতি অনার্য অন্ত্যজ জাতির সহিত একস্থানে ভস্মীভূত হইতে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যে-শ্মশানে কোনো সুইডেনবাসীর চিতা জ্বলিয়াছে সেখানে যে তাঁহাদের পবিত্র মৃতদেহ পুড়িবে, ইহাতে তাঁহারা ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।' প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি 'হাড়িডোম' কথাটিকে উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে রেখে পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন। 'পাঠকগণ মনে করিবেন না আমরা ঘৃণা প্রকাশ পূর্বক 'হাড়িডোম'প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতেছি আমরা সংবাদপত্রের ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি।'

হ্যামারগ্রেনকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। এই প্রবন্ধে আত্মার মহিমায় উজ্জ্বল বাঙালিপ্রেমী সেই বিদেশী মানুষটির প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বহুদিন বাদে এই সুইডেন থেকেই যখন তাঁকে নোবেল-পুরস্কারে ভূষিত করা হল তার পরে স্টকহোমে নোবেল-বক্তৃতা দিতে গিয়ে [24 May 1921] রবীন্দ্রনাথ এই মানুষটির কথা স্মরণ করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ এঁর কাছে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করতেন, সেই সময়ে খেলাচ্ছলে হ্যামারগ্রেনের যে স্কেচ তিনি এঁকেছিলেন, সেইটিই তাঁর একমাত্র প্রতিচ্ছিবি।[২৮]

শ্রাবণ-সংখ্যা সাধনা-য় [পৃ ২৬০-৬৫] মুদ্রিত 'অনধিকার প্রবেশ' [দ্র গল্পগুচ্ছ ১৯। ২০৫-০৯] গল্পটিও এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় লেখা। 'এই সুইডেনদেশীয় নিরীহ প্রবাসী প্রীতিপূর্বক বিশ্বাসপূর্বক অতি দূরদেশে পরজাতীয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; পাছে কোথাও অনধিকার প্রবেশ হয়,···এইজন্য সর্বত্র সর্বদাই ত্রস্ত সতর্ক বিনম্রভাবে এক পার্শ্বে অবস্থান করিতেন···মনে যত অনুরাগ যত শ্রদ্ধাই থাক পুড়িয়া মরিবার এবং মরিয়া পুড়িবার এই মহাশ্মশানক্ষেত্রে জীবনে মরণে তোমাদের কোনো অধিকার নাই'—মন্দিরের পবিত্রতা সম্পর্কে অতি-সতর্ক নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-বিধবা জয়কালী দেবী, যিনি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের অপরাধও

ক্ষমা করেন না, দয়াবৃত্তির অকস্মাৎ উদ্বোধনে অপবিত্র শূকরশাবকের অনধিকার প্রবেশকেও তিনি স্বীকার করে নিলেন—এই বৈপরীত্য শিল্পীর কলমে লেখা নয়, সমাজ-সংস্কারক চিন্তাশীল ব্যক্তির রচনা।

২৩ আষাঢ় [শুক্র 6 Jul] রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'আমি আজ বিকালে সাজাদপুরে রওনা হচ্চি।' পরের দিন ইন্দিরা দেবীকে যাত্রার বর্ণনা করে লিখলেন : "আমি এখন পথে। কাল যখন দুপুরবেলায় বোট ছাড়তে যাচ্ছি একজন আমলা এসে করযোড়ে বললে, 'ধর্মাবতার, আজকে বোট না ছেড়ে কাল সকলবেলায় ছাড়লে ভালো হয়।' আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললে, ত্র্যহস্পর্শ পড়েছে, আজ বড় অযাত্রা। আমি বললুম, আমি প্রমাণ করে দেব আজ যাত্রা শুভ—আমি নির্বিঘ্নে সাজাদপুরে পৌঁছব। এই ব'লে গ্রহ তারা তিথির মুখের উপর তুড়ি মেরে বেরিয়ে পড়লুম।"[২৯] সন্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা হয়। মেঘে-ঢাকা ম্লান সন্ধ্যায় আশেপাশের মিশ্রিত কলরবের মধ্যে 'বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারী একটা অপূর্ব ভাবের আবেগ উপস্থিত হল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল।···আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতাটায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলুম।···এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, তার যে-একটা ধ্বনি হতে থাকে সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য। সেই জন্যে দেখেছি আমার মনের অনেক সুতীব্র সুগভীর ভাব কবিতায় লেখা হয় নি। হয়তো আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।' অবশ্য আমরা এও দেখেছি যে, তাঁর কোনো কোনো অভিজ্ঞতা ও ভাব মনের গভীরে তলিয়ে গিয়ে অনুকূল অবসরে বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

পরের দিন [২৪ আষাঢ় শনি 7 Jul] ইছামতী দিয়ে সাজাদপুরের দিকে যেতে যেতে পোলিশ লেখক Jozef Igancy Kraszewski [1812-87]-এর লেখা *The Jew* উপন্যাসের অনুবাদ [অনুবাদক : L. Kowalewska, 1893][৩০] পড়ে শেষ করেন। এ-বিষয়ে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'অদৃষ্টক্রমে সে নভেলটা নিতান্তই অপাঠ্য—কেবলমাত্র আরম্ভ করেছিলুম ব'লে প্রাণপণে শেষ করে ফেললুম।···আমাদের ইচ্ছাশক্তিরও একটা গর্ব আছে—সে একটা জিনিষ নিজে আরম্ভ করেছে বলেই অবশেষে নিজের বিরুদ্ধেও সেটা শেষ করতে চায়। সেই একগুঁয়ে অনাবশ্যক অহংকার-বশত একটা বাজে-বকুনি-ভরা অসংলগ্ন প্রকাণ্ড অপাঠ্য গ্রন্থ একটি দীর্ঘ বর্ষাদিনে বদ্ধ ঘরে বসে শেষ করলুম—শেষ করবার মহৎ সুখ ছাড়া আর কোনো সুখ পেলুম না।'[৩১] পত্রে বইটির কঠোর সমালোচনা করলেও তিনি শ্রাবণ-সংখ্যা সাধনা-য় মুদ্রিত 'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধে লেখক ক্রাসিজউস্কির জীবনের মহত্ত্ব ও জাতীয় সম্মান-লাভের বর্ণনা করে লিখেছেন: "এই লেখক-রচিত 'ইহুদি'-নামক একটি উপন্যাসগ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন, লেখকের প্রতিভা জাতীয় হৃদয়ের আন্দোলন-দোলায় কেমন করিয়া লালিত হইয়াছে।"[৩২] লক্ষণীয়, এখানে শিল্পমূল্যের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির বিচার করেন নি।

এই সময়ে তিনি আর-একটি বিদেশী উপন্যাস পাঠ করেছিলেন—সেটি হল হাঙ্গেরিয়ান লেখক মৌরস্ য়োকাই [Maurus Jokai, 1825-1904]-এর লেখা *Eyes like Sea* [R. Nisbet Bain-এর অনুবাদ, 1893]।[৩৩] এই দু'টি উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধ রচনা করেন।

ক্রাসিজ্‌উস্কি-র রচনারম্ভের পঞ্চাশৎবার্ষিক উৎসব পোলাণ্ডবাসী 1879-এ পালন করেন, য়োকাই-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ উৎসব হয় 1894-এ। উভয়েই যথাক্রমে পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরির জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ও নিজেদের দেশের নূতন সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'ইঁহারা যেমন স্বদেশের সাহিত্যকে গতিশক্তি দিয়াছেন তেমনি তাহার চলিবার পথও স্বহস্তে খনন করিয়াছেন। প্রায় এমন কোনো বিষয় নাই যাহা তাঁহারা নিজে স্বভাষায় প্রচলিত করেন নাই। শিশুদের সুখপাঠ্য মনোরম রূপকথার গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস পর্যন্ত সমস্তই তাঁহারা নিজে রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষাকে বিদ্যালয়ে বদ্ধমূল এবং স্বদেশীয় সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন।' রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্রতও তাই, বাংলা সাহিত্যকে বাঙালির অন্তরে প্রকৃত প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য সারাজীবন নিজের প্রতিভাকে বিচিত্ররূপে বিকশিত করে গেছেন—কিন্তু এই সময়ে স্বদেশের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছে : 'আমাদের দেশে লেখকগণ বিচ্ছিন্ন, বিষন্ন, সঙ্গবিহীন। তাঁহারা বৃহৎ মানব-হৃদয়ের মাতৃসংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে বসিয়া আপন উপবাসী শীর্ণ প্রতিভাকে নীরস কর্তব্যের কঠিন খাদ্যখণ্ডে কোনোমতে পালন করিয়া তুলিতে থাকেন। সামান্য বাধা সে লঙঘন করিতে পারে না, সামান্য আঘাতে সে মুমূর্ষু হইয়া পড়ে, দেশব্যাপী নিত্যপ্রবাহিত গতি প্রীতি আনন্দ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া সে আপনাকে সতত সতেজ রাখতে পারে না। অল্পকালের মধ্যেই আপনার ভিতরকার সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করিয়া রিক্তবল রিক্তপ্রাণ হইয়া পড়ে।' বাঙালি লেখকের এই অভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও লিখেছেন, ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে নিজের চতুষ্পার্শ্বস্থ শূন্যতা সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাঙালি পাঠকের অবহেলা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ কিছুটা অতিরঞ্জিত—মাত্র তেত্রিশ বৎসরের এক যুবককে তারা প্রথম জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি পদে বরণ করেছে এবং লেখক-জীবনের নয়, মর্ত্য-জীবনের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সংবর্ধনা জানিয়েছে—যে-সম্মান স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও লাভ করতে পারেন নি। অবশ্য সেই যুগের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি পাঠকসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে মনে করেছিলেন কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

প্রবন্ধটি বিশেষ পরিচিত নয়, নইলে অন্তত রবীন্দ্রনাথের নারী-ভাবনার আলোচনাতেও এর উল্লেখ চোখে পড়ত। রোকাই-এর 'সমুদ্রের ন্যায় চক্ষু' উপন্যাসের নায়িকা 'বেসি'-র সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'শাস্ত্রমতে সে যে বড়ো পবিত্র উন্নত স্বভাবের তাহা নহে, সে পরে পরে পাঁচ স্বামীকে বিবাহ করিয়াছে এবং শেষ স্বামীকে হত্যা করিয়া কারাগারে জীবনত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে রমণী, সে বীরাঙ্গনা, অনেক সতীসাধ্বীর ন্যায় সে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী, কিছু না হউক তাহার নারীপ্রকৃতি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান; সে সমাজের কলে পিষ্ট এবং লেখকের গৃহনির্মিত নৈতিক চালুনিতে ছাঁকা গৃহস্থের ঘরে ব্যবহার্য পয়লা নম্বরের পণ্যদ্রব্য নহে, সুবোধ গোপাল ও সুমতি সুশীলার ন্যায় সে বাংলাদেশের শিশুশিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।' চোখের বালি-র বিনোদিনী ও চতুরঙ্গ-এর দামিনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথও 'প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান' নারীপ্রকৃতি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু হাঙ্গেরির সমাজের সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের গুণগত পার্থক্যের জন্য তাদের পক্ষে 'বেসি' হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।

সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ২৫ আষাঢ় [রবি 8 Jul] পৌঁছেছিলেন, 13 Jul [শুক্র ৩০ আষাঢ়] দেখা যায় তিনি 'কলকাতা-পথে' বোটে ইছামতী দিয়ে চলেছেন। ইছামতীর দুই পারের প্রকৃতি বর্ণনা তিনি পত্রের

মধ্যে বার বার করেছেন, এবারেও তার অভাব নেই। সেইজন্য লিখেছেন : 'ব[ড়দাদা] তাঁর বক্সোমেট্রি না লিখে থাকতে পারেন না। বী[রুদাদা] দেয়ালে দেয়ালে এবং তেতালার প্রত্যেক টবে সূর্য এঁকে তার মাঝখানে লিখে রাখছেন 'সূর্য'—কত ধ'রে ধ'রে, কতবার মুছে, কত যত্ন ক'রে আঁকেন তার ঠিক নেই। ঐ সূর্যটি ঠিক প্রকাশ করার উপরে তাঁর এবং পৃথিবীর কী সুখ নির্ভর করছে তা অন্তর্যামী জানেন। আমারও সেই একই পাগলামি, কেবল বিষয়ভেদ এবং প্রকারভেদ।'[৩৪]—রবীন্দ্রনাথের লেখায় বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা বহুবার এসেছে, কিন্তু ন'দাদা বীরেন্দ্রনাথের এই একটি মাত্র বর্ণনাই পাওয়া যায়।

15 Jul [রবি ৩২ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। এবার ৫০ নং পার্ক স্ট্রীটে সত্যেন্দ্রনাথের বাসা একেবারে শূন্য। পুত্র-কন্যা-সহ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সম্ভবত বলেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের নূতন কর্মস্থল সাতারায় যান আষাঢ়ের মাঝামাঝি অর্থাৎ জুলাইয়ের শুরুতে [ইন্দিরা দেবী 29 Jun পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিঠি কলকাতায় পেয়েছেন, শিলাইদহ থেকে 30 Jun-এ লেখা চিঠি সাতারায় পেয়েছেন 5 Jul]। গগনেন্দ্রনাথকে সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'বিরাহিমপুরের কাজের ভিড়ে এবং শারীরিক ক্লান্তিতে আমি কিছু লিখ্‌তে পারিনি—অথচ সাধনা এবার বড় অসহায়—জ্যোতিদাদা বলু সুধী [ইনিও কি নববধূ-সহ সাতারায় গিয়েছিলেন?] সকলেই তাকে পরিত্যাগ করে পালিয়েচেন।' উল্লেখ্য, সাধনা-র শ্রাবণ-সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের লেখা নেই।

ফলে, রবীন্দ্রনাথ প্রধানত জোড়াসাঁকোয় পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। 16 Jul [সোম ১ শ্রাবণ] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন: 'সদ্যোনিদ্রোত্থিত তেতালার ঘরে গিয়ে দেখি, আমার কনিষ্ঠ শাবকটি [মীরা দেবী] শয়নগৃহের মেজের মাদুরের উপরে প'ড়ে প'ড়ে কলরব করবার চেষ্টায় আছে।'[৩৫] সম্পূর্ণ পত্রটি দীর্ঘদিন পর আত্মজার সঙ্গে পুনঃপরিচয়ের বর্ণনা : 'কলকাতায় এসে অবধি আমার অধিকাংশ সময় তারই সঙ্গে হাস্যালাপে কেটে যাচ্ছে।' বস্তুত এবারে কলকাতায় এসে তিনি ইন্দিরা দেবীকে যে পাঁচটি চিঠি লিখেছেন [বা যে পাঁচটি চিঠি অনুলিখিত হয়েছে], তার তিনটি মীরা দেবীর কথাতেই পূর্ণ। 1 Aug [বুধ ১৭ শ্রাবণ]-এ লেখা চিঠিটি আরম্ভ হয়েছিল অন্য কথা দিয়ে : 'শরৎচন্দ্র রায় বলে একজন কে দেখা করতে এসেছিল, আমি দেখা করলুম না। বাঙালির ছেলেকে একবার ঘরের মধ্যে ঢোকালে, বের করে দেওয়া দায় হয়ে ওঠে।'—কিন্তু গড়িয়ে গেছে কন্যা-প্রসঙ্গে : 'কিন্তু বাঙালির মেয়ে মীরাটিও বড়ো কম নন—তিনিও একবার কলরব-সহকারে আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে আর শীঘ্র বের হন না। আমাকে থাবড়ে থুবড়ে, আমার বুকের উপর নৃত্য ক'রে—আমার দাড়ি গোঁফ, চুলের সিঁথে, লেখবার খাতা, গল্পের প্লট, ভাবের অনুবৃত্তি সমস্ত দুই ক্ষুদ্র হাতে ঘেঁটে নাস্তানাবুদ করে দিয়ে তবে তিনি আমার গৃহ হতে নিঃসৃত হন।'[৩৬]

বস্তুত সনিষ্ঠ সাহিত্যসাধনার মধ্যেও এই ছোটোখাটো স্নেহপ্রীতি ও চিন্তাশীল মনের সংসর্গ পাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মন উন্মুখ হয়ে থাকত। 21 Jul [শনি ৬ শ্রাবণ] একটি চিঠিতে লিখছেন : 'আমার ভারী ইচ্ছে—আমার ঘরের কাছে একজন কেউ গান বাজনা করবার লোক থাকে। বো[লি] যদি দিশি এবং ইংরাজি সংগীতে বেশ ওস্তাদ হয়ে ওঠে তা হলে আমার অনেকটা সাধ মিটবে।···সেদিন অ[ভি] যখন গান করছিল আমি ভাবছিলুম মানুষের সুখের উপকরণগুলি যে খুব দুর্লভ তা নয়—পৃথিবীতে মিষ্টিগলার গান নিতান্ত অসম্ভব আইডিয়ালের মধ্যে নয়, অথচ ওতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গভীর।···আমি জানি, আমার প্রকৃতি

সংগীত চায়, শিল্প চায়, সৌন্দর্য চায়, ভাবুক মানুষের সঙ্গ চায়, সাহিত্যের আলোচনা চায়—কিন্তু এ দেশে আমার বৃথা আকাঙ্ক্ষা, বৃথা চেষ্টা। এখানকার লোকেরা বিশ্বাসও করতে পারে না যে, এ জিনিসগুলো কারও পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমিও ক্রমে ভুলে যেতে আরম্ভ করি যে, আমার প্রকৃতির প্রায় কোনো শিকড়ই কোনো খাদ্য পাচ্ছে না। শেষকালে হঠাৎ যেদিন কোনো একটা খাদ্য কিছু পরিমাণে জোটে তখন হৃদয়ের তীব্র আগ্রহ দেখে মনে পড়ে যে, এতদিন আমি উপবাস করে ছিলুম, এ জিনিসটা আমার প্রকৃতির জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক।'[৩৭] পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ চিঠিটির পাশে 'বাদ' শব্দটি লিখে রেখেছেন, ছিন্নপত্র-তে পত্রটি সংকলিত হয় নি—কিন্তু রবীন্দ্র-মানসের একটি বিশিষ্ট প্রকাশের দিক থেকে পত্রটি মূল্যবান। 'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

কলকাতা-বাসের শেষ দিকে একবার 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে দেখা করতে যান 'ভাবুক মানুষের সঙ্গ' লাভের আকাঙ্ক্ষায়। 2 Aug [বৃহ ১৮ শ্রাবণ] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'প্রি[য়] বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব-ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিস বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি।'[৩৮] রবীন্দ্রনাথ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পড়তে কত ভালোবাসতেন তার অনেক উদাহরণ আমরা আগেই পেয়েছি, সেই বিজ্ঞানচর্চা তাঁর অন্তরের রসে কেমনভাবে জারিত হয়ে গিয়েছিল তার পরিচয় আছে এই পত্রের পরবর্তী অংশে : 'যখন অ্যাস্ট্রনমি প'ড়ে নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায় তখন জীবনের ছোটো ছোটো ভারগুলো কতই লঘু হয়ে যায়! তেমনি আপনাকে যদি একটা বৃহৎ ত্যাগস্বীকার কিম্বা পৃথিবীর একটা বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেওয়া যায় তা হলে তৎক্ষণাৎ আপনার অস্তিত্বভার অনায়াসে বহনযোগ্য বলে মনে হয়।'

৪ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৪ শ্রাবণ [রবি 29 Jul] অপরাহ্ণ ৫টায় কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে অনুষ্ঠিত পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে তিনি পরিষদের কার্যাবলীর সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করলেন। এই দিন একটি দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত হল। বাংলা পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন বিষয়ে রজনীকান্ত গুপ্ত-লিখিত একটি পত্র পাঠ করার পর 'উক্ত বিষয়ে আলোচনার পর সকলের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, নিম্নলিখিত ব্যাক্তিদিগকে লইয়া একটি সমিতি গঠন করা হউক। সমিতির সভ্যগণ ভূগোল, গণিত, প্রভৃতির পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন সম্বন্ধে ইচ্ছানুসারে আপনাদিগের মধ্যে বিষয় বিভাগ করিয়া লইবেন।'[৩৯] কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (সমিতির সভাপতি), রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শারদারঞ্জন রায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সমিতির সম্পাদক)-কে নিয়ে পারিভাষিক সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি গঠন-প্রসঙ্গে সারস্বত সমাজের [১২৮৯] কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক, এই সমাজের উদ্যোগে 'ভৌগোলিক পরিভাষা' মুদ্রিত হয়েছিল। [দ্র রবিজীবনী ২। ২০০-০১]। পরবর্তী ৭ম মাসিক অধিবেশনে [২৪ অগ্র° 9 Dec]-র ৫ম প্রস্তাবে দেখা যায় : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত ইংরাজী শব্দগুলির বাঙ্গালার প্রতিশব্দ নিরূপণের ভার পারিভাষিক সমিতির প্রতি অর্পিত হইল।'[৪০] এগুলি নিয়ে কাজ সম্ভবত কিছুই হয়নি। কেন-না ১৩০৩ বঙ্গাব্দে কার্যনির্বাহক সমিতির ১৩শ অধিবেশনে [১৭ ফাল্গুন 27 Feb 1897]

ব্যোমকেশ মুস্তাফীর প্রশ্নের উত্তরে জানানো হয় : 'এ সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় রবীন্দ্রনাথ বাবুকে যে ১৭ই মাঘে ১১৬৯ নং পত্র লিখিয়াছেন, [সম্পাদক রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী] তাহার উল্লেখ করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই ছিল যে, রবীন্দ্রবাবুর প্রেরিত শব্দ তালিকা কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইতেছে না, এজন্য তাঁহাকে পুনরায় তালিকা প্রেরণের নিমিত্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হইতেছে।'[৪১]

এই সভায় নাট্যকার মনোমোহন বসু প্রস্তাব করেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যখন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ. এ. ও. বি. এ. পরীক্ষায় যাহাতে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা আলোচনা হয়, তন্নিমিত্ত পরিষদের পক্ষ হইতে চেষ্টা করা উচিত।' পরবর্তী চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে [১১ ভাদ্র 26 Aug] প্রস্তাবটি কার্যকরী রূপ লাভ করে। আমরা যথাসময়ে প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করব।

শ্রাবণ মাসের প্রথমে কড়ি ও কোমল-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 18 Jul [বুধ ৩ শ্রাবণ], মুদ্রণ-সংখ্যা ১০০০। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র :

কড়ি ও কোমল।/ ছবি ও গান এবং ভানুসিংহের/ পদাবলী সম্বলিত।/ (দ্বিতীয় সংস্করণ)/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ কলিকাতা।/ অপার সারক্যুলার রোড কাশিয়াবাগান বাগানবাটীতে "ভারতী যন্ত্রে" | শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।/ সন ১৩০১।/ মূল্য এক টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : আখ্যাপত্র, উৎসর্গ, দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন, শুদ্ধিপত্র [৬]+সূচিপত্র [৪]+১৮৮।

'দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

ছবি ও গান, ভানুসিংহের পদাবলী ও কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ঐ তিন গ্রন্থের যে সকল কবিতা পাঠক সাধারণের জন্য রক্ষাযোগ্য জ্ঞান করি, তাহাই এই গ্রন্থে একত্র প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলির স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করা হইয়াছে। তিনখানি বহি লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের লেখা, তন্মধ্যে ভানুসিংহের পদাবলী অপেক্ষাকৃত শৈশবের রচনা।

ছবি ও গান থেকে আটটি কবিতা এই সংস্করণে গৃহীত হয় : ১। সুখের স্মৃতি। ২। যোগী ৩। স্মৃতি-প্রতিমা ৪। স্নেহময়ী ৫। রাহুর প্রেম ৬। মধ্যাহ্নে ৭। পোড়ো বাড়ি ৮। নিশীথ-চেতনা।

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এই সংস্করণে 'ভানুসিংহের পদাবলী' নামে অভিহিত। প্রথম সংস্করণের একুশটি কবিতার মধ্যে মাত্র নয়টি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'কো তুহুঁ' 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে স্থানান্তরিত হয়।

কড়ি ও কোমল-এর গানগুলি ও 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' ছাড়া এই কবিতাগুলিও দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয় : ১। শরতের শুকতারা ২। পাষাণী মা ৩। মা লক্ষ্মী ৪। মায়ের আশা ৫। পত্র [মাগো আমার লক্ষ্মী] ৬। পত্র [বসে বসে লিখলেম চিঠি] ৭। জন্মতিথির উপহার ৮। চিঠি [চিঠি লিখব কথা ছিল] ৯। পত্র [জলে বাসা বেঁধেছিলেম] ১০। পত্র [দামু বোস আর চামু বোসে] ১১। খেলা ১২। বাকি ১৩। বৈতরণী ১৪। সিন্ধুগর্ভ ১৫। ক্ষুদ্র অনন্ত ১৬। জাগিবার চেষ্টা ১৭। বিজনে। নূতন কবিতা রূপে এই সংস্করণে সংকলিত হয় 'ফুলের ঘা' [বালক, বৈশাখ ১২৯২]।

এই-সমস্ত পরিবর্তন পাঠক-সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর ৯ শ্রাবণের ডায়েরিতে লিখেছেন : 'সুকবির এই সুমতি দেখিয়া বাস্তবিকই বড়ই প্রীত হইয়াছি। তাঁহার বিচারশক্তি যে দিন দিন উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, উহা এখনও বিশুদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সংস্করণেও এমন কয়েকটি কবিতা রক্ষিত হইয়াছে, যাহাদিগকে বাদ দিলে জগতের কোনো ক্ষতি হইত না, অথচ পাঠক সম্প্রদায়কে কতকগুলো ছাইভস্মের হস্ত হইতে রক্ষা করা

হইত। এ জন্য আমরা অধিকতর সুসংস্কৃত তৃতীয় সংস্করণের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।'[৪২] অপরপক্ষে রবীন্দ্রভক্ত তরুণ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [1873-1932] ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ [31 May 1895] তারিখের এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'আপনি দ্বিতীয় সংস্করণে কড়ি ও কোমলের ওরূপ দুর্দশা করিয়াছেন দেখিয়া মর্মাহত হইলাম। তিনখানি পুস্তক একত্র করিবার কি প্রয়োজন ছিল? করিলেন করিলেন ছাঁটিলেন কেন? কোনগুলি আমাদের ভাল লাগিবে, কোনগুলি না লাগিবে, সে বিচার ঘরে বসিয়া আপনার করিবার কি অধিকার আছে? আর আর যাহা বাদ দিন, শ্রীমতী ইন্দিরার পত্রগুলি বাদ দিয়া বড়ই অত্যাচার করিয়াছেন। সেই পত্রগুলি আমরা বারম্বার পড়িতাম, লোককে পড়িয়া শুনাইতাম, হাসাইতাম, আপনারা হাসিতাম, ক্রমে মুখস্থ হইয়া যাইত, আপনি সেই পত্রগুলি কিনা বাদ দিলেন!!! কি অন্যায়! কি স্বার্থপরতা! ইহা অপেক্ষা আপনার পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন না কেন? প্রোষিতভর্তৃকা অপেক্ষা বিধবার কষ্ট কম।'[৪৩] ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ-র এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কী হতে পারে।

শ্রাবণের মাঝামাঝি প্রকাশিত হল চিত্রাঙ্গদা-র দ্বিতীয় সংস্করণ ও বিদায়-অভিশাপ। বিদায় অভিশাপ সাধনা-র মাঘ ১৩০০-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল, এই প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেল। আখ্যাপত্রে মুদ্রিত তারিখ : ১৬ শ্রাবণ ১৩০১ [মঙ্গল 31 Jul]। আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

চিত্রাঙ্গদা। /ও/ বিদায় অভিশাপ।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও/ প্রকাশিত।/ ৫৫ নং চিৎপুর রোড।/ ১৬ শ্রাবণ ১৩০১ সাল।/ মূল্য ১ এক টাকা।

মলাটে আছে : চিত্রাঙ্গদা।/ (দ্বিতীয় সংস্করণ)/ বিদায়-অভিশাপ।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১০৩ [চিত্রাঙ্গদা পৃ ১-৭৭; বিদায় অভিশাপ পৃ ৮০-১০৩]। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিগুলি বাদ গেলেও উৎসর্গ তাঁকেই করা হয়েছে : 'উৎসর্গ।/ স্নেহাস্পদ শ্রীমান অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরম কল্যাণীয়েষু।'

আমরা আগেই বলেছি, দু'টি কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রেই পাঠ-পরিবর্তনের পরিমাণ ন্যূনতম।

নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর ২৯ শ্রাবণের [সোম 13 Aug] ডায়েরিতে এই দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠ করে তাঁর মন্তব্য লিখেছেন, এটিকে বিশেষ করে চিত্রাঙ্গদা-র একটি বিশিষ্ট সমালোচনা-রূপে আমরা গ্রহণ করতে পারি :

বিচিত্র চিত্রগুলি বাদ দিয়া রবীন্দ্রের চিত্রাঙ্গদার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। 'বিদায় অভিশাপ' নামক সুন্দর কবিতাটিও ইহার সহিত সংযুক্ত দেখিলাম। চিত্রাঙ্গদায় রবীন্দ্রের অমিত্রাক্ষর অনেকটা নির্দ্দোষ। ইহার স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বিষয়টিও বেশ চিত্তাকর্ষক।···প্রথম যখন গ্রন্থখানি পাঠ করি, মনে হইয়াছিল, ইহার বুঝি কোনো প্রকার গূঢ় উদ্দেশ্য নাই; কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্রের সমাবেশ। কিন্তু পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া আমার ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল। কবি ইহাতে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের একটি ইতিহাস বর্ণিত করিয়াছেন। প্রেমের মূলে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি ও আসঙ্গলিপ্সাই প্রবল, ইহাতে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্য্যে মানুষের মন বেশীদিন শান্তি লাভ করিতে পারে না। আর সে শোভা স্থায়ীও নহে। প্রেমিক স্বীয় বাঞ্ছিতের শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে, কর্ম্মহীন বিলাসলীলা প্রেমের আদর্শ নহে। কর্ত্তব্য পালনের পথে···সাহচর্য্যই ইহার চরম উদ্দেশ্য। ইহাই প্রেমের বিষম পরীক্ষার সময়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে দম্পতি তাঁহাদের মিলন বজায় রাখিতে পারিলেন, তাহারাই ধন্য। কারণ, 'শ্রান্তিহীন সে মিলন চিরদিবসের'। এইরূপে প্রথম সৌন্দর্য্যের মোহ, যৌবনের ভ্রান্তি, উপভোগের অরুচি, তৎপর ভূষণবিহীন সত্যের অভ্যুদয়, ইহাই প্রেমের প্রকৃত ইতিহাস। যে কবি এই মহান ইতিহাস এমন সুন্দর ও মধুর করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন তিনি সহস্র সাধুবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।/ ফুরায় ফুলের যবে ফুটিবার কাজ,/ তখন প্রকাশ পায় ফল—/ এই একটি মাত্র বাক্যে সমগ্র গ্রন্থের উপদেশ নিবদ্ধ রহিয়াছে।

—এই মন্তব্য ১৩০১ বঙ্গাব্দে লেখা হলেও প্রকাশিত হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ ১৩১১-সংখ্যা [পৃ ৭৩-৭৪] সাহিত্য-তে। পত্রিকাটির নিয়মিত লেখক কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তা নিশ্চয়ই পড়েছিলেন, আমরা আশা

করতে পারি; অথচ তিনিই বছর-দুয়েক পরে 'কাব্যে নীতি'র ধ্বজা তুলে এই কাব্যটি সম্পর্কে বিষোদ্গার করতে আরম্ভ করেছিলেন!

[প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "এই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'খামখেয়ালি সভা' বসে মাঝে মাঝে।···রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে গুটিকতক 'খেয়ালী' সভ্য লইয়া ক্লাব গঠন করা হইল। ···একটা স্লেটে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় নিমন্ত্রণলিপি লিখিতেন, ···একটি পত্রের নমুনা উদ্‌ধৃত করিতেছি—এই সভা ১৩০১ সালের শ্রাবণের ১৩ তারিখে (২৮ জুলাই ১৮৯৪) আহূত হয়।/ শ্রাবণ মাসের ১৩ তারিখে শনিবার সন্ধ্যাবেলা"[৪৪] ইত্যাদি। তথ্যটি যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রজীবনী-কার আমন্ত্রণলিপিটি উদ্ধৃত করেছেন অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' থেকে,[৪৫] যেখানে অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি থেকে বলতে গিয়ে কিছুটা ভুল করে ফেলেছিলেন। 28 Jul 1897-এ বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি ও ঝামাপুকুর রীডিং রুম-এর উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী সভার আমন্ত্রণপত্রের উল্‌টো পিঠে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে লেখা মূল আমন্ত্রণলিপিটি রবীন্দ্রভবনে আছে, তাতে উক্ত প্রথম ছত্রটির সঠিক পাঠ পাওয়া যায় : 'শ্রাবণমাসের ১৬ই তারিখ শনির সন্ধ্যাবেলা'—এর থেকে হিসাব করে দেখা যায়, জোড়াসাঁকোয় রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে 'খামখেয়ালি সভা'র অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৬ শ্রাবণ ১৩০৪ অথাৎ 31 Jul 1897 শনিবারে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে 'খামখেয়ালি সভা'-র প্রতিষ্ঠা হয় ২৪ মাঘ ১৩০৩ অর্থাৎ 5 Feb 1897 শুক্রবারে। আমরা যথাস্থানে এ-বিষয়ে আলোচনা করব।]

সাধনা, শ্রাবণ ১৩০১ [৩/৯] :

২০০-১০ 'রাজা ও প্রজা' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৫৪২-৪৮
২২৪-৩৩ 'সাহিত্যের গৌরব' দ্র সাহিত্য [১৩৬১]। ২৪২-৫০
২৫৩-৬০ 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' দ্র সমাজ-পরিশিষ্ট ১২। ৪৮৪-৮৯
২৬০-৬৫ 'অনধিকার প্রবেশ' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৯। ২০৫-০৯

'রাজা ও প্রজা' একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ। সিভিলিয়ান রাডীচি। [Radice] আইন লঙ্ঘন করে উড়িষ্যার এক জমিদারকে পীড়ন করাতে লেফটেনান্ট গবর্নর ম্যাকডোনেল এক বৎসরের জন্য তাঁর পদাবনতি ঘটান, কিন্তু এলিয়ট শাসনভার গ্রহণ করেই শাস্তি মকুব করে তাঁকে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন—এই প্রথাবিরুদ্ধ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনা করেন। এর ফলে জনসাধারণ যথাক্রমে যে হর্ষ ও বিষাদ অনুভব করেছিল, তিনি মনে করেন তা কেবল মোহবশত, 'কারণ আমাদের গবর্মেন্টের কর্তব্যনীতি অনেক পরিমাণে কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিতেছে, প্রজাদিগের ন্যায়ান্যায়বোধের সহিত তাহার যোগ অতিশয় অল্প।···যখন দেখিব প্রজার নিন্দা-নামক শক্তি গবর্মেন্টের রাজকার্যের মধ্যে আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে তখন আমরা আনন্দ প্রকাশ করিব।' রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডবাসী ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মধ্যে সর্বদাই একটি পার্থক্য দেখেছেন। ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার

পরিপ্রেক্ষিতে এখানকার ইংরেজের এমন একটা 'স্বতন্ত্র নূতন কর্তব্যনীতি' 'গঠিত হয়, যাকে ইংলণ্ডের ইংরেজ ভালো করে চেনে না। রাডইয়ার্ড কিপ্‌লিঙের[Rudyard Kipling, 1865-1936] মতো প্রতিভাসম্পন্ন ভারতবর্ষীয় ইংরেজ এই নূতন পদার্থটিকে ইংলণ্ডে পরিচিত করাতে গিয়ে 'প্রাচ্যদেশকে একটি বৃহৎ পশুশালার মতো দাঁড় করাইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের ইংরেজকে বুঝাইতেছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্মেন্ট্ একটি সার্কাস কম্পানি। তাঁহারা নানা-জাতীয় বিচিত্র অপরূপ জন্তুকে সভ্যজগৎসমক্ষে সুনিপুণভাবে নৃত্য করাইতেছেন। একবার সতর্ক অনিমেষ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেই সব-কটা ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবে। সুতীক্ষ্ণ কৌতূহলের সহিত এই জন্তুদিগের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, যথাপরিমাণে চাবুকের ভয় এবং অস্থি খণ্ডের প্রলোভন রাখিতে হইবে এবং কিয়ৎপরিমাণে পশুবাৎসল্যেরও আবশ্যক আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে নীতি প্রীতি সভ্যতা আনিতে গেলে সার্কাস রক্ষা করা দুষ্কর হইবে এবং অধিকারী মহাশয়ের পক্ষেও বিপদের সম্ভাবনা।' স্বভাবতই এই চিত্র ইংলণ্ডের ইংরেজের পক্ষেও পরম উপাদেয়। ফলে 'কেবল ভারতবর্ষে নহে ইংলণ্ডেও ক্রমে ক্রমে এই ধারণা বিস্তৃত হইতেছে যে, য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য। ভারতবর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে, সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে।' এইজন্যই পলিসির নামে ইংরেজ গবর্মেন্ট প্রজাদের ন্যায়ান্যায়বোধকে তুচ্ছ করে, বালাধন-হত্যাকাণ্ডের মামলায় হাইকোর্টের বিচারে যারা নিন্দিত হয়েছে, বাংলা-গবর্মেন্ট তাদের প্রত্যেককেই পুরস্কৃত করেছে। এর প্রতিকারের উপায় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে যে-ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন, তা আত্মগঠনমূলক : 'যখন আমরা বহুকালব্যাপী পরাধীনতার বিষময় শিক্ষা ভুলিতে পারিব, যখন প্রবলের অন্যায়াচরণকে বিধির বিধানের স্বরূপ নীরবে অবশ্যসহ্য বলিয়া স্থির করিব না, যখন অন্যায়ের প্রতিবিধান-চেষ্টা নিষ্ফল হইলেও কর্তব্য বলিয়া জানিব এবং সেজন্য ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হইব না,···তখন ব্রিটিশ গবর্মেন্টের ন্যায়পরতা কদাচ স্বার্থ পলিসি এবং ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হইবে না, অটল পর্বতের ন্যায় প্রজা-হৃদয়ের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।' সাম্রাজ্যবিস্তারের সেই স্বর্ণযুগে ইংরেজের সামরিক শক্তি তখন এতই অপ্রতিহত এবং পক্ষান্তরে একতাবন্ধন ও সুনির্দিষ্ট জাতীয় চেতনার অভাবে ভারতবাসী এতই দুর্বল যে, সেই অবস্থায় অন্য উপায় চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব ছিল। হঠকারী বৈপ্লবিক ঘোষণা সে-যুগে রবীন্দ্রনাথের কাছে আশা করা বাস্তব-সম্মত নয়।

অন্যান্য রচনাগুলি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

১৯ শ্রাবণ [শুক্র 3 Aug] রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ত্যাগ করে শিলাইদহে যান, এবার সম্ভবত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সঙ্গী হন। 4 Aug [শনি ২০ শ্রাবণ] তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে। কোথায় সেই কলকাতা, সেই তেতালার ছাত, সেই বিশৃঙ্খল খাট পালং চৌকির নিবিড়তার মধ্যে নিয়মিত জীবনযাত্রা,···একটি উন্মুক্তবাতায়ন তরণীর মধ্যে একটি ক্যাম্প্-টেবিলের শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভাতে পত্রলিখনে নিযুক্ত এবং তাঁহার সম্মুখভাগে অপর বেত্রাসনে তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত [? শ্রীশচন্দ্র মজুমদার] সাধনার জন্যে গল্পরচনায় [শ্রীশচন্দ্র তখন সাধনা-য় ধারাবাহিকভাবে। 'কৃতজ্ঞতা' উপন্যাস লিখছেন] একাগ্রমনে প্রবৃত্ত।···আজ সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর আলো এবং সুন্দর বাতাস। ইচ্ছা করছে বেশ

মধুরভাবে মগ্ন হয়ে একটা কিছু লিখি। বা গুন্‌গুন্‌ করে গান তৈরি করি, কিম্বা বেশ একটি সরল সুন্দর অতিশয়বৈচিত্র্যবিহীন এবং বিশ্লেষণশূন্য গল্পের বই পড়ি···কিন্তু এই-সমস্ত অপেক্ষাকৃত সুলভ সাধও আপাতত পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখছি নে। কারণ, চিঠি লিখতে লিখতে ইতিমধ্যেই নায়েব ও মৌলবী এসে প্রবেশ করেছেন। নায়েব আমাদের জমিদারি-প্রচলিত হিসাবপত্রের পদ্ধতি শ্রী[শ] বাবুকে বোঝাতে আরম্ভ করেছে; তাই নিয়ে যে জামিদারিক ভাষার আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার কণামাত্র যদি এই পত্রপ্রান্তে নমুনা-স্বরূপ উদ্ধৃত করে দিই তা হলে বোধ হয় ইহজন্মে তুই আর আমাকে মার্জনা করবি নে—সেই জন্যে বিরত হলুম।'[৪৬]

এবারে শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা অধিকাংশ পত্রেই বর্ষামুখর পদ্মার কথা। ২৩ শ্রাবণ [মঙ্গল 7 Aug] সম্ভবত শ্রীশচন্দ্র কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন, পরের দিন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'আজ সমস্ত দিন··· * বাবু নেই, আজ সমস্ত দিন নদীর কল্লোল শোনা গেছে। একটিমাত্র মানুষ কেবলমাত্র সামনে উপস্থিত থাকলেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না। আমি দেখেছি থেকে থেকে টুকরো-টুকরো কথাবার্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপব্যয় আর কিছুতে হয় না। যদি কোনো একটা সৃজনে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে বুদ্ধিশক্তি কল্পনাশক্তি তাজা রাখা আবশ্যক হয় তাহলে অনেকক্ষণ সম্পূর্ণ নীরব থাকা আবশ্যক।' চিঠির শেষে তিনি লিখেছেন : 'আমাদের দুটো জীবন আছে—একটা মনুষ্যলোকে আর-একটা ভাবলোকে। সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি।···এখানে যখন আসি তখন বেশ বুঝতে পারি—আমার কবিতায় আমি কিছুই লিখতে পারি নি। যা অনুভব করি তা ব্যক্ত করতে পারি নে।'[৪৭] সম্ভবত এই অনুভূতিই অন্যান্য ভাবের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রূপ নিল দু'দিন পরে লেখা 'অন্তর্যামী' কবিতায় [Ms. 129-এ প্রথম তিনটি স্তবকের শেষে লেখা আছে : 'শিলাইদহ/ বোট/ ১০ অগস্ট। ১৮৯২'—এখানে '১৮৯২' উল্লেখটি অবশ্যই ভুল] :

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

—পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির তিনটি স্তবকই পাওয়া যায়, অন্যান্য স্তবকগুলি পরের মাসে রচিত বলে 'ভাদ্র, ১৩০১' সময়-কাল নির্দেশ করা হয়েছে [দ্র চিত্রা ৪। ৫৫-৬২]; উল্লেখ্য, সাধনা-র আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যায় [পৃ ৪০৯-২৩] মুদ্রিত কবিতাটিতে আরও তিনটি স্তবক আছে, যেগুলি গ্রন্থে বর্জিত হয় [দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭০। ১৩২]। কিছুদিন থেকেই নিজের সচেতন মনের অন্তরালে কোনো অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতির ভাবনা রবীন্দ্রনাথের পত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল, এই কবিতাটিতে তা কাব্যরূপ লাভ করল।

বঙ্কিমচন্দ্রের শোকসভাকে কেন্দ্র করে বৈশাখ মাসে নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র-বিনিময়ের কথা আমরা আগে বলেছি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পত্রটি পাওয়া যায় নি। নবীনচন্দ্রের আর-একটি পত্রের উত্তরে ২৫ শ্রাবণ [বৃহ 9 Aug] তিনি যে-পত্রটি লেখেন, সেটি রক্ষিত হয়েছে :

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। হিন্দুমেলায় যখন আপনাকে প্রথম দেখি [৮ ফাল্গুন ১২৮৩ রবি 18 Feb 1877] তখন আমি অখ্যাত অজ্ঞাত এবং আকারে আয়তনে ও বয়সে নিতান্তই ক্ষুদ্র—তথাপি আমি যে আপনার লক্ষ্যপথে পড়িয়াছিলাম এবং তখনও আপনি যে আমাকে মন খুলিয়া অপর্য্যাপ্ত উৎসাহবাক্য বলিয়াছিলেন তাহা আমার পক্ষে বিস্মৃত হওয়া অকৃতজ্ঞতা মাত্র—কিন্তু আপনি যে সেই ক্ষুদ্রবালকের সহিত ক্ষণকালের সাক্ষাৎ আজও মনে করিয়া রাখিয়াছেন তাহাতে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। তাহার পরে আজ সপ্তাহখানেক হইল রাণাঘাটের ষ্টেশনে আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আমি মনে মনে আশা করিতেছিলাম আপনি আমার গাড়িতে উঠিবেন এবং আপনাকে আমার সেই বাল্যপরিচয় স্মরণ করাইয়া দিব, কিন্তু সেদিন আপনি ধরা দিলেন না।...সহৃদয়তাগুণে আজ আপনি নিজে হইতে পত্রযোগে ধরা দিয়াছেন কিন্তু কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপনপত্রে আপনার নিম্নে আমার নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া আপনি কেন আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন? যদিও আমি বয়সে আপনার অপেক্ষা অনেক ছোট হইব তথাপি দৈবক্রমে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার নামের নিম্নে আমারই নাম পড়িয়াছে—আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও ঐতিহাসিক পর্য্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি—আশা করি ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই অধিকারটি আমি রক্ষা করিতে পারিব।'[৪৮]

নবীনচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় পত্রটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন : 'স্মরণ হয়, ইহার প্রতিবাদ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম, আমার নিম্নে তাঁহার স্থান হইলে আমি ও বঙ্গ সাহিত্য, উভয়ে নিরাশ হইব। আমার আশা, তাঁহার স্থান আমি অযোগ্যের বহু ঊর্দ্ধে হইবে।' [৪৯]

রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে 'কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপনপত্রে'র যে-উল্লেখ আছে, তার প্রস্তাব গৃহীত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৪ শ্রাবণের অধিবেশনে। ড মদনমোহন কুমার লিখেছেন : 'ঐ অধিবেশনে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র আলোচিত হয় এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণের কয়েকখানি পুথি হইতে এক এক অংশ পাঠ করিয়া বিলক্ষণ পাঠ-বৈলক্ষণ্য গোচরীকৃত হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আরও পুথি সংগ্রহ করিবেন এবং বিজ্ঞাপন দিয়া পুথিসংগ্রহ করিয়া পরবর্তী কর্তব্য স্থির করিবেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।'[৫০] এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভাপতি ও দুই সহকারী সভাপতির নামে নিশ্চয়ই বাংলা পত্রিকাগুলিতে 'বিজ্ঞাপন' দেওয়া হয়েছিল, পত্রিকাগুলির বিলুপ্তির ফলে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের তারিখ ও ভাষা জানার কোনো উপায় নেই।

নবীনচন্দ্র যে পত্রটি লেখেন, তাতে অন্যান্য প্রসঙ্গও ছিল। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে শিলাইদহ থেকে 13 Aug [সোম ২৯ শ্রাবণ] লিখলেন : 'লেখকের জীবনে মাঝে মাঝে অনেকগুলি অচিন্ত্যপূর্ব্ব আনন্দের বিষয় ঘটিয়া থাকে। কথ্ন আপনাদের গৃহের একপ্রান্তে আমি একটুখানি প্রীতির আসন অধিকার করিয়াছিলাম তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। আপনার পুত্র যে আমার পত্রোত্তরের জন্য আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন, তাহা আমার আশার অতীত। তাঁহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিবেন, তাঁহার কল্পনার রবিবাবু যে গোপন প্রীতি উপহার পাইতেছে বাস্তব রবিবাবু সশরীরে সেই প্রীতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু বাস্তবে কল্পনায় বিরোধ বাধিলে বাস্তবকে বহুল পরিমাণে মার্জ্জনা করিয়া লইতে হইবে।'[৫১]

সৌজন্য-বিনিময়ের এই প্রতিযোগিতা এখানেও শেষ হয়নি, নবীনচন্দ্রের আর-একটি পত্রের প্রত্যুত্তরে 22 Aug [বুধ ৭ ভাদ্র] রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'আমার নমস্কারগুলি আপনার পত্রযোগে ফেরৎ পাইলাম এবং সেই সঙ্গে আপনার শতকোটি প্রণাম আসিয়াও পৌঁছিয়াছে অত্র রসিদদ্বারা জানাইলাম। ....আপনার পুত্রকে যে একটি চন্দ্রবিন্দু "তাঁহাকে" শব্দযোগে পাঠাইয়াছিলাম সে যদি তাহার বয়সের পক্ষে গুরুতর হইয়া থাকে তবে

সেটা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। ···আমার ভক্তটির মুখে আমার রচিত গান শুনিবার জন্য বড় ইচ্ছা হইয়াছে, এ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিবই সেজন্য আপনাদের পক্ষ হইতে কোনরূপ চেষ্টাই আবশ্যক হইবে না।'

এই-সব পত্রালাপের মধ্যে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে স্বগতকথনের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। জলের স্রোতে ভাসমান মৃত পাখিদের দেখে 9 Aug [বৃহ ২৫ শ্রাবণ] লিখছেন : 'য়ুরোপেও মানুষ এত জটিল এবং এত প্রধান যে তারা জন্তুদের বড়ো বেশি জন্তু মনে করে। ভারতবর্ষীয়েরা জন্মক্রমে মানুষ থেকে জন্তু এবং জন্তু থেকে মানুষ হওয়া কিছুই মনে করে না—....এই জন্যে আমাদের শাস্ত্রে সর্বভূতে দয়াটা একটা অসম্ভব আতিশয্য বলে পরিত্যক্ত হয়নি। মফস্বলের উদার প্রকৃতির মাঝখানে এলে, তার সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে আমার সেই ভারতবর্ষীয় স্বভাবটি জাগ্রত হয়ে ওঠে···সেইজন্যে প্রতিবারই মফস্বলে এসে মাংস খাওয়ার প্রতি আমার আন্তরিক ধিক্কার জন্মে, আবার কলকাতায় জনসমাজের মধ্যে গিয়ে মাংসাশী হয়ে উঠি। ···পাড়াগাঁয়ে আমি ভারতবাসী হই, আর কলকাতায় গিয়ে আমি য়ুরোপীয় হয়ে যাই। কোন্‌টা আমার যথার্থ প্রকৃতি কে জানে?'[৫২] পরের দিনের চিঠিতেও য়ুরোপ ও ভারতের তুলনা এসেছে, এবার সংগীতের ক্ষেত্রে : 'আমার মনে হয়, দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা—আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। ···আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের গান। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে যে-একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়, আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনন্ত উত্থানপতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।'[৫৩] ইন্দিরা দেবী গেটের জীবনী পড়ছেন জেনে 12 Aug [রবি ২৮ শ্রাবণ] তাঁকে লিখলেন প্রায় 'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধের সুরে : 'সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল, জর্মনিতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল—হের্ডের শ্লেগেল হুম্বোল্‌ট্‌ শিলার কাণ্ট্‌ প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারি দিকে জেগে উঠছিল, তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙালি লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি—আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনে, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না ব'লে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। ···গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব!'[৫৪] 10 Aug তিনি 'অন্তর্যামী' কবিতার তিনটি স্তবক লিখেছিলেন, 13 Aug [সোম ২৯ শ্রাবণ]-এ লেখা পত্রটি যেন সেই ভাবেরই ব্যাখ্যা : 'যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে প্রকাশ করাই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—এটা একেবারে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ—ভিতরকার একটা চঞ্চল শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা ঠিক মনে হয় না, মনে হয় সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে। প্রায়

আমার সমস্ত রচনাই আমার নিজের ক্ষমতার অতীত বলে মনে হয়—এমন-কি, আমার অনেক সামান্য গদ্য লেখাও। যে-সমস্ত তর্কযুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহিরভূত আর-একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব-মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিষটাকে মোটের উপরে আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ। সে আমাকে কেবল যে প্রকাশ করায় তা নয়, অনুভব করায়, ভালোবাসায়। সেই জন্যে আমার অনুভূতি আমার নিজের কাছেই প্রত্যেকবার নূতন এবং বিস্ময়জনক।'[৫৫]

19 Aug [রবি ৪ ভাদ্র] তিনি ইন্দিরা দেবীকে যে পত্রটি লিখেছেন, সেটি অন্য কারণে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন : 'এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি—তাতে গুটি-তিনেক সংস্কৃত বেদান্ত গ্রন্থ এবং তার অনুবাদ আছে; তার থেকে আমার অনেকটা সাহায্যলাভ হয়েছে। রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো একজন প্রখরবুদ্ধিমান লোকও বৈদান্তিক ছিলেন, ডয়্সেন সাহেবও আগাগোড়া বেদান্তের খুব প্রশংসা করে গেছেন, কিন্তু আমার মনের কোনো সংশয় দূর হয়নি।'[৫৬] এই সংশয়ের কথাই তিনি আলোচনা করেছেন ভাদ্র-সংখ্যা [পৃ ৩০২-২০] সাধনা-য় মুদ্রিত 'বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা' [এখনও গ্রন্থভুক্ত হয়নি] প্রবন্ধে। উক্ত প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি লিখেছেন : 'বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে জর্ম্মন্ অধ্যাপক ডাক্তার পৌল ডয়্সেন সাহেবের মত সাধনার পাঠকদিগের নিমিত্ত নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।' 'সঙ্কলন' লিখলেও পাদটীকায় তিনি 'অনুবাদক' হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ৩০২-১২ পৃষ্ঠায় অনুবাদের মাধ্যমে ডয়সেনের মত সংকলন করে তিনি 'অনুবাদকের প্রশ্ন রেখেছেন' ৩১২-২০ পৃষ্ঠায়। এই অংশটি পড়তে পড়তে সন্দেহ হয় এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা, না দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের! কিন্তু তাঁর আত্মপরিচয় ধরা পড়ে প্রবন্ধটির শেষাংশে : 'যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি বল? আমি আদি অন্ত মধ্য কিছুই জানি না, আমি কেবল এইটুকু জানি আমার হৃদয়ে যে প্রীতি ভক্তি দয়া স্নেহ সৌন্দর্য্যপ্রেম আছে তাহা অনন্ত চরিতার্থতা চায়—এমন কি আমার সেই সকল আকাঙক্ষার মধ্যেই আমি অনন্তের আস্বাদ পাই—সেই আমার সর্ব্বসফলতা যিনিই হৌন যেখানেই থাকুন তিনিই আমার ব্রহ্ম তাঁহাতেই আমার মুক্তি।' আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও আনুষ্ঠানিক ধর্মসাধনায় কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথের রুচি ছিল না—পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবশত যেটুকু বাহ্যিক সংস্কারানুগত্য দেখা যায়, তাঁর মৃত্যুর [৬ মাঘ ১৩১১] পর সেটুকুও লোপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি-উপলব্ধির সৃষ্টি, সেই কারণে বেদ-উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে তিনি ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেছেন নিজের উপলব্ধিকে একটি বিশেষ মাত্রা দেবার জন্য—সায়ন-কৃত টীকার সঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যার বৈলক্ষণ্য দেখে যাঁরা তাঁর সংস্কৃতানুশীলনের ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁরা যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতটি বিচার করে দেখেন না।

এই সময়ে সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ চলছিল। তাঁর চিঠিগুলির সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া না গেলেও, সুরেশচন্দ্রের কয়েকটি পত্র তিনি সযত্নে রক্ষা করেছেন। পরবর্তী কালে সুরেশচন্দ্র সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্র-বিদূষণের যে পঙ্কিল স্রোত প্রবাহিত করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এতে একটু আশ্চর্যও হতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতির মতো একদা-বন্ধু বিদূষণ-কারীদের প্রতি উষ্মা কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে ও কথোপকথনে প্রকাশ পেলেও সুরেশচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর বিস্ময়কর নীরবতা রবীন্দ্র-চরিত্রের জটিল গ্রন্থিসমূহের একটির প্রতি ইঙ্গিত

করে। এই পর্বে সুরেশচন্দ্রের রবীন্দ্র-ভক্তির পরিচয়টিও কৌতূহলজনক। তিনি রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে ৩ ভাদ্র [শনি 18 Aug] তাঁকে লিখেছেন :

সাদর নমস্কার নিবেদন—

আপনার প্রতিপূর্ণ সুমিষ্ট পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পড়িয়া, বলাবাহুল্য যে, তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীশবাবুকে লইয়া মহা আমোদ হইয়া গিয়াছে। তিনি ত ঘোলের একজন ভক্ত হইয়া কলিকাতায় পা দিয়াছেন দেখিতেছি—আবার আপনার নৌকাবাসে যাইতে প্রস্তুত।···

ভারি ত উপহার।—তবে আপনার হাতে সার্থক হইবে ও ভারি হইয়া দাঁড়াইবে। এ আশা আমরা অবশ্য করি।

সাহিত্য আপনার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইলাম। নিজকৃত কার্য্যের সফলতা অন্য কাহারও কাছে শুনিলে স্বভাবতঃ আনন্দ হয়। কিন্তু সেটা লুকাইয়া রাখাই সভ্যতার রীতি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার আবশ্যকতা দেখিতেছি না,—আপনার মত আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্য-রাজের মুখে শ্রাবণের সাহিত্যের প্রশংসা শুনিয়া বাস্তবিক আমি আনন্দিত এবং অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছি।

"বাঘের নখ" [সুরেশচন্দ্র-রচিত গল্প]—যাঁর লেখা তাঁর পক্ষ হইতে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আপনার প্রশংসা তাঁর পক্ষে, শিক্ষানবিশের শঙ্কিত সঙ্কোচের পক্ষে অত্যন্ত ষ্টিমুলেন্ট হইয়াছে।

"সোনার তরী" ছাপিয়া শেষ করিয়াছি ৫/৭ দিন। কভারের কাগজ নেই, তাই বেরুল না। আপনার এখানকার কার্য্যকারকের নামটি লিখিয়া পাঠাইবেন। কাগজের জন্য আমি মাননীয় সত্যবাবুকে পত্র লিখিয়াছি।···

কলিকাতার নূতন খবর দুটি,—আপনাকে দিবার মত। এক—মোহিনীবাবু এবারকার "ভারতীতে" এক কবিতা ছাড়িয়াছেন। দুই—শ্রীশবাবুর "বঙ্কিম-প্রসঙ্গে" [শ্রাবণ-সংখ্যা সাধনা-য় প্রকাশিত] হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। স্বর্গত * ঔপন্যাসিকের সহধর্ম্মিণী প্রবন্ধটি পড়িয়া অন্নজল পরিত্যাগ ও শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীশদাদাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, বিশ্বস্তসূত্রে শুনিলাম। আপনি দেখিয়া শুনিয়া দিয়াছেন? একথাও রাষ্ট্র; —এ বন্যার বেগ কে ধারণ করিবে। হিঁদুদের পক্ষ হইতে একজন দিতে পারি—বন্ধু হীরেনবাবু—তিনি বলেন "তাতে দোষ কি?" কেহ কেহ, —বঙ্কিমবাবুর আত্মীয়দিগের মধ্যে বলেন,—"সত্য কি এমনই করিয়া বলিতে হয়।" এখন আপনি বুঝুন।

কেমন আছেন? পদ্মা কেমন? নাটকখানির কতদুর? এখন নূতন কি লিখিতেছেন। আপনার পত্র বারবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, এবার একটা বিস্তৃত পত্রের আশা করিয়া বিদায় হই। ইতি ৩রা ভাদ্র ১৩০১।/ স্নেহার্থী সুরেশ সমাজপতি[৫৭]

উভয়ের সমকালীন সম্পর্কের দিক্-নির্দেশক ও কয়েকটি মূল্যবান তথ্যের জন্য পত্রটি প্রায় আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করেছি। সুরেশচন্দ্র যে উপহারের কথা লিখেছেন, সেটি সম্ভবত 'রাজ-সংস্করণ' সাহিত্য-এর কোনো সংখ্যা। এ-সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্র বলেছেন : 'সেকালের "সাহিত্যে"র একটা জাঁকালো সংস্করণ বাহির হইত। খুব পুরু মসৃণ কাগজে উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা, বহুমূল্য গোলাপী মলাটের কাগজে মোড়া। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ দশ টাকা। ···এক শত ছাপা হইত। একজন 'গ্রাহক' হইয়াছিলেন। তিনি ···জমিদার টাঙ্গাইলের কবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। ···অবশিষ্ট নিরানব্বই খানি আমরা বাছিয়া বিলি করিতাম।'[৫৮] এরই একটি সংখ্যা সুরেশচন্দ্র 'উপহার' হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে থাকতে পারেন।

'সোনার তরী' সংক্রান্ত তথ্যটি গুরুতর, কারণ এটি নিয়ে কিছু ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জানি, সোনার তরী-র প্রথম সংস্করণ '১২ নং রামকৃষ্ণ দাসের লেন সাহিত্য-যন্ত্রে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত' হয়েছিল, দ্বিতীয় সংস্করণটি '১৩/৭ বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত' হয়। উপরের চিঠিতে সুরেশচন্দ্র এই 'দ্বিতীয় সংস্করণ'টির কথাই উল্লেখ করেছেন। ড সুকুমার সেন এ-সম্পর্কে লিখেছেন : "সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকা বার হবার বছর দেড়েকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' বার করলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশ করতে না পেরে সমাজপতি বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষোভের কিছু প্রতিবিধান হবে ভেবে রবীন্দ্রনাথ সমাজপতিকে সোনার-তরী প্রকাশের ভার দিলেন আর তাঁর প্রেসে আরও কয়েকখানা বই ছাপালেন। কিন্তু সমাজপতি এমন এক কাণ্ড করে বসলেন যাতে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁকে

প্রকাশক রাখতে পারলেন না। Publicity Stunt হিসেবে সমাজপতি সোনার-তরী প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই, যখন অধিকাংশ বই অবিক্রীত রয়েছে তখন, শুধু নামপত্রটি বদ্‌লিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ বলে ছেপে দিলেন। তাই সমাজপতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা ঘুচল।"[৫৯] ড সেন এই তথ্যের কোনো উৎস-নির্দেশ করেননি; কিন্তু দু'টি সংস্করণ পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলে তথ্যটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে না। টাইপ, প্রতি পৃষ্ঠায় ছত্র-সংখ্যা, মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রভৃতি দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও খুঁটিয়ে দেখলে অলঙ্করণের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। তাছাড়া প্রথম সংস্করণ মাত্র ২৫০ কপি ছাপানো হয়েছিল, সুতরাং দ্রুত নিঃশেষিত হওয়া খুব বিচিত্র নয়। প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের পুস্তক-বিক্রয়ের পরিমাণ হতাশাজনক ছিল ঠিকই—কিন্তু বর্তমান সময়ে অবস্থার নিশ্চয়ই পরিবর্তন ঘটেছিল, অল্প সময়ের ব্যবধানে অনেকগুলি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণ হওয়াই তার প্রমাণ। উপরের চিঠিতে সমাজপতি অবশ্যই তাঁকে প্রতারণা করতে চাননি। এর পরেও 'বিচিত্র গল্প' দুটি ভাগ, 'কথা-চতুষ্টয়' ও 'গল্প-দশক' [30 Aug 1895] 'সাহিত্য-যন্ত্রে' মুদ্রিত হয়েছিল।

সুরেশচন্দ্র তাঁর পত্রে একটি নাটক সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। এই নাটকটি কি 'মালিনী'? রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পত্রটির উত্তর দিয়েছিলেন, সেটি পাওয়া গেলে এ-সম্পর্কে হয়তো কিছু তথ্য জানা যেত।

রবীন্দ্রনাথ 22 Aug [বুধ ৭ ভাদ্র] নবীনচন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন : 'আমি এখন কেবল যে নদীস্রোতে এবং কল্পনাস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছি তাহা মনে করিবেন না। কর্ম্মস্রোতও অত্যন্ত প্রবল। আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম এক মাসের মধ্যে অবসর করিয়া উঠিতে পারিব না। ···আগামী রবিবারের পরে সম্ভবতঃ রেলপথ হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িব।'[৬০] এর আগের দু'টি চিঠিতেও অনুরূপ কথা আছে। বোঝা যায়, সাজাদপুর-পতিসরে কিছুকাল কাটাবার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। কিন্তু কলকাতা থেকে সম্ভবত কোনো জরুরী আহ্বান গিয়ে পৌঁছেছিল, ফলে দু'দিন পরেই দেখা যায় তিনি কলকাতার অভিমুখে 'কুষ্টিয়ার পথে' চলেছেন; 24 Aug [শুক্র ৯ শ্রাবণ] বোটে করে যেতে যেতে লিখছেন : 'আমার ডান দিকের জানলা দিয়ে যতদূর চেয়ে দেখি নিবিড়সবুজ শস্যক্ষেত্র, বাম দিকের জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি অপার উদার জলরাশি। ....আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক সময় ভাবি—বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়।'[৬১] বর্ষাসজল পূর্ণ নদীর সৌন্দর্য দেখে তিনি লিখছেন : 'প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণবকবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়—তার প্রধান কারণ, এই-সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়—এর মধ্যে মানব-ইতিহাসের যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতিসম্মিলনগাথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণবকবিদের সেই অনন্তবৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণবকবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণবকবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।' বৈষ্ণবপদাবলী রবীন্দ্রনাথের রসদৃষ্টিতে কতখানি অনুস্যূত হয়ে ছিল, এই উদ্ধৃতিটিতে তার কিছুটা পরিচয় রয়ে গেছে।

কলকাতায় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ ১১ ভাদ্র [রবি 26 Aug] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে যোগদান করেন। এর আগের অধিবেশনে নাট্যকার মনোমোহন বসু প্রস্তাব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় 'যাহাতে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা আলোচনা হয়, তন্নিমিত্ত পরিষদের পক্ষ হইতে চেষ্টা করা উচিত।' বর্তমান অধিবেশনে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের একটি পত্র [প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিত ভূগোল ইতিহাসাদি বাংলা ভাষায়

পঠনপাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে] ও রজনীকান্ত গুপ্তের পত্র [উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজি স্কুল ও কলেজে বাংলার আলোচনা বাড়ানো, এফ.এ.পরীক্ষায় বাংলা রচনা ও অনুবাদের নিয়ম প্রবর্তন করা, বি.এ.পরীক্ষায় পাসকোর্সে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা পাঠ্যপুস্তকও নির্ধারণ করা ও অনার্সকোর্সে বাংলা রচনার নিয়ম প্রবর্তন করা বিষয়ে] পঠিত হয়। ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ-সম্পর্কে বলেন, অন্যান্য প্রদেশের ভাষা বাংলার মতো উন্নত ও পরিপুষ্ট না হওয়ায় এই বিষয়ে আপত্তি হতে পারে ও হচ্ছে, 'Faculty of Arts-এর গত অধিবেশনে কোন কোন মুসলমান সভ্য এই সূত্রে উর্দ্দূ লইয়া আপত্তির কথা উত্থাপিত করিয়াছিলেন'। শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বললেন, বাংলাতে মুসলমানের ভাষা যখন বাংলাই হয়ে পড়েছে, তখন এরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। 'শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন—"মফঃস্বলে যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন অধিকতর প্রচলিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ মুসলমান ছাত্রেরা অনেকেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, —এমন কি আজ কাল মুসলমান ছাত্রদিগের অনেকে সংস্কৃত শিক্ষাতেও কৃতকার্য্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।"....অবশেষে স্থির হইল যে মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু, মহাশয়দিগকে অনুরোধ করা হউক যে তাঁহারা এই বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক একটি নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব পরিষদের নিকট উপস্থিত করুন—করিলে পরিষদ তৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা করিবেন। পরিষদ তাঁহাদিগের প্রস্তাব প্রাপ্ত হইলে তাহা মুদ্রিত করিয়া সাধারণ অধিবেশনের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহার এক এক খণ্ড সভ্যদিগের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন।'[৬২] উল্লিখিত ব্যক্তিগণ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করেন; তাঁদের স্বাক্ষরিত ইংরেজিতে লেখা একটি রিপোর্ট ও 5 Jan 1895 [শনি ২২ পৌষ] তারিখ-সংবলিত একটি প্রচার-পত্র [Circular Letter] প্রায় ২০০ জনের কাছে মতামতের জন্য প্রেরিত হয়, যে ৭০ জন এই পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ৬৪ জনের বক্তব্য সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০২-সংখ্যার সঙ্গে ১০৪ পৃষ্ঠার একটি ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়। এইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Arts-এর কাছে প্রেরিত হয়। এর পরিণতি সম্পর্কে পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী [১৩০৩]-তে 'বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা প্রচলন' শিরোনামায় লেখা হয়েছে : '···বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Arts সভা পরিষদের প্রস্তাব বিবেচনা করিবার ভার যে সমিতির উপর অর্পণ করেন সেই সমিতি স্থির করিয়াছেন যে পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে এফ্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় নিরূপিত বিষয় ব্যতীত বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবেন, ও পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে এক একখানি প্রশংসা পত্র পাইবেন। আর্ট সভার এই মীমাংসা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের প্রতি পরিষ্দ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।'[৬৩]

এই প্রসঙ্গে *The Indian Mirror*-এর 26 Jun [মঙ্গল ১৩ আষাঢ়]-সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে : 'We are given to understand that the next meeting of the Chaitanya Library and Beadon Square Literary Club will be held in the middle of July to discuss whether Bengali should be introduced into the curriculum of F. A. and B. A. examination and to send up a requisition to the Senates if necessary. Babu Rabindra Nath Tagore and Pandit

Rajani Kant Gupta will read papers in favour of the proposal, and Mr. N. N. Ghosh will oppose it. The Hon'ble Justice Guru Dass Bannerji will preside.' এত বিস্তৃতভাবে পরিকল্পিত হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত সভাটি অনুষ্ঠিত হয়নি। আমরা দেখেছি, সাহিত্য পরিষদই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের উপরে আর একটি প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব এসে পড়ে। চৈতন্য লাইব্রেরি ও বীডন স্কোয়ার লিটারেরী ক্লাব তিনটি রচনা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। Blackie-রচিত *Self Culture* গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদ ও বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য দু'টি স্বর্ণপদক এবং বাংলা নাটকের ইতিহাস-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার ঘোষণা করে 30 Nov-এর মধ্যে রচনা জমা দিতে বলা হয়; তিনটি পুরস্কারের জন্য বিচারক নিযুক্ত হন যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।[৬৪] রবীন্দ্রনাথ হারাণচন্দ্র রক্ষিতের লেখা 'বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিম' প্রবন্ধটিকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। সাবিত্রী লাইব্রেরি-আয়োজিত মহিলাদের রচনা-প্রতিযোগিতায় [১২৮৯, ১২৯০] রবীন্দ্রনাথ অন্যতম বিচারক ছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি।

এবারে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় বেশি দিন ছিলেন না। 29 Aug [বুধ ১৪ ভাদ্র]-এ ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'আজ সকালে বসে বসে আমার একটা নতুন গানে সুর দিচ্ছিলুম—সুরটা যে খুব নতুন তা নয়, একরকম কীর্তনের ধরনের ভৈরবী। কিন্তু তবু ছন্দে ছন্দে গাইতে গাইতে শরীরের সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা সংগীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে—সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা বাজনার যন্ত্রের মতো কম্পিত এবং গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই সুরের স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে একটা স্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়। ···কিন্তু এই রকম করে গাইতে গাইতে কাজকর্মের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, প্রুফগুলো পড়ে রইল, দুপুর বেজে গেল, রৌদ্রের আলোক এবং তাপ ক্রমেই তীব্র হয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল—আজ আর কিছু হল না।'[৬৫] গানটি হল 'এসো এসো ফিরে এসো' [গীত ২। ৩৭২-৭৩; স্বর ১৩]; Ms. 129-এ রচনার স্থান-কাল হিসেবে লেখা : 'ভাদ্র। শিলাইদহ। ১৩০১।' অর্থাৎ কিছুদিন আগে শিলাইদহে থাকার সময়েই তিনি গানটি রচনা করেছিলেন। দু'মাস আগে 27 Jun [১৪ আষাঢ়] গিরিবালা-নাম্নী যে মেয়েটিকে 'কল্পনারাজ্যে অবতারণ' করিয়ে তিনি 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তারই শেষে গানটি ব্যবহার করা হয়েছে। গল্পটি সাধনা-র আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সাধনা, ভাদ্র ১৩০১ [৩।১০] :

২৮৩-৯৪ 'অপমানের প্রতিকার' দ্র রাজাপ্রজা ১০।৪১০-১৭

৩০২-২০ 'বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা'

৩২১-২৮ 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' দ্র ব্যঙ্গকৌতুক। ৭।৩৫১-৫৬

এছাড়া 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি' [দ্র গীত ২।২৮৩] গানটির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি ২৭৯-৮২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ লেখা ও পাঠের পর থেকেই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রায় ধারাবাহিক ভাবে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ হলোয়ার্ডের অশিষ্ট আচরণের উল্লেখ করেছেন, ছিন্নপত্রাবলী-র 10 Feb 1893 তারিখে লেখা ৭৯-সংখ্যক ও আরও কয়েকটি পত্রে যে আচরণকে তিনি ধিক্কার দিয়েছিলেন। জুরি-প্রথার বিরোধিতা করে সেই অধ্যক্ষ বলেছিলেন, 'জীবনের পবিত্রতা, অর্থাৎ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করার পরমদূষণীয়তা সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা ইংরেজের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পপরিমিত। সেইজন্য হত্যাকারীর প্রতি ভারতবর্ষীয় জুরির মনে যথোচিত বিদ্বেষের উদ্রেক হয় না।' বছর-দুয়েক আগের এই ঘটনার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, তার পরেও ইংরেজ-কর্তৃক অনেকগুলি ভারতবাসীর অপমৃত্যু ঘটেছে এবং ইংরেজের আদালতে একজন অপরাধীরও দোষ সপ্রমাণ হয় নি—এইসব সংবাদ কাগজে পড়লে 'ভারতবর্ষীয়ের প্রতি সেই মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু খড়্গনাসা ইংরেজ অধ্যাপকের তীব্র ঘৃণাবাক্য এবং জীবনহনন সম্বন্ধে তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান মনে পড়ে। মনে পড়িয়া তিলমাত্র সান্ত্বনা লাভ হয় না। ভারতীয় প্রাণ ও য়ুরোপীয় প্রাণের মূল্য বিষয়ে ইংরেজের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'কিন্তু বারংবার য়ুরোপীয় অপরাধীর অব্যাহতি এবং তৎসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষীয়ের ঔদাসীন্যে ভারতবর্ষীয়ের প্রতি ইংরেজের আন্তরিক অবজ্ঞার পরিচয় দেয়। সেই অপমানের ধিক্কার শেলের ন্যায় স্থায়ীভাবে হৃদয়ে বিঁধিয়া থাকে। এর জন্য তিনি অবশ্য স্বদেশবাসীকেই ধিক্কার দিয়েছেন, 'কারণ, একথা কিছুতেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না; সম্মান নিজের হস্তে।' প্রসঙ্গক্রমে তিনি খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মুহুরি-মারার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এই ম্যাজিস্ট্রেট এফ. ও. বেল তাঁর পূর্ব পরিচিত, সাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে একবার এঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন; সেইজন্য লিখেছেন : 'প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বেল-সাহেব দয়ালু উন্নতচেতা সহৃদয় ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য অথবা অবজ্ঞা নাই। আমাদের বিশ্বাস, তিনি যে মুহুরিকে মারিয়াছিলেন তাহাতে কেবল দুর্ধর্ষ ইংরেজপ্রকৃতির হটকারিতা প্রকাশ পাইয়াছে, বাঙালি-ঘৃণা প্রকাশ পায় নাই।' রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছেন বাঙালি ব্যারিস্টারের বিরুদ্ধে, যাঁর প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, 'মুহুরিমারা কাজটা ইংরেজের অযোগ্য হইয়াছে, কারণ, বেল-সাহেবের জানা ছিল অথবা জানা উচিত ছিল যে, মুহুরি তাঁহাকে ফিরিয়া মারিতে পারে না।' এইখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি, কারণ তিনি জানেন যে, 'মুহুরি যদি ফিরিয়া মারিত তবে বেল-সাহেব যথার্থ ইংরেজের ন্যায় তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন।' কিন্তু সেরূপ যে হয় না, তার কারণ 'আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে; তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি।···গুরুকে ভক্তি করিয়া ও মান্য লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্যাদা থাকা আবশ্যক···গৃহের এবং সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা সেই মনুষ্যত্ব উপার্জন করিতে পারিব তখন ইংরেজ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে এবং অপমান করিতে সাহস করিবে না।' লক্ষণীয়, এখানেও রবীন্দ্রনাথ অপমানের প্রতিকার করার জন্য ছুরিতে শান দেওয়ার পরামর্শ দেন নি, আত্মশক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব-সাধনার

উপর জোর দিয়েছেন। এই দিক দিয়ে দেখলে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি অব্যাহত যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বলে মনে করি।

'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' 'বিনিপয়সায় ভোজ'-এর মতো monologue-জাতীয় রচনা—এই ধরনের রচনাগুলি সম্পর্কে আমরা আগে আলোচনা করেছি।

সম্ভবত রবিবার ১৮ ভাদ্র [2 Sep] জমিদারি-পরিদর্শনোপলক্ষে কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে পূর্বপ্রতিশ্রুতিমতো রবীন্দ্রনাথ রানাঘাটে কবি নবীনচন্দ্র সেনের বাসায় একটি দিন যাপন করেন। নবীনচন্দ্র এ-প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন :

ইহার কিছু দিন পরে তিনি তাঁহার জমিদারী কার্যে কুষ্টিয়া যাইবার পথে একদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১০টার ট্রেনে দয়া করিয়া রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমার একজন আত্মীয় তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলে, তিনি যখন গাড়ী হইতে নামিলেন, দেখিলাম, সেই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের [1877] নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব! উজ্জ্বল গৌর বর্ণ; স্ফুটোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ; মস্তকে মধ্যভাগ-বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশশোভা; কুঞ্চিত অলক-শ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণদর্পণোজ্জ্বল ললাট; ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্ব্ব শ্মশ্রুশোভান্বিত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণ পক্ষ্মযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জ্জিত সুবর্ণের। চশমা।···মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খ্রীষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরান ও রেশমী চাদর।···

তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি গান রচনা করিয়াছিলাম। চৌদ্দ বৎসরবয়স্ক আমার পুত্র নির্ম্মল তাহা হারমোণি ফ্লুটের সঙ্গে গাইল। তাহার বড় আনন্দ হইয়াছে। রবিবাবু তাহার গলার প্রশংসা করিলেন, এবং আরও দুই একটি গান গাইতে বলিলেন। সে তাঁহার রচিত কয়েকটি গান গাইল।···আমরা তখন তাঁহাকে একটি গান গাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া, হারমোণি ফ্লুট তাঁহার সমক্ষে দিলাম। তিনি বলিলেন, তিনি কোনও যন্ত্রের সঙ্গে গাইতে ভালবাসেন না। কারণ, যন্ত্রে গলার মাধুর্য্য ঢাকিয়া ফেলে। তিনি একটি পর্দ্দা কিছু ক্ষণ টিপিয়া, সুরটিমাত্র স্থির করিয়া, যন্ত্র ছাড়িলেন। তাহার পর পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া, একটি নূতন কীর্ত্তনের গান রচনা করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া, উহা গাইতে লাগিলেন।···

এস এস ফিরে এস!···

একে এই সুললিত রচনা, অপূর্ব্ব কবিত্ব ও প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস, তাহাতে রবিবাবুর কামিনী-লাঞ্ছিত বংশী-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠ! আমার বোধ হইতে লাগিল, কণ্ঠ একেবারে গৃহ পূর্ণ করিয়া, গৃহের ছাদ ভিন্ন করিয়া, আকাশ মুখরিত করিতেছে।···গানের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখ ও চক্ষু অভিনয় করিতেছে।···তার পর নিজের রচিত আরও দুই একটি গীত গাহিলেন। বঙ্কিমবাবুর 'বন্দে মাতরম্' গাইতে বলিলে, কেবল প্রথম পদটি মাত্র গাইলেন। বলিলেন, গানটি তাঁহার মুখস্থ নাই। তিনি বাঙ্গালী অন্য কাহারও গান যে জানেন, কি বাঙ্গালী অন্য কাহারও কাব্য যে পড়িয়াছেন, তাঁহার কথায় বোধ হইল না···তবে নির্ম্মলের মুখে অন্যের রচিত কোনও কোনও গান শুনিয়া তিনি প্রশংসা করিলেন, কাহার রচনা জিজ্ঞাসা করিলেন। একটা গান গিরীশ ঘোষের রচিত বলিলে,—"শুনিয়াছি, *তিনি** গান রচনা করিতে পারেন।"—এই পর্য্যন্ত।···বিশেষতঃ উপরের কীর্ত্তনটি লক্ষ্য করিয়া রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আমি অনেক সময়ে ভাবি, আমিও পৌত্তলিক কি না। বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মগণের হইতে আমার ধারণা স্বতন্ত্র। আমি ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের allegory (রূপক) মনে করি।"···গানের পর তাঁহার কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি করিলেন। রবিবাবু একাধারে কবি ও অভিনেতা। তাঁহার আবৃত্তির তুলনা নাই।···

দুজনে বহুক্ষণ গল্প করিতে করিতে আহার করিলাম, এবং আহার করিতে করিতে সাহিত্য ও বহু বিষয়ে আলাপ করিলাম। অপরাহ্নে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে রাণাঘাট দেখাইতে ও বেড়াইতে বাহির হইলাম। 'ভারতী'তে 'রৈবতকে'র সেই অপূর্ব্ব সমালোচনার [পৌষ ১২৯৪।৫৪২-৪৪] উল্লেখ করিয়া রবিবাবু বলিলেন—"আমি ও দিদি এ সমালোচনার কিছুই জানিতাম না। উহা বোধ হয় আমাদের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আপনি আমাদের প্রতি অবিচার করিবেন না।···আমি ও দিদি উহার জন্য বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"···

নগরভ্রমণ-হইতে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রির আহারে বাবু সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ রবিবাবুর ও নির্ম্মলের গান হইল। পরে 'টেবিলে' পানাহার বড় আনন্দের সহিত চলিতে লাগিল। রবিবাবুর মার্জ্জিত সোনার চশমা, মার্জ্জিত রুচি, মার্জ্জিত ঈষৎ হাসি। সমস্ত দিন ঠাকুরবাড়ীর ওজনমাপা চাপা কথা, চাপা হাসি ও চাপা শিষ্টাচারে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল।···আমি বলিলাম—"রবিবাবু! সমস্ত দিন আপনার চাপা কথা ও চাপা হাসিতে বড় জ্বালাতন হয়েছি। আমি আর আমার ওজন ঠিক রাখতে পাচ্ছি না। দোহাই আপনার! আপনি একবার আমাদের মত প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া কথা বলুন!" তিনি এবার খুব হাসিলেন। তিনি এ বেলা বড় খাইতেছিলেন না। কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। বধূঠাকুরাণী সকালে একদিকে আমার প্রতি ৫৩ রকমের ব্যঞ্জনাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতে আপনার আলাপেও এরূপ একটা মোহিনী শক্তি (charm) আছে যে, আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া সকালে অতিরিক্ত আহার করিয়া ফেলিয়াছে। এখন আর বোঝা লইতে পারিতেছি না।" আমি বলিলাম—"এ কেবল শিষ্টাচারের কথা। কলিকাতার 'বৈঠকখানার বীর'কে (Hero of the Calcutta drawing room) আমি গরীব কি খাওয়াইতে পারি? আর আলাপ–আমি 'বাঙ্গালে'র আলাপে রবিবাবুকে মুগ্ধ করিবার শক্তি থাকিবারই ত কথা!" তখন সুরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবমতে আমরা খুব ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে আহার করিতে লাগিলাম। আহারান্তে আমি ও সুরেন্দ্রবাবু উভয়ে রবিবাবুকে নিশীথ সময়ে গোয়ালন্দ মেলে তুলিয়া দিয়া, জীবনের একটি দিন বড় আনন্দে কাটাইয়া বাড়ী ফিরিলাম।[৬৬]

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ, কিন্তু বর্ণনার মাধুর্যে ও যাথায়থ্যে অনুপম। রবীন্দ্রনাথের রূপ ও কণ্ঠ-সৌন্দর্যের বর্ণনা আমরা আগেও পেয়েছি, কিন্তু বাংলার একজন বিশিষ্ট কবি নবীনচন্দ্রের এই বর্ণনার সঙ্গে সমকালীন ফটোগ্রাফ মিলিয়ে নিলে বোধহয় বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যাবে না।

নবীনচন্দ্র নিশ্চয়ই তাঁর সৌভাগ্য ও আনন্দ প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথকে পত্র দিয়েছিলেন, প্রত্যুত্তরে তিনি ২৯ ভাদ্র [বৃহ 13 Sep] পতিসর থেকে 'ভাই নবীনবাবু' সম্বোধন করে লিখলেন, '···আপনি আমাকে যে প্রীতি সম্বোধনে অভিহিত করিয়াছেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া আপনাকে প্রিয় সম্বন্ধে বাঁধিতে পারিলাম —···দিন কতক আমি এমনই কাজে ব্যস্ত ছিলাম যে নিঃশ্বাস লইবার অবকাশ ছিল না—এ কয়দিন নিঃশ্বাস লইবার উপযুক্ত বাতাসেরও অপ্রতুল ছিল। সেইজন্য এতদিন আপনাকে লিখিতে পারি নাই।···কিন্তু এমন কখনও মনে করিবেন না যে, আপনাদের স্নেহ এবং আদর আমি বিস্মৃত হইয়াছি—বিশেষতঃ অলক্ষ্য হইতে বউ ঠাকুরাণী মাদৃশ ক্ষুদ্রশক্তি স্বল্পক্ষুধা ক্ষীণ ব্যক্তির প্রতি যে স্নেহপূর্ণ এবং ছত্রিশ ব্যঞ্জনপূর্ণ পরিহাস ও পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও ভুলিবার বিষয় নহে। তাঁহাকে জানাইবেন যে, তাঁহার আয়োজনের মধ্যে ব্যঞ্জন অংশ নিঃশেষ করিতে আমি অশক্ত হইয়াছিলাম কিন্তু স্নেহ অংশটুকু সম্পূর্ণরূপেই সম্ভোগ করিয়াছিলাম এবং তাহা ব্রাহ্মণসুলভ লোভবশতঃ সঙ্গে বাঁধিয়াও আনিয়াছি।' এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ রায় রামানন্দের বিখ্যাত পদ 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল' পদটির অর্থব্যাখ্যা ও 'এসো এসো ফিরে এসো' গানটি কপি করে পাঠান। নবীনচন্দ্রের গ্রন্থ [? 'কুরুক্ষেত্র'] মাসিকপত্রে সমালোচনা করার কথাও আছে, কিন্তু সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি।

রবীন্দ্রভবনে পরবর্তীকালে লিখিত নবীনচন্দ্রের কয়েকটি পত্র রক্ষিত আছে, তার থেকে মনে হয় উভয়ের সুসম্পর্ক তখনও বজায় ছিল।

ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি থেকে অনুমান হয়, ২০ ভাদ্র [মঙ্গল 4 Sep] রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে এসে কুঠিবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরের দিন 5 Sep তাঁকে লিখছেন : 'অনেক কাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড়ো ভালো লাগে। ···এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব এবং লেখবার ইচ্ছা আসে এমন আর কোথাও না। বাইরের জগতের একটা জীবন্ত প্রভাব আমার সমস্ত মুক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে প্রবেশ করতে থাকে—আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজহিল্লোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে অনেক রকম গল্প তৈরি হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষত এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে।···কেন জানি নে, মনে হয় এই রকম সোনালি-রৌদ্রেভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে—অথাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, ডামাস্ক্ সমরকন্দ্ বুখারা—আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ—মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার

পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস—নগর, মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়-পরা দোকানি খর্‌মুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে—পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিন্‌খাপ বিছানো-জরির চটি ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচুলি-পরা আমিনা জোবেদি সুফি, পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো-কাপড়-পরা কালো হাবষি পাহারা দিচ্ছে—এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা-আশঙ্কা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।'[৬৭] এই অংশটি পড়লেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের মনে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির সম্পূর্ণ আবহাওয়া ঘনিয়ে এসেছে। গল্পটি কোন্ সময়ে লেখা আমাদের জানা নেই—সেটি প্রকাশিত হয় সাধনা-র শ্রাবণ ১৩০২-সংখ্যায় [দ্র গল্পগুচ্ছ ২০।২৩১-৪৩]। 28 Jun 1895 [১৫ আষাঢ় ১৩০২] তারিখে লেখা চিঠিতে যে 'একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প' লেখার কথা আছে, সেটি নানা কারণে 'ক্ষুধিত পাষাণ' বলে আমাদের মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ গত বছরের গোড়া থেকেই ছড়া-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, ১৭ আষাঢ় ১৩০০ তারিখে শিলাইদহ থেকে মিসেস্ পি. কে. [সরলা] রায়কে লেখা তাঁর পত্র থেকে আমরা সে-বিষয়ে অবগত হয়েছি। এইভাবে বিভিন্ন সূত্রে ছড়া সংগ্রহ করে তিনি এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন এই দিনে। ইন্দিরা দেবীকে সংবাদটি দিতে গিয়ে উক্ত পত্রেই লিখেছেন : 'আজ সকালে বসে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—সেটার ভিতরে বেশ সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পেরেছিলুম, বড়ো ভালো লাগছিল। 'ছড়া'র একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে—সেখানে কোনো আইন কানুন নেই—মেঘরাজ্যের মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে, যে রাজ্যে আইনকানুনের প্রাবল্য বেশি সেই বৈষয়িক রাজ্য সর্বত্রই পিছনে পিছনে অনুসরণ করেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ মাঝখানে আমলাদের একটা উপপ্লব উপস্থিত হল, আমার মেঘরাজ্য ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। 'ছড়ার রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে...কত রকমের ছবি এবং কত রকমের সুখ দুঃখ ও হৃদয়বৃত্তির ভিতর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে' 'মেয়েলি ছড়া' নামের এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি তিনি লেখেন কয়েক দিন ধরে। দু'দিন পরে 7 Sep [শুক্র ২৩ ভাদ্র] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'যখন এইরকম লিখতে লিখতে লেখা বেড়ে যায়, এবং প্রতিদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই মনে হয় কাল সেই লেখাটা কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলুম এবং আজ কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে, তখন ভারী ভালো লাগে—দিনগুলিকে বেশ লেখায় পরিপূর্ণ করে ভরা কলসীর মতো সন্ধেবেলায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি, এবং সেই-সব লেখার ধ্বনি প্রতিধ্বনির রেশ সমস্ত শরীর মনের মধ্যে বাজতে থাকে।'[৬৮] তুচ্ছ ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে কবির অন্তর্দৃষ্টি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার সমস্ত অর্থহীনতা অসংলগ্নতাকে এমন একটি অখণ্ড ভাবসূত্রে গ্রথিত করেছেন যে, তাতে পাঠকের শৈশবকালীন সুখস্মৃতি আরও মধুরতর হয়ে ওঠে। এই ছড়াগুলি সংগ্রহ করার পিছনে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সচেতন বুদ্ধি অবশ্যই কার্যকরী ছিল, কিন্তু এগুলিকে অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনার সময়ে তাঁর নিজের শৈশবস্মৃতিও জাগ্রত হয়ে উঠেছে। ছড়াগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যে এত রস-মেদুর এটি তার অন্যতম কারণ। আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের মনের একটি অংশ সর্বদা বাল্য-কৈশোরের স্মৃতির জগতে বাস করত। কিছুদিন পরে 5 Oct [২০ আশ্বিন] ইন্দিরা দেবীকে প্রবন্ধটির ভাব ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন : 'ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য নিয়ে সেইটেকে নিজের

মনের ভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে—তারা সামান্য একটা কদাকার পুতুলকে নিজের প্রাণ এবং নিজের সুখ দুঃখে জীবন্ত করে তোলে। সে ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে তাকেই আমরা ভাবুক বলি। তার কাছে চতুর্দিক্‌বর্তী সমস্ত জিনিস নিতান্ত কেবল জিনিষ নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর—তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়।'[৬৯] বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন।

কিন্তু প্রবন্ধটি কেবল ছড়ার জগতের সৃষ্টিধর্মী পুনর্গঠন নয়, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সাহিত্য ও শিক্ষা ভাবনার প্রকাশের দিক দিয়েও রচনাটি মূল্যবান। চৈতন্য লাইব্রেরি ও বীডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাবের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি ১৬ আশ্বিন [সোম 1 Oct] মিনার্ভা থিয়েটারে পাঠ করেন। 'মেয়েলি ছড়া' নামে এটি সাধনা-র আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যায় [পৃ ৪২৩-৭৪] মুদ্রিত হয়। কিন্তু গদ্যগ্রন্থাবলী-র অন্তর্গত 'লোকসাহিত্য' [১৩১৪] গ্রন্থে সংকলিত হবার সময়ে প্রবন্ধটির বৃহৎ অংশ পরিত্যক্ত ও কিছু অংশ পুনর্লিখিত হয়েছে। আমরা যে সাহিত্য ও শিক্ষা-ভাবনার কথা বলছি, তা এই বর্জিত অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি-বহির্ভূত, বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের রবীন্দ্র-রচনাবলী বা স্বতন্ত্র -সংস্করণের গ্রন্থপরিচয় অংশেও গৃহীত হয় নি। এখানে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সম্পর্কে লিখেছেন : 'ছড়ার মধ্যেই কি, আর উচ্চতম কাব্যের মধ্যেই কি, সৃজনকার্য্য অচেতন ভাবে ঘটিয়া থাকে। সচেতন ভাবে যাহা করা যায় তাহা নির্ম্মাণ। ভাল কাব্যমাত্রই কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া আপনি রচিত হইয়া উঠে। ভালমন্দ কোনপ্রকার উদ্দেশ্য সে সম্মুখে খাড়া করিয়া রাখে না, অথচ উদ্দেশ্য স্বতই সাধিত হয়।'[৭০] চিঠিপত্রে ও 'অন্তর্যামী' কবিতায় এই ভাবটি বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। আনন্দের অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনকে যাঁরা অধিক গুরুত্ব দেন তাঁরা কাব্যসাহিত্য ছাড়া শিক্ষাজগতেও যে অনেক ক্ষতি করছেন সে-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'ছেলেদের জন্য গ্রন্থরচনা ও গ্রন্থনির্ব্বাচন তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। জগতে অতি সত্বরেই নীতি ও তত্ত্বপ্রচারের অধৈর্য্যে তাঁহারা ছেলে-ভুলানো কাল্পনিক কথাগুলাকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া নিরতিশয় আবশ্যকীয় শুষ্ক সত্য এবং উপদেশকে গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে জলসংযোগরহিত ছাতুর মত পিণ্ডাকার করিয়া গিলাইতে চেষ্টা করিতেছেন।/কিন্তু জননী সরস্বতী ত আমাদের বিমাতা নহেন। অক্ষম অবস্থায় তিনি আমাদের প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই। আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন আমাদের জন্য তাঁহার স্তনে ক্ষীরধারা নিঃসৃত হইয়াছিল—তাহা এই ছড়া এবং রূপকথা,—তাহা কোন বুদ্ধিমানের উদ্দেশ্যকৃত স্বহস্তরচিত নহে, তাহা মাতৃস্নেহের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে স্বতঃ-উৎসারিত অমৃতধারা।'[৭১] এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিশুপাঠ্য গ্রন্থলেখকদের পরামর্শ দিয়েছেন : 'শিশুদের কল্যাণ যাঁহারা কামনা করেন তাঁহারা যেন কেবলমাত্র প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগক্রমে বিশুদ্ধ সাধুভাষায় জ্ঞানশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা প্রচার না করিয়া চিত্রবিচিত্র কাল্পনিক কথা ও রূপকথা সংগ্রহ ও সৃজনপূর্ব্বক শিশুদের হৃদয় সরস এবং তাহাদের শিক্ষার পথ সুন্দর এবং তাহাদের জীবনারম্ভকাল নবীন উষারাগে রঞ্জিত ও ছায়ান্বিত করিয়া তোলেন। কমলকাননকে প্রাইমারি স্কুল, সরস্বতীকে তাহার হেড্ পণ্ডিত এবং তাহার বীণাযন্ত্রটিকে বেত্রদণ্ডে পরিণত করিয়া সহজভীরু শিশুর সম্মুখে বিদ্যার মূর্ত্তিকে যেন বিকট রুদ্রবেশে উপস্থিত না করেন, এবং শিশুমতিকে এমন তরল খাদ্য দেন যাহা সে আনন্দে স্বেচ্ছাসহকারে গ্রহণপূর্ব্বক নিজের মানসপ্রকৃতির সহিত অনায়াসে মিশ্রিত করিয়া লইয়া তাহাকে প্রফুল্ল পরিপুষ্ট এবং বলশালী করিয়া তুলিতে পারে।'[৭২] রবীন্দ্রনাথের

এই আহ্বান কিছুদিনের মধ্যেই সার্থক হয়েছিল। শিশু-সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার [১২৭৩-১৩৪৪], উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী [1863-1915] প্রভৃতি এই অভাব মেটাবার জন্য অগ্রসর হয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'বাল্য-গ্রন্থাবলী'র প্রবর্তন করে যুক্তাক্ষর-বর্জিত সহজ ছন্দে 'নদী' [১৩০২] রচনা এবং অবনীন্দ্রনাথকে 'শকুন্তলা' ইত্যাদি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। আর 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটি পাঠ ও প্রকাশের ফলে এই শ্রেণীর লোকসাহিত্য সংগ্রহের যে জোয়ার এসেছিল, সমকালীন পত্রপত্রিকা তার সাক্ষ্য দেবে।

২৫ ভাদ্র [রবি 9 Sep] সকালে রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর থেকে পতিসর যাত্রা করেন। 10 Sep ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'কাল সকাল থেকে জলপথে রয়েছি।···ভাদ্র মাসের দিন, বাতাস বেশি নেই, বোটের শিথিল পাল ঝুলে ঝুলে পড়ছে এবং নৌকোটি সমস্তদিন আলস্যমন্থর গমনে নিতান্ত উদাসীনের মতো চলেছে। এই শৈবালবিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্র পড়েছে, আমি জানলার কাছে এক চৌকিতে বসে আর-এক চৌকিতে পা তুলে দিয়ে সমস্তদিন কেবল গুন্‌গুন্ করে গান করছি।···আমার সুরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার আর সংখ্যা নেই—এমন এক লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমছে এবং কত বিসর্জন দিচ্ছি। রীতিমত বসে সেগুলোকে পুরো গানে বাঁধতে ইচ্ছা করছে না।'[৭৩] এই রকমই একটা টুকরো গানের কয়েকটি ছত্র তিনি এই পত্রে উদ্ধৃত করেছেন : 'ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'—সেটি দীর্ঘকাল পরে সম্ভবত অগ্র° ১৩১৪-তে সম্পূর্ণ গীতরূপ লাভ করে [দ্র গীতাঞ্জলি ১১।৯-১০, ৭নং; গীত ১।৭৬]।

পতিসরে জমিদারির কাজকর্ম সেরে রবীন্দ্রনাথ চললেন বন্ধু-সন্দর্শনে। 20 Sep [বৃহ ৫ আশ্বিন] তিনি ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠিটি লিখেছেন, তার উপরে লেখা 'দিঘাপতিয়া জলপথে'। দিঘাপতিয়ার রাজকুমার শরৎকুমার রায় লিখেছেন : 'এই সময়ে রবিবাবু একবার আমাদের দিঘাপতিয়ার বাটীতেও পদার্পণ করিয়াছিলেন,—তাঁহার নৌভ্রমণের পথে দিঘাপতিয়া পড়িয়াছিল।'[৭৪] 'ছিন্নপত্র' [১৩১৯] গ্রন্থে উক্ত স্থান-নির্দেশ দেখে শরৎকুমার একথা লিখেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় সাহিত্যোৎসাহী ছিলেন, কিছুদিন পরেই তিনি সাহিত্যপরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলে অর্থসাহায্য করেন—সুতরাং তাঁর আহ্বানে রবীন্দ্রনাথের দিঘাপতিয়া যাওয়া আশ্চর্যের নয়।

22 Sep [শনি ৭ আশ্বিন] তিনি চলেছেন 'বোয়ালিয়া-পথে'। শরতের সোনার রৌদ্রে সমস্ত মনটিকে সিক্ত করে তিনি লিখেছেন : 'আমি আলো এবং আকাশ এত ভালোবাসি। বোধ হয় আমার নামের সার্থকতার জন্যে! গেটে মরবার সময় বলেছিলেন : More light!—আমার যদি সে সময় কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি : More light and more space!'[৭৫] ভ্রমণকাহিনী পড়তে রবীন্দ্রনাথ খুবই ভালোবাসতেন, হয়তো তাঁর বৈচিত্র্যপিয়াসী মন কল্পনায় ভ্রমণকারীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। এই সময়ে সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা জয়ের বিবরণ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার অনেকটা দখল করে থাকত। হয়তো সেই সংবাদ পড়ে এই চিঠিতে লিখছেন : 'সন্ন্যাসীরা যে রকম করে বেড়িয়ে বেড়ায় তেমনি করে ভ্রমণ করা যদি আমার পক্ষে সহজ হত তা হলে এই অবারিত পৃথিবীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে একবার দেশে দেশান্তরে ঘুরে আসতুম।' কিন্তু সন্ন্যাসের আদর্শ কোনোদিনই তাঁর আন্তরিক সমর্থন লাভ করে নি, তাই

লিখেছেন : 'কিন্তু আকাশও দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে, এবং গৃহও দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। উভচর জীব হয়ে আমি ভারী মুশকিলে পড়েছি।'

উভচরতার এই সংকট আর একরূপে প্রকাশ পেয়েছে 24 Sep [সোম ৯ আশ্বিন] বোয়ালিয়া থেকে লেখা একটি চিঠিতে। বন্ধুসান্নিধ্যের আকাঙক্ষায় তিনি এখানে এসেছিলেন, লোকেন পালিতকে 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটি পড়িয়ে তাঁর মতামত জানার ইচ্ছাও হয়তো ছিল। কিন্তু তিনি তখন বিখ্যাত ব্যক্তি, দু'বছর আগে এখানে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ পাঠ করে ও পরে 'ছাত্রদের নীতিশিক্ষা' প্রসঙ্গ কথা লিখে বন্ধু ও শত্রু দুই-ই সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং বোয়ালিয়ায় আসার পর তাঁর আকর্ষণে কিছু জনসমাগম নিশ্চয়ই হয়েছিল। অনুরূপ অবস্থায় তাঁর বিরক্তির কথা ইতিপূর্বেও ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন, এবারেও লিখলেন : 'আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখ বোধ হয়—সাধারণত মানুষের সংসর্গ আমাকে বড়ো বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়, আমাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করতে থাকে—সকলের মতো হয়ে, সকল মানুষের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিলেমিশে, সহজ আমোদপ্রমোদে আনন্দ লাভ করবার জন্যে আমার মনকে আমি প্রতিদিন দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার চারি দিকেই এমন একটি গণ্ডী আছে আমি কিছুতেই সে লঙঘন করতে পারি নে।'[৭৬] রবীন্দ্রনাথের এই স্বভাবের সমালোচনা করেছেন নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর ১৫ আশ্বিনের 'ডায়েরী'তে : 'রবি বাবুর একটা ভাব দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। তিনি ভদ্রতা ও সৌজন্যে বেশ তৎপর, কিন্তু আত্মীয়তার দিকে বড় সহজে অগ্রসর হইতে চাহেন না। আমার সহিত কয়েকবার দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তাও অনেক হইয়াছে, তথাপি আমার নিজের খবর, বিষয় ব্যবসায় ঘরকন্নার কথা অবগত হইবার একটু বাসনাও তাঁহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। আমার বিষয় সামান্য বোধে ছাড়িয়া দিলেও*—চন্দ্রের সহিত আলাপ ত বড় অল্প নহে; কিন্তু রবি বাবুর কেমন স্বভাব, তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াও, তিনি কেমন আছেন, অথবা তাঁহার ঘরের অন্য কোনও সংবাদ জানিবার জন্য একটা প্রশ্নও করিলেন না। আশ্চর্য্য প্রকৃতি! তিনি যেন কেবল বসন্তের বাতাসের মত শূন্যে ভাসিয়া কুসুমের শুধু দেহ-সৌরভটুকু লইয়া যাইতে চান, তাহার প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেম-মধুর সহিত পরিচিত হইতে নিতান্তই নারাজ। কবির পক্ষে ইহা বড় সুখ্যাতির কথা নহে।'[৭৭] নিত্যকৃষ্ণের ক্ষোভের কারণটি অতিরঞ্জিত নয়—কিন্তু এইটিই রবীন্দ্রনাথের স্বভাববৈশিষ্ট্য, অনেক অনুরাগী মানুষকে এই কারণেই তাঁর থেকে দূরে সরে যেতে হয়েছে, অনেকে রবীন্দ্র-বিরোধীও হয়ে উঠেছেন এই স্বভাব-বর্মে প্রতিহত হয়ে। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে, এই বর্মের জন্যই অনেক বড়ো বড়ো মানসিক বিপর্যয় ও দুঃখের আঘাতকে তিনি অতিক্রম করতে পেরেছেন।

29 Sep [শনি ১৪ আশ্বিন]-এ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এই সময়ে দ্বিভাষিক পত্রিকা সুহৃদ-এ মুদ্রিত যদুনাথ সরকার-কৃত তাঁর ছোটগল্পের সমালোচনা 'The New Leaven in Bengal'-শীর্ষক তাঁর ছোটগল্পের সমালোচনাটি সম্ভবত তাঁর চোখে পড়ে। ইন্দিরা দেবীকে সমালোচনাটি পাঠিয়ে তিনি লিখছেন : 'এ লোকটা কিছু ওরিজিনাল চাল চেলেছে। এ আমার কবিতাগুলোকে গাল দিয়ে আমার গল্পগুলোকে আকাশে তুলে দিয়েছে। আবার এক সম্প্রদায়ের লোক আছে যারা ঠিক এর উল্টো দিক দিয়ে যায়। মধ্যখানে আমি বিস্ময়ান্বিত হয়ে সকৌতুকভাবে বসে থাকি।···আবার, একদল লোক আছে যারা বলে আমার অন্য সব রচনা ক্ষণস্থায়ী, কেবল একমাত্র গানই আমাকে লোকসমাজে অমর করে রেখে দেবে।' [এই

সময়েই একদল এমন মন্তব্য করেছেন জেনে আমরা আশ্চর্যান্বিত, রবীন্দ্রনাথ নিজেও শেষবয়সে অনুরূপ কথা বলেছিলেন।] এরপর তিনি সকৌতুকে মন্তব্য করেছেন : 'আমি ভাবি, যদি খ্যাতিলাভ মানুষের দুরাকাঙক্ষার শেষ লক্ষ্য হয় তবে আমার আর ভাবনা নেই—অন্ধকার অমরতাকে লক্ষ্য করে আমি অনেকগুলো ঢিল ছুঁড়তে বসেছি, যেটা হোক একটা লেগে যেতেও পারে।'[৭৮]

পরের দিন ১৫ আশ্বিন সকালে তিনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে দেখা করতে যান। কবি নিত্যকৃষ্ণ বসু এই সাক্ষাৎকারের বিবরণে লিখেছেন : 'রবিবার সকালে রবি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।···লোকটি সর্ব্ববিষয়েই অতি সুন্দর। কথাবার্ত্তা অনেক প্রকার হইল। রবি বাবুর বাঞ্ছিত বসুন্ধরা-বেষ্টন [তিনি কি পৃথিবীভ্রমণের ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন?], আগামী সোমবার চৈতন্য লাইব্রেরী সভায় তাঁহার বক্তৃতা, কাব্যের উদ্দেশ্য, তাঁহার "সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় জড়বাদিতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সু-চন্দ্র নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্রে"র কথা পাড়িলেন। রবি বাবু উক্ত কাব্যের সমালোচনা লিখিবেন। তিনি, নবীন বাবুর বাঙ্গালা ভাষার উপর তাদৃশ দখল নাই, এই মত প্রকাশ করিলেন।···রবি বাবুর সমালোচনা পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিলাম।'[৭৯] তাঁর এই আশা অবশ্য পূর্ণ হয়নি। 'ডায়েরী'র পরবর্তী অংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি।

১৬ আশ্বিন [সোম 1 Oct] সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে চৈতন্য লাইব্রেরি ও বীডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাবের ৩৭তম অধিবেশনে ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। *The Indian Mirror*-এর 3 Oct-সংখ্যায় এই সভার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয় :

The 37th meeting of the Chaitanya Library and Beadon Square Literary Club was held in the Minerva Theatre, on Monday last at 6 P.M. Mr. Justice Bannerji occupied the chair, and there were more than a thousand gentlemen present. Babu Rabindra Nath Tagore read an interesting address on "Nursery rhymes of Bengal." He cited several nursery rhymes, and pointed out they were a store-house of pleasure for little children, and as such they deserve the attention of the adults. In them are to be found the outpouring affection of parents for children, of brothers for sisters and vice *versa*. The children's love for nursery rhymes teaches us a lesson which we should never forget, namely, that in imparting instruction we should replace the school-master's rod by motherly tenderness. The meeting separated at 8 P.M.

প্রবন্ধের সারকথাটি এই প্রতিবেদক বুঝতে পারলেও, সকলে তা পারেন নি। সেই কথা রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন 17 Oct [বুধ ১ কার্তিক]-এর পত্রে : "কাল 'ব [বিদ্যারত্ন, হেমচন্দ্র]র' সঙ্গে 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে গেলুম তিনি বুঝতে পারেন নি। আমি বললুম, কালিদাস শকুন্তলা কেন লিখেছিলেন এবং সেটা আজ পর্যন্ত কেন টিকে আছে? আমাদের চার দিকে যে-সমস্ত ছোটো বড়ো জিনিষ আছে এবং প্রতি মুহূর্তে এসে পড়ছে তাদের কত রকম ভাবে দেখা যেতে পারে, তাদের ভিতর থেকে কত রকম সুখ আবিষ্কার করা যেতে পারে—এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-প্রধান চর্চার বিষয়।···প্রাপ্ত ফলের অপেক্ষা পাবার শক্তিটা ঢের বড়ো—সেই জন্যে সাহিত্যে অবলম্ব্য বিষয়ের দিকে ততটা বেশি মনোযোগ দেয় না যেমন তার রচনার

দিকে, কল্পনার দিকে, প্রকাশের দিকে। কিন্তু এ সমস্ত কথা ব···ঠিক বুঝতে পারলেন কি না ঠিক বলতে পারি নে।"[৮০] তিনি যে বুঝতে পারেন নি, তার প্রমাণ আছে তত্ত্ববোধিনী-র বৈশাখ ১৮১৭ শকের সমালোচনা-য় [পৃ ১৬]। এই সময়ে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন পত্রিকাটির সহকারী সম্পাদক বলে [সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ] সমালোচনাটি তিনিই করেছিলেন, এরূপ আমরা অনুমান করে নিয়েছি। সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা-র মাঘ ১৩০১-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া'-শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ও অনেকগুলি ছড়ার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যারত্ন এ-সম্পর্কে লিখেছেন : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু দেশপ্রচলিত কতকগুলি ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিয়া দেশে কুরুচি ভাবের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। ছড়াগুলির অধিকাংশই নীরস, অনর্থক ও উদ্দেশ্যশূন্য। যদি কোন বইয়ে সুকবি ছেলেদের জন্য ঈশ্বরের মহিমাসূচক স্বভাববর্ণনামূলক ও পরস্পরের প্রতি প্রণয়োদ্দীপক ছড়া রচনা করিতে পারেন, তাহা হইলে সেগুলি প্রচলিত হইলে দেশের মহোপকার সাধিত হয়।' রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর সমালোচকদের উদ্দেশ্যেই 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'আজ-কাল বঙ্গদেশে স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া সাহিত্যরচনার প্রাদুর্ভাব অধিক দেখা যায়। তাহার একটা কারণ এই যে, বাঙ্গালীরা অন্য অনেক সভ্যজাতি হইতে, আনন্দের অপেক্ষা প্রয়োজন সাধনকেই অধিক গৌরব দিয়া থাকেন। তাহার ফল হয়, আনন্দেরও হ্রাস হয় বৃহৎ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না। তাঁহারা যদি ক্রমাগতই কাব্য হইতে নীতি ও তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করেন। তবে তাঁহাদের ফরমাস্ অনুসারে এমন কাব্য রচিত হয় যাহাতে কাব্যসৌন্দর্য্য উপেক্ষিত হইতে পারে অথচ তত্ত্ব ও নীতির সুস্পষ্ট বিকাশ হয় না এবং সেই সকল উদ্দেশ্যকৃত রচনা কখনই স্থায়ী এবং ব্যাপক হইতে পারে না।'[৮১]

সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১ [৩।১১-১২] :

৩৫৫-৯৩ 'মেঘ ও রৌদ্র' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৯।২১০-৩৫

৪০৯-২৩ 'অন্তর্যামী' দ্র চিত্রা ৪।৫৫-৬২ [বর্জিত অংশ : দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭০।১৩২]

৪২৩-৭৪ 'মেয়েলি ছড়া' দ্র লোকসাহিত্য ৬।৫৭৭-৬০৮ ['ছেলেভুলানো ছড়া : ১']

৪৮৯-৯৩ 'স্বর্গীয় প্রহসন' দ্র ব্যঙ্গকৌতুক ৭।৩৫৭-৬৪

৪৯৮-৫০৫ 'ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ' দ্র পাঠ-সঞ্চয়

এ ছাড়া ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি-সহ 'আমারে কর তোমার বীণা' [দ্র গীত ২।২৮৩] গানটি মুদ্রিত হয় ৪৮৭-৮৯ পৃষ্ঠায়।

'মেঘ ও রৌদ্র' 'অন্তর্যামী' ও 'মেয়েলি ছড়া' প্রসঙ্গে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। 'ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ' বিজ্ঞান-ভিত্তিক রচনা, বিজ্ঞান-বিষয়ক যে বিপুল গ্রন্থরাজি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করতেন তারই প্রত্যক্ষ ফসল এই লেখাটি। প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেও দেখা যেতে পারে। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন না থাকার জন্য তখন দেশের বিভিন্ন অংশে মহামারী আকারে কলেরা টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে জনজীবন বিপর্যস্ত হত, এরই প্রতিকারকল্পে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে পাঠককে সচেতন করবার চেষ্টা করেছেন, এমনভাবে দেখলে রচনাগুলি অতিরিক্ত তাৎপর্য লাভ করে।

'স্বর্গীয় প্রহসন' নেহাতই একটি কৌতুকনাট্য, পৌরাণিক দেবদেবীদের আভিজাত্যপূর্ণ আচরণ ও তাঁদের সংস্কৃত বহুল সাধুভাষার সংলাপ এবং তার বিপরীতক্রমে লৌকিক দেবদেবীদের গ্রাম্য ভাষা ও আচরণ নাটিকাটিতে কৌতুকরসের একটি নূতন মাত্রা যোগ করেছে—হিন্দু দেবদেবীদের ব্যঙ্গ করার কোনো উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সম্ভবত এইরূপ কল্পনা করেই সুরেশ সমাজপতি লিখেছেন : 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বর্গীয় প্রহসন" আমাদের ভাল লাগিল না।'[৮২]

সাধনা-র তৃতীয় বর্ষের এই যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশ করে সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন। '১৬ আশ্বিন ১৩০১ সাল।' তারিখ দিয়ে তিনি 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখলেন :

সাধনার তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল।/আমরা কিয়ৎপরিমাণেও সিদ্ধিলাভ করিয়াছি কিনা জানি না।/কিন্তু একথা গোপন করিবার আবশ্যক দেখি না, যে, যে পরিমাণ জনাদর প্রাপ্ত হইলে বহুব্যয়সাধ্য "সাধনা" স্বচ্ছন্দে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারিত তাহা "সাধনার" অদৃষ্টে ঘটে নাই। তাহাতে হয়ত আমাদের অক্ষমতা অথবা দুর্ভাগ্য অথবা উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে।

আমাদের একটি উৎসাহের কারণ এই আছে যে, আমরা অনেক কৃতবিদ্য পাঠক লাভ করিয়াছি এবং সাধনার প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগ আছে। তবুও যে, সাধনার আর্থিক অবস্থার অস্বচ্ছলতা ঘটিয়াছে সে কেবল সাধনার অনুষ্ঠাতাগণের বিবেচনার দোষে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা দেশের কোন সাময়িক পত্রের এতাদৃশ ব্যয়বাহুল্য করা উচিত হয় না।

পত্রিকার স্থায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আগামী বৎসর হইতে সাধনার সাইজ রয়াল করা হইবে—এবং কাগজের ভার যাহাতে দুই পয়সা মাশুলে যায় তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে। আগামী বৎসর হইতে পত্রিকার মূল্য ডাকমাশুল সমেত তিন টাকা স্থির হইল।···

যোগ্যতর হস্তে সম্পাদকীয় কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিলাম—সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যসাধনে যে সকল ত্রুটি ঘটিয়াছে তজ্জন্য পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতি

এই 'যোগ্যতর হস্ত'টি রবীন্দ্রনাথের। বেনামে তিনিই এতদিন সম্পাদনা-কার্য পরিচালনা করে আসছিলেন, এখন স্বনামে তিনি এই কার্যে ব্রতী হলেন। সত্যপ্রসাদের স্থানে কার্যাধ্যক্ষ হলেন বলেন্দ্রনাথ।

কিন্তু তার আগে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকার সঙ্গে সাধনা-র সম্মিলনের একটি প্রস্তাব উঠেছিল। তখনকার দিনে এইরূপ সম্মিলন প্রায়ই ঘটত। এক্ষেত্রে সম্মিলনের প্রস্তাবক ছিলেন সুরেশচন্দ্র স্বয়ং। প্রস্তাব ও পরিণতির সম্পূর্ণ ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ হয়েছে নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী'তে। ১৯ আশ্বিন [বৃহ 4 Oct]-এর ডায়ারিতে তিনি তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে লিখেছেন :

প্রিয় [নাথ সেন] বাবুর মুখে "সাহিত্য" সম্পাদক মহাশয়ের অভিপ্রায় শুনিয়া রবীন্দ্র বাবু সাহিত্যের সহিত "সাধনার" সম্মিলনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিবেন। "সাধনা"র আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে। কিন্তু "সাহিত্য" এখন নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রস্তাবিত সম্মিলন কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা সহজে ঠিক করিতে পারা যায় না। বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যের উন্নতির কথা ভাবিলে ইহাতে কতকটা সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। উভয় পত্রিকার লেখকগণ একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইলে অনেকটা উন্নতির আশা করা যায়। কিন্তু এই সম্মিলনের পরিণাম প্রকৃতপক্ষে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা বলা যায় না। রবীন্দ্র বাবুর এইরূপ উৎসাহ যে বরাবর বর্ত্তমান থাকিবে তাহার কিছু স্থিরতা নাই। তা ছাড়া, ভালই হউক আর মন্দই হউক সম্পাদক মহাশয় সমালোচন সম্বন্ধে যে স্বাধীনতার পরিচয় দিতেছেন রবীন্দ্র বাবুর নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। কারণ ইহাতে শত্রুবৃদ্ধি হয় দেখিয়া, রবীন্দ্র বাবু সাধনায় সমালোচনা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পরে যদি তিনি সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করেন, তখন "সাহিত্যে"র পৃথকভাবে পরিচালনা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।[৮৩]

নিত্যকৃষ্ণ এইসব কথা যে কেবল ডায়ারিতে লিখছিলেন তা নয়, সুরেশচন্দ্র ও অন্যান্যদেরও তাঁর এই অভিমতের কথা নিশ্চয়ই জানিয়েছিলেন। ২৩ আশ্বিনের [সোম ৪ Oct] ডায়ারিতে কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ে কথাবার্তার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন :

কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, এদিকে সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার মন বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। সম্মিলনটা বোধ হয় নিতান্তই অনিবার্য্য। তবে একটা আশার কথা এই যে, সু-চন্দ্রই সম্পাদক রহিলেন, রবি বাবু কেবল লেখক শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এইভাবে প্রচারিত "সাহিত্য-সাধনা"র

সম্পাদক মহাশয় যে "সাহিত্য"-সম্পাদকের মতেরও ক্ষমতার স্বাধীনতা দেখাইতে পারিবেন, তাহা মনে হয় না। রবীন্দ্র বাবুও সমালোচনার শাসন হইতে মুক্ত হইলেন।[৮৪]

কিন্তু সমস্ত আলোচনাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। ২৮ আশ্বিনের [শনি 13 Oct] ডায়ারিতে নিত্যকৃষ্ণ লিখেছেন:

সাহিত্য ও সাধনার সম্মিলন প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হইল না দেখিতেছি। সু-চন্দ্র আজ রবিবাবুকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, এই ছয় মাস তিনি এ বিষয়ে কিছু করিতে পারিবেন না। আমাদের বলিলেন, ছয় মাস কেন, ও প্রস্তাব আর কখনই বোধ হয় সফল হইবে না। এত পরামর্শ, লোক-জানাজানি করিয়া শেষে সব ভাসাইয়া দেওয়াটা আমার মতে ভাল না হইলেও, সম্মেলন না হওয়াতে যে আমি আনন্দিত, তাহা আর না বলিলেও চলে। আর একখানা "ঠাকুর বাড়ীর কাগজ বাড়াইয়া কোনও ফল নাই।"[৮৫]

বোঝা যায়, সুরেশচন্দ্রের পারিষদবৃন্দ উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবিশ্রাম কাজ করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পত্রেও সুরেশ সমাজপতির বাড়ি যাওয়ার কথা আছে, কিন্তু সেখানে বর্ণনার বিষয়টি আলাদা। 5 Oct [শুক্র ২০ আশ্বিন] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'কাল দুর্গাপূজা আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশু দিন সকালে সু[রেশ] স[মাজপতি]র বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দু ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ-হাত-তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে—এবং আশে পাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হল দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো গোছের পুতুল-খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে।···কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে ক'রে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়, সে জিনিষটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়।···এই কারণে, সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।'[৮৬] কিছুদিন আগে নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে আলোচনায় বলেছিলেন, 'আমি অনেক সময়ে ভাবি, আমিও পৌত্তলিক কিনা'—সেই কথার সঙ্গে এই চিঠির ভাবের মিল আছে। ধর্মবিষয়ে এই খানেই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। হিন্দুসমাজের কঠোর সমালোচনা করেছেন দেখে হিন্দুরা তাঁকে বিরোধীগোষ্ঠীর লোক বলে মনে করেছেন, অপরপক্ষে ব্রাহ্মেরাও তাঁকে আপন বলে মনে করেন নি। একজন কবির পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাকারবাদী হওয়াও শক্ত।

এই দিনে [২০ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হল, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুসারে তিনটিরই প্রকাশের তারিখ 5 Oct 1894, প্রত্যেকটিরই মুদ্রণ-সংখ্যা ১০১০ ও দাম বারো আনা। এর পূর্বে 'ছোট গল্প' [১৫ ফাল্গুন ১৩০০] গ্রন্থে তাঁর ১৬টি গল্প মুদ্রিত হয়েছিল, 'বিচিত্র গল্প' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং 'কথা-চতুষ্টয়' গ্রন্থে সংগৃহীত হল মোট ১৯টি গল্প। পুস্তক তিনটিতে গ্রন্থনাম ছাড়া আখ্যাপত্রের বিবরণ একই রকম, সেই কারণে আমরা একটিমাত্র গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করছি :

বিচিত্র গল্প।/**প্রথম ভাগ**।/কলিকাতা;/১৩৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে/শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত/ও/৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।/১৩০১।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+১১১।

সূচী : ১। অসম্ভব কথা; ২। কঙ্কাল; ৩। স্বর্ণমৃগ; ৪। ত্যাগ; ৫। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন; ৬। জয় পরাজয়; ৭। সম্পত্তি সমর্পণ।

বিচিত্র গল্প।/**দ্বিতীয় ভাগ**।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+১১১।

সূচী : ১। দালিয়া; ২। জীবিত ও মৃত; ৩। মুক্তির উপায়; ৪। সুভা; ৫। অনধিকার প্রবেশ; ৬। মহামায়া; ৭। একটি আষাঢ়ে গল্প ৮। একটি ক্ষুদ্র ও পুরাতন গল্প।

কথা-চতুষ্টয়।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+১৩০+২।

সূচী : ১। মধ্যবর্ত্তিনী; ২। শাস্তি; ৩। সমাপ্তি; ৪। মেঘ ও রৌদ্র।

লক্ষণীয়, কোনো গ্রন্থেই রচনা ও প্রথম প্রকাশের কালানুক্রমিকতা রক্ষিত হয় নি। তবে এতাবৎ লেখা রবীন্দ্রনাথের সব ক'টি গল্পই এই চারটি গল্পসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আশ্বিনের বাকি দিনগুলি রবীন্দ্রনাথ কলকাতাতেই কাটান। এর মধ্যে অনেকটা সময় কাটে সুরেশ সমাজপতির সঙ্গে সাহিত্য ও সাধনা-র সম্মিলন সংক্রান্ত আলোচনায় ও পরামর্শে। ভিতরে ভিতরে তাঁর মন যে অস্থির হয়ে উঠছিল সে-কথা ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন। 9 Oct [মঙ্গল ২৪ আশ্বিন] বিজয়াদশমীর দিনে : 'আমি যখন কলকাতায় থাকি তখন অন্নময় প্রাণময় কোষটাই প্রবল হয়ে উঠে অন্য সমস্ত সূক্ষ্ম কোষগুলিকে অভিভূত করে ফেলে।···আমি তো এখান থেকে পালাই-পালাই করছি। শীঘ্রই বোলপুর যাব সংকল্প করেছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি সেখানে যখন সেই গাড়িবারান্দার ছাতের উপর বড় কেদারা পেতে একলাটি শরতের সন্ধ্যালোকে বোলপুরের দিগন্তপ্রসারিত সবুজ মাঠের উপর আমার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাঁজগুলি খুলে দিয়ে তাকে বিস্তৃত করে দিতে পারব তখন অগাধ শান্তিরসে আমার সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয়ে উঠবে।'[৮৭]

গগনেন্দ্রনাথদের বৈঠকখানা বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গাপূজা হত। সেই উপলক্ষে হত নাচ-গান-বাজনার বিরাট আয়োজন, অবনীন্দ্রনাথ তার সুন্দর বর্ণনা করেছেন 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে। সম্ভবত ২৫ আশ্বিন [বুধ 10 Oct] রাত্রে অনুরূপ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, পরদিন ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'বীণটা ভারী চমৎকার বাজিয়েছিল। অনেকটা সেই বদ্রির [বদ্রিনাথ শুক্ল] মতো—মুচড়ে-মুচড়ে নিংড়ে নিংড়ে কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে সুর বের করতে লাগল—···যন্ত্রটা যে কত রকমের কথা কইতে লাগল তার সব কথা কে বুঝতে পারবে—একেবারে যেন বুকের ভিতরে মুখ দিয়ে তার যা-কিছু বলবার ছিল সমস্ত বলে গেল—এক-একবার যখন মোটা তারটার পুরুষকণ্ঠোচিত গাম্ভীর্যের ভিতর থেকে একটা উদার করুণা ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল তখন মনে হতে লাগল সংসারের সমস্তই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মিথ্যা ব'লেই এমন অনন্তবেদনাময় এবং এমন অসীমসুন্দর, তাই তার মধ্যে এত রাগিণী এবং এত মূর্চ্ছনা।'[৮৮] এই বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ বোধহয় ইন্দিরা দেবী ছাড়া আর কারোর কাছে করতে পারতেন না। কয়েকদিন আগে [7 Oct] তাঁকে লিখেছিলেন : 'আমিও জানি [বব] তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয়নি।···তুই আমাকে অনেক দিন থেকে জেনে আসছিস ব'লেই যে তোর কাছে আমার মনের ভাব ভালো করে ব্যক্ত হয় তা নয়; তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি

সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে।··· আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারেনি।'[৮৯] সংসারের বিচিত্র উত্থান-পতনে, সম্পর্কের দূরত্বে ইন্দিরা দেবীর মনের এই সত্যরূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল বলেই সম্ভবত চিঠিপত্র ৫ম খণ্ডের অন্তর্গত তাঁর লেখা চিঠিগুলিতে এই অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ যেন কিছুটা বাধাগ্রস্ত। আমরা যে ছিন্নপত্রাবলী-র চিঠিগুলি থেকে বড়ো বড়ো উদ্ধৃতি ব্যবহার করি তার কারণও তাই—এখানে রবীন্দ্রমনের যে বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত প্রকাশ আছে, তার মধ্য থেকে মানুষ ও কবি রবীন্দ্রনাথকে অনেক সহজে বুঝে নেওয়া যায়—অন্যত্র সেই অনুসন্ধান তত্ত্বকথায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

অধ্যাপক ড প্রসন্নকুমার রায় ও তাঁর স্ত্রী সরলা রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কথা আগেই বলেছি। শারদীয় অবকাশে সপরিবারে পদ্মায় ভ্রমণের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর বোটটি তাঁদের ব্যবহার করতে দেন। কলকাতায় বিভিন্ন কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন তিনি; বৃহস্পতিবার [*11 Oct] মিসেস্ পি. কে. রায়কে একটি চিঠিতে লিখেছেন : 'আপনারা বোটে গিয়া কেমন আছেন জানিতে উৎসুক আছি। যদি কোনো অভাব বা অসুবিধা থাকে আমাকে জানাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমার আশঙ্কা হইতেছে ছেলেদের লইয়া গিয়া আপনাদের পাছে কোনরূপ অসুবিধার কারণ ঘটিয়া থাকে।' শিলাইদহের খাজাঞ্চি গোপালচন্দ্র মজুমদারের প্রযত্নে পাঠানো এই পত্রে যে কোনো প্রয়োজনে তাঁর সাহায্য নিতে বলেছেন। চিঠির শেষে লিখেছেন : 'আমি বোধ হয় শীঘ্রই বোলপুরে শান্তিনিকেতনে যাইব। সেখানে ছুটিটা কাটাইয়া আসিবার ইচ্ছা আছে।'৯০

সাহিত্যিক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে [1851-1903] লেখা একটি চিঠি সম্ভবত এই সময়ের। এটিতে তারিখ আছে '২৯শে আশ্বিন', কিন্তু সালের উল্লেখ নেই। এতে তিনি লিখেছেন : 'আপনার চিঠি পাইয়া উত্তর লিখিতে দেরি হইল, অহার কারণ আলস্য নহে।···কয়েক দিন একটি শিশু রোগীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা লইয়া আমি অহোরাত্র উদ্বিগ্ন ও ব্যাপৃত ছিলাম। এখন সে সুস্থ হইয়াছে আমিও অবকাশ পাইয়াছি।' সম্ভবত কোনো সন্তানের অসুস্থতার কথা এখানে বলা হয়েছে, অন্য কোনো পত্রে এর উল্লেখ নেই। এর পরে তিনি লিখেছেন : '···আপনার সাংসারিক দুর্গতির সংবাদে আমি আন্তরিক উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। ত্রিপুরা অঞ্চলে কিছুই প্রত্যাশা করিবেন না। আমি অন্যত্র চেষ্টা করিব।/ এবারে আমি দীর্ঘকাল বোলপুরে থাকিব। একটু নির্জ্জন হইলেই এখানে আপনাকে ডাকিয়া লইব।'[৯১] অন্যত্র তিনি ঠাকুরদাসের সাহিত্যবোধের প্রশংসা ও তাঁর সঙ্গে আলোচনায় আনন্দের কথা ব্যক্ত করেছেন।

১ কার্তিক [বুধ 17 Oct] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন। পরের দিন 18 Oct তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'কাল সন্ধের সময় বোলপুরে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজ ভোরে উঠে স্নান করে দক্ষিণের ঘরে এসে বসেছি, আমার মনের সমস্ত গ্লানি যেন দূর হয়ে গেছে।···সিম্‌লের সেই রৌদ্রোত্তপ্ত বারান্দাটিতে গিয়ে দাঁড়ালে পল্লবভূষণা নীলাম্বরী প্রকৃতি ঠিক যেমন একেবারে চোখের বুকের কোলের সামনে এসে দেখা দিত, এখানকার এই দক্ষিণের ঘরটিতে বসেও ঠিক সেইরকমটি মনে হচ্ছে।···ঘরের জাজিমের উপর লুটিয়ে প'ড়ে

একটা পেন্সিল এবং খাতা হাতে একটা কোনো রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করছে। সকাল বেলাটি বেশ স্নিগ্ধ এবং নবীন আছে, এই বেলা আরম্ভ করে দেওয়াই ভালো।···মন এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তাকে যেন স্পর্শ-দ্বারা অনুভব করতে পারছি, তার ধ্বনি খুব নিকটে শোনা যাচ্ছে।'[৯২] এই রকম মানসিক অবস্থায় তিনি লিখলেন 'সাধনা' কবিতাটি [দ্র সাধনা, অগ্র°। ১-৪; চিত্রা ৪।৬২-৬৫]। চিত্রা কাব্যগ্রন্থে কবিতাটিতে তারিখ দেওয়া আছে '৪ কার্তিক, ১৩০১'; কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি,—সেইজন্য গ্রহণ-বর্জন কতটা করা হয়েছিল বলার উপায় নেই—কিন্তু আমাদের ধারণা, কবিতাটি ২ কার্তিকেই লেখা হয়, ৪ কার্তিকে সংস্কারের পর এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

শুক্রবার 19 Oct [৩ কার্তিক] কবিতা-রচনার খবরটি দিয়ে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'কাল কেবল বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে একখানি ছোটো কবিতা লিখেছি এবং একটি তিব্বত-ভ্রমণের বই পড়েছি। এই রকম নির্জন জায়গায় একলা বসে ভ্রমণের বই পড়তে আমার ভারী ভালো লাগে। এ রকম জায়গায় নভেল আমি ছুঁতে পারি নে।···ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে, অথচ প্লটের বন্ধন নেই—মনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়।···ভ্রমণকারী একটি ফরাসী, সেই জন্যে সে ভ্রমণ করতেও জানে এবং লিখতেও জানে।'[৯৩] এই গ্রন্থ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে লিখলেন : 'ইংরাজ ভ্রমণকারীদের যতগুলো বই পড়েছি প্রায় সবগুলোতেই তাদের উদ্ধত পাশব প্রকৃতির এবং আত্মাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা অন্য জাতের প্রতি সুবিচার করতে এবং ভালোবাসা দিতে পারে না। অথচ বিধাতা এদের উপরে যত ভিন্ন জাতের ভার সমর্পণ করেছেন এমন আর কারও উপর করেন নি।' একটি রাজনৈতিক সমস্যা সম্ভবত তাঁর চিন্তাকে তখন অধিকার করে ছিল, তাঁর ফলে আকস্মিকভাবে ইংরেজ ভ্রমণকারীদের প্রতি এই উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে।

ইংরেজের সুবিচারের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থার অভাব ক্রমেই প্রকট হচ্ছিল। 'ইংরাজের আতঙ্ক', 'রাজনীতির দ্বিধা' ও 'অপমানের প্রতিকার' প্রবন্ধে তিনি বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করে এই সমস্যার প্রতিই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে এইরূপ একটি ঘটনাকে লক্ষ্য করে লিখলেন 'সুবিচারের অধিকার' [দ্র সাধনা, অগ্র°। ২৯-৩৮; রাজাপ্রজা ১০।৪১৮-২৩] প্রবন্ধ। গোরক্ষিণী-সভা ও বিহার প্রদেশে Tree-daubing দেখে আতঙ্কিত ইংরেজ আপন রাজ্যরক্ষায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদনীতির দ্বারা বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটাবার কাজে তৎপর হয়ে উঠেছিল, পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তা স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন। বোম্বাই প্রদেশের সেতারা জেলার [সত্যেন্দ্রনাথ তখন এখানে ডিস্ট্রিক্ট ও সেশনস্ জজ] বাই-নামক নগরে তেরো জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুর কারাদণ্ডের ঘটনায় তিনি একই ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। হিন্দুপ্রধান এই নগরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব না থাকলেও সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট হিন্দুদের একটি পূজা উপলক্ষে বাদ্য বন্ধ করতে আদেশ করেন। সেই আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন না করার জন্য উক্ত তেরো জন ভদ্র হিন্দুর কারাদণ্ড হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাটির উল্লেখ করে লিখলেন : 'এমনি করিয়া, যেখানে বিরোধ নাই সেখানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, যেখানে বিদ্বেষের বীজমাত্র আছে সেখানে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া মহাসমারোহে অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।' 'সাধারণের বিশ্বাস' ব'লে উল্লেখ করলেও এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নিজেরও ধারণা, 'দমনটা অধিকাংশ

হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরও অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনোকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া এক পক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্য পক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে। 'তাঁর বক্তব্য এই যে, এটি গবর্মেন্টের পলিসি না হতে পারে—কিন্তু সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের আচরণে এরূপ মনোভাব প্রভাব ফেলবেই, সেক্ষেত্রে 'সুবিচারের অধিকার' পাওয়া কঠিন। সেই কারণে 'গবর্মেন্টের নিকট সকরুণ অথবা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ' করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধ লিখছেন না, 'আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।' কিন্তু একতাবদ্ধ হয়ে সেই আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া কত কঠিন, তিনি কিছুদিন আগে গল্পচ্ছলে 'মেঘ ও রৌদ্র' কাহিনীর মধ্য দিয়ে তা বর্ণনা করেছিলেন। এখানেও সেই কথাই লিখলেন : 'আমরা জানি, বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে। আমরা জানি যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে। যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ; আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না—কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে।' আমাদের বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে, স্বদেশবাসীর আত্মদরপ্রিয়তা ঈর্ষা হীন স্বার্থ ও লোভ কিভাবে রন্ধ্রপথে সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষকে চিনতেন না বা তিনি নরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন ইত্যাদি অভিযোগ যাঁরা তোলেন, দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতাই তার দ্বারা প্রমাণিত হয়। এইজন্যই তিনি মনুষ্যত্বসাধনার উপর এত জোর দিয়েছেন : 'তাহাদের নিকট যখন আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া প্রমাণ দিব তখন তাহারা সকল সময়েই আমাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। যখন ভারতবর্ষে অন্তত কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরেজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবে যে, ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহারা কখনো ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।' রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের অধিকাংশ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে লেখা। ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতেও প্রবন্ধটির উল্লেখ আছে; 25 Oct [বৃহ ৯ কার্তিক] তাঁকে লিখেছেন : 'আজ একটি অর্ধসমাপ্ত পোলিটিকাল্ প্রবন্ধ শেষ করতে হবে।...লিখে যে কী ফল হবে তা অন্তর্যামীই জানেন।...ফল পাব না মনে করেই আমাদের দেশে কাজ করতে হয়।'[৯৪]

১৫ কার্তিক [বুধ 31 Oct] পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই নির্জনবাস যে তাঁর ভালো লেগেছিল, ইন্দিরা দেবীকে লেখা বিচিত্রস্বাদের অনেকগুলি চিঠিই তার প্রমাণ। অবধারিতভাবেই এর অনেকটা

অংশ শৈশবস্মৃতি মাখানো। পিতার সঙ্গে প্রথম এখানে আসা, নারকেলকুঞ্জে বসে একখানা পুরোনো Lett's Diary-তে দিন-সাতেক ধরে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'-নামক বীররসাত্মক কবিতা রচনা, এমন-কি নর্মাল স্কুলে পড়ার সময়ে বাদলার দিনে অন্ধকার ঘরে পণ্ডিতমশাই পড়া বন্ধ করলে 'বৃষ্টির শব্দ এবং মেঘের অন্ধকার পুলকিতমনে উপভোগ' করার স্মৃতি পর্যন্ত তিনি রোমন্থন করেছেন।

অবশ্য এর মধ্যে অন্যান্য কাজও তাঁকে করতে হয়েছে—তার ভিতরে সাধনা-র কাজ সর্বপ্রধান। 'যোগ্যতর হস্তে সম্পাদকীয় কার্যভার ন্যস্ত' করে সুধীন্দ্রনাথ সাধনা-র দায়িত্ব ত্যাগ করলেও সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম তখনও ঘোষিত হয় নি। তিনি একসময়ে ভূতপূর্ব 'মালঞ্চ'-সম্পাদক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের [1851-1903] নামও বেতনভোগী সম্পাদক হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, তাঁকে লেখা ৭ কার্তিকের [মঙ্গল 23 Oct] চিঠি তার প্রমাণ : 'সাধনার সাইজ ও কাগজ কমানো সম্বন্ধে অনেক হিতৈষী বন্ধু আপত্তি করাতে অবশেষে তাঁহাদের অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার হইয়াছি।···পূর্ব্বের ন্যায় ব্যয়বাহুল্য রহিল বলিয়া আপনাকে সাধনার সম্পাদকপদে নিয়মিত নিযুক্ত করিতে সাহস করিলাম না। আপনি প্রবন্ধ-প্রতি কিরূপ মূল্য গ্রহণ করিতে পারেন আমাকে জানাইবেন—অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন না। আগামী বৎসর হইতে সাধনায় কোনও লেখকের নাম থাকিবে না।'[৯৫] এই নাম না থাকার কারণে ঠাকুরদাসের কোনো প্রবন্ধ সাধনা-র চতুর্থবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ সাধনা-পরিচালনার নিপুণ ব্যবস্থা করে [তাঁর ধারণা-মতো] নিশ্চয়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন। তাই বুধবার 24 Oct [৮ কার্তিক] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : 'সত্যি কথা বলতে কী, যখন একবার বিষয়কার্যের মধ্যে ভালো করে মনোনিবেশ করা যায় তখন তার একটা নেশা ক্রমে মনটাকে অধিকার করে নেয়। বহুবিধ পরামর্শ উপায়চিন্তা এবং ভবিষ্যৎভাবনায় বেশ এক রকম ভোর হয়ে যেতে হয়।···আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি ব্যারিস্টার কিম্বা সিভিলিয়ান হয়ে আসতুম তা হলে আমি আমার নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতুম—সাহিত্যচর্চায় মন দেবার কোনো আবশ্যক অনুভব করতুম না।···ভাগ্যি আমি ব্যারিস্টর হয়ে আসি নি!'৯৬

তিনি ব্যারিস্টর হয়ে আসেন নি তার জন্য বাঙালি জাতিও ভাগ্যবান, কিন্তু সাহিত্যচর্চা-ব্যতীত অন্যান্য কাজও তাঁকে কম করতে হয় নি। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ বহুবার যোগ দিয়ে সংগীত পরিবেশন করেছেন, 20 Oct [শনি ৪ কার্তিক] তারিখে তাঁকে উক্ত সমাজের অন্যতম ট্রাস্টী নিয়োগ করা হল।[৯৭] এই ধরনের কাজে অবশ্য দায়িত্ব অপেক্ষা সম্মানই বেশি। কিন্তু সম্মানের দায়িত্ব পালন করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে মাঝেমাঝেই এই সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে।

এই সময়ে নূতন করে তাঁর যোগ গড়ে উঠল শ্রীঅরবিন্দের অগ্রজ কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের [1869-1924] সঙ্গে। রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র মনোমোহন শৈশবেই পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের সঙ্গে বিলাতপ্রবাসী হয়েছিলেন। অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে পড়াশুনো শেষ করে তিনি এই বৎসরে পূজার আগে দেশে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলাতপ্রবাসের সময়ে এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর তাঁদের যে সাক্ষাৎ ঘটল রবীন্দ্রনাথ তার স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে : 'মনোমোহন যখন দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার পুনরায় পরিচয় হয়—সে পরিচয় আমার কাব্যসূত্রে। সেইদিন সেইক্ষণ

আজ আমার মনে পড়ে। জোড়াসাঁকোয় আমাদের বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় 'সোনার তরী' পড়ছিলুম। মনোমোহন তখন সেই কাব্যের ছন্দ ও ভাব নিয়ে অতি সুন্দর আলোচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও শুধু বোধশক্তি দ্বারা তিনি কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু গ্রহণ করতে পেরেছিলেন।'* এরপর তাঁদের মধ্যে পত্রালাপ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি রক্ষিত হয়েছে কিনা জানা নেই, কিন্তু মনোমোহনের ইংরেজিতে লেখা কয়েকটি পত্র রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করেছেন। এইরকম একটি পত্রে 24 Oct [৮ কার্তিক] দেওঘর থেকে মনোমোহন লিখেছেন : 'I am so glad to get your kind letter, and to know that you will be in Shillidah for the period of my present Pooja holidays. I shall come and join you without fail.' এই পত্রে অরবিন্দ সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন, একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও তা উদ্ধৃত করি : 'Aurobinda is anxious to know what you think of his book of verses, but I have explained to him how busy you are just now, and that you will write later when you have a little more leisure to do justice to his book... Unfortunately, he has directed (or rather misdirected) all his energies to writing Bengali poetry. He is at present engaged on an epic (inspired I believe by Michael Madhusudan) on the subject of Usha & Aniruddha.'[৯৮] শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের প্রাথমিক ইতিহাস রচনায় পত্রাংশটির কিছু গুরুত্ব থাকতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : 'আমি সম্ভবত কার্তিক মাসটা এইখানেই যাপন করিব'—সম্ভবত কলকাতা থেকে কোনো বিষয়কার্যের আহ্বান আসাতে তাঁকে অবস্থান-কাল সংক্ষেপ করতে হল। কিন্তু শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে তাঁর ইচ্ছে করছিল না, সে-কথা ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন 31 Oct [বুধ ১৫ কার্তিক] তারিখে : 'এখান থেকে যেতে আমার মন-কেমন করছে—কলকাতায় ফিরে গিয়ে এখানকার প্রফুল্ল সকাল বেলা এবং নির্জন দুপুর বেলা আমার সর্বদাই মনে পড়বে—এখানকার শান্তি এবং সৌন্দর্যস্মৃতি আমাকে আকর্ষণ করতে থাকবে। কিন্তু কী করা যাবে! স্বার্থপরতাকে দমন করে প্রফুল্লচিত্তে কর্তব্যক্ষেত্রে যাওয়া যাক। ছেড়ে যাবার সময় সৌন্দর্যগুলো আরও যেন মনোহর হয়ে ওঠে। আজকের দিনটা এমনি একটি করুণাপূর্ণ রাগিণীতে আপ্লুত হয়ে উঠেছে।'[৯৯]

১৫ কার্তিক [বুধ 31 Oct] কলকাতায় গিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে কেবল একটি অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে দেখি। ১৯ কার্তিক [রবি 4 Nov] ২/২ রাজা নবকৃষ্ণের স্ট্রীটে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যালয়ে রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকেও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের বন্ধুদের মধ্যে লোকেন্দ্রনাথ পালিত, চিত্তরঞ্জন দাস ও আশুতোষ চৌধুরী এই অধিবেশনে সভ্যরূপে গৃহীত হন। এছাড়া এই দিনের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ কোনো কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন কিনা প্রতিবেদনে তার কোনো উল্লেখ নেই।

এরপর কার্তিক মাসের বাকি দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধি অস্পষ্ট। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আশ্বিন-অগ্র° ১৩০১-এর একটি খণ্ডিত হিসেবের খাতায় '২৯ কার্ত্তিক' [বুধ 14 Nov] তারিখ দিয়ে দু'টি হিসাব পাওয়া যায় : (১) 'রবীন্দ্রবাবুর গমনাগমনের ব্যয় ৩২।লে৬' (২) 'উক্ত বাবু মহাশয় ও রথীন্দ্র বাবু মহাশয়ের যাতায়াত তথায় থাকিবার ব্যয় ৫৪ ল০ /বিঃ ১ বৌচর ৯২২/৬'-এর থেকে অনুমান করা যায় যে, ১৯ কার্তিকের পর রবীন্দ্রনাথ আবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন, এবারে রথীন্দ্রনাথকে [৬] সঙ্গে নিয়ে, ২৯

কার্তিক তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন। এই বারে শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি যে চিঠিপত্র লিখেছিলেন, সেগুলি রক্ষিত হয় নি বলে পিতাপুত্রের দিনগুলি কেমন কেটেছিল তা জানা যায় না।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহটি রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় কাটান। এর মধ্যে কোনো এক দিন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-বিষয়ে আলোচনা হয়। মঙ্গলবার 20 Nov [5 অগ্র°] তিনি ইন্দিরা দেবীকে এ-সম্পর্কে লিখলেন : 'এই গদ্য-পদ্যর ভেদ ও সেই প্রভেদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অল্পকাল হল···মুখুজ্জের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল। তাঁর মতে ভবিষ্যতে গদ্য এতদূর পর্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে যে, পদ্যর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যাবে। কথাটা যদি বিশুদ্ধ তর্কের হত তা হলে অনেকটা সহজ হত, কিন্তু এর মধ্যে ভাবের কথা বহুল পরিমাণে আছে বলে মুখে মুখে বোঝানো বড় শক্ত হয়।···ঠা—বাবুও বোধ হয় আমার কথা মানলেন না। ভাবে বোধ হল তাঁর বিশ্বাস, আমার গদ্যে আমার পদ্যের চেয়ে ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক। তিনি আমার শেষ দিককার লেখা কতকগুলি কবিতার বই চেয়েছেন—বোধ হয় কোনো প্রবন্ধে প্রমাণ করবেন যে আমার পদ্যই গদ্য এবং গদ্যই পদ্য।'[১০০]

21 Nov [বুধ ৬ অগ্র°] তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'অ[ভিজ্ঞা?] ও বাড়িতে তাদের এক তলার ঘরে বসে এস্‌রাজে ভৈরবী আলাপ করছে, আমি আমার তেতলার কোণের ঘরে বসে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। তোর চিঠিতেও তুই মাটাঙ্গের ভৈরবী আলাপের কথা লিখেছিস।'[১০১] ছিন্নপত্রাবলী-র সম্পাদকের 'অ—'-র পরিচয় নিয়ে সংশয়ান্বিত অনুমান সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের অনুমান এখানে অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলা হয়েছে—কানাইলাল ঢেড়ীর কাছে তাঁর এসরাজ শেখার গল্প তিনি করেছেন 'ঘরোয়া'তে—তাছাড়া 'ও বাড়ি' বলতে বৈঠকখানা বাড়িকেই বোঝাত।

৭ বা ৮ অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যান। তাঁর বাবুর্চি গোফুর মিঞা তখন মৃতপ্রায়। 25 Nov [রবি ১০ অগ্র°] ইন্দিরা দেবীকে লিখলেন : 'গো···এ যাত্রায় বেঁচে গেল। পরশু প্রায় সমস্ত রাত আমার ঘুম হয়নি। আমার বোটের পিছনেই তার নৌকো ছিল—মাঝে মাঝে তার কাতর শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম আর তার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে মনটা উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠছিল। তখন নিস্তব্ধ রাত্রি, আমার ঘর সমস্ত অন্ধকার। বিছানার মধ্যে পড়ে পড়ে মানুষের জীবন-মৃত্যুটাকে ভীষণ একটা রহস্যে আচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছিল।'[১০২] এই ভাবনা বিভিন্ন সময়ে তাঁর মনকে অধিকার করেছে—অনন্তের পটভূমিকায় মৃত্যুকে দেখে তাঁকে সান্ত্বনা খুঁজে নিতে হয়েছে।

6 Dec [বৃহ ২১ অগ্র°] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'আমি আজকাল একটু স্থানপরিবর্তন করেছি। নদীর ঠিক মাঝখানে একটা চরের মতো জেগে উঠেছে, সেই চরে আমি বোট নিয়ে এসে বেঁধেছি।···বিকেলে যখন ডাঙায় বেড়াতে যাই তখন জলিবোটে খানিকটা দাঁড় টেনে বেয়ে যেতে হয়; এই সূত্রে আমার দাঁড় টানাও হয় বেড়ানোও হয়।'[১০৩] শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভাই শৈলেশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারির কাজে নিয়োগ করেছিলেন। চরের নির্জনতা উপভোগের সময়ে তাঁর উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথকে বিরক্ত করে। 7 Dec [শুক্র ২২ অগ্র°] তিনি লিখছেন: 'আমি যখন একলা বেড়াই, খানিক বাদে শৈ···প্রায়ই আমার সঙ্গ নিতে আসে এবং কাজকর্মের আলোচনা করে। কালও সে এসেছিল। খানিকক্ষণ ধরে খারিজ দাখিল বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে

কথা কওয়ার পর যেই একটু চুপ করেছি—অমনি হঠাৎ দেখতে পেলুম অনন্ত জগৎ সেই সন্ধ্যার আকাশে নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তখন আমার আশ্চর্য বোধ হল, কানের কাছে একটা মানুষের সামান্য কণ্ঠস্বরে এই অনন্ত-আকাশ-ভরা নিঃশব্দতা ডুবে গিয়েছিল···আমি শৈ···র কথার কোনো উত্তর দিলুম না, সে মনে করলে আমি বুঝি শুনতে পাই নি। ফের আবার প্রশ্ন করলে, আমি ফের নিরুত্তরে সে কথা কাটিয়ে দিলুম। তখন সে ভারী আশ্চর্য হয়ে চুপ করে গেল।'[১০৪] 11 Dec [মঙ্গল ২৬ অগ্র°]-এর চিঠিতে লিখছেন : 'আজকাল *শৈলেশের ভয়ে খুব** সকাল-সকাল বেড়াতে বেরই; অনেকক্ষণ একলা বেড়াবার পরে শৈ···এসে হাজির হয়। ততক্ষণ আমি মনটিকে শান্ত এবং শীতল করে নিই এবং দিনের সমস্ত চিন্তা ও কাজের ছিন্ন আবর্জনাগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সুদূরে ফেলে দিই। তখন নিদেন খানিক ক্ষণের জন্যে মনে হয় সংসারের সমস্ত লাভক্ষতি এবং সুখদুঃখ কিছুই কিছু নয়।'[১০৫] শৈলেশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ খুবই স্নেহ করতেন, সুতরাং এই বিরক্তি কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নয়—নির্জনতার আনন্দরসে মনটিকে ডুবিয়ে নেবার সময়ে যে-কোনো বাধাই তাঁকে অস্থির করে তুলত, ছিন্নপত্রাবলী-র অনেক চিঠিতেই তাঁর এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

১৫ অগ্র° [শুক্র 30 Nov] রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় সাধনা-র চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। ইতিপূর্বে কার্যাধ্যক্ষ হিসেবে তত্ত্ববোধিনী-র বিজ্ঞাপনে নীতীন্দ্রনাথের নাম ঘোষিত হলেও পত্রিকায় নাম ছাপা হত সত্যপ্রসাদের; কিন্তু কার্যত বলেন্দ্রনাথই বৈষয়িক দিকগুলি দেখাশোনা করতেন, তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে তা বোঝা যায়। অগ্র° ১৩০১-সংখ্যায় কার্যাধ্যক্ষ-রূপে তিনিও স্বনামে আবির্ভূত হলেন। তাঁর কর্মদক্ষতার একটি নমুনা আছে 'সাধনার ক্যাশবহি'তে; ২০ অগ্র° তারিখের একটি হিসাব : 'সাধনার প্লাকার্ড তৈয়ারির মজুরি শোধ আর্ট ইউনিয়ন প্রেসের বিল শোধ ১০্'—সিনেমা-থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের মতো কলকাতার দেয়ালে-দেয়ালে সাধনা-র পোস্টার লাগানো রয়েছে, ভাবতেই কৌতুক বোধ হয়!

রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাধনা-য় লেখকের নাম ছাপা হত না, ষান্মাসিক সূচীতেও লেখকের নাম নেই—ফলে অনেক রচনারই লেখক-পরিচয় উদ্ধার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, কিন্তু সন্দেহ হয় তাঁর কিছু রচনা এখনও অ-চিহ্নিত ও অ-গ্রন্থিত থেকে গেছে। সেগুলিকে চিহ্নিত করার দায়িত্ব যথাসম্ভব আমাদের নিতে হবে।

'গ্রন্থ সমালোচনা' বাদে অগ্র° ১৩০১-সংখ্যার এগারোটি রচনার মধ্যে ছ'টি রচনা রবীন্দ্রনাথের, স্বরলিপিটিও তাঁরই গানের। রচনাগুলি হল :

১-৪ 'সাধনা' ['দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে'] দ্র চিত্রা ৪। ৬২-৬৫

৪-২৩ 'প্রায়শ্চিত্ত' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৯। ২৩৫-৪৮

২৯-৩৮ 'সুবিচারের অধিকার' দ্র রাজাপ্রজা ১০। ৪১৮-২৩

৪৯-৫৯ 'কাব্যের তাৎপর্য্য।/ (পাঞ্চভৌতিক সভায় আলোচিত)' দ্র পঞ্চভূত ২। ৬০৩-১০

৬৭-৭৫ 'ফুলজানি' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪৭০-৭৫

৮৪-৯৪ 'আর্য্যগাথা' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪৮০-৮৫

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের '(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ' [দ্র গীত ৩ | ৮১৯-২০] মিশ্রসিন্ধু—একতালা সুর-তালে বিধৃত গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত হয় ৩৯-৪২ পৃষ্ঠায়, স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত।

ভারতী-র অগ্র° ১৩০১-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সুরারোপিত গোবিন্দদাসের 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি' গানটির স্বরলিপি 'শ্রীমতী স্নেহলতা দত্তের অনুরোধে' মুদ্রিত হয় ৪৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায়। স্বরলিপিকারের নাম না থাকলেও সম্ভবত সরলা দেবী এটি প্রস্তুত করেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পটি 'অনধিকার প্রবেশ' ও 'মেঘ ও রৌদ্র'-এর মতো সমকালীন চিন্তার স্পর্শে কিছুটা গুরুভার। 'সুবিচারের অধিকার' প্রবন্ধে দেশবাসীর আত্মমর্যাদাবোধের অভাবের যে-সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, গল্পের নায়ক অনাথবন্ধুর চরিত্রচিত্রণের মধ্যে তার কিছু ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

'কাব্যের তাৎপর্য' 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাট্যটিকে নিয়ে 'পাঞ্চভৌতিক সভায় আলোচিত' রচনা। 'পঞ্চভূত'-এর ডায়ারি শেষ প্রকাশিত হয়েছিল সাধনা-র আশ্বিন ১৩০০-সংখ্যায়। এর পর মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন শিরোনামে এই জাতীয় রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সাধনা-র চতুর্থ বর্ষের দশটি সংখ্যায় পঞ্চভূত-এর আটটি রচনা মুদ্রিত হয়।

এই সংখ্যার সাধনা-য় রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন ধরনের গ্রন্থসমালোচনার প্রবর্তন করেন। স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আকারে একটি গ্রন্থের সমালোচনার পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন-এ ব্যবহার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ রীতিটির প্রয়োগ শুরু করলেন বর্তমান সংখ্যায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাস [13 Mar 1894] ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আর্যগাথা' কাব্যের দ্বিতীয় ভাগের [20 Feb 1894] সমালোচনা দিয়ে।

'ফুলজানি'-র প্রথম পরিচ্ছেদটি প্রকাশিত হয়েছিল বালক-এর আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২-সংখ্যায় 'পাঠশালা' নামে; তারপর ভারতী ও বালক-এর বৈশাখ ১২৯৫-সংখ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদটির পুনর্মুদ্রণ-সহ অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে ফাল্গুন-চৈত্র ১২৯৬-সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। কয়েক সংখ্যা পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁর ভালো লাগার কথা শ্রীশচন্দ্রকে জানিয়ে লেখেন [? Jun 1888]: 'ওর মধ্যে কেনোরকম নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই। আর এমন একটি ছবি মনে এনে দেয় যা আমাদের দেশের কোনো লেখকের লেখাতে দেয় না। আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—···শীতল ছায়া, আম-কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা, এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহমিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানবজীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন।···কোনোরকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা করে তুলবেন না। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি অধিক ফলাও কাণ্ড না করেন তা হলে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখকের সঙ্গে সমান আসন পেতে পারবেন।'[১০৬]

কিন্তু শ্রীশচন্দ্র উপন্যাসের পরবর্তী অংশে এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, এবং বর্তমান সমালোচনায় সেই অংশের প্রতি সমস্ত আক্রমণটুকু ঘনীভূত হয়েছে : '১৬৬ পাতায় বইখানি সমাপ্ত—···এতক্ষণ গ্রন্থকার ১২২ পৃষ্ঠায় যে একটি সুন্দর সরল সমগ্র কাব্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসবশত শেষের ৪৪ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে একটি আকস্মিক বজ্র নির্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন।'

'আর্যগাথা' দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা। সম্ভবত এর আগেই তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল, কারণ এই সংখ্যাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের কৌতুক-কবিতা 'কেরানী' ছাপা হয় [পৃ ৬০-৬৭, 'আষাঢ়ে' গ্রন্থে সংকলিত]। 'আর্যগাথা' দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা বিভিন্ন রসের গানের সংকলন, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গানের দিক থেকেই গ্রন্থটিকে বিচার করেছেন। সাধারণভাবে পুস্তকটি প্রশংসা করলেও 'কোনো কোনো গানে ইংরাজি প্রথার ভাষা'র সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলনের সময়ে [১৩১৪] তিনি এই অংশটুকু বাদ দেন, এর আগেই তাঁর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধ দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্র-রচনাবলী-র 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে বর্জিত অনুচ্ছেদগুলি সংকলিত হয়েছে।

সাধনা-য় ইতিপূর্বে যে 'সমালোচনা'গুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে আমরা সিদ্ধান্ত করেছি। সেইভাবে রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাধনা-য় 'গ্রন্থ সমালোচনা'র দায়িত্ব তাঁরই উপর ছিল, আমাদের ধারণা এইরূপ। অবশ্য ফাল্গুন ১৩০১-সংখ্যায় প্রকাশিত 'দেওয়ান গোবিন্দরাম' ও 'মনোরমা' গ্রন্থ-দু'টির সমালোচনা ছাড়া অন্যগুলি রবীন্দ্রনাথ-কৃত কিনা তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, কিন্তু বহু জায়গায় আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আমাদের সিদ্ধান্তের সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। বর্তমান সংখ্যায় অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভক্তচরিতামৃত' ও 'রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত', কাশীচন্দ্র ঘোষালের 'চরিত রত্নাবলী' প্রথম ভাগ, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'অর্থই অনর্থ' ও 'ঠগী কাহিনী' গ্রন্থগুলি সমালোচিত হয়েছে। 'চরিত রত্নাবলী' সম্বন্ধে বলা হয়েছে : '···ইহার মধ্যে কেবল "করমেতি বাই" নামক প্রথম চরিতটি আমাদের ভাল লাগে নাই। মানবহিতৈষণার জন্য যাঁহারা সংসার বিসর্জন করেন তাঁহাদের জীবনচরিত বর্ণনযোগ্য। কিন্তু আত্মসুখের আকর্ষণে যাঁহারা সুকঠিন সংসারকৃত্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন তাঁহাদের চরিত্রকে আদর্শ জ্ঞান করিতে পারি না। করমেতি বাই স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে "শ্যামল সুন্দর সিন্ধু তরঙ্গ মাঝারে" নিমগ্ন হইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সুখী হইয়া থাকেন ত তিনিই সুখী হইয়াছেন—আমাদের হাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরা তাঁহার হতভাগ্য স্বামীর জন্য দুঃখিত।'[১০৭]—রবীন্দ্রনাথের সন্ন্যাস-বিরোধী মানসিকতার সঙ্গে এই অংশের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

পৌষের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে ফিরে আসেন। ৭ পৌষ [শুক্র 21 Dec] শান্তিনিকেতনের চতুর্থ বার্ষিক ব্রহ্মোৎসবে তিনি যোগ দেন। উৎসবের বিবরণে আছে : '···সর্ব্বপ্রথমে ঘণ্টারব হইল। তখন সকলে ব্রহ্মোপসনার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অগ্রবর্তী করিয়া মঙ্গল গীত গাহিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন।···পরে আচার্য্যেরা বেদী গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর···সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।···পরে স্বাধ্যায়ন্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্ববক্তব্যের সহিত শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের একটি হৃদয়স্পর্শী উপদেশ পাঠ করিলেন।···পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মধুর গম্ভীর স্বরে ভক্তিভরে প্রার্থনা করিলেন।···অনন্তর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। মন্দিরের সোপান পরম্পরায় বহু সংখ্যক ভোজ্য সুসজ্জিত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রবাবু তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিলেন "অদ্য পৌষ মাসের সপ্তম দিবসে ব্রহ্মপ্রীতিকামনায় এই সমস্ত সবস্ত্র

ভোজ্য অনাথ দীন দুঃখী ও আতুরদিগের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইল" …।[১০৮] দেবেন্দ্রনাথের 'নিজ স্বতন্ত্র ক্যাশবহি'র একটি হিসাব—'রবীন্দ্রবাবু মহাশয়/বোলপুর যাওয়ার সময় বর্ধমানে গগন বাবু দিগের খাওয়া খরচা'—থেকে মনে হয় শান্তিনিকেতনের উৎসবে গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতিরাও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন।

সাধনা, পৌষ ১৩০১ [৪/২]:

৯৭-১০৭ 'বিচারক' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৯। ২৪৮-৫৫

১২০-২৮ 'নূতন অবতার' দ্র ব্যঙ্গকৌতুক ৭। ৩৪৬-৫১

১২৮-৩৬ 'কৌতুহাস্য।/ (পাঞ্চভৌতিক সভা)' দ্র পঞ্চভূত ২। ৬১৫-২০

১৬২-৭৫ 'সঞ্জীবচন্দ্র। (পালামৌ)' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪৩৩-৪১

১৮৭-৯৩ 'সমালোচনা'

'বিচারক' গল্পটির একটি সুন্দর সমালোচনা করেছেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি :

একটি ছোট গল্প কেন,—এই আখ্যানবস্তুকে লেখক একটি বড় উপন্যাসে পরিণত করিতে পারিতেন। ক্ষুদ্র আকারে এই গল্পের সকল উদ্দেশ্য, সমস্ত সৌন্দর্য্য, পূর্ণ বিকশিত হইবার অবসর পায় নাই,—ক্ষুদ্র গল্পের প্রয়োজনে ও আয়তনে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনাই ছিল না। … লেখক পাপপুরী হইতে ক্ষীরোদাকে সংগ্রহ করিয়াছেন বটে,—কিন্তু পাপের আনুষঙ্গিক ঘৃণাজনক ব্যাপারগুলি বর্জন করিয়া, তাহাকে এমন সাবধানে পাঠকবর্গের সম্মুখে আনিয়াছেন যে, ক্ষীরোদার দুঃখে হৃদয় গলে। তাহার ঘোরতর নিরাশা,—তাহার দারুণ অবসাদ, তাহার পাপের পরিণাম, পাঠকের সহানুভূতির উদ্রেক করে,—কিন্তু পাপ অনেক দূরে থাকে। এই গল্পে যে একটি সমুচিত সংযম ও সুরুচিপ্রিয়তার নিদর্শন আছে, তাহা বাস্তবিকই অনুকরণের যোগ্য। বাস্তব চিত্র যথাযথ অঙ্কিত করিবার জন্য যাঁহারা ছাল ছাড়াইয়া পাপের অস্থি কঙ্কাল ও পূতিগন্ধময় প্রেতদেহের চিত্র দেখান,—তাঁহারা বীভৎস রসের সঞ্চার করেন মাত্র। তাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে কণ্টক পড়ে, পরন্তু কুরুচির চিত্রে অভীষ্ট আদর্শ আবৃত হইয়া যায়। লেখক ক্ষীরোদার জীবনের বাস্তব ফটো তুলিয়াছেন, কিন্তু তাহার ব্যবচ্ছেদ করিয়া পাঠককে বিব্রত করেন নাই। যাঁহারা বাস্তবচিত্রাঙ্কনের ছলে দেশে কুরুচির বীজ বপন করেন,—তাঁহারা "বিচারক" গল্পে, বাস্তবের সংযত ও সুসঙ্গত চিত্ররচনার দৃষ্টান্ত পাইবেন।[১০৯]

—গল্পটি কার লেখা, সুরেশচন্দ্রের নিশ্চয়ই তা অজ্ঞাত ছিল না।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [1834-89] 'পালামৌ ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার বিশ্লেষণ করেছেন 'সঞ্জীবচন্দ্র' প্রবন্ধে। 'তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না' এই মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ যেন সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার মর্মস্থলটি উদঘাটন করে দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনার অধিকাংশই ব্যয়িত হয়েছে চন্দ্রনাথ বসু 'সঞ্জীবনী সুধা' গ্রন্থের ভূমিকায় যে-সব মন্তব্য করেছেন তারই সমালোচনায়। একে কেউ যদি 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' বলে অভিহিত করেন তাঁকে খুব একটা দোষী করা যাবে না। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'-য় লিখেছেন : 'শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সঞ্জীবনী সুধা" নামক পুস্তকখানির প্রথমে সঞ্জীবের প্রতিভার যে সমালোচনা করিয়াছেন, "সাধনার" লেখক বর্তমান প্রবন্ধে অনেক স্থলে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষণে মান্যবর চন্দ্রনাথবাবু কি বলেন, দেখা যাউক।'[১১০] এর মধ্যে বিতর্ক-সৃষ্টির একটি সচেতন প্ররোচনা দেখা যায়, সৌভাগ্যক্রমে তা সফল হয়নি।

'সমালোচনা'-য় সত্যব্রত সামশ্রমী-কর্তৃক সংশোধিত সীতানাথ দত্ত-কৃত ছয়টি উপনিষদের অনুবাদ ও 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'-র দ্বিতীয় সংখ্যাটি সমালোচিত হয়েছে। 'উপনিষদঃ' গ্রন্থের সমালোচনাটি

উল্লেখযোগ্য—কারণ কিছুদিন থেকে চিঠি ও রচনায় উপনিষদের শ্লোক উদ্ধার করলেও, উপনিষদ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এই প্রথম লিখিত আকারে প্রকাশ পেল। সমালোচনার শুরুতেই তিনি লিখেছেন : 'আমরা সম্পাদকোচিত সর্ব্বজ্ঞতার ভাণ করিতে পারি না। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকারকৃত উপনিষদের টীকা ও বঙ্গানুবাদে কোন প্রকার ভ্রম বা ত্রুটি আছে কি না তাহা নির্ণয় করিতে আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত।' উপনিষদের শ্লোকগুলির অর্থ টীকার সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভব কি না তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন :

অর্থ স্পষ্ট হৌক্ বা না হৌক এই উপনিষৎগুলির মধ্যে যে একটি সরল উদারতা, গভীরতা, প্রশান্তি এবং আনন্দ আছে তাহা বাঙ্গলা অনুবাদেও প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সর্ব্বত্রই অনির্ব্বচনীয়কে বচনে প্রকাশ করিবার যে অসীম ব্যাকুলতা বিদ্যমান আছে তাহা এত সুগভীর যে, তাহাতে চাঞ্চল্য নাই। ইহাতে ঋষিরা জ্ঞানের এবং বাক্যের পরপারে ব্রহ্মকে যতদূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন এমন আর কোন ধর্ম্মে করে নাই, অথচ তাঁহাকে যত নিকটতম অন্তরতম আত্মীয়তম করিয়া অনুভব করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও বোধ করি অন্যত্র দুর্লভ। তাঁহারা একদিকে জ্ঞানের উচ্চতা অন্যদিকে আনন্দের গভীরতা উভয়ই সমানভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গলাদেশে শাক্ত বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরের নৈকট্য অনুভবকালে তাঁহার দূরত্বকে একেবারে ললাপ করিয়া দেয়, ভক্তিকে অন্ধভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিবার কালে জ্ঞানকে অবমানিত করে;—কিন্তু উপনিষদে এই উভয়ের অটল সামঞ্জস্য থাকাতে তাহার মহাসমুদ্রের ন্যায় এমন অগাধ গাম্ভীর্য্য। এই জন্যই উপনিষদে সাধকের আত্মা কলনাদিনী কূলপ্লাবিনী প্রমত্ততায় উচ্ছ্বসিত না হইয়া নির্ব্বাক্ আত্মসমাহিত ভূমানন্দে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে।[১১১]

এই আলোচনার পাদটীকায় কেনোপনিষদের 'কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ' শ্লোকটি ও তার তাৎপর্য উদ্ধার করে তিনি লিখেছেন :

"প্রৈতি" শব্দটির প্রতি আমরা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গলা ভাষায় এই শব্দটির অভাব আছে। যেখানে বেগপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইংরাজীতে impulse শব্দের ব্যবহার হয় আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গলায় সেই স্থলে "প্রৈতি" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।[১১২]

—এই পাদটীকা থেকেই রবীন্দ্রনাথকে চিনে নেওয়া যায়।

'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

এই পত্রিকায় আমরা এমন সকল প্রবন্ধ প্রত্যাশা করি যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস এবং বঙ্গভাষার পুরাবৃত্ত, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান রচনার সহায়তা করে। আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার এবং অপ্রচলিত পুরাতন শব্দের অর্থ বিচারও ইহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং বাঙ্গলা রূপকথা (Folk lore), প্রবচন (proverb) হরুঠাকুর রামবসু প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের গান, ছড়া (nursery-rhyme) প্রভৃতি সংগ্রহের প্রতিও ইহার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।[১১৩]

—'নিছনি' 'পহুঁ' প্রভৃতি শব্দের অর্থবিচার, রূপকথা ছড়া প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ আমরা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যাটিতেই তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' রচনার সঙ্গে অনেকগুলি ছড়া মুদ্রিত হয় ও পণ্ডিতসমাজে উৎসাহ সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। সমালোচনাটির পরবর্তী অংশে রজনীকান্ত গুপ্তের 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়' প্রবন্ধটির কঠোর নিন্দা করে তিনি লেখেন :

সাহিত্য পরিষদ সভার প্রতি আমাদের আন্তরিক মমতা আছে বলিয়া এবং তাহার নিকট হইতে আমরা অনেক প্রত্যাশা করি বলিয়াই সাধারণের সমক্ষে তাহার এরূপ অদ্ভুত বাল্যলীলা আমাদের নিকট নিরতিশয় লজ্জা ও কষ্টের কারণ হয়।[১১৪]

পৌষ মাসের বাকি দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ কী করছিলেন, সে-সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই। মাঘোৎসবের জন্য তিনি একটি মাত্র গান লেখেন : 'নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়' [দ্র গীত ১।১৬১]। কিন্তু এই উৎসব উপলক্ষেই তাঁর ব্যস্ততার কথা জানিয়েছেন 12 Jan [শনি ২৯ পৌষ]। বাল্যবন্ধু অক্ষয়কুমার

মিত্রকে : 'কবে দেখা করিতে আসিবে একটা দিন এবং সময় স্থির করিয়া আমাকে লিখিয়া পাঠাইবে। ··· এগারই মাঘের উৎসব উপলক্ষ্যে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি—এই কারণে সংক্ষেপে সারিলাম।'[১১৫] পরের দিনই অক্ষয়কুমার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, ইন্দিরা দেবীকে 14 Jan [সোম ১ মাঘ] লিখেছেন : 'কাল অ···এসেছিল, তার সঙ্গে শিষ্টালাপ করাটাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছিল।'[১১৬]

২৯ পৌষ মহর্ষির ক্যাশবহির একটি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির আর একটি বিবরণ পাওয়া যায় : 'ব° থ্যাকার এণ্ড কোম্পানী/দং শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির জন্য বই ক্রয় করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় আনেন তাহার মূল্য শোধ···৩৪৷৷০'। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ৪ কার্তিক [19 Oct 1888] শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়েই 'মহর্ষিদেব তাঁহার নিজের ব্যবহৃত সংস্কৃত, ইংরাজি, বাঙ্গলা বহুসংখ্যক পুস্তক ও পুস্তকাধার আশ্রমে দান' করেছিলেন—সেখানকার পুস্তক-সংগ্রহে নূতন সংযোজনের হিসাব এখানে পাওয়া যায়। এইভাবেই ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার পুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

দু'মাস নিজ দায়িত্বে সাধনা সম্পাদনা করার পরই রবীন্দ্রনাথ ক্লান্ত বোধ করছেন। 14 Jan [সোম ১ মাঘ] ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন: 'এতদিন শীত ছিল, কাজের উৎসাহ ছিল—মনে করতুম চিরজীবন সাধনার এডিটরি করে কাটিয়ে দেব। এখন একটু গরম হাওয়া পড়বা মাত্রই মনে হচ্ছে, এডিটরি করার চেয়ে আমি সেই-যে কবি ছিলুম সে ছিলুম ভালো।'[১১৭] এই গুঞ্জনটুকু দিন-কুড়ির মধ্যেই আর্তনাদে পরিণত হয়েছে : 'বছরের মধ্যে ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর-কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলে ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়—কারণ, সম্বৎসর পাগলামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বৎসর Sanity বজায় রেখে চলাও আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য।'[১১৮] Sanity বেশি দিন তিনি বজায় রাখতে পারেননি, মাস-আষ্টেক পরেই তিনি সম্পাদকত্ব ও সঙ্গে সঙ্গে সাধনা-র অপমৃত্যু ঘটান।

৭ মাঘ [রবি 20 Jan] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। কার্যবিবরণীতে লিখিত হয়েছে : 'পরিষদের বর্তমান অবস্থায় সাহিত্যসমালোচনার ভার গ্রহণ কর্তব্য কি না এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়গণের পত্র পঠিত হইল। ···শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় সভ্য মহোদয়, সম্প্রতি সমালোচনার প্রয়োজন নাই, অথবা সংক্ষিপ্ত সমালোচনাতেই ক্ষান্ত থাকা কর্তব্য, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ···বাঙ্গলার প্রধান গ্রন্থকারগণের অধিকাংশই পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত, এরূপ স্থলে যথারীতি প্রকৃত সমালোচনা হইবে কি না, তাহাও প্রসঙ্গ ক্রমে উঠিল।'[১১৯] সমালোচনা সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম স্থির করে পরবর্তী অধিবেশনের আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে সভ্যদের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। পরের অধিবেশন ১৩ই ফাল্গুনে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন না। সেই সভায় পরিষদের পত্রিকায় গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বর্তমান অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুর-পরিবারের পাঁচজনকে পরিষদের সদস্য করা হয়।

১১ মাঘ [বৃহ 24 Jan] মহর্ষিভবনে পঞ্চষষ্টিতম ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি মাত্র ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন :

খম্ভার—ঝাঁপতাল। নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময় দ্র তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৯১-৯২; গীত ১।১৬১; স্বর ২২। মূল গান : জ্ঞান রঙ্গ ধ্যান রঙ্গ রঙ্গ ঔর বিজ্ঞান দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩।৪৮।

শিক্ষিত তরুণ বাঙালির যে অংশটি তখন রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুরাগী, পরবর্তীকালের বিখ্যাত গল্পকার-ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় [1873-1932] তাঁদের অন্যতম। উত্তরপ্রদেশের দিলদারনগরের বাসিন্দা প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকে প্রথম পত্রটি লেখেন 'ভাই রবি' সম্বোধন করে 22 Jun 1894 [শুক্র ৯ আষাঢ়] তারিখে। ২১ বছরের তরুণ পত্রে নাম-ঠিকানা দেননি, অথচ একটি ফটো চেয়েছেন, সাধনা-র প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সনেট প্রকাশিত হলে ফটো পাঠাতে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি বোঝা যাবে, তখন তিনি নাম-ঠিকানা পাঠাবেন—এই হল পত্রের বিষয়বস্তু। দু'দিন পরে ১১ আষাঢ় আর একটি পত্রে জানান, তাঁর বন্ধু অতুলচন্দ্র ঘোষ ওরফে বীরেশ্বর গোস্বামীর লেখা মানসী-র একটি সমালোচনা *The National Magazine*-এর May 1894-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর তৃতীয় পত্র 'অকালকুষ্মাণ্ড দেবশর্ম্মা'-স্বাক্ষরে, তারিখ 'কোন পাঁজির মতে পৌষ সংক্রান্তি কোন কোনটার মতে ১ মাঘ ১৩০১।' ১১ মাঘের পত্রে প্রভাতকুমার আত্মপরিচয় দিলেন, লিখলেন : "আজ বাঁকীপুর হইতে আমার লেখক বন্ধু সাধনা পাঠাইয়া দিয়াছেন। ···সাধনা পাইয়া অবধি আমার মস্তিষ্ক বড় উত্তেজিত হইয়া রহিয়াছে। ···যাহা আশা করিতেও সাহস করি নাই তাহাই হইতে চলিল। আমি জীবনে কখনও এত সম্মানিত জ্ঞান করি নাই।···আপনি আমার অকিঞ্চিৎকর কবিতাতে আপনার স্বর্ণলেখনী স্পর্শ করাইয়াছেন, এ আহ্লাদ আমার রাখিবার স্থান নাই।'[১২০] রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাধনা-য় লেখকদের নাম মুদ্রিত হত না বলে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, কিন্তু সম্ভবত পৌষ-সংখ্যায় মুদ্রিত 'গার্গী' [পৃ ১৯৩] সনেটটি প্রভাতকুমারের রচনা *—হয়তো সেই কারণেই তিনি এত উত্তেজিত। এই পত্রেও তিনি 'ছবি ও হস্তাক্ষরের জন্য' প্রার্থনা জানিয়েছেন। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির অতি সামান্য অংশই সংগৃহীত হয়েছে, প্রভাতকুমারের পত্র থেকেই তাঁর পত্র লেখার তারিখ ও বিষয়বস্তু অনুমান করে নিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই 'ভক্তে'র লেখা প্রায় প্রত্যেকটি পত্র রক্ষা করেছেন, তাঁকে স্মরণ করে যে কবিতা লিখেছেন সেটির নাম 'ভক্তের প্রতি' [২১ আষাঢ় ১৩০৩; দ্র চৈতালি ৫।৪৪-৪৫] :

> সরল সরস স্নিগ্ধ তরুণ হৃদয়,
> কী গুণে তোমারে আমি করিয়াছি জয়
> তাই ভাবি মনে।···
>   তারুণ্য তোমার
> আপন লাবণ্যখানি লয়ে উপহার
> পরায় আপন কণ্ঠে, সাজায় আমারে
> আপন মনের মতো দেবতা-আকারে
> ভক্তির উন্নত লোকে প্রতিষ্ঠিত করি।

এই ভক্তিতে তিনি সংকোচ বোধ করেন এ কথা লিখলেও রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করতে পারেননি, পত্রগুলি যে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন সম্ভবত এটিই তার কারণ।

১৭ মাঘ [বুধ 30 Jan] কলকাতার ঠিকানায় প্রভাতকুমার ছবি ও চিঠি চেয়ে আর একটি পত্র দেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে। সম্ভবত 2 Feb [শনি ২০ মাঘ] তিনি পত্রটির উত্তর দেন, 4 Feb [২২ মাঘ, প্রভাতকুমারের ব্যবহৃত পঞ্জিকা-মতে ২৩শে] চিঠিটি পেয়ে প্রভাতকুমার যা লেখেন তাতেই বক্তব্যটি ধরা যায় : 'আজ—৪ ফেব্রুয়ারি—আমার দ্বাবিংশতম জন্মদিন। আজ আপনার পত্র পাইলাম। ···আপনি সাধনার সম্পাদক হইয়াছেন বলিয়া আপনার সময়াভাব আপনাকে সাধনার সম্পাদক হইবার জন্য কে মাথার দিব্য দিয়াছিল?···ছবির কথা, চেষ্টা ফেষ্টা শুনিব না। ছবি দিতেই হইবে, না থাকে, নূতন ছাপাইয়া দিতে হইবে। আপনি কলিকাতায় আসিবার পনের দিন পরে আমি ছবি চাই-ই চাই।'[১২১] এই অনুরাগের অত্যাচার রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন, সম্ভবত কলকাতা থেকে ছবি আনিয়ে ভক্তকে পাঠান। ২৭ মাঘ [শনি 9 Feb] ছবি পেয়ে প্রভাতকুমার লিখছেন : 'ছবিতে একটা বিষয়ে বঞ্চিত হইলাম। তাহাতে আপনার স্নেহময় দৃষ্টি পাইলাম না।···আপনি ত আমার পানে চাহিয়া নাই, অন্যদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমার পানে চাহিয়া রহিয়াছেন, এমন ছবি, যদি কলিকাতায় ছাপাও পাইতাম, তাহা হইলে এ বিলাতী ছবি ফেলিয়া তাহাই লইতাম। যাহা হউক, একদিন আপনার স্নেহদৃষ্টি আমি পাইবই পাইব। সেই দিনের জন্য আশা করিয়া থাকিলাম।'[১২২]

আগের চিঠিতে প্রভাতকুমার একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন, সেটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। তিনি লিখছেন : 'গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি একটু কাযের জন্য সাহিত্য আফিসে গিয়াছিলাম। ···কথা প্রসঙ্গে সুরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, আর রবীন্দ্রবাবু আপনার সাহিত্যে লেখেন না কেন?" তর্ক বৈচিত্র্য, আপনার পত্র ও সাহিত্য সম্পাদকের ফুটনোট, এসব যেন জানিই না, এইরূপ ভাণ করিলাম। সুরেশবাবু বলিলেন—কি জানেন, রবীন্দ্রবাবু একে ত আপনার সাধনা লইয়াই ব্যস্ত। আর আমিও সাহস করিয়া তাঁহার নিকট চাহি নাই। কারণ, যদি না দেন, তবে মনে হইবে সেই 'ঝগড়ার জন্য' (ঠিক এই কথাটা —ঝগড়া—ব্যবহার করিয়াছিলেন) দিলেন না। যাহা হউক, তিনি সে সব কথা মনেও করেন না—খুব উদার লোক—সেদিন দেখা হইয়াছিল,—এই, একখানা পত্রও লিখিয়াছেন, এখনও জবাব দেওয়াও হয় নাই,"—এই বলিয়া পত্রখানা ইতস্ততঃ খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে পাইলেন না। যাহা হউক, আপনি যেন আর সাহিত্যে লিখিবেন না, কখনও না।'[১২৩] আমরা জানি, এই সময়ে তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল, পত্রালাপও যে চলত তার প্রমাণ আমরা আগেই দিয়েছি। সুতরাং মনে হয়, এক্ষেত্রে প্রভাতকুমার অনেকটা স্ব-রচিত পূর্বধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। সরলস্বভাব প্রীতিমুগ্ধ এই যুবক নিশ্চয়ই অসদুদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথকে উত্তেজিত করার জন্য কথাগুলি লেখেননি, কিন্তু আমাদের ধারণা, এই ধরনের কথা-চালাচালির ফলেই রবীন্দ্রনাথ ও সুরেশচন্দ্রের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল।

২৭ মাঘের পত্রে প্রভাতকুমার লিখেছেন : 'আপনি কি আমার লেখকবন্ধুর রাজা ও রানীর সমালোচনা হিতবাদীতে দেখিয়াছিলেন? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে পাঠাইয়া দিব।' অতুলচন্দ্র ঘোষ ওরফে বীরেশ্বর গোস্বামীর লেখা এই সমালোচনাটি পত্রিকাটির সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়েছে। এঁর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ ছিল, কিন্তু পত্রগুলি এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রভাতকুমারের চিঠি এইসব বিলুপ্ত তথ্যের জন্য খুবই মূল্যবান।

সাধনা, মাঘ ১৩০১ [৪/৩] :

১৯৫-২১৩ 'নিশীথে' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৯।২৫৪-৬৭

২১৩-১৫ 'সন্ধ্যা' দ্র চিত্রা ৪।৩০-৩২

২২০-২৮ 'সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ' দ্র পঞ্চভূত ২।৬২৬-৩১

২৬৩-৭৩ কৃষ্ণচরিত্র' [প্রথমাংশ] দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯।৪৪৬—৫১

২৮৭-৯২ 'সমালোচনা'

২৮৭-৮৯ হাসি ও খেলা। যোগীন্দ্রনাথ সরকার; ২৮৯-৯১ সাধনসপ্তকম্;
২৯১-৯২ নীতিশতক বা সরল পদ্যানুবাদসহ চাণক্যশ্লোক। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

'নিশীথে' গল্পটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভালো লাগেনি। তিনি লিখেছেন : 'গল্পটির আখ্যানকৌশল অকিঞ্চিৎকর; কেবল ভাষার সৌন্দর্য্যে ও বর্ণনার ঐশ্বর্য্যে গল্পটির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়।'[১২৪] কিন্তু এই ভাষার সৌন্দর্য বা বর্ণনার ঐশ্বর্য প্রতাপ নারায়ণ বিশ্বাসকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। কারণ তিনি গল্পটির মধ্যে মার্কিন কবি ও গল্পকার Edgar Allan Poe [1809-49]-এর 'Leigia' [ও কিছু পরিমাণে 'Morella' ও 'Eleanora'] গল্পের 'ঘনিষ্ঠ এবং অক্ষম অনুকরণ' লক্ষ্য করেছেন।[১২৫] গল্পগুলির থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের ভাষার সঙ্গে 'নিশীথে'র ভাষার এমন স্থূল সাদৃশ্য তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে দেখিয়েছেন যে, তাঁর যুক্তি অস্বীকার করা শক্ত। অনুরূপভাবে তিনি 'সম্পত্তিসমর্পণ' [পৌষ ১২৯৮] গল্পের মধ্যে Poe-এর 'The Cask of Amontillado' ও 'The Tell-Tale Heart' গল্পের, 'জীবিত ও মৃত' [শ্রাবণ ১২৯৯], ও 'মহামায়া' [ফাল্গুন ১২৯৯] গল্পের মধ্যে তাঁর 'Premature Burial' গল্পের এবং 'ক্ষুধিত পাষাণ' [শ্রাবণ ১৩০২] গল্পের মধ্যে Poe-এর 'A Tale of the Ragged Mountains' ও Theophile Gautier-এর 'Mummy's Foot' গল্পের এমন সাদৃশ্য দেখিয়েছেন যে মনে হয়, বিদেশী গল্পগুলি সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি লেখা হয়েছে। প্রতাপবাবু অবশ্য এই সাদৃশ্য ও প্রভাব দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি, 'জীবিত ও মৃত' 'ক্ষুধিত পাষাণ' ও 'গুপ্তধন' গল্পের উৎস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতিগুলিকে তিনি 'গল্পগুলির প্রকৃত উৎসের দিকে যাতে পাঠকের মনোযোগ যেতে না পারে সেজন্যে···নানাধরনের অপ্রাসঙ্গিক এবং বিভ্রান্তিকর মন্তব্য' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এরূপ প্রতারণামূলক আচরণের কারণ কী? তরুণ যদুনাথ সরকার তাঁর ছোটগল্পকে কবিতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে রায় দিলেও, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প ছাড়া অন্যগুলির ক্ষেত্রে সমকালীন পাঠক যে খুব-একটা উচ্ছাস প্রকাশ করেছিলেন এমন দৃষ্টান্ত অন্তত লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়নি। চন্দ্রনাথ বসু বা সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মন্তব্যকে যদি পাঠকসমাজের একাংশের মনোভাব বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের যে-গল্পগুলির প্রশংসা করেছিলেন, উক্ত গল্পগুলি তার মধ্যে পড়ে না [সুরেশচন্দ্র অবশ্য 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন]। তাছাড়া পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ত্রুটি-সন্ধানের যে গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তার মধ্যে অন্তত অনুরূপ অভিযোগ শোনা যায়নি। অথচ সমকালীন বাঙালির কাছে Poe বা Gautier অপঠিত ছিলেন, এমন কথা কোনোমতেই বলা চলে না। আশুতোষ চৌধুরী ব্যারিস্টারি পাশ

করে বিলেত থেকে ফিরে এসে ভারতী ও বালক-এ 'কাব্যজগৎ' নামে যে প্রবন্ধমালা লেখেন, তার অন্যতম 'পোএ' কার্তিক ১২৯৩ [পৃ ৪০৭-১২]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। আর ইন্দিরা দেবী তো স্পষ্ট করেই লিখেছেন : 'এডগার এলেন পো'র সঙ্গে রবিকাকাই আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর বইয়ের একটি মোটা সংস্করণের চেহারা এখনো পরিষ্কার মনে পড়ে। তাঁর গদ্যপদ্যের বিশেষত্ব এখনো মনে লেগে রয়েছে। তাঁর গল্পের মধ্যে কী-একটা রহস্যময়তা ছিল।'[১২৬] এর পর তিনি Poe-এর 'The Raven' কবিতা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যার থেকে রবীন্দ্রনাথও উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন ছন্দের আলোচনায়। আর Theophile Gautier-এর *Mademoiselle de Maupin* প্রিয়নাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই পড়েছেন তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ মহলের বাইরেও অনেকে এইসব বই পড়েছেন, এমন ভাবা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ প্রতারণামূলক মিথ্যাচারণ ইত্যাদি ধরা পড়ার জন্য 1964 পর্যন্ত সময় লাগল, এটি সত্যই বাঙালি পাঠকের অগৌরবের পরিচয় বহন করে, বিশেষত যে বাঙালি জাতির একটা বড়ো অংশ দীর্ঘকাল ধরে নানাসূত্রে রবীন্দ্র-বিদূষণে কখনো আলস্য দেখায়নি!

কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। প্রতিভা প্রকৃতিদত্ত হলেও পরিবেশ, দেখাশোনার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও গ্রন্থজগতে ব্যাপক পরিভ্রমণের ফলেই তা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা এর আগে বহুবার রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনার পরিধি পরিমাপের মতো উপকরণের অভাব নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছি। বর্তমান প্রসঙ্গেও অনুরূপ আক্ষেপের কারণ আছে। Poe-এর লেখা যে রবীন্দ্রনাথ মন দিয়ে পড়েছিলেন সে-সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই, ইন্দিরা দেবীর স্মৃতিচারণ তার অন্যতম প্রমাণ। সুতরাং গল্পরচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অল্পবিস্তর রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাওয়া গেলে আশ্চর্য বা উত্তেজিত হওয়ার কারণ দেখি না। বারবার দেখা গেছে, বাস্তব বা গ্রন্থপাঠলব্ধ অভিজ্ঞতা প্রায় সবসময়েই রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উশ্‌কে দেওয়াতেই পর্যবসিত, তার পরে সেই কল্পনা তাঁর প্রকৃতি অনুসারে নিজের পথ রচনা করে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। 'পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি' ও 'ছুটি' গল্পের ক্ষেত্রে ছিন্নপত্রাবলী-র সাক্ষ্য বর্তমান বলে কল্পনার বিস্তারটি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণহীন গল্পগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখা একটু অতিরেকের পর্যায়ে পড়ে। 'জীবিত ও মৃত' গল্পের ভাবউৎস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেই কারণেই তাকে আমরা সন্দেহ করি না। এ রকম অনেক উদ্ভট ভাবনা যে রবীন্দ্রনাথের মনে জাগত তার একটি দৃষ্টান্ত আছে বিলাতযাত্রার পথে জাহাজ থেকে স্ত্রীকে লেখা একটি পত্রের মধ্যে [দ্র চিঠিপত্র ১।১১, পত্র ২]। এক্ষেত্রেও বিশেষ ভাবনাটির প্রতিফলন Premature Burial-এর মধ্যে দেখার ফলে 'জীবিত ও মৃত' গল্পটির কাঠামোয় রূপ নিয়েছে, এমন ব্যাখ্যা অযৌক্তিক নয়। আর 'মহামায়া' গল্পের সঙ্গে Poe-এর Victorine গল্পের যে সাদৃশ্য শ্রীবিশ্বাস দেখিয়েছেন, সেটি অনেকটাই কষ্টকল্পিত—বস্তুত দু'একটি তুচ্ছ মিল ছাড়া গল্পদু'টি সর্বথাই আলাদা।

তুলনামূলকভাবে Leigia-র সঙ্গে 'নিশীথে'র সাদৃশ্য গভীরতর। কিন্তু তার জন্যও শ্রীবিশ্বাসের এত উত্তেজিত হওয়ার কারণ ছিল না। তাঁর অনুসন্ধানের উৎস ড সুখময় মুখোপাধ্যায় এ-সম্পর্কে লিখেছেন : 'এই গল্পটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ তার মূল ভাবটুকু নিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়ে নিজের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী পরিবর্তন সাধন করে 'নিশীথে' গল্পটি রচনা করেছেন বলে মনে হয়।···পো এবং রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টামানসের মূলধর্মের

মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তাই 'নিশীথে' 'লিজিয়া'র মত রোমাঞ্চকর গল্প হয়নি, তার মধ্যে কবি-কল্পনার ইন্দ্রজাল ও বর্ণাঢ্য ভাবঘন পরিবেশই প্রধান হয়ে উঠেছে।' এর আগেই তিনি লিখেছেন : 'রসের দিক দিয়েই দুই গল্পের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। 'লিজিয়া' গল্পের রস তীব্র ও ভয়ঙ্কর, কিন্তু 'নিশীথে'র রস মদির ও মধুর। তাছাড়া 'নিশীথে' গল্পের মূল রস অতিপ্রাকৃত হলেও তার একটি বাস্তব setting আছে, কিন্তু 'লিজিয়া'র তা নেই, তার পরিবেশটি অবিমিশ্রভাবে অলৌকিক।'[১২৭] এইটিই যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি, সব-কিছুকেই সন্দেহ করে উত্তেজিত হওয়া মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর!

'সন্ধ্যা' [ক্ষান্ত হও, ধীরে কথা কও। ওরে মন,] কবিতাটি প্রায় এক বৎসর আগে ৯ ফাল্গুন ১৩০০ [20 Feb 1894] তারিখে পতিসরে লেখা হয়েছিল।

পঞ্চভূত-এর অন্তর্গত 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'কৌতুকহাস্য' রচনাটির সূত্র ধরে আলোচিত। আলোচনায় হিন্দু সৌন্দর্যবোধের মূল বৈশিষ্ট্য খুব সূক্ষ্মভাবে উদঘাটিত হয়েছে বটে, কিন্তু বিপরীতমুখী চিন্তা-সংঘর্ষে উদ্ভূত যে সজীবতা এই প্রবন্ধমালার প্রাণ তা রচনাটিতে অনুপস্থিত। নারী সদস্যদ্বয়ের অনুপস্থিতি ও সভাপতির সম্পূর্ণ নীরবতাও এর একটা কারণ। অবশ্য নারীদেহের অংশবিশেষের সুউচ্চতা ও বর্তুলতা ইত্যাদি নিয়ে পুরুষসদস্যেরা এখানে যত সহজে মত প্রকাশ করতে পেরেছেন, স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির উপস্থিতিতে তা সম্ভব হত বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সেই কারণেই তাঁদের উপস্থিত করেননি।

এখানে আলোচনা-সূত্রে সমীর বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে সেটি উদ্ধারযোগ্য : 'বঙ্কিম কৃষ্ণকে পূজা করিবার এবং কৃষ্ণপূজা প্রচার করিবার পূর্বে কৃষ্ণকে নির্মল এবং সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন-কি, কৃষ্ণের চরিত্রে অনৈসর্গিক যাহা-কিছু ছিল তাহাও তিনি বর্জন করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার নিজের উচ্চতম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।···তিনি পূজা-বিতরণের পূর্বে প্রাণপণ চেষ্টায় দেবতাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও হাতের কাছে যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই নমোনম করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই।'

এই মন্তব্য বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। প্রবন্ধটি অবশ্য এই সংখ্যায় শেষ হয় নি, ইতিহাসের যে ভিত্তির উপরে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ এখানে তারই প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রথম ও শেষ অনুচ্ছেদ দু'টি গ্রন্থে বর্জিত। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই লিখেছেন : 'ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মনে একটা সচেষ্টতা এবং স্বাধীনতার উদ্যম দেখা দিয়াছে। সেই উদ্যমটি একবার জাগ্রত হইয়া উঠিলে তাহাকে কোন একটিমাত্র বিষয়ে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না;···আমাদের এই নূতন জীবন-চাঞ্চল্য, সমাজতন্ত্র, সম্রাজ্যতন্ত্র, ধর্ম্মতন্ত্র, সর্ব্বত্রই আঘাত বিস্তার করিতেছে।'[১২৮] বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'কে রবীন্দ্রনাথ এই নূতন জীবন-চাঞ্চল্যের অন্যতম ফসল বলে মনে করেছেন : 'আমাদের মতে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান নায়ক, স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমত বঙ্কিম বুঝাইয়াছেন, জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না, সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের

ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বিতর্কে ও অন্যান্য সামাজিক প্রবন্ধে যে-কথাটি বারবার বোঝাতে চাইছিলেন, কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে তারই প্রতিফলন দেখে গ্রন্থটির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমের 'স্বাধীন বুদ্ধি' ও 'সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি'র প্রশংসা করলেও মহাভারতের অংশকে বাদ দিয়ে ও মূল অংশকে উদ্ধার করে প্রকৃত ঐতিহাসিক কৃষ্ণকে আবিষ্কার করার জন্য বঙ্কিম যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে তা গ্রহণ করতে পারেন নি। সেইজন্য বিবিধ বিচার-বিতর্কের পর প্রথম প্রবন্ধের শেষে মন্তব্য করেছেন : 'সুতরাং এখনো বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র ইতিহাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই চেষ্টাই তাঁহার প্রধান গৌরব। কেবল চেষ্টা নহে। তিনি যে প্রণালীতে কাজ করিয়াছেন এবং মনের যে ভাবটি রক্ষা করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালী পাঠকদিগের শিক্ষাবিধানের পক্ষে মহামূল্য।'[১২৯] ফাল্গুন-সংখ্যায় প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাঁর আলোচ্য মহাভারতের তথাকথিত মূল অংশ থেকে বঙ্কিম-কর্তৃক পুনর্গঠিত কৃষ্ণচরিত্রের গুণাগুণ। এই অংশটিতেই বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা-পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার লক্ষ্য হয়েছে। তিনি লিখেছেন : 'তিনি [বঙ্কিমচন্দ্র] যে-কৃষ্ণের অন্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন সে-কৃষ্ণ তাঁহার নিজের মনের আকাঙ্ক্ষাজাত। সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্যক অনুশীলনে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত একটি আদর্শ তিনি ব্যাকুলচিত্তে সন্ধান করিতেছিলেন,—তাঁহার ধর্মতত্ত্বে যাহাকে তত্ত্বভাবে তিনি পাইয়াছিলেন ইতিহাসে তাহাকেই সজীব সশরীরভাবে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিঃসন্দেহ তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল। মনের সে-অবস্থায় অন্য কোনো কবির আদর্শকে অবিকলভাবে উদ্ধার করা মনুষ্যের পক্ষে সহজ নহে।' রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনাকে ড অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য 'মৃত বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রের বিরোধ'[১৩০] আখ্যা দিয়েছেন। 'সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েকটি মাস অতিবাহিত হতে না হতেই···দেশবাসীর শোক দূরীভূত হবার পূর্বেই বঙ্কিমের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই যে আক্রমণ, তাকে নিরতিশয় নির্মম ও নিষ্ঠুর আঘাত' বলে ড ভট্টাচার্যের মনে হয়েছে। বঙ্কিমের মৃত্যুর এতকাল পরে তাঁর মনে এতে যদি আঘাত লাগে তো কারো কিছু করবার নেই, কিন্তু সমালোচনা মাত্রই 'বিরোধ' নয় ও কোনো লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থের সমালোচনা নিষিদ্ধ হলে তো অনেক সমালোচকই বেকার হয়ে পড়বেন!

['আবদারের আইন' প্রবন্ধটি সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন : 'প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই এবং সাধনায় উহা স্বাক্ষরিত নহে। তবে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি তাঁহার রচিত বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন।'[১৩১] বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের 'সাধনা' এখন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহভুক্ত। তার একটি কপিতে এই রচনাটি ও অন্য অনেক রবীন্দ্র-রচনার শিরোনামের পাশে লাল পেনসিলের টিক্-চিহ্ন থাকলেও চিহ্নগুলি রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন কিনা তার প্রমাণাভাব ও আরও অনেকগুলি সম্ভাব্য রবীন্দ্র-রচনা অচিহ্নিত থেকে গেছে দেখে চিহ্নটিকে খুব নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। তাছাড়া ভাষার বিচারে ও বিষয়ের বিন্যাস-রীতিতেও প্রবন্ধটি রবীন্দ্ররচনার বিশেষত্ব-বর্জিত। আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ government শব্দটিকে বাংলায় লেখবার সময়ে 'গবর্মেন্ট'-রূপে লিখতেন—বর্তমান প্রবন্ধে শব্দটিকে আদ্যন্ত 'গবর্ণমেন্ট' বানানে পাওয়া যায়। রচনাটি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নয়, এটিকে তার একটি গৌণ প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি।]

'সমালোচনা'গুলি স্বাক্ষরিত নয়, কিন্তু রচনাগুণে এগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলেই মনে হয়। এবারে তিনটি গ্রন্থ সমালোচিত হয়েছে, তার মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের [১২৭৩-১৩৪৪] 'হাসি ও খেলা'-র সমালোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুদের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে। আক্ষেপ করেছেন, আমরা তার কিছু কিছু আগে উদ্ধৃত করেছি। এখানেও তিনি লিখেছেন : 'ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই; তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই; তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয় না।···শিক্ষা দিতে হইলে শিশুদের হৃদয় আকর্ষণ করা বিশেষ আবশ্যক; তাহাদের স্বাভাবিক কল্পনা শক্তি এবং কৌতূহল প্রবৃত্তির চরিতার্থসাধন করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে হইবে; বর্ণমালা প্রভৃতি চিহ্নগুলিকে [যদ্দৃষ্টং] ছবির দ্বারা সজীব এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে ভাল ভাল চিত্রের দ্বারা মনের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ, এক সঙ্গে তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধ, কল্পনা শক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন সাধন করিতে হইবে। সেইরূপ করা হয় না বলিয়াই অধ্যাপনার জন্য শিশুদিগকে বিভীষিকার হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। বালকদিগের অনেক বালাই আছে; সবচেয়ে প্রধান বালাই পাঠশালা।'[১৩২] শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এই বইখানি শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বালকদের হস্তে পড়িয়া অল্পকালের মধ্যে একখানি হাসি ও খেলার যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে গ্রন্থপ্রণয়নকর্ত্তা এককালে শোক ও আনন্দ অনুভব করিতেন। এরূপ গ্রন্থের পক্ষে, শিশু হস্তের অবিরল ব্যবহারে মলিন ও বিবর্ণ মলাট এবং বিচ্ছিন্নপ্রায় পত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল 'সমালোচনা।'[১৩৩] কন্যা রেণুকার বয়স তখন তিন বৎসর, সম্ভবত তার হাতেই বইটি 'সমালোচিত' হয়েছিল! বছরখানেক পরে রবীন্দ্রনাথের 'নদী' [২২ মাঘ ১৩০২] বইটির অনুরূপ সমালোচনা করেছিলেন 'দাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। যোগীন্দ্রনাথ সরকার পরে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন।

'সাধন সপ্তকম্' ও 'নীতিশতক' দুটি গ্রন্থই সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা পদ্যানুবাদ। এই ধরনের অনুবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'উপদেশ অথবা নীতিকথা,···সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্য্যে তাহা পাঠকের চিত্তে সহজে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং সেই শব্দ ও ছন্দের ঔদার্য্য শুষ্ক বিষয়ের প্রতিও সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গলায় তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। বাঙ্গলা উচ্চারণে যুক্ত অক্ষরের ঝঙ্কার, হ্রস্ব দীর্ঘস্বরের তরঙ্গলীলা, এবং বাঙ্গলা পদে ঘনসন্নিবিষ্ট বিশেষণবিন্যাসের প্রথা না থাকাতে সংস্কৃত কাব্য বাঙ্গলা অনুবাদে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর শুনিতে হয়।'[১৩৪] সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় প্রকাশ করেছেন।

আমরা আগেই বলেছি, ১৭ মাঘ [বুধ 30 Jan] নাগাদ রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গিয়েছিলেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের কথা আগে বলা হয়েছে, সম্ভবত এই সময়ে তাঁকে শিলাইদহের সেরেস্তার কাজে নিযুক্ত করা হয়। 11 Feb [সোম ২৯ মাঘ]*[১] ইন্দিরা দেবীকে এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন : 'এ পারে সন্ধের সময় আমার একটি বেড়াবার সঙ্গী পাওয়া গেছে। লোকটির নাম ঠা[কুরদাস মুখোপাধ্যায়];*[২]

বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী, চিন্তাশীল, স্পষ্টবক্তা এবং জমিদারি কাজকর্মে বহুদর্শী।…রোজ বেড়াবার সময় এঁর সঙ্গে আমার নানা ভাবের আলোচনা হয়ে থাকে। আমি যে কী ভাবে জগৎসংসারকে দেখে থাকি, সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে, এবং সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই যে আমি যথার্থ ধর্ম বলে জ্ঞান এবং অনুভব করি এবং আমার এই অন্তরপ্রকৃতিটি না বুঝলে যে আমার অধিকাংশ কবিতার রসাস্বাদন, এমন-কি, অর্থগ্রহণ করা যায় না—এই কথাটা আমি তাঁকে বোঝাচ্ছিলুম। দেখলুম তিনি বেশ বুঝলেন—কেবল বোঝা নয়, বেশ মশ্‌গুল্ হয়ে গেলেন।'[১৩৫] পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মবোধ ও জীবনদর্শনেরও একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে : 'আমার যে ধর্ম এটা নিত্যধর্ম, এর উপাসনা নিত্য-উপাসনা। কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগ-মাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘেঁষে পরম নির্ভয়ে গভীর আরামে পড়ে ছিল—সেটা দেখে আমার মনে যে-একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই-সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা মাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি। এ ছাড়া অন্যান্য যা-কিছু dogma আছে, যা আমি কিছুই জানি নে এবং বুঝি নে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখি নে, তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হই নে। যেটুকু আমি positively জানতে পারছি সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তাতেই আমাকে পরিপূর্ণ সুখ দেয়। তার সঙ্গে মিথ্যা অনুমান বিচার মিশিয়ে তাকে একটা system-এ পরিণত করতে গিয়ে তার ভিতরকার প্রত্যক্ষ সত্যটিকেও সংশয়াপন্ন করে তোলা হয়।' এই জীবনদৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে খুব একটা সরে আসেননি।

ফাল্গুন মাসের প্রথম কয়েকটি দিন তিনি সাধনা-র জন্য লেখায় ব্যস্ত। 17 Feb [রবি ৬ ফাল্গুন] তিনি লিখছেন : 'আজকাল প্রতিদিন 'সাধনা' লেখার চিন্তায় মনটিকে সেরকম নিশ্চেষ্ট করে তুলে সর্বতোভাবে এই প্রকাণ্ড প্রকৃতির মুখোমুখি করে দাঁড় করাবার অবসর পাই নে—নিজের ভিতরে অহরহ একটা না-একটা-কিছু প্রক্রিয়া চলছে, বাইরে যে কিছু আছে এ কথা ভুলে থাকতে হয়।'[১৩৬] পরের দিন 18 Feb [সোম ৭ ফাল্গুন] লিখলেন : 'আজকের দিনটি এমনি নিস্তব্ধ এবং সুন্দর যে, পরিপূর্ণ আলস্যরসে নিমগ্ন হবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে। কিন্তু সাধনার জন্যে 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' এখনো বাকি আছে। দুখানা অপাঠ্য বই পড়ে তার উপরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে। নিতান্ত বাজে কাজ—এ রকম কাজ এমন দিনে করা অন্যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস-বশত ফাল্গুনের এই প্রশান্ত মধ্যাহ্নে এই নির্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরে এই নিভৃত বোটের মধ্যে ব'সে সম্মুখে সোনার রৌদ্র সুনীল আকাশ এবং ধূসর বালুর চর নিয়ে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু-কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ান-গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। সে বইও কেউ পড়বে না, সে সমালোচনাও কেউ পড়বে না, মাঝের থেকে আজকের এই দুর্লভ দিনটা নষ্ট হবে।'[১৩৭] 'দুখানা অপাঠ্য বই'-এর একটির নাম রবীন্দ্রনাথই করেছেন, আর একটি কুমারকৃষ্ণ মিত্র-প্রণীত 'মনোরমা'। সময় ও মনের শান্তি নষ্ট করে এই কাজ যে রবীন্দ্রনাথকে করতে হত, তার লিখিত প্রমাণ মাত্র এই চিঠিতেই আছে। কিন্তু এরূপ 'পাথুরে' প্রমাণ ছাড়াও জোর করেই বলা যায়, সাধনা-র অন্যান্য 'গ্রন্থ সমালোচনা'গুলি রবীন্দ্রনাথই করেছেন। 'সাধনার ক্যাশবহি'-তে ২৬ ফাল্গুন 'শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কিরণশশী নাটক

সমালোচনার জন্য বুকপোস্টে পাঠানর টিকিট' ও পত্র প্রেরণের খরচ লেখা হয়েছে—কিন্তু অজ্ঞাত কারণে গ্রন্থটির সমালোচনা সাধনা-য় প্রকাশিত হয় নি।

দিনটি অবশ্য এইসব তুচ্ছ কাজেই অপব্যয়িত হয় নি, 'ছান্দোগ্যোপনিষদ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়' অবলম্বনে তিনি লিখলেন 'ব্রাহ্মণ' ['অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে'] কবিতা [দ্র সাধনা, ফাল্গুন। ৩৭৫-৭৮; কথা ৭।১৭-২০]। কাব্যলক্ষ্মী এলেন প্রায় চার মাস পরে, কিন্তু তাঁর আবির্ভাব ঘটল গল্পের সূত্র অবলম্বন করে। কয়েকদিন পরে ১২ ফাল্গুন 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতা লিখেছেন, সেটিও একটি গল্পেরই কাব্যরূপ। বোঝা যায়, এই সময়ে তিনি গল্পের রসেই মজে আছেন। কিছুদিন আগে লিখেছেন 'আপদ' গল্প [দ্র সাধনা, ফাল্গুন। ৩১৭-৩৩; গল্পগুচ্ছ ১৯।২৬৭-৭৮]; ১৫ ফাল্গুন বিকেলে 'দিদি' গল্পটি লিখে শেষ করেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠিগুলি লিখেছেন, তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাল্যস্মৃতির রোমন্থন। 16 Feb ফাল্গুন মাসে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন : 'মনে আছে ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে যখন অমৃতসরে গিয়েছিলুম তখন এই ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এইরকম শীত বোধ হত, এবং রোজ সকালে স্নানের সময় বড়ো আক্ষেপ উপস্থিত হত। শীতের চোটে সেই বহুদিনকার পূর্বস্মৃতি মনে পড়ছে এবং সেইসঙ্গে মনে পড়ছে—সেখানে দীর্ঘ দুপুর বেলায় একলা বসে অদূরে ইঁদারা থেকে যন্ত্রযোগে গোরুদের জল তোলবার সকরুণ ক্যাঁ-কো শব্দ শুনতে পেতুম, চাষীরা অত্যন্ত উচ্চ সপ্তম সুরে একটা একঘেয়ে তান ছাড়ত, ইঁদারার উপরে একটা তুঁতের গাছ ঝুঁকে পড়েছিল, সেইটে থেকে পাকা তুঁত পেড়ে এনে খেতুম এবং বাড়ির জন্য মন কেমন করতে থাকত।'[১৩৮] ১৬ ফাল্গুন [27 Feb] লিখেছেন : 'দুপুরবেলাটিও খুব নিস্তব্ধ এবং গরম এবং শান্ত এবং স্থির হয়ে আছে—খুব ছেলেবেলায় ইস্কুলে একটার সময় ছুটি হলে নির্জন ক্লাসে জানলার কাছে বসে কলকাতার বাড়িগুলোর শূন্য নিস্তব্ধ ছাদশ্রেণীর দিকে চেয়ে এবং বহুদূর আকাশের চিলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে যে রকম মন-কেমন করতে থাকত, আজও ঠিক সেইরকম ভাবটা মনে উদয় হয়েছে।···আজ আমার সেই ছেলেবেলাকার পুকুরের ধারের দক্ষিণ দিকের তোষাখানাটা মনে পড়ছে। তখন ই[রু] খুব ছোটো ছিল, সেও আমাদের দলের একটি ছিল।'[১৩৯] জীবনস্মৃতিতে এই-সব বর্ণনার অনেকটাই নেই, কিন্তু বাল্যস্মৃতির মায়ামেদুর ভাবটি সেখানেও লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনস্মৃতি লিখছিলেন, সেই একই সময়ে ছিন্নপত্র-এরও সংকলন করছিলেন। আমাদের তো মনে হয়, 'আপদ' গল্পে কিরণময়ী ও সতীশের হাস্যকৌতুকমুখর সম্পর্কের মধ্যে কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অনেকটা ছায়াপাত ঘটেছে, কিরণময়ীর প্রতি নীলকান্তের মনোভাবেও তাঁর নিজের মনের মাধুরীর মিশ্রণ অলক্ষিত থাকে না।

আগেই বলেছি, ১২ ফাল্গুন [শনি 23 Feb] রবীন্দ্রনাথ 'পুরাতন ভৃত্য' ['ভূতের মতন চেহারা যেমন'] কবিতাটি [দ্র সাধনা, চৈত্র। ৪৩০-৩৫; কাহিনী ৭।৯৬-৯৮] লেখেন। 'বুধবার, ১৬ ফাল্গুন' [27 Feb] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'কাল বিকেলে সাধনার জন্যে একটা গল্প লেখা শেষ করে আজ কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি।'[১৪০] এই গল্পটি সম্ভবত 'দিদি' [দ্র সাধনা, চৈত্র। ৪১৫-৩০; গল্পগুচ্ছ ১৯।২৭৮-৮৮], ১৫ ফাল্গুন রচনা শেষ হয়।

28 Feb [বৃহ ১৭ ফাল্গুন] রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : "আজ আমি এক অনামিকা চিঠি পেয়েছি।···আমাকে সে কখনো দেখে নি, কিন্তু আজকাল আমার 'সাধনা'র মধ্যে সে আমাকে দেখতে পায়। তাই লিখেছে—'তোমার সাধনায় রবির পড়িয়াছে, তাই রবি-উপাসক যত ক্ষুদ্র যত দূরে থাকুক তবুও তার জন্যেও আজি রবিকর বিকীর্ণ হইতেছে। তুমি জগতের কবি, তবুও সে ভাবিতেছে আজি তুমি তাহারও কবি।' ইত্যাদি ইত্যাদি।"[১৪১] এই 'অনামিকা' তাঁর পরিচয় কখনো উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু ইনি অবধারিতভাবেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে মনে করিয়ে দেন।

ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠিগুলি লিখতেন সেগুলি রক্ষিত হয় নি,—কিন্তু তাঁর চিঠি রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভাবনার তরঙ্গ সৃষ্টি করত তার পরিচয় আছে ছিন্নপত্রাবলী-র পত্রে—যার কোনো-কোনোটি আবার অন্য রচনার রূপ নিয়েছে। 1 Mar [শুক্র ১৮ ফাল্গুন] ইন্দিরা দেবীর পত্রের উত্তরে তিনি লিখেছেন : 'অধিকাংশ ভাবই আমাদের কাছে পুরাতন; এবং আমাদের মনের ধর্মই এই যে, পুরাতন অভ্যস্ত জিনিষগুলির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এবং রস আমাদের অনুভব করবার ক্ষমতা নেই—সেই জন্যে কোনো কবি যখন পুরাতন ভাবের মধ্যে ভাষা ছন্দ এবং বলবার নতুন ধরণের দ্বারা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে আনে তখন আবার আমরা নতুন করে সেই জিনিষটির আসল রসটুকু আস্বাদন করতে পারি—তখন চিরকেলে শোনা কথাটা নতুন সংগীতে কানের মধ্যে বাজতে থাকে।'[১৪২] অগ্র° ১২৯৯-সংখ্যা সাধনা-য় 'প্রকৃতির শিক্ষা' গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি একই কথা লিখেছিলেন, আমরা যথাস্থানে তা উদ্ধৃত করেছি। আবার 6 Mar [বুধ ২৩ ফাল্গুন]-এর চিঠিতে লিখছেন : 'সৌন্দর্যের চর্চা কিম্বা সুবিধার চর্চা এর মধ্যে কোন্‌টাকে প্রাধান্য দিতে হবে এই নিয়ে তোর আজকের চিঠিতে একটুখানি তর্ক আছে—ওটা অনেকটা অবস্থা এবং অসুবিধার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।···অসংগত অদ্ভুত ব্যবহারে লোকের দৃষ্টি যে রকম অধিক ক'রে আকর্ষণ করে তাতে লোকের লজ্জা অনুভব করাই উচিত—যেমন নিজের সম্বন্ধে খুব বেশি করে সচেতন থাকাটা কিছু না তেমনি পরের চেতনার উপর প্রবল আঘাতে নিজেকে আছড়ে ফেলতে বিশেষ একটা অপ্রবৃত্তি থাকা উচিত।'[১৪৩] লক্ষণীয়, এই ভাবনাই পঞ্চভূত-এর 'ভদ্রতার আদর্শ' রচনায় রূপ লাভ করেছে।

সম্ভবত শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথের সাজাদপুরে যাওয়ার কথা ছিল। সেইজন্য 8 Mar [শুক্র ২৫ ফাল্গুন] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'সাজাদপুরে গিয়ে একেবারে অনেক চিঠি জমে আছে দেখতে পাব।'[১৪৪] কিন্তু সম্ভবত কলকাতায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পেয়ে তাঁকে পরিকল্পনা বদল করতে হল। সেইটি জানিয়ে 10 Mar [রবি ২৭ ফাল্গুন] ইন্দিরা দেবীকে লিখলেন : 'এবারে মনে মনে স্থির করেছি কলকাতায় গিয়ে কোনো গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করব না, চুপচাপ করে স্থির শান্ত চিত্তে লেখাপড়া করব। তার চেয়ে সুখের অবস্থা আর কিছু নেই।'[১৪৫] শিলাইদহের খবর দিয়ে লিখেছেন : 'আজকাল আর আমার একলা বেড়ানো হয় না। সঙ্গে প্রায়ই শৈ[লেশ] এবং ঠা[কুরদাস] বাবু থাকেন। তাঁদের কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ এক-একবার অল্পক্ষণের মতো সমস্ত জ্যোৎস্নামণ্ডিত শান্তিপূর্ণ দৃশ্যটি এবং অনন্ত-আকাশপূর্ণ নিস্তব্ধতা আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়—আমার সেই চিরপরিচিতটি পর্দা সরিয়ে দিয়ে এক-একবার আমাকে দেখা দিয়ে যায়'। কয়েকদিন আগে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গ তাঁর ভালো লাগছিল, কিন্তু এখন লিখলেন : 'আমি কৌতুকহাস্যের কথা সাধনায় লিখেছি। আমি যখন জ্যোৎস্নারাত্রে পদ্মার ধারের নির্জন চরে ঠা[কুরদাস] বাবুর

মুখ থেকে এখানকার সেরেস্তার রিপোর্ট শুনতে থাকি এবং সেই রিপোর্টের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রভরা আকাশ উঁকি মারতে থাকে, তখন তার কৌতুকটা আমি এক-একবার অনুভব করতে পারি—ওর মধ্যে কোনো-একজন লোকের একটা মিষ্টি দুষ্টুমির হাসি আছে।'

সাধনা, ফাল্গুন ১৩০১ [৪।৪] :

৩১৭-৩৩ 'আপদ' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৯।২৬৭-৭৮

৩৪১-৫৮ 'কৃষ্ণচরিত্র' [শেষাংশ] দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯।৪৫১-৬২

৩৬৪-৭৪ 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' দ্র পঞ্চভূত ২।৬২০-২৬

৩৭৫-৭৮ 'ব্রাহ্মণ' দ্র কথা ৭।১৭-২০

৩৭৯-৪০০ 'আলোচনা'

৪০১-০৩ 'গ্রন্থ সমালোচনা' দ্র রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য। ৩৩৫-৩৬

৪০১-০২ দেওয়ান গোবিন্দরাম ৪০২-০৩ মনোরমা।

এছাড়া 'বড় আশা করে এসেছি গো' [পৃ ৩০৩-০৫] ও 'ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে' [পৃ ৩০৫-০৬] গান-দু'টির স্বরলিপি মুদ্রিত হয়; স্বরলিপিকারের নাম যথারীতি অনুল্লেখিত।

এই সংখ্যায় 'আলোচনা' নামে একটি নূতন বিভাগের পত্তন হয়। সাধনা-র বাকি সব-ক'টি সংখ্যায় এই বিভাগটি চালু ছিল, রাজনীতি ছিল আলোচনার প্রধান বিষয়। পুলিনবিহারী সেন লিখেছেন : 'সাধনার চতুর্থ বর্ষে (১৩০১-০২) রবীন্দ্রনাথ তার সম্পাদকতা গ্রহণ করে "আলোচনা" নামে একটি নূতন বিভাগের প্রবর্তন করেন—সাময়িক ঘটনা ও রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য।'[১৪৬] অর্থাৎ তিনি এই বিভাগের অন্তর্গত সবগুলি রচনাকেই রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ভাষা ও রচনারীতি পর্যালোচনা করে আমাদের তা মনে হয় নি। তবে দু'একটি ছাড়া বাকি রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখা, এ-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। বিষয়বস্তু ও রচনাপ্রণালী থেকে আমাদের অনুমান, বর্তমান সংখ্যার 'ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি' [পৃ ৩৯৩-৯৬] ও 'ধর্মপ্রচার' [পৃ ৩৯৬-৪০০] রচনা-দু'টি রবীন্দ্রনাথের লেখা। এছাড়া পরবর্তী সংখ্যায় যেভাবে মন্তব্য করা হয়েছে তার থেকে মনে হয়, 'পলিটিক্স' [পৃ ৩৭৯-৮৭] ও 'কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ' [পৃ ৩৮৭] রচনা দু'টিও তিনি-ই লিখেছিলেন। 'ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি' রচনায় তিনি লিখেছেন : 'জর্ম্মান্ অধ্যাপক ওল্‌ডেন্‌বার্গ্ বুদ্ধের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে এবং সেই তাঁহার [? অনুবাদ] বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি জর্ম্মন ভাষায় বেদের ধর্ম্ম নামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদের প্রতীক্ষা করিয়া আছি।' এর পর তিনি আমেরিকার *Monist* পত্রিকার সমালোচনায় এই গ্রন্থের যে অংশ উদ্ধৃত হয়েছে সেটুকু সংকলন করেন। নিছক অ্যাকাডেমিক উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে এই সংকলন করেন নি, সেটি বোঝা যায় রচনার শেষ অনুচ্ছেদে : 'সমালোচক মহাশয়ের উপদেশে অনেক কথা আছে যাহাতে আমাদের দম্ভে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ক্রমাগত আত্মশ্লাঘাদ্বারা নিশ্চেষ্ট অহঙ্কারে পরিস্ফীত হইয়া ওঠাকে মহত্ত্বলাভ বলে না। যে সকল কঠিন আঘাতে আমাদিগকে যথার্থ পৌরুষ দান করে, যাহা অপর্য্যাপ্ত অতি মিষ্ট তরল স্তুতিরসে অহরহ আমাদের

আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে তাহা আমাদিগকে সাংঘাতিক অন্ধস্নেহে নিরুদ্যম জড়ত্বের দিকে, সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্যের দিকে কোমল আলিঙ্গনপাশে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; [,] তাহার মায়া ছেদন করিতে না পারিলে আমাদের নিস্তার নাই।'[১৪৭] সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মত প্রকাশ করে আসছিলেন, তার সঙ্গে উদ্ধৃতাংশের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

ন্যুইয়র্কের নাইন্‌টীন্থ সেঞ্চুরি ক্লাবে ডাঃ পল্ কেরস্-এর মধ্যস্থতায় বিশপ থোর্বন ও বোম্বাইয়ের জৈনধর্মালম্বী ব্যারিস্টার বীরচাঁদ গান্ধীর মধ্যে 'ভারতবর্ষে ক্রিশ্চান মিশন' সম্বন্ধে যে বিতর্ক হয়, পত্রিকায় প্রকাশিত তার বিবরণ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম্মপ্রচার' রচনা করেন। তিনি লিখেছেন : 'হিন্দু কখনও ধর্ম্মপ্রচার করিতে বাহির হয় নাই। কিন্তু কালের গতিকে হিন্দুকেও বিদেশে স্বধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিতে বাহির করিয়াছে। সম্প্রতি আটলান্টিক পার হইয়া হিন্দু আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া আসিয়াছে এবং সেই নব ধরাতলবাসীগণ আমাদের প্রাচীন ধরাতলের পুরাতন কথা শুনিয়া পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে উভয় জাতিরই গৌরবের কথা।···আমরা যে আমাদের ধর্ম্মের সত্য প্রচার করিবার জন্য পল্লী ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি ইহা আমাদের নবজীবনের লক্ষণ। এই উপলক্ষ্যে নানা মতের সহিত রীতিমত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, সকল বিরোধের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সকল আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক যখন নিজের ধর্ম্মকে সকলের ধর্ম্ম করিয়া তুলিতে পারিব, তখনই প্রকৃত উদারতা লাভ করিব; এখন আমরা যাহাকে উদারতা বলিয়া থাকি, তাহা ঔদাসীন্য, তাহা সকল অনুদারতার অধম।'[১৪৮]

রচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন : 'বঙ্কিম যদিচ পাশ্চাত্যদের প্রতি বহুল অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন তথাপি তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন খৃষ্টধর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত এ গ্রন্থ কদাচ রচিত হইতে পারিত না। অনেকের নিকট তাহা কৃষ্ণচরিত্রের অগৌরবের বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। আমরা বলি ইহা তাহার প্রধান গৌরব। বঙ্কিম খৃষ্টধর্ম্মের আলোকে হিন্দুধর্মের মর্ম্মনিহিত সত্যকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কৃত্রিম সঙ্কীর্ণতা ছেদন করিয়াছেন এবং সেই উপায়েই ইহার যথার্থ মাহাত্ম্যকে বাধামুক্ত করিয়া সর্ব্বদেশকালের উপযোগী করিয়া অসঙ্কোচে সগর্বে জগতের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সত্যের উপর কদাচ জাতিবিশেষের শিলমোহরের ছাপ পড়ে না—যেখানে ছাপ পড়ে নিশ্চয় সেখানে খাদ আছে।'[১৪৯] এই লেখা যে রবীন্দ্রনাথের, এ-সম্পর্কে সংশয় প্রকাশের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

চৈত্র মাসের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। 15 Mar [শুক্র ২ চৈত্র] ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে জানিয়েছেন : 'কলিকাতার খবর সমস্তই ভাল—এ পর্য্যন্ত মারীভয় আমাদের যোড়াসাঁকোর গলি পার হয় নাই। কয়দিন সুখে আলস্যভোগ করিতেছি—বেশ গরমটিও পড়িয়াছে—এই গরমে কেবল জীবন ধারণের যোগ্য নিতান্ত কর্ত্তব্য কাজগুলি ছাড়া আর কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। সকল কাজেই গড়িমসি করিতেছি।'[১৫০]

এইদিনই একই কথা লিখেছেন ইন্দিরা দেবীকে : 'আজ সকালবেলাটা যে কী করে কাটিয়েছি তা বলতে পারি নে। কোনো কাজই করি নি, বোধ হয় বিশেষ কিছু ভাবিও নি। বেশ দক্ষিণে বাতাস দিচ্ছিল এবং গরমে

শরীরের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছিল, চুপচাপ করে একলাটি পড়ে ছিলুম, গড়াচ্ছিলুম, খবরের কাগজের পাতা ওল্‌টাচ্ছিলুম—মনে জানি যে, চিঠিপত্র লেখা আছে, প্রুফ্‌শিট্‌-সংশোধন আছে, সাধনার লেখা আছে, কাছারির কাজ আছে, বাবামশায়ের কাছে হিসেব শোনাতে যাবার কথা আছে, কিন্তু তবু আলস্যের জন্যে মনে অনুতাপ-মাত্র নেই—বোধ হয় অনুতাপ করবার মতো উদ্যম শরীরমনে ছিল না।'[১৫১] অবশ্য এই আলস্যে দিনযাপন তাঁর জীবনের একটি অংশমাত্র—চিঠিপত্র ও সাধনার জন্য লেখা, প্রুফশিট-সংশোধন, কাছারির কাজ, পিতাকে হিসাব শোনাবার জন্য পার্ক-স্ট্রীটে যাওয়া প্রভৃতি সব কাজই তাঁকে করতে হয়েছে। 4 Apr [বৃহ ২২ চৈত্র] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'আমি আজকাল কাজের তাড়ায় দোতলায় নেবে এসেছি। দক্ষিণের বারান্দার কোণে আমি যে একটি অলিন্দবেষ্টিত কাষ্ঠনীড় রচনা করে নিয়েছিলেম, সেইখানে আড্ডা করে নিয়েছি। ঘরে আর কোনো আসবাব নেই, কেবল মাঝখানে তোদের প্রদত্ত সেই চীনে ডেস্ক এবং একটি মাত্র চৌকি। এ আমার পক্ষে একটি নতুন আবিষ্কার বললেই হয়—আমার তেতালার ঘরে কিছুতেই মন বসিয়ে লিখতে পারতুম না, মনে করতুম কলকাতার দোষ, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এ ঘরে এসে লেখার কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে না, বেশ মন দিতে পারছি।'[১৫২] মন দেওয়ার প্রয়োজনও ছিল, কারণ সাধনা-র নিত্যনৈমিত্তিক লেখা ছাড়াও তখন তাঁকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনের জন্য 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধ রচনা করতে হচ্ছিল। 2 Apr [মঙ্গল ২০ চৈত্র] প্রবন্ধটি সম্পর্কে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'আজও সমস্ত দিন সেই বক্তৃতাটা নিয়ে পড়েছিলুম। বাংলায় নিজের মনের ভাবটি ঠিক মনের মতো করে প্রকাশ করা এমনি শক্ত যে, লেখাটা একটা লড়াই-বিশেষ। শক্ত হবার কারণ কেবল ভাষার অক্ষমতা নয়—যারা লেখাটা শুনবে তাদের সাধারণত কোনো বিষয়ে কোনো কথা ভালো করে ভাবা অভ্যাস নেই, সেইজন্যে সব কথাই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বিস্তারিত করে লেখা দরকার হয়ে পড়ে। যে কথাটাকে সংহত সংক্ষিপ্ত করে লিখলে তার ওরিজিন্যালিটি, তার উজ্জ্বলতা, পরিস্ফুট হত সে কথাটাকে জল মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর করে তুলতে হয়—তার পরে নিজের মনে ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়।'[১৫৩] রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সম্বন্ধে সমালোচকদের একটি বড়ো অভিযোগ এই যে, সেগুলি অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ। কী কারণে রচনাগুলিকে দীর্ঘ করতে হত, এখানে তার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সাধনা, চৈত্র ১৩০১ [৪।৫] :

৪১৫-৩০ 'দিদি' দ্র গল্পগুচ্ছ ১৯।২৭৮-৮৮

৪৩০-৩৫ 'পুরাতন ভৃত্য' দ্র কাহিনী ৭।৯৬-৯৮

৪৪৫-৫১ 'সরলতা' দ্র পঞ্চভূত ২।৬১০-১৪ ['প্রাঞ্জলতা']

৪৭০-৭৬ 'যুগান্তর' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯।৪৭৬-৭৯

৪৭৬-৮৬ 'আলোচনা'

৪৭৬-৭৯ 'ইণ্ডিয়ান্ রিলীফ্ সোসায়েটি; ৪৭৯-৮২ 'উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্তব্য বিস্তার'; ৪৮৩-৮৪ 'হিন্দু ও মুসলমান'; ৪৮৪-৮৫ 'কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ'; ৪৮৫-৮৬ 'রাষ্ট্রীয় ব্যাপার'

৪৮৭-৮৮ 'গ্রন্থ সমালোচনা'

৪৮৭-৮৮ 'নূরজাহান'; ৪৮৮ 'শুভ পরিণয়ে'

শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাস 'যুগান্তর' প্রকাশিত হয় 1 Jan 1895 [১৮ পৌষ] তারিখে। ২৯৬ পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ উপন্যাসটির প্রশংসা করতে রবীন্দ্রনাথ কার্পণ্য করেন নি, কিন্তু অত্যন্ত সংযতভাবে তার ত্রুটিও নির্দেশ করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। এই সমালোচনার ফলে সেই সম্পর্কের পরিবর্তন হয় নি।

বর্তমান-সংখ্যার 'আলোচনার অন্তর্গত সব-ক'টি রচনাই রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে আমাদের ধারণা। 'ইণ্ডিয়ান্ রিলীফ্ সোসায়েটি' সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'এই সভাটি গোপনে স্থাপিত হইয়া কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষের হিতোদ্দেশে নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। সভা যে পরিমাণে কাজ করিয়াছে সে পরিমাণে আপন নাম ঘোষণা করে নাই ইহাতে আমাদের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়।···এ সভা উপযুক্ত বোধ করিলে লোকবিশেষ এবং সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে।' রবীন্দ্রনাথের মতে, এই প্রচেষ্টা স্বজাতিবন্ধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কেন না, 'যখন একজন সামান্য চাষা দেখিতে পাইবে তাহাকে বিজাতি-কৃত অন্যায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিঃস্বার্থ স্বদেশীর দল অগ্রসর হইতেছে, এমন কি, পরের বিপদ দূর করিতে গিয়া অনাবশ্যক নিজের বিপদ আহ্বান করিয়া লইতেছে তখন সে অন্তরের সহিত অনুভব করিবে স্বজাতি কাহাকে বলে; তখন সে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবে কেবল ভাইবন্ধু তাহার আপন নহে, সমস্ত স্বজাতি তাহার আপন।' দেশের মঙ্গলের জন্য উপযুক্ত আইন প্রবর্তন ও ভারতবাসীর স্বত্বাধিকার বিস্তারের জন্য কংগ্রেসের চেষ্টার প্রশংসা করেও তার গৌণ ফলকেই রবীন্দ্রনাথ মূল্যবান মনে করেছেন : 'ভারতবর্ষীয় ভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলন এবং পরস্পর হৃদয় বিনিময়—ইহাই আমাদের পরম লাভ,—ইংরাজের রাজসভায় আসন লাভ করার অপেক্ষা ইহা অনেক সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।···অবস্থাবিশেষে পরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয়, কিন্তু সকল অবস্থাতেই নিজের স্বাধীন বলবৃদ্ধির চেষ্টাই শ্রেয়।'

এই রচনার সূত্র ধরেই তিনি 'উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্ত্তব্য বিস্তার'-এ লিখেছেন : 'অনেক সময় বৃহৎ উদ্দেশ্য লইয়া বসিলে অল্পই কাজ হয় এবং উদ্দেশ্য খাটো করিলে ফল বেশি পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আমাদের অর্থ এবং সামর্থ্য উভয়ই স্বল্প—এই জন্য যথার্থ নিজের কর্তব্য পালন করিবার ইচ্ছা থাকিলে সে কর্ত্তব্যকে আপন সাধ্য-সীমার মধ্যে আনিতে হইবে।···এখনও আমাদের দেশহিতৈষিণী সভাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপক উদ্দেশ্যের মধ্যে আপনাদিগকে দিশাহারা করিয়া রাখিয়াছেন। সে সকল সভার দ্বারা অনেক শুভফল ফলিতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেই সঙ্গে এমন কতকগুলি সভার আবশ্যক যাঁহারা উদ্দেশ্যের পরিধি সংক্ষিপ্ত করিয়া যথা কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত করিবেন। অর্থাৎ যাঁহারা কেবল আন্দোলন না করিয়া কাজে হাত দিবেন।' উদাহরণস্বরূপ তিনি এমন একটি সভা স্থাপন করবার প্রস্তাব করেছেন, যা কেবলমাত্র বাংলা দেশের দুঃখ-অভাব মোচনের জন্য কৃতসংকল্প হবে। কারণ, 'দারিদ্র্যে, দুর্ভিক্ষে এবং রাজদ্বারে আমরা আপন দেশের লোকের সাহায্যে আপনারা উপস্থিত থাকিয়া স্বজাতিই স্বজাতির সর্ব্বপ্রধান বান্ধব ইহাই প্রমাণ করা আমাদের প্রধান কাজ।'

এই সূত্রে 'হিন্দু ও মুসলমান' রচনায় তিনি উভয় সম্প্রদায়ের সখ্যবন্ধন দৃঢ় করার কথা বলেছেন। এক সময়ে তাদের মধ্যে প্রতিবেশিসম্বন্ধ ও সৌহার্দ্য যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই সম্পর্ক শিথিল হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ হিন্দুদেরই বিশেষভাবে দায়ী করেছেন। 'আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানী অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা নবোপার্জ্জিত আর্য্য অভিমানকে সজারুর শলাকার মত আপনাদের চারিদিকে কন্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন; কাহারো কাছে ঘেঁষিবার যো নাই। হঠাৎবাবুর বাবুয়ানার মত তাঁহাদের হঠাৎহিঁদুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাঙ্গলা শিখিতেছেন এবং বাঙ্গলা লিখিতেছেন—সুতরাং স্বভাবতই এক পক্ষ হইতে ইঁট এবং অপরপক্ষ হইতে পাটকেল বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে।'

এই সংখ্যার 'গ্রন্থ সমালোচনা' খুবই অকিঞ্চিৎকর। বিপিনবিহারী ঘোষের 'নূরজাহান' নাটকটি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'এক এক সময়ে মনে হয় লেখকের ক্ষমতা আছে কিন্তু সে ক্ষমতা যেন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নাই।' 'শুভ পরিণয়ে' কোনো প্রচ্ছন্ননামা লেখকের বন্ধুর বিবাহোপলক্ষে লেখা ক্ষুদ্র কাব্য। পাঠকসাধারণের জন্য প্রকাশিত নয় বলে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করা অনাবশ্যক মনে করেছেন।

আমরা পূর্বেই বলেছি, কলকাতায় সংক্রামক রোগের আবির্ভাবের সংবাদ পেয়েই সম্ভবত সাজাদপুরে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর নিজের পরিবারে ব্যাধির প্রাদুর্ভাব না ঘটলেও এসেই শুনলেন, কর্মচারী ও বন্ধু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এই সময়ে লেখা কয়েকটি চিঠিতে সহানুভূতিশীল মানুষ রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বিধৃত রয়েছে। 'শুক্রবার' তিনি ঠাকুরদাসকে লিখেছেন : 'কাল বৈকালে আপনার পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার সহ লোক পাঠাইয়া ছিলাম। আপনার স্ত্রীর বসন্ত হইয়াছে। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন বসন্ত পাকিয়াছে, আট ন দিন হইয়া গিয়াছে, এই জন্য আশঙ্কার কারণ বিশেষ নাই।···আপনার ছেলেমেয়েদের অবিলম্বে টীকা দেওয়া আবশ্যক—ডাক্তারও তাঁহাদিগকে সেই কথা বলিয়া আসিয়াছেন। আপনি আর বিলম্ব করিবেন না—কলিকাতায় আসিয়াই তৎক্ষণাৎ টীকা লইবেন। ডাক্তার সিম্পসন্ লিখিয়াছে যাহাদের অল্পকাল টীকা হইয়াছে তাহারা কেহই বসন্তে আক্রান্ত হয় নাই—সতীশ [ভগ্নীপতি ডাঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়] বলিতেছিলেন টীকা লইয়া রোগীর সহিত একত্রে শয়ন করিলেও কোন ভাবনা নাই।···আপনাকে এই উপলক্ষ্যে ছুটির অতিরিক্ত আরও পনেরো দিন ছুটি মঞ্জুর করিয়া দিলাম।'[১৫৪] ঠাকুরদাসের কন্যাকেও একটি তারিখ-হীন ['বুধবার'] পত্রে তিনি লিখেছেন : 'মাতঃ, তোমার পিতার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া আমি পরম দুঃখিত হইয়াছি। তোমাদের সাহায্যের জন্য আমি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও একটি লোক সংগ্রহ করিতে পারিলাম না;—বসন্ত রোগীর সেবায় কোন লোক অগ্রসর হইতে চাহে না। যদি কোন ডাক্তারকে সম্মত করাইতে পারি তবে তোমাদের বাড়িতে পাঠাইবার চেষ্টা করিব।'[১৫৫] পত্রটি সম্ভবত উপরে উদ্ধৃত চিঠিটির আগে লেখা।

হয়তো চৈত্র মাসের শেষ দিকে ঠাকুরদাসের পারিবারিক সংকট কিছুটা দূরীকৃত হয়েছিল। সম্ভবত ২৩ চৈত্র [শুক্র 5 Apr] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন : 'আপনাদের সংবাদ জানাইবেন। আপনার স্ত্রীর অবস্থা এক্ষণে কিরূপ?/আমাদের এদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়াছে—গগনদের বাড়ির প্রায় সকল ছেলেই শয্যাগত। আপনি

কেমন আছেন?/আগামীকল্য সাহিত্য-পরিষদ সভার বার্ষিক উৎসব—তদুলপক্ষ্যে আমাকে এক প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে—তাহারই আয়োজনে কিছু ব্যস্ত আছি—চারিদিকে এই রোগ তাপ আশঙ্কার মধ্যে প্রবন্ধ লিখিবার মত মনের অবস্থা পাওয়া কঠিন।'[১৫৬]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২৪ চৈত্র শনিবার ও ২৫ চৈত্র রবিবার। ২৪ চৈত্র বাৎসরিক অধিবেশনে রমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতি পদে এবং নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ সহকারী সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন, চন্দ্রনাথ বসুকেও সহকারী সভাপতি করা হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

২৫ চৈত্র [রবি 7 Apr] হয় বাৎসরিক সম্মিলনী। কার্যবিবরণীতে লিখিত হয়েছে : '২৫শে চৈত্র রবিবার অপরাহ্ন [যদ্দৃষ্টং] পাঁচ ঘটিকার সময় মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ধ্বজা পতাকা, পুষ্প ও পুষ্পমালায় পরিশোভিত হইল। প্রাঙ্গণের চতুস্পার্শ্ববর্তী গৃহ সমূহ সুন্দর কার্পেট, সুন্দর চেয়ার, সুরঞ্জিত চন্দ্রাতপ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় চারি শত লোক সভাস্থল পূর্ণ করিয়া বসিলেন।···অধিবেশন উপলক্ষে রচিত একটি গান গীত হইলে পর সভাপতি কর্তৃক আহুত হইয়া সম্পাদক পূর্ব্বোল্লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলেন। তদনন্তর আর একটি সংগীত হইলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য নামক একটি সুললিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন···।··· তাহার পর সভাস্থ সকলেই প্রাঙ্গণের সম্মুখবর্তী সুসজ্জিত, প্রশস্ত ও দীপালোক সমুজ্জ্বল গৃহে উপস্থিত হইয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া সাহিত্যালাপ করিতে লাগিলেন। সেই গৃহের এক পার্শ্বে প্রীতিভোজনেরও সামান্যরূপ ব্যবস্থা ছিল;···ইতিমধ্যে বিখ্যাত চণ্ডীগায়ক শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ স্বর্ণকার প্রাঙ্গণ মধ্যে স্বদলের সহিত গানারম্ভ করিলেন। এ দিকে গৃহের ভিতর হার্‌মোনিয়ম সংযোগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সুকণ্ঠ গায়কগণ সংগীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ আমোদ, উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসের সহিত রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।'[১৫৭] এই অনুষ্ঠানের জন্য রচিত ও গীত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তিনটি ও মনোমোহন বসুর দু'টি গান সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন্ কোন্ গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন, তার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

চৈত্র মাসের বাকি দিনগুলির মধ্যে একটির খবর পাওয়া যায় 9 Apr [মঙ্গল ২৭ চৈত্র] ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি আলস্য-মন্থর পত্রে : 'ঢং ঢং শব্দে দশটা বাজল। চৈত্র মাসের দশটা নিতান্ত কম বেলা নয়—রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, ···মুখ একটু শুকিয়ে এসেছে—ইচ্ছে করছে খানিকটে বরফ দিয়ে এক-গ্লাস ঠাণ্ডা দইয়ের সরবৎ খাই।···ইচ্ছা করছে কোনো-একটা বিদেশে যেতে। বেশ একটা ছবির মতো দেশ—পাহাড় আছে, ঝর্না আছে,···দূর হোক গে ছাই, আজ আর কিছুতে হাত না দিয়ে দ্বি[পু]দের দক্ষিণের ঘরে একলাটি হাত পা ছড়িয়ে একটা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের বই নিয়ে পড়ব মনে করছি, বেশ অনেকগুলো ছবিওয়ালা নতুন-পাত-কাটা বই। একটা চীনদেশের ভ্রমণ হাতে আছে, কিন্তু চীনটা অনেক বইয়েতে পড়েছি। একটা মেয়ের লেখা পারস্য আছে, কিন্তু মেয়েরা ভালো ভ্রমণকারী নয় এবং তাতে যথেষ্ট ছবি নেই। তিব্বত পড়া হয়ে গেছে, আফ্রিকা পড়েছি। যদি দক্ষিণ-আমেরিকার খুব-ছবি-ওয়ালা ভালো বই থাকত তো পড়তুম। কিন্তু

থ্যাকারের দোকানে মনের মতো বই খুঁজে পাই নি।'[১৫৮] ভ্রমণ কাহিনীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল সুতীব্র—'ইচ্ছা সম্যকদর্শনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি' দ্বিজেন্দ্রনাথের এই অকপট সত্যভাষণ তাঁরও মনের কথা, সুতরাং ভ্রমণকাহিনী ক্রয় ও পাঠের মাধ্যমেই অন্তত এই সময়ে তৃপ্ত থাকতে হয়েছে। পরেও যে বারবার তিনি বিদেশযাত্রী হয়েছেন, অন্যান্য কারণ ছাড়া এই আকর্ষণও তার মধ্যে অনেকটা কার্যকরী ছিল।

ইতিপূর্বে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' এবং 'রাজা ও রানী' অভিনীত হয়। এই দু'টি নাটক কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তার একটি সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে বর্তমান অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩-এ। এই বৎসর আর-একটি রবীন্দ্রনাট্য সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হল। তাঁর 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নাটিকাটি 'হেঁয়ালি নাট্য' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল 'বালক' পত্রিকায় মাঘ ১২৯২ [পৃ ৪৮৯-৯৬]-সংখ্যায় [দ্র হাস্যকৌতুক ৬।৬৬-৭৩]। এই নাটিকাটির রূপান্তর 'দুকড়ি দত্ত' নামে এমারেল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে ২৪ চৈত্র [শনি 6 Apr 1895] বৈকুণ্ঠনাথ বসু-সংকলিত পৌরাণিক গীতনাট্য 'মান'-এর সঙ্গে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফির প্রযোজনায় অভিনীত হয়। এতাবৎ অজ্ঞাত এই তথ্যটি উদঘাটিত করেছেন শঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' [Aug 1982] গ্রন্থে। তিনি *The Statesman* পত্রিকায় উক্ত দিনে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধার করেছেন: 'EMERALD THEATRE/ SATURDAY, THE 6TH APRIL, AT 9 P. M./ MANA/ To be followed by Baboo Rabindra Nath/ Tagore's Social Skit/ DOCOWRI DUTT/ .../A. MASTAPHI/ Manager.' তিনি যথার্থই দাবী করেছেন : 'সাধারণ রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের এই নাট্যটি-যে অভিনীত হয়েছে তা বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস-লেখকেরা কেউই এ-পর্যন্ত জানতেন না।'[১৫৯] প্রহসনটি মোট পাঁচবার অভিনীত হয়। অপর তারিখগুলি হল চৈত্র-সংক্রান্তি ৩০ চৈত্র [শুক্র 12 Apr], ২ বৈশাখ ১৩০২ [রবি 14 Apr], ৯ আষাঢ় [শনি 22 Jun] ও ১০ আষাঢ় [রবি 23 Jun]। যতদূর মনে হয়, অর্ধেন্দুশেখর দুকড়ি দত্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

দুকড়ি দত্তের অন্য উল্লেখ পাওয়া যায় প্রায় বছরখানেক পরে লেখা রবীন্দ্রনাথকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি পত্রে, কিন্তু উল্লেখটি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর। 'মৈমনসিং' থেকে 18 Mar 1896 [বুধ ৬ চৈত্র ১৩০২] দ্বিজেন্দ্রলাল লিখছেন : 'আপনার দোকোড়ি দত্ত কতদূর পহুঁছিয়াছেন গল্পটি ঠিক একটি ক্ষুদ্র আয়তনের farceএর উপযোগী'। যে farce এক বছর আগে রচিত ও অভিনীত হয়ে গেছে, তার এইরূপ উল্লেখের তাৎপর্য বোঝা শক্ত। সালটি দ্বিজেন্দ্রলাল ভুল লিখেছেন মনে করলে সংগতি হয় বটে, কিন্তু চিঠির অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়ে পড়ে। পত্রটির প্রসঙ্গ যথাস্থানে আবার উত্থাপিত হবে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে চারুবালা দেবীর বিবাহ হয় ১২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 25 May] তারিখে। আগেই বলা হয়েছে, 'সুধীর বিবাহ দিনে' রবীন্দ্রনাথ 'বাজিল কাহার বীণা' [দ্র গীত ২।২৮১-৮২] গানটি রচনা

করেন। বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুধীন্দ্রনাথ এই সময়ে ওকালতি-ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিলাত-প্রবাসী প্রমথ চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ খবরটি দিয়ে লিখেছেন : 'সুধী দিনকতক সাহিত্যের সাধনা ছেড়ে দিয়ে অন্যবিধ সাধনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং সিদ্ধও হয়েছেন। এখন আর সাহিত্যের প্রতি তাঁর তেমন অনুরাগ এবং মনোযোগ দেখা যাচ্চে না।'[১৬০] সাধনা-র সম্পাদকত্ব ত্যাগের এটিও একটি অন্যতম কারণ। অবশ্য সাহিত্য-চচা তিনি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি—'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁর লেখা গল্প ও কবিতা প্রায় নিয়মিতই প্রকাশিত হয়েছে।

আগের বছর ৪ Aug [২৪ শ্রাবণ ১৩০০] হেঁয়ালি-চিত্রের মাধ্যমে 'একান্নবর্তী বিপুল পরিবার'-এর 'কেউ জীবিকার উপায় অন্বেষণ করচেন না' বলে সুরেন্দ্রনাথ যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৩/২৯৬], বর্তমান বৎসরে দেখা যাচ্ছে সে-বিষয়ে অনেকেই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের কথা তো আগেই বলা হল, শিল্পী-স্বভাব তাঁর তৃতীয় অগ্রজ নীতীন্দ্রনাথ ঝুঁকেছিলেন কৃষিকার্যের দিকে। মহর্ষির ক্যাশবহির ১৭ অগ্র° ১৩০২ তারিখের একটি হিসাব : 'বাবু নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্য ইছাপুর পলতায় বাগান ও জমি মৌরশী লওয়ার জন্য গত ৯ আশ্বিন ১৩০১ সাল যে টাকা দেওয়া হয়··· ৪৫৪২।লে১'; নীতীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যটি অবশ্য বোঝা যায় ৩ শ্রাবণ ১৩০৩-এর হিসাবে : 'দ° ইছাপুর পলতার বাগান ও জমি মৌরশী লওয়া ও কৃষিকার্য্য ও বাঙ্গালা তৈয়ারী ব্যয় প্রভৃতি জন্য দেওয়া যায়···৭৫্ '—কিন্তু এই প্রচেষ্টার কী পরিণতি হয়েছিল আমাদের জানা নেই।

বলেন্দ্রনাথও এঁদের পথ অনুসরণ করার প্রয়াসী হয়েছেন। ৭ ফাল্গুন ১৩০১ [18 Feb 1895]-এর একটি হিসাব : 'বঃ বাবু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর/দং উঁহার কারবার করার জন্য দান···১০০০্'—এই হিসাবটিও মহর্ষির ক্যাশবহির। হিসাবটি Tagore & Co.-এর সূচনাকালটি চিহ্নিত করেছে। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সহযোগী। পরে রবীন্দ্রনাথও উক্ত ব্যবসায়ের অংশীদার হন, শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ভরাডুবির সমস্ত দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়।

সিমলায় প্রায় এক বৎসর [2 Apr 1893–15 Mar 1894] ফলো-ছুটি কাটাবার পর সত্যেন্দ্রনাথ ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স্ জজ [অস্থায়ী] হিসেবে সাতারায় নিযুক্ত হন 16 Mar 1894 [৪ চৈত্র ১৩০০] তারিখে। প্রথমে তিনি একাই সেখানে গিয়েছিলেন, Jul 1894-এর গোড়ায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেখানে সমবেত হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাতারা ও পুনায় থাকার সময়ে যথারীতি বিভিন্ন ব্যক্তির ছবি এঁকেছেন, সত্যপ্রসাদ ও তাঁর বোন ইন্দুমতী যে সাতারায় গিয়েছিলেন সেই খবরটি পাওয়া যায় তাঁর স্কেচের খাতা থেকে। তিনি 8 Feb 1895 [২৬ মাঘ] 'Matange (Singer)'-এর ছবি এঁকেছেন; ইন্দিরা দেবী এঁর সম্পর্কে বলেছেন : 'মটঙ্গে নামক একজন অন্ধ ওস্তাদের কাছে ওখানে গান শিখতুম; ··· তাঁর কত সুন্দর গান ভাঙ্গাও হয়েছে—যার মধ্যে "বিশ্ববীণা রবে" প্রধান।'[১৬১] রবীন্দ্রনাথ মটঙ্গের গানটি ভাঙেন ৪ আশ্বিন ১৩০২ [20 Sept 1895]—তাঁর চিঠিতেও 'মাটাঙ্গের ভৈরবী আলাপের' উল্লেখ আছে।[১৬২] আশ্চর্যের বিষয়, সত্যেন্দ্রনাথের বিভিন্ন কর্মস্থলে রবীন্দ্রনাথ বেড়াতে গিয়েছেন, কিন্তু সাতারা তার অন্তর্গত হয়নি। যদিও কথা ও কাহিনী র 'প্রতিনিধি' [দ্র ৭।১৪-১৭] কবিতায় তিনি 'সাতারার দুর্গভালে'র চিত্র অঙ্কন করেছেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

পূর্ব্ববর্তী অধ্যায়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২-তে আমরা শিকাগোর ধর্ম্মমহাসভা ও হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের আশ্চর্য অভ্যুত্থানের কথা বলেছি। মহাসভার অধিবেশন চলার সময়ে ও পরে আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত বিবরণ প্রকাশ পেতে শুরু করলেও বাংলা ও ভারতের সংবাদপত্রে সেই উচ্ছ্বাস দূরত্বের কারণে স্বভাবতই কিছু বিলম্বে দেখা দিয়েছে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর মহাগ্রন্থ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' প্রথম খণ্ডে [৩য় সং, ১৩৮৬, পৃ ৪০-৫৬] এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, সুতরাং এ-নিয়ে অধিক বাগ্‌বাহুল্য অনাবশ্যক। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র জ্যৈষ্ঠ ১৮১৬ শক [পৃ ২২-২৫] সংখ্যায় চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 'সিকাগো ধর্ম্মমেলা' শিরোনামে যে প্রবন্ধ লেখেন, তার মধ্যে বিবেকানন্দের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। অবশ্য এ জন্য তাঁকে বা পত্রিকাটিকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। আদি ব্রাহ্মসমাজের তথাকথিত মুখপত্র এই পত্রিকাটি শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মোৎসব, মাঘোৎসব ইত্যাদি কয়েকটি অনুষ্ঠান ছাড়া নিজেদের অনুষ্ঠান বা কার্যবিধি প্রকাশেই উদাসীন ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, আদি ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতাদির খবর তত্ত্ববোধিনী অপেক্ষা *Indian Mirror* প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।

৭ পৌষ [শুক্র 21 Dec] শান্তিনিকেতনে চতুর্থ বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তত্ত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত বিবরণে প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথের কিছু ভূমিকা ছিল, সেইজন্য তা আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। সায়ংকালীন উপাসনার বিবরণে লিখিত হয় : 'অনন্তর রক্ত সন্ধ্যায় আকাশ সুরঞ্জিত এবং রক্তাভ সূর্য্য প্রান্তরের পশ্চিম প্রান্তে অস্তমিত হইল। বিচিত্র বর্ণের কাচনির্ম্মিত বিশাল ব্রহ্মমন্দির আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।' এই উপাসনায় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন করেন। হেমচন্দ্র চক্রবর্তী স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা শেষ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ পাঠ করলে শাস্ত্রী মহাশয় ব্যাখ্যান বিবৃত করেন। শম্ভুনাথ গড়গড়ির প্রার্থনা ও 'তদনন্তর সুমধুর সঙ্গীত হইয়া' অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। প্রাতঃ ও সায়ংকালীন উপাসনায় গানের আয়োজন যথেষ্টই ছিল—ক্যাশবহিতে 'গানের কাগজ ৬০০' ছাপানোর হিসাব পাওয়া যায়—কিন্তু তত্ত্ববোধিনী-র বিবরণে [মাঘ।১৫৩-৬৪] কোনো গান উদ্ধৃত হয়নি।

মহর্ষির শান্তিনিকেতন ট্রাস্টডীডে 'ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপনের জন্য…বর্ষে বর্ষে একটি মেলা'র আয়োজন করার। নির্দেশ ছিল। সেই নির্দেশ-অনুযায়ী বর্তমান বৎসরেই প্রথম মেলা বসে। যাত্রাভিনয়ের আয়োজনও ছিল : 'দিবা দ্বিতীয় প্রহর। চতুর্দ্দিকে দোকান পসার বসিয়াছে এবং স্থানীয়লোকে উৎসবক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় সাধারণের হৃদয়ের সুশিক্ষার উদ্দেশে রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান গীত হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ তাঁহার সর্ব্বস্ব দান স্ত্রী পুত্র বিক্রয়, সর্প দংশনে পুত্রের মৃত্যু, শ্মশানে পুনর্মিলন এই সমস্ত করুণরসোদ্দীপক গীতাভিনয়ে অনেকেরই অশ্রুপাত হইয়াছিল।' সান্ধ্য উপাসনার পর বাজি পোড়ানো হয় : 'পরে সমস্ত নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চটচটা শব্দে ভহ্নুৎসব পর্ব্ব আরম্ভ হইল। লোকতরঙ্গ মহা কোলাহলে ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। তৎকালে খধূপোদগত গোলকের বিচিত্র নির্ম্মল আলোকে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কেবলই মস্তকরাজি দৃষ্ট হইতে লাগিল। কি ভীষণ জনতা! কি বিষম কলরব!' বাজি অবশ্য গত বছরও পোড়ানো

হয়েছিল। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, 'শান্তিনিকেতনের ১৩০১ সালের ৭ পৌষ চতুর্থ সাম্বৎসরিক ব্রহ্ম উৎসবের ব্যয়' ১৭৩২ টাকা দশ আনা।

শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সুসজ্জিত করে তোলার চেষ্টা এ বৎসরেও অব্যাহত ছিল। 'শান্তিনিকেতনের পুকুরের ধার বাধানো ও মন্দিরের গেট সিমেন্ট দেওয়ার জন্য' টাকা বরাদ্দ করার হিসাব পাওয়া যায়। মহর্ষির একটি বিশেষ ইচ্ছা ছিল, সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনের অতিথিশালায় বিশিষ্ট ভক্তদের সমাগম হোক। তত্ত্বকৌমুদী-র [১ অগ্র°] সংবাদে প্রকাশ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী তিন মাস সেখানে বাস করেন। ২৫ অগ্র° ক্যাশবহির একটি হিসাব : 'পি কে রায়ের বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাতায়াত ব্যয় ৪০ ৷৷৬'—আশ্রমের ক্রমবর্ধমান খ্যাতির একটি প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে।

১১ মাঘ [বৃহ 24 Jan] পঞ্চষষ্ঠিতম ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রাতঃকালীন উপাসনায় বন্দনাগীতের পর ক্ষিতীন্দ্রনাথ 'ব্রহ্মজ্ঞান' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা উদ্বোধনের পর স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হলে তিনিই উপদেশ পাঠ করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এর পর 'স্ববক্তব্য' নিবেদন করেন। 'রাত্রিকালে বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র পুষ্পে সুসজ্জিত উৎসবক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য হইলে' বেদগান ও সঙ্গীতের পর ক্ষিতীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন। অন্যান্য বক্তা ছিলেন হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি। তত্ত্ববোধিনী-র বিবরণে রবীন্দ্রনাথের 'নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়' গানটিই কেবল মুদ্রিত হয়।

রামমোহনের আকর্ষণে আগত সুইডিশ ব্রাহ্ম কার্ল এরিখ হ্যামারগ্রেন Jun 1893-তে কলকাতায় আসেন। এঁর সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা আগেই করেছি [দ্র রবিজীবনী ৩।২৯৪। বাংলা দেশের প্রতিকূল আবহাওয়া, কঠোর পরিশ্রম ও শারীরিক অযত্ন তাঁর জীবনকাল দীর্ঘায়িত হতে দেয়নি। তত্ত্বকৌমুদী-র ১ শ্রাবণ-সংখ্যায় লিখিত হয় : '২৪-এ জুন পীড়ার সঞ্চার হইয়া ৩রা জুলাই মঙ্গলবার [২০ আষাঢ়] দেহান্ত হইয়া গেল।' তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নিমতলা শ্মশানে শেষকৃত্য নিয়ে কী-ধরনের সামাজিক বিক্ষোভ হয়েছিল, জীবনকথা অংশে তার কিছু পরিচয় আছে।

ডাঃ মোহিনীমোহন বসুর ৬১/১ রাজাবাজার-স্থ গৃহে ২৪ আষাঢ় [শনি 7 Jul] সন্ধ্যায় ও পরদিন সকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হ্যামারগ্রেনের 'শ্রাদ্ধ' হয় : 'a short sketch of the life of the deceased was read by Dr. Bose, and prayers were offered by him and Mrs. Bose. Dr. M. M. Bose made a donation of Rs. 100 to the Rammohan Roy library projected by Mr. Hammergren.'[১৬৩]

হ্যামারগ্রেনের আশা পূর্ণ হয়েছিল। তত্ত্বকৌমুদী-র ১৬ অগ্র°-সংখ্যায় 'সংবাদ' দেওয়া হয় : 'রামমোহন লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে।'

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ৩

সখিসমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহিলা শিল্পমেলার কয়েকটির বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। পুরোনো সংবাদপত্রের আদ্যন্ত ফাইল দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় প্রতিটি মেলার বিবরণ সংকলন করা সহজ নয়। অথচ এই শ্রেণীর প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক ও সামাজিক গুরুত্ব এবং ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে এই মেলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

থাকার জন্য যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে আমরা তা লিপিবদ্ধ রাখতে আগ্রহী। বর্তমান বৎসরে 29 Dec 1894 [শনি ১৫ পৌষ] থেকে তিন দিন ১৮১ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে বেথুন কলেজের প্রাঙ্গণে মহিলা শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়। 29 Dec দুপুর দু'টোর সময়ে কাউন্টেস অব্ এলগিন [ভাইসরয় লর্ড এলগিনের পত্নী] মেলার উদ্বোধন করেন। *The Indian Mirror*-এর 24 Dec-সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ : 'the Fair will close every day at 5 P. M., after which a dramatic piece will be performed entirely by ladies.' এবারে কোন্ নাটক অভিনীত হয়েছিল জানা যায়নি।

এযাবৎ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত রবীন্দ্র-নাট্যের সংখ্যা দু'টি মাত্র—বউঠাকুরানীর হাট-এর কেদারনাথ চৌধুরী-কৃত নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' এবং 'রাজা ও রানী'। রাজা বসন্ত রায় প্রথম অভিনীত হয় 3 Jul 1886 [শনি ২০ আষাঢ় ১২৯৩] গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। শঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর অমূল্য গবেষণা-গ্রন্থ 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' [1982]-এ ঐ বৎসর নাটকটির আরও বহুবার অভিনয়ের তারিখ উদ্ধার করেছেন *The Statesman* পত্রিকার বিজ্ঞাপন থেকে : 10, 11 এবং 17 Jul ও 15 Aug। এরপর দেনার দায়ে থিয়েটারটি বিক্রি হয়ে গেলে অভিনেতৃবৃন্দ 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি' নাম নিয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটের 'অপেরা হাউস'-এ 28 Aug ও 11 Sep নাটকটি অভিনয় করেন। 'ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি' নামে তাঁরা এখানেই অভিনয় করেন 18 Sep, 16 Oct নাটকটি অভিনীত হয় হাওড়ার টাউন হলে।

প্রায় এক বছর পরে 23 Oct 1887 [রবি ৭ কার্তিক ১২৯৪] নবপ্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটারে নাটকটির পুনরভিনয় শুরু হয়। 30 Oct ও 5 Nov আরও দু'টি অভিনয় হওয়ার পর কেদারনাথ চৌধুরীর স্থানে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এমারেল্ডের 'Director and Manager' হয়ে এলে 20 Nov [রবি ৫ অগ্র°]-এ 'রাজা বসন্ত রায়' অভিনয়ের পর এর মঞ্চায়ন বন্ধ করে দেন। 3 Feb 1889 [২২ মাঘ ১২৯৫]-এর পরে গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড ত্যাগ করলে আবার নাটকটি 7 Apr [২৬ চৈত্র] অভিনীত হয়।

এমারেল্ড থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' প্রথম অভিনীত হয় ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ [শনি 7 Jun 1890]। এরপর প্রতি সপ্তাহেই নাটকটি অভিনীত হতে থাকে। ১ আষাঢ় [শনি 14 Jun], ৮ আষাঢ় [শনি 21 Jun], ১৫ আষাঢ় [শনি 28 Jun], ২২ আষাঢ় [শনি 5 Jul], ৩০ আষাঢ় [রবি 13 Jul], ৫ শ্রাবণ [রবি 20 Jul], ১২ শ্রাবণ [রবি 27 Jul], ১৯ শ্রাবণ [রবি 3 Aug], ২৬ শ্রাবণ [রবি 10 Aug], ২ ভাদ্র [রবি 17 Aug], ৯ ভাদ্র [রবি 24 Aug], ১৫ ভাদ্র [শনি 30 Aug], ২২ ভাদ্র [শনি 6 Sep] ও ২৯ ভাদ্র [শনি 13 Sep] 'রাজা ও রানী' অভিনীত হয়। পর-পর ১৫ সপ্তাহ শনি বা রবিবারে নাটকটির অভিনয় তার জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক।

এর পরও 'রাজা ও রানী'-র অভিনয় বন্ধ হয়নি, তবে তা হয়েছে 'রাজা বসন্ত রায়' অভিনয়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে। আমরা সেই তারিখগুলি তালিকাবদ্ধ করে দিচ্ছি :

১৯ আশ্বিন	[শনি 4 Oct]	: রাজা বসন্ত রায়
২৬ আশ্বিন	[শনি 11 Oct]	: রাজা বসন্ত রায়
২৮ আশ্বিন	[সোম 13 Oct]	: রাজা ও রানী [এই দিন মহালয়া ছিল]
২ কার্তিক	[শনি 18 Oct]	: রাজা বসন্ত রায়

১০ কার্তিক	[রবি 26 Oct]	: রাজা বসন্ত রায়
১৬ কার্তিক	[শনি 1 Nov]	: রাজা ও রানী
৮ অগ্র°	[রবি 23 Nov]	: রাজা ও রানী
২১ অগ্র°	[শনি 6 Dec]	: রাজা বসন্ত রায়
২২ অগ্র°	[রবি 7 Dec]	: রাজা ও রানী
৭ পৌষ	[রবি 21 Dec]	: রাজা বসন্ত রায়
১৪ পৌষ	[রবি 28 Dec]	: রাজা ও রানী
২০ মাঘ	[রবি 1 Feb1891]	: রাজা বসন্ত রায়
২৪ ফাল্গুন	[শনি 7 Mar]	: রাজা বসন্ত রায়
৮ চৈত্র	[শনি 21 Mar]	: রাজা বসন্ত রায়
১৪ চৈত্র	[শুক্র 27 Mar]	: রাজা ও রানী [এই দিন গুড ফ্রাইডে ছিল]
২২ চৈত্র	[শনি 4 Apr]	: রাজা ও রানী

এই পর্বে নাটক-দু'টি প্রায়শই অন্য নাটকের সঙ্গে অভিনীত হত।

১২৯৮ বঙ্গাব্দে [1891-92]ও নাটক-দু'টির অভিনয় অব্যাহত থাকে, তবে স্বভাবতই অভিনয়-রজনীর সংখ্যা কমে এসেছে :

১৩ বৈশাখ	[শনি 25 Apr]	: রাজা বসন্ত রায়
২৭ বৈশাখ	[শনি 9 May]	: রাজা ও রানী
৩ জ্যৈষ্ঠ	[শনি 16 May]	: রাজা ও রানী
৩ শ্রাবণ	[শনি 18 Jul]	: রাজা ও রানী
১১ শ্রাবণ	[রবি 26 Jul]	: রাজা বসন্ত রায়
১৭ শ্রাবণ	[শনি 1 Aug]	: রাজা ও রানী
১৮ শ্রাবণ	[রবি 2 Aug]	: রাজা ও রানী
৩১ শ্রাবণ	[শনি 15 Aug]	: রাজা বসন্ত রায়
৩২ শ্রাবণ	[রবি 16 Aug]	: রাজা বসন্ত রায়
৬ ভাদ্র	[শনি 22 Aug]	: রাজা ও রানী
৭ ভাদ্র	[রবি 23 Aug]	: রাজা ও রানী
২৭ ভাদ্র	[শনি 12 Sep]	: রাজা ও রানী
৪ আশ্বিন	[রবি 20 Sep]	: রাজা বসন্ত রায়

২১ আশ্বিন	[বুধ 7 Oct]	: রাজা বসন্ত রায়
৩০ কার্তিক	[রবি 15 Nov]	: রাজা বসন্ত রায়
৭ অগ্র°	[রবি 22 Nov]	: রাজা বসন্ত রায়
৬ ফাল্গুন	[বুধ 17 Feb 1892]	: রাজা ও রানী
৮ চৈত্র	[রবি 20 Mar]	: রাজা ও রানী
১১ চৈত্র	[বুধ 23 Mar]	: রাজা বসন্ত রায়

১২৯৯ বঙ্গাব্দের [1892-93] অভিনয় তালিকা :

৪ বৈশাখ	[শুক্র 15 Apr]	: রাজা ও রানী [এই দিন গুড ফ্রাইডে ছিল]
২ জ্যৈষ্ঠ	[শনি 14 May]	: রাজা ও রানী
৯ জ্যৈষ্ঠ	[শনি 21 May]	: রাজা বসন্ত রায়
১৭ জ্যৈষ্ঠ	[রবি 29 May]	: রাজা ও রানী
২৮ চৈত্র	[রবি 9 Apr 1893]	: রাজা ও রানী

এরই মধ্যে মাত্র একদিনের জন্য ৬ মাঘ ১২৯৯ [বুধ 18 Jan 1893] রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে 'রাজা ও রানী' অভিনীত হয়।

উপরে যে-বিষয়টি আলোচিত হল সেটি পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে বিচ্ছিন্ন করে আমরা আলোচনা করিনি। কারণ, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র-নাটকের জনপ্রিয়তার পরিমাণ সেই বিচ্ছিন্ন আলোচনায় স্পষ্ট হত না। ১২৯৩ থেকে ১২৯৯ [1886-93] সাত বছরে 'রাজা বসন্ত রায়' অভিনীত হয়েছে মোট ৩৩বার ও 'রাজা ও রানী'র অভিনয়-সংখ্যা ৩৭—সেই যুগে অল্প দিনের ব্যবধানেই যেভাবে নূতন নাটকের প্রয়োজন হত, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিনয়-সংখ্যাকে ভালোই বলতে হবে। রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার রূপটি স্পষ্ট করার জন্য এই একত্রিত বিবরণের প্রয়োজন ছিল।

এর পর দেড় বছরেরও বেশি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় না। বস্তুত May 1893 থেকে Sep 1894 এই দীর্ঘ সময়ে এমারেল্ডে কোনো অভিনয়ই হয়নি—22 Sep 1894 [শনি ৭ আশ্বিন] অতুলকৃষ্ণ মিত্র-রচিত 'মা' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে এমারেল্ডের পুনরুজ্জীবন ঘটে। এরপর 25 Dec 1894 [মঙ্গল ১১ পৌষ ১৩০১] বড়দিন উপলক্ষে আবার 'রাজা বসন্ত রায়' অভিনীত হল। তার পরে কিছুদিন নাটকটি ধারাবাহিকভাবে অভিনীত হয় :

১৯ পৌষ	[বুধ 2 Jan 1895]	: রাজা বসন্ত রায়
৭ মাঘ	[রবি 20 Jan]	: রাজা বসন্ত রায়
১৪ মাঘ	[রবি 27 Jan]	: রাজা বসন্ত রায়
২১ মাঘ	[রবি 3 Feb]	: রাজা বসন্ত রায়

২৮ মাঘ	[রবি 10 Feb]	: রাজা বসন্ত রায়
২৭ ফাল্গুন	[রবি 10 Mar]	: রাজা বসন্ত রায়
১০ চৈত্র	[শনি 23 Mar]	: রাজা বসন্ত রায়

এর পরে ২৪ চৈত্র (শনি 6 Apr] রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' কৌতুকনাট্যের রূপান্তর 'দুকড়ি দত্ত' প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটিকাটি অতঃপর চার বার অভিনীত হয়েছে, দু'বার 'রাজা বসন্ত রায়'-এরই সঙ্গে :

৩০ চৈত্র	[শুক্র 12 Apr]	: সীতার বনবাস, আবুহোসেন ও দুকড়ি দত্ত
২ বৈশাখ ১৩০২	[রবি 14 Apr]	: মান ও দুকড়ি দত্ত
৯ আষাঢ়	[শনি 22 Jun]	: রাজা বসন্ত রায় ও দুকড়ি দত্ত
১০ আষাঢ়	[রবি 23 Jun]	: রাজা বসন্ত রায় ও দুকড়ি দত্ত

অতঃপর এই দু'টি আর কখনও অভিনীত হয়েছে কিনা জানা নেই। 'রাজা ও রানী' অবশ্য এই এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চেই আবার অভিনীত হয়েছে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানির দ্বারা—প্রথম অভিনয় হয় ৯ শ্রাবণ ১৩০৪ [শনি 24 Jul 1897] তারিখে।

উল্লেখপঞ্জী

১ ছিন্নপত্রাবলী [১৩৬৭]। ২৫৯, পত্র ১২০
২ 'সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী', সাহিত্য, মাঘ ১৩১০।৬২১
৩ ঐ। ৬৩১-৩২
৪ আমার জীবন ৫ [দত্তচৌধুরী-সং, ১৩৮২]। ২৫৩
৫ সাহিত্য, অগ্র° ১৩১০।৪৭৭
৬ আমার জীবন ৫।২৫৩
৭ রবি-রশ্মি ২ [১৩৮৮]। ৪৭১-৭২
৮ সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ। ১৬৫-৬৬
৯ ঐ, পৌষ ১৩১০।৫১৩
১০ ঐ। ৫১৪
১১ রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক ১ [১৩৯২]। ৩৯৭
১২ চিঠিপত্র ৫[১৩৫২]।১৬৫-৬৬, পত্র ১৪
১৩ সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১।১৭২
১৪ চিঠিপত্র ৫।১৬৪-৬৫, পত্র ১৪

১৫ *On the Edges of Time* [1981], p. 7

১৬ জোড়াসাঁকোর ধারে [১৩৭৮]। ৮৭

১৭ রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ [১৩৯১]। ১৪

১৮ ড মদনমোহন কুমার, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস' ১ [১৩৮১]। ১২৮-২৯

১৯ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা [সা. প. প.], শ্রাবণ। ৫৫

২০ চিঠিপত্র ৫।১৬৬, পত্র ১৪

২১ ছিন্নপত্রাবলী। ২৬১, পত্র ১২১

২২ ঐ। ২৬৪-৬৫, পত্র ১২২

২৩ ঐ। ২৬৬-৬৭, পত্র ১২৩।

২৪ চিঠিপত্র ৪ [১৩৫০]। ২৫, পত্র ৫

২৫ ছিন্নপত্রাবলী। ২৭৪-৭৫, পত্র ১২৫

২৬ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪ [১৩৯২]। ২৯

২৭ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৫৩৮-এ উদ্ধৃত

২৮ জোড়াসাঁকোর ধারে। ১৫১-৫২

২৯ ছিন্নপত্রাবলী। ২৮১, পত্র ১২৮

৩০ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১।৩৯৯

৩১ ছিন্নপত্রাবলী। ২৮৪, পত্র ১২৯

৩২ সাহিত্য [১৩৬১]। ২৪৮-৪৯

৩৩ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১।৪০০

৩৪ ছিন্নপত্রাবলী। ২৮৫, পত্র ১২৯

৩৫ ঐ। ২৯৩, পত্র ১৩৩

৩৬ ঐ। ২৯৭, পত্র ১৩৬

৩৭ ঐ। ২৯৫-৯৬, পত্র ১৩৫

৩৮ ঐ। ২৯৯, পত্র ১৩৭

৩৯ সা. প., প., শ্রাবণ। ৫৮

৪০ ঐ, মাঘ। ২০৭

৪১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার খাতা'

৪২ সাহিত্য,

৪৩ 'প্রভাত রবি', দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৪৭, পত্র ৯

৪৪ রবীন্দ্রজীবনী ১।৪০২

৪৫ ঘরোয়া [১৩৭৭]। ১১৯

৪৬ ছিন্নপত্রাবলী। ৩০০-০১, পত্র ১৩৮

৪৭ ঐ। ৩০৪-০৫, পত্র ১৪০

৪৮ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩।১৮৩, পত্র ১

৪৯ আমার জীবন ৪ [১৩৮২]। ১২৩

৫০ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস ১।১৪৮-৪৯

৫১ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩।১৮৩, পত্র ২

৫২ ছিন্নপত্রাবলী। ৩০৭, পত্র ১৪১

৫৩ ঐ। ৩০৯, পত্র ১৪২

৫৪ ঐ। ৩১০-১১, পত্র ১৪৩

৫৫ ঐ। ৩১২-১৩, পত্র ১৪৪

৫৬ ঐ। ৩১৭, পত্র ১৪৬

৫৭ রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহভুক্ত মূল পত্র

৫৮ শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম জীবনী'। ৩৭৬

৫৯ পরিজন-পরিবেশে রবীন্দ্র-বিকাশ [1962]। ১০০

৬০ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩।১৮৩, পত্র ৩

৬১ ছিন্নপত্রাবলী। ৩১৯, পত্র ১৪৭

৬২ সা. সা. প., কার্তিক। ১২১-২২

৬৩ ঐ, তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী

৬৪ দ্র *The Indian Mirror*, 15 Aug 1894

৬৫ ছিন্নপত্রাবলী। ৩২১, পত্র ১৪৮

৬৬ আমার জীবন ৪।১২৩-২৬

৬৭ ছিন্নপত্রাবলী। ৩২২-২৩, পত্র ১৪৯

৬৮ ঐ। ৩২৮, পত্র ১৫১

৬৯ ঐ। ৩৪৯, পত্র ১৫৯

৭০ সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক। ৪৭১

৭১ ঐ। ৪৭৩

৭২ ঐ। ৪৭৪

৭৩ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৩১, পত্র ১৫২

৭৪ রবীন্দ্র-স্মৃতি [১৩৩৮]। ৬

৭৫ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৩৬, পত্র ১৫৪

৭৬ ঐ। ৩৪২, পত্র ১৫৬

৭৭ ‘সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী’, সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৩।

৭৮ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৪৬, পত্র ১৫৮

৭৯ সাহিত্য, বৈশাখ ১৩১৩।৪১

৮০ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৫৮, পত্র ১৬৩

৮১ সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক। ৪৭২

৮২ সাহিত্য, কার্তিক। ৪৯৭

৮৩ ঐ, বৈশাখ ১৩১৩।৪৩

৮৪ ঐ, কার্তিক ১৩১৩৪।১৯

৮৫ ঐ। ৪২১

৮৬ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৪৮-৫০, পত্র ১৫৯

৮৭ ঐ। ৩৫৪-৫৫, পত্র ১৬১

৮৮ ঐ। ৩৫৬-৫৭, পত্র ১৬২

৮৯ ঐ। ৩৫১-৫২, পত্র ১৬০

৯০ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৫ [১৩৯৩]। ৫, পত্র ৩

৯১ কবি-প্রণাম [১৩৪৮]। ১০২

৯২ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৫৯-৬০, পত্র ১৬৪

৯৩ ঐ। ৩৬১, পত্র ১৬৫

৯৪ ঐ। ৩৬৮-৬৯, পত্র ১৬৯

৯৫ ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৪।৭৫৪

৯৬ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৬৭, পত্র ১৬৮

৯৭ দ্র তত্ত্ব°, মাঘ ১৮১৬ শক। ১৬৭-৬৮

৯৮ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৯৯ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৭৬, পত্র ১৭৪

১০০ ঐ। ৩৭৯-৮০, পত্র ১৭৬

১০১ ঐ। ৩৮১, পত্র ১৭৭

১০২ ঐ। ৩৮২, পত্র ১৭৮

১০৩ ঐ ৩৮৭, পত্র ১৮০

১০৪ ঐ। ৩৮৯, পত্র ১৮১

১০৫ ঐ। ৩৯১, পত্র ১৮২

১০৬ ছিন্নপত্র [১৩৬২]। ১৫-১৬, পত্র ৫

১০৭ সাধনা, অগ্র°। ৯৬

১০৮ তত্ত্ব°, মাঘ। ১৫৩-৬০

১০৯ সাহিত্য, মাঘ। ৭০৩-০৪

১১০ ঐ। ৭০৪

১১১ সাধনা, পৌষ। ১৮৯-৯০

১১২ ঐ। ১৯০

১১৩ ঐ। ১৯১

১১৪ ঐ। ১৯৩

১১৫ রবীন্দ্রবীক্ষা ১২ [১৩৯১]। ১১, পত্র ১

১১৬ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৯৫, পত্র ১৮৫

১১৭ ঐ। ৩৯৫, পত্র ১৮৫

১১৮ ঐ। ৩৯৭, পত্র ১৮৬ [4 Feb ২২ মাঘ]

১১৯ সা. প. প., বৈশাখ ১৩০২।৮১

১২০ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৪১, পত্র ১

১২১ ঐ। ১৪১-৪২, পত্র ২

১২২ ঐ। ১৪২, পত্র ৩

১২৩ ঐ। ১৪২, পত্র ২

১২৪ সাহিত্য, ফাল্গুন। ৭৭২

১২৫ দ্র 'রবীন্দ্রনাথের রহস্যগল্প', রবীন্দ্রনাথের রহস্য গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ [1984]। ১৯-২৩।

১২৬ রবীন্দ্রস্মৃতি। ৪১-৪২

১২৭ 'রবীন্দ্রনাথ ও এডগার অ্যালান পো', রবীন্দ্র-সাহিত্যের নব রাগ [1961]। ৮২

১২৮ সাধনা, মাঘ। ২৬৩

১২৯ ঐ। ২৭৩

১৩০ দ্র স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ [১৩৯৩]। ৬৪-৭৪

১৩১ রবীন্দ্রজীবনী ১।৪১৬, পাদটীকা ১

১৩২ সাধনা, মাঘ। ২৮৭-৮৮

১৩৩ ঐ। ২৮৯

১৩৪ ঐ। ২৯০

১৩৫ ছিন্নপত্রাবলী। ৩৯৯, পত্র ১৮৭

১৩৬ ঐ। ৪০২-০৩, পত্র ১৮৯

১৩৭ ঐ। ৪০৪, পত্র ১৯০

১৩৮ ঐ। ৪০১, পত্র ১৮৮

১৩৯ ঐ। ৪১০-১১, পত্র ১৯৩

১৪০ ঐ। ৪১০, পত্র ১৯৩

১৪১ ঐ। ৪১২, পত্র ১৯৪

১৪২ ঐ। ৪১৬, পত্র ১৯৫

১৪৩ ঐ। ৪১৭, পত্র ১৯৬

১৪৪ ঐ। ৪২৩, পত্র ১৯৮

১৪৫ ঐ। ৪২৫, পত্র ১৯৯

১৪৬ 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র', দেশ, সাহিত্য ১৩৭০। ১২১

১৪৭ সাধনা, ফাল্গুন। ৩৯৫-৯৬

১৪৮ ঐ। ৩৯৬-৯৭

১৪৯ ঐ। ৪০০

১৫০ কবি-প্রণাম। ১০১

১৫১ ছিন্নপত্রাবলী। ৪২৯, পত্র ২০১

১৫২ ঐ। ৪৩৮, পত্র ২০৬

১৫৩ ঐ। ৪৩৭, পত্র ২০৫

১৫৪ কবি-প্রণাম। ১০৩

১৫৫ ঐ। ১০৩

১৫৬ ঐ। ১০২

১৫৭ সা. প. প., বৈশাখ ১৩০২।৯৫-৯৭

১৫৮ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৪২, পত্র ২০৮

১৫৯ বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান [1982]। ২৮৩

১৬০ চিঠিপত্র ৫।১৬৫, পত্র ১৪

১৬১ শ্রুতি ও স্মৃতি [অপ্রকাশিত], রবীন্দ্রন-সংগ্রহ

১৬২ দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৩৮১, পত্র ১৭৭

১৬৩ *The Indian Mirror*, July 17, *The Indian Messenger* থেকে উদ্ধৃত

* পরিষদের মুখপত্রের 10 Mar 1894 [No. 8]-সংখ্যায় পৌষ ১৩০০-সংখ্যা সাধনায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের 'কর্ত্তব্যনীতি' 'বিনি পয়সায় ভোজ' 'ইংরাজের আতঙ্ক' রচনাগুলি সমালোচিত হয়।

* পত্র-শীর্ষে 'মঙ্গলবার' আছে, জিজ্ঞাসা-চিহ্নটি সম্পাদকের দেওয়া। 1894-এ লেখা অনেক চিঠিতে বার ও তারিখের গোলমাল আছে।

* চিঠিপত্র ১ [১৩৭২]। ৩২, পত্র ১৪; সম্পাদক কেন-যে চিঠিটি 'জুন-জুলাই ১৮৯৩'-এ লেখা বলে অনুমান করেছেন বোঝা শক্ত।

* এখানে ইন্দিরা দেবী 'শ্রী' লিখে কেটে দিয়েছেন।

* নবীনচন্দ্র 19 Nov 1906 তারিখে রেঙ্গুন থেকে একটি পত্রে গিরিশচন্দ্রকে লিখেছেন : '···একবার রাণাঘাটে তোমার একটি গান গাইলে, রবিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন? গানটী বড় সুন্দর না?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"গানটি কার?" আমি বলিলাম "গিরিশের"। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"শুনিয়াছি *লোকটা* বেশ গান বাঁধিতে পারে।" আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম!' [বক্রাক্ষর আমাদের]—নবীনচন্দ্র রচনাবলী ২। ৫৪০; আমাদের ধারণা, শব্দ-ব্যবহারের এই পার্থক্য নবীনচন্দ্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থেকে সৃষ্ট হয়েছে, গিরিশচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবজ্ঞা-সূচক মনোভাব এ থেকে প্রতিফলিত হয় না।

* বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৬। ৫; 17 Oct 1898-এর একটি পত্রে মনোমমাহন রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'I have read the Paroshpathar several times again, and am never tired of it]—it seems to have soul-echoes of endless and haunting beauty.'

* বক্রাক্ষর শব্দগুলি কালি বুলিয়ে কাটা, যতটুকু পড়া যায় তাতে প্রথম শব্দটি 'শৈলেশের' বলেই মনে হয়।

* পুলিনবিহারী সেন অনুমান করেছেন : 'সাধনায় (মাঘ ১৩০১) তাঁর একটি কবিতা-প্রকাশের ['রানী', পৃ ২৯২] ফলে তিনি স্বনামে পত্র লিখে পরিচিত হতে সাহসী হন।' দ্র ঐ। ১৭৭—কিন্তু উক্ত পত্র লেখার সময়ে সাধনা-র মাঘ-সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি।

*১ পাণ্ডুলিপিতে তারিখ আছে '১ ফাল্গুন' [12 Feb], 16 Feb সাতারায় চিঠি পৌঁছনোর তারিখের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য ছিন্নপত্রাবলী-র সম্পাদক 11 Feb তারিখ অনুমান করেছেন।

*২ পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ এখানে নীল পেন্‌সিলে '?'-চিহ্ন ব্যবহার করেছেন, সম্ভবত ছিন্নপত্র-সংকলনের সময়ে তিনি এই 'ঠা···' কে সনাক্ত করতে পারেন নি। পত্রটি অবশ্য ছিন্নপত্র-তে গৃহীত হয় নি।

প ঞ্চ ত্রিং শ   অ ধ্যা য়

১৩০২ [1895-96] ১৮১৭ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের পঞ্চত্রিংশ বৎসর

১৮১৬ শকের চৈত্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথের যুগ্ম-স্বাক্ষরে 'বিজ্ঞাপন' মুদ্রিত হয়েছিল : '১ বৈশাখ নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনে আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্ন প্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।' এই ঘোষণা অনুযায়ী 'বষারম্ভে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা', 'ঈশ্বরই অমৃতসেতু', 'উদ্বোধন', 'প্রার্থনা' ইত্যাদির মাধ্যমে ১ বৈশাখ [শনি 13 Anr 1895] ভোরে আদি ব্রাহ্মসমাজের নববর্ষ-উৎসব পালিত হল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নূতন কোনো গান রচনা করেন নি, গত বৎসরের মাঘোৎসবের জন্য লেখা খাম্বাজ-ঝাঁপতালে রচিত 'নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়' [দ্র গীত ১। ১৬১] গানটিই অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় [দ্র তত্ত্ব, জ্যৈষ্ঠ। ২৪]।

বৎসরের প্রথম দিনটি তাঁর ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছিল। পরের দিন 14 Apr [রবি ২ বৈশাখ] তার বর্ণনা দিয়ে সাতারায় ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'কাল সমস্ত দিন খুব ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।···অন্য কোনো দিন হলে আধমরা হয়ে পড়তুম কিন্তু কাল খুব ঠাণ্ডা ছিল—আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, বেশ লাগছিল। যদিও নিমন্ত্রণ সেরে এবং সভাপতিত্ব করে বেড়ানোর মধ্যে কিছুমাত্র কবিত্ব নেই, তবু কাল একটা জায়গা থেকে আর-একটা জায়গায় যাবার মধ্যবর্তী সময়টুকুতে মনের মধ্যে ভারী একটা অপরূপ কবিত্ব-বেদনার সঞ্চার হচ্ছিল—ঠিক যেন একটা গান শুনছিলুম এবং মনের মধ্যে যে-একটা অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হচ্ছিল তার কোনো অর্থ বুঝতে পারছিলুম না।···কাল রাত্রে জ্যো [তিঃ-প্রকাশ]-দের ওখানে অ[বন]* একটা এস্রাজ হাতে করে বসল—বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এবং বাতাসে গাছের পাতার শব্দ হচ্ছে। আমি প্রথমে 'ভরা বাদর' গাইলুম। তার পরে গাইলুম 'আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে'—গলাটাও বেশ ছিল, মনটাও বেশ পরিপূর্ণ ছিল, নববষটিও বেশ অনুকূল ছিল, বেশ জমে উঠেছিল।'[১]

তরুণ ভক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র লেখালেখি এই সময়েও চলছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি না পাওয়া যাওয়ায় এই পত্রধারা একতরফা। ৩ বৈশাখ প্রভাতকুমার লিখেছেন : 'আপনার পত্র পাইয়া আপনার অবস্থা সম্বন্ধে আমার শোচনীয় ধারণা হইল।···আপনার এবারকার পত্রখানা যেন কেমন কেমন হইয়াছে। যাহাকে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার জন্য একটা সর্বনামও ব্যবহার করেন নাই। এ যেন সংবাদপত্রের স্তম্ভের জন্য সম্পাদকীয় মন্তব্য। আপনার কবিতা পাঠে লুব্ধ হইয়া আপনাকে আরও কাছে

হইতে দেখিবার জন্য আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলাম। সেইজন্য ভব্যতার সমুদ্র এক লম্ফে পার হইয়া আপনার কাছে গিয়া উপস্থিত হই। আপনি যদি সাত হাত দূর হইতে অভিবাদন প্রত্যর্পণ করিয়া পাশ কাটাইতে চেষ্টা করেন, তবে আমার এ সমুদ্রলঙ্ঘন বৃথা হইবে।'[২] প্রভাতকুমারের অভিযোগ ও অভিমানের কারণ আছে, কিন্তু এই ধরনের পত্র পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কতটা সংকোচ বোধ করতেন 'অনামিকা'র পত্র সম্পর্কে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৪১২-১৩, পত্র ১৯৪] তার বিবরণ আছে; তাছাড়া দেখা যায়, বাইশ বছরের এই যুবককে 'আপনি-তুমি'র মধ্যে কোন্ সর্বনামটিতে সম্বোধন করবেন এ নিয়ে তাঁর দ্বিধা ১ অগ্র° ১৩০২-এর পত্রেও কাটে নি। প্রভাতকুমারের উল্লিখিত পত্রের যে উত্তরের বর্ণনা তাঁর ১৬ বৈশাখের চিঠিতে আছে, সেটি থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বভাবটি ধরা পড়ে : 'আপনার এবারকার পত্রখানিতে প্রচুর হাস্যরস বিদ্যমান আছে।…"বাক্য স্ফূর্তি হয় না।" হাঃ হাঃ হাঃ "বাক্য স্ফূর্তি হয় না"ই বটে। "কবি বলিয়া ভ্রম করিয়া থাক"—হাঃ হাঃ হাঃ ভ্রমই বটে।'[৩] মার্জিত আভিজাত্য-প্রসূত বিনয় ও সংকোচপরায়ণ ব্যক্তিস্বভাবের এই পরিচয়টি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে অনেকটা সহায়তা করে।

কিন্তু এই ভক্তের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ১৯ চৈত্র ১৩০১ প্রভাতকুমার লিখেছিলেন : 'কয়েকদিন হইল, আমি আটটি ইংরাজি কবিতা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছি। নবীন বর্ষের নবীন প্রভাতে সেগুলি আপনার হস্তে উপহার দিব মনে করিতেছি'। বৈশাখের শুরুতেই এগুলি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ওই মাসের সাধনা-য় 'প্রেম-পঞ্জিকা (Charles Kent-রচিত Love's Calender কবিতার অনুকরণ)' কিছু সংশোধন-সহ* [পৃ ৫৮৫-৮৬] মুদ্রিত করেন। আরও একটি অনুবাদ 'এসেছিল গিয়েছে চলিয়া' প্রকাশ করেন আষাঢ়-সংখ্যায় [পৃ ১৮৮-৯০]। ১৬ বৈশাখ প্রভাতকুমার লেখেন : 'জ্যৈষ্ঠের সাধনায় ইহার সঙ্গে যে কবিতাটি পাঠাইলাম, তাহা ছাপিতে হইবে। এটি এতদিন পাঠাই নাই, কারণ ইহাতে 'গলিত-লৌহ রবি' যে ছত্রটি আছে, তাহা অন্য সময়ে খাটিবে না।…সুতরাং অনুরোধ, ঠেলিয়া ঠুলিয়া একটু স্থান করিয়া দিবেন।' রবীন্দ্রনাথ এই অনুরোধও রক্ষা করেছিলেন, 'ছবি' নামক দীর্ঘ কবিতাটি জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা [পৃ ৫৯-৬১] সাধনা-তেই মুদ্রিত হয়েছিল। এর পরেও রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারের কবিতা সাধনা ও স্ব-সম্পাদিত ভারতী [১৩০৫]-তে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁকে গদ্যপ্রবন্ধ লেখার উপদেশ দিয়েছিলেন—শেষ পর্যন্ত ছোটগল্প ও উপন্যাসেই প্রভাতকুমার তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন।

সাধনা, বৈশাখ ১৩০২ [৪/৬] :

৪৮৯-৫০৪ 'মানভঞ্জন' দ্র গল্পগুচ্ছ ২০। ১৯৭-২০৭

৫৪৯-৭৭ 'বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য' দ্র সাহিত্য ৮। ৪১৫-৩২

৫৭৭-৮৪ 'আলোচনা'

৫৭৭-৮১ ফেরোজশা মেটা; ৫৮১-৮৪ বেয়াদব; ৫৮৪ কথামালার একটি গল্প;

৫৮৭-৮৮ 'গ্রন্থ সমালোচনা'

৫৮৭-৮৮ রঘুবংশ। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কর্তৃক অনুবাদিত; ৫৮৮ ফুলের তোড়া। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; ৫৮৮ নীহার বিন্দু। নিতাইসুন্দর সরকার

'মানভঞ্জন' গল্পে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার সমাজজীবনের একটি বিশেষ অংশের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হত, ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকলেও সেখানকার পরিবেশের কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন—আর থিয়েটারের নটীদের নিয়ে উচ্চবিত্ত পরিবারের উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের অসামাজিক কার্যকলাপ চালু কেচ্ছার আকারে লোকের মুখে মুখে ফিরত। 'মানভঞ্জন' গল্পে রবীন্দ্রনাথ এই পরিবেশটিকে রূপ দিয়েছেন। নিত্যপ্রিয় ঘোষ কিছু বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে কাহিনীর নায়ক-নায়িকার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও পাবলিক স্টেজ (১৮৭৭-১৯০০)' প্রবন্ধে : 'গল্পের নায়ক গোপীনাথ শীল ধনাঢ্য পিতার উচ্ছৃঙ্খল পুত্র। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ভক্ত গোপীনাথ সুন্দরী স্ত্রীকে অবহেলা করে, সময় কাটায় নটীদের সঙ্গে, যাদের একজন লবঙ্গ। স্ত্রী শোধ তোলে গোপীনাথের অলক্ষ্যে রঙ্গালয়ে অভিনয় করে। এইরকম উচ্ছৃঙ্খল কাপ্তেন রবীন্দ্রনাথের আশেপাশেই ছিল, যাদের একজন স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। চোরবাগানের দত্তবাড়ির ছেলে, এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ছোট ভাই। ১৮৯৫ সালে মানভঞ্জন লেখার সময়, অমর দত্তের বয়স উনিশ, থিয়েটার করার জন্য উন্মত্ত, নারী ও সুরাতে মগ্ন, বাড়ীতে স্ত্রী অবহেলিত, এবং কলকাতায় উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য বিখ্যাত।···গোপীনাথ শীল নামটির সঙ্গে গোপাললাল শীলের সাদৃশ্যও যথেষ্ট। মতিলাল শীলের নাতি গোপাললাল এমারেল্ড থিয়েটারের পত্তন করেছেন ১৮৮৭ সালে, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে ধরনের থিয়েটারকে বলতেন কাপ্তেনী থিয়েটার, খেয়ালী বড়লোকের শখ। লবঙ্গ নামটিও তখনকার নটীদের নামের মতোই। গোলাপ, শ্যামা, এলোকেশী, জগত্তারিণী প্রথম বছরের (১৮৭৩) নটীদের নাম।'[৪] রঙ্গালয়ের মালিকদের বিব্রত করার জন্য রক্ষিতা অভিনেত্রীকে নিয়ে নৌকাবিহারে যাওয়ার কাহিনীও দুর্লভ নয়। এই জীবনকে ব্যঙ্গ ও কবিত্বের রসে পূর্ণ করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

ফাল্গুন ১৩০১-সংখ্যার 'আলোচনায় 'পুলিস্ রেগুলেশন বিল'-এর দোষ-ত্রুটি দেখানো হয়েছিল—সেটিতে রবীন্দ্রনাথের সংযোজন থাকলেও সম্পূর্ণ রচনাটি তাঁর লেখা কিনা এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কিন্তু ফেরোজশা মেটা সুপ্রীম কাউন্সিলে এই বিল সম্পর্কে যে প্রতিবাদ করেছিলেন, বর্তমান সংখ্যার 'আলোচনা'-য় তিনি নিজেই সেই বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেছেন। ইংরেজ শাসকবর্গ নিজ স্বার্থে এই প্রতিবাদকে বেয়াদবি মনে করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর আচরণকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন : 'মেটা যে কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাতে সফল হইতে পারেন নাই কিন্তু তাহা হইতে উচ্চতর সফলতা লাভ করিয়াছেন।···আমরা যে আমরা, আমাদের লোক যে আমাদেরই লোক, এই চেতনাটি যত প্রকারে যত আকারে সজাগ হইয়া উঠে ততই আমাদের মঙ্গল; আমাদের কাজ আমাদের দেশের লোক করিতেছে ইহা আমরা যেখানে যত পরিমাণে দেখিতে পাই ততই আমাদের আনন্দের বিষয়। সম্ভবতঃ অনেকস্থলে আমরা অনেক ভ্রম করিব, অনেক অযথাচরণ করিব, এমন কি, অনভিজ্ঞতা বশতঃ আমাদের নিজেদের স্বার্থেও আঘাত দিব তথাপি পরিণামে তাহাতে আমাদের পরিতাপের বিষয় থাকিবে না। অতএব ভারতমন্ত্রীসভায় যে লোক আমাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের লাঞ্ছনা শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের হইয়া লড়িয়াছেন··· তাঁহাকে আমাদের সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতি প্রকাশ করিয়া আমরা অলক্ষিত ভাবে আপনারা সকলেই ঘনিষ্ঠতর সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে বদ্ধ হইতেছি।'[৫] কথামালার একটি গল্প উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন : "আমাদের পোলিটিক্যাল ক্ষেত্র হইতে কোন গুপ্তধন পাইয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে এরূপ যাঁহারা

প্রত্যাশা করেন তাঁহারা নিরাশ হইবেন—কিন্তু সকলে একত্র মিলিয়া কর্ষণে যে শস্য জন্মিবে তাহাতে পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে।'[৬] দেশবাসীকে একত্ববন্ধনে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই যে সবচেয়ে বড়ো কাজ, এই কথা বার বার বলতে রবীন্দ্রনাথ ক্লান্তি বোধ করেন নি।

'নবীনচন্দ্র দাস এম. এ. কর্ত্তৃক অনুবাদিত' রঘুবংশ দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থটির সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করা নিরতিশয় কঠিন কাজ : কারণ, সংস্কৃত কবিতার শ্লোকগুলি ধাতুময় কারুকার্য্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহতভাবে গঠিত—বাঙ্গলা অনুবাদে তাহা বিশ্লিষ্ট এবং বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু নবীন বাবুর রঘুবংশ অনুবাদ খানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।···অনুবাদক সংস্কৃত কাব্যের লাবণ্য বাঙ্গলাভাষায় অনেকটা পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চদশ সর্গে তিনি যে দ্বাদশাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণে ভাল ঠেকিল না। বাঙ্গলার পয়ার ছন্দে প্রত্যেক ছত্রে যথেষ্ট বিশ্রাম আছে,—তাহা চতুর্দ্দশ অক্ষরের হইলেও তাহাতে অন্যূন ষোলটি মাত্রা আছে—এই জন্য পয়ার ছন্দে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিবার স্থান পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বাদশাক্ষর ছন্দে যথেষ্ট বিশ্রাম না থাকাতে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিলে ছন্দের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়; যেন কুঠির পান্সীতে মহাজনী নৌকার মাল তোলা হয়। দ্বাদশাক্ষর ছন্দে ধীর গমনের গাম্ভীর্য্য না থাকাতে তাহাতে সংস্কৃত কাব্যসুলভ ঔদার্য্য নষ্ট করে।'[৭] এর পরে তিনি গ্রন্থটি থেকে একটি পয়ার ও একটি দ্বাদশাক্ষর শ্লোক উদ্ধৃত করে যুক্তাক্ষর ব্যবহারে ছন্দোসৌন্দর্যের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়েছেন।

'নীহার-বিন্দু' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছে : 'গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিতেছেন—"পাখী গান গাহিয়া যায়,সুর, মিষ্ট কি কড়া,—মানুষে শুনিয়া, ভাল কি মন্দ বলিবে,—সে তার কোন ধার ধারে না; সে সুধু, আপন মনে আপনিই, নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, গাহিয়া যায়।" অতএব ভরসা করি আমরা এই গ্রন্থলিখিত গান ক'টি ভাল না বলিলেও গ্রন্থকারের নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিবার কোন ব্যাঘাতই হইবে না।'[৮]

বৈশাখের সাধনা-র কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই রবীন্দ্রনাথ আলস্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। 24 Apr [বুধ ১২ বৈশাখ] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'আজ সকাল বেলা থেকে সুগভীর আলস্যে আমাকে আক্রমণ করেছে।···আমাদের জোড়াসাঁকোর দোতলার নির্জন ঘর এবং বারান্দায় অকর্মণ্যভাবে কেবলই ঘুর ঘুর করে বেড়িয়েছি। শরীরের সমস্ত সন্ধিগুলো যেন শিথিল হয়ে পড়েছিল, কোনো লেখা অথবা পড়ায় হাত দেবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না।'[৯] দিন-সাতেক পরে 2 May [বৃহ ২০ বৈশাখ] তারিখের চিঠিতেও প্রায় একই কথা : 'আজ কোথা থেকে একটা নহবৎ শোনা যাচ্ছে। সকাল বেলাকার নহবতে মনটা বড়োই ব্যাকুল করে তোলে।'[১০] আসলে, রবীন্দ্রনাথ কাজের মধ্যেই থাকেন ভালো—কাজের বোঝা হালকা হয়ে গেলে অনির্দিষ্ট ব্যাকুলতা তাঁকে পীড়িত করতে থাকে। ২২ বৈশাখ [শনি 4 May] জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ৪৭তম জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে তাঁকে একটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেন : Isaac Taylor-এর লেখা '*The Origin of Aryans*'। গ্রন্থটি তাঁরা দু'জনেই খুব মন দিয়ে পড়েছিলেন, উভয়ের হস্তাক্ষরে বহু মন্তব্য বইটিতে রয়েছে।

এবারে ২৫ বৈশাখ [মঙ্গল 7 May] রবীন্দ্রনাথ চৌত্রিশ বৎসর পূর্ণ করে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করলেন। আত্মীয়েরা এই উপলক্ষে নিশ্চয়ই উপহারাদি দিয়েছিলেন, কিন্তু একটি মূল্যবান উপহার এসে পৌঁছল সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে—তাঁরা তখন পুনায় অবস্থান করছেন। ইন্দিরা দেবী এই উপহার সম্পর্কে লিখেছেন : 'ছেলেবেলায় আমি আর সুরেন রবিকাকার একটি বিশেষ জন্মদিনে একটি খাতায় আমাদের প্রিয় ইংরেজ কবিদের বিখ্যাত কবিতাগুলি নকল করে তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম। তার নকলের অংশটা হাতের লেখা, কিন্তু প্রত্যেক পৃষ্ঠায় যে সেয়াইকলমের নকশা করা আছে সেটি আমার দাদার হাতের কারিগরি। তাঁর প্রতি আমাদের ভাইবোনের ভক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে এই খাতাটি কৌতূহলী যাঁরা তাঁরা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে দেখতে পারেন। সে যুগের ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তখন আমাদের নিষ্ঠা, আর শিক্ষাদানের ব্যাপারে রবিকাকার প্রবল উৎসাহের পরিচয় এতে পাওয়া যাবে, কারণ রবীন্দ্রসদনে পৌঁছবার বহু আগে খাতাখানি যখন তাঁর কাছে ছিল তখন তিনি রথীকে দিয়ে আমাদের সংকলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য পরবর্তী কবিদের রচনা তাতে নকল করাতে আরম্ভ করেছিলেন।'[১১] শেষের কথাটি অবশ্য ঠিক নয়—একটি ছাড়া বাকি সবগুলি কবিতাই ইন্দিরা দেবীর হাতে লেখা—'Ode to Psyche' অন্য কারোর হাতে লেখা শেষ কবিতাটিও পরবর্তী কালের কোনো কবির রচিত নয়, Keats-এর, যাঁর কবিতা দিয়ে সংকলনটির সূত্রপাত হয়েছে।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কালো কাপড়ে মোড়া পাতলা মলাটের ২৮০ পৃষ্ঠার এই খাতাটির সংগ্রহণ-সংখ্যা ৩৯৯। Lyric Album নামে অভিহিত এই খাতাটি সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী '6.5.95' [সোম ২৪ বৈশাখ] তারিখ লিখে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন। Keats, Shelly, Browning, Tennyson, Wordsworth, Byron, Moore, Scott, Longfellow, Poe, Rossetti, Swinburne প্রভৃতির লেখা মোট ৭৩টি কবিতা এই খাতায় নকল করা হয়েছে, তার মধ্যে ৭২টি-ই ইন্দিরা দেবীর হাতে লেখা। লিখিত পৃষ্ঠা ১৯৮, বাকি পৃষ্ঠাগুলি সাদাই থেকে গেছে। অনুলিখিত কবিতাগুলি থেকে তাঁদের পাঠরুচির হদিশ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে একবার দার্জিলিং যান। তাঁর যাওয়া ও ফিরে আসার তারিখ অনুমান-নির্ভর হলেও তিনি যে এই সময়েই দার্জিলিং গিয়েছিলেন, সেটি জানা যায় সাধনার ক্যাশবহি-র ৫ জ্যৈষ্ঠ [শনি 18 May] তারিখের হিসাব থেকে : 'বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট সাধনার বৈশাখ মাসের মাসকাবার গতকল্য দ্বারজিলিং রেজেষ্টরি বুক পোস্টে পাঠান ব্যয় ল ৬'। ২৬ বৈশাখ সত্যপ্রসাদ ১০০ টাকা 'রবিমামাকে হাওলাত' দিয়েছিলেন, হয়তো দার্জিলিং যাওয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে এই ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে একটি তারিখ-হীন চিঠিতে ['শনিবার'] লিখেছিলেন : 'আমার একটি রুগ্না ভ্রাতুস্পুত্রীকে লইয়া আজই আমাকে দার্জ্জিলিং যাইতে হইতেছে।' চিঠিটি এই সময়ে লেখা হওয়াই সম্ভব, কারণ এর পরেই তিনি লিখেছেন : 'শীঘ্র বাড়ি বদল করা আপনার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই। যোড়াসাঁকোর কাছে হইলেই ভাল।'[১২] ঠাকুরদাসের স্ত্রীর বসন্ত রোগ হওয়ায় তাঁর পারিবারিক বিশৃঙ্খলার কথা আমরা আগেই বলেছি, হয়তা সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জোড়াসাঁকোর কাছে বাসা নিতে বলেছেন।

এই অনুমান সঠিক হলে রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিং যাত্রার তারিখটি ২৯ বৈশাখ [শনি 11 May] বলে নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু তাঁর সঙ্গিনী 'রুগ্না ভ্রাতুস্পুত্রী'টি কি অভিজ্ঞা দেবী? তাঁর বিবাহ ও মৃত্যুর তারিখ আমাদের জানা নেই। যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, সেই ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিজ্ঞার

পরের বোন মনীষা দেবীর বিয়ে হয় ১১ আষাঢ় ১৩০৩ [24 Jun 1896] তারিখে। সুতরাং তার বছরখানেক আগে অভিজ্ঞার বিয়ে হয়েছিল এমন অনুমান করা চলে, হয়তো এই বৈশাখ মাসেই তাঁর বিবাহ হয়। ড চিত্রা দেব লিখেছেন : 'অভিজ্ঞা ছিলেন শান্ত, গম্ভীর, রোদনভরা বিষন্ন। কালব্যাধি যে তলে তলে বাসা বেঁধেছে সে কথা কেউ বুঝতে পারেনি। বিয়ের রাতে ঘটলো অঘটন। অনুষ্ঠানের শেষেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হঠাৎ জ্বর, প্রবল জ্বর। দিনে দিনে অসুখ বেড়ে চলে এবং জানা যায় দুরারোগ্য ক্ষয় রোগ তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছে। চিকিৎসার অসাধ্য; কৃশ-পাণ্ডুর চাঁদের মতোই একমাসের মধ্যে হারিয়ে গেলেন অভিজ্ঞা। মৃত্যু হোলো জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই।'[১৩] এমন হতে পারে যে, অভিজ্ঞার অসুস্থতা প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্নেহময় পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ বায়ু-পরিবর্তনের জন্য তাঁকে দার্জিলিং নিয়ে গিয়েছিলেন।

কবে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, অভিজ্ঞা দেবীর মৃত্যু কবে ঘটেছিল, আমাদের জানা নেই। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বা তাঁকে লিখিত যে চিঠিগুলি পাওয়া যায়, তার কোনোটিতেই এরূপ প্রসঙ্গের আভাসও নেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ২৩ জ্যৈষ্ঠের চিঠি থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ১৮ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 31 May] পতিসর থেকে তাঁকে লেখা একটি পত্রে মানসী-র কয়েকটি কবিতার অর্থ ব্যাখ্যা করেছিলেন।[১৪] অনুমান করা যায় যে, এর কয়েকদিন আগেই তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন ও পতিসর যাত্রা করেছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকেও তিনি পতিসর থেকে একটি পত্র লেখেন। এটি পেয়ে 1 Jun [শনি ১৯ জ্যৈষ্ঠ] সুরেশচন্দ্র তাঁকে যে চিঠি দেন, উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণের জন্য সেটি নানা কারণে মূল্যবান। পত্রটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

কাল আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

আপনার "ফটো" শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচীকে দেওয়া হয়। মৃত ক্ষেত্রনাথ গুপ্ত বাগচী মহাশয়ের পরিচিত ও তাঁহার চিত্রকলার শিষ্য ছিলেন। ক্ষেত্রবাবু ছবি করিতে বাগচী মহাশয়কে দিয়াছিলেন, কিন্তু শিল্পীর আলস্যবশতঃ ছবির কিছুই অগ্রসর হয় নাই। ইতিমধ্যে ক্ষেত্রবাবু লোকান্তরিত হইয়াছেন,—এবং ছবিও সেইভাবে বাগচী মহাশয়ের কাছে আছে। কাল আমি ছবির জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম। বাগচী মহাশয় তখন বাহিরে ছিলেন। আমি দু-এক দিনের মধ্যে বাগচী মহাশয়ের নিকট হইতে আপনার ফটো আনাইয়া আপনাকে পাঠাইব। কিন্তু ডাকে ফটো খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যদি আপনার বিশেষ প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে আমি ফটো মাননীয় সত্যবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিতে পারি। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করা যাইবে। অনতিক্রমণীয় কারণে আপনার মফস্বল-যাত্রার পূর্ব্বেই ছবি পাঠাইতে পারিলাম না।—ক্ষমা করিবেন।

আপনার সাতখানি বই অদ্য ফেরত পাঠাইতেছি। "পামিরের" দ্বিতীয় খণ্ড পরে পাঠাইয়া দিব। বোধ করি, তাহাতে আপনার অসুবিধা হইবে না।

"সাধনায়" "জ্যোৎস্নারাত্রে" পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। আপনার মায়াময়ী লেখনী অমর হইয়া, এইরূপ রহস্যমধুর উদার উন্মুক্ত কবিতার সৃষ্টি করুক। আপনার এখনকার কবিতায় যে উন্নত বাসনা, উদার উন্মুক্ত বিশ্বজনীন ভাব ও যে পূত বিকশিত সৌন্দর্য্যরহস্যের একাগ্র উপাসনা দেখা যায়, বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই।

আপনি আবার কবে কলিকাতা আসিতেছেন?

আপনার বোধ হয় মনে আছে, আমি আপনার কবিতার একটি সংগ্রহ প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলাম, এবং আপনি তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। আমার আর একটি প্রার্থনা ছিল,—আপনার কোন কবিতাগুলি আপনি সংগ্রহে নিবদ্ধ হইবার উপযোগী মনে করেন,—আপনি পুস্তকে সেইগুলি চিহ্নিত করিয়া দেন। যদি আপনার সুবিধাজনক হয়, তাহা হইলে এবার মফঃস্বলে গিয়া অবকাশমতে যদি আপনার গ্রন্থাবলী একবার পড়িয়া সংগৃহীত হইবার যোগ্য কবিতাগুলি চিহ্নিত করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি বড় উপকৃত হই।

আপনি আমাকে "ন্যান্সনের মেরুভ্রমণবৃত্তান্ত" পড়িতে দিতে চাহিয়াছিলেন। সেখানি যদি সুবিধা হয় এই লোকমাং পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

আশা করি, আপনি ভাল আছেন। আমার শরীর বড় অসুস্থ। ইতি; ১লা জুন ১৮৯৫।[১৫]

—আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, যিনি এই চিঠি লিখেছেন তিনিই কয়েক বছরের মধ্যে রবীন্দ্র-বিরোধীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন!

চিঠিটিতে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। অন্নদাপ্রসাদ বাগচী 1849-1905] তখনকার দিনের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, এন্‌গ্রেভার ও লিথোগ্রাফার, আর্ট স্টুডিয়োর প্রতিষ্ঠাতা। সেই সময়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের লিথোচিত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ও বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করা হত। এইভাবে জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে মহর্ষির চিত্র ও ভাদ্র কার্তিক-সংখ্যা সাধনা-য় বিদ্যাসাগরের চিত্র মুদ্রিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ছবিও বিক্রয় করা হত সেটি জানা যায় প্রভাতকুমারের ৯ কার্তিকের পত্র থেকে : 'তাঁহার [জামালপুরের 'রেলওয়ে অফিসের দরিদ্র কর্মচারী নাম—শ্রীশচন্দ্র রায়'] ঘরে অন্নদাচরণ বাক্‌চীর প্রস্তুত আপনার ছবি টাঙ্গানো রহিয়াছে দেখিলাম।'[১৬] এর আগে ১৭ শ্রাবণ তিনি লিখেছিলেন : যেদিন সঞ্জীবনীতে আপনার ছবি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছেন, সেইদিনই আনিতে পাঠাইয়াছেন।'[১৭] রবীন্দ্রনাথের সেই বয়সে এতখানি পরিচিতি ও জনসমাদরের দিক দিয়ে সংবাদটি মূল্যবান, আর এই ব্যাপারে সুরেশচন্দ্রের ভূমিকা উপরে উদ্ধৃত পত্রটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনী-প্রীতির কথা আমরা জানি, তিনি সেই আনন্দের অংশ অপরকে দিতে চাইতেন এই খবরটিও পত্রটিতে পাওয়া যায়, তাঁর পঠিত অন্তত দুটি ভ্রমণকাহিনীর নামও আমরা জানতে পারছি। তবে এই প্রসঙ্গে এটিও বোঝা যাচ্ছে যে, পত্রবাহক মারফৎ চিঠিটি পাঠাবার সময়ে সুরেশচন্দ্র জানতেন না যে, রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ত্যাগ করে পতিসর যাত্রা করেছেন।

পত্রটির সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ রবীন্দ্রনাথের কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছাটি। সুরেশচন্দ্রের প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ সম্মতিও দিয়েছিলেন—কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে তিনি সত্যপ্রসাদের উদ্যোগে সমগ্র 'কাব্যগ্রন্থাবলী' নোটকগুলি-সহ] প্রকাশ করেন আশ্বিন ১৩০৩-এ। সুরেশচন্দ্রের সাধু সংকল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যদি একটু সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতেন, তাহলে তিনি হয়তো তাঁর শত্রুগোষ্ঠীর নেতা হয়ে উঠতেন না!

সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ [৪/৭] :

৩৫-৪৯ 'ঠাকুর্দ্দা' দ্র গল্পগুচ্ছ ২০। ২০৭-১৬

৬১-৭২ 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' দ্র লোকসাহিত্য ৬। ৬৩২-৩৮ ['কবি-সংগীত']

৭২-৭৫ 'জ্যোৎস্নারাত্রে' দ্র চিত্রা ৪। ২৪-২৭

৮৩-৮৮ 'আলোচনা' দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭০। ১৩১-৩২

৮৩-৮৫ 'চাবুক পরিপাক'; ৮৫-৮৭ 'জাতীয় আদর্শ'; ৮৭ 'অপূর্ব্ব দেশহিতৈষিতা'; ৮৭-৮৮ 'কুকুরের প্রতি মুগুর'

৮৮-৯০ 'গ্রন্থ সমালোচনা'

নির্ঝরিণী। মৃণালিনী প্রণীত

'ঠার্কুদা' গল্পটি সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন : 'গল্পটির আর কোন আকর্ষণ নাই থাক, এই গল্পের কৈলাস চৌধুরী নামক "নয়ানজোড়ের জমিদার বংশের নিব্বাপিত বাবুটি" বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে।'[১৮]

'কবি-সংগীত' 'দক্ষিণেশ্বর নিবাসী শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত' 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ' [১৩০১] গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিত। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ

কবিওয়ালাদের গানকে বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসের মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী জনমনোরঞ্জক পদার্থ হিসেবে বিচার করেছেন। ইতিহাস-সচেতনতা ও সাহিত্যকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের অনুবর্তী করে দেখার এই চেষ্টা সেকালের পক্ষে কিছুটা অভিনব। প্রবন্ধটি সহজলভ্য, সুতরাং আলোচনার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই—কিন্তু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সমকালীন নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি : 'কবিদলের গানে যে-প্রকার উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং সুলভ অলংকারের বাহুল্য দেখা গিয়াছে, আধুনিক সংবাদপত্রে এবং অভিনয়ার্থে রচিত নাটকগুলিতেও কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে তাহাই দেখা যায়। এই-সকল ক্ষণকালজাত ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য এবং সাহিত্যনীতির ব্যভিচার, এবং সর্ববিষয়েই রূঢ়তা ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। অচিরকালেই সাধারণের এমন উন্নতি হইবে যে, তাহার অবসর-বিনোদনের মধ্যেও ভদ্রোচিত সংযম, গভীরতর সত্য এবং দুরূহতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব—তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।' রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সেকালে রচিত ও অভিনীত প্রহসনগুলি সম্পর্কেই এই মন্তব্য করেছেন, এক্ষেত্রে রুচির উন্নয়নের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন এ-কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি।

এই সংখ্যার 'আলোচনা' 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িকপত্র' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করতে গিয়ে পুলিনবিহারী সেন লিখেছেন : 'দেশের সম্মান দেশের মানুষের আত্মসম্ভ্রম রক্ষাকল্পে এ রকম তীব্র সুরের রচনা সেকালে "সম্পাদকীয় স্তম্ভে" সুলভ ছিল না বস্তুতঃ রচনাটি সমসাময়িক সম্পাদকদের লক্ষ্য করেই রচিত।'[১৯] এই ধরনের বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে লিখিত অনেক রাজনৈতিক প্রবন্ধেই ছড়িয়ে আছে।

এই সংখ্যার 'গ্রন্থ সমালোচনা-র বিষয় 'মৃণালিনী প্রণীত' 'নির্ঝরিণী' কাব্য। লাড্‌লিমোহন ঘোষের কন্যা মৃণালিনী [1879-1972]র ১৩ বছর বয়সে পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সঙ্গে বিবাহ হয়; বিয়ের দু'বছরের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হলে তিনি যে কবিতাগুলি লেখেন, সেগুলিই 'নির্ঝরিণী' [1896] কাব্যে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'ব্যক্তিগত দুঃখ সুখের প্রকাশ যতক্ষণ না সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালীন সৌন্দর্য লাভ করে ততক্ষণ সাহিত্যে তাহা কাহারও নিকট সমবেদনা প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সাহিত্যে প্রধানতঃ আত্মহৃদয়ের পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। টেনিসনের ইন্ মেমোরিয়ম্ নামক কাব্য কেন সর্ব্বসাধারণের নিকট এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? তাহা টেনিসনের বন্ধুবিয়োগ শোকের প্রকাশ বলিয়া নহে, তাহাতে মানবজাতির বিচ্ছেদশোকমাত্রই বিচিত্র রাগিণীতে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে বলিয়াই তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশযোগ্য হইয়াছে—নচেৎ ব্যক্তিগত শোকের প্রকাশ্য বিলাপ টেনিসনের পক্ষে লজ্জার কারণ হইত।'[২০] এই কারণে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গ্রন্থে যেখানে বালিকার আত্মশোকের কথা আছে তা পরিহার করতে চেয়েছেন, 'কারণ প্রথম জোয়ারের জলের ন্যায় প্রথম শোকের উচ্ছ্বাসে কাব্যকলার পরমাবশ্যক সংযম অনেকটা ভাসিয়া যায়, সর্ব্বত্রই যেন বাহুল্য দৃষ্ট হইতে থাকে। শোক যখন জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া একটি উদার গম্ভীর বৈরাগ্যের আকার ধারণ করে তখনি তাহা কাব্যে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইবার অবসর লাভ করে।'[২১] সেইজন্য 'গ্রন্থকর্ত্রী যেখানেই ব্যক্তিগত শোকের অন্ধ-কারাগার হইতে বাহিরের সৌন্দর্য্য রাজ্যে পদার্পণ করেছেন, সেখানেই তাঁর যথার্থ কবিত্বের নিদর্শন

পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘অনন্ত কালের পরিচয়’ ও ‘বিশ্বপ্রেম’ কবিতা-দুটিতে ‘ভাষা ও ভাবের···নৈপুণ্য ও গভীরতা এবং অকৃত্রিম সত্যতার প্রশংসা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ১৮ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 31 May] পতিসর যাত্রা করেন। 1 Jun [শনি ১৯ জ্যৈষ্ঠ] তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন : ‘অনেক দিনের পরে আমার নির্জন বোটটির মধ্যে এসে আমার ভারী আরাম বোধ হচ্ছে।···নির্জনতা যেন আমার গায়ে মাথায় সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।’[২২] 3 Jun [সোম ২১ জ্যৈষ্ঠ] প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তাঁকে লিখছেন : ‘বর্ষাটা এমনি জমে এসেছে যে, ইচ্ছে করছে গদ্যে না লিখে পদ্যে চিঠি লিখে যাই—কিন্তু পদ্যে লিখতে বসলে বোধ হয় লেখা শেষ হবার পূর্বেই ঝড় শেষ হয়ে যাবে। ঝড়কে তো আর অক্ষর মিলিয়ে চলতে হয় না। এই সময়ে বেশ ফেঁদে বসে একটা গল্প লিখতেও বেশ। তাই লিখতুম, কিন্তু পাশে শৈ[লেশ] বসে আছে—কেউ কাছে বসে থাকলে লেখা হয় না।’[২৩] গল্পের একটি প্লট হয়তো মাথায় ঘুরছিল, সেটি ‘দৃঢ় সংকল্প করে খুব নিবিড় ভাবে মনঃসংযোগপূর্বক’ লিখে শেষ করেন 6 Jun [বৃহ ২৪ জ্যৈষ্ঠ] বিকেলবেলায়। গল্পটি হল সাধনা-র আষাঢ়-সংখ্যায় মুদ্রিত ‘প্রতিহিংসা’ [দ্র গল্পগুচ্ছ ২০। ২১৭-৩০]। ইন্দ্রাণী-চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করা গল্পটির উদ্দেশ্য হলেও জমিদার দেওয়ান সেরেস্তার কর্মচারীদের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেকটা কাজে লেগেছে। এই ধরনের অভিজ্ঞতার কল্পনানুরঞ্জন দেখা যায় কয়েকদিন পরে ৩১ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 13 Jun] তারিখে লেখা ‘দুই বিঘা জমি’ [দ্র সাধনা, আষাঢ়। ১৬০-৬৩; কাহিনী ৭। ৯৮-১০০] কবিতায়। শিলাইদহ-নিবাসী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী এই কবিতার ‘বাবু’ ও ‘উপেন’কে শিলাইদহ গ্রামের গুরুচরণ অধিকারী ও যদু দত্ত বলে সনাক্ত করেছেন।[২৪]

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ১ আষাঢ় [শুক্র 14 Jun] কলকাতায় ফিরে আসেন। এই দিনই সত্যপ্রসাদের হিসাব খাতায় দেখা যায় : ‘রবিমামার বাকি হাওলাত আদায় ৫০্’—দার্জিলিং যাওয়ার সময়ে তিনি ১০০ টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেইটিই বোধ হয় এতদিনে শোধ হল।

কলকাতায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি মাত্র চিঠি পাওয়া যায়; ১১ আষাঢ়ে [সোম 24 Jun] লেখা সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন : ‘ক’দিন খুব রীতিমত বৃষ্টি বাদল হয়ে আজ মেঘ কেটে রৌদ্র দেখা দিয়েছে। মনে আছে এক সময় এই রকম দিনগুলো আমাকে ভারী অভিভূত করত।···আজ সকালে বাবামশায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পার্ক স্ট্রীটে গিয়েছিলুম। যাবার সময় বরাবর এক অমৃতবাজার পড়তে পড়তে যাচ্ছিলুম, ফেরবার সময় হঠাৎ গড়ের মাঠের দিকে দৃষ্টি পড়ল—এবং পৃথিবীটা অনেকটা সেই আগেকার মতোই আছে, কেবল আমার আজকাল অবসর নেই—···এখন এত রকমের বিষয় আমার চার দিকে ব্যূহ বেঁধে রয়েছে যে, জগৎটাকে সম্মুখে দেখতে পাই নে—একেবারে সচেতন মনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে···অবিশ্রাম কাজকর্মে মানুষকে শক্ত এবং প্রবীণ করে দেয়। সেটুকু শক্ত হওয়া দরকার জানি—সংসারক্ষেত্রের উপযোগী হতে গেলে সে পরিমাণে প্রবীণতা অত্যাবশ্যক, কিন্তু তবু সেটা আমার কাছে ভারী অপ্রিয় মনে হয়।’[২৫] এটি অবশ্য কলকাতার একঘেয়ে কাজ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বলে গ্রহণ করতে হবে—উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে থাকার সময়ে প্রকৃতির নিকট সান্নিধ্যে কাজকর্ম তাঁকে পীড়িত করে না, এ-জিনিস বারবারই তাঁর জীবনে দেখা গেছে।

সাধনা, আষাঢ় ১৩০২ [৪ । ৮] :

১৩৯-৫৯ 'প্রতিহিংসা' দ্র গল্পগুচ্ছ ২০। ২১৭-৩০

১৬০-৬৩ 'দুই বিঘা জমি' দ্র কাহিনী ৭। ৯৮-১০০

১৬৩-৬৮ 'অপূর্ব্ব রামায়ণ/ (পাঞ্চভৌতিক সভা)' দ্র পঞ্চভূত ২। ৬৩৬-৪০

১৯০-৯৫ 'আলোচনা'

১৯০-৯১ 'ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা; ১৯১-৯৩ 'মতের আশ্চর্য্য ঐক্য'; ১৯৩ 'ইংরাজি ভাষা শিক্ষা : ১৯৩-৯৫ 'জাতীয় সাহিত্য'

১৯৮-২০০ গ্রন্থ সমালোচনা।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম। হারাণচন্দ্র রক্ষিত

২০০-০১ কৃষ্ণবিহারী সেন।

'পাঞ্চভৌতিক সভা'র আলোচনা 'অপূর্ব রামায়ণ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 20 Jul [শনি ৫ শ্রাবণ] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'এবারে আমার পাঞ্চভৌতিকে নিদেন একটা চিন্তা করবার যোগ্য নূতন ভাব আছে, সেটা আমি দেখলুম কোনো পাঠকই ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি।' এরপর তিনি জীবনের পূর্ণতাসাধনের ক্ষেত্রে মৃত্যুর ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে লিখেছেন : 'কিন্তু আমি বারম্বার দেখেছি পাঞ্চভৌতিকে আমি যে-সকল চিন্তার অবতারণ করি তার ঠিক মর্মটি প্রায় কেউ গ্রহণ করে না। আসলে বোধ হয় আমি ভালো করে বোঝাতে পারি নে—বোঝানোও বিষম শক্ত।'[২৬] নিশ্চিত করে বলার মতো তথ্য নেই, তবু মনে হয় যে, অভিজ্ঞা দেবীর বিবাহের রাতেই তাঁর মরণান্তিক ব্যাধির আত্মপ্রকাশ রচনাটির প্রেরণা হিসেবে কার্যকরী হয়েছে।

'আলোচনা'র প্রথমটি একেবারেই সংবাদপত্র-ধর্মী; বিলেতের পার্লামেন্টে প্রথম নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধি দাদাভাই নৌরজী কমন্স সভায় ভারতে ও ইংলণ্ডে একই সময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রচলন সম্পর্কে যে 'মোশন' এনেছেন 'প্রচুর স্বাক্ষরসমেত বহুল আবেদনপত্র' তাঁর কাছে প্রেরণ করার জন্য ভারতবাসীকে অনুরোধ এর বিষয়। কংগ্রেসের আন্দোলন সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য করলেও রবীন্দ্রনাথ যে এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগী ছিলেন, এই অংশটি তার অন্যতম প্রমাণ-রূপে গৃহীত হতে পারে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ও বৈশাখ--সংখ্যা সাধনা-য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা 'বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য'-এর একটি তীব্র সমালোচনা করেন দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা মোহিনীমোহনের ভ্রাতা যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ১২৩-৩৩] মুদ্রিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও জাতীয় জীবন' প্রবন্ধে। 'আলোচনা'র বাকি তিনটি রচনা এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধ অবলম্বন করে লিখিত। যোগিনীমোহন রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্বন্ধে লিখেছিলেন : '···বাঙ্গালায় শিক্ষা দিলে বিষয়গুলি সহজবোধ্য এবং অল্পশ্রমসাধ্য হইবারই সম্ভাবনা; উপরন্তু বঙ্গভাষার অনুশীলনও হইবে, সাহিত্যেরও উৎকর্ষ সাধিত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার প্রতি অনুরাগও বৃদ্ধি পাইবে—এবং হয়ত গ্রন্থকারদের ভিক্ষার থলিতে কিঞ্চিৎ অর্থসমাগমেরও সম্ভাবনা হইতে পারে!'[২৭] এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'নানা স্বাভাবিক কারণে মাতৃভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ অন্ধ এবং পক্ষপাতবিশিষ্ট হইতে পারে কিন্তু তাহা "অলীক" এ কথা প্রকাশ করিয়া তিনি

যে কেবল আমাদের প্রতি অন্যায় অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে; সত্যের প্রতি যে সকল ভদ্রজনের স্বাভাবিক ভক্তি আছে তাঁহারা অন্যকে অকারণে এরূপ অপবাদ দিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত বোধ করেন।'[২৮] 'ইংরাজি ভাষা শিক্ষা' রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বপ্রচারিত মতের প্রতিধ্বনি করে লিখেছেন : 'যাহারা এককালে দুই হাতে দুই লাঠি লইয়া খেলে, তাহারা শিক্ষাকালে প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক হাতের অভ্যাস করিয়া পরে দুই হাত মিলাইয়া লয়। সেইরূপ, আমাদের মতে, অন্ততঃ এন্ট্রেন্স পর্য্যন্ত ভাষা এবং বিষয়কে স্বতন্ত্ররূপে আয়ত্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয়কে একত্র মিলাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য।'[২৯]

যোগিনীমোহনের প্রবন্ধে দু'টি পাদটীকা ছিল; একটিতে 'লেখক' 'National' শব্দের স্থলে 'জাতীয় শব্দের' ব্যবহারে আপত্তি করেছেন, অপরটিতে 'সাহিত্য-সম্পাদক' রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামতের জন্য সাহিত্য পরিষদকে দায়ী করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভুল করে প্রথম পাদটীকাটিও সাহিত্য-সম্পাদকের লেখা বলে গ্রহণ করে 'জাতীয় সাহিত্য'-শীর্ষক রচনায় তাঁর উদ্দেশ্যেই বক্তব্য নিবেদন করেছেন। সুরেশচন্দ্র তাঁর 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় প্রবন্ধটির প্রশংসা করেন নি, কিন্তু কোনো স্পষ্ট মতামত প্রকাশেও বিরত থেকেছেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধ সুরেশচন্দ্রের লেখা অনুমান করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সম্পাদকের উদ্দেশ্যে যে-পত্র লিখেছিলেন, সুরেশচন্দ্র তার পাদটীকায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে মুখর হয়ে উঠেছিলেন [দ্র সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০০। ৮১-৮৪], এ কথা আমরা জানি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের 'অলোচনা'র যে-উত্তর যোগিনীমোহন লেখেন [দ্র 'বাদপ্রতিবাদ।/ উত্তর'—সাহিত্য, আষাঢ়। ২২৬-২৯], সেখানে তিনি এই ভুলটির উল্লেখ করেন—'সাহিত্য-সম্পাদক' তার পাদটীকায় লেখেন : 'মাননীয় সাধনা-সম্পাদক মহাশয় ভ্রমক্রমে "বাঙ্গালা ভাষা ও জাতীয় জীবন" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত একটি ফুটনোট আমার মনে করিয়া, আষাঢ়ের সাধনায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমি যখন উক্ত নোটের লেখক নহি, তখন তাহার মতামত, রবীন্দ্র বাবুর কৃত প্রতিবাদ বা যোগিনীমোহন বাবুর কৃত সমর্থনের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ দেখিতেছি না।'[৩০] রবীন্দ্রনাথও শ্রাবণ-সংখ্যা সাধনা-র 'আলোচনা'য় 'ভ্রম স্বীকার' করে লেখেন : 'এই অনবধান ও ভ্রমের জন্য আমরা সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি'—পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি ভ্রমস্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন নি! অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য কত বিপুল হতে পারে এটি তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এবং রবীন্দ্রনাথ ও সুরেশচন্দ্রের সমসাময়িক সুসম্পর্কের উৎকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম' গ্রন্থটি এবারের 'গ্রন্থ সমালোচনা'র বিষয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'লেখক এই গ্রন্থে স্বহস্তে একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে চড়িয়া বসিয়াছেন, এবং বঙ্কিমকে ও সেই সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের আর কতকগুলি পরীক্ষাত্তীর্ণ ভাল ছেলেকে হাস্যমুখে ছোট বড় পারিতোষিক বিতরণ করিয়া লেখক-সাধারণকে পরম আপ্যায়িত এবং উৎসাহিত করিয়াছেন।'[৩১] এর পর রচনার 'ভদ্র সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসনযোগ্য' কয়েকটি 'অশিষ্ট ভঙ্গিমা'র উদাহরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন : 'গ্রন্থকার, বঙ্কিমরচিত উপন্যাসের পাত্রগুলির মধ্যে কে কতটা পরিমাণে হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই অতি সূক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা ও প্রশংসা বণ্টন করিয়া দিয়াছেন।···আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পরম

দুর্ভাগ্য এই যে, এ কথা আমাদের সমালোচকদিগকে সর্ব্বদাই স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে, সাহিত্য সমালোচনা কালে মনুসংহিতা আদর্শ নহে মানবসংহিতাই আদর্শ।'[৩২]

আমরা আগেই বলেছি, চৈতন্য লাইব্রেরি ও বীডন স্কোয়ার লিটারেরী ক্লাব বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান সম্পর্কে যে রচনা-প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার বিচারক। তাঁর বিচারেই হারাণচন্দ্র রক্ষিতের প্রবন্ধটি স্বর্ণপদকে পুরস্কৃত হয়। তা সত্ত্বেও সাধনা-র পৃষ্ঠায় গ্রন্থটির বিরূপ সমালোচনার প্রতি কটাক্ষ করেন মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁর সম্পাদিত 'অনুশীলন ও পুরোহিত' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় [পৃ ১৬৩-৭২]। রবীন্দ্রনাথের এরূপ বিচার-বিভ্রাটের কারণটি রহস্যময়। না কি 'মন্দের ভালো' এই বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটিকে পুরস্কৃত করেছিলেন!

কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন [1847-95] ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাধনা-র নিয়মিত লেখক। ১৬ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 29 May] মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'গত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের সোদরপ্রতিম পরমাত্মীয় বন্ধু কৃষ্ণবিহারী সেনের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার বান্ধবেরা সকলেই অবগত আছেন অবিচলিত ধৈর্য্যে ও অগাধ পাণ্ডিত্যে তিনি যেমন প্রবীণ ছিলেন তাঁহার হৃদয়টি তেমনি বালকের মত স্বচ্ছ সরল এবং সদাপ্রফুল্ল ছিল; সংসারের রোগ শোক দুশ্চিন্তা কিছুতেই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার ন্যায় বহু অধ্যয়নশীল উদারবুদ্ধি সহৃদয় ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি বিরল। এই বন্ধুবৎসল স্বদেশহিতৈষী ঈশ্বরপ্রেমিক মহাত্মা মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সাধনার পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। এই মনস্বী পুরুষের সহায়তায় বঙ্গভাষা বিশেষ আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে আশা পূর্ণ না করিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন।'[৩৩] এরপর 'ভক্তবন্ধুদত্ত পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপে' ২০ ছত্রের একটি কবিতা সংকলিত হয়েছে [পৃ ২০০-০১], কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা নয় বলেই মনে হয়।

১৫ আষাঢ় [শুক্র 28 Jun] রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায় সাজাদপুরে গল্প রচনায় রত : 'বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি, একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি—একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক এবং বর্ণ এবং শব্দ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য এবং লোক এবং ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে এবং সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে—আমার নিজের মনের কল্পনা আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠছে।'[৩৪] রবীন্দ্রজীবনী-কার গল্পটিকে 'ক্ষুধিত পাষাণ' বলে অনুমান করেছেন—'একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প' হিসেবে সেইটির কথাই মনে হয়, গল্পটি প্রকাশিতও হয়েছিল শ্রাবণ-সংখ্যা সাধনা-য়—কিন্তু আমাদের মনে হয় গল্পটি হল 'অতিথি'। 'প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক এবং বর্ণ এবং শব্দ' যতটা 'অতিথি' গল্পের মধ্যে মিশে গেছে, 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে তার আভাসও নেই—সেই গল্পে বর্ণিত প্রকৃতি রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। এমন হতেই পারে যে, গল্পটি অনেক আগে লেখা—5 Sep 1894 [২১ ভাদ্র ১৩০১] তারিখে

ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিটিতে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৩২২-২৩, পত্র ১৪৯] 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর পরিবেশটি বর্ণিত হয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি, তাঁর অনেক গল্প প্রকাশ-কালের বহু পূর্বে রচিত।

কয়েক দিন বোটে বাস করার পর রবীন্দ্রনাথ ১৮ আষাঢ় [সোম 1 Jul] সাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে উঠে আসেন। পরের দিন ইন্দিরা দেবীকে সেই খবরটি দিয়ে লিখেছেন : 'বেশ লাগছে। মাথার উপরে ছাদটা অনেক উঁচুতে এবং দুই পাশে দুই খোলা বারান্দা থাকাতে আকাশের অজস্র আলো আমার মাথার উপরে বর্ষণ হতে থাকে—এবং সেই আলোতে লিখতে পড়তে এবং বসে বসে ভাবতে ভারী মধুর লাগে।···আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি! আকাশ আমার সাকী, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে, সোনার আলো মদের মতো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে।'[৩৫]

১৮ আষাঢ় তারিখেই তিনি লিখলেন 'শীতে ও বসন্তে' কবিতা [দ্র সাধনা, শ্রাবণ। ২৩৮-৪৫; চিত্রা ৪। ৬৫-৭১]। এ যেন নিজেরই উদ্দেশ্যে লেখা—একদিকে তিনি 'আলোচনা'য় দেশের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে মন্তব্য করছেন, অন্যদিকে রস-সমৃদ্ধ সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। অবশ্য 'সারবান সাহিত্য'-এর প্রবক্তাদের প্রতি কটাক্ষও এখানে দুর্লভ নয়।

২২ আষাঢ় [শুক্র 5 Jul] সাজাদপুরে পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হয়। পুণ্যাহ-অনুষ্ঠানের একটি বর্ণনা আমরা আগেই দিয়েছি। এই সময়ে সাজাদপুর কাছারির কর্মচারীদের একটি তালিকা পাওয়া যায় 'সাধনার ক্যাশবহি'-তে, এঁরা সকলে তিন টাকা করে চাঁদা পাঠিয়ে সাধনা-র গ্রাহক হয়েছিলেন : নায়েব বিপিনবিহারী বিশ্বাস, সহযোগী পেস্কার পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়, খাজাঞ্চি রাধিকাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ইনস্পেক্টর জ্ঞানদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, আমিন প্রসন্নকুমার বাগচি ও সার্ভে আমিন বসন্তকুমার মজুমদার। আরও কর্মচারী নিশ্চয়ই ছিলেন, পুণ্যাহ-উৎসবে এঁদের নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকত।

5 Jul রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'কাল অনেক রাত পর্যন্ত নহবতে কীর্তনের সুর বাজিয়েছিল সে বড়ো চমৎকার লাগছিল,···আজ ভোরের বেলায় সেই বাজনার শব্দে জেগে উঠেছি।···ছেলেবেলায় পেনেটির বাগানে থাকতুম, পাশে দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দির থেকে দিন-রাত্রির মধ্যে তিন-চার বার করে নহবত বাজত—আমার তখন মনে হত আমি বড়ো হয়ে স্বাধীন হবা মাত্রই একটা এইরকম নহবত রাখব। যে পাষাণদেবতা কাঁসর ঘণ্টার অসহ্য কোলাহল সম্পূর্ণ বধির ভাবে শুনতে পারে, তার পক্ষে চার বেলা নহবতের রাগিণী-আলাপ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তার চেয়ে আমাদের মতো ঠাকুরের জন্যে যদি কোনো পুণ্যবান সদাশয় এই রকম নহবতের ব্যবস্থা করে দেন তা হলে সংগীতটা ব্যর্থ হয় না।'[৩৬] পরের দিন [6 Jul] পুণ্যাহের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন : 'বিস্তর প্রজা এসেছিল। আমি বসে বসে লিখছিলুম, এমন সময় প্রজারা দলে দলে রাজদর্শন করতে এল—ঘর বারান্দা সমস্ত পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার নাম রূপচাঁদ মেধ্রা—সে একটি ডাকাত-বিশেষ,লম্বা জোয়ান সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজা। আমাকে যেন সে পরমাত্মীয়ের মতো ভালোবাসে—সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি।'···মেয়েদের ভালোবাসা অবশ্য খুব মধুর লাগতে পারে, কিন্তু এই রকম সরল সবল পুরুষমানুষের অকৃত্রিম অটল নিষ্ঠা এরও একটি অপূর্ব সৌন্দর্য আছে—এর মধ্যে মানবপ্রকৃতির একেবারে অমিশ্রিত আদিম সহৃদয়তাটুকু প্রকাশ পায়···। ···একদিন কালীগ্রামে মাঠে চৌকি নিয়ে বসে আছি, সেখানে

হঠাৎ এক মেয়ে এসে আমার দুই পায়ে মাথা রেখে চুমো খেলে—বলা আবশ্যক সে অল্পবয়স্কা নয়। পুরুষ প্রজারাও অনেকে পদচুম্বন করে। আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তা হলে আমি এদের বড়ো সুখে রাখতুম এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।'[৩৭] রবীন্দ্রনাথ যখন কালীগ্রামের 'একমাত্র জমিদার' হয়েছিলেন, তখন সেখানকার প্রজাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

9 Jul [মঙ্গল ২৬ আষাঢ়] দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'আঁকাবাঁকা ইছামতী নদীর মধ্য দিয়ে 'পাবনা-পথে' চলেছেন [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৪৬১, পত্র ২২০]—পরের দিনের ২২১ নং চিঠির রচনা-স্থল 'শিলাইদহ'। 'ছিন্নপত্র'-সংকলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই দু'টি চিঠিকে একটি চিঠিতে [১৪৬ নং] পরিণত করেন, তার তারিখ 9 Jul ও রচনা-স্থল 'পাবনা-পথে'। গোপালচন্দ্র রায় বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে 'শিলাইদহ' নির্দেশটিতে ভুল থাকার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁর বিচারটি নির্ভরযোগ্য। ইন্দিরা দেবী চিঠিগুলি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খাতায় লিপিবদ্ধ করতেন না, পাণ্ডুলিপিতে অনেক চিঠিই উল্‌টো-পাল্‌টা ক্রমে অনুলিখিত হওয়ার নিদর্শন আছে—পোস্টমার্ক দেখে তারিখ ও স্থান অনেক সময়ে তিনি অনুমান করে লিখে রেখেছেন এমন সম্ভাবনাও আছে, কয়েকটি স্থলে সেই কারণে তাঁকে প্রশ্নচিহ্নের ব্যবহার করতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁর উপরে দু'টি দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ২৪ আষাঢ় [রবি 7 Jul] পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির তৃতীয় অধিবেশন রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে গৃহীত তৃতীয় প্রস্তাবটি হল : 'বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য ও অন্যান্য সারগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত পরিষদ কর্ত্তৃক একটি গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি স্থাপিত হউক। সভাপতি, সহকারী সভাপতিগণ, সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লইয়া গ্রন্থপ্রকাশসমিতি গঠিত হউক। শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির ধনরক্ষক হউন।'[৩৮] পরিষদ কর্তৃক অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশের এইটিই সূচনা। পরিষদ-পত্রিকার কার্তিক-সংখ্যায় 'পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যে সকল চাঁদা স্বীকৃত ও প্রদত্ত হইয়াছে তাহার তালিকা'য় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ১০০ টাকা চাঁদা দিয়েছেন—তাঁর নামটি তারকাচিহ্নিত, এই চিহ্নের ব্যাখ্যায় 'ইহারা অনুগ্রহপূর্বক নিজ নিজ দেয় পাঠাইয়া দিয়াছেন' পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে।

উক্ত অধিবেশনের পঞ্চম প্রস্তাবটি হল : '···শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতি রামায়ণ সম্পাদনের ভার অর্পিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে ভার প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। ইহার জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পদকল্পতরু প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ চাহিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তাহারও উল্লেখ করিলেন। অবশেষে পরিষদ আনন্দের সহিত সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুমোদন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উক্ত ভার দিতে ইচ্ছুক হইলেন।'[৩৯] ১২৯৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ একবার বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেই প্রয়াস সফল হয়নি। বর্তমান উদ্যোগটির পরিণতিও একই রকমের। রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে এ ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলেন, পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থ চাওয়ার উল্লেখই তার প্রমাণ। কিন্তু পরিষদ প্রস্তাব গ্রহণে উৎসাহী হলেও উপকরণ সরবরাহে ব্যর্থ হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ১৯ চৈত্র [মঙ্গল 31

Mar 1896] তারিখে পরিষদ-সম্পাদককে লেখেন : 'প্রস্তাব ছিল যে, সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে আমাকে মুদ্রিত এবং হস্তলিখিত বৈষ্ণব পদাবলী সাহায্য দেওয়া হইবে, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া আমি বিদ্যাপতির পদ সঙ্কলন করিব। পরিষদ হইতে প্রস্তাবমত কার্য্য হয় নাই, সেই জন্য আমি বিদ্যাপতির সঙ্কলন-কার্য্যে হাত দিতে পারি নাই।'[৪০]

এ-সম্পর্কে তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী [১৩০৪]-তে লিখিত হয় [পৃ ১২-১৩] : 'বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ। ১৩০২ সালের ২৪শে আষাঢ় তারিখের অধিবেশনে বিদ্যাপতির পদাবলীর বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রণয়নের ভার শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়; কিন্তু বিশুদ্ধ পুঁথি না পাওয়ায় ১৩০২ সালে রবীন্দ্র বাবু এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। পরে গতবর্ষে [১৩০৩] আষাঢ় মাসে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বিদ্যাপতির নূতন সংস্করণের উল্লেখ করিয়া, অতঃপর পরিষদ্ কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থের স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশের আর আবশ্যকতা আছে কি না, তদ্বিষয়ে সম্পাদকের মত জিজ্ঞাসা করেন। তদনুসারে সম্পাদক মহাশয় রবীন্দ্র বাবুকে ঐ বিষয়ে পত্র লেখেন। পত্রোত্তরে তিনি সম্প্রতি ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা নাই, এই মত প্রকাশ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ রবীন্দ্র বাবুর মতের অনুমোদন করায় সম্প্রতি বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ-প্রণয়নের অভিপ্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।'

'বিদ্যাপতি/ সমগ্র বঙ্গীয় পদাবলী।/ শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কৃত / টীকা, কবির জীবনবৃত্তান্ত এবং বাঙ্গালা ও মৈথিলী/ ভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমেত।/ কলিকাতা / ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত' হয় ১৩০১ বঙ্গাব্দে। 'প্রথম বারের পূর্ব ভাষ'-এ স্বাক্ষরিত তারিখ '২১শে আশ্বিন, ১৩০১ সাল', বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ 30 Oct 1894 [১৪ কার্তিক ১৩০১]। গ্রন্থটির 'পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন'-এ কালীপ্রসন্ন লেখেন : 'এই সংস্করণে কতকগুলি নূতন পদের সন্নিবেশ এবং টীকার পরিশোধন ও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। টীকা বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কয়েকটি পরামর্শ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়াও আমাকে বাধিত করিয়াছেন।'

এই সংস্করণে 'আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত' পদটির 'দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড' ছত্রের টীকায় তিনি লিখেছেন : 'এই কবিতায় বসন্তের রাজসম্পদ বর্ণিত হইতেছে।···কাজেই হঠাৎ মাঝখানে, "দিনকর কিরণ দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল,"—এরূপ কথা বলা কবির অভিপ্রেত বিবেচনা হয় না। রবীন্দ্র বাবু কথা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁহার ন্যায় এখন আমাদিগেরও বোধ হইতেছে হয়ত "পৌগণ্ড" অর্থে রাজার বা রাজ-সভার সংক্রান্ত কিছু বুঝাইতেছে।'[৪১] এর থেকে বোঝা যায়, শুধু 'পুরাতন খাতা' দেওয়াই নয়, রবীন্দ্রনাথ মৌখিক ভাবেও কালীপ্রসন্নকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। বিদ্যাপতির সম্পাদনা-ভার পরিত্যাগের পর রবীন্দ্রনাথের সাহায্যাদি ব্যাপার ঘটেছিল বলে অনুমান করা যায়। তাঁর খাতাটি হারিয়ে যাওয়ায় সহায়তার পরিমাণ নির্ণয় করা দুষ্কর হয়েছে।

শ্রাবণ মাসের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। প্রায় পুরো মাসটাই তিনি কলকাতায় কাটান। তার মধ্যে ১৩ শ্রাবণ [রবি 28 Jul] অপরাহ্নে তিনি বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি ও ঝামাপুকুর রীডিং ক্লাবের উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এমারেল্ড্ থিয়েটারে 'বিদ্যাসাগরচরিত' নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন [দ্র সাধনা, ভাদ্র কার্তিক। ২৯৯-৩৪১; চারিত্রপূজা ৪। ৪৭৭-৫০২]। বিদ্যাসাগরকে আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, সেই মহামানবের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি এই রচনা। তথ্যসূত্র হিসেবে তিনি 'স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত', 'সহোদর শম্ভুচরণ বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত' ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। এই দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য জীবনীমূলক রচনার সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধটির পার্থক্য সুবিপুল। কিন্তু পাদটীকা-কণ্টকিত জীবন-তথ্যের সমবায়ে তিনি বিদ্যাসাগরের চরিত্রমহিমাটি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বাংলা জীবনী-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পারিবারিক ঐতিহ্য ও পরিবেশের মধ্যে তাঁর চরিত্র-বীজের অনুসন্ধান, সুকঠিন কর্ষণে সেই বীজের অঙ্কুরোদগম ও মহাবৃক্ষে পরিণতির ইতিহাস রচনা করতে তথ্যগুলি রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণভাবে ব্যবহার করছেন, কিন্তু উপলবন্ধুর পথে পার্বত্য স্রোতস্বিনীর প্রবাহের মতো তা কোথাও বাধার সৃষ্টি করে নি। অবশ্য বাঙালি হিন্দুর নির্জীবতা, নীচতা প্রভৃতির প্রতি যে আক্রমণাত্মক মনোভাব রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক গদ্য-রচনার অন্যতম লক্ষণ, বর্তমান প্রবন্ধটিও তার ব্যতিক্রম নয়—বরং সমসাময়িক বাঙালিয়ানার জীবন্ত প্রতিবাদ হিসেবে তিনি বিদ্যাসাগরচরিতকে উপস্থাপিত করেছেন : 'সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এ-দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন।···তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই।···তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না। যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরে ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।'

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'-য় লেখেন : 'এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যপ্রকাশ সম্ভাবিত নহে। আমরা কেবল এ জন্য লেখকের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যে দিন এই প্রবন্ধ বিদ্যাসাগর-স্মরণার্থ-সভায় প্রথম পঠিত হয়, সেই দিন সভাপতি শ্রীযুত জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত বিস্তৃতভাবে লিখিবার জন্য রবীন্দ্র বাবুকে সভাস্থলে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জীবনচরিতের আলোচনায় যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি, উদার সহানুভূতি তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, উন্নত বর্ণনাকৌশল ও পরিণত লিপিকুশলতার আবশ্যক, —রবীন্দ্র বাবুর

এই প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হয়, তাঁহার সে সংস্থান যথেষ্ট আছে। তিনি বিস্তৃত জীবনচরিতের রচনায় হস্তক্ষেপ করিলে সফলতা লাভ করিবেন, মনে করি।'[৪২] রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি এই ধরনের বিস্তৃত কাজের অনুকূল ছিল না, সুতরাং সেই জীবনচরিত অলিখিত থেকে গেছে।

প্রশংসা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ আরও লাভ করেছিলেন। তাই তিনি 3 Aug [শনি ১৯ শ্রাবণ] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'লোকের খ্যাতির মধ্যে খুব একটা মাদকতা আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু সর্ববিধ মাদকতার মতো খ্যাতির মাদকতায়ও ভারী একটা অবসাদ এবং শ্রান্তি আছে।···প্রথমত লোকের খ্যাতি পেলেই নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস জন্মে, তার পরে সেই অনেকখানি মিথ্যা জিনিষ ফাঁকি দিয়ে পাচ্ছি বলে ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়—অথচ আমি যে বাংলার পাঠক-সাধারণের অনাদরের যোগ্য তাও আমার আন্তরিক বিশ্বাস নয় এই এক আশ্চর্য ব্যাপার।' এই পত্রেরই শেষে তিনি লেখেন : 'সাধনায় প্রতি মাসে লোকচক্ষে নিজের নামটার পুনরাবৃত্তি করতে একেবারে বিরক্ত ধরে গেছে।'[৪৩] এই বছরের সাধনা-য় লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নি, কিন্তু কোনগুলি রবীন্দ্র রচনা, তা চিনে নিতে পাঠকদের অসুবিধা হত না সুরেশচন্দ্রের সমালোচনা থেকেই তা বোঝা যায়। সাধনা বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত এই সময়ে গৃহীত হয়ে গেছে। ভাদ্র-কার্তিক তিন মাসের সাধনা একসঙ্গে প্রকাশিত হবে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে একথা জেনে প্রভাতকুমার তাঁর ২১ শ্রাবণের পত্রে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।[৪৪] তিনি যে-সব পরামর্শাদি দিয়েছেন তাতে মনে হয় সাধনা বন্ধ করে দেওয়া হবে এই দুঃসংবাদ তখনও তিনি পান নি। সংবাদটি দীর্ঘকাল অপ্রচারিত ছিল। প্রভাতকুমার ১৬ আশ্বিনেও অগ্রহায়ণের সাধনা-র জন্য রচনাদি পাঠিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ২১ আশ্বিন শিলচরের উকিল কামিনীকুমার চন্দকে সাধনা-র গ্রাহক করে নেবার কথা লিখেছেন। সাধনা বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরও কিছু দ্বিধা ছিল। বিষয়টি নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব।

সাধনা, শ্রাবণ ১৩০২ [৪।৯] :

২০৩-১০ 'ভদ্রতার আদর্শ।/ (পাঞ্চভৌতিক সভা)' দ্র পঞ্চভূত ২।৬৩২-৩৬

২১৯-৩৭ 'ক্ষুধিত পাষাণ' দ্র গল্পগুচ্ছ ২০।২৩১-৪৩

২৩৮-৪৫ 'শীতে ও বসন্তে' দ্র চিত্রা ৪।৬৫-৭১

২৯৩-৯৮ 'আলোচনা'

২৯৩ 'ভ্রম স্বীকার'; ২৯৩-৯৪ 'চিত্রল অধিকার'; ২৯৪-৯৫ 'ইংরাজের লোকপ্রিয়তা'; ২৯৫-৯৬ ইংরাজের স্বদোষবাৎসল্য; ২৯৬-৯৮ 'ইংরাজের লোকলজ্জা'; ২৯৮ 'প্রাচী ও প্রতীচী'

6 Mar 1895 [২৩ ফাল্গুন ১৩০১] ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :'সৌন্দর্যের চর্চা কিম্বা সুবিধার চর্চা এর মধ্যে কোন্‌টাকে প্রাধান্য দিতে হবে এই নিয়ে তোর আজকের চিঠিতে একটুখানি তর্ক আছে—ওটা অনেকটা অবস্থা এবং অসুবিধার পরিমাণের উপরে নির্ভর করে।'[৪৫] এর পরে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন—পরের দিনের চিঠিতেও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। 'ভদ্রতার আদর্শ' প্রবন্ধ এই আলোচনারই সাহিত্য-রূপ বলে আমাদের ধারণা।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি এডগার অ্যালান পো-র 'A Tale of the Ragged Mountains' ও থিয়োফিল গোতিয়ে-র *Le pied de La momie* গল্পের Lafcadio Hearn-কৃত অনুবাদ The Mummy's Foot অবলম্বনে লেখা বলে প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিশেষত শেষোক্ত গল্পটির সঙ্গে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর বিভিন্ন সাদৃশ্য দেখিয়ে তিনি লিখেছেন : 'গল্প দুটির মধ্যে শুধু কাঠামো বা চরিত্রসৃষ্টিতে নয়, বিভিন্ন অংশের বর্ণনা ও শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ, বিশেষ করে প্রাসাদের বর্ণনায় অনুবাদ এতো আক্ষরিক যে *The Mummy's foot* গল্পটি সামনে খুলে রেখে ক্ষুধিত পাষাণ লেখা হয়েছিলো এই 'absurd' সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকে না।'[৪৬] কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো কল্পনা-কুশল ভাষা-নিপুণ লেখকের এই তুচ্ছ অনুকরণে প্রবৃত্ত হওয়ার কী দরকার ছিল, এই কথাটা বোঝা আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে ওঠে। এই চৌর্য গোপন করবার জন্যই রবীন্দ্রনাথকে শাহিবাগের গল্প ফেঁদে অনুসন্ধিৎসুদের বিভ্রান্ত করতে হয়েছিল, এমন কথাও শ্রীবিশ্বাস বলেছেন। এই ধরনের অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য 'নিশীথে'-প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি।

আষাঢ়-সংখ্যার 'আলোচনা'-য় 'জাতীয় সাহিত্য' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমক্রমে যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়-কৃত একটি মন্তব্যকে সাহিত্য-সম্পাদকের মন্তব্য মনে করে সমালোচনা করেছিলেন। বর্তমান-সংখ্যার 'আলোচনা'য় প্রথমেই 'ভ্রম স্বীকার' করে এই অনবধান ও ভ্রমের জন্য···ক্ষমা প্রার্থনা' করেছেন।

এর অন্তর্গত অন্যান্য নিবন্ধগুলি হিন্দুকুশ পর্বতাঞ্চলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত চিত্রল রাজ্য ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার ফলে উদ্ভূত সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত। রবীন্দ্রনাথ দেশী-বিদেশী কত সংবাদপত্র মন দিয়ে পাঠ করতেন, তার কিছু পরিচয় আছে এই নিবন্ধগুলিতে। ইংরেজচরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষও লক্ষণীয় : 'বন্ধুত্ব করিবার ক্ষমতা ইংরাজের নাই। অনর্থক অনাবশ্যক স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া অযথা ঔদ্ধত্যের দ্বারা শান্তির জায়গায় অশান্তি আনয়ন করিবার অসাধারণ প্রতিভা ইংরাজ জাতির আছে। চিত্রলের পথ সুগম হইল, এখন মাঝে মাঝে এক এক ইংরাজ শিকারী কাঁধে এক বন্দুক তুলিয়া পার্ব্বত্য ছাগ শিকারে বাহির হইবেন, এবং অপরিমেয় দম্ভের দ্বারা দেশবাসীকে ত্যক্তবিরক্ত করিয়া তুলিবেন।' অন্যান্য নিবন্ধগুলিও একই সুরে রচিত।

এই মাসের বালক-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা 'সখা ও সাথী'র ৭৬-৭৯ পৃষ্ঠায় 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' শিরোনামায় তাঁর একটি জীবনী প্রকাশিত হয়।[৪৭] আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম ব্যক্তি-পরিচিতি মুদ্রিত হয়েছিল নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' [1884] গ্রন্থে [দ্র রবিজীবনী ২। ২৯৮]। কিন্তু সেটি ছিল পরিচিতি মাত্র—প্রকৃত জীবনী প্রথম প্রকাশিত হল ভুবনময় রায়-সম্পাদিত 'সখা ও সাথী'-তে, রচনাতে লেখকের নাম নেই। পারিবারিক সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের জীবনীর উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল, জীবনী-প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর সম্মতিও নেওয়া হয়। জীবন-বৃত্তান্তের কয়েকটি ভুল সংশোধন করে পত্রিকাটির ভাদ্র-সংখ্যায় [পৃ ১০৩-০৪] যে 'রবি বাবুর পত্র' মুদ্রিত হয়, তাতে তিনি লেখেন : 'আপনারা যখন আমার বাল্য-বিবরণ লিখিবেন বলিয়া আমাকে শাসন করিয়া গিয়াছিলেন, তখন তাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই—এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে সম্মতি দিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আপনাদের মাসিকপত্রে

প্রবন্ধের শিরোভাগে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখিয়া সবিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। ছাপার কালিতে ম্লান না দেখায় এমন উজ্জ্বল নাম অল্পই আছে।'

জীবনীটি সংক্ষিপ্ত হলেও মূল্যবান। পরবর্তীকালে জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ এর অনেক অংশই বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু নর্মাল স্কুলের শিক্ষক হরনাথ পণ্ডিতের নাম একমাত্র এখানেই পাওয়া যায়। আরও লক্ষণীয়, ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে পড়ার কথা এই জীবনীতে নেই।

বলেন্দ্রনাথ চতুর্থ বর্ষের সাধনা-র কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন থেকেই তাঁর মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হচ্ছিল। ৭ ফাল্গুন ১৩০১ [18 Feb 1895] তারিখে মহর্ষির নিজস্ব ক্যাশবহিতে একটি হিসাব দেখা যায় : ব° বাবু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর/দং উহার কারবার করার জন্য দান বিঃ ২৫ ন° বাঙ্গাল বেঙ্কের এক চেক/গুঃ খোদ ১০০০৲'। দেখা যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যবসায় সমৃদ্ধির স্মৃতি উত্তরপুরুষদের বারবারই চঞ্চল করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একসময়ে পাট ও নীলের ব্যবসা করে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন, পরে জাহাজী ব্যবসা করে দুর্ভাগ্য ও জেদের বশে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেন। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা অন্যদের চৈতন্য-সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট হয় নি। কিছুদিন আগে [8 Aug 1893] সুরেন্দ্রনাথ 'হেঁয়ালি চিত্র'-এর মাধ্যমে সিমলা থেকে সত্যপ্রসাদকে জানিয়েছিলেন : 'আমরা একান্নবর্ত্তী বিপুল পরিবার, মগর কেউ জীবিকার উপায় অন্বেষণ করচেন না; না বোঝা খারাপ; শেষটা চুরি করে খেতে হবে'। এই আশঙ্কার প্রতিবিধান করতে সুরেন্দ্রনাথ কাজে নেমে পড়েছিলেন, তাঁর সহযোগী হন বলেন্দ্রনাথ। মহর্ষি যেমন বলেন্দ্রনাথকে 'কারবার করার জন্য' এক হাজার টাকা দান করেছিলেন, সুরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা সেরূপ কোনো হিসাব পাই নি—সম্ভবত তাঁর মূলধনের যোগান দিয়েছিলেন পিতা সত্যেন্দ্রনাথ। এঁরা দুজনে মিলে 'Tagore & Co' নামে একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন—যার প্রাথমিক কাজ ছিল পাট কেনা-বেচা। তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু লাভের মুখ দেখেছিলেন, যার ফলে রবীন্দ্রনাথও এই ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। বর্তমান বৎসরের ১২ শ্রাবণ [শনি 27 Jul] মহির্ষর ক্যাশবহির একটি হিসাব : 'ব° শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/দং উঁহার ব্যাবসা করিবার জন্য দেওয়া যায় ২০০০৲'– একই দিনে বলেন্দ্রনাথকেও এই খাতে আরও এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। কুষ্টিয়ায় Tagore & Co-এর ব্যবসা কেন্দ্র খোলা হয়। ঠাকুরপরিবারের কুষ্টিয়া কুঠিবাড়ির ফটকে সাদা পাথরের উপরে Tagore and Company লেখা এই সেদিনও দেখে এসেছেন শিল্পী রথীন মিত্র।[৪৮] দেশভাগের পর অবশ্য বাড়িটি হস্তান্তরিত হয়েছে।

এই নতুন কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পরে 14 Aug [বুধ ৩০ শ্রাবণ] শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে : 'যত বিচিত্র রকমের কাজ আমি হাতে নিচ্ছি, কাজ জিনিষটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা মোটের উপর ততই বাড়ছে। অবশ্য, সাধারণভাবে জানতুম যে, কর্ম অতি উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ পদার্থ। কিন্তু সে-সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা। এখন বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি কাজের মধ্যে পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা। কর্মের মধ্যে পুরুষের অনেকগুলি বৃত্তিকে সর্বদাই নিয়োগ করে রাখতে হয়—জিনিষ চিনতে হয়, মানুষ চিনতে হয়, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় রাখতে হয়। এখন আমার কাছে একটা নূতন রাজ্য খুলে গেছে। দেশ দেশান্তরের লক্ষ লক্ষ লোক যে-এক বৃহৎ বাণিজ্যক্ষেত্রের মধ্যে অহর্নিশি প্রাণপণ প্রয়াসে প্রবৃত্ত আমি তারই মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছি—মানুষের পরস্পরের শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্বন্ধ এবং কর্মের

সুদূরবিস্তৃত উদারতা আমার প্রত্যক্ষগগাচর হয়েছে। সমস্ত চিনতে এবং শিখতে, খাটতে এবং চিন্তা করতে, বেশ একটি গৌরব অনুভব করা যায়।'[৪৯]

আমরা আগেও দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ যখনই নতুন একটা কাজ হাতে নিয়েছেন, তখনই অশেষ প্রযত্নে তাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন—নিজেকে নতুন ভাবে উপলব্ধি করার এও যেন একটি পথ। সুতরাং ব্যবসায়-জগতে এই প্রবেশকেও তিনি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। 18 Aug [রবি ২ ভাদ্র] ইন্দিরা দেবীকে যে লিখেছেন : 'কুটীরবাসের একটা অভিজ্ঞতা আমার মন্দ লাগল না—যদিও টেবিল চৌকি ক্যাম্প্‌খাট নিয়ে ঠিক রীতিমত কুটীরবাস হয় না। তবু ডাঙার উপরে উঠে বর্ষার সবুজ পৃথিবীটা একবার দেখে আসা গেল, সেটা বেশ লাগল'—[৫০]—এও সম্ভবত উক্ত ব্যবসায়ের সঙ্গেই জড়িত।

অবশ্য কবি-মানুষটি এর আড়ালে চাপা পড়েন নি। 20 Aug [মঙ্গল ৪ ভাদ্র] লিখেছেন : 'মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে কাল থেকে নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর শরৎকালের ভাব দেখা দিয়েছে।···একটি সুবিস্তীর্ণ সুন্দর সমুজ্জ্বল শান্তি জলে স্থলে শূন্যে আপন উদার মাতৃক্রোড় প্রসারিত করে বসে আছে, অত্যন্ত নিকটে এসে আমার মস্তক চুম্বন করছে।' এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন : 'আমার ইচ্ছে করে আমার সমুদয় চিঠিগুলো থেকে সমস্ত তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়ে, কেবল মতামত বর্ণনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ, কেবল চিন্তা এবং কল্পনাগুলিকে বেছে নিয়ে একত্র গেঁথে গেলে আমার অধিকাংশ জীবিতকালের সমস্ত মাধুর্য একেবারে ঘনীভূতভাবে পাওয়া যেতে পারে—···বিশ্বজগতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার কথা আমার অন্য কোনো লেখায় তেমন যথার্থ সত্যভাবে নেই যেমন আমার চিঠির মধ্যে আছে—সেই অংশগুলি যদি পাই তা হলে আমার জীবন অনেকটা বৃহত্তর হয়ে ওঠে।'[৫১] ইন্দিরা দেবী তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ—করেছিলেন কিন্তু 'তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথা' বাদ দেওয়ার জন্য আমাদের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—সেগুলি থাকলে আরও কত অন্তরঙ্গভাবে আমরা 'ব্যক্তি'-রবীন্দ্রনাথকে লাভ করতে পারতাম!

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম গল্প-সংকলন 'গল্প-দশক' প্রকাশিত হল। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ 30 Aug 1895 [শুক্র ১৪ ভাদ্র], পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২০, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০, মূল্য এক টাকা চার আনা। গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে আছে :

গল্প-দশক।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/কলিকাতা :/ ১৩।৭ বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে/শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত/ও/ ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।/ ১৩০২।/ মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

উৎসর্গ। "পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ আশুতোষ চৌধুরীর করকমলে এই গ্রন্থ উপহৃত হইল। ১৫ই ভাদ্র।/ ১৩০২।/ গ্রন্থকার।"

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৪+২ [উৎসর্গ]+২ [সূচীপত্র]+২২০।

এই সংকলনের দশটি গল্পই সাধনা-য় মুদ্রিত হয়েছিল : ১। প্রায়শ্চিত্ত; ২। বিচারক; ৩। নিশীথে; ৪। আপদ; ৫। দিদি; ৬। মানভঞ্জন; ৭। ঠাকুর্দ্দা; ৮। প্রতিহিংসা; ৯। ক্ষুধিত পাষাণ; ১০। অতিথি।

লক্ষণীয়, গল্পগুলি সাধনা-য় প্রকাশের কালানুক্রমে মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহিত্য-যন্ত্রে মুদ্রিত।

সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২ [৪।১০-১২] :

২৯৯-৩৪১ 'বিদ্যাসাগর চরিত' দ্র চারিত্রপূজা ৪।৪৭৭-৫০২

৪৩০-৫৬ 'অতিথি' দ্র গল্পগুচ্ছ ২০।২৪৩-৬০

৪৬০-৬৭ 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল (পাঞ্চভৌতিক সভা)' দ্র পঞ্চভূত। ২।৬৪০-৪৪

৫৩০-৩৭ 'আলোচনা'

৫৩০-৩২ 'নূতন সংস্করণ'; ৫৩২-৩৩ 'জাতিভেদ';

৫৩৩-৩৫ 'বিবাহে পণগ্রহণ'; ৫৩৫-৩৭ 'ইংরাজের কাপুরুষতা'

৫৩৭-৪২ 'নগর-সংগীত' দ্র চিত্রা ৪।৭১-৭৫

এছাড়াও 'ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক' [পৃ ৪৯৮-৫০৮] প্রবন্ধটিও রবীন্দ্রনাথের লেখা হওয়া সম্ভব, কিন্তু এ সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ নই বলে রচনাটিকে তালিকাভুক্ত করা হয় নি। সাধনা-র অন্যান্য সংখ্যায় 'গ্রন্থ সমালোচনা'গুলি রবীন্দ্রনাথ-কৃত হলেও বর্তমান সংখ্যায় সমালোচিত গ্রন্থগুলির বিষয় ও আলোচনা-পদ্ধতি কিছুটা ভিন্নতর বলে আমাদের মনে হয়েছে। বিশেষত, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য-কৃত 'কবি বিদ্যাপতি' সম্বন্ধে সমালোচক যে লিখেছেন : 'এপর্য্যন্ত বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে যতগুলি আলোচনা বাহির হইয়াছে গ্রন্থকার তাহার সকলগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন এবং নানা স্থান হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। বক্ষ্যমান বিষয় সম্বন্ধে আমাদের নিজের ভালরূপ অভিজ্ঞতা নাই'[৫২]—এই মন্তব্যকে রবীন্দ্রনাথের বলে মেনে নেওয়া শক্ত। কিশোর বয়স থেকেই তিনি বিদ্যাপতি সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করেছেন, তাঁর বিদ্যাপতি-চর্চার ইতিহাসও সুদীর্ঘ।

'অতিথি' গল্পটি সম্ভবত ১৫ আষাঢ় [শুক্র 28 Jun] সাজাদপুরে লেখা, আমরা এমন অনুমান করেছি। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের কিছু স্মৃতি ও কল্পনা বন্ধনভীরু বালক তারাপদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' প্রবন্ধটির শেষাংশের সঙ্গে পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এর অন্তর্গত 16 oct 1889 [৩১ আশ্বিন ১২৯৬] তারিখে লেখা 'ইন্দুর-রহস্য' [পৃ 102, ৮৪-সংখ্যক] রচনাটির সাদৃশ্য আছে। 'দিন কতক দেখা গেল সুরির [সুরেন্দ্রনাথের] দুটো একটা বাজনার বই খোওয়া যাইতেছে। সন্ধান করিয়া জানা গেল একটা ইন্দুর রাতারাতি উক্ত বইয়ের কাগজ কাটিয়া ছিন্ন খণ্ডগুলি পিয়ানোর তারের মধ্যে গুজিয়া দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছাড়া ইহার ত কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না'—এই 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' থেকেই পাঞ্চভৌতিক রচনাটি পরিকল্পিত হয়েছে।

এই সংখ্যার 'আলোচনা'য় রবীন্দ্রনাথ প্রথম তিনটি নিবন্ধে সামাজিক সমস্যা ও শেষ নিবন্ধটিতে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মন্তব্য করেছেন। সামাজিক সমস্যার বিচারে তাঁকে কিছুটা আপোষকামী মনে হলেও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর লেখনী শাণিত ধিক্কারে ঝল্‌সে উঠেছে। আসানসোল স্টেশনে একটি দেশীয় বালিকার প্রতি পাশবিক অত্যাচারের দায়ে অভিযুক্ত কয়েকজন ইংরেজ রেল কর্মচারী জুরির বিচারে মুক্তি পায়। এ-সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ইংরেজ ও ইংরেজি সংবাদপত্রের নীরবতায় ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'দুর্গম চিত্রলের যুদ্ধ জয় লইয়া ইংরাজ দেশে বিদেশে বীরত্বের আস্ফালন করিতেছেন; কিন্তু নিঃসহায় রমণীর প্রতি নির্দ্দয়তম অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজ যে আন্তরিক কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছেন

যুদ্ধজয়গৌরবের অপেক্ষা তাহা অনেকগুণে গুরুতর। চিত্রল জয় করিয়া তাঁহারা শত্রুকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিরুপায় অধীন জাতির প্রতি এইরূপ মনুষ্যত্ববিহীন অবজ্ঞার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা আপন রাজ্যতন্ত্রের ভিত্তিমূলে স্বহস্তে পরম শত্রুতার বীজ রোপণ করিয়া রাখিতেছেন।'[৫৩] জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হলে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালেও এইভাবে ধিক্কারে মুখর হয়েছেন।

'নগর-সংগীত' কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, রচনাকালও অনুল্লেখিত। কিছুদিন আগে বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের সহযোগী হয়ে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে 14 Aug [৩০ শ্রাবণ] তারিখে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন : 'দেশ দেশান্তরের লক্ষ লক্ষ লোক যে-এক বৃহৎ বাণিজ্যক্ষেত্রের মধ্যে অহর্নিশি প্রাণপণ প্রয়াসে প্রবৃত্ত আমি তারই মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছি'—মনে হয়, কবিতাটি সেই সময়ে লেখা।

শুধু সম্মুখে চলেছি লক্ষ্যি'

আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী,

তুমিও ছুটিছ চপলা লক্ষ্মী

আলেয়া-হাস্যে ধাঁধিয়া;

পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা,

বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা,

কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা,

আনিব তোমারে বাঁধিয়া।

—সম্ভবত চঞ্চলা বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে আয়ত্ত করার আকাঙ্ক্ষা থেকে কবিতাটি রচিত।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে সাধনা-র ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল 31 Aug [শনি ১৫ ভাদ্র] তারিখে, পৃষ্ঠা ২৫৬, মুদ্রণসংখ্যা ১০০০ ও মূল্য এক টাকা। এই বৎসর ৯ আশ্বিন [25 Sep] দুর্গাপূজা আরম্ভ হয়, সুতরাং পূর্বানুসৃত রীতি অনুযায়ী ১৫ ভাদ্র-আশ্বিন যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না, কিন্তু বিস্মিত হতে হয় কার্তিক-সংখ্যা এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়—কোনো সম্পাদকীয় বিজ্ঞপ্তিতে এর কারণও নির্দেশ করা হয় নি। সংবাদটি রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে জানালে ২১ শ্রাবণ [5 Aug] তিনি পরামর্শ দিয়ে লেখেন : 'তিন খণ্ড সাধনা একত্রে বাহির করিবেন শুনিয়া শঙ্কিত হইলাম। এ কেন? দুই খণ্ডই ত পূর্বে একত্রে বাহির হইয়াছে।···যদি আপনি কিছুদিন অবসর গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় এরূপ করিয়া থাকেন, তবে তিন খণ্ডই ছাপা হউক; ভাদ্র ও আশ্বিনে একসঙ্গে বাঁধাইয়া বিলি করা হউক; কার্ত্তিকের খণ্ডখানি সব ঠিকঠাক করিয়া, ঠিকানা লিখিয়া, টিকিট সাঁটিয়া, আলমারিজাত করিয়া রাখা হউক, ১৪ কার্ত্তিক সেগুলি ডাকে দিলেই হইবে। একসঙ্গে তিন খণ্ড বাহির করা, এ যেন কেমন কেমন দেখাইতেছে।'[৫৪] এর পরে তিনি ২৬ ভাদ্র 'গল্প-দশক' ও ১২ আশ্বিন মহর্ষির চিত্র উপহার পেয়েছেন, কিন্তু সাধনা বন্ধ করে দেওয়ার কথা শোনেন নি। ১৬ আশ্বিন [2 Oct] 'দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর' ও 'নীলকুল-বাসুদেবের ব্রতকথা' গল্প-দুটি এবং 'অনুবাদ ও অনুকরণ'-এর চারটি কবিতা পাঠাবার কথা জানিয়ে লিখেছেন, 'এগুলি অগ্রহায়ণের সাধনা-র

জন্য’।[৫৫] অর্থাৎ তিনি তখনও সাধনার অবলুপ্তির কথা জানেন না। এমন কি রবীন্দ্রনাথও ১০ আশ্বিন [26 Sep] ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : ‘আমার সাধনা লেখার কাজে এখনও হাত দিই নি। কেবল সংগীত-আলোচনায় সরস্বতীর সঙ্গে খানিকটা সম্বন্ধ রেখেছি।’[৫৬] সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন : ‘সাহিত্যসংসারে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক হইয়া “সাধনাকে” সিদ্ধির পথে আনিয়াছিলেন। তাহার পর “সাধনা” ত্রৈমাসিক হইতেছে শুনিয়া, আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইবে।’[৫৭] ২৩ আশ্বিন[9 Oct] সাধনার ক্যাশবহি-র হিসাবে দেখা যায়, ‘আগামী পঞ্চম বর্ষের নূতন কেস বহি আদি প্রস্তুত খরচ বাবদ পাঁচ টাকা সাত আনা খরচ হয়েছে। এই-সব তথ্য থেকে বোঝা যায়, সাধনা বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিতে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর দ্বিধা কেটে গেছে। ৬ কার্তিক [22 Oct] তিনি ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন : ‘সাধনার মায়াবন্ধন একেবারে ছেদন করিয়াছি। শত্রু-পক্ষ হাসিবে সন্দেহ নাই কিন্তু শত্রুপক্ষের হাস্যোচ্ছ্বাস নিবারণের উদ্দেশে নিজের ইহকাল পরকাল বিসর্জ্জন করিতে পারি না।’[৫৮] প্রভাতকুমারকেও পত্রে এই কথা জানালে তিনি ১২ কার্তিক [28 Oct] লেখেন : ‘সাধনা আর বাহির হইবে না শুনিয়া, কান্না পাইতে লাগিল।···এবার শত্রুপক্ষ হাসিবে। সাধনা ত্রৈমাসিক হইবে শুনিয়া একজন বলিয়াছিল—“এবার হয়ে এসেছে; ক্রমে ষান্মাসিক হবে; বাৎসরিক হবে; ঘর থেকে বছর বছর এতগুলি করে টাকা গুণতে হয়।” আমি সগর্বে বলিয়াছিলাম—“Who the devil cares for?” এবার আমি সে ব্যক্তির কাছে মুখ তুলিতে পারিব না।’[৫৯] রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের উত্তরে সাধনা বন্ধ করে দেওয়ার কারণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু পত্রটি এখনও পাওয়া যায় নি। সাধনা-র সাহায্যার্থে মাসিক চাঁদা হিসেবে গগনেন্দ্রনাথ কুড়ি টাকা ও রবীন্দ্রনাথ দশ টাকা দিতেন; আর ছিল গ্রাহকদের চাঁদা, এইচ, বোস অ্যাণ্ড কোং প্রভৃতি কিছু প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের মূল্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁর চাঁদা ক্রমশই বাকি পড়ছে, আর অন্যান্য বহু গ্রাহকের মতো জগদীশচন্দ্র বসুর ন্যায় গ্রাহকও চতুর্থ বর্ষের চাঁদা শোধ করেছেন ৩২ আষাঢ় তারিখে। গ্রাহক-সংখ্যাও আশানুরূপ ছিল না। সাধনার ক্যাশবহি-র ১৭ ভাদ্রের [2 Sep] হিসাবে আছে : ‘বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং সাধনার দেনা পরিশোধের জন্য উক্ত বাবু মহাশয়···তিনশত টাকা দেন’। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ও কার্যাধ্যক্ষ বলেন্দ্রনাথ এই সময়ে আবার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। এই-সব কারণের সামগ্রিক ফল সাধনা-র অবলুপ্তি। সঞ্জীবনী-তে দু’বার এই বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার খবর জানা যায় সাধনার ক্যাশবহি-র ২১ কার্তিকের [6 Nov] হিসাবে : ‘সাধনা উঠিয়া যাইবার বিজ্ঞাপন সঞ্জীবনীতে দুইবার প্রকাশের মূল্য···৩্’। পত্রিকাটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ‘বিজ্ঞাপন’টি দেখার সুযোগ নেই, কিন্তু সম্ভবত এইটি দেখেই সুরেশ সমাজপতি লেখেন : ‘পাঠকগণ বিজ্ঞাপনে দেখিবেন, “সাধনা” অতঃপর আর প্রকাশিত হইবে না।···“সাধনা” বিলুপ্ত হইল কেন, তাহার কোন কারণ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি মনে হয়, বাঙ্গালীপাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইলে “সাধনা” বিলুপ্ত হইত না। যে দেশে “সাধনার” মত উচ্চ শ্রেণীর মাসিকও বিলুপ্ত হইবার অবসর পায়, সে দেশ নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।’[৬০]

সাধনা-র অন্তিম পরিণতির একটি বিবরণ পাওয়া যায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ১৮ অগ্রহায়ণের [3 Dec] পত্রে : 'দেখিলাম, সাধনার শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে, গ্রাহকগণকে কাশিয়াবাগান—বাগানবাটীতে উপস্থিত হইবার জন্য বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিতেছেন। এ ভারটা বলেন্দ্রবাবুকে দিলে হইত না? আপনার নামটা কি এতই সস্তা হইয়াছে?'[৬১] খবরটি নিশ্চয় কোনো সংবাপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই রবীন্দ্রনাথ পতিসর-সাজাদপুরে পরিভ্রমণরত, তবে কি কার্তিক মাসের শেষ দিকে এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হয়েছিল?

দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি সাতারা ও পুনায় দীর্ঘকাল কাটাবার পর 1 Sep [রবি ১৬ ভাদ্র] কলকাতায় ফিরে আসেন। 3 Sep দ্বিজেন্দ্রনাথ ড প্রসন্নকুমার রায়কে লেখেন : 'আমি সেতারায় এক বৎসর কয়েক মাস থাকিয়া গত পরশু এখানে পৌঁছিয়াছি। আমার বাতের ব্যামো ভালো হইয়াছে বিনা ঔষধে—কেবল জলবায়ুর গুণে।' রবীন্দ্রনাথের 24 Aug-এর পত্র ইন্দিরা দেবী কলকাতায় পেয়েছেন 2 Sep [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৪৭২-৭৩, পত্র ২২৮]—এই অস্বাভাবিক বিলম্ব পত্রটির সাতারা থেকে পুনঃপ্রেরণের কারণে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কলকাতা-যাত্রার সঠিক তারিখটি জানতেন না। 26 Aug [সোম ১০ ভাদ্র] তারিখেও তাঁরা সাতারায় ছিলেন, এইদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে 'ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়'-এর ছবি আঁকেন—এর পরই সম্ভবত তাঁরা কলকাতা যাত্রা করেন।

রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সম্মিলনের উদ্দেশ্যে সম্ভবত এই সময়ে কলকাতায় আসেন। ১৭ ভাদ্র তিনি 'সাধনার দেনা পরিশোধ জন্য' তিনশো টাকা দেন, এই টাকা হয়তো তিনি নিজের হাতেই দিয়েছিলেন।

বেশি দিন তিনি কলকাতায় ছিলেন না। কিন্তু তারই মধ্যে তাঁর অন্তরে যে গীতসুধারসের উৎস উন্মুক্ত হল, তার প্রবাহ প্রায় দু'মাস স্থায়ী হয়েছে। ২৬ ভাদ্র [বুধ 11 Sep] এর সূত্রপাত হয় জোড়াসাঁকোয় লেখা 'ওঠো রে মলিনমুখ, চলো এইবার' [দ্র গীতবিতান ২।৫৪৭-৪৮] গানটি দিয়ে। মজুমদার পুঁথিতে গানটি প্রথম লেখা হয়, এরপর অনেক দিন পর্যন্ত এই 'পকেট-বুক'টি তাঁর গান-রচনার অন্যতম সঙ্গী। গানটি আশ্বিন ১৩০৩-এ প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত 'চিত্রা' কাব্যে 'ভঙ্গ' শিরোনামে 'মূলতান' সুরনির্দেশ-সহ মুদ্রিত হয় [পৃ ৩৭৫], কিন্তু সুরটি রক্ষা পায় নি। গানটি রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীর 'গানের বহি'-তে তারিখ-সহ লিখে দিয়েছেন, কিন্তু কালানুক্রমে এটি লিখিত হয় নি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের সূচনা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। অগ্র° ১৩০১-সংখ্যা সাধনা-য় রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'কেরাণী' কবিতাটি প্রকাশ করেন ও এই সংখ্যাতেই তাঁর 'আর্য্যগাথা দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা মুদ্রিত হয়। এই সময়টিকে আমরা উভয়ের সৌহার্দ্যের সূচনাকাল বলে অনুমান করেছি। সাধনা-র শেষ সংখ্যাতেও দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমরা ও তোমরা' প্যারডি-কবিতাটি মুদ্রিত হয় [পৃ ৫০৮-১০]-এটি রবীন্দ্রনাথেরই 'তোমরা এবং আমরা' [সাধনা, পৌষ ১২৯৯; সোনার তরী—তোমরা ও আমরা'] কবিতার প্যারডি। ইন্দিরা দেবীর প্যারডিটি ভালো লাগে নি; রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে 30 Sep [১৪ আশ্বিন] তাঁকে লিখেছেন : "তুই 'আমরা ও তোমরা' –লেখকের উপর ভয়ানক চটেছিস দেখলুম। লোকটা কিন্তু 'খুব মজা করেছি' মনে করে বসে আছে।"[৬২] এরপর তিনি রসবোধের ভিন্নতা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন দেখে মনে হতে পারে যে, তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের উপরে এই জন্য বিরক্ত হয়েছিলেন—কিন্তু সম্ভবত

তা ঠিক নয়। কিছুদিন আগে তাঁর একটি চিঠি পেয়ে 'আপনার প্রণয়সম্মানিত' দ্বিজেন্দ্রলাল 6 sep [২১ ভাদ্র] উত্তরে লেখেন : 'আপনার পত্র দুই জেলা এবং তিন মহকুমা ঘুরে' মানিকগঞ্জে আমাকে পাকড়াও করে।···'আমরা ও তোমরা' সাধনায় দেখে খুসী হলাম।···সাধনার জন্য একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত।···প্রবন্ধ একটি এখন বলেন ত পাঠাতে পারি। কিন্তু যখন সাধনা বেরোবার বহু বিলম্ব আছে, আর আপনি পূজার সময় আসছেন, তখন সেটা এখানে আপনার হাতেই দিব মনস্থ করেছি—'। রবীন্দ্রনাথ পূজার সময়ে কলকাতায় ছিলেন না, এই চিঠি লেখার সময়েই সেখানে এসেছিলেন। সাধনা আর প্রকাশিত হয় নি, তাই তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধ 'মানভিক্ষা' ভারতী-তে দিয়েছিলেন, সেটি ভারতী-র কার্তিক-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সখা ও সাথী-সম্পাদক ভুবনময় রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। পত্রিকাটির শ্রাবণ-সংখ্যায় তাঁর জীবনী ও কয়েকটি তথ্যের সংশোধন-সংবলিত 'রবি বাবুর পত্র' ভাদ্র-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। আশ্বিন সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'ইচ্ছাপূরণ' [দ্র গল্পগুচ্ছ ২০।২৬০-৬৬] গল্পটি লিখে দেন, সেটি তিনটি চিত্র ["তুই পাঁচন খেয়ে এই খেনে চুপ্ চাপ্ শুয়ে থাক।", '(বৃদ্ধ সুবলচন্দ্রের বাল্যাবস্থা প্রাপ্তি)' ও '(কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিল।—১১১ পৃষ্ঠা)']-শোভিত হয়ে পত্রিকাটির ১০৯-১৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। গল্পটি রচনার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন ৬ চৈত্র [18 Mar 1896] তারিখের পত্রে : 'সখা ও সাথীর কর্তৃপক্ষেরা দিনকতক তাঁহাদের কাগজে একটা গল্প দিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন। অনেক ব্যর্থ অনুরোধের পর অবশেষে রফা হয় যে, আমার একটি কোন পুরাতন গল্প সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহারা ছাপাইবেন। ছুটি গল্পটি নির্বাচিত হইলে পর তাহার পুনর্লিখনের ভার তাঁহাদেরই হাতে দিই।···সে বেচারার ভাগ্যে ছাপাখানার মসী-অভিষেক জোটে নাই—কারণ, অবশেষে একটি নূতন ছোট গল্প লিখিয়া সম্পাদকীয় perturbed spiritকে শান্তি দান করিয়াছিলাম।'[৬৩]

শিবনাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'মুকুল' পত্রিকার আশ্বিন ১৩০২-সংখ্যার [১।৪] ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় চিত্র-শোভিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের 'কাগজের নৌকা' [দ্র শিশু ৯।৮২-৮৪] কবিতাটি মুদ্রিত হয়। এই কবিতাটিও নিশ্চয়ই উপরোধে রচিত।

ভাদ্রের শেষে রবীন্দ্রনাথ আবার উত্তরবঙ্গে যান। এবার পুত্র রথীন্দ্রনাথকেও [৭] তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাঁর 20 Sep [শুক্র ৪ আশ্বিন]-এর চিঠিতে 'এই হতভাগ্য ব্যক্তিটি স্টীমারের ছাতের উপরে আপাদমস্তক ভিজে একেবারে কাদা হয়ে গিয়েছিল' বর্ণনা দেখে মনে হয়, তিনি রামপুর-বোয়ালিয়ায় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের কাছেও গিয়ে থাকতে পারেন। লোকেন্দ্রনাথ এর কয়েকদিন আগেই বিলেত থেকে ফিরেছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'just after his return from England' তাঁর একটি ছবি এঁকেছিলেন 12 Sep [২৭ ভাদ্র] নাগাদ।

উক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি 'নতুন গানের' কথা আছে : 'কাল পরশু দুদিন ঠিক আমার সেই নতুন গানের মতো দৃশ্যটা হয়েছিল—/ ঝরঝর বরষে বারিধারা—···ইত্যাদি। ···আমি কাল পরশু মাঝে মাঝে সেই গানটা গাচ্ছিলুম। গাওয়ার দরুন বৃষ্টির ঝরঝর, বাতাসের হাহাকার, গোরাই নদীর তরঙ্গধ্বনি একটা

নূতন জীবন পেয়ে উঠতে লাগল—চারি দিকে তাদের একটা ভাষা পরিস্ফুট হয়ে উঠল এবং আমিও এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের সুবিশাল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলুম।'[৬৪] 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা' [দ্র গীত ২।৪৩৯; স্বর ১১; কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪২৯—মিশ্রমল্লার] গানটির রচনাকাল '১৮৯৫ সেপ্টেম্বর ২০ [১৩০২ আশ্বিন ৪]' বলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নির্দেশ করলেও[৬৫] এটি নিশ্চয়ই কয়েকদিন পূর্বে রচিত হয়েছিল। মজুমদার-পুঁথিতে কেবল 'ঝরঝর বরষে' শব্দ-দুটি পাওয়া যায়।

এই দিন [৪ আশ্বিন] তিনি আর একটি গান লিখতে শুরু করেন 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' [দ্র গীত ২।৪২৭-২৮; স্বর ৩৬; কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪৩০-৩১—শঙ্করাভরণ—মিশ্রতাল]। এটি ইন্দিরা দেবী-সংগৃহীত 'নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস জানরে' [দ্র গবেষণা গ্রন্থমালা ৩।৫৪-৫৮] গানটি ভেঙে রচিত। গানটি মজুমদার-পুঁথিতে লেখা, কিন্তু অন্য অনেকগুলি ভাঙা গান যেমন এই পাণ্ডুলিপিতে মূল গানের নীচে বা উপরে কথা বসিয়ে রচিত, এটিতে সেইরূপ হয়নি। অনেক পরিবর্তন ও কাটাকুটির মধ্য দিয়ে গানটির বাংলা রূপান্তর গড়ে উঠেছে। এই দিন ধুয়া ও বসন্ত-বন্দনা অংশটি রচিত হয়। ৯ আশ্বিন একই সুরে আষাঢ় ও আশ্বিনের বন্দনা অংশগুলি লিখে রবীন্দ্রনাথ গানটি সম্পূর্ণ করেন।

৫ আশ্বিন [শনি 21 Sep] তিনি লেখেন, 'ওলো সই, ওলো সই' [দ্র গীত ২।৩০৪-০৫; স্বর ৩৫; কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪৩০—বিভাস]। গানটি সম্পর্কে সাহানা দেবী লিখেছেন : শিলাইদহে কবি যখন সপরিবারে বাস করতেন তখন মাসিমাও [অমলা দাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বোন] ওঁদের সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন। ··· কবিপত্নীর সঙ্গেই ছিল মাসিমার সবচেয়ে বেশি ভাব। তাঁকে 'কাকীমা' বলে ডাকতেন। এই দুই সখীর একত্র বসে অন্তরঙ্গ ভাবে গল্পালাপাদির একটি চিত্র আছে রবীন্দ্রনাথের গানে, গানটি হচ্ছে—ওলো সই, ওলো সই। ···এই গানটির কথা মাসিমার মুখেই শুনেছি আর গানটিও তাঁকে অনেকবার গাইতে শুনেছি।'[৬৬] গানটির মধ্যে উভয়ের বিশ্রম্ভালাপের প্রতি সকৌতুক ইঙ্গিত থাকতে পারে, কিন্তু এই সময়ে তাঁরা কলকাতাতেই ছিলেন, শিলাইদহে আসেন কয়েকদিন পরে। ২ আশ্বিন 'যোড়াসাঁকো' থেকে মাধুরীলতা [বেলা] পিতাকে লিখেছেন : 'পূজার ছুটির জন্যে আমাদের দুইখানি পুস্তকের অঙ্ক কসিয়া ফেলিতে হইবেক। এবং সমস্ত Royal Reader-এর কবিতাগুলি মুকস্ত করিতে হইবেক। আমরা আজ ভবানিপুরে যাইব।···আমি মনে মনে এই বিবেচনা করিয়াছি যে সিলাইদায় গিয়া তোমার মতন রোগা হইব। আমার মাঝিদের গান শুনিতে বড় ইচ্ছা করে। এবং বোটের ছাতে উঠিয়া নদী স্টীমার এবং বোট যাচ্ছে দেখিতে বড় ইচ্ছা করে।'[৬৭] এইসব কথা রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই কন্যাকে লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিবার এই সময়ে কলকাতায় ছিল এইটি জানাবার জন্য আমরা চিঠিটি উদ্ধৃত করেছি। মাধুরীলতা চার বছর বয়স থেকেই পিতাকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন [দ্র চিঠিপত্র ১।১৭-১৮, পত্র ৫], কিন্তু রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত সন-তারিখ-সংবলিত প্রথম চিঠি এইটিই।

21 Sep [৫ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠিটি লেখেন, সেটি একটু সমস্যা সৃষ্টি করে। তিনি লিখেছেন : 'আমি নিশ্চয় জানি যে, একবার যদি আমি নিজেকে ঘাড় ধরে কোনো একটা রচনাকার্যে নিযুক্ত করাতে পারি তা হলে লেখা বেশ হু হু করে এগোতে থাকে, এবং যতই সে লেখার মধ্যে মন নিবিষ্ট হতে থাকে ততই মনটা একটা বিশুদ্ধ আনন্দের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রথম লিখতে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে কিছুতেই মনকে লওয়াতে পারি নে। ···এখন সে কেবলই তার কলকাতার

আস্তাবলটার দিকে ঝুঁকছে—আবার একবার যখন সে আপনার রচনার এবং কল্পনার মধ্যে আপনার পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবে, খানিকটা দূর এগিয়ে যাবে, তখন মনে করবে এই কল্পনালোকের মধ্যে আমার বাস্তবলোক প্রকৃতভাবে আছে। লিখতে গিয়ে আপনার নিগূঢ় মানসরাজ্যের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশলাভ হতে থাকে এবং সেখানে গিয়ে দেখি, জীবনে আমার বাঞ্ছিত পুষ্প থেকে যত মধু আহরণ করেছিলুম তার অধিকাংশই সেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে। মনের এই নিত্যরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করবার দ্বার সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না।'[৬৮] সৃষ্টিযন্ত্রণায় কাতর রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের একটি অপূর্ব চিত্র এই চিঠিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন্ রচনাকার্যে নিজেকে নিবিষ্ট করার জন্যে তাঁর এই সাধ্যসাধনা সেইটি বোঝা মুশকিল। সাধনা-র অবলুপ্তির ফলে তাঁর নিত্যনিয়মিত রচনাস্রোত এই সময়ে রুদ্ধ, কিছু গান ও পরবর্তী 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি কবিতা তাঁর সমকালীন সৃষ্টির নিদর্শন। তাহলে কি, প্রায় এক বছর আগে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৩ ভাদ্র ১৩০১ তারিখে 'নাটকখানির কতদূর' বলে যে প্রশ্ন করেছিলেন এটি কি সেই নাটক অথাৎ 'মালিনী'? এই প্রশ্ন বারবার করার কারণ, নাট্যকাব্যটির রচনাকাল আমাদের জানা নেই। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : '১৩০২ বা ১৩০৩ সালে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, যখন কবি উড়িষ্যায় ছিলেন সেই সময়ে এই নাটকখানি সেইখানে লেখা।'[৬৯] সম্ভবত এরই সূত্রে রবীন্দ্রজীবনীকারও লেখেন : 'উত্তরবঙ্গ হইতে জমিদারি সংক্রান্ত কার্য উপলক্ষে চলিয়াছেন উড়িষ্যা [১৩ বৈশাখ ১৩০৩-এর পর]। রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে ভ্রমণকালে তিনি বিস্তর বই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এইসব গ্রন্থের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই থাকিত। ···এবার এই গ্রন্থ হইতে 'মহাবস্তু অবদান' অন্তর্গত এক উপাখ্যান অবলম্বনে 'মালিনী' নাট্যকাব্য রচনা করিলেন।'[৭০] কিন্তু এই সময়ে ক্যাশবহি বা অন্যান্য সূত্রে তাঁর উড়িষ্যা-যাত্রার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সেই সময়ে উড়িষ্যায় মালিনী রচনার ইতিবৃত্ত মেনে নেওয়া শক্ত। অবশ্য বর্তমান বৎসরেও আশ্বিন-কার্তিক দু'মাস তিনি গীতসুধারসে ভাসমান, সুতরাং এই সময়েও নাট্যকাব্যটি লেখা হয়নি। আরও তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

মজুমদার-পুঁথির বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত একটি অসমাপ্ত কাব্যরচনার এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে স্থান-সংক্ষেপের জন্য ছত্রগুলি আমরা অন্যভাবে সাজিয়েছি :

নাহি অবসর
আঁখি-ভরা ঘুমঘোরে উঠিয়াছি কোন্ ভোরে,
বসিয়াছি ঘড়ি ধরে, রুধিয়াছি ঘর!
কলমের খোঁচা লেগে ভাবগুলো রেগেমেগে
কাঁচাঘুমে উঠে জেগে নাহি পায় পথ—

—কানাই সামন্ত লিখেছেন, '১৩০২, ৫ আশ্বিনের এই লেখা।'[৭১] যদি তাই হয়, ইন্দিরা দেবীকে এই দিনে লেখা পত্রের সঙ্গে কবিতিকাটির একটি কৌতুকজনক সাদৃশ্য দেখা যায়!

৬ আশ্বিনে [রবি 21 Sep] লেখা গান : 'ভূপালি। কাওয়ালি।/ মধুর মধুর ধ্বনি বাজে'[দ্র গীত ২।৫৪৭; স্বর ১০; কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪৩০]। এই গানটিকেও ইন্দিরা দেবীকে লেখা উক্ত চিঠিটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়া সম্ভব।

মজুমদার-পুঁথিতে দেখা যায়, ‘ওলো সই, ওলো সই’ থেকে পর পর লেখা গানগুলিকে একাদিক্রমে সংখ্যা-চিহ্নিত করেছেন, আবার এই গানগুলিই তিনি ইন্দিরা দেবীর ‘গানের বহি’র সঙ্গে বাঁধানো সাদা পাতাগুলিতে লিখে দিয়েছেন—সেগুলিও একাদিক্রমে সংখ্যা-চিহ্নিত, কিন্তু দুটি সংখ্যার মধ্যে মিল নেই।

৮ আশ্বিন [মঙ্গল 24 Sep] রবীন্দ্রনাথ লেখেন ‘পূরবী। একতালা।/বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে গানটি [দ্র গীত ১/ ৬৮; স্বর ১০; কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪৩০]।

৯ আশ্বিন [বুধ 25 Sep] তিনি ‘বিশ্ববীণারবে’ গানটির শেষ দুটি স্তবক রচনা করেন ও নতুন লেখেন ‘দেশ। পঞ্চমসওয়ারি/ আহা আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি’ গানটি [দ্র গীত ৩।৮৯৩; স্বর ৩৫]। এই গানটি রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীর গানের বহি-তে লিখে দিয়েছেন, কিন্তু কাব্য গ্রন্থাবলী-তে ও পরবর্তী সংকলনগ্রন্থগুলিতে এটি গৃহীত হয়নি—এর কারণ অজ্ঞাত। গীতবিতান-এর পাঠ গানের বহি থেকে গৃহীত।

26 Sep [বৃহ ১০ আশ্বিন] রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : ‘কেবল সংগীত-আলোচনায় সরস্বতীর সঙ্গে খানিকটা সম্বন্ধ রেখেছি। এখানে প্রকৃতি এত নিকটবর্তিনী, তার হৃৎকম্প এবং তার নিশ্বাস-হিল্লোল এত কাছে অনুভব করা যায় যে, সংগীত ছাড়া আর কোনোরকম চেষ্টাসাধ্য উপায়ে ভাবপ্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না।’[৭২] রবীন্দ্রনাথ এর পর ১২ আশ্বিন থেকে ১ কার্তিক পর্যন্ত আরও দশটি গান রচনা করেছেন, আমরা সেগুলিকে তালিকাবদ্ধ করে দিচ্ছি [সংখ্যাগুলি মজুমদার-পুঁথি অনুযায়ী, ‘বিশ্ববীণারবে’ ও ‘আজি মোর দ্বারে’ গান-দুটি সংখ্যা চিহ্নিত হয়নি] :

[৪] বিজয়া দশমী ১৩০২/১২ আশ্বিন [শনি 28 Sep] কেদারা-কাওয়ালি। কে দিল আবার আঘাত দ্র গীত ২।৩৩১; স্বর ১১; কাব্য গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত চিত্রা-য় ‘অতিথি’ শিরোনামে সংকলিত।

[৫] ১৩ আশ্বিন [রবি 29 Sep] এসো গো নূতন জীবন দ্র গীত ২/৫৪৭; স্বরলিপি নেই; কাব্য গ্রন্থাবলী-র অন্তর্গত চিত্রা-য় শিরোনাম ‘নবজীবন’ [পৃ ৩৭৪], সুরনির্দেশ : ভৈরোঁ।

[৬] ১৪ আশ্বিন [সোম 30 Sep] কালাংড়া। পুষ্পবনে পুষ্প নাহি দ্র গীত ২।৩২৬; স্বর ১০; ‘মানসবসন্ত’ : কাব্য গ্রন্থাবলী [চিত্রা]। ৩৭৪-৭৫।

[৭] ১৫ আশ্বিন [মঙ্গল 1 Oct] রামকেলী। (আহা) জাগি পোহাল বিভাবরী দ্র গীত ২/৩২৫; স্বর ৫০; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩১, মিশ্র ভৈরোঁ।

[৮] ১৬ আশ্বিন [বুধ 2 oct] ভৈরবী। ওহে অনাদি অসীম সুনীল অকূল সিন্ধু দ্র গীত ৩।৮৪৫; স্বরলিপি নেই; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩১।

[জোড়াসাঁকোয় ২৬ ভাদ্রে লেখা ‘ওঠরে মলিনমুখ চল এইবার’ গানটি রবীন্দ্রনাথ এর পর মজুমদার-পুঁথিতে ৯ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে লিখে রেখেছেন।]

[১০] ১৮ আশ্বিন [শুক্র 4 Oct] তোমার গোপন কথাটি, সখি, দ্র গীত ২। ২৯৭; স্বর ১০; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩১ ‘কীর্ত্তনের সুর’।

[১১] ২৩ আশ্বিন [বুধ 9 Oct] চিত্ত পিপাসিত রে দ্র গীত ২।২৭১; স্বর ১০; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩১, খাম্বাজ।

[১২] ২৫ আশ্বিন [শুক্র 11 Oct] আমি চিনি গো চিনি তোমারে দ্র গীত ২।৩০৬; স্বর ৫০; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩১, ঝিঁঝিট।

[১৩] ২৯ আশ্বিন [মঙ্গল 15 Oct] আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল দ্র গীত ২।৫৯৩-৯৪; স্বর ৫১; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩১-৩২, খাম্বাজ।

[১৪] ১ কার্তিক [বৃহ 17 Oct] ভূপালি। খেমটা। ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী দ্র গীত ২।৫৯৯; স্বর ৫১; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩২। গানটির শুরুতে বর্জিত পাঠ : '[...] অশ্রু কিসের দীর্ঘশ্বাস/ আমরা হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব পরিহাস!'

এখানে কিছুটা বিরতি ঘটলেও গানের পালা রবীন্দ্রনাথ শেষ করে দেননি, দিন-পনেরো পরেই আবার একগুচ্ছ গান রচিত হয়।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে অনেকগুলি চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে তাঁর জীবন ও মানস -চিত্রটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এই সময়ে পাটের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং কয়েকটি চিঠিতে তার পক্ষ সমর্থনের প্রয়াস আছে। 25 Sep [৯ আশ্বিন]-এর চিঠিতে লিখছেন : 'দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের এমন সংগতি নেই যে কারও দুঃখ দূর করতে পারি। সেই জন্যে টাকা করা কাজটাকে ছোটো মনে হয় না। যদি আমাদের এই ব্যবসায়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে উঠতে পারি তা হলে অনেক মনের আক্ষেপ মেটাতে পারব—এই মেট্যিরিয়ল পৃথিবীতে কেবলমাত্র কামনার দ্বারা ভালোবাসার দ্বারা কারও দুঃখ দূর করা যায় না।'[৭৩] কিন্তু এর ফলে কবি-মানুষটি কিছুটা বিব্রত-ও, তাই পরের দিন লিখছেন : 'আজ আমার নির্জনবাসের শেষ দিন; কাল থেকে অন্যান্য কাজের মধ্যে আতিথ্যে মন দিতে হবে।'[৭৪] 4 Oct [১৮ আশ্বিন]-এর চিঠিটি তো ব্যবসা সম্পর্কে খানিকটা বিরূপতা প্রকাশ করেছে : 'আমি যদি পাটের ব্যবসায়-উপলক্ষে কোনো দুর্গম স্থানে গিয়ে একলা পড়ে থাকি তা হলে লোকে আমার প্রশংসা করবে এবং আমারও কর্তব্যবুদ্ধি শান্ত থাকবে, কিন্তু যদি বিনা কার্যে কিছুদিন নিরুদ্দেশ থাকি তা হলে আপনাকে এবং পরকে ভুলিয়ে রাখা শক্ত হয়।'[৭৫] ব্যবসায়ী মানুষটির পরিচয়টি এখানে অবশ্য সুস্পষ্ট নয়, সেটি স্পষ্ট ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে লেখা ১৬ আশ্বিনের [বুধ 2 Oct] চিঠিতে : 'আমার কারবার চলিতেছে ভাল—কেবল উপযুক্ত লোকের অভাবে হিসাব এখনো খসড়াবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। আগামী কল্য হইতে খসড়া খাতার মধ্যে মজ্জমান হিসাবকে উদ্ধার করিবার জন্য একটি লোক নিযুক্ত হইবে। পাকা খাতায় উঠিলে একবার আপনাকে স্মরণ করিব।'[৭৬]

এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন : 'দিন দুয়েক হইতে রীতিমত ঝড়ের দাপটে পড়িয়াছি। কতকটা সাইক্লোনের মত। ...রথী এবং বলু আমার স্কন্ধে থাকাতেই আশঙ্কা।' রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা পিতার সঙ্গে হিমালয় যাত্রা, একটি মহৎ ব্যক্তিত্বের নিরন্তর সাহচর্য তাঁর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই অভিজ্ঞতার জন্যই তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কোনো স্কুলে ভর্তি না করে বাড়িতেই শিক্ষক রেখে পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন এবং সময়-সুযোগমতো তাঁকে নিয়ে ভ্রমণে বহির্গত হয়েছেন। ইতিপূর্বে কার্তিক ১৩০১-এ তিনি রথীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবারে নিয়ে এলেন শিলাইদহে।

রথীন্দ্রনাথ এই ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করেছেন The boat "PADMA" প্রবন্ধে [দ্র *Visva-Bharati Quarterly*, May-July 1943, pp. 33-40]:

In spite of mother's fears, father started taking me with him on his frequent river journeys when I was little more than a boy of seven. ...My earliest recollection is that of a visit to Kushtia. The station which hangs precariously over the steep embankment of the Gorai and its one-legged English station master, the river with its swift current and eddies, the innumerable barges and dinghies huddle close to the bank—all seemed strange and forbidding to me. ...The factory was inspected in due course-its workshop with its huge hydraulic presses for bailing jute, innumerable sugarcane crushes waiting for shipment to interior villages, its ware-houses bulging with their loads of mustard and other oil seeds and the hundreds of workmen sweating and shouting. Father looked into all the details of the business but it did not take him long to do it, he had a way easily shaking off the officers who came with long reports and accounts. Business finished he would immediately go back to his writing as though the interruption mattered not at all.

—এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে ঠাকুর কোম্পানির ব্যবসা-স্থলের একটি অন্তরঙ্গ চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কর্মপদ্ধতির একটি প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায়। পুত্রকেও তিনি এই-সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার অংশীদার করে নিয়েছেন, এটিও লক্ষণীয়।

শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ কলকাতায় মাধুরীলতার সঙ্গে পত্রালাপ করতেন সেটি জানা যায় মাধুরীলতার 'ভবানীপুর' থেকে '১৫ই আশ্বীন' [মঙ্গল 1 Oct]-এ লেখা চিঠিতে : 'পরশুদিন তোমার ও রথীর একটা চিঠি পেলাম। এখন আমি দিদিয়াদের [ইন্দিরা দেবী] কাছে থাকি। মাষ্টারমহাশয় আমাদের ঢের Home Ex: দিয়েছেন। হয়ত দুইটা খাতা ভরিয়া যাবে। রথীও সেখানে বেশ আছে। রথী কি সেখানে আর Home Ex: করে?··· রথী মামাকে বেশ মজার চিঠি লিখেছিল। ···বলুদাদাকে বল আমাকে আগে চিঠি লিখিতে না হলে আমিও তাঁকে লিখিব না। ···রথীকে বল যে কাল তাকে আমি একটা চিঠি লিখিব।'[৭৭] রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখা হয়েছিল কিনা জানি না, কয়েকদিন পরেই মৃণালিনী দেবী সখী অমলা দাস-সহ শিলাইদহে আসেন, তাঁর তিন কন্যাকেও নিশ্চয়ই তিনি নিয়ে এসেছিলেন।

এই পারিবারিক সম্মিলনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়াটি বিচিত্র। ইন্দিরা দেবীকে 4 Oct [শুক্র ১৮ আশ্বিন] শরৎপ্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখছেন : 'আশ্চর্য এই যে, পরশু আমার এখানে যখন জনসমাগম হবে তখন এরা যেন আর এখানে থাকবে না—মানুষ এলে যেন প্রকৃতির মধ্যে আর প্রকৃতির স্থান থাকবে না। মানুষ এত বেশি জায়গা জোড়ে, চতুর্দিকে এতটা জিনিষের অপব্যয় করে!'[৭৮] পরের দিনের চিঠিটি কুষ্টিয়া থেকে লেখা, সম্ভবত মৃণালিনী দেবীদের এগিয়ে আনার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতিরসসম্ভোগের মধ্যে একান্ত প্রিয়জনের সমাগমও যে ভালো লাগছে না 15 Oct [মঙ্গল ২৯ আশ্বিন]-এর চিঠিতে তা খুব স্পষ্ট : 'যদি একলা থাকতুম তা হলে এই সময়টাতে জানলার কাছে লম্বা কেদারায় আবিষ্টচিত্তে পড়ে থাকতুম —···কিন্তু এখন এ অবস্থায় ঠিক সেই আত্মবিস্মৃত ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হওয়া শক্ত। আমি যে আমি, অর্থাৎ অমুকের বাপ, অমুকের স্বামী, অমুকের বন্ধু, শ্রীযুক্ত অমুক, সে সম্বন্ধে বিচিত্র প্রমাণ চতুর্দিকেই বর্তমান।'[৭৯] পরের দিনের চিঠিতেও এই ভাবটি আছে : 'কাল অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হয়নি, অনেকক্ষণ জলিবোটে পড়েছিলুম—তার পরে বোটে আমার শোবার ঘরে এসে জানলার ধারে বেঞ্চিতে বসে অনেক দিন পরে একাকী যাপন করেছিলুম। ···রাত্রি যদিও গভীর ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল না, কারণ, আমার পাশের বোট থেকে আমার দুই প্রতিবেশিনী বিছানায় পড়ে পড়ে হাস্যালাপ করছিলেন।'[৮০] সুকণ্ঠী অমলা দাসকে রবীন্দ্রনাথ খুবই স্নেহ করতেন, রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে তিনি তাঁর গান শেখার

ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং 'এ কি আকুলতা ভুবনে' 'চিরসখা হে ছেড়ো না মোরে' 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে' প্রভৃতি গান তাঁর কণ্ঠের উপযোগী করে রচনা।[৮১] শিলাইদহে সংগীতচর্চা সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'After a hurried dinner the whole family would tumble into an open boat and, rowing out into the middle of the river, keep it anchored there. Amaladidi and Father would take turns and song after song would float across the water uninterruptedly until midnight.'[৮২] এই বর্ণনার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ভিন্ন সময়ে রচিত যে দুটি গানের উল্লেখ করেছেন ['বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' ও 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা'], তাতে মনে হয় নানা দিনের কথা তাঁর স্মৃতিতে একাকার হয়ে গিয়েছিল। নইলে অন্তত সমকালীন পত্রে রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে এই সংগীতরসোল্লাসকে মেলানো শক্ত। অবশ্য এই সময়েই লিখিত একটি গানে তাঁর গীতসুধার জন্য আর্তি প্রকাশ পেয়েছে :

> চিত্ত পিপাসিত রে/গীতসুধার তরে॥
> তাপিত শুষ্কলতা   বর্ষণ যাচে যথা
> কাতর অন্তর মোর লুণ্ঠিত ধূলি-'পরে
> গীতসুধার তরে॥

—কিন্তু এই পর্বে তিনি মাত্র চারটি গান লিখেছেন, তার মধ্যে শেষ দুটি সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রবর্তিত 'ডাকাতে ক্লাব'কে মনে করে লেখা, যেটি 'লক্ষ্মীছাড়ার দল' নামেও পরিচিত ছিল।

এই স্বজন-সমাগমে রবীন্দ্রনাথ যখন বিব্রত, তখন বন্ধু-সমাগমও ঘটল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 7 Oct [সোম ২১ আশ্বিন] তাঁকে লিখেছেন : 'কুষ্টিয়া আবকারি আপিস পর্য্যবেক্ষণের সময় আপনার সহিত দেখা হইবে, আশা আছে। ১৬/১৭ই অক্টোবর তক অতদূর পহুঁছিয়া উঠিব, বোধ হয়। সম্ভবতঃ আপনি সে সময়ে শিলাইদহে বিরাম করিবেন। আমাদের উক্ত স্থানে 'আগমন' 'গোপনীয়' ভাবে সংঘটিত হইবে, অতএব পুষ্প স্তম্ভ তোরণাদি দ্বারা প্রকাশ্য কোন প্রকার স্বাগতায়োজন করিবার দরকার নাই। কেবল সন্দেশের আয়োজনটা থাকিলেই হইবে। ···পাছে নগেন্দ্রের মত এক কুন্দনন্দিনীকে ঘরে আনিয়া বৃষ[?]বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফেলি সেই ভয়ে আমার সূর্য্যমুখীকে সঙ্গে করিয়া যাওয়াই সর্ব্বাংশে নিরাপদ বিবেচনা করিতেছি।'[৮৩] বর্তমান মানসিক অবস্থায় বন্ধুসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের কেমন লেগেছিল জানা নেই, কিন্তু তাঁকে যে অন্যদের ভালো লাগত সে-কথা লিখেছেন রথীন্দ্রনাথ : 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছুটি পেলেই শিলাইদহে চলে আসতেন। তখন তাঁর হাসির গান খুব শোনা যেত। আমরা তাঁর গান শুনে হেসে লুটোপাটি খাচ্ছি—তিনি কিন্তু হারমোনিয়াম বাজিয়ে গম্ভীরভাবে গান গেয়ে যেতেন। মুখে একটুও হাসির চিহ্ন নেই।'[৮৪]

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হলেও কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্মমতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে যুক্ত করেননি। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্যে নিজের ধর্মকে উদ্ধৃত করে নেওয়ার দিকে তাঁর একটি বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়। ইন্দিরা দেবীকে লেখা এই সময়ের বিভিন্ন পত্রে এর প্রাথমিক রূপটি চোখে পড়ে। 4 Oct [শুক্র ১৮ আশ্বিন] তিনি লিখেছেন : 'এ জীবনে আমার যা-কিছু গভীরতম তৃপ্তি এবং প্রীতি, সে কেবল এই রকম নির্জনে সুন্দর মুহূর্তে পুঞ্জীভূতভাবে আমার কাছে ধরা দেয়—খণ্ডভাবে মিশ্রিতভাবে সংসার থেকে সেগুলো সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে—কেবল তার আভাস পাই। আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য

সম্বল, আমার সমস্ত জীবনখনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু—আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনার ভিতরকার অমৃতশস্য—সেটাকে যদি স্পষ্ট পরিস্ফুট নির্ভরযোগ্য দৃঢ় আকারে পাই তা হলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সুখ-সম্পদ সব চেয়ে বেশি জিনিষ হয়—যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের স্বাভাবিক অনিবার্য প্রবাহ এও একটা পরম লাভ।'[৮৫] পরের দিন তিনি লিখেছেন : 'কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিষ দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থিরকর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, কে আমার উপরে একটি উদার বিষাদমন্ত্র পাঠ করে আমার সমস্ত চাপল্য প্রতিদিন মিলিয়ে নিয়ে আসছে এবং বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে নিভৃত নিস্তব্ধ সজাগ সচেতন ভাবে অনুভব করতে দিচ্ছে। ···তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, সুখ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তবু বিধাতা যখন বলপূর্বক আমাকে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত করিয়েছেন তখন বোধ হয় আমার দ্বারা তিনি একটা বিশেষ ফল পেতে চান—··· মাঝে মাঝে তার আবছায়া রকম অনুভব পাই। ···আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনো আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না, তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ দৃঢ় হয়ে আসে—সে ধর্ম আমার জীবনের ভিতরে সংসারের দুঃসহতাপে ক্রিস্টলাইজ্‌ড্ হয়ে ওঠে সেই আমার যথার্থ। ···সেই জিনিষটাকে নিজে মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের চরম ফল।'[৮৬] সম্ভবত ইন্দিরা দেবীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি 10 Oct [বৃহ ২৪ আশ্বিন] লেখেন : 'ঠিক যাকে সাধারণত ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারি নে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে-একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো-একটা নির্দিষ্ট মত নয়—একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। ···জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে···কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি।'[৮৭] লক্ষণীয়, 'বঙ্গভাষার লেখক' [১৩১১] গ্রন্থে নিজের জীবনবৃত্তান্ত লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-রচনাটি লিখেছিলেন, তার মধ্যে এই পত্র থেকে দীর্ঘতর উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন : 'এই পত্রে আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনশক্তির কথা লিখিয়াছি, যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?'[৮৮]

কয়েক মাস পরে ২৯ মাঘ [মঙ্গল 11 Feb]-লিখিত এই কবিতা [দ্র চিত্রা ৪। ১০৬-০৮] তাত্ত্বিকদের হাতে পড়ে ক্রমশ ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও মাঝে মাঝে তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। কিন্তু তাঁর

ব্যক্তিজীবনের ও কাব্যজীবনের বিকাশের দিক দিয়ে কবিতাটিকে দেখলে এর মধ্যে অতীন্দ্রিয়তার সন্ধান করা নিরর্থক বলে মনে হয়, ছিন্নপত্রাবলী-র উদ্ধৃত পত্রখণ্ডগুলি এর অনুভূতিগত সত্যতার সাক্ষ্যবিশেষ।

৬ কার্তিক [মঙ্গল 22 Oct] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে একটি পত্রে লেখেন : 'আমি সম্ভবতঃ আগামী রবিবারে কলিকাতায় পৌঁছিব।'[৮৯] এর থেকে মনে হয়, তিনি সপরিবারে ১১ কার্তিক রবিবার [27 Oct] কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। এছাড়াও সাধনার ক্যাশবহি-তে ৩ কার্তিক 'রবীবাবু মহাশয়ের নিকট এক পত্র পাঠান' ও ৯ কার্তিক 'শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সিলাইদহে গত আশ্বিন মাসের মাসকাবার পাঠান'র হিসাব তাঁর এই সময়ে শিলাইদহে থাকার প্রমাণ।

কার্তিক মাসের প্রথম পক্ষটিতে রবীন্দ্রনাথের গানের ধারা রুদ্ধ থাকলেও জোড়াসাঁকোয় ফেরার কয়েক দিনের মধ্যেই আবার পূর্ণবেগে উৎসারিত হয়েছে। ১৬ কার্তিক থেকে ২৯ কার্তিক পর্যন্ত মাত্র ১৪ দিনে তাঁর রচিত গানের সংখ্যা ৯টি :

[১৫] ১৬ কার্তিক [শুক্র 1 Nov] (এ কি) আকুলতা ভুবনে দ্র গীত ২।৪২৮; স্বর ১০; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩২, বাহার।

[১৬] ১৮ কার্তিক [রবি 3 Nov] তুমি রবে নীরবে হৃদয় মম দ্র গীত ২/২৯৭; স্বর ১০; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩২, বেহাগ।

[১৭] ২১ কার্তিক [বুধ 6 Nov] দেশ একতালা/ সে আসে ধীরে দ্র গীত ২/৩২৬; স্বর ১০; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩২, মিশ্র সুরট।

[১৮] ২২ কার্তিক [বৃহ 7 Nov] পরজ/কে উঠে ডাকি দ্র গীত ২/৩৯০; স্বর ১৩; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩২, পরজ।

[১৯] ২৩ কার্তিক [শুক্র 8 Nov] খাম্বাজ একতালা/ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি দ্র গীত ২।৩৪৫; স্বর ৩২; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩২, খাম্বাজ।

[২০] ২৪ কার্তিক [শনি 9 Nov] কাওয়ালি/তুমি যেয়ো না এখনি দ্র গীত ২।৩৩০-৩১; স্বর ১০; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩৩ ভৈরবী।

[২১] ২৫ কার্তিক [রবি 10 Nov] কাওয়ালি/আকুল কেশে আসে, চায় ম্লাননয়নে দ্র গীত ২।৩৩১; স্বর ১৩; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩৩, রামকেলী।

[২২].২৯ কার্তিক [বৃহ 14 Nov] হৃদয়চন্দ্র হৃদিগগনে উদিলরে শুভ লগনে [হৃদয়শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গললগনে] দ্র গীত ১।২০৬-০৭; স্বর ৪; কাব্য গ্রন্থাবলী-তে নেই।

[২৩] ২৯ কার্তিক [বৃহ 14 Nov] সিন্ধুকানাড়া/কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে দ্র গীত ২।২৯৪; স্বর ১০; কাব্য গ্রন্থাবলী [গান]। ৪৩৩, সিন্ধুকানাড়া।

মজুমদার-পুঁথি-তে রবীন্দ্রনাথের গানরচনার একটি পর্ব এখানে শেষ হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপিটি সকলের দেখার সুযোগ নেই, কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক-একটি গানের রূপ গড়ে উঠেছে সেটির পর্যালোচনা যথেষ্ট কৌতূহলজনক। কানাই সামন্ত 'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি' [রবীন্দ্রপ্রতিভা। ২৫৭-৮১], অমিতাভ চৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক' [দেশ, শারদীয়া ১৩৭৭। ১৮-২৪; রবীন্দ্রনাথের পকেট বুক এবং।১-১৩] ও

শান্তিদেব ঘোষ 'রবীন্দ্রজীবনে গীতরচনার একটি অজ্ঞাত যুগ' [দেশ, শারদীয়া ১৩৭৮।৮২-১০৮; রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা। ১৬০-২৪২] প্রবন্ধে এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, বিশেষত শেষোক্ত দু'টি প্রবন্ধের পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ বহু পাণ্ডুলিপি-চিত্রে সমৃদ্ধ, এই গুলি দেখে নিতে পারলে পাঠক উপকৃত হবেন।

এই পাণ্ডুলিপিতে ২৯ কার্তিকের গান যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরের দুটি পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ একটি শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয় রচনার চেষ্টা করেছেন। এর পরের পৃষ্ঠায় একটি হিন্দি-ভাঙা গান রচিত হয়েছে—'শীতল তব পদছায়া'—যার তারিখ নেই, কিন্তু ১৪ শ্রাবণ ১৩০৩-এর পূর্বে রচিত। সুতরাং এরই মধ্যবর্তী কোনো সময়ে এই বর্ণপরিচয় রচনার চেষ্টা হয়েছিল বলে মনে হয়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে তাঁর সহজ পাঠ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল, তারই আদি পাঠ দেখা যায় বর্তমান প্রয়াসে :

ক×কয় কথা××কেবল কাঁদে×কয় কথা। খ খায় খই।

গ গায় গান। ঘ ঘুমোয় ঘরে

ঙ করে উঁ আঁ। তার চোখে লাগে ধুঁয়া।

চ×চিবোয় চাল×চড়ে চালে। ছ×ছড়ায় ছোলা×ছেঁড়ে ছাতা।

[×···× চিহ্নের মধ্যবর্তী পাঠ লিখে কেটে দেওয়া।]

—এইভাবে প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ ও পরে স্বরবর্ণের পাঠ লেখা হয়েছে। স্বরবর্ণের সম্পূর্ণ পাঠ মিলযুক্ত, ব্যঞ্জনবর্ণে মিল কখনো কখনো এসে গেলেও তার জন্য কোনো বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় না। সহজ পাঠ-এর পদ্ধতি মিলযুক্ত, কিন্তু একই সঙ্গে বর্ণপরিচয় ও বর্ণযোজনার দিক দিয়ে এদের সাদৃশ্য গভীর। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা নিয়ে ভেবেছেন প্রচুর, সাধনা-য় এই বিষয়ে লিখেছেনও অনেক রচনা—কিন্তু বর্তমান প্রয়াসের লক্ষ্য সম্ভবত দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা, যাঁর বয়স এই সময়ে পাঁচ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে।

৯ কার্তিক [শুক্র 25 Oct] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জামালপুর থেকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'বাজারে গুজব, আপনি বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা সংগ্রহ করিয়া একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিতেছেন। অনেকে উৎসুক হইয়া আছেন। কথাটা সত্য কি না আমাকে লিখিবেন।'[৯০] রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন কিনা প্রভাতকুমারের পরবর্তী পত্রগুলি থেকে জানা যায় না, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু ভগ্নহৃদয় কাব্যের প্রশংসা ও রাজর্ষি উপন্যাসের জন্য তথ্যসরবরাহ করেই বীরচন্দ্র এই সম্পর্ক শেষ করেন নি। রাজকার্য এবং বিশ্রাম ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বীরচন্দ্র প্রায়ই কলকাতা আসতেন। এইরূপ দুটি খবর আমরা *The Indian Mirror* পত্রিকায় দেখেছি; 1 Jan 1892-এর খবর: 'Maharaja of Tipperah has come down to Calcutta for a change', আবার 9 Dec 1894-এ প্রকাশিত হয় : 'Yesterday H. H. Maharajah Bir Chunder Manikya of Hill Tipperah…arrived by special train at Sealdah'। অনুমান করা যেতে পারে যে, এই-সব অবস্থানে পূর্ব-যোগাযোগের সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাছে আহ্বান করতেন। তাঁর অনুচর কর্নেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন : 'বাংলায় প্রকাশিত নূতন নূতন গ্রন্থ মহারাজ বীরচন্দ্রের নিকট পেশ করিবার ভার আমার মত কিশোর সেবকের উপর অর্পিত ছিল, সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বীরচন্দ্র মাণিক্য কলিকাতায় যখনই যাইতেন,

তখনি রবিবাবুকে ডাকাইয়া আনিতেন। বয়সে এই দুই কবির বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও বীরচন্দ্র বাৎসল্যভাবে কিশোর [?] সৌম্যদর্শন কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে কবিতা পাঠ এবং সঙ্গীত শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন।··· রবীন্দ্রনাথ পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের নিকট কবিতা পাঠ, বিশেষতঃ গান করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কিন্তু বীরচন্দ্রের স্বভাবসুলভ উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করা সহজসাধ্য হইত।'[৯১] রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন : 'মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান-গাওয়া যে কতদূর সঙ্কোচের ছিল তা' সহজেই অনুমেয়। কেবলমাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয়ে আমাকে সাহস দিয়েছিল।'[৯২] এখানে তিনি কলকাতায় মহারাজের সাহচর্যলাভের কথা উল্লেখ করেন নি এবং ১৩০৩ আশ্বিন-কার্তিকেতাঁর সঙ্গে কার্সিয়াঙে যাওয়ার কথা বলার পরে সংগীত-প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় সত্যরঞ্জন বসু তার 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি প্রবন্ধে '১৮৯৪ (১৩০১) গ্রীষ্মকালে' উভয়ের কার্সিয়াঙে অবস্থান কল্পনা করায় প্ররোচিত হয়ে লিখেছেন : 'প্রথমবারের অবস্থান সময়ে বীরচন্দ্র কবির লেখা শুনিতেন আর গান গাহিতে বলিতেন'।[৯৩] রবীন্দ্রনাথ যে ১৩০১-এর গ্রীষ্মকালে কার্সিয়াং যাননি, সে কথা আমরা আগেই বলেছি। তিনি আরও বলেছেন : 'তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে যখন আমি তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছিলেম, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানারকম আলাপ হতো। বৈষ্ণব পদাবলী যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল। কিন্তু তার পরই তাঁর সহসা মৃত্যু হওয়াতে সে সঙ্কল্প সফল হতে পারে নি।' এই উক্তি থেকে মনে হতে পারে যে, বৈষ্ণবপদাবলী সংকলনের প্রস্তাব বুঝি ১৩০৩ কার্তিকে উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু প্রভাতকুমারের এই পত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তার এক বছর আগেই এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা সুদূর জামালপুরেও পৌছে গিয়েছিল। সম্ভবত Dec 1894-এ বীরচন্দ্র যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখনই তিনি রবীন্দ্রনাথকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে এই কাজ সম্পাদনে কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে অনুলিখিত ৪০টি বৈষ্ণবপদের একটি সংকলনে। [রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহণ সংখ্যা Ms. 225, ৪৩টি পাতার এক পৃষ্ঠায় প্রেসকপির মতো করে লেখা।] পদসংগ্রহে সূত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে লিখে রেখেছেন পদগুলির পাশে—অস : অক্ষয় সরকার, গীচি : গীতচিন্তামণি, পকল : পদকল্পলতিকা ইত্যাদি। কিন্তু যথাযথ প্রস্তুতির পূর্বেই বীরচন্দ্রের মৃত্যুতে প্রস্তাবটি কার্যকরী হয় নি। জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদাবলী-সংকলনের সংকল্প নিয়েছেন, কিন্তু জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে তার সব-ক'টিই পরিত্যক্ত হয়েছে।

কলকাতায় থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমার কথিত 'সাধনার শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে, গ্রাহকগণকে কাশিয়াবাগান-বাগানবাটীতে উপস্থিত হইবার জন্য বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ' করে ফিরেছিলেন। কাশিয়াবাগান বাগানবাড়ি স্বর্ণকুমারী দেবীর বাসস্থান। এই উপলক্ষে সম্ভবত সেখানে একটি প্রীতি-সম্মিলন হয়েছিল।

22 Nov [শুক্র ৭ অগ্র°] দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ বোটে করে পতিসর-পথে চলেছেন। এইদিন ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'ছোট্ট নদীটির মধ্যে দিয়ে আমার বোট চলেছে—সমস্ত দিন একলা রয়েছি, কারও সঙ্গে একটিমাত্র কথাও কইতে হয়নি।···কলকাতার নানান কঠিন করস্পর্শের অনুরণন এখনো সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে রীরী করছে—কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, ক্রমে ক্রমে সে সমস্তই থেমে যাবে, জগৎকে অনন্তবৃহৎ বলে জানব এবং জগতের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ সহজ ও সরল হয়ে আসবে।'[৯৪] অবশ্য খুব সহজে এই সম্বন্ধ স্থাপিত

হয় নি—তিন দিন পরে 25 Nov [১০ অগ্র°] লিখছেন : 'আমরা এম্‌নি গৃহপালিত প্রাণী যে, কলকাতা থেকে দুই পা বাড়িয়ে এই কালীগ্রামটিতে এসে মনে করছি একটা কী বিরাট ব্যাপার করে বসেছি। বাড়ির খুঁটির সঙ্গে এনি ছোটো দড়িতে আমাদের পা বাঁধা যে একটুখানি নড়লে-চড়লেই অমনি টান পড়ে—কেনই বা এত চিঠিপত্র লেখা এবং চিঠিপত্রের প্রত্যাশা!'[৯৫] 28 Nov [১৩ অগ্র°]ও তিনি লিখছেন : 'কলকাতায় যখন নানাপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষে উদ্‌ভ্রান্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি তখন মনে মনে কল্পনা করি, সুদূর নির্জনে আমার জন্যে আমার ভাবলক্ষ্মী সুধাপাত্র নিয়ে বসে আছেন—যখন সেখানে এসে উপস্থিত হই তখন দেখি পাষাণী কলকাতাও আমার পিছনে পিছনে এসেছে এবং ভাবলক্ষ্মী সুদূরতর নির্জনে গিয়ে লুকিয়েছেন।'[৯৬] অবশ্য বেশিদিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি, তিন দিন পরেই তাঁর আকাঙিক্ষতা কাব্যলক্ষ্মী এসে ধরা দিয়েছেন, মাত্র এক পক্ষকালের মধ্যেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম কয়েকটি এখানে রচনা করেছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮ কার্তিক [3 Nov] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আপনি একখানি পূর্বপত্রে লিখিয়াছিলেন, "বৈষ্ণবশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত নিত্য ধর্মের প্রতি আমার প্রচুর শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু তাই বলিয়া আমি বোষ্টম ধর্মের ভক্ত নহি।" কথাটা লইয়া আমি মনের মধ্যে অনেক দিন হইতেই নাড়াচাড়া করিতেছি।' এর পর তিনি 'শৃঙ্গার রসের আশ্রয়ে কিরূপে ভক্তি আসিতে পারে এই প্রশ্ন তুলে অনুরোধ করেছেন : 'বৈষ্ণবশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত নিত্যধর্ম কি, তাহা আমাকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিবেন রবীন্দ্রবাবু—আপনার যখন অবসর হইবে, সেই সময়ে লিখিবেন—আমি ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিয়া থাকিব।'[৯৭] কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ সেই অবসর পান নি, পতিসরে এসে ৯ অগ্র° [রবি 24 Nov] এক দীর্ঘ পত্রে বৈষ্ণব ধর্মের রসতত্ত্ব বর্ণনা করলেন। অবশ্য এর মধ্যে নূতন কথা কম, বৈশাখ ১৩০০-সংখ্যা সাধনা-য় মুদ্রিত 'ডায়ারী' ['মনুষ্য]-তে বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা সূত্রাকারে ব্যক্ত করেছিলেন, সেইটিই কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আকারে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে এই সময়ে তাঁর কতখানি দখল ছিল বলা শক্ত, এখানে তাঁর ব্যাখ্যা অনেক পরিমাণে তাঁর নিজস্ব জীবনভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। তিনি লিখেছেন : 'ইহার মূল কথাটা এই, আমি যেমন তাঁহাকে চাই, তিনি তেমনি আমাকে চান আমাকে নহিলে তাঁহার চলে না সেই জন্য তিনি আমাকে এত করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন।'[৯৮] এই বোধ তাঁর 'গীতাঞ্জলি'-পর্বে বিচিত্র সুরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—'আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে' যেন এই বাক্যটিরই কাব্যরূপ। 'জীবনদেবতা' কবিতাও এই ভাবনায় অনুরঞ্জিত।

ইন্দিরা দেবীকে লেখা 25 Nov [সোম ১০ অগ্র°]-এর চিঠি থেকে জানা যায়, তিনি এই সময়ে Edward Dowden-এর *New Studies in Literature* [1895] নামক সদ্যপ্রকাশিত সমালোচনা-গ্রন্থটি পড়ছেন। তিনি লিখছেন : 'কাল সন্ধেবেলায় গেটের উপর ডাউডেনের একটি প্রবন্ধ পড়ছিলুম—তাতে দেখছিলুম গেটে দুই বৎসরের জন্যে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে ইটালিতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ করে কী-এক নূতন প্রাণ এবং নূতন সম্পদ লাভ করেছিলেন, তাতে করে তাঁর প্রতিভা সহসা কী-এক অপূর্ব পরিণতি লাভ প্রাপ্ত হয়েছিল, তার সমস্ত প্রকৃতি কী-একটা বিস্তীর্ণ শান্তি এবং বৃহৎ মর্যাদা অর্জন করেছিল। পড়লে আমাদের মতো কারাবাসীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—···মনে হয়, যদি গেটের মতো শুভদৃষ্ট আমার হত, যদি এই বাংলাদেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদি এ দেশে মানবপ্রকৃতিবিকাশের উপযোগী সমস্ত খাদ্য থাকত,

তাহলে আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতুম—এখন আমি অনেকটা পরিমাণে কৃপাপাত্র দীন। যদি পারি তো আমিও এক সময়ে জগতে বেরিয়ে পড়ব—এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।'[৯৯] 29 Nov [শুক্র ১৪ অগ্র°]-এর পত্রেও কালীগ্রামের ভূ- ও মানব-প্রকৃতির খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে আক্ষেপ করে লিখেছেন : 'আমি খড়্‌খড়েগুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীর্তিকাহিনী অধ্যয়ন করছি। কোথায় নদীতীরে পতিসর, বোটের মধ্যে আমি, আর কোথায় বিচিত্রকর্মসংকুল ভাইমার রাজসভায় রাজকবি গেটে!'[১০০] বিচিত্র কর্ম ও শোকদুঃখাতুর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অন্তে একদিন বৃহত্তর জগতের তীব্রতর আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ জগতের পথে বেরিয়েছিলেন, 'পৃথিবীর মধ্যে অমরতা'ও লাভ করেছেন।

ডাউডেনের এই বই একটি কবিতা রচনার উপলক্ষ হয়েছে। ১৬ অগ্র° [রবি 1 Dec] রবীন্দ্রনাথ 'পূর্ণিমা' [দ্র চিত্রা ৪৭৬-৭৭] কবিতাটি লেখেন। কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ৪ চৈত্র [16 Mar 1896]-এর চিঠি থেকে মনে হয়, গ্রন্থ প্রকাশের সময়ে প্রথম পাঠের কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি লিখেছেন : 'পূর্ণিমা'— "কবি কুঞ্জবনে যে সুন্দরী জেগে আছে মন্দার শয়নে" সে সব কোথায় গেল? অতুল[চন্দ্র ঘোষ]কে ইহারি তো পাণ্ডুলিপি দিয়াছিলেন?"[১০১] রবীন্দ্রনাথ ৬ চৈত্র পত্রোত্তরে লেখেন : "পূর্ণিমা' কবিতাটা সত্য ঘটনামূলক। একদিন বোটে বসিয়া বাতি জ্বালাইয়া সন্ধ্যাবেলা ডাউডেন সাহেবের সমালোচনা পড়িতে পড়িতে রাত অনেক হইল এবং হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল—অবশেষে দিক্ হইয়া বইটা ধপ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম অমনি চারিদিকের মুক্ত জানালা দিয়া এক মুহূর্তে অনন্ত আকাশভরা পূর্ণিমা আমার বোট পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশব্দ উচ্চহাস্যে সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল। যখন সমস্ত আকাশে সৌন্দর্য আপনি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তখন বাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাউডেনের পুঁথি হইতে সৌন্দর্যতত্ত্ব খুঁটিয়া খুঁটিয়া উদ্ধার করার দুশ্চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যজনক—পৃথিবীর প্রান্তে একটা বোটের ভিতরে একটি ক্ষুদ্র মানবের এই অদ্ভুত আচরণে অনন্ত আকাশ হইতে এত বড় একটা সুমিষ্ট পরিহাস অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে আমার পৃষ্ঠে আসিয়া সস্নেহ আঘাত করিল ইহাতে আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। চন্দ্রলোক হইতে পৃথ্বীলোক পর্যন্ত কতখানি জ্যোৎস্না অথচ টেবিলের উপরে একটি বাতির শিখা সমস্ত লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল—অনন্ত নক্ষত্রলোক হইতে এই নিস্তরঙ্গ নদীতল পর্যন্ত কি পরিপূর্ণ অসীম নিঃশব্দতা, অথচ কানের কাছে ডাউডেন সাহেবের এই অকিঞ্চিৎকর বিতর্কে অন্তহীন আকাশের বিশ্বস্তর নীরবতা একেবারে অগোচর হইয়া গিয়াছিল। সেই পূর্ণিমা সন্ধ্যার এই মহৎ ঘটনাটি প্রথমে একটুখানি সাজাইয়া লিখিয়াছিলাম, তাহাতে মূল কথাটা মাটি হইয়াছিল—তাহার পর বই ছাপাইবার সময় যথাযথ যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই লিখিয়া দিলাম।'[১০২] ঘটনাটি তিনি আগেই 12 Dec [বৃহ ২৭ অগ্র°] তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লিখে জানিয়েছিলেন [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৫১১-১২, পত্র ২৫০]।

'পূর্ণিমা' কবিতার নীচে রবীন্দ্রনাথ তারিখ দিয়েছেন : '১৬ অগ্রহায়ণ, পূর্ণিমা, ১৩০২'—কিন্তু পঞ্জিকাতে দেখা যায়, এই বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার তারিখ ১৭ অগ্র° [সোম 2 Dec]; এখানে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া তারিখ ভুল হতে পারে, চতুর্দশীর চাঁদকেই পূর্ণিমার চাঁদ বলে ভুল করে থাকতে পারেন—কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর গোলমাল আছে ছিন্নপত্রাবলী-র কিছু চিঠির বিন্যাসে ও তাদের রচনাকাল ও স্থান-নির্ণয়ে। আমরা আগেই বলেছি, সব সময়ে চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দিরা দেবী সেগুলিকে খাতায় নকল করে

রাখেন নি, সময় ও সুযোগ-মতো কয়েকটি চিঠি নিয়ে একসঙ্গে নকল করতে বসেছেন। তার ফলে গোলমাল হয়েছে অনেকগুলি। প্রথমত, খাতায় অনেক চিঠির বিন্যাস কালানুক্রমিক নয়—যেমন মুদ্রিত গ্রন্থের ২৪৫-২৫০ সংখ্যা-চিহ্নিত পত্রগুলির পাণ্ডুলিপি-ধৃত বিন্যাস এই রকম : ২৪৬ কালীগ্রাম [6 Dec], ২৪৭ জলপথে/শনিবার [7 Dec], ২৪৯ সাহাজাদপুর-পথে [11 Dec], ২৪৮ শিলাইদহ-জলপথে [8 Dec], ২৫০ শিলাইদহ 12 Dec ও ২৪৫ সাহাজাদপুর ১৯ অগ্র° [4 Dec]—পত্রাবলীর সম্পাদক লিখিত বা অনুমিত তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু 4 Dec সাহাজাদপুর থেকে 6 Dec কালীগ্রাম যাওয়া, 7 Dec জলপথে, 8 Dec শিলাইদহ-জলপথে, 11 Dec সাহাজাদপুর-পথে থেকে 12 Dec শিলাইদহে অবস্থান অসম্ভব না হলেও রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ-অভ্যাসের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের সব চিঠিতে তারিখ নেই, খামের উপরে ডাকঘরের মোহর দেখে ইন্দিরা দেবী চিঠির অনুলিপির তলায় পত্র-প্রাপ্তির তারিখ লিখে রেখেছেন, তার থেকে পত্রাবলীর সম্পাদক পত্র-রচনার তারিখ অনুমান করে নিয়েছেন। কিন্তু খাম থেকে চিঠি বের করে নিয়ে নকল করতে গিয়ে খাম এলোমেলো করে ফেলার সম্ভাবনা থেকে যায় ও ছাপের অস্পষ্টতার জন্য '3' কে '৪' বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। এইসব সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে, তার কারণ গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থে [পৃ ১১-১৩] সাজাদপুর-নিবাসী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক অনুলিখিত সেখানকার কাছারিবাড়ির অর্ডারবুকে ২১-৮-১৩০২ [শুক্র 6 Dec] তারিখে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরের উল্লেখে ওই দিন তাঁর সাজাদপুরে উপস্থিতির কথা প্রমাণ করেছেন, কিন্তু ছিন্নপত্রাবলীর ২৪৬-সংখ্যক চিঠির রচনাস্থল 'কালীগ্রাম' ও 'কলকাতা ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৫' পত্র-প্রাপ্তির তারিখ থেকে সম্পাদক অনুমান করে নিয়েছেন পত্রটি 6 Dec রচিত হয়েছিল। সাজাদপুর ও কালীগ্রাম সন্নিকটবর্তী নয়, সুতরাং মেনে নিতেই হয় কোথাও একটা ভুল আছে—আমাদের সমর্থন গোপালবাবুর দিকে। তবে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-যে সংশোধন করে লিখেছেন : 'নাগর নদীর ঘাট/১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫'—এখানে তারিখের সংশোধনটি আমরা মেনে নিতে পারি না, কারণ তাহলে স্বীকার করতে হয় 15 Dec [রবি ১ পৌষ] শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে চিঠি লিখে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৫১৫, পত্র ২৫২] তার পরের দিনই তিনি কালীগ্রামে নাগরনদীর ঘাট থেকে পূর্বদিনে সেখানেই দেখা সূর্যাস্তের শোভা বর্ণনা করছেন!

কিন্তু সে যাই হোক, বর্ণনাটির অপূর্বতা নিয়ে সন্দেহ নেই : 'শিলাইদহের মাঠে গাছপালা গ্রাম বনের দর্শন পাওয়া যায়—এখানে কোথাও কিছু নেই, কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী, এবং তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা—মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে। ধীরে ধীরে কত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত সাগর নগর বনের উপর দিয়ে যুগ যুগান্তর কাল সমস্ত গোল পৃথিবীটা, একাকিনী, স্তম্ভিত অশ্রুপূর্ণ ম্লান দৃষ্টিতে, মৌন মুখে, শ্রান্ত পদে, প্রদক্ষিণ করে আসছে—তার বর যদি নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন অনন্ত পশ্চিমের পারে তার পতিগৃহ! দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার পথে লোহিতসমুদ্রের উপর এক অপরূপ সূর্যাস্ত দেখে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন কবিতায় তাকে প্রকাশ করতে না পেরে। এখানেও একই আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে : 'কাল হঠাৎ সেই মাঠের উপরে উঠে মাথার মধ্যে যেন একটা ছন্দ এবং সংগীত এবং কবিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাকে আকারবদ্ধ করা হল না এবং করাও বোধ হয় অসম্ভব।

সন্ধ্যার সমস্ত ঝিকিমিকি'কে গলিয়ে নিয়ে একটি সোনার প্রতিমা তৈরি করা যেমন অসাধ্য এও তেমনি অসাধ্য। আমার সেই অন্তরের উচ্ছ্বাস, পতিসরের প্রান্তরের উপর কালকের সেই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ নির্জন সন্ধ্যার মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে তারই সঙ্গে অস্তমিত হয়েছে।'[১০৩]

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের সৌন্দর্যানুভব কখনই সম্পূর্ণ অস্তমিত হয় নি, সূর্যাস্তরাগরঞ্জিত ছিন্ন মেঘখণ্ডের মতো কখনো গানে কখনো কবিতায় ছড়িয়ে গেছে।

গোপালচন্দ্র রায়-প্রদত্ত অর্ডার বুকের নকলের সাক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ২১ অগ্র° [শুক্র 6 Dec] সাজাদপুরে ছিলেন। ১৯ অগ্র° [বুধ 4 Dec] সাজাদপুর থেকে লেখা একটি চিঠি ছিন্নপত্রাবলী-তে আছে [২৪৫-সংখ্যক], আবার পতিসর থেকে যাত্রার বর্ণনা-সংবলিত পত্রটির শীর্ষে লেখা আছে 'শনিবার'—এই শনিবার তাহলে ১৫ অগ্র° [30 Nov], 'পূর্ণিমা' কবিতা রচনার আগের দিন। এই চিঠিতে তিনি লিখেছেন : 'বোট আজ ভোরের বেলায় ছেড়ে দেওয়া গেছে—সংকীর্ণ নদী ছাড়িয়ে এখন বিস্তীর্ণ বিলের মধ্যে এসে পড়েছি।···অনেক দিন পরে পতিসরের সেই ছোটো নদীগহ্বরটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমার মন আজকে তার সমস্ত ডানা আকাশে মেলে দিয়েছে, আমার বোট ভেসে চলেছে, আমি যেন এই স্নিগ্ধ নির্মল রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছি।'[১০৪] 'সাহাজাদপুর-পথে' এই নৌকাযাত্রার আর-এক দিনের বর্ণনা : 'ওরে বাস্ রে! কী তুমুল ব্যাপার! এইমাত্র কাঁচিকাটা পার হওয়া গেল—একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল। এ জায়গাটা একটা সংকীর্ণ খালের মতো, আঁকাবাঁকা—এইটুকুর ভিতর দিয়ে বিপুল জলস্রোত ফেনিয়ে ফুলে একেবারে যেন ঝর্ণার মতো ঝরে পড়ছে-ক্রুদ্ধ জল সমস্ত বোটটাকে একেবারে কেড়ে-ছিঁড়ে ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে চলে—···বুকের মধ্যে প্রাণটা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে স্তম্ভিত হয়ে থাকে, তার পরে মিনিট দশেকের মধ্যে সংকটের জায়গা উত্তীর্ণ হয়ে নিরাপদের ক্রোড়ের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়তে হয়।'[১০৫]

সম্ভবত সাজাদপুরেই ১৮ অগ্র° [মঙ্গল 3 Dec] তিনি 'চিত্রা' [দ্র চিত্রা ৪২১-২২] কবিতাটি রচনা করেন। ডাউডেনের সৌন্দর্যতত্ত্ব পাঠে ক্লান্ত কবির চোখে পূর্ণিমার চন্দ্রালোক 'অনন্তের অন্তরশায়িনী' 'বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী'র রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। সেই সৌন্দর্যদৃষ্টি এই কবিতায় বাস্তবের ধূলিমুক্ত হয়ে বাহির ও অন্তরের মধ্যে যোগ স্থাপন করেছে, 'জগতের মাঝে' যিনি 'বিচিত্ররূপিণী' 'অন্তরের মাঝে' তিনিই 'অন্তরবাসিনী' রূপে দেখা দিয়েছেন।

সাজাদপুরে কয়েকদিন থেকে সম্ভবত ২২ অগ্র° [শনি 7 Dec] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ যাত্রা করেন। একটি পত্রে তিনি লিখেছেন : 'কাল থেকে জলপথেই আছি। আশা ছিল আজ শিলাইদহে পৌঁছব, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখছি নে। সেজন্যে দুঃখ করতে চাই নে—পথের মধ্যে যে কটা দিন পাওয়া যায় সেই ক'দিন আমার পক্ষে অবিমিশ্র ছুটি—স্বেচ্ছাকৃত চিন্তা এবং কাজ ছাড়া কোনো কর্তব্যই নেই।···সমস্ত দিন আমার খসড়া কবিতার খাতাটা খুলে পেন্সিল হাতে যখন-তখন দু-চার লাইন করে লিখছি, এবং তার পরে অলসভাবে কোনো একটা দিকে চেয়ে আছি। আজ ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙে গেল—উঠে কতকগুলো গরম কাপড় জড়িয়ে বাতি জ্বেলে উর্বশী-নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেললুম, যখন সাড়ে সাতটা তখন স্নান করতে গেলুম—এমনি করে এই দু দিনে দুটি বেশ বড়োসড়ো রকমের কবিতা শেষ করে ফেলেছি।'[১০৬] এই দুটি কবিতা হল ২২ অগ্র° শনি 7 Dec]-এ লেখা 'আবেদন' [দ্র চিত্রা ৪।৭৭-৮১] ও ২৩ অগ্র° [রবি 8 Dec]-এ

লেখা 'উর্বশী' [দ্র চিত্রা ৪।৮২-৮৪]। পত্রটিতে তারিখ নেই, 'উর্বশী' কবিতার রচনাকাল থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে। কবিতা-দু'টি লিখে তিনি যথেষ্ট তৃপ্তি পেয়েছিলেন, সে কথাই লিখেছেন চিঠিটির পরবর্তী অংশে : 'সমস্ত দিন খোলা আকাশ এবং অজস্র আলোকের মধ্যে এই রকম অবিশ্রাম অখণ্ড অবসর পেলে তবে প্রকৃতি যে রকম করে তার ফুল ফোটায় এবং ফল পাকায় সেই রকম। করে সমস্ত রঙ ফলিয়ে এবং রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়।'

'উর্বশী' কবিতা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ৬ চৈত্রের পত্রে প্রভাতকুমারকে লিখেছেন : 'পৌরাণিক উর্বশীর নাম অবলম্বন করিয়া আমি যাহাকে কমপ্লিমেন্ট দিয়াছি তাহাকে অনেক দিন হইতে অনেক কবি কমপ্লিমেন্ট দিয়া আসিতেছেন। গেটে যাহাকে বলেন The Eternal Woman—Ewige Weibliche, আমি তাহাকে উর্বশী মূর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছি। সে আমাদের সহিত কোনোরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, বধূ নহে মাতা নহে কন্যা নহে, সে রমণী সে আমাদের হৃদয় হরণ করে, সে দিব্যরূপে আমাদের স্বর্গে বিরাজ করে,··· তাহার সহিত কাহারও কোন বন্ধন নাই, সে আদিম রহস্যসমুদ্র হইতে দেবতারা সংসারের সমস্ত সুধা ও বিষ উন্মথিত করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন অতল হইতে এই চিরযৌবনা অপ্সরী উঠিয়া আজ পর্যন্ত মুনিদের ধ্যানভঙ্গ, কবিদের কবিত্বের উদ্রেক, এবং দেবতাদের চিত্তবিনোদন করিয়া আসিতেছে। সে নৃত্য করে, গান করে, আনন্দ দান করে, এবং বাসনার চরমতীর্থ স্বর্গলোকে বাস করে।'[১০৭]

'চিত্রা' ও 'আবেদন' কবিতার আলোচনা একসঙ্গে করে তিনি প্রভাতকুমারকে একই পত্রে লিখেছেন : "যিনি 'আমি' নামক এই ক্ষুদ্র নৌকাটিকে সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র হইতে লোকলোকান্তর যুগযুগান্তর হইতে একাকী কালস্রোতে বাহিয়া লইয়া আসিতেছেন,···সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত সৌন্দর্যে আমি যাঁহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক, যিনি ব্যাপ্তভাবে সুখ দুঃখ অশ্রু হাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ, 'চিত্রা' গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি। ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্বলোকের, আমি তাঁহার কথা বলি নাই—যিনি বিশেষ রূপে আমার, অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত জগৎসংসার সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি আমার এবং আমি যাঁহার, যিনি আমার অন্তরে এবং যাঁহার অন্তরে আমি, যাঁহাকে ছাড়া আমি কাহাকেই ভালবাসিতে পারি না, যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে। আমি তাঁহারই কাছে আবেদন করিয়াছি যে, তোমার কাছে নানা লোক নানা বড় বড় পদ পাইয়াছে, আমি তাহার কোনটা চাই না, আমি তোমার মালঞ্চের মালাকর হইব—আমি তোমার নিভৃত সৌন্দর্যরাজ্যে তোমার গোপন সেবায় নিযুক্ত থাকিব—এক কথায় আমি কবিতা লিখিব, আমি বিশ্বহিতের জন্য সম্পাদকী করিতে পারিব না; কবিতা লিখিয়াও তোমার কাজ করা হইবে—হিতকার্য না করিতে পারি যথাসাধ্য আনন্দের আয়োজন করিতে পারিব।'[১০৮] কয়েকমাস আগে তিনি বৈষ্ণবকবিতার রসব্যাখ্যা করে যে পত্র লিখেছিলেন, তার সঙ্গে উদ্ধৃতির প্রথম অংশের ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আর 'আবেদন' কবিতার ভাব ব্যাখ্যা করে তিনি যা লিখলেন 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার শেষে বা 'পুরস্কার' কবিতায় প্রায় একই ভাব ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু 'উর্বশী' কবিতার 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙক্ষা' পরের দিন ২৪ অগ্র° [সোম 9 Dec] 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় 'সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা'র মর্ত্যজগতে প্রত্যাবর্তন করেছে। শিলাইদহে ফেরবার পর

এই পর্বের আর যে তিনটি কবিতা তিনি লিখেছেন—'দিনশেষে' [২৮ অগ্র°, দ্র চিত্রা ৪।৮৯-৯০], 'সান্ত্বনা' [২৯ অগ্র°, দ্র ঐ। ৯১-৯৩] ও 'শেষ উপহার' [১ পৌষ, ঐ। ৯৪-৯৫]—সেগুলিতে ঐ 'সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা'র কথাই মুখ্য।

এরই মধ্যে 14 Dec [শনি ২৯ অগ্র°] তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন : 'আজকাল আমি আমার লেখা এবং আলস্যের মাঝে মাঝে কবি কীট্‌সের একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত অল্প অল্প করে পাঠ করি। পাছে এক দমে একেবারে শেষ হয়ে যায় সেই জন্যে রেখে রেখে রয়ে রয়ে পড়ি—পড়তে বেশ লাগে। আমি যত ইংরাজ কবি জানি সব চেয়ে কীট্‌সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশি করে অনুভব করি।' টেনিসন সুইন্‌বরন্‌ প্রভৃতি কবির সঙ্গে তুলনা করে তিনি লিখলেন : কীট্‌সের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনার কলানৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সেইটে আমাকে ভারী আকর্ষণ করে।'[১০৯]

15 Dec [রবি ১ পৌষ] তারিখে লেখা চিঠিটি ছিন্নপত্রাবলী-র শেষ চিঠি। এর পরেও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শিলাইদহে কাটিয়েছেন, ইন্দিরা দেবীকে নিশ্চয়ই আরও অনেক চিঠি লিখেছেন—কিন্তু সেগুলি দুর্ভাগ্যবশত রক্ষিত হয় নি, অন্তত এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি। ইন্দিরা দেবীকে লেখা পরবর্তী প্রকাশিত পত্র চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত 6 May 1913 [মঙ্গল ২৩ বৈশাখ ১৩২০] তারিখে লণ্ডন থেকে লেখা চিঠিটি। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রের মুকুরে তাঁর মনটি যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার পরিচয় থেকে আমরা বঞ্চিত—এর পরবর্তীকালের চিঠিগুলি সত্যই ছিন্ন পত্র, রবীন্দ্রমানসের সহজ প্রবাহ সেগুলিতে অনুপস্থিত।

14 Dec-এর চিঠির মধ্যেই কলকাতায় যাওয়ার কথা আছে, সম্ভবত এর দু'তিন দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় চলে আসেন। ৭ পৌষ [শনি 21 Dec] তাঁকে শান্তিনিকেতনের পঞ্চম সাংবৎসরিক উৎসবে যোগদান করতে দেখা যায়। 'সর্ব্ব প্রথম ঘণ্টারব হইল। তখন সকলে ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মঙ্গল গীত গাহিতে গাহিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন।'[১১০] অন্যান্য বার রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকে সংগীত পরিবেশনের মধ্যে, কিন্তু এবার অন্য কর্তব্যভারও তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে : 'মন্দিরের সোপান পরম্পরায় বহু সংখ্যক ভোজ্য সুসজ্জিত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্র বাবু তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এই বলিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিলেন "অদ্য পৌষ মাসের সপ্তম দিবসে ব্রহ্মপ্রীতিকামনায় এই সমস্ত সবস্ত্র ভোজ্য অনাথ দীন দুঃখী ও আতুরদিগের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইল।" এ বৎসর প্রার্থীর সংখ্যাও যথেষ্ট হইয়া ছিল।'[১১১]

এর পরে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধির কোনো সংবাদ জানা যায় না। ১ মাঘ [মঙ্গল 14 Jan 1896] তিনি 'বিজয়িনী' [দ্র চিত্রা ৪।৯৫-৯৯] কবিতাটি লেখেন, কিন্তু কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, কবিতাটির সঙ্গে রচনাস্থলও উল্লিখিত হয় নি–সুতরাং এই সময়ে তিনি কোথায় অবস্থান করছেন জানার উপায় নেই।

১১ মাঘ 24 Jan] মহর্ষিভবনে ষষ্ঠষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথ-রচিত দুটি ব্রহ্মসংগীত গীত হয় : [১] শঙ্করাভরণ—তাল ফেরতা। বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮০; গীত ২। ৬১৫; স্বর ৫৫।৪-৯ আশ্বিন ইন্দিরা দেবী-সংগৃহীত 'নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস জানরে' গানটি ভেঙে যে

'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' গানটি লিখিত হয়েছিল, এই গানটিকে তারই পরিবর্ধিত রূপ বলা যায়। প্রথম ছত্রটির পরিবর্তনান্তে উক্ত গানের বসন্ত-বর্ণনা অংশ পর্যন্ত এখানে অবিকৃত ভাবে গৃহীত হয়েছে, গীতবিতান-পাঠের বাকি পাঁচটি ছত্র একই সুরের কাঠামোয় নতুন করে রচিত।

[2] ঝিঁঝিটি—একতালা। পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮০-৮১; গীত ১।৫৭-৫৮; স্বর ২৬। গানটি সম্ভবত কোনো ইংরেজি গানের সুর অবলম্বনে রচিত। ইন্দিরা দেবী লিখেছেন : "তাঁর [হেমেন্দ্রনাথের] চতুর্থা কন্যা মনীষা 'তমীশ্বরাণাং' বেদমন্ত্রে ও রবিকাকার কতকগুলি গানে, যথা, 'পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে' প্রভৃতিতে পিয়ানোর সংগত বসিয়েছিলেন। সেগুলি তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করে নি।"[১১২] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বর্তমান মাঘোৎসবে 'তমীশ্বরাণাং' বেদমন্ত্রটি গীত হয়েছিল।

১৪ মাঘ [সোম 27 Jan] মহর্ষির পার্ক স্ট্রীট-স্থ বাসভবনে 'ব্রাহ্মসম্মিলন সভা' হয়। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত বিবরণে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই।

এর পর ১৮ মাঘ [শুক্র 31 Jan] ক্ষিতীন্দ্রনাথের ও ২২ মাঘ [মঙ্গল 4 Feb] বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। সুতরাং এই দিন তাঁর কলকাতায় উপস্থিতি অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই বিবাহ-দিনটিকে স্মরণীয় করে রেখেছেন 'নদী' গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে :

পরম স্নেহাস্পদ/শ্রীমান বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে/তাঁহার শুভ পরিণয় দিনে/এই গ্রন্থখানি/উপহৃত/হইল।/২২শে মাঘ,/১৩০২।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্র:

বাল্যগ্রন্থাবলী ২।/নদী।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/মূল্য ছয় আনা।

আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় :

কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও/প্রকাশিত।/৫৫ নং অপার চিৎপুররোড।/২২শে মাঘ ১৩০২ সাল।

ছন্দ-সম্পর্কীয় নির্দেশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

বিজ্ঞাপন।/এই কাব্যগ্রন্থখানি বালকবালিকাদের পাঠের জন্য রচিত হইয়াছে। পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছি ইহার ছন্দ শিশুরা সহজেই আবৃত্তি করিতে পারে। বয়স্ক পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, যে, প্রত্যেক ছত্রের আরম্ভের শব্দটির পরে যেখানে ফাঁক দেওয়া হইয়াছে সেখানে স্বল্পমাত্র কাল থামিতে হইবে।/২২শে মাঘ,/১৩০২/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+২+৩৪, মুদ্রণসংখ্যা : ২০৫০। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ-অনুযায়ী গ্রন্থ-প্রকাশের তারিখ : 4 Feb 1896 [২২ মাঘ]।

রবীন্দ্রনাথ কবে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, আমাদের জানা নেই। মজুমদার-পুঁথির পৃষ্ঠায় যখন সহজ পাঠ-এর প্রাথমিক রূপটি তিনি রচনা করছিলেন, তারই সমকালে এটি রচিত হয়ে থাকতে পারে। কন্যা রেণুকার পাঠ-সহায়ক হিসেবেও এটি লেখা হওয়া সম্ভব। সুদীর্ঘ ৩০০ ছত্রের এই কবিতাটিতে 'স্বপন' 'গ্রাম' 'ঘণ্টা' 'ক্যাঁ কো' 'ক্রমে' 'ভ্রমণ' ও 'শ্রম' নিয়ে মাত্র বারোটি যুক্তাক্ষর শব্দ আছে—তার মধ্যে 'গ্রাম' তিনবার, 'ক্রমে' তিনবার এবং 'স্বপন' দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। বোঝাই যায়, রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা ছিল সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ যথাসাধ্য কম ব্যবহার করার।

'দাসী' পত্রিকার Mar 1896 [৫।৩]-সংখ্যার ১৬৪-৬৫ গ্রন্থটির একটি সমালোচনা মুদ্রিত হয়। সম্ভবত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন : '···আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে শিশুদের বন্ধুত্ব-লিপ্সু

দেখিয়া অতিশয় প্রীত ও আশান্বিত হইলাম। তাঁহার “নদী”র সঙ্গে অনেক শিশু কল্পনার রথে চড়িয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিবে। শিশুরা পড়িয়া পড়িয়া ইহার সুন্দর কাগজ ও ছাপা শ্রীহীন করিয়া দিলে আমরা সুখী হইব।'

'নদী' বাল্যগ্রন্থাবলী-পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা'। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'খেয়াল গেল ছোটোদের স্কুল করতে হবে। নীচের তলায় ক্লাস-ঘর সাজানো হল বেঞ্চি দিয়ে, ঝগড় চাকর ঝাড়পোঁছ করছে, ঘণ্টা জোগাড় হল, ক্লাস বসবে। কোত্থেকে মাস্টার ধরে আনলেন। কোথায় কী পাওয়া যাবে, রবিকাকা জানতেনও সব। হাল্কাভাবে কিছু হবার জো নেই, যেটি ধরছেন নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন করা চাই। ছেলেদের উপযোগী বই লিখলেন, আমাকে দিয়েও লেখালেন। ওই সময়েই 'ক্ষীরের পুতুল' 'শকুন্তলা' ওই-সব বইগুলি লিখি। নানা জায়গা থেকে বাল্যগ্রন্থ আনালেন।'[১১৩]

উদ্ধৃতিটি আমরা এর আগে ১২৯২ বঙ্গাব্দের বিবরণে একবার ব্যবহার করেছিলাম 'রবীবাবু স্কুলের জন্য বাটী দেখিবার গাড়ি ভাড়া'র হিসাব উল্লেখ প্রসঙ্গে। সেই চেষ্টার ফল কী হয়েছিল আমাদের জানা নেই, কিন্তু বর্তমান প্রচেষ্টাটি ফলবতী হয়েছিল তার কৌতুকপূর্ণ বিবরণ আছে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় : 'বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই একটা ইস্কুল খুলেছিলেন। সর্বসমেত দশ-পনেরো জনের বেশি ছাত্রছাত্রী জুটল না। একজন বৃদ্ধ হেডমাস্টার ও দুজন অধ্যাপক আমাদের পড়াতে লাগলেন। অধ্যাপকদের বিষয়ে একটু বলা দরকার। হেডমাস্টারমশায় সনাতনী শিক্ষাপদ্ধতিতে পাকা হয়ে গেছেন। বাবা বুঝলেন একে কোনো নতুন পদ্ধতি আর শেখানো সম্ভব নয়। তাই দুজন অল্পবয়সের মাস্টার নিয়ে এলেন। তখন কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী সবে প্রচলিত হয়েছে। অবিনাশ বসু ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই কিণ্ডারগার্টেন সম্বন্ধে খুব উৎসাহী।···অবিনাশবাবুর স্ত্রীর অভ্যাস ছিল ক্লাসে বসেই pindrop silence, please—বলা। এই শব্দটি বারবার শোনবার জন্য আমরা ইচ্ছা করেই গোলমাল করতুম। আরও মজা লাগত যখন চৌকোনা, গোল প্রভৃতি বোঝাতে নানান ছড়া বানিয়ে বলতেন।···রসময় হেডমাস্টার মশায় দুপুরবেলা জেগে থাকতে পারতেন না। তিনি বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে ঢুলতে থাকতেন। আমরাও টাস্ক বন্ধ করে দিয়ে সবাই মিলে বুড়ো আঙুল চুষতে আরম্ভ করতুম। আমাদের মধ্যে দিদির দুষ্টুবুদ্ধি ছিল বেশি—কখন নিঃশব্দে পালিয়ে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে মাছভাজা বেগুনি প্রভৃতি উপাদেয় খাবার নিয়ে এসে আমাদের বিতরণ করে আবার চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে পড়ত।'[১১৪]

নিজের স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতা মর্মান্তিকভাবে রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল—সেইজন্য পরবর্তীকালে বালকবালিকাদের শিক্ষা নিয়ে তিনি অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন, হাতেকলমে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এইসব প্রয়াস তারই অন্তর্গত। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : 'যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অথাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না'—এই 'স্বাধীন পাঠ' যোগান দেওয়ার জন্য তিনি যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, এই কারণেই বাল্যগ্রন্থাবলী-র সূচনা, 'নদী' লিখেছেন এই কথা মনে রেখেই। 'নদী'-র প্রধান ত্রুটি, মলাটের উপর একটি ছবি ছাড়া গ্রন্থটিতে আর কোনো ছবি নেই। হয়তো সেই অভাব মেটানোর জন্য অবনীন্দ্রনাথ মুদ্রিত পুস্তকের একুশটি পৃষ্ঠা চিত্রিত করেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও কয়েকটি চিত্র আঁকেন।

১৩৬১ বঙ্গাব্দের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় [পৃ ১১৭-২৫] অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে চিত্রিত পৃষ্ঠাগুলি মুদ্রিত হয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ নদী-র সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৩৭১ বঙ্গাব্দে।

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার ধারা ধীরগতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। ১৫ মাঘ [মঙ্গল 28 Jan] তিনি লিখেছেন 'গৃহ-শত্রু' [দ্র চিত্রা ৪।৯৯-১০১] কবিতা, পরের দিন লিখলেন একটি সনেট 'মরীচিকা [দ্র ঐ। ১০১]। বলেন্দ্রনাথের বিবাহ-দিনে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'উৎসব' [দ্র ঐ। ১০২-০৪]। ২৪ মাঘ [বৃহ 6 Feb]-এ রচিত 'প্রস্তরমূর্তি' [দ্র ঐ। ১০৪-০৫] সনেট ও পরের দিনে লেখা ক্ষুদ্র কবিতা 'নারীর দান' [দ্র ঐ। ১০৫] সম্ভবত কলকাতায় লেখা।

রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন : 'পট পরিবর্তন হইল, কলিকাতার উৎসবাদির অবসানে মাঘের শেষে পুনরায় শিলাইদহে কবিকে নদীবক্ষে ভাসমান দেখিতেছি।'[১১৫] এ-বিষয়ে আমরা এতখানি নিশ্চিত নই। এই সময়ে লিখিত কোনো চিঠিপত্র এখনও পাওয়া যায় নি, যে কবিতাগুলি লিখেছেন মুদ্রিত গ্রন্থে তাতে তারিখ থাকলেও রচনা-স্থলের উল্লেখ নেই, এই বছরের ক্যাশবহির অভাবে রবীন্দ্রনাথের পার্ক স্ট্রীট আসা-যাওয়া ইত্যাদি খবরও দুর্লভ। অন্যদিকে ৭ ফাল্গুন [মঙ্গল 18 Feb] তারিখে রচিত 'প্রৌঢ়'-শীর্ষক সনেটটি মজুমদার-পুঁথিতে লেখবার সময়ে তিনি রচনা-স্থল হিসেবে 'কলিকাতা' স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, 'ধূলি' ও 'সিন্ধুপারে'-ও কলকাতায় লেখা পাণ্ডুলিপিতে সেই তথ্য রয়েছে—যদিও মুদ্রিত গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই।

২৯ মাঘ [মঙ্গল 11 Feb] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা '–জীবনদেবতা' দ্র চিত্রা ৪। ১০৬-০৮–ভাদ্র ১৩০১-এ রচিত 'অন্তর্যামী' কবিতার সুরে বাঁধা। অনেক দিন ধরেই তাঁর মনে এই ভাবটি গুঞ্জরিত হচ্ছিল, নানা প্রসঙ্গে আমরা তার উল্লেখ করেছি। ছিন্নপত্রাবলী-র শেষ দিকের কিছু চিঠিতে তো স্পষ্টতই এই ভাব-নীহারিকার ঘনীভবন লক্ষ্য করা যায়। কবিতাটি লিখিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাতে যে অনুভূতি বার বার নানা রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে তাকে নিছক তত্ত্ব বলে অভিহিত করতে আমরা সংকোচ বোধ করি। অথচ রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনায় জীবনদেবতা-তত্ত্ব বহু আলোচিত প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কয়েক দিন পরে ৬ চৈত্র প্রভাতকুমাকে লিখেছেন : 'জীবন-দেবতা মেটাফিজিক্যাল জীবন-দেবতা। আমার জীবনটিকে অবলম্বন করে যে অন্তর্যামী শক্তি আপনাকে অভিব্যক্ত করে তুলচেন'[১১৬] ইত্যাদি। পরেও 'বঙ্গভাষার লেখক' [১৩১১] গ্রন্থের অন্তর্গত আত্মজীবনকথায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে ও রচনাবলী সংস্করণ চিত্রা-র ভূমিকায় তিনি তত্ত্ব-রূপেই কবিতাটি ব্যাখ্যা করেছেন।

১ ফাল্গুন [বুধ 12 Feb] রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'রাত্রে ও প্রভাতে' [দ্র চিত্রা ৪।১০৮-০৯] তাঁর দুই নারী ভাবনার কাব্যরূপ। জীবনের অভিজ্ঞতাতেই তিনি হয়তো প্রেয়সী ও সঙ্গিনী নারীর এই দ্বৈতরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন—তাই তরুণ বয়স থেকেই এটি তাঁর অন্যতম প্রিয় থীম। 'ভগ্নহৃদয়' গীতিকাব্য, 'নলিনী' গদ্যনাটিকা ও 'মায়ার খেলা' একই ভাবনার আশ্রয়ে রচিত—'রাজা ও রানী' নাটকে নাট্যদ্বন্দ্বের মূলে এই ভাবনা, রাজা বিক্রম রানী সুমিত্রাকে চান কেবল প্রেয়সী-রূপে, সুমিত্রা চান রাজমহিষীর মর্যাদা। পরেও 'শেষের কবিতা' ও 'দুই বোন' উপন্যাসে এই ভাবনার রূপায়ণ লক্ষিত হয়।

২ ফাল্গুনের [বৃহ 13 Feb] কবিতা '১৪০০ সাল' [দ্র চিত্রা ৪।১১০-১১]। দূরকালের পাঠকের কাছে আদৃত হবার আকাঙ্ক্ষা সব কবির মনে আছে, সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ১৪০০ সালের পাঠকের কাছে বার্তা

পাঠিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৪০০ সাল বেশি দূরবর্তী নয়, এই শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে জীবন্ত ভাবে উপস্থিত আছেন।

'নীরব তন্ত্রী' [দ্র চিত্রা ৪।১১১-১২] ও 'দুরাকাঙক্ষা' [দ্র ঐ।১১২-১৩] দুটি কবিতাই ৪ ফাল্গুনে লেখা।

চিত্রা-র অধিকাংশ কবিতারই পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, কিন্তু শেষ তিনটি কবিতার পাণ্ডুলিপি আছে মজুমদার-পুঁথিতে—তিনটিতেই রচনা-স্থল হিসেবে কলকাতার উল্লেখ আছে। ৭ ফাল্গুন [মঙ্গল 18 Feb]এ লেখা 'প্রৌঢ়' [দ্র চিত্রা ৪।১১৩] ও ১৫ ফাল্গুন [বুধ 26 Feb]-এর 'ধূলি' [দ্র ঐ। ১১৪] বিচিত্র মিল-বিন্যাসে রচিত দুটি সনেট—এমন রীতিতে লেখা সনেট রবীন্দ্র-কাব্যে বিরল।

চিত্রা কাব্যের শেষ কবিতা 'সিন্ধুপারে' [দ্র চিত্রা ৪।১১৪-১৮] ২০ ফাল্গুন [সম 2 Mar] জোড়াসাঁকোয় লেখা। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবে কবিতাটি আরম্ভ করেছিলেন :

ঘুমাতেছিলাম গভীর নিশীথে,
পৌষরজনী আড়ষ্ট শীতে।
  খণ্ডচন্দ্র পাণ্ডুবরণ
  হিমে বিজড়িত জ্যোৎস্না কিরণ,

এই অংশটুকু আবার পুনর্লিখিত হয়েছে এইভাবে :

পৌষরজনী শীতে জর্জ্জর
নির্ব্বাণ দীপ, নির্জ্জন ঘর
তপ্তশয়ন প্রিয়ার মতন
রেখেছিল মোরে সোহাগে বেড়িয়া
কত বিচিত্র সুখের স্বপন
পূর্ণ করিয়া সুপ্তি-গগন
যেন শত ২ মায়াপাখীমত
  উড়িছে আঁধারে শয্যা ঘেরিয়া
হেন কালে হায় মোর নাম ধরে
বাহির হইতে কে ডাকিল মোরে
নিদ্রা টুটিয়া চমকি উঠিয়া

এই অংশটুকু সবটাই বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ শেষে কবিতাটির উপযুক্ত আকার খুঁজে পেয়েছেন। ব্যঞ্জনধ্বনি-বহুল কলাবৃত্ত ছন্দটি তিনি ত্যাগ করেন নি, কিন্তু দীর্ঘ কুড়ি মাত্রার চরণ রচনা করে অপূর্বর্ভাবে কবিতাটির রহস্য-মধুর পরিবেশটি সৃষ্টি করেছেন।

৬ চৈত্র প্রভাতকুমারকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির তত্ত্ব-গন্ধী ব্যাখ্যা দিয়েছেন : "মৃত্যুর পরে 'সিন্ধুপারে' এই জীবনদেবতাই আমাকে চিরপরিচিত প্রিয় মূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন—আমি মিথ্যা ভয় করেছিলেম, মনে করেছিলাম, যিনি আমাদের এই জীবন লীলাভূমির মাঝখানে আনিয়া আমাদের সহিত খেলা করিয়াছিলেন তিনি বুঝি চিরকালের মত ছুটি লইলেন, আর একজন কোন অচেনা লোক আমাদের পূর্বাপরের মাঝখানে ভয়ংকর বিচ্ছেদ আনয়ন করিতেছে-কিন্তু সে লোকটি যেমনি ঘোমটা তুলিয়া ফেলিল অমনি দেখিলাম আমাদের সেই চিরকালের সঙ্গীটি—একটুখানি ভয় দেখাইয়া আরো যেন অধিকতর ভালবাসার সঙ্গে কাছে টানিয়া লইল।"[১১৭]

এই-সব কবিতা যখন লেখা হচ্ছে, তখন চিত্রা গ্রন্থের মুদ্রণের কাজও চলছে। সম্ভবত ২০ ফাল্গুন [সোম 2 Mar]-এ লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ সংবাদটি প্রভাতকুমারকে জানান।[১১৮] ২৯ ফাল্গুন [বুধ 11 Mar] 'চিত্রা' প্রকাশিত হয়। খুব বিস্ময়জনকভাবে গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গ করা হয় নি।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে আছে :

চিত্রা।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/মূল্য ১৷৹ টাকা।

আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় :

কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ফাল্গুন, ১৩০২।/৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে গ্রন্থটির প্রকাশ-তারিখ: 11 Mar 1896, মুদ্রণ-সংখ্যা : ১০৫০, মূল্য : দেড় টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২+২+১৫১।

মাঘ ১৩০০ থেকে ফাল্গুন ১৩০২ পর্যন্ত প্রায় দু'বছরে লিখিত ৩৪টি কবিতা এই সংকলন-ভুক্ত; সোনার তরী থেকে স্খলিত 'সুখ' [১৩ চৈত্র ১২৯৯] কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মোট কবিতার সংখ্যা ৩৫।

মাত্র ছ'মাস পরে আশ্বিন ১৩০৩-এ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলী-তে চিত্রা অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে কবিতা ও গানের সংখ্যা ৪৭টি। মোটামুটি একে চিত্রা-র দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যায়। অন্তর্বর্তী কালে রচিত ৯টি গান ও ৪টি কবিতা—'স্নেহস্মৃতি', 'নববর্ষে', 'দুঃসময়' ও 'ব্যাঘাত'—সংযোজিত হয়, কবিতা চারটি প্রথম প্রকাশকালে কেন অন্তর্ভুক্ত হয়নি বোঝা শক্ত। তেমনি 'নীরব তন্ত্রী' কবিতাটি কাব্যগ্রন্থাবলী সংস্করণে কেন বর্জিত হয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা করা কঠিন।

[চিত্রা উপহার পেয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৪ চৈত্র তারিখে লিখেছেন : 'মলাটে, টাইটেলপেজে, প্রথম পৃষ্ঠার যেখানে মোটা করিয়া "চিত্রা" লেখা আছে, তাহার পর আবার একটা অনতিসূক্ষ্ম, মাথা কাটা তালের ছড়ির মত পূর্ণচ্ছেদ কেন? ইহা কি দেখিতে খারাপ দেখায় না? আমার ত দেখায়। বিলাতী পুস্তকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, এরূপ স্থলে কোথাও ফুলস্টপ্ থাকে না।'[১১৯] মুদ্রণ সম্পর্কে অনুরূপ সচেতনতা সেযুগে দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-মুদ্রকেরা অবশ্য এ পরামর্শ মানেন নি। আরও বহুকাল এই অনাবশ্যক পূর্ণচ্ছেদ যত্রতত্র ব্যবহৃত হয়েছে।]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'দাসী' পত্রিকার May 1896-সংখ্যায় [পৃ ২৪১-৫৫] চিত্রা-র একটি দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন [দ্র রবীন্দ্রবিতান] বঙ্গবাসী পত্রিকার ২১ আষাঢ় ১৩০৩ [শনি 4 Jul 1896]-সংখ্যায় চিত্রা-র একটি স-প্রশংস সমালোচনা মুদ্রিত হয়েছিল, তথ্যটি জানা যায় প্রভাতকুমারের ২৩ আষাঢ়ের পত্র থেকে : 'গত শনিবারের বঙ্গবাসী সাহিত্য সমাচার স্তম্ভে চিত্রার একটি সমালোচনা দিয়াছে,···বঙ্গবাসীর ভাল লাগিয়াছে, কি ভাগ্যি!'[১২০]

১১ ফাল্গুন প্রভাতকুমার একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'আগামী দোলপূর্ণিমার দিনে, দরিদ্রের কিঞ্চিৎ দীন উপহার আপনার পদতলে পৌঁছিবে।'[১২১] এই উপহার হল দোলপূর্ণিমা, ১৩০২' [১৭ ফাল্গুন শুক্র 28 Feb]-উল্লেখিত একটি পাণ্ডুলিপি : 'কাহিনী/শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়/(গোপনপ্রচারের জন্য মুদ্রিত)'।

উপহার-পত্রে লেখা :

মাননীয়
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বন্ধুবরেষু।

প্রিয় রবিবাবু,

আমি যে আপনার কবিতার একজন পরম ভক্ত, এই কথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে এই ক্ষুদ্র কবিতাটি উৎসর্গ করিলাম।

আপনার স্নেহগর্বিত
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

দিলদার নগর।
দোলপূর্ণিমা, ১৩০২

আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে পুস্তিকাটি ছাপানোর জন্য প্রভাতকুমার তাগাদা দিলেও এটি মুদ্রিত হয়েছিল কিনা বলা শক্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিটি সযত্নে রক্ষা করেছেন, এই ভক্ত-প্রীতি তাঁর মনের একটি দিকে আলোকপাত করে।

২০/২১ ফাল্গুনের পত্রে [পত্রটি পাওয়া যায় নি, প্রভাতকুমারের ২২ ফাল্গুনের পত্র থেকে অনুমিত] রবীন্দ্রনাথ অনতিপরে মফস্বল-যাত্রার কথা লিখেছিলেন। কিন্তু ২৬ ফাল্গুন [রবি 8 Mar] তাঁকে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের যোগ দিতে হল। এই সময়ে দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যা নলিনীর সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুহৃৎনাথের বিবাহ-সম্বন্ধ হয়। মহর্ষি-পরিবারের রীতি-অনুযায়ী তাঁকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিতে হল। এ-সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী-তে লিখিত হয়েছে : 'শ্রীমন্মহর্ষিদেবের গৃহে দীক্ষা ।/গত ২৬শে ফাল্গুন রবিবার দিবসে মহর্ষিদেবের পারিবারিক ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীমান্ সুহৃৎনাথ চৌধুরীর দীক্ষা সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘণ্টার সময়ে নিমন্ত্রিত বন্ধুবর্গ মন্দিরস্থ বেদীর চতুস্পার্শে উপবেশন করিলে আচার্য্যগণ বেদীগ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া সকলকে উদ্বোধিত করিয়া তুলেন।'[১২২] অবশ্য বিবাহটি হয় পরের বছর ১৪ বৈশাখে।

এর পরেই রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যাত্রা করেন।

মানসী-র পালা শেষ হয়ে গেলে সোনার তরী-র পালা জমতে বৎসরাধিক সময় লেগেছিল, কিন্তু চিত্রা-র ক্ষেত্রে সেরূপ হয় নি। 'সিন্ধুপারে' লেখা হয়েছিল ২০ ফাল্গুন, চৈতালি-র প্রথম কবিতা 'উৎসর্গ রচনার তারিখ ১৩ চৈত্র ['প্রভাত' কবিতার তারিখ নিয়ে আমাদের সংশয় আছে]—মধ্যে মাত্র বাইশ দিনের ব্যবধান। এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই সনেট, কিন্তু প্রথম দিকের চারটি কবিতাতে—'উৎসর্গ' [১৩ চৈত্র বুধ 25 Mar], 'গীতহীন' [ঐ], 'স্বপ্ন[[১৪ চৈত্র] ও 'আশার সীমা' [ঐ]—চিত্রা-র সুরের অনুরণন শোনা যায়। রচনাবলী-র 'সূচনা'য় এগুলি সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'এর প্রথম কয়েকটি কবিতায় পূর্বতন কাব্যের ধারা চলে এসেছে। অর্থাৎ সেগুলি যাকে বলে লিরিক।'[১২৩]

লিরিকের ভাব চৈতালি-র আরও অনেকগুলি কবিতায় আছে, কিন্তু সনেটগুলিই এই কাব্যগ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে চোখে পড়ে। এগুলিও বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। নদীর প্রবাহের মধ্যে দ্বীপ গড়ে ওঠার উপমা ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ কবিতাগুলি রচনার পটভূমিকা বিবৃত করেছেন উক্ত 'সূচনা'য় : 'পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র

লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসল-কাটা শস্যক্ষেত ধূ ধূ করছে। কোনো-এক গ্রীষ্মকাল এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মত অবস্থা নয়। বোটের জানলা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়।'[১২৩] 'সামান্য লোক', 'প্রভাত', 'খেয়া', 'কর্ম', 'দিদি', 'পরিচয়', 'পুঁটু', 'সঙ্গী' প্রভৃতি কবিতা এই স্থানিক রঙে রঞ্জিত। এর সবকটি কবিতা পতিসরে রচিত নয়, কিছু কবিতায় স্মৃতিও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত বিশেষ পরিবেশটিই কবিতাগুলির নিরলংকৃত আঁটোসাঁটো গড়নের কারণ। এই যাত্রায় কালিদাসের কাব্য নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গী ছিল। তাই কয়েকটি কবিতা 'ঋতুসংহার' 'মেঘদূত' প্রভৃতির উদ্দেশ্যে লেখা, 'বন' 'তপোবন' 'প্রাচীন ভারত' প্রভৃতি কবিতা সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত সামাজিক আদর্শকে অবলম্বন করে রচিত।

চৈত্র ১৩০২-তে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশটি কবিতা রচনা করেন। এর মধ্যে কোনো কবিতাতেই রচনা-স্থলের উল্লেখ নেই। আমাদের অনুমান, প্রথম কয়েকটি শিলাইদহে, মাঝেরগুলি পতিসরে ও শেষের কয়েকটি সাজাদপুরে রচিত। কিছু-কিছু মন্তব্য-সহ আমরা এই মাসে রচিত কবিতার একটি তালিকা করে দিচ্ছি : ১১ [সোম 23 Mar] 'প্রভাত' দ্র চৈতালি ৫। ১৪

এই কবিতাটির তারিখ নিয়ে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে। ভাবানুসারে সাজানোর জন্য চৈতালি-তে কয়েকটি কবিতার ক্ষেত্রে কালানুক্রমের ব্যত্যয় ঘটানো হলেও সাধারণভাবে কবিতাগুলি রচনার কাল অনুসারে সাজানো। সেই দিক থেকে বিচার করলে 'প্রভাত' কবিতাটির রচনাকাল ১৭/১৮ চৈত্র হওয়া সম্ভব।

১৩	[বুধ 25 Mar]	'উৎসর্গ'	দ্র	চৈতালি	৫। ৫-৬
১৩	[,,]	'গীতহীন'	দ্র	ঐ	৫। ৬-৭
১৪	[বৃহ 26 Mar]	'স্বপ্ন'	দ্র	ঐ	৫। ৮
১৪	[,,]	'আশার সীমা'	দ্র	ঐ	৫। ৯
১৪	[,,]	'দেবতার বিদায়'	দ্র	ঐ	৫। ৯-১০
১৪	[,,]	'পুণ্যের হিসাব'	দ্র	ঐ	৫। ১০
১৪	[,,]	'বৈরাগ্য'	দ্র	ঐ	৫। ১১

'দেবতার বিদায়' 'পুণ্যের হিসাব' ও 'বৈরাগ্য' কবিতা তিনটিকে কণিকা [১৩০৬]-র নীতিমূলক কবিতাগুলির অগ্রদূত বলা যায়।

১৫	[শুক্র 27 Mar]	'মধ্যাহ্ন'	দ্র	ঐ	৫। ১১-১২

এই কবিতা লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথ পতিসরে পৌঁছে গেছেন বলেই মনে হয়। সেখানকার প্রকৃতির স্থানিক রূপটি কবিতাটিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি নিজেও সে-কথা বলেছেন ২১ বৈশাখ ১৩১৮ [বৃহ 4 May 1911] তারিখের একটি আলোচনা-সভায় : 'পতিসর পরগণার কালিগ্রামে* কবিতাটি লেখা। ভয়ানক রৌদ্র। আমার নৌকা তপ্ত হইয়া থাকিত। নাগর নদীর জল কমিয়া কেবল শৈবাল দল। গরমে একটু খড়খড়ি খুলিয়া বাহিরে দেখিতাম। নানা বর্ণের জলজ ফুল, পতঙ্গের খেলা।···ঘাস-জল পতঙ্গ পক্ষী সকলের সহিত আমি তখন প্রকৃতির অন্তঃপুরে ছিলাম। বুঝানো কঠিন সকলের সহিত আমার কী ঔৎসুক্য-পূর্ণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল।···আমার অলস দিনের কাছে তাহারা বড়ই সত্য ছিল।···জলের পুষ্পবনে শৈবালে দেখিয়াছি আর সরলভাবে লিখিয়াছি। রিয়ালিস্টিক লেখা রেখাপাত মাত্র। খুবই সিম্পলভাবে ডায়রির মত প্রায় প্রোসেই[ক] রচনা। তখন একটি একটি সনেট নিত্য লিখিতাম।/ চৈতালি অলঙ্কার সমারোহভারগ্রস্ত কাব্য নহে।'[১২৪]

১৬	[শনি 28 Mar]	'পল্লীগ্রামে'	দ্র	ঐ	৫ । ১৩
১৭	[রবি 29 Mar]	'সামান্য লোক'	দ্র	ঐ	৫ । ১৩-১৪
১৮	[সোম 30 Mar]	'দুর্লভ জন্ম'	দ্র	ঐ	৫ । ১৫
১৮	[,,]	'খেয়া'	দ্র	ঐ	৫ । ১৫-১৬
১৮	[,,]	'কর্ম'	দ্র	ঐ	৫ । ১৬

'কর্ম' কবিতাটি একটি বাস্তব ঘটনা-মূলক, যদিও ঘটনাটি কিছুদিন আগেকার—14 Aug 1895 [৩০ শ্রাবণ] তারিখে শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন : "মনে আছে, সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি ভারী রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে।' এই বলে সে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁচ করতে গেল।"[১২৫]

এই বাস্তব স্মৃতিলোক থেকে কাব্যস্মৃতিলোকে তাঁর উত্তরণ ঘটল অব্যবহিত পরের দিনের কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন : 'বুঝিতে পারিতেছিলাম এ-সময়ে আমার জীবনের মোড় ফিরিতেছে। নগর হইতে বনের প্রতি টান—ক্রমে তপোবন। যখন আমার এই বিরল সরল প্রকৃতির দিকে চক্ষু পড়িল তখনই —ধরিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৃষ্টি প্রাচীন ভারতের দিকে ফিরিয়া গেল। যেখানে ঘণ্টাসূচী অফিস নাই, আছে একটি অনন্ত প্রকৃতি। জানি না প্রাচীন ভারতের এই কল্পনা সত্য কিনা—কিন্তু তখন মনের মধ্যে তাহার একটি দুর্নিবার টান আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যদিও তাহা ফুটিয়াছে অনেক পরে, আমার বঙ্গদর্শনের লেখায়।'[১২৬] একথা ঠিক যে, বঙ্গদর্শন-এর যুগেই প্রাচীন ভারতের আদর্শ রবীন্দ্র-ভাবনায় একটি সুনির্দিষ্ট আকার লাভ করেছে, কিন্তু তার আগে চৈতালি কাব্য থেকেই এই ভাবনা কবিতার রূপে বারে বারে আত্মপ্রকাশ করেছে

—‘কথা’ [১৩০৬], ‘কল্পনা’ [১৩০৭] ও ‘ক্ষণিকা’ [১৩০৭] কাব্যের অনেকগুলি কবিতা ও ‘কাহিনী’ [১৩০৬]-র অন্তর্গত অধিকাংশ কাব্যনাট্য প্রাচীন ভারতের আদর্শ -কল্পনায় অনুরঞ্জিত। চৈতালি-র এই সময়ে রচিত কবিতাগুলি হল :

১৯	[মঙ্গল 31 Mar]	‘বনে ও রাজ্যে’	দ্র	চৈতালি	৫ । ১৭
১৯	[,,]	‘সভ্যতার প্রতি’	দ্র	ঐ	৫ । ১৭-১৮
১৯	[,,]	‘বন’	দ্র	ঐ	৫ । ১৮
১৯	[,,]	‘তপোবন’	দ্র	ঐ	৫ । ১৯
২০	[বুধ 1 Apr]	‘ঋতুসংহার’	দ্র	ঐ	৫ । ২০
২১	[বৃহ 2 Apr]	‘মেঘদূত’	দ্র	ঐ	৫ । ২১

২১ চৈত্র তারিখে লিখিত আর তিনটি সনেটে কিন্তু এই ভাবের অনুবর্তন নেই, পতিসরের গ্রামীণ সহজ সরল জীবনযাত্রার চিত্র এই কবিতাগুলির বিষয়।

২১	[বৃহ 2 Apr]	‘দিদি’	দ্র	চৈতালি	৫ । ২১-২২
২১	[,,]	‘পরিচয়’	দ্র	ঐ	৫ । ২২
২১	[,,]	‘অনন্ত পথে’	দ্র	ঐ	৫ । ২৩

পশ্চিমী মজুরের একটি ছোটা মেয়ে এই সনেট-ত্রয়ের নায়িকা, তারই জীবনলীলার বিভিন্ন দৃশ্য অবলম্বনে কবিতাগুলি রচিত। রবীন্দ্রনাথ ‘দিদি’-প্রসঙ্গে বলেছেন : ‘কী সুন্দর দেখিলাম! সঙ্কল্প করিলাম কবিত্ব নয়। সত্য কথা বলিব।‘ কিন্তু ‘এই সত্য অনুভবের প্রকাশকে লোকেন [পালিত] বড় মন্দ বলিল।’

‘অনন্ত পথে’ কবিতার ‘আজি আমি তরী খুলে যাব দেশান্তরে’ ছত্রটি থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এইদিন পতিসর থেকে সাজাদপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। জলপথে ও সাজাদপুরে অবস্থানকালেও তাঁর রচনাধারা অব্যাহত থেকেছে। এই সময়ে রচিত কবিতাগুলি হল :

২২	[শুক্র 3 Apr]	‘ক্ষণমিলন’	দ্র	চৈতালি	৫ । ২৩-২৪
২২	[,,]	‘প্রেম’	দ্র	ঐ	৫ । ২৪

এই দুটি কবিতার পটভূমি বিবৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ : ‘খিদিরপুরের পথে ট্রাম—তখনও স্টিম যুগ—এই ভাবটা আমার মনে আসিয়াছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রাত্রির অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। পার হইতে মনে হইতেছিল কালের বাহিরে কিছু নাই—অর্থাৎ নন-এনটিটি। আমার এই উপলব্ধি পূর্বে, লেখা বেশ কয়েক মাস পরে।’

২৩ [শনি 4 Apr] 'পুঁটু' দ্র চৈতালি ৫ । ২৫

এই কবিতাটির আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটি অজ্ঞাত তথ্য উদঘাটিত করেছেন। লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে আমরা রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে জানি। জীবনস্মৃতি-তে তাঁর সাহিত্যবোধের প্রশংসাও করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সমালোচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'প্রেমের অভিষেক' কবিতার সাধনা-য় প্রকাশিত পাঠ চিত্রা কাব্যে সংশোধিত হয়েছিল। 1906-এ রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন গয়াতে বদলি হন, লোকেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জেলা-জজ; তাঁর রবীন্দ্রানুরাগে উত্তেজিত দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র-বিরোধী প্রবন্ধগুলি লিখতে শুরু করেন, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী এমন অভিমত প্রকাশ করেন।[১২৭] কিন্তু 'পুঁটু' কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'আমার এই কবিতায় লোকেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পরে বিরুদ্ধ সাহিত্যিক দলের সহিত মিলিত হইয়া লোকেন আমার বিরুদ্ধে উৎসাহিত করে।' এই ঘটনা কখন ঘটেছিল বলা মুশকিল। সাধারণভাবে মনে করা যেতে পারে যে, কাব্যগ্রন্থাবলী (আশ্বিন ১৩০৩]-তে 'চৈতালি' প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর লোকেন্দ্রনাথ সমালোচনা-মুখর হয়ে রবীন্দ্র-বিরোধী সাহিত্যিক দলের সঙ্গে হাত মেলান। কিন্তু এর পরেও প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিপত্রে লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। না কী, গয়ায় অবস্থান কালেই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র-বিদূষণে প্রবৃত্ত হন বলে রবীন্দ্রনাথ এর পিছনে লোকেন্দ্রনাথের ইন্ধন যোগানোর কথা অনুমান করে নিয়েছেন?

২৩ [শনি 4 Apr] 'সঙ্গী' দ্র চৈতালি ৫ । ২৭
২৪ [রবি 5 Apr] 'সতী' দ্র ঐ ৫ । ২৮
২৪ [,,] 'স্নেহদৃশ্য' দ্র ঐ ৫ । ২৮-২৯
২৪ [,,] 'করুণা' দ্র ঐ ৫ । ২৯

রবীন্দ্রনাথ আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রত্যেকটি কবিতাই সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

২৫ [সোম 6 Apr] 'পদ্মা' দ্র ঐ ৫ । ৩০-৩১
২৫ [,,] 'স্নেহগ্রাস' দ্র ঐ ৫ । ৩১
২৬ [মঙ্গল 7 Apr] 'বঙ্গমাতা' দ্র ঐ ৫ । ৩২
২৬ [,,] 'দুই উপমা' দ্র ঐ ৫ । ৩২
২৬ [,,] 'অভিমান' দ্র ঐ ৫ । ৩৩
২৬ [,,] 'পরবেশ' দ্র ঐ ৫ । ৩৩-৩৪

'পদ্মা' ও 'দুই উপমা' কবিতা-দুটি সনেট নয়, 'পদ্মা' ৩৬ ছত্রের দীর্ঘ গীতিকবিতা ও ৮ ছত্রের 'দুই উপমা' কণিকা-র নীতিধর্মী কবিতাগুলির সমধর্মী। ২৭ চৈত্র তারিখে লিখিত ৪ ছত্রের 'তত্ত্বজ্ঞানহীন' কবিতাটিও একই শ্রেণীর।

উল্লিখিত অন্য কবিতাগুলি ভিন্ন জাতের—কিছুটা পরিমাণে সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত। সম্ভবত ২৫ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে পৌঁছন এবং সংবাদপত্র পাঠ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। 'অভিমান' কবিতার—

> নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
> পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে—
> তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক্,
> সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাস নে ঢাক।

—প্রভৃতি ছত্রে এই উত্তেজনার পরিচয় রয়েছে।

২৭ [বুধ 8 Apr]	'সমাপ্তি'	দ্র	চৈতালি	৫। ৩৪
২৭ [,,]	'ধরাতল'	দ্র	ঐ	৫। ৩৫
২৭ [,,]	'তত্ত্ব ও সৌন্দর্য'	দ্র	ঐ	৫। ৩৫-৩৬
২৭ [,,]	'তত্ত্বজ্ঞানহীন'	দ্র	ঐ	৫। ৩৬
২৮ [বৃহ 9 Apr]	'মানসী'	দ্র	ঐ	৫। ৩৬
২৮ [,,]	'নারী'	দ্র	ঐ	৫। ৩৭
২৮ [,,]	'প্রিয়া'	দ্র	ঐ	৫। ৩৭-৩৮
২৮ [,,]	'ধ্যান'	দ্র	ঐ	৫। ৩৮
২৯ [শুক্র 10 Apr]	'মৌন'	দ্র	ঐ	৫। ৩৯
২৯ [,,]	'অসময়'	দ্র	ঐ	৫। ৪০-৪১
২৯ [,,]	'গান'	দ্র	ঐ	৫। ৪১
৩০ [শনি 11 Apr]	'শেষ কথা'	দ্র	ঐ	৫। ৪১
৩০ [,,]	'বর্ষশেষ'	দ্র	ঐ	৫। ৪১-৪২
৩০ [,,]	'অভয়'	দ্র	ঐ	৫। ৪২

এই ১৪টি কবিতাই সাজাদপুরে লেখা, সাজাদপুরের জমিদারি সেরেস্তার রক্ষিত অর্ডার বুকে এই সময়ে সেখানে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতির প্রমাণ রয়েছে। সাজাদপুরের অধিবাসী নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী শাহজাদপুরের কাছারী বাড়িতে রক্ষিত জমিদারি সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের একটি অর্ডার বুক বা হুকুমনামা বইয়ের অনেকগুলি

হুকুম এক সময়' [? 1944] নকল করে রেখেছিলেন। গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীর গ্রন্থে এইরূপ কয়েকটি হুকুম উদ্ধৃত করেছেন [দ্র পৃ ১৭-১৯]। এতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ২৭ চৈত্র ১টি, ২৯ চৈত্র ৩টি ও ৩০ চৈত্র বর্ষশেষের দিন ৪টি আবেদন মঞ্জুর করেছেন—যা এই সময়ে তাঁর সাজাদপুরে উপস্থিতির প্রমাণ। বৈশাখ ১৩০৩-এরও প্রথম কয়েকদিন তিনি সাজাদপুরে থাকেন, তার পরে কলকাতা যাত্রা করেন।

এবারে জমিদারি-পরিদর্শনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রের খুব অল্পই আবিষ্কৃত হয়েছে, ফলে তাঁর জীবন-চিত্র স্পষ্ট করা দুরূহ। ৪ চৈত্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁকে একটি পত্রে 'চিত্রা পাওয়ার কথা, জানিয়ে বিভিন্ন কবিতা সম্পর্কে সকৌতুক মন্তব্য করেন। রবীন্দ্রনাথ পত্রটির উত্তর দেন ৬ চৈত্র [বুধ 18 Mar] শিলাইদহ থেকে, এই দীর্ঘ পত্রের প্রধান বিষয় চিত্রার প্রধান কয়েকটি কবিতার ভাব ব্যাখ্যা, প্রয়োজনমতো আমরা পত্রটি থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছি। ১২ চৈত্র [মঙ্গল 24 Mar] প্রভাতকুমার এলাহাবাদের 'কায়স্থ পাঠশালা'র অধ্যক্ষ 'দাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্য পাবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি পরিচয়পত্র প্রার্থনা করেন, তাঁর ১৭ চৈত্রের [রবি 29 Mar] চিঠি থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ প্রার্থিত পরিচয়পত্রটি পাঠিয়ে দিয়েছেন[১২৮]—এই পত্রটি অবশ্য পাওয়া যায় নি।

এই সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত আর-একটি পত্রের সন্ধান পাওয়া যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণী-তে। ১৯ চৈত্র [মঙ্গল 31 Mar] পতিসর থেকে পরিষদের সম্পাদককে লিখিত এই পত্র ও আনুষঙ্গিক তথ্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

এই মাসে রবীন্দ্রনাথকে লেখা কয়েকটি চিঠি অবশ্য রক্ষিত হয়েছে। জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা 'শনিবার ৯ই চৈত্র [21 Mar] তাঁকে লেখেন : 'তোমার চিঠি অনেকদিন পাইয়াও উত্তর দি নাই। তুমি কবে আসিবে? আমরা কি গরমীর ছুটিতে কোথাও যাইব? আজ বলুদাদা শিলাইদহে যাইবেন। রথী রোজ গান ও এসরাজ শেখে। ওর রাত্রে রোজ মাষ্টার আসেন। Miss Mitter বলেন যে রথী পিয়ানো বেশ শিখিতেছে।···যেদিন তোমার চিঠি পেলুম মীরা তাহা নিয়ে কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল।···আজ আমাদের Examination।'[১২৯] ইত্যাদি নানা পারিবারিক সংবাদে পত্রটি পূর্ণ। লক্ষণীয়, পুত্রকন্যাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ কী-ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েব রবীন্দ্র-বিরোধী রূপটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু প্রথমাবধি চিত্রটি এরূপ ছিল না তার নিদর্শন রয়েছে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর দুটি পত্রে। 18 Mar [বুধ ৬ চৈত্র] 'মৈমনসিং' থেকে তিনি লিখেছেন : 'এ উত্তম! আপনি বলিলেন যে মঙ্গলবার রাতে [? ২৮ ফাল্গুন 10 Mar] আমার সঙ্গে গোয়ালন্দ মেলে আসিবেন। তা সে আসা দূরে থাকুক সে রাতে আপনার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা গেল না।'[১৩০] রবীন্দ্রনাথকে তিনি সহযাত্রী হিসেবে পান নি বটে, কিন্তু উভয়ের অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি এই চিঠিতে অলক্ষণীয় থাকে না। '২০৩/১ কর্ণোয়ালিস স্ট্রিট' থেকে 25 Mar [বুধ ১৩ চৈত্র] তিনি লিখছেন : 'অতএব দেখিতেছেন রাত্রি ৩টা পর্যন্ত জাগিয়া গান শোনা আমার পক্ষে অতীব সহজ ব্যাপার—বিশেষতঃ আপনার গান। আপনার গান সম্বন্ধে একটি কথা যে আপনার গানের সুরগুলি আমি কি কোন রূপেই আয়ত্ত করিতে পারিলাম না? আপনি রাগরাগিণীর একরূপ বিচিত্র মধুর সমাবেশ করেন বটে কিন্তু শিখিতে কষ্ট। আপনার "কত কথা তারে ছিল বলিতে" এবং "দেও তরী ভাসাইয়া" এ দুটি মাত্র উত্তম গানের

রাগিণী বোধ হয় আদায় করিতে পারিয়াছি অথচ অন্যান্য অনেক উৎকৃষ্ট গান আমি আপনার ও অন্যের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি। আপনি যে রাগরাগিণীগুলো গুঁড়ো করিয়া বাটিয়া মসলাস্বরূপ ব্যবহার করিয়া আপনার গীতিকবিতা রন্ধন করেন। কবিতাটাই যেন খাদ্য, রাগরাগিণীগুলো মসলামাত্র।'[১৩১] রবীন্দ্রনাথের গানের বিশেষত্ব তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীতে অভ্যস্ত দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে রবীন্দ্রসংগীতের বিমিশ্র রাগরূপ আয়ত্ত করা কঠিন ছিল। পরে তাঁর পুত্র দিলীপকুমারও অনুরূপ অসুবিধা বোধ করেছেন।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির খ্যাতিও রবীন্দ্র-বিরোধিতার জন্য। কিন্তু এই পর্বে তাঁর রূপ অন্যতর। 28 Mar [শনি ১৬ চৈত্র] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

ভক্তিভাজনেষু—

আপনার পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। "চিত্রায়" যে লাইন ভুলক্রমে ছাপা হয় নাই, *তাহা সংশোধিত করিবার অবকাশ দিয়া আপনি আমাদের উপকৃত করিয়াছেন।

আশা করি, আপনি ভাল আছেন।

আপনার "প্রহসনের" কি হইল? আমরা আশায় উন্মুখ হইয়া আছি।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বিলাতে দিনকতক অভিনয়বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, —তিনি ও বিষয়ে মজবুদ শুনিয়াছি—তাঁহাকেও আপনার ফর্দ্দে টানিতে পারেন। কবে কলিকাতার দিকে আসিবেন, স্থির করিয়াছেন?

যদি ব্যস্ত না থাকেন, আমাদের একখানা বড় করিয়া চিঠি লিখিবেন। চিঠি এত মিষ্ট করেন যে ক্রমাগত পড়িতে ইচ্ছা করে, কিন্তু হায়—দ্বিজুবাবুর গানের মত দু পাত উল্টাইতেই "বল হরি।" নদীবক্ষে কেমন আছেন এবং কি করিতেছেন? আমরা বিসূচিকা ও বসন্ত, দুই ভগিনী ভ্রাতার উপদ্রবজর্জ্জরিত কলিকাতায় এখনও টেঁকিয়া আছি।

"চিত্রা" সম্বন্ধে পত্রে আর কি বলিব,—এবং বলিবার ভাষাই বা কোথায় পাইব। প্রিয়বাবু কাজে কি করিবেন,—তা ভগবান জানেন। (আমিও কতকটা জানি) মুখে আমাকে সমালোচনার আস্বাদ দিয়াছেন। আপনার অমর লেখনীর জয় হউক—আপনি যে আনন্দের সৌন্দর্য্যের সত্যের প্রস্রবণ বাঙ্গলার মরুভূমে উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন,সমস্ত দেশ দ্বেষ দলাদলি ভুলিয়া তাহাতে স্নিগ্ধ হউক।—আর এক কথা, বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিলাম, —কলিকাতার ডাকাতের দল আর আপনার নৌকায় ডাকাতি করিবে না; তাহাদের দুটী দাবীর একটী নূতন কবিতার বহি—আপনি পূর্ণ করিয়াছেন। ইহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট—এবং আশান্বিতও বটে যে, আর একটীও (মায়ার খেলা এবং ক্ষুধার খোরাক) কালে পূর্ণ হইবে।

আমি পরম্পরায় শুনিলাম, শ্রীযুত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় আপনার "সোনার তরী"'র সমালোচনা লিখিয়াছেন। আমি মনে করিতেছি, পালিত মহাশয়ের নিকট সেটির প্রার্থী হইব। তিনি এখন বিলাতে কোথায় আছেন, যদি আমায় লেখেন, ত আমি তাঁহার কাছে আমার দরখাস্ত পেশ করি। আপনি আমার হইয়া তাঁহাকে একটু অনুরোধ করিবেন?

আমি এ কয়দিন "সাহিত্য" লইয়া বড় বিব্রত ছিলাম। আজ শেষ ফর্ম্মর শেষ প্রুফ দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছি কাল আপনার বই আপনার দাদার কাছে পাঠাইব।

আপনি আমার প্রীতিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি।

স্নেহার্থী
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

—রবীন্দ্রনাথের 'মিষ্ট' পত্রগুলি পাওয়া যায়নি, সেগুলি পাওয়া গেলে উভয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কটি আরও স্পষ্ট হত—কিন্তু সুরেশচন্দ্রের পত্রটিই এই সম্পর্কের দিক-নির্দেশের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে।

পত্রটির কিছু টীকা আবশ্যক। সুরেশচন্দ্র যে "প্রহসনের" কথা এখানে লিখেছেন, সেটির পরিচয় উদ্ধার করা শক্ত। রবীন্দ্রনাথ এর আগে 'গোড়ায় গলদ' লিখেছিলেন, সেটি প্রকাশিত হয় ৩১ ভাদ্র ১২৯৯ তারিখে। তাঁর পরবর্তী প্রহসন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' খামখেয়ালী সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে [? চৈত্র ১৩০৩] আশুতোষ চৌধুরীর ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িতে পঠিত ও 5 Apr 1897 [২৪ চৈত্র ১৩০৩] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কি এই প্রহসনের কাহিনী সুরেশচন্দ্র প্রভৃতিকে শুনিয়েছিলেন? আবার, দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্বোল্লিখিত 18 Mar-এর পত্রে লিখেছেন : 'আপনার দোকোড়ি দত্ত কতদূর পহুঁছিয়াছেন। গল্পটি ঠিক একটি ক্ষুদ্র আয়তনের farceএর উপযোগী।' —উকিল দুকড়ি দত্ত রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক-এর অন্তর্গত 'খ্যাতির বিড়ম্বনা'

নাটিকার একটি চরিত্র, নাটিকাটি মুদ্রিত হয় মাঘ ১২৯২-সংখ্যা 'বালক' পত্রিকায়। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্ভবত এই রচনাটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তবে 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' অবলম্বনে একটি প্রহসন ২৪ চৈত্র ১৩০১ [শনি 6 Apr 1895] তারিখে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির পরিচালনায় এমারেল্ড্ থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। কিন্তু সে তো এই-সব পত্র লেখার এক বৎসর পূর্বের কথা! পত্রোত্তরে রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি পাওয়া গেলে এ-বিষয়ে আলোকপাত করা যেত।

সুরেশচন্দ্র প্রিয়নাথ সেনের লেখা 'চিত্রা' ও লোকেন্দ্রনাথ পালিতের লেখা 'সোনার তরী' কাব্যের সমালোচনার কথা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই দুটি সমালোচনা 'সাহিত্য' বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমাদের জানা নেই।

'কলিকাতার ডাকাতের দল' কথাটি একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীকে সুরেশচন্দ্র বলেছিলেন :

'"ইণ্ডিয়া ক্লাবে' থাকতে থাকতেই একদিন শোনা গেল যে, দিনদুপুরে 'Imperial Druggists Hall'এর একটা দোতলা বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেছে। এই ঘটনাটি উপলক্ষ করে "ইণ্ডিয়া ক্লাবে" দ্বিজুবাবু ও তাঁর বন্ধুরা ("লক্ষ্মীছাড়ার দল") সবাই মিলে একটা "ডাকাতে ক্লাব" প্রতিষ্ঠা করেন।···প্রতি রবিবারে ক্লাবে সকলেই জমায়ৎ হতেন। প্রায়ই সেখানে সেদিন সকালবেলা Breakfast'এর (প্রাতরাশের বা মধ্যাহ্ন-ভোজনের) ব্যবস্থা হত; "ডাকাতে"রা সকালবেলা থেকেই ক্লাবে সমবেত হতেন এবং সারাটা দিন একত্র কাটাতেন। পরে কখনও কখনও আবার Dinner'এরও (নৈশভোজেরও) আয়োজন। হত। ···"ডাকাতের ক্লাবে"র সভ্যরা, অর্থাৎ—এই "লক্ষ্মীছাড়ার দল"—পর্য্যায়ক্রমে একে একে "ডাকাতের ক্লাব"কে আমোদিত···করতেন। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এক এক জনকে হঠাৎ একটা 'নোটিশ' দেওয়া যেত যে, অমুক দিন "তোমার বাড়িতে ডাকাতি হবে"। সর্ব্বপ্রথম জোড়াসাঁকোর গগন ঠাকুরমহাশয়কে এই রকম এক চিঠি দেওয়া হয়। গগনবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে তার উত্তরে "ডাকাতের ক্লাব"কে জানান যে, তাঁর বাড়িটা তখন মেরামত হচ্ছে, এবং চুণ, সুরকী ও বাঁশের 'ভারা'তে তার অবস্থা এম্নি হয়ে আছে যে, তখন ডাকাতেরা এলেও বিশেষ কোন সুবিধা করতে পারবেন না। তারপর, কিন্তু শীঘ্রই তিনি একটা সুন্দর 'সান্ধ্য-সম্মিলন' (Evening party) দেন, এবং তাতে "ডাকাতের দলের সমস্ত ও গগনবাবুর বন্ধু-বান্ধবগণ নিমন্ত্রিত হন। সে "পার্টিটা" খুবই জাঁকালো ও সফল···হয়েছিল। এই সম্মিলনে রবিবাবুর গুটী ৪/৫ গান—যা এখন খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—প্রথম গীত ও প্রচারিত হয়। "এখনো তা'রে চোখে দেখিনি" তন্মধ্যে অন্যতম। আদি-সমাজের ভূতপূর্ব্ব গায়ক অক্ষয় মজুমদার মহাশয় এই সম্মিলনে রবিবাবুর "বিনি পয়সার ভোজের অভিনয় করেন।···আর একবার অভিলাষ মুখুজ্যে ('রাধিকা মুখুর্য্যে মহাশয়ের পুত্র, এখন 'রায়বাহাদুর') মহাশয়কে এই "ডাকাতের ক্লাবের সভ্যেরা 'বধ' করেন, ···রবিবাবু এবারেও উপস্থিত ছিলেন।'[১৩২]

আমরা আগেই বলেছি, সম্ভবত এই 'ডাকাতের ক্লাব'কে মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল' ও 'ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী' গান দুটি রচনা করেছিলেন।

সুরেশচন্দ্র আর-একটি সম্মিলনের স্মৃতিচারণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেটিতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন : 'দ্বিজুবাবু যখন আব্কারী বিভাগে পরিদর্শক কাজে নিযুক্ত ছিলেন তখন তাঁহার একখানি বা ছিল।···একবার সেই বাটিতেই তিনি আমাদের একটা 'পার্টি' দিয়েছিলেন। কথা ছিল—এখান থেকে বরাবর খড়্দা পর্য্যন্ত গিয়ে সেখানে একটা বাগানে আহারাদি করা যাবে, এবং তারপর ধীরে-সুস্থে ফেরা যাবে। রবিবাবু এ পার্টিতেও ছিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়ে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সব ছাদে গিয়ে বসা গেল; এবং কেদার মিত্র, রবিবাবু ও দ্বিজুবাবুর গান হতে লাগল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে ঝড়-বৃষ্টি-দুর্যোগে আনন্দোৎসবটি পণ্ড হয়ে গেল। অশেষ দুর্ভোগের পর খড়দহের বাগানবাড়িতে রাত কাটিয়ে 'প্রত্যুষে উঠিয়াই যে যার সব ট্রেনে করে কলিকাতায় ফিরে আসা গেল। দুজন মহাকবি অম্লান-বদনে এই-সব অকথ্য কষ্ট সহ্য করেছিলেন; এবং হাস্যামোদ, কবিত্ব ও রসিকতার অফুরন্ত প্রবাহে সেই দারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্লেশকেও আনন্দময় করে রেখেছিলেন।'[১৩৩]

এই ‘ডাকাতের ক্লাব’-এর উত্তরসূরী ‘খামখেয়ালী সভা’, যার উদ্বোধন হয়েছিল ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২৪ মাঘ [শুক্র 5 Feb 1897]।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ১

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আষাঢ়-সংখ্যায় [পৃ ৪৮] আদি ব্রাহ্মসমাজের ‘আয় ব্যয়’-এর ‘ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৬ বৈশাখ মাস’-এর হিসাবে দেখা যায় : ‘শুভকর্ম্মের দান।/ শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০্’। কী এই শুভকর্ম? মীরা দেবীর [জন্ম : ২৯ পৌষ ১৩০০] অন্নপ্রাশন উপলক্ষে এই দান হলে বলতে হয়, এই অনুষ্ঠান অনেক দেরি করে সম্পন্ন হয়েছিল। অবশ্য ঠাকুরপরিবারে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের কোনো ধরাবাঁধা সময় ছিল না।

১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-সংখ্যা [১৯ বর্ষ ১ সংখ্যা] থেকে স্বর্ণকুমারী দেবী ‘শরীর অসুস্থ হওয়াতে ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা-ভার ত্যাগ করলে তাঁর দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরলা দেবী তখন মহীশূরে মহারানী গার্লস্ স্কুলের অ্যাসিস্টেন্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টে।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর পরিবারে সকলের জন্মদিন পালন করতেন। ১২৯৪ বঙ্গাব্দ থেকে সরলা দেবী রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনের সূচনা করেন। পরের বৎসর থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মদিন পালিত হলেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন আরম্ভ হয় বর্তমান বৎসর থেকে। আষাঢ়-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে ‘সংবাদ’টি দিয়ে লেখা হয় : ‘৩রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের জন্মদিন। ঐ দিবস (বৃহ 16 May] প্রাতঃকালে তাঁহার পার্কষ্ট্রীটস্থ ভবনে তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গ সমবেত হইয়া ব্রহ্মোপাসনাদি করেন।’ পরের বৎসর থেকে অনুষ্ঠানটি আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

আষাঢ় মাসে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র নরনাথের সঙ্গে ঊর্মিলা দেবীর বিবাহ হয়। এই উপলক্ষে মহর্ষির নিজস্ব ক্যাশবহির ২৭ আষাঢ়ের হিসাব : ‘ব° কুক এণ্ডকেলভী/দং বাবু নীলকমল মুখখাপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রের বিবাহে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় যৌতুক দিবার আংটী ও ব্রাশলট…৪০০্। নীরদনাথের আর একপুত্র নীলানাথের সঙ্গে প্রতিমা দেবীর প্রথম বিবাহ হয়।

১৮ মাঘ [শুক্র 31 Jan 1896] হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধৃতিমতী দেবীর বিবাহ হয়। ইনি ‘চোরবাগানে ঠাকুরগোষ্ঠীর দৌহিত্র মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থ কন্যা’।[১৩৪]

এর কয়েক দিন পরে ২২ মাঘ [মঙ্গল 4 Feb] এলাহাবাদ-নিবাসী ‘দর্পনারায়ণ বংশীয় ঠাকুরগোষ্ঠীর জামাতা সার্জ্জন মেজর ফকিরচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সুশীলতা’ [সাহানা] দেবীর সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের সরকারী ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, এই দুই বিবাহে ২৭৬৭ টাকা ১০ আনা ৯ পাই খরচ হয়েছিল।

দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যা নলিনী দেবীর সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুহৃৎনাথ চৌধুরীর বিবাহ-সম্বন্ধ হয়। ২৬ ফাল্গুন [রবি 8 Mar] তাঁকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়। বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়েছিল পরের

বছর ১৪ বৈশাখে। এর অব্যবহিত পরে ঠাকুরপরিবারের খরচে সুহৃৎনাথ উচ্চতর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বেণীমাধব রায়চৌধুরী সম্ভবত এই বছরের কোনো সময়ে পরলোকগমন করেন। বৈশাখ ১৩০৩ থেকে ঁ বেণীমাধব রায়ের স্ত্রী'র জন্য কুড়ি টাকা হারে মাসোহারা বরাদ্দ হতে দেখা যায়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য : ২

'বর্ষারম্ভে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা', 'ঈশ্বরই অমৃতসেতু' -শীর্ষক ভাষণ, 'উদ্বোধন 'প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে আদি ব্রাহ্মসমাজের নববর্ষের উৎসব পালিত হয় ১ বৈশাখ [শনি 13 Apr 1895] প্রাতঃকালে মহর্ষিভবনে। গত বৎসর মাঘোৎসবে গীত রবীন্দ্রনাথ-রচিত ব্রহ্মসংগীত 'নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়' [দ্র গীত ১। ১৬১] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় নববর্ষ উৎসবের বিবরণের সঙ্গে মুদ্রিত হতে দেখে [পৃ ২৪] মনে হয়, গানটি উক্ত উৎসবে গীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

মহর্ষির ৭৯তম জন্মোৎসব পালিত হয় ৩ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 16 May]। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের 'ধর্মপিতা'র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে কেন্দ্র করে বিবদমান বিভিন্ন ব্রাহ্মগোষ্ঠী কিভাবে বারবার সম্মিলিত হয়েছে, তার কিছু-কিছু বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। বয়োজ্যষ্ঠ ধর্মীয় নেতা হিসেবে ভারতের অন্যত্রও তখন তাঁর বিশেষ মর্যাদা। ফলে অনেকেই তাঁর ছবি সংগ্রহ করে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন, তার বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ১৭ শ্রাবণ ১৩০২ তারিখের পত্রে। তত্ত্ববোধিনী-র আষাঢ় সংখ্যায় জন্মোৎসবের বিবরণের সঙ্গে 'এতদুপলক্ষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকগণকে তাঁহার এক এক খণ্ড চিত্র উপহার দেওয়া হয়। 3 Aug [১৯ শ্রাবণ] এইরূপ একটি ছবি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজের Southern India Brahmo Samaj-এর সম্পাদককে পাঠান এইরূপ সংবাদ আশ্বিন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয়। মহর্ষির ব্যক্তিমহিমাকে এইভাবে আদি সমাজ প্রভাব বৃদ্ধির কাজে লাগিয়েছে।

স্বামী দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের সঙ্গেও এই সময়ে আদি সমাজের একটি যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ভারতবর্ষীয় স্বাধীন আর্য্যমিশনের কার্যাধ্যক্ষ সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য আদি সমাজ থেকে প্রচারক প্রার্থনা করে মহর্ষিকে লেখেন : 'সে দিন বড়বাজারের (ক্লাইভ স্ট্রীটের) আর্য সমাজের সভ্যেরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আপনিও পিতার ন্যায় প্রতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে যে সকল সদুপদেশ দিয়াছিলেন তাহার ফলেই সে দিন আদি সমাজ মন্দিরে পণ্ডিত মুনিরামের ব্যাখ্যান হয়।'[১৩৫] এই যোগাযোগের পরিণামে বছর-তিনেক পরে বলেন্দ্রনাথ পাঞ্জাবের আর্যসমাজের সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়াস করেন।

আদি সমাজের কাজে ক্ষিতীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের ফলে তাঁকে ইতিপূর্বে অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছিল। ৩০ কার্তিক [15 Nov] আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে অন্যতম উপাচার্য পদে নিয়োগ করেন।[১৩৬] মাঘোৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রবন্ধাদি তিনি আগে থেকেই পাঠ করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবার

পেলেন বেদীতে বসার অধিকার, যে অধিকার পেতে রবীন্দ্রনাথকে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

৭ পৌষ [শনি 21 Dec] শান্তিনিকেতনে পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার কথা আমরা যথাস্থানে বলেছি। প্রাতে হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর উদ্বোধন, ক্ষিতীন্দ্রনাথের 'অধ্যাত্মযোগ'-শীর্ষক উপদেশ পাঠ ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের প্রার্থনা হয়। রাত্রে ক্ষিতীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধনের পর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা শেষ করে 'প্রার্থনাসমন্বিত উপদেশ' প্রদান করেন।

৭ পৌষ উপলক্ষে মেলা গত বৎসর প্রথম বসেছিল। এ বৎসরের মেলার বিবরণে লেখা হয় : 'দিবা দ্বিতীয় প্রহর। চতুর্দ্দিকে' দোকান পসার বসিয়াছে এবং স্থানীয়লোকে উৎসবক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছে। ঐ সময় সাধারণের হৃদয়ের সুশিক্ষার উদ্দেশে রাজা শ্রীবৎসের উপাখ্যান গীত হইয়াছিল। সংসারের অনিত্যতা এবং রাজা শ্রীবৎসের ধর্ম্মের জন্য রাজ্যনাশ, স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বিচ্ছেদ, এবং দ্বাদশ বৎসর বনবাস প্রভৃতির দারুণ কষ্ট অবিচলিতভাবে সহ্য করা, এই সমস্ত করুণরসোদ্দীপক গীতাভিনয়ে অনেকেরই অশ্রুপাত হইয়াছিল।[১৩৭]

বাল্যকালে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নলদময়ন্তী পালা যাত্রা দেখার কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ [দ্র ছেলেবেলা ২৬। ৫৯৯-৬০১]। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা কিছুটা ছিল চোখ-ধাঁধানো, কিছুটা ছিল ঘুমে আবিল হয়ে। কিন্তু ৭ পৌষের মেলার অন্তর্গত দিন-দুপুরে শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠে যাত্রাগানের আসর রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমনে গভীরতর প্রভাব বিস্তার করেছে। ইতিপূর্বেই বিদেশী নাটক ও নাট্যাভিনয়ের অনুকরণে গীতিনাট্য বা নাটক রচনা ও অভিনয়ে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করেছেন। কিন্তু পরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরিবেশে যখন তিনি নাটক রচনা করেছেন, তখন তিনি জ্ঞাতসারেই যাত্রার গঠনকলা, সংগীতময়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসরণ করেছেন। এই দিক দিয়ে মেলার যাত্রাভিনয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ।

১০ মাঘ [বৃহ 23 Jan 1896] ষষ্ঠষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ক্ষিতীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।

পরের দিন প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে বন্দনাগান, ক্ষিতীন্দ্রনাথের বক্তৃতা, দ্বিজেন্দ্রনাথের উদ্বোধন ও প্রার্থনা হয়। সায়ংকালীন উপাসনায় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি প্রার্থনা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম্মই বিশুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতার সোপান'-শীর্ষক উপদেশ পাঠ করেন।

এই বৎসরের মাঘোৎসবে চারটি 'বেদগান' গীত হয় : ১। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং ২। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ৩। ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ৪। এষদেবোবিশ্বকর্ম্মা। রবীন্দ্রনাথ-রচিত ব্রহ্মসংগীত 'বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে' ও 'পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে' এই উপলক্ষে গীত হয়, একথা আমরা আগেই বলেছি।

১৪ মাঘ [সোম 27 Jan] 'ব্রাহ্মসম্মিলন সভা' হয় : 'বিগত ১৪ই মাঘ সোমবার ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাদর আহ্বানে ব্রাহ্ম সাধারণ তাঁহার পার্কষ্ট ীটস্থ ভবনে সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নে সমবেত হইয়াছিলেন। উপস্থিত ব্রাহ্মসংখ্যা ৪০০।৫০০ হইয়াছিল। প্রাতে ৭।টার সময় সংকীর্ত্তন হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। ৮টার সময় পূজ্যপাদ মহর্ষি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সকলে

দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।···সাড়ে আটটার সময় কার্য শেষ হইয়া গেল।'[১৩৮] প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্ম এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে এবারেও সেতারায় মহাসমারোহে মাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয় [দ্র তত্ত্ব°, চৈত্র। ১৯১-৯২]।

উল্লেখপঞ্জী

১ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৪৪-৪৫, পত্র ২০৯
২ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৪৪, পত্র ৬
৩ ঐ।১৪৬, পত্র ৭
৪ বহুরূপী, বিশেষ রবীন্দ্রনাট্য সংখ্যা [May 1986]। ৬৯
৫ সাধনা, বৈশাখ। ৫৮২-৮৩
৬ ঐ। ৫৮৪
৭ ঐ। ৫৮৭
৮ ঐ। ৫৮৮
৯ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৪৬, পত্র ২১০
১০ ঐ। ৪৪৮, পত্র ২১১
১১ রবীন্দ্রস্মৃতি [১৩৮০]। ৪০
১২ কবি-প্রণাম। ১০২
১৩ ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল [১৩৮৭]। ১২২-২৩
১৪ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৪৭-৪৮, পত্র ১০
১৫ রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহভুক্ত্ মূল পত্র
১৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৫৩, পত্র ২০
১৭ ঐ। ১৫১, পত্র ১৫
১৮ সাহিত্য, আষাঢ়। ২৩০
১৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৭০। ১৩১
২০ সাধনা, জ্যৈষ্ঠ। ৮৯
২১ ঐ। ৯০
২২ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৫০, পত্র ২১২
২৩ ঐ। ৪৫২, পত্র ২১৩

২৪ দ্র শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ [১৩৮০]। ৩১৭-২১

২৫ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৫৪-৫৫, পত্র ২১৫

২৬ ঐ। ৪৬৪, পত্র ২২২

২৭ সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ। ১২৫

২৮ সাধনা, আষাঢ়। ১৯২

২৯ ঐ। ১৯৩

৩০ সাহিত্য, আষাঢ়। ২২৭

৩১ সাধনা, আষাঢ়। ১৯৮

৩২ ঐ। ১৯৯-২০০

৩৩ সাধনা, আষাঢ়। ২০০

৩৪ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৫৬, পত্র ২১৬

৩৫ ঐ। ৪৫৭, পত্র ২১৭

৩৬ ঐ। ৪৫৯, পত্র ২১৮

৩৭ ঐ। ৪৬০, পত্র ২১৯

৩৮ সা. প. প., শ্রাবণ। ১৮৮

৩৯ ঐ। ১৮৯

৪০ দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণী [১৩০৩]। ১৮

৪১ বিদ্যাপতি বঙ্গীয় পদাবলী [১৩০৫]। ৯৫

৪২ সাহিত্য, কার্তিক। ৫০৫

৪৩ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৬৫, পত্র ২২৩

৪৪ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৫১-৫২, পত্র ১৬

৪৫ ছিন্নপত্রাবলী। ৪১৭, পত্র ১৯৬

৪৬ ‘ক্ষুধিত পাষাণের উৎস সন্ধানে’, রবীন্দ্রনাথের রহস্যগল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ। ৯১

৪৭ দ্র ‘রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ’, সজনীকান্ত দাস : ‘রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য’ [১৩৬৭]। ৬৯-৭৫

৪৮ দ্র রথীন মিত্র, ‘শিলাইদহ, সাজাদপুর ও কুষ্টিয়ার কুঠিবাড়ি’, দেশ, ২৬ বৈশাখ ১৩৯৩। ৫০

৪৯ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৬৬, পত্র ২২৪

৫০ ঐ। ৪৬৮, পত্র ২২৫

৫১ ঐ। ৪৬৯, পত্র ২২৬

৫২ সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক। ৫৫০

৫৩ ঐ। ৫৩৬-৩৭

৫৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৫১-৫২, পত্র ১৬

৫৫ দ্র ঐ। ১৫২, পত্র ১৯

৫৬ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৭৯, পত্র ২৩২

৫৭ সাহিত্য, কার্তিক। ৫০৫

৫৮ ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৪।৭৫৪

৫৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৫৩, পত্র ২১

৬০ সাহিত্য, কার্তিক। ৫০৫

৬১ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৫৪, পত্র ২৩

৬২ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৮০, পত্র ২৩৩

৬৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৭৫, পত্র ২

৬৪ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৭৪, পত্র ২২৯

৬৫ দ্র গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী ১ [১৩৮০]। ৮৬, ৫৪৪-সংখ্যক

৬৬ ‘কবির সংস্পর্শে’, রবীন্দ্রায়ণ ২ [১৩৬৮]। ২২৯

৬৭ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ‘মাধুরীলতার চিঠি’ [1977]। ৩১-৩২, পত্র ২

৬৮ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৭৬, পত্র ২৩০

৬৯ রবিরশ্মি, পূর্বভাগে। ৪৩৯

৭০ রবীন্দ্রজীবনী ১ [১৩৯২]। ৪৪৪

৭১ রবীন্দ্রপ্রতিভা [১৩৬৮]। ২৬৩

৭২ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৭৯, পত্র ২৩২

৭৩ ঐ। ৪৭৮, পত্র ২৩১

৭৪ ঐ। ৪৭৯, পত্র ২৩২

৭৫ ঐ। ৪৮৩, পত্র ২৩৪

৭৬ ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৪। ৭৫৪

৭৭ মাধুরীলতার চিঠি। ৩২-৩৩, পত্র ৩

৭৮ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৮৪, পত্র ২৩৫

৭৯ ঐ। ৪৯১, পত্র ২৩৯

৮০ ঐ। ৪৯২, পত্র ২৪০

৮১ দ্র পিতৃস্মৃতি [১৩৭৮]। ১৮-১৯

৮২ *On the Edges of Time*, p. 26

৮৩ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৮৪ পিতৃস্মৃতি। ৩৪

৮৫ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৮৩, পত্র ২৩৪

৮৬ ঐ। ৪৮৫-৮৬, পত্র ২৩৬

৮৭ ঐ। ৪৮৯, পত্র ২৩৮

৮৮ আত্মপরিচয় ২৭।১৯৬

৮৯ ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৪।৭৫৪

৯০ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৫৩, পত্র ২০

৯১ 'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ', দেশীয় রাজ্য [১৩৩৪]। ২১০

৯২ 'আগরতলায় কিশোর-সাহিত্য-সমাজে কবি-সম্রাটের বাণী', রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা [১৩৬৮]। ৩৬১

৯৩ ঐ। ১২

৯৪ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৯৪, পত্র ২৪১

৯৫ ঐ। ৪৯৬, পত্র ২৪২

৯৬ ঐ। ৪৯৯, পত্র ২৪৩

৯৭ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৫৪, পত্র ২২

৯৮ ঐ। ১৭৩, পত্র ১

৯৯ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৯৬-৯৭, পত্র ২৪২

১০০ ঐ। ৫০১, পত্র ২৪৪

১০১ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৫৭, পত্র ২৭

১০২ ঐ। ১৭৫, পত্র ২

১০৩ ছিন্নপত্রাবলী। ৫০৪-০৫, পত্র ২৪৬

১০৪ ঐ। ৫০৬, পুত্র ২৪৭

১০৫ ঐ। ৫১০, পত্র ২৪৯

১০৬ ঐ। ৫০৮, পত্র ২৪৮

১০৭ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫।১৭৫, পত্র ২

১০৮ ঐ। ১৭৫-৭৬, পত্র ২

১০৯ ছিন্নপত্রাবলী। ৫১৩, পত্র ২৫১

১১০ তত্ত্ব°, মাঘ ১৮১৭ শক। ১৪৬

১১১ ঐ। ১৫১

১১২ রবীন্দ্রস্মৃতি। ১৯

১১৩ ঘরোয়া। ১৩৭

১১৪ পিতৃস্মৃতি। ২৮-২৯

১১৫ রবীন্দ্রজীবনী ১।৪৩৩

১১৬ দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৫।১৭৫, পত্র ২

১১৭ ঐ। ১৭৫, পত্র ২

১১৮ দ্র ঐ। ১৫৫, পত্র ২৫ [২২ ফাল্গুন]

১১৯ ঐ। ১৫৭, পত্র ২৭

১২০ ঐ। ১৬১, পত্র ৩৪

১২১ ঐ। ১৫৫, পত্র ২৪

১২২ তত্ত্ব°, চৈত্র ১৮১৭ শক। ১৮৪

১২৩ চৈতালি ৫।১

১২৪ 'চৈতালিটা আমার বড় আদরের' [ক্ষিতিমোহন সেন-অনুলিখিত]: দেশ, সাহিত্য ১৮৫।৪১

১২৫ ছিন্নপত্রাবলী। ৪৬৬, পত্র ২২৪

১২৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৫৮।৪২

১২৭ দ্র দেবকুমার রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল [২য় সং]। ৪৯৭-৯৯

১২৮ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৫৮-৫৯, পত্র ২৮-২৯

১২৯ মাধুরীলতার চিঠি। ৩৩, পত্র ৪

১৩০ রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১৩১ বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান। ২৮৩

১৩২ দ্বিজেন্দ্রলাল। ২৫৮-৬০

১৩৩ ঐ। ২৬৫-৬৬

১৩৪ নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফি, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। ৩৫৯

১৩৫ তত্ত্ব°, আশ্বিন। ৯৪

১৩৬ দ্র ঐ, অগ্র°। ১২৮

১৩৭ দ্র ঐ, মাঘ। ১৫১

১৩৮ ঐ, ফাল্গুন। ১৮১-৮২

---

* ছিন্নপত্রাবলীর সম্পাদক অনুমান করেছেন : 'জ্যো[তিদাদা]দের ওখানে অ[ভি]···' ইত্যাদি। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সময়ে পুনায় অবস্থান করছেন এবং কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে বাস করতেন, ফলে 'জ্যোতিদাদাদের ওখানে' লেখার কোনো অর্থ নেই। জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথের পিস্‌তুতো ভাই, সেই কারণে আমরা 'অ[বন]' এইরূপ অনুমান করেছি।

* প্রভাতকুমার ২২ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন : "প্রেমপঞ্জিকাতে আপনি যাহা 'উপদ্রব' করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি বিশেষ আহ্লাদিত ও সম্মানিত হইয়াছি।"

* এটি নিশ্চয়ই লিখতে ভুল হয়েছিল; 'কালীগ্রাম পরগনার পতিসরে' হবে।

* 'আবেদন' কবিতার ৮৭ তম ছত্র : 'নিশ্বাসের প্রায়, মৃদু ছন্দে দিবে দোল' প্রথম সংস্করণে ছাপা হয় নি।

ষ ট্ ত্রিং শ   অ ধ্যা য়

১৩০৩ [1896-97] ১৮১৮ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ষট্‌ত্রিংশ বৎসর

এবারে নববর্ষের দিনে [রবি 12 Apr] রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন না—সম্ভবত তিনি তখন সাজাদপুরে। চৈতালি-র পালা তখনও চলছে—২ বৈশাখ [সোম 13 Apr] লেখা হল তিনটি কবিতা: 'অনাবৃষ্টি' [দ্র চৈতালি ৫। ৪৩], 'অজ্ঞাত বিশ্ব' [ঐ ৫। ৪৩-৪৪] ও 'ভয়ের দুরাশা' [ঐ ৫। ৪৪]।

'অনাবৃষ্টি'কবিতাটি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। কাব্যগ্রন্থাবলী-তে 'চৈতালি' প্রকাশিত হওয়ার পর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ [1876-1962] 10 Dec 1897 [শুক্র ২৬ অগ্র°] কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে 'রবীন্দ্রবাবুর চৈতালি'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ও প্রবন্ধটি Dec 1897-সংখ্যা 'দাসী'-তে [পৃ ৫১৩-৩২] প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি 'অনাবৃষ্টি' কবিতা সম্পর্কে লেখেন: 'জাতীয় কবি হইতে হইলে, জাতির সুখ দুঃখের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি নিতান্তই আবশ্যক।...যে দেশে একবার অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে অজন্মা হইলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, সে দেশের কবির পক্ষে অনাবৃষ্টির মত একটা গুরুতর বিপদ লইয়া এরূপ বিদ্রূপ করা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না।'[১] এমন-কি এই প্রবন্ধের প্রতিবাদকারী রমণীমোহন ঘোষ '"চৈতালি" সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য' প্রবন্ধে[২] 'কবি কৃষককন্যার দুঃখে সহানুভূতি দেখান নাই' বলে অভিযোগটি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু 'বৃষ্টিহীন শুষ্কনদী দগ্ধক্ষেত্র বৈশাখের দিন'-এ দেবতার প্রতি কৃষককন্যার অনুনয়বাণী বৃথা হতে দেখে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

কলিযুগে, হায়
দেবতারা বৃদ্ধ আজি। নারীর মিনতি
এখন কেবল খাটে মানবের প্রতি।

—'জাতির সুখ দুঃখের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি'র অভাব বলে সমালোচিত হয় দেখে আশ্চর্য লাগে। বিশেষত, প্রকৃতি বা দেবতার খামখেয়ালি আচরণ সম্পর্কে ক্ষোভ একই দিনে লিখিত অপর দুটি কবিতাতেও দেখা যায়।

২ বৈশাখ চৈতালি-র কবিতার প্রথম পর্যায় শেষ হল। এরপর রবীন্দ্রনাথ কবে কলকাতা ফিরে আসেন নিশ্চিত করে জানা না গেলেও ৯ বৈশাখ [সোম 20 Apr] 'পার্কষ্ট্রীট হইতে আসিবার গাড়িভাড়া'র হিসাব থেকে বোঝা যায় এর আগেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

আমরা পূর্বে বলেছি, বৈশাখ ১২৯৮ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছাড়া মহর্ষি পরিবারের অন্য সদস্যদের মাসোহারা অর্ধেক হয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ তখন থেকে ১৫০ টাকা হারে মাসোহারা পাচ্ছিলেন। এরপর ১২৯৯ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত চার বছরের সরকারী ক্যাশবহি পাওয়া যায় নি। কিন্তু ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ক্যাশবহিতে দেখা যায় তাঁর মাসোহারার পরিমাণ অপরিবর্তিত রয়েছে; পরিবারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাসিক খোরাকী বাবদ ২৫ টাকার জায়গায় ৪০ টাকা বরাদ্দ হয়েছে; 'ছোটবধূঠাকুরাণী' মৃণালিনী দেবীর মাসোহারা ৩০ টাকাও অপরিবর্তিত। কিন্তু 'বাটীর ও পরগণার কার্য্য দেখার জন্য' রবীন্দ্রনাথকে মাসিক ২০০ টাকা দেওয়ার যে হিসাব দেখা যায়, সেটি কবে থেকে প্রবর্তিত হয়েছিল জানার উপায় নেই। ঘর ও আসবাবপত্র মেরামত, গাড়ি ও ঘোড়ার দেখাশোনা, ঔষধ প্রভৃতির খরচ সরকারী তহবিল থেকেই মেটানো হয়েছে। ঠাকুর কোম্পানির ব্যবসা বাবদ রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথকে ৫০০০ টাকা করে যে 'হাওলাত' দেওয়া হয়, তাদের 'দান'-এ পরিবর্তিত করা হয় ২ ভাদ্র। এই-সব হিসাব উদ্ধারের তাৎপর্য এই, অন্যান্য জমিদারপুত্রের সঙ্গে তুলনা না করলে তখনকার মূল্যমান অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা ভালোই ছিল এইটি প্রতিপন্ন করা।

১৪ বৈশাখ [শনি 25 Apr] দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যা নলিনী দেবীর সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুহৃৎনাথ চৌধুরীর বিবাহ হয়। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে ১৩ বৈশাখ একটি গান রচনা করেন: ইমন ভূপালি —কাওয়ালি। উজ্জ্বল করহে আজি এ আনন্দ রাতি দ্র সাহিত্য, বৈশাখ। ৭৪; কাব্যগ্রন্থাবলী [ব্রহ্ম]। ৪৬৯.; গীত ২। ৬০৭-০৮; স্বরলিপি নেই। 'সাহিত্য' পত্রিকায় রবীন্দ্র-রচনা এর পরে আর প্রকাশিত হয় নি।

কলকাতায় থাকলে পার্ক স্ট্রীটে পিতার কাছে যাতায়াত রবীন্দ্রনাথের প্রায় নিত্যকর্মের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু এবারে সেই গতায়াতের পরিমাণ কম। ৯ বৈশাখ তাঁর 'পার্কষ্ট ীট হইতে আসিবার' হিসাব পাওয়া যায়, যাতায়াতের অন্য হিসাব পাওয়া যায় ২১ বৈশাখ (শনি 2 May] ও ২৮ বৈশাখে [শনি 9 May]—২৭ বৈশাখের হিসাব: 'শ্রীযুত বড় বাবু মহাশয়ের পার্কষ্ট্রীটের বাটী হইতে রবীন্দ্রবাবুকে ডাকিতে আসিবার গাড়িভাড়া', প্রয়োজনটি নিশ্চয়ই গুরুতর ছিল, কিন্তু উপযুক্ত তথ্যের অভাবে বিষয়টি স্পষ্ট করা সম্ভব নয়।

হাতে কোনো পত্রিকা নেই, তাছাড়া পতিসর-সাজাদপুরে যে পরিবেশে চৈতালি-র কবিতাগুলি অবলীলায় রচিত হচ্ছিল কলকাতায় সেই পরিবেশের অভাব—ফলে রবীন্দ্রনাথকে কোনো রচনাকর্মে নিযুক্ত থাকতে দেখা যায় না। বৈশাখ মাসে কলকাতা থেকে লেখা তাঁর কোনো চিঠিও পাওয়া যায় নি। সেইজন্য এই সময়ে তাঁর জীবনচিত্র অস্পষ্ট।

তবে তিনি এর মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখেছিলেন, সেটি জানা যায় প্রভাতকুমারের ২৪ বৈশাখ [মঙ্গল 5 May] তারিখের পত্র থেকে। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের 'ষট্‌ত্রিংশত্তম (বাস্‌রে—কথাটা যেন মারিতে আসিতেছে) জন্মদিনের' জন্য প্রীতিসম্ভাষণ জানিয়ে লিখেছেন: 'অতুল আপনার সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ করিয়া ফেলিল, ইহাতে আমার অত্যন্ত ঈর্ষার উদয় হইতেছে'।[৩] এই 'অতুল' প্রভাতকুমারের বাঁকিপুরের বন্ধু অতুলচন্দ্র ঘোষ, যিনি বীরেশ্বর গোস্বামী নামে প্রবন্ধাদি লিখতেন। ইনিও একজন রবীন্দ্রানুরাগী, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের বিবরণ প্রভাতকুমারের অনেক চিঠিতেই রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারের পত্রাদি প্রথমাবধি যেমন সযত্নে রক্ষা করেছেন, অতুলচন্দ্রের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। ফলে উভয়ের সম্পর্কের সম্পূর্ণ দিগ্‌দর্শন সম্ভব নয়। যাই হোক্‌, প্রভাতকুমারের পত্র থেকে জানা

যাচ্ছে যে, বৈশাখ মাসের কোনো দিনে অতুলচন্দ্র কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সেইটিই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকার।

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: '[নিলিনী দেবীর] বিবাহ-উৎসবের পর কবিকে উড়িষ্যা যাত্রা করিতে হইল—জমিদারী পার্টিশনের কাজে। উড়িষ্যার জমিদারি মহর্ষি তাঁহার মৃত পুত্র হেমেন্দ্রনাথকে দান করিয়াছিলেন; সেখানকার তত্ত্বাবধান এতদিন এজমালিতে হইয়া আসিতেছিল। এখন হেমেন্দ্রনাথের পুত্রেরা সাবালক হইয়াছেন।'[৪] এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের উড়িষ্যা যাওয়ার তথ্য তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন, তার সূত্র তিনি উল্লেখ করেন নি। তাছাড়া মহর্ষির শেষ উইল স্বাক্ষরিত হয় 8 Sep 1899 [শুক্র ২৩ ভাদ্র ১৩০৬] তারিখে, এই উইল অনুসারেই হেমেন্দ্রনাথের পুত্রেরা উড়িষ্যার জমিদারীর অধিকার লাভ করেন। এর আগেও মহর্ষি কয়েকবার উইল করেছেন, সেগুলিতে উড়িষ্যার জমিদারী তিনি হেমেন্দ্রনাথের বংশধরদের যদি দিয়েও থাকেন তাহলেও তা কার্যকরী হয় নি। সুতরাং এই সময়ে 'জমিদারী পার্টিশনের কাজে' রবীন্দ্রনাথের উড়িষ্যা যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ২১ ও ২৮ বৈশাখ তিনি পার্ক স্ট্রীটে গিয়েছিলেন, তার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

রবীন্দ্রজীবনী-কার এর পরে লিখেছেন: 'উত্তরবঙ্গ হইতে জমিদারি সংক্রান্ত কার্য উপলক্ষে চলিয়াছেন উড়িষ্যা। রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে ভ্রমণকালে তিনি বিস্তর বই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এইসব গ্রন্থের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই থাকিত।...এবার এই গ্রন্থ হইতে 'মহাবস্তু অবদান' অন্তর্গত এক উপাখ্যান অবলম্বনে 'মালিনী' নাট্যকাব্য রচনা করিলেন।'[৪] 3 Mar 1893 উড়িষ্যার তীরতল থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ১৮৭, পত্র ৮৬] 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর' প্রভৃতি বিস্তর বই সঙ্গে নেওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তথ্যটি May 1896-এ ব্যবহার করার যৌক্তিকতা বোঝা শক্ত। আমরা আগেই বলেছি, 'মালিনী' ভাদ্র ১৩০১-এ শিলাইদহে লিখিত হওয়াও সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গ্রন্থের রচনাকাল ও প্রকাশকালের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান আমরা আগেও দেখেছি।

৩ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 15 May] পার্ক স্ট্রীটে তিন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি ও পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে মহর্ষির অশীতিতম জন্মোৎসব পালিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণে [আষাঢ়। ৩৫-৩৯] অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাম নেই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমার্ধে মাসোহারা, গৃহসংস্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়া ক্যাশবহিতে রবীন্দ্রনাথের গতিবিধি সংক্রান্ত কোনো খবর নেই। ১৭ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 29 May] তাঁর পার্ক স্ট্রীট হইতে আসিবার গাড়িভাড়া'র হিসাব পাওয়া যায়।

২৩ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 4 Jun] প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'আমি ৯ই জুন এ স্থান ত্যাগ করিব ১২ই কলিকাতায় পৌঁছিব—সেখানে দুই একদিন থাকিয়াই যদি আপনি মফস্বলে থাকেন তবে আপনার সন্ধানে বাহির হইব'।[৫] প্রভাতকুমারকে মফস্বলে যেতে হয়নি, কলকাতাতেই যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা ও ছন্দ বিষয়ে তর্ক হয়েছিল সেকথা তিনি ১৪ আষাঢ়ের [শনি 27 Jun] পত্রেই জানিয়েছিলেন। পুনরায় তাঁদের দেখা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সাক্ষাতের দিন সন্ধ্যাবেলায় জ্বরে পড়ে ম্যালেরিয়ার ভয়ে তিনি পালিয়ে আসেন।

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্ভবত ৩১ জ্যৈষ্ঠ [শনি 13 Jun] দেখা করেন। উক্ত ১৪ আষাঢ়ের পত্রে তিনি লিখেছেন: 'আপনি আমার আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। বলিয়া আসিলাম পরশ্ব আসিব, তাহার পর এক পক্ষ আর কোনো খবরই নাই।' ছন্দ-বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি লেখেন; 'আপনার সঙ্গে সেদিন ছন্দ সম্বন্ধে যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে বলা বাহুল্য আপনি আমাকে কনভার্ট করিতে পারেন নাই। আমি যে আপনাকে পারিয়াছি, তাহাও বোধ হয় না; কি করিব কিছুদিন ধরিয়া আক্রমণের সুবিধা পাইলাম না।...আপনি আমার আবিষ্কৃত পঠনপ্রণালীর মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই।'

কাব্য-গ্রন্থাবলী প্রকাশের আয়োজন যে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, সেই খবরটিও জানা যায় এই পত্র থেকে; 'গ্রন্থাবলীতে রাজা ও রাণী যেন প্রথম সংস্করণের মত ছাপা হয়। চিত্রার পরে রচিত কবিতাগুলি গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত করিবার প্রয়োজন নাই। কোনও একখানা বহি নহে, কতকগুলি ছুটা কবিতা, সে কেমন দেখাইবে।' চিত্রা-র পরে লিখিত এই কবিতাগুলি আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রচিত আরও কতকগুলি কবিতার সঙ্গে 'চৈতালি' নামে কাব্য-গ্রন্থাবলী-তে মুদ্রিত হয়। রাজা ও রানী সম্বন্ধে প্রভাতকুমারের পরামর্শ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে এই পত্রের উত্তর দেন ১৫ আষাঢ় [রবি 28 Jun] তারিখে, প্রভাতকুমারের ১৬ আষাঢ়ের চিঠি থেকে খবরটি জানা যায়। আষাঢ়ের প্রথমেই তাঁর মফস্বলে যাওয়ার কথা ছিল—প্রভাতকুমার লিখেছেন: 'আমি যেদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই সেইদিন আপনি আভাস দিয়াছিলেন জোর দুই তিন দিন আর আছেন'—কিন্তু সম্ভবত হেমেন্দ্রনাথের কন্যা মনীষা দেবীর সঙ্গে অকালমৃতা অভিজ্ঞা দেবীর স্বামী ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ [১১ আষাঢ়] প্রভৃতি কিছু কিছু কারণে তাঁর যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়।

এই সময়ের কয়েকটি ঘটনা জানা যায় ক্যাশবহির হিসাব থেকে। ৩০ জ্যৈষ্ঠের [বৃহ 11 Jun] হিসাব: 'গগনচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট রবীন্দ্রবাবু মহাশয় ১ পত্র লেখার টিকিট' গাজিপুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগের আর-একটি প্রমাণ। ৯ আষাঢ় [সোম 22 Jun] ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ, বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ সেখানে যান। আমরা আগেই বলেছি, এই ধরনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংগীত-পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। এই দিন সত্যপ্রসাদ ঠাকুর কোম্পানিকে চার হাজার টাকা ঋণ দেন। তাঁর হিসাবখাতায় তিনি লিখেছেন: 'Tagore & Co-এর Proprietors বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই তিনজনকে ৪০০০৲ টাকা...শতকরা বার্ষিক ৯৲ সুদে হ্যাণ্ডনোটে হাওলাত দেওয়া যায়'। ১৮ শ্রাবণ তিনি আরও ছ'হাজার টাকা ধার দেন। ১৭ আশ্বিন ১৩০৬ এই ঋণ পরিশোধ করা হয় বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। ততদিন মাসিক ৭৫ টাকা করে সুদ দিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের আষাঢ় মাসের 'আয় ব্যয়'-এ দেখা যায়: 'শুভকর্ম্মের দান' হিসেবে ১০৲ ও আনুষ্ঠানিক দান' হিসেবে ২৲ রবীন্দ্রনাথ দান করেছেন [দ্র তত্ত্ব°, ভাদ্র। ৮২]। তাঁর পরিবারে শুভকর্মের কী অনুষ্ঠান এই সময়ে হয়েছিল, বলা শক্ত। মৃণালিনী দেবী তখন অন্তঃসত্ত্বা—অনুষ্ঠানটি কি এই সংক্রান্ত?

প্রভাতকুমার ১৬ আষাঢ়ের চিঠিতে লিখেছেন: 'এ পৃষ্ঠায় মিলনান্তে নামক একটি সনেট্ লিখিয়া পাঠাইলাম। বিরহান্তে নাম দিয়া আপনি ইহার একটি বিপরীত ভাবাত্মক সনেট রচনা করিয়া আমাকে পাঠাইয়া

দিবেন।’[৬] রবীন্দ্রনাথ এই দাবী পূরণ করেন ২১ আষাঢ় [শনি4 Jul] তারিখে শিলাইদহ থেকে ‘মিলনান্তে’ নামেই আর একটি সনেট [‘বিরহ বৎসর পরে মিলনের বীণা’] লিখে দিয়ে। প্রভাতকুমার অবশ্য সনেটটি পেয়ে খুশি হন নি, ২৩ আষাঢ় তিনি লিখেছেন: ‘আমি যে ভাবে রচনা করিতে বলিয়াছিলাম, সে ভাবে ত করেন নাই। আমি আমার কবিতার বিপরীত ভাব আপনাকে চিত্র করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। মিলনান্তে শুষ্ক অসাড়তার ভাব আমি লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি, বিরহান্তে নবীভূত প্রেমের প্রবল বেগ বর্ণনা করিবার ভার আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলাম। আপনি বোধহয় আমার পত্র সাবধানে পড়েন নাই তাই উল্টা করিয়া দিয়াছেন।’[৭]

প্রভাতকুমারের আর একটি দাবী ছিল, কবিতাটি ‘ভবিষ্যৎ পুস্তকে মুদ্রিত’ হবে—কিন্তু এই দাবী পূর্ণ হয় দীর্ঘকাল পরে, ‘পূরবী’ [১৩৩২] কাব্যের ‘সঞ্চিতা’ অংশে কবিতাটি প্রথম সংকলিত হয়, পরে ‘উৎসর্গ’ কাব্যের সংযোজন-ভুক্ত হয়েছে [দ্র ১০। ৮৬]। অবশ্য ভাদ্র-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৩৩৮] ‘অবসান’ শীর্ষনামযুক্ত হয়ে বাঁদিকে প্রভাতকুমারের ‘মিলনান্তে’ ও ডান দিকে রবীন্দ্রনাথের ‘বিরহান্তে’ মুদ্রিত হয়।

ভক্তের এই দাবী রবীন্দ্রনাথের ভালোই লেগেছিল। ২১ আষাঢ় তারিখেই তিনি ‘ভক্তের প্রতি’ [দ্র চৈতালি ৫। ৪৪-৪৫] সনেটটি রচনা করেন। আলোচনা সূত্রে তিনি অবশ্য বলেছিলেন: ‘বোধ হয় আমার ভক্ত অতুল ঘোষের প্রতি লেখা। প্রভাতকুমারের বন্ধু, সেই সূত্রে আমার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, আমাকে তিনি একটি ভক্তিপূর্ণ কবিতা লেখেন তাহারই উত্তরে এইটি লেখা’[৮]—কিন্তু আমাদের ধারণা, সনেটটি প্রভাতকুমারের উদ্দেশ্যেই লেখা। প্রভাতকুমারের প্রতিটি পত্র যেমন সযত্নে রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করেছেন, অতুলচন্দ্রের সেই সৌভাগ্য হয় নি।

ইতিপূর্বে পতিসর-সাজাদপুর-শিলাইদহে অবস্থানকালে চৈত্র ১৩০২ ও বৈশাখ ১৩০৩-এ কুড়ি দিনে চৈতালি-র ৫৩টি কবিতা লিখিত হয়। সেই পালা আবার আরম্ভ হল ১ শ্রাবণ [বুধ 15 Jul] তারিখে ‘প্রাচীন ভারত’ [দ্র চৈতালি ৫। ১৯-২০] সনেটটি দিয়ে। প্রাত্যহিক জীবনের আপাততুচ্ছ ঘটনার মধ্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করে চৈতালি-র কবিতা-রচনার সূত্রপাত, তারই মধ্যে ১৯ চৈত্র তিনি প্রয়াণ করেছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনে—পর পর তিন দিনে লেখা হয়েছিল ‘বনে ও রাজ্যে’, ‘সভ্যতার প্রতি’, ‘বন’, ‘তপোবন’, ‘ঋতুসংহার’ ও ‘মেঘদূত’ এই ছ’টি কবিতা। ‘প্রাচীন ভারত’ কবিতা এদের সঙ্গেই পঠনীয়, সেই কারণেই কালানুক্রম ভঙ্গ করে কবিতাটি ‘তপোবন’ [১৯ চৈত্র] কবিতার পর মুদ্রিত হয়েছে।

১ শ্রাবণে লেখা ‘হৃদয়ধর্ম’ [দ্র ৫। ২৫-২৬] কবিতাটিও ২৩ চৈত্রে লিখিত ‘পুঁটু’-র সঙ্গে একই ভাবসূত্রে গ্রথিত এবং ২ শ্রাবণে লিখিত ‘মিলনদৃশ্য’ ও ‘দুই বন্ধু’ সেই ভাবনাকেই তত্ত্বরূপ দান করেছে, ফলে এখানেও কালানুক্রম স্পষ্টতই লঙঘন করা হয়েছে। ভাবের অনুসরণে কালানুক্রমের ব্যতিক্রম চৈতালি-তে আরও রয়েছে।

১ ও ২ শ্রাবণে রচিত কবিতাগুলি সম্ভবত শিলাইদহে লেখা, ৭ শ্রাবণ [মঙ্গল 21 Jul] লিখিত ‘নদীযাত্রা’ [দ্র ৫। ৪৫] কবিতা থেকে মনে হয় এই দিন রবীন্দ্রনাথ বোটে সাজাদপুরে রওনা হন। এই যাত্রায় তিনি ‘নদীযাত্রা’ ছাড়াও তিনটি কবিতা লেখেন—‘মৃত্যুমাধুরী’, ‘স্মৃতি’ ও ‘বিলয়’—সবগুলিই মৃত্যুভাবনায় পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ আলোচনা-সূত্রে 'মৃত্যুমাধুরী' কবিতা সম্বন্ধে বলেন: 'ভাইঝি অভির মৃত্যু উপলক্ষে', 'স্মৃতি'-সম্পর্কে তাঁর উক্তি: 'আমার ভাইঝি অভির মৃত্যুর পরে লেখা'।[৮]

[এই উক্তি থেকে মনে হতে পারে যে, অভিজ্ঞা দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এই কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল। অভিজ্ঞা দেবীর মৃত্যুর তারিখ আমাদের জানা নেই, কিন্তু তাঁর স্বামী ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মনীষা দেবীর বিবাহ হয় ১১ আষাঢ় তারিখে—সুতরাং অভিজ্ঞা দেবীর মৃত্যু নিশ্চয়ই কয়েক মাস পূর্বের কথা।]

অভিজ্ঞা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ খুবই ভালোবাসতেন, সুকণ্ঠী এই ভাইঝিটির গলার গান শোনার জন্য দূর মফস্বলেও তাঁর মন ব্যাকুল হত ইন্দিরা দেবীকে লেখা 28 Jun 1892 [১৫ আষাঢ় ১২৯৯]-এর পত্রে তার উল্লেখ রয়েছে। [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ১৩০-৩১, পত্র ৬১]। নলিনী তালুকদারকে রবীন্দ্রনাথ-যে লিখেছিলেন: 'অভি বলে আমার একটি ভাইঝি ছিল, তার গলা ছিল খুব মিষ্টি। একদিন কি একটা কারণে আমার খুব রাগ হয়েছিল, অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঠিক সেই সময়ে যা-তা বকে গেল, এক মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে গেল'[৯]—এরই কাব্যরূপ দেখা যায় 'স্মৃতি' কবিতায়;

> সে ছিল আরেক দিন এই তরী'-পরে,
> কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতিস্বরে।
> ছিল তার আঁখি দুটি ঘনপক্ষ্মচ্ছায়,
> সজল মেঘের মতো ভরা করুণায়।
> কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত সুখে,
> উচ্ছ্বসি উঠিত হাসি সরল কৌতুকে।
> পাশে বসি ব'লে যেত কলকণ্ঠকথা,
> কত কী কাহিনী তার কত আকুলতা!

রবীন্দ্রনাথের সাজাদপুর যাত্রা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল, এটি বোঝা যায় ১১ শ্রাবণের ক্যাশবহির হিসাব থেকে: '৭ রোজ রবীন্দ্রের নিকট সাজাদপুরে ১ পুত্র'—৭ শ্রাবণ কলকাতা থেকে তাঁর কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে পরদিন সাজাদপুর পৌঁছেই পত্রটি তিনি হাতে পান।

৮ শ্রাবণ [বুধ 22 Jul] সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি জমিদারি-কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন, এই খবর পাওয়া যায় গোপালচন্দ্র রায়-উদ্ধৃত সাজাদপুরের অর্ডার বুকের নকল থেকে:

পাঁড়কোলার দাশু ওরফে হরকান্ত চক্রবর্তীর নামীয় এ সরকারের কৃত বাকি খাজনার নালিশের খরচা ও ড্যামেজ মাফ পাইবার মঞ্জুরী আদেশ।/ (হুঃ) মঞ্জুর।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ৮ই শ্রাবণ ১৩০৩

মুকুন্দলাল সেন। শক্তিপুর ইন্‌সপেকটর পদে ২৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৮ই শ্রাবণ ১৩০৩

পরের দিন নির্দেশ:

এনাত আলি বাবুর্চির পোষাক তৈয়ারি করিয়া দেওয়ার প্রার্থনা—প্রার্থনা মঞ্জুর।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯-৪-১৩০৩

১২ শ্রাবণের [রবি 26 Jul] নির্দেশ:

রূপচাঁদ মৃধা/ সাং কৈল কৈলর পুণ্যাহ সময়ে আমোদাদি করিবার জন্য কিছু মঞ্জুরের প্রার্থনা।/ চার টাকা মঞ্জুর। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ১২-৪-১৩০৩[১০] ইত্যাদি।

এরই মধ্যে ১০ শ্রাবণ থেকে ১৫ শ্রাবণ পর্যন্ত ছ'দিনে তিনি লিখলেন বিচিত্র স্বাদের ১৭টি কবিতা:

১০ [শুক্র 24 Jul]	'প্রথম চুম্বন'	দ্র	চৈতালি	৫। ৪৮
১০ [,,]	'শেষ চুম্বন'	দ্র	ঐ	৫। ৪৮-৪৯
১১ [শনি 25 Jul]	'যাত্রী'	দ্র	ঐ	৫। ৪৯
১১ [,,]	'তৃণ'	দ্র	ঐ	৫। ৫০
১১ [,,]	'স্বার্থ'	দ্র	ঐ	৫। ৫১
১১ [,,]	'প্রেয়সী'	দ্র	ঐ	৫। ৫১-৫২
১১ [,,]	'শান্তিমন্ত্র'	দ্র	ঐ	৫। ৫২
১১ [,,]	'কালিদাসের প্রতি'	দ্র	ঐ	৫। ৫৩
১১ [,,]	'কাব্য'	দ্র	ঐ	৫। ৫৪-৫৫
১৪ [মঙ্গল 28 Jul]	'ঐশ্বর্য'	দ্র	ঐ	৫। ৫০-৫১
১৪ [,,]	'প্রার্থনা'	দ্র	ঐ	৫। ৫৫-৫৬ ; গীত ১। ১০৯
১৪ [,,]	'ইছামতী নদী'	দ্র	ঐ	৫। ৫৬
১৪ [,,]	'শুশ্রূষা'	দ্র	ঐ	৫। ৫৭
১৪ [,,]	'আশিস্ গ্রহণ'	দ্র	ঐ	৫। ৫৭-৫৮
১৪ [,,]	'বিদায়'	দ্র	ঐ	৫। ৫৮
১৫ [বুধ 29 Jul]	'কুমারসম্ভব গান'	দ্র	ঐ	৫। ৫৩-৫৪
১৫ [,,]	'মানসলোক'	দ্র	ঐ	৫। ৫৪

পৃষ্ঠা-সংখ্যার দিকে তাকালে বোঝা যাবে, কবিতাগুলিকে ভাবের সূত্র অনুসরণ করে সাজানো হয়েছে। 'ঐশ্বর্য' কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'আমাদের বিষয়ের তখন অত্যন্ত টলটলায়মান অবস্থা। বৈষয়িক ডাক আসিল। উকিল আদালত কার্যের রণক্ষেত্রের দিকে চলিলাম। কবে আবার প্রকৃতির দিকে ফিরিব। তাহার উপর মৃত্যুর আঘাতেও অন্তরের বোধ।'[১১] কবিতাগুলি প্রধানত এই ভাবনার অনুসরণে সজ্জিত। 'যাত্রী', 'তৃণ', 'ঐশ্বর্য' ও 'স্বার্থ' কবিতাগুলির মধ্যে বৈষয়িক সমস্যা-জনিত ক্ষোভ ও তা থেকে ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে। অন্য কবিতাগুলি—এমন কি, 'কালিদাসের প্রতি', 'কাব্য', 'কুমারসম্ভব গান' ও 'মানসলোক'-ও—মনের এই বিশেষ অবস্থায় রচিত।

পাঠক জানেন, দ্বারকানাথের বিদেশে অকালমৃত্যুর [1 Aug 1846] পর ঋণভারগ্রস্ত ব্যবসা ও জমিদারি দেখাশোনা করতেন দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ। সম্পত্তির আর এক অংশীদার ছিলেন দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ। কিন্তু নিঃসন্তান নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে 24 Oct 1858 তারিখে। দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথকে রেখে ইতিপূর্বেই 19 Dec 1854 গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। নিঃসন্তান গণেন্দ্রনাথ [মৃত্যু: 16 May

1869] ও তিন পুত্রের জনক গুণেন্দ্রনাথ [মৃত্যু; 3 Jun 1881]ও দীর্ঘজীবী ছিলেন না। গুণেন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়ে তাঁর তিন পুত্র গগনেন্দ্রনাথ সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ নাবালক ছিলেন। ফলে এজমালি জমিদারি পরিচালনার অধিকার ও দায়িত্ব ছিল পরিবারের কর্তা দেবেন্দ্রনাথের উপর, যিনি বিভিন্ন সময়ে নানা জনকে এই কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। বর্তমান সময়ে এই দায়িত্ব অর্পিত ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। নগেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা হওয়ার পর সম্পত্তিতে দেবেন্দ্রনাথের অংশ ছিল ৫/৯ ভাগ ও গিরীন্দ্রনাথের বংশধরদের অংশ ছিল ৪/৯ ভাগ।

আমরা জানি, দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব সম্পত্তির বাঁটোয়ারা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি উইল করেন [যদিও তার সব-কয়টি পাওয়া যায় নি]—কিন্তু এজমালি সম্পত্তি বিভাগের প্রশ্নটি এতদিন অমীমাংসিত ছিল। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ কয়েকবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রেরা সাবালকত্ব অর্জন করেছেন। সুতরাং সম্পত্তি-বিভাগের প্রশ্নটি এই সময়ে উত্থাপিত হল। সম্ভবত পূর্বেই কোনো সময়ে মৌখিকভাবে স্থির হয়েছিল যে, ডিহি সাজাদপুর জমিদারীটি পাবেন গুণেন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা। স্বভাবতই তাঁদের পরমর্শদাতারা অন্যান্য ছোটখাটো তালুকের দিকে নজর দিয়ে সম্পত্তি বাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। অশান্তির সূত্রপাত এইখানে। অশান্তির প্রকৃতিটি বোঝা যায় অনেক পরে [? অগ্র° ১৩০৭: Nov 1900] গগনেন্দ্রনাথকে লিখিত একটি তারিখ-হীন পত্রে:

> ...এজমালি সম্পত্তিতে আমাদের কোন স্বার্থ নেই—বাবামশায়ের প্রতি বিশ্বাস পালনই একমাত্র লক্ষ্য।
>
> যে ক'টি বিষয়ে তোমাদের স্পষ্টই লোকসান কেবল সেই ক'টির পরিবর্ত্তে তোমরা গালিমপুর চেয়েছ—এতে যে কেবল শান্তিনিকেতনের পক্ষে গালিমপুর লোকসান তা নয়, শিলাইদহ্ এবং কুমারখালি কুঠিবাড়িতে তোমাদের কাছ থেকে যে প্রাপ্য আছে তাও লোকসান দিতে হবে। কালিগ্রামের দাদনী টাকার শেষ অবশেষের অনেক অংশই আদায়ের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, সেও তোমরা দিতে চেয়েছ—কিন্তু সেটা কাগজে যে রকম দেখাবে কাজে সে রকম হবে না। কুঠিবাড়ির মালমসলা সম্বন্ধে যে দাবি করেছ, তার বিরুদ্ধে আমাদের তরফের দাবিও অনেকগুলি দেখাবার ছিল। বোধহয় তোমরা নিজেও জান তোমরা যে প্রস্তাব করেছ বৈষয়িক হিসাবে সে রকম প্রস্তাবকে তোমরা নিজেও কখনো গ্রাহ্য করতে পারতে না। কিন্তু লাভের চেয়ে শান্তি ভাল—অনেক সময়ে ন্যায্য দাবির চেয়েও সেটা প্রার্থনীয়। বাবামশায় তোমাদের প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি কোন রকমের বিরোধ চাননা—তোমরা যদি তোমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবকেই ন্যায়সঙ্গত মনে কর তাহলে আমাদের তরফ থেকে লেশমাত্র আপত্তি করব না।[১২]

—বর্তমান সময়েও এইরূপ অশান্তির অভাব ছিল না বলেই মনে হয়। ৭ শ্রাবণে প্রেরিত চিঠিটি ও এই ধরনের আরও চিঠি এই অশান্তির সংবাদ ও উপকরণ বহন করে নিয়ে আসতে পারে, চৈতালি-র শেষ দিকের কবিতাগুলিতে তার ক্ষতচিহ্ন থেকে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ১১ শ্রাবণ 'শান্তিমন্ত্র' কবিতায় লেখেন: 'কাল আমি তরী খুলি লোকালয়মাঝে/ আবার ফিরিয়া যাব আপনার কাজে—' কিন্তু তিনি কলকাতায় ফেরেন সম্ভবত ১৫ শ্রাবণের (বুধ 29 Jul] পর। ১৮ শ্রাবণ [শনি 1 Aug] সত্যপ্রসাদ 'রবীবাবু, বলুবাবু ও সুরেনবাবু (Tagore &Coর Proprietor) তিনজনকে...শতকরা বার্ষিক ৯্ টাকা সুদে (হ্যাণ্ড নোট)...৬০০০্ টাকা ধার দেন, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ২৭ শ্রাবণ [সোম 10 Aug] রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথকে ১৫০০ টাকা করে 'সাহায্য' দেওয়ার হিসাব সরকারী ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়।

8 Aug [শনি ২৫ শ্রাবণ] মহর্ষি জমিদারি ও পারিবারিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করে আমমোক্তারনামা [Power of Attorney] স্বাক্ষর করেন। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত এই দলিলে [Tagore Family Papers, Doc. No. 68]-র উপরে লেখা: Power of Attorney from Debendranath Tagore to

Rabindranath Tagore on 8th August 1896 in the presence of Mohini Mohan Chatterjee, Solicitor, Cal./Presented between the hours 10 to 11 on the 8th Aug 1896. এই দলিলের বলে সম্পত্তি-বিভাগে ও জমিদারি-পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করেছেন।

এই বিষয়টি নিয়ে কয়েকদিন তিনি যে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, তার নিদর্শন পাওয়া যায় ক্যাশবহির কয়েকটি হিসাবে: 'শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু বালিগঞ্জ যাতায়াতের' [২২ শ্রাবণ] 'পার্কষ্ট্রীট হইতে আসিবার' [২৪ শ্রাবণ], 'রবীন্দ্রবাবু ও সত্যবাবুর হাইকোর্ট ও বালিগঞ্জ যাতায়াতের গাড়িভাড়া' [২৫ শ্রাবণ], 'রবীন্দ্রবাবু ও সত্যবাবুর মোহিনীবাবুর আফিসে যাতায়াতের গাড়িভাড়া' ইত্যাদি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রেও তিনি 'আজকাল কিছু বিশেষ ব্যস্ত আছি', 'সম্প্রতি বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া কিছু উদ্‌ভ্রান্তভাবে আছি', 'কাজের ভিড় পড়িয়াছে' ইত্যাদি কথা লিখেছিলেন।[১৩]

8 Aug [শনি ২৫ শ্রাবণ] রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম দুটি ছাত্রপাঠ্য পুস্তক প্রকাশিত হল: সংস্কৃত শিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদক ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য [বিদ্যারত্ন]-এর সম্পাদনায় গ্রন্থ-দুটি প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্র রচনাবলী অচলিত সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়' থেকে জানা যায়:

'সংস্কৃত শিক্ষা' প্রথম ভাগ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তকতালিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ একই সঙ্গে (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগস্ট) বাহির হয়। প্রথম ভাগের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪২, দ্বিতীয় ভাগের ৩৪। দুই ভাগেরই মূল্য তিন আনা করিয়া ছিল। দুই খণ্ডই হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

সংস্কৃত শিক্ষা।/ দ্বিতীয় ভাগ।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/ বাল্মীকি-রামায়ণ অনুবাদক/ শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত।/ Calcutta:/ PRINTED AND PUBLISHED BY/ J. N. BANERJEE & SON, BANERJEE PRESS,/ 119, OLD BOYTAKHANA BAZAR ROAD./ 1896.

এই খণ্ডে ভূমিকা, নিবেদন ইত্যাদি কিছু নেই, সম্ভবত প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি, লক্ষ্য প্রতি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একথা আমরা আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। স্কুলটি অবস্থিত ছিল গগনেন্দ্রনাথদের বৈঠকখানা বাড়িতে ['তেতালা বাটী']। বর্তমান বৎসরের ক্যাশবহিটি রক্ষিত হওয়ায় এই স্কুল সম্পর্কে কিছু-কিছু খবর পাওয়া যায়। ৬ জ্যৈষ্ঠের [সোম 18 May] হিসাবে আছে: 'ব°বাবু রজনীকান্ত [মোহন] চট্টোপাধ্যায় দং তেতালা বাটীর স্কুলের বৈশাখ মাসের দান শোধ গুঃ গণেশচন্দ্র ঘোষাল ৫০ / ব° বিপ্রদাস সান্যাল দং বৈশাখ মাসের দান শোধ গুঃ খোদ ৩ /৫৩'। এই সংক্রান্ত আরও হিসাব ক্যাশবহিতে আছে।

আমাদের অনুমান, 'সংস্কৃত শিক্ষা' এই স্কুলের জন্য লিখিত হয়েছিল। উপক্রমণিকা মুখস্থ করে সংস্কৃত ভাষা শেখার প্রচলিত পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না। পরবর্তী কালে প্রকাশিত 'সংস্কৃত প্রবেশ' প্রথম ভাগ [1904]-এর 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে লেখেন:

ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্ব্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষাশিক্ষার সদুপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না।

এইজন্য আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত-পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

তাহাতে গোড়া হইতে প্রয়োগশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষাশিক্ষা ও ভাষার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আমার যে স্বল্পমাত্র অধিকার আছে, তাহাতে আমার দ্বারা কিছুদূর পর্য্যন্ত প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই শোভা পায়—সঙ্কটের আশঙ্কা করিয়া তাহার অধিক অগ্রসর হইতে পারি নাই।

এইজন্য পরে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের 'সংস্কৃতশিক্ষার সুপ্রণালী'র আদর্শস্বরূপ সংস্কৃত প্রবেশ প্রথমে কিয়দংশ রচনা করে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। বর্তমান ক্ষেত্রে সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

সম্ভবত 'শ্রীহট্টের টোলে-পড়া পণ্ডিত' শিবধন বিদ্যার্ণবকে রবীন্দ্রনাথ এই স্কুলে সংস্কৃত পড়াবার কাজে নিযুক্ত করেন। ২৩ ভাদ্র [7 Sep] তারিখের হিসাব; 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের শিবধন বিদ্যার্ণবের দীক্ষার জন্য পার্ক স্ট্রীট যাওয়ার গাড়িভাড়া' উভয়ের যোগাযোগের প্রমাণ। এইদিন শিবধন বিদ্যার্ণব মহর্ষির কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের সন্তানদের ও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সংস্কৃত-শিক্ষক রূপে তিনি অনেকদিন নিযুক্ত ছিলেন। আমরা পরে দেখব, 'সংস্কৃত শিক্ষা'র আরও দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল—তখন শিবধন বিদ্যার্ণব তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন।

ভাদ্র মাস ও আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন। জমিদারি বিভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং তার বন্দোবস্ত করার জন্য তাঁর অ্যাটর্নি-ব্যারিস্টারের বাড়ি ও পিতাকে অবহিত রাখার জন্য পার্ক স্ট্রীট যাতায়াতের অনেক হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। এর উপরে ঠাকুর কোম্পানির কাজ ছিল, সেই উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য সত্যপ্রসাদকে বা বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে বালিগঞ্জে যাওয়ার খবরও ক্যাশবহিতে আছে। ২ ভাদ্র মহর্ষি এই ব্যবসা উপলক্ষে তাঁকে ও বলেন্দ্রনাথকে আবার ৫০০০ টাকা করে 'দান' করেন। তখন মাসোহারা ১৫০্ ও 'পরগণা, ও বাড়ির কার্য্যের জন্য' ২০০্ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মাসিক আয় ৩৫০্ টাকা মাত্র এবং বীরেন্দ্রনাথের মাসোহারা ১৫০্ টাকাই বলেন্দ্রনাথের সম্বল। সুতরাং ঠাকুর কোম্পানির অংশীদারী মূলধনের জন্য তাঁদের সর্বদাই মহর্ষির 'দান' বা 'সাহায্য'-এর উপর নির্ভর করতে হয়েছে, সময়বিশেষে তাঁদের 'মহাজন' সত্যপ্রসাদের কাছ থেকে ধার করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করেন, অবশ্য তাঁকে ও তাঁর পিতামাতাকেও বারবার ঋণের জন্য সত্যপ্রসাদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

ঠাকুর কোম্পানির ব্যবসায়ের চিত্রটি স্পষ্ট করা দুরূহ। এই সংক্রান্ত কাগজপত্র, চিঠি ইত্যাদি খুব কমই রক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'মফস্বল হইতে ভুষি মাল ও পাট কিনিয়া 'বাঁধি' কারবার দিয়া সূত্রপাত হয়। কিছুকাল পরে আখমাড়াই কলের কাজেও তাঁহারা হাত দেন। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে আখের চাষ ভালোই ছিল ও গ্রামে-গ্রামে আখমাড়াই হইত। সে-সময়ে আখমাড়াই কলের একমাত্র সরবরাহক ছিল রেনউইক নামে এক ব্রিটিশ কোম্পানি। তাহাদের দালাল গ্রামে গ্রামে তাহাদের কল বিলি

করিত। ঠাকুর কোম্পানি এই বিদেশী কোম্পানির সহিত প্রতিযোগিতায় নামিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের একচেটিয়া ব্যবসা ভাঙিয়া দিতে সমর্থ হইলেন।'[১৪]

ঠাকুর কোম্পানি অন্যের সাহায্যে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে আগ্রহী ছিল, আদালতের নথির সাহায্যে তার একটি বিবরণ দিয়েছেন 'চিত্রগুপ্ত' তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের চামড়া ব্যবসা ছিল' প্রবন্ধে [দ্র যুগান্তর, 11 Jun 1979]। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় কাঁচা চামড়া ক্রয়বিক্রয়ের জন্য হর অ্যাণ্ড কোম্পানি নামে চার নম্বর মুন্সীবাজারে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন—ঠাকুরপরিবারের বিশ্বস্ত সারদাচরণ হর ছিলেন এই কোম্পানির ম্যানেজার। শেখ রহম আলি ও ফকির মহম্মদের অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত ২১ কাশীনাথ মল্লিক লেনের গোলাম পাঞ্জেতুন অ্যাণ্ড কোম্পানি হর কোম্পানির কাছ থেকে কাঁচা চামড়া কিনত। Aug-Sep 1896-এ তারা ২৭০০ টাকার চামড়া কিনেছিল হর কোম্পানির কাছ থেকে। বারংবার তাগাদার পর ১৪০০ টাকা শোধ হয়, কিন্তু বাকি টাকার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ চারজন অংশীদার 15 Dec 1896 [১ পৌষ] মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে যে ওকালতনামা লিখে দেন, 'চিত্রগুপ্ত' তার একটি লিপিচিত্র দিয়েছেন। 21 Dec বকেয়া ১২৫২ টাকার জন্য মামলা রুজু হয়। বিচারপতি স্টিফেন জর্জ সেলের এজলাসে শেখ রহম আলি ও ফকির মহম্মদ চারটি সমান কিস্তিতে বকেয়া টাকা পরিশোধের অঙ্গীকার করলে মামলাটির নিষ্পত্তি হয়। ঘটনাটি তুচ্ছ, কিন্তু ঠাকুর কোম্পানি ব্যবসায়ের ব্যাপকতা বোঝার পক্ষে মূল্যবান।

জমিদারির সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করলেও বৈষয়িক ব্যাপারে পিতার কাছে রবীন্দ্রনাথের অধীনতাটি লক্ষণীয়। ২ ভাদ্রের একটি হিসাব: 'রবীন্দ্রবাবুর মাস্কাবার লইয়া পার্কস্ট্রীট যাতায়াতের গাড়িভাড়া', ৩ আশ্বিনের হিসাবে আছে: 'বৈকালে মাস্কাবার লইয়া রবীন্দ্রবাবুর পার্কস্ট্রীট যাতায়াত গাড়িভাড়া'—এই দিন সকালেও তিনি পার্ক স্ট্রীটে পিতার কাছে গিয়েছিলেন। 'মাস্কাবার' হচ্ছে জমিদারি, পারিবারিক বা আদি ব্রাহ্মসমাজের মাসিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্তসার—মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় থাকলে এই হিসাব মহর্ষির কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর অনুমোদন লাভ করা রবীন্দ্রনাথের অবশ্যকর্তব্য ছিল, তাঁর অনুপস্থিতিতে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো সেরেস্তার কোনো প্রধান কর্মচারী এই কাজ করতেন। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে লিখেছেন: 'বড়ো বয়সে কাজের ভার পাইয়া যখন তাঁহার কাছে হিসাব দিতে হইত সেইদিনের কথা এইখানে আমার মনে পড়িতেছে। তখন তিনি পার্ক স্ট্রীটে থাকিতেন। প্রতি মাসের দোসরা ও তেসরা আমাকে হিসাব পড়িয়া শুনাইতে হইত। তিনি তখন নিজে পড়িতে পারিতেন না। গত মাসের ও গত বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয়া সমস্ত আয়ব্যয়ের বিবরণ তাঁহার সম্মুখে ধরিতে হইত। প্রথমত মোটা অঙ্কগুলা তিনি শুনিয়া লইতেন ও মনে মনে তাহার যোগবিয়োগ করিয়া লইতেন। মনের মধ্যে যদি কোনোদিন অসংগতি অনুভব করিতেন তবে ছোটো ছোটো অঙ্কগুলো শুনাইয়া যাইতে হইত। কোনো কোনো দিন এমন ঘটিয়াছে, হিসাবে যেখানে কোনো দুর্বলতা থাকিত সেখানে তাঁহার বিরক্তি বাঁচাইবার জন্য চাপিয়া গিয়াছি, কিন্তু কখনো তাহা চাপা থাকে নাই। হিসাবের মোট চেহারা তিনি চিত্তপটে আঁকিয়া লইতেন। যেখানে ছিদ্র পড়িত সেখানেই তিনি ধরিতে পারিতেন। এই কারণে মাসের ওই দুটা দিন বিশেষ উদ্‌বেগের দিন ছিল।'[১৫] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভাদ্র মাস থেকে সত্যপ্রসাদকে জোড়াসাঁকো সেরেস্তার কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়, তিনি প্রতিদিনের হিসাবে 'Examined' লিখে সই করার পর রবীন্দ্রনাথ প্রতিস্বাক্ষর [Countersign] করতেন।

কোনো পত্রিকার আহ্বান না থাকাতে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা তো নেই-ই, ১৫ শ্রাবণ [29 Jul] চৈতালি-র শেষ কবিতা রচিত হওয়ার পর কাব্যরচনার স্রোতও রুদ্ধ। এই সময়ে তিনি রচনা করলেন অনেকগুলি ব্রহ্মসংগীত। এইগুলি লেখার কোনো অব্যবহিত উপলক্ষ ছিল কি না আমাদের জানা নেই, কিন্তু এই গানগুলির অধিকাংশই বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। দেখা যায়, এই সময়ে রচিত ন'টি ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে অন্তত ছ'টি গান হিন্দি গান ভেঙে রচিত হয়েছিল। আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ভালো হিন্দি গান শোনার সুযোগ কলকাতাতেই পেতেন, ফলে তাঁর অধিকাংশ হিন্দি গান-ভাঙা ব্রহ্মসংগীত কলকাতাতেই রচিত হয়েছে। এই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের বেতনভোগী গায়ক ও সংগীতশিক্ষক ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী [1863-1924]। সম্ভবত এঁর গাওয়া গান ভেঙেই এই ব্রহ্মসংগীতগুলি রচিত হয়। গানগুলির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় মজুমদার-পুঁথিতে, একটি ছাড়া কোনোটিতেই রচনার তারিখ নেই, কিন্তু পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠায় রচিত গানগুলির বিন্যাস থেকে এদের রচনার সময় অনুমান করা যায়। যেমন, পাণ্ডুলিপির 66-67 পৃষ্ঠায় চৈতালি-র 'আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে' কবিতাটি [কয়েকটি ছত্র বাদ দিয়ে এর একটি গীতরূপও আছে, দ্র গীত ১। ১০৯, স্বর ২২] লেখা হয়েছে, চৈতালি কাব্য-অনুযায়ী এর রচনা-তারিখ ১৪ শ্রাবণ [মঙ্গল 28 Jul]। এর অব্যবহিত পূর্বের দু'টি পৃষ্ঠায় কয়েকটি মূল হিন্দি গান ও সেগুলি ভেঙে রচিত বাংলা গান লেখা। এইজন্য এগুলি ১৪ শ্রাবণের পূর্বে রচিত বলে অনুমান করা যায়। ১৩০২-এর মাঘোৎসবে এগুলি গীত হয় নি, সুতরাং আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩০৩-এ এগুলির রচনা অনুমান করলে ভুল হয় না। অনুরূপভাবে 69 পৃষ্ঠায় রচিত 'কে যায় অমৃতধামযাত্রী' গানটির নীচে তারিখ আছে '২৯ শে ভাদ্র ১৩০৩' [রবি 13 Sep]—কাজেই 67-69 পৃষ্ঠায় রচিত পাঁচটি গান ১৪ শ্রাবণ থেকে ২৯ ভাদ্রের মধ্যে রচিত বলে ধরে নেওয়া যায়। এদের মধ্যে 'ব্যাকুল প্রাণ কোথা সুদূরে ফিরে' ও 'আমার সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও' গান দু'টি ছাড়া বাকি গানগুলি ১৫ আশ্বিনে প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থাবলী-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এই তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য। গানগুলি হল: [১] ইমনকল্যাণ—একতালা। শীতল তব পদ ছায়া দ্র গীত ১। ১৮৬; কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪৬৯; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪; স্বর ২৩; মূল গান: বাঙ্গুরি মোরি মুরগই জিন ছুও লঙ্গরবা দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮৬। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে পাঠ লিখেছিলেন: অমৃত তব বাণী।

[এই পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ আর একটি হিন্দি গানের বাণী লিখে রেখেছেন: 'কোনন বে লে, এরী যহাঁ মোরাঁ' ইত্যাদি—কিন্তু এটি ভেঙে নূতন গান রচনার চেষ্টা করেন নি। অপরপক্ষে 65 পৃষ্ঠায় বেহাগ রাগের 'ঠকুরিয়া অচরা মোরে ছাড়িদে' সম্পূর্ণ গানটি লিখে শুধু প্রথম ছত্রে 'নিশিদিন জাগিয়া আছ নাথ হে' কথা বসিয়ে আর অগ্রসর হন নি। এই পৃষ্ঠাতেই 'প্যারি তোরে পাবানা পকারো' ইত্যাদি গানটি লিখে প্রতিটি ছত্রের উপরে কথা বসিয়েছেন: 'আজি হৃদি আসনে তোমারে করি অভিষেক' ইত্যাদি। কিন্তু এই পাঠ তাঁর পছন্দ হয় নি, তাই নীচে সমস্ত গানটি নতুন করে লিখেছেন: 'আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব'—এর মধ্যেও পাঠ পরিবর্তনের চিহ্ন রয়েছে। এখানে একটি বিষয় বিচার করে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে হিন্দি গানগুলির যে পাঠ লিখেছেন, 'সঙ্গীতমঞ্জরী' 'গীতসূত্রসার' প্রভৃতি গ্রন্থ-ধৃত পাঠ তার থেকে ভিন্নতর—রবীন্দ্রনাথ-লিখিত অনেক পাঠ আবার অর্থশূন্য। তা হলে তিনি কি গান শোনার সময়ে এইগুলি লিখে নিতেন? অনেক শব্দে মীড়, কম্পন, তাল ইত্যাদির চিহ্ন থেকে সেই রকমই মনে হয়। আবার সুরের কাঠামোটি পরে ভুল যাওয়ার ফলেই সম্ভবত অনেকগুলি গান পরিত্যক্ত হয়েছে।]

[২] বেহাগ-ধামার। আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব দ্র গীত ৩। ৮৪৫; কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪৬৯; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৫; স্বর ২৬; মূল গান: প্যারী তেরে পায়ন পকরুঁ গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৪১;

[৩] বাগেশ্রী—আড়াঠেকা। তোমা-হীন কাটে দিবস হে প্রভু দ্র গীত ১। ১৭৭; কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪৬৯; স্বরলিপি নেই; মূল গান: তুম বিন কৈসে দ্র ত্রিবেণী-সংগম। ২৭;

[৪] ভূপালি—মধ্যমান। ব্যাকুল প্রাণ কোথা সুদূরে ফিরে দ্র গীত ১। ১৭৫; কাব্য গ্রন্থাবলী-তে নেই; স্বরলিপি নেই; মূল গান: ব্যাহণ লিয়ে বন দ্র ত্রিবেণী-সংগম। ৩০;

[৫] হৃদয়-আবরণ খুলে গেল দ্র গীত ৩। ৮৫৭; কাব্যগ্রন্থাবলী-তে নেই; স্বরলিপি নেই; মূল গান: নইরে মা বরণ কোয়েলিয়া দ্র ত্রিবেণী-সংগম। ৩৪;

এই গানটি রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত অন্য কোনো পাণ্ডুলিপিতে নূতন করে লেখেন। সেই পাঠটিই বহুল প্রচারিত:

বাহার—আড়াঠেকা। এ কি করুণা করুণাময় দ্র গীত ১। ১৮২; কাব্যগ্রন্থাবলী। ৪৬৯; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪; স্বর ৪;

[৬] দেশ—একতালা। আমার সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও দ্র গীত ১। ৫৬-৫৭; কাব্য গ্রন্থাবলী-তে নেই; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪-৭৫; স্বরলিপি নেই;

[৭] তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল। মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ দ্র গীত ১। ২১৪; কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪৬৯; তত্ত্ব°, ফাল্গুন ১৮২০ শক [১৩০৫]। ১৯৫; স্বর ৪; মূল গান: কৌন রূপ বনে হো রাজাধিরাজ দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৪৮;

[৮] হাম্বীর—তেওরা। আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম দ্র গীত ১। ১৭০; কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪৬৯; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪; স্বর ২২;

[৯] বেহাগ—চৌতাল। কে যায় অমৃতধামযাত্রী দ্র গীত ১। ১১০; কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪৬৯; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৫; স্বর ২৪। মজুমদার-পুঁথিতে রাগিনী 'ভূপালি'।

এই গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন রামমোহন রায়ের ৬৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে। এই উপলক্ষে স্মরণসভাটি হয় ১২ আশ্বিন [রবি 27 Sep] মির্জাপুর স্ট্রীট-স্থ সিটি কলেজ ভবনে। রাজা পিয়ারীমোহন। মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয় দুপুর আড়াইটায়। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য একতলায় কলেজ প্রাঙ্গণে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আর একটি সভার আয়োজন করতে হয়।

সভার প্রথম বক্তা ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কালীবর বেদান্তবাগীশ, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'He spoke for about an hour and all the while kept the whole audience spell-bound by that marvellous power of his oratory which has made him the idol of Young Bengal, as a writer in the Calcutta Review very aptly remarked sometime ago. It may be noted here that as the desire to hear the speech of Rabindra Nath was tumultuously expressed by a large body of men at the overflow meeting below, the speaker had not a very easy time of it, for he had to make a second speech at the

overflow meeting. The address at the main meeting was simply charming and elicited frequent and deafening cheers. ...The proceedings were brought to a close with a song by Babu Rabindra Nath Tagore.'[১৬]

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার্থে আনন্দমোহন বসুকে সম্পাদক ও উমেশচন্দ্র দত্তকে সহকারী সম্পাদক করে যে কমিটি গঠন করা হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি 'রামমোহন রায়' নামে কার্তিক-সংখ্যা [পৃ ৪৪৮-৫৮] ভারতী-তে মুদ্রিত হয় [দ্র ভারতপথিক রামমোহন। ৮২-১০১]।

কাব্য গ্রন্থাবলী মুদ্রণের আয়োজন জ্যৈষ্ঠ মাসেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা আমরা পূর্বেই প্রভাতকুমারের পত্র থেকে জানতে পেরেছি। সত্যপ্রসাদ ছিলেন এই গ্রন্থের প্রকাশক। তিনি এর বিজ্ঞাপন দিলেন এক নূতন পদ্ধতিতে। তাঁর নিজস্ব হিসাব-খাতায় ৯ ভাদ্রের [সোম 24 Aug] হিসাব: 'রবীবাবুর গ্রন্থাবলী পুস্তকের বিজ্ঞাপন জন্য Post Card—৫ৃ'—সম্ভাব্য বিশিষ্ট ক্রেতাদের কাছে মুদ্রিত পোস্টকার্ডের মাধ্যমে পুস্তক-প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ তখনকার দিনে অভিনব বলতে হবে। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় আশ্বিন মাসের ১৫ তারিখে [বুধ 30 Sep]।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্র খুবই সংক্ষিপ্ত:

কাব্য গ্রন্থাবলী /শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/মূল্য ৬ টাকা।

আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায়:

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়/প্রকাশক /কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।/ ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।/ ১৫ই আশ্বিন ১৩০৩।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+৮+৪৭৬। মুদ্রণসংখ্যা: ১০০০।

বড় আকারের [১০ ১/২"x৮ ১/২"] বই বলে এটি টালি-সংস্করণ নামে অভিহিত।

রবীন্দ্রনাথ এর 'ভূমিকা'য় লেখেন:

আমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ একত্র প্রকাশিত হইল। এজন্য আমার স্নেহভাজন প্রকাশকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।

অনেক সময় কবিতা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে রচনাগুলি পরস্পরের সাহায্যে স্ফুটতর সম্পূর্ণতর হইয়া দেখা দেয়, লেখকের মর্ম্মকথাটি পাঠকের নিকটে সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে। একবার লেখকের সমস্ত রচনার সহিত সেইরূপ বৃহৎভাবে পরিচয় হইয়া গেলে, তখন, প্রত্যেক স্বতন্ত্র লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারে।

এই গ্রন্থে কবিতাগুলি কালক্রমানুসারে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথমাংশে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। কৈশোরক আখ্যায় যে সকল কবিতা বাহির হইয়াছে তাহা লেখকের পনেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫। ১৬ বৎসর বয়সের লেখা—আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক পরবর্ত্তী কালের লেখাও আছে—এগুলি বিষয় প্রসঙ্গে একত্রে ছাপা হইল। গ্রন্থশেষে যে সমস্ত গান প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

গান ও গীতি নাট্যগুলি পাঠযোগ্য কবিতা নহে কেবল গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণতা নিবারণার্থে প্রকাশকের অনুরোধে এই গ্রন্থে স্থান পাইল।

"চৈতালি" শীর্ষক কবিতাগুলি লেখকের সর্ব্বশেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্র মাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।

গীতিগ্রস্থ ও গীতিনাট্য ব্যতীত এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য পুস্তকে যে সকল গান বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে সূচিপত্রে তাহাদিগকে তারা-চিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল। অনেক গুলি গানের সুর আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য লেখকের বাল্যরচনা। 'বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত সারদামঙ্গল কাব্য হইতে ইহার কতক কতক ভাব এমন কি, ভাষা সংগ্রহ করিয়া ছিলাম—সেজন্য কবির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

—রবীন্দ্রনাথ এই 'ভূমিকা'র নীচে তারিখ দিয়েছেন '১৫ আশ্বিন, ১৩০৩', কিন্তু এটি নিশ্চয়ই তার পূর্বে লেখা।

কাব্য গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর কার্তিক-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে পূর্ণপৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়:

প্রতিমূর্ত্তি সমেত/রবীন্দ্র বাবুর কাব্য গ্রন্থাবলী/প্রকাশিত হইয়াছে/ ইহাতে "কৈশোরক", "ভানুসিংহ", "বাল্মীকি প্রতিভা", "সন্ধ্যা সঙ্গীত", "প্রভাত সঙ্গীত", "প্রকৃতির প্রতিশোধ", "ছবি ও গান", "কড়ি ও কোমল", "মায়ার খেলা", "মানসী", "রাজা ও রাণী", "বিসর্জ্জন" "সোণার তরী", "চিত্রাঙ্গদা", "বিদায় অভিশাপ", "চিত্রা", "মালিনী" নাটক, "চৈতালি", "গানের বহি", "অনুবাদ",—এই কুড়ি খানি কাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। আকার ডিমাই অকটেভো, ১২২ ফর্ম্মা

এই গ্রন্থাবলী তিন প্রকার সংস্করণে বাহির হইতেছে।

সুলভ সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর আধুনিক একখানি প্রতিমূর্ত্তি আছে, কাগজের বাঁধা, মূল ৬্।

মধ্যম সংস্করণ—ইহাতে রবীন্দ্র বাবুর বিলাতে "কৈশোরক" রচনা কালের, অভিনয় সময়ের "বাল্মীকি" ও "রঘুপতি" সাজের ও আধুনিক—এই চারিখানি ছবি, এবং স্বহস্তাক্ষরে লিখিত একটি নূতন কবিতা সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১০্।

উৎকৃষ্ট সংস্করণ—ইহাতে উল্লিখিত ছবি হস্তাক্ষর ব্যতীত কবির পদ্মাতীরস্থ তরিপ্রবাস ও কবির জন্ম নিবাসের চিত্রদ্বয় সন্নিবেশিত আছে। উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট মরক্কোয় বাঁধা। মূল্য ২৫্।

আমার নিকট প্রাপ্তব্য শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, জোড়াসাঁকো কলিকাতা।

—বিজ্ঞাপনটি তত্ত্ববোধিনী-র পরবর্তী অনেকগুলি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। গ্রন্থটি সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্য এই বিজ্ঞাপনে আছে। *The Amrita Bazar Patrika*-র অনেকগুলি সংখ্যায় এই একই বিজ্ঞাপন দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছে।

'চৈতালি' ও 'মালিনী' কাব্য গ্রন্থাবলী-তে প্রথম প্রকাশিত হয়। মধ্যম ও উৎকৃষ্ট সংস্করণে চৈতালি কাব্যারম্ভের পূর্ব পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে 'তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি' ছ'টি ছত্রের একটি কবিতা মুদ্রিত হয়। বিজ্ঞাপনের বক্তব্য অনুসারে এটি 'একটি নূতন কবিতা'।

সন্ধ্যাসংগীতের পূর্বে রচিত ভগ্নহৃদয়, রুদ্রচণ্ড ও শৈশবসঙ্গীত গ্রন্থ থেকে ৪০টি কবিতা বা গান 'কৈশোরক' অংশে সংকলিত হয়েছে। কিছু পাঠের পরিবর্জন ও পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী ও চিত্রা—এই পূর্ব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে কিছু-কিছু কবিতা বর্জিত হয়েছে, কোথাও-কোথাও যথেষ্ট পাঠ-সংস্কারও লক্ষণীয়। প্রভাতসংগীত এবং কড়ি ও কোমল-এর অনুবাদ কবিতাগুলি একটি স্বতন্ত্র 'অনুবাদ' বিভাগে সংকলিত হয়—এখানেও দু'টি কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি করে কবিতা বর্জিত।

রাজা ও রানী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি নাটকের পাঠ কাব্য গ্রন্থাবলী-তে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত—বিশেষত বিসর্জন নাটকটি এখানে নূতন রূপ লাভ করেছে। ছন্দ, ভাষা ও নাট্যসংস্থানের ব্যাপক পরিবর্তনে এটি প্রথম সংস্করণের বহু ত্রুটি কাটিয়ে উঠেছে। অবশ্য বিসর্জন নাটক পরেও কয়েকবার পুনর্লিখিত হয়েছে।

সংগীত-সংকলনটি এখানে 'গান' ও 'ব্রহ্মসঙ্গীত' এই দুটি ভাগে বিভক্ত—জাতীয় সংগীতের জন্য আলাদা কোনো বিভাগ নেই। 'গান' অংশে ১১৯টি ও 'ব্রহ্মসঙ্গীত' অংশে ১৬৩টি [সূচীপত্রে দু'টি গানের প্রথম ছত্র ভ্রমক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়নি]—মোট ২৮২টি গান এই বিভাগে মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কাব্য ও নাটকের

অন্তর্ভুক্ত গানের সংখ্যা [৭৩+বাল্মীকি প্রতিভা ৫৪+মায়ার খেলা ৬১] ১৮৮টি। সুতরাং কাব্য গ্রন্থাবলী-তে মোট ৪৭০টি গান মুদ্রিত হয়েছে।

'মালিনী' [পৃ ৩৯১-৪০৬] ও 'চৈতালি' [পৃ ৪০৭-২৮] কাব্য গ্রন্থাবলী-তে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'চৈতালি'-র ৭৯টি কবিতা ১১ চৈত্র ১৩০২ থেকে ১৫ শ্রাবণ ১৩০৩-এর মধ্যে রচিত। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে চৈতালি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আমরা আগেই বলেছি, মালিনী নাটকের রচনাকাল সুনির্দিষ্টরূপে আমাদের জানা নেই। রবীন্দ্রজীবনী-কার উল্লিখিত রচনাকাল [? বৈশাখ ১৩০৩] আমরা কেন গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না তার কারণও বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রকাশের ক্রম থেকে মনে হয়, মালিনী চৈতালি-র আগে রচিত হয়েছিল। মালিনী-র পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত প্রভাতকুমারকে দান করেন। প্রভাতকুমার ১৮ আষাঢ় ১৩০৬ [2 Jul 1899] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'নূতন গল্পের [চোখের বালি] original ms.টি যেন আর কাহাকেও দিবেন না।—আর তাহার মার্জিনে মার্জিনে আপনার যে সময়ের যা মনোভাব তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন যথা মালিনীর খসড়ায় এক স্থানে লেখা আছে—"বড়ই নির্জন সঙ্গীহীন।" (sotto voce—কম আবদার নয়!)[১৬ক] পাণ্ডুলিপিটি এখনও পাওয়া যায় নি—পেলে অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধান হত হয়তো।

চারটি দৃশ্যে বিভক্ত [কাব্য গ্রন্থাবলী-তে চতুর্থ দৃশ্যটি ভ্রমক্রমে পঞ্চম দৃশ্য-রূপে চিহ্নিত] ৯৫৯ ছত্রের সমিল প্রবহমান পয়ারে নাটকটি রচিত।

রচনাবলী-সংস্করণ মালিনী-র 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, মালিনী নাটিকার উৎপত্তি স্বপ্নে। 1890-তে [১২৯৭] লণ্ডনে থাকার সময়ে প্রিমরোজ হিলে তারকনাথ পালিতের বাসায় আবিল ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখেন: 'যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।'

এই স্বপ্নবৃত্তান্ত মালিনী নাটকের পরিণাম দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মূল কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন বৌদ্ধ সাহিত্যে মহাবস্তাবদানের অন্তর্গত 'মালিন্যবস্তু' থেকে। অবশ্য মূল মহাবস্তাবদান রবীন্দ্রনাথের পড়া ছিল না—পড়ার সুযোগও ছিল না তখন, তিনি কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন ড রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থের অন্তর্গত Mahávastu-Avadána-এর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কৃত সংক্ষিপ্তসার 'The Story of Malini' [p. 121] থেকে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই বইয়ের একটি কপি আছে, যার আখ্যাপত্রটি হল:

THE/SANSKRIT BUDDHIST LITERATURE/OF/NEPAL/BY/RÁJENDRALÁLA MITRA, LL.D., C. I.E./ CALCUTTA:/ PRINTED BY J.W. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS./ AND PUBLISHED BY/ THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL, 57, PARK STREET./ 1882.

আখ্যাপত্রের উপরে কালিতে লেখা: 'Adi Brahmo Samaj/ Calcutta/ 6/ 2/ 1883' দেখে মনে হয় গ্রন্থটি আদি ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারের জন্য কেনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

জমিদারি-পরিদর্শন ও অন্যান্য কার্যসূত্রে ব্যাপকভাবে ভ্রাম্যমাণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটি ছোটখাটো গ্রন্থাগার ঘুরে বেড়াত। প্রয়োজনীয় বইটি সঙ্গে না আনার আক্ষেপ ছিন্নপত্রাবলী-র অনেক চিঠিতেই প্রকাশ পেয়েছে। ইন্দিরা দেবীকে 3 Mar 1893 উড়িষ্যার তীরতল থেকে তিনি লিখেছেন; '...মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়—তার সবগুলোই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়, কিন্তু কখন্ কোন্টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়।...সেই জন্যে আমার সঙ্গে 'নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর' থেকে আরম্ভ করে শেক্স্পীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই।...অন্য বার বরাবর আমার বৈষ্ণবকবি এবং সংস্কৃত বই আনি; এবার আনি নি, সেই জন্যে ঐ দুটোরই আবশ্যক বেশি অনুভব হচ্ছে।'[১৭] এর থেকে বোঝা যায়, অন্তত 'দি স্যান্স্ক্রিট বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর অব্ নেপাল' বইটি প্রায়শঃই তাঁর সঙ্গী হত। এই গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছেন। তথ্যটির স্বীকৃতি তিনি নিজেই গ্রন্থটির পুস্তানিতে পেনসিলে লিখে রেখেছেন [সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা-সূচক]:

33 শ্রেষ্ঠভিক্ষা
[33] পূজারিণী
67 উপগুপ্ত
121 মালিনী
135 পরিশোধ
224 চণ্ডালী
20 মূল্যপ্রাপ্তি
159 মস্তকবিক্রয়
313 [সামান্য ক্ষতি]
298 নগরলক্ষ্মী

এছাড়া 144 পৃষ্ঠায় Kusa-Játaka-র মার্জিনে তিনি 'রাজা' লিখে রেখেছেন—এই কাহিনীটিই 'রাজা' নাটকের ভিত্তি-স্বরূপ। 'অচলায়তন' নাটকের বীজও 'Story of Panchhaka' [pp. 311-13] কাহিনীর মধ্যে আছে।

মহাবস্তুাবদানের অন্তর্গত 'মালিন্যবস্তু'-র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কৃত সংক্ষিপ্তসারের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হল: এক প্রত্যেকবুদ্ধ ভিক্ষার্থে বারাণসী নগরে প্রবেশ করেন, কিন্তু কিছুই পান না। তাঁর ভিক্ষাপাত্র শূন্য দেখে একটি বালিকা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভোজনে পরিতৃপ্ত করল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহাবশেষের উপর একটি স্তূপ নির্মিত হল এবং বালিকাটি প্রত্যহ ফুল ও সুগন্ধি দিয়ে স্তূপটিকে সজ্জিত করত। তার প্রার্থনা ছিল, পরবর্তী প্রত্যেক জন্মে সে যেন পুষ্পমাল্যে শোভিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার আকাঙক্ষা সার্থক হল। জন্মান্তরে কণ্ঠে পুষ্পমাল্য দ্বারা সুসজ্জিত দেবকন্যা হয়ে তার জন্ম হল। স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে বারাণসীর রাজা কৃকির কন্যা মালিনী রূপে একই ভাবে সে জন্মগ্রহণ করল। মালিনী ভগবান কাশ্যপ ও তাঁর শিষ্যদের আমন্ত্রণ্ করে প্রচুর ভোজ্যের দ্বারা তাঁদের তৃপ্ত করল। তার পিতার রাজসভায় প্রচুর ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণেরা এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজাকে তার প্রতি নির্বাসন-দণ্ডের আদেশ দিতে বাধ্য করল। মালিনী এক সপ্তাহের স্থগিতাদেশ প্রার্থনা করে তা লাভ করল। এই সাত দিনের মধ্যে সে তার পাঁচশত ভ্রাতা, মন্ত্রিগণ, সেনাধ্যক্ষগণ ও নাগরিকগণকে আর্যধর্মে দীক্ষা দিল। তারা মালিনীকে তাদের আত্মিক ত্রাতারূপে স্বীকার করে

নিল। ব্রাহ্মণদের দুষ্ট অভিপ্রায়ে ক্রুদ্ধ হয়ে তারা তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করলে ব্রাহ্মণেরা রাজার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করল। তারা মালিনীর নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিল বটে, কিন্তু সকল দুর্গতির মূল কাশ্যপকে হত্যা করার জন্য দশজন সশস্ত্র লোককে প্রেরণ করতে রাজাকে বাধ্য করল। সেই মহর্ষি সহজেই এই দশজনকে দীক্ষিত করলেন। তারা তখন আরও বেশি সংখ্যক লোককে নিয়োগ করায় একই ফল হল। তারা দেখল সশস্ত্র লোক পাঠিয়ে তারা দীক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে মাত্র। তখন তারা নিজেরাই উদ্দেশ্য সাধন করতে চাইল। গদা, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে তারা কাশ্যপের আশ্রমের দিকে ধাবিত হল। কাশ্যপ পৃথ্বী দেবীকে আহ্বান করে এই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি প্রদর্শন করতে অনুরোধ করলেন। তিনি একটি বৃহৎ তালবৃক্ষ উৎপাটন করে ব্রাহ্মণদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন ও তারা পিষ্ট হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

ড কল্যাণীশঙ্কর ঘটক 'বৌদ্ধ কাহিনীর অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মালিনী' প্রবন্ধে [দ্র রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৯০। ৫৪-৭২] মূল 'মালিন্যবস্তু'র অনুবাদ করে দেখিয়েছেন, তার সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কৃত সংক্ষিপ্তসারের পার্থক্য কতখানি। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, মূল রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল না, তিনি আকর হিসেবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-কৃত সংক্ষিপ্তসারটিকেই ব্যবহার করেছেন। পূর্বে প্রদত্ত অনুবাদ থেকে দেখা যায়, নাটকের প্রথমাংশের সঙ্গেই কাহিনীটির যোগ—কাহিনীর শেষাংশের অতিপ্রাকৃত ঘটনা রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন, তার স্থান নিয়েছে স্বপ্নলব্ধ কাহিনী।

সচেতন পাঠক বিসর্জন-এর রঘুপতি ও জয়সিংহ চরিত্রের সঙ্গে মালিনী-র ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয় চরিত্রের অন্তর্লীন সাদৃশ্য লক্ষ্য করবেন। প্রথাগত আচার-সর্বস্ব ধর্মের সঙ্গে হৃদয়ের সত্য উপলব্ধিজাত ধর্মের সংঘাত দু'টি নাটকেরই প্রাণ। সাধনা-পর্বে লিখিত বিভিন্ন সামাজিক প্রবন্ধে যে আনুষ্ঠানিক ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার দিয়েছিলেন, পূর্ববর্তী বিসর্জন ও পরবর্তী মালিনী নাটকে তাই কাব্যরূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী-সংস্করণের 'সূচনা'-য় লিখেছেন: 'আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে,...সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।...এই ভাবের উপর মালিনী স্বতই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এরই যা দুঃখ, এরই যা মহিমা, সেইটেতেই এর কাব্যরস।'

পরবর্তী কালে [1912] রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে মালিনী-র অনুবাদ করেন, *Sacrifice and other Plays* [1917] গ্রন্থে প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিসর্জন এবং রাজা ও রানী-র অনুবাদের সঙ্গে তা প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদে চারটি দৃশ্যকে রবীন্দ্রনাথ দু'টি দৃশ্যে পরিবর্তিত করেন এবং প্রায় প্রতিটি সংলাপই সংক্ষেপিত হয়। তিনি লিখেছেন: 'বোধ করি এই নাটিকায় আমার রচনার একটা কিছু বিশেষত্ব ছিল, সেটা অনুভব করেছিলুম যখন দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে বাসকালে এর ইংরেজি অনুবাদ কোনো ইংরেজ বন্ধুর চোখে পড়ল। প্রথম দেখা গেল এটা আর্টিস্ট রোটেনস্টাইনের মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে।...আমার মনে হল এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি তাঁর শিল্পী-মনে মূর্তিরূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার পরে একদিন ট্রেভেলিয়ানের মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শুনলুম। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন এই নাটকে তিনি গ্রীক

নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন।' রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছেন: 'মালিনীর নাট্যরূপ সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন'—এই রূপ মূল রচনাতেই আছে, ইংরেজি অনুবাদে চারটি দৃশ্য দু'টিতে পরিণত হওয়ায় নাট্যরূপটি আরও সুসংহত।

সম্ভবত ২৩ আশ্বিন [বৃহ ৪ Oct] রবীন্দ্রনাথ রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথকে নিয়ে দার্জিলিং যাত্রা করেন। এই অনুমানের কারণ ক্যাশবহির উক্ত তারিখের একটি হিসাব; এদিন 'জায়' খাতে লেখা হয়েছে: 'খোদ বাবু মহাশয়ের সঙ্গে ৩৫০্ বাদ রেলভাড়া ২০০/১৫০্ সেয়ালদহায় গাড়ি ভাড়া ১ ৬/৪৭২/ ল' হিসাবটির সূচনা ১৮ আশ্বিন; 'দারজিলিং গমন জন্য ৯১/।ল৬'। ২১ অগ্র° সম্পূর্ণ খরচের হিসাবটি ক্যাশবহিতে লেখা হয়: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র বাবু ও শ্রীযুক্ত দ্বিনেন্দ্রবাবু মহাশয়দিগের দারজিলিং যাতাতের ব্যয় ৫১৭ ।ল/০'।

কিন্তু বিভিন্ন স্মৃতিকথা অন্যান্য তথ্য থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কার্সিয়াঙে গিয়েছিলেন। [দার্জিলিং যাওয়ার বিষয়টি আমরা পরে আলোচনা করব।] ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা আগেই বলা হয়েছে। অসুস্থ বীরচন্দ্র এই সময়ে কার্সিয়াঙে যেতে মনস্থ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সঙ্গী হবার জন্য আহ্বান করেন। বীরচন্দ্রের তরুণ অনুচর কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন:

> আমরা যখন কলিকাতা হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে রুগ্ন মহারাজ বীরচন্দ্রকে লইয়া কার্সিয়াং-এ গমন করি, তখন মহারাজ, কবি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তখনকার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিয়া যাইত, অবিশ্রামভাবে মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সঙ্গীত এবং কাব্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন; বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবনা করিতেন, আলোচনান্তে প্রতি রাত্রে মহারাজ উঠিয়া রবিবাবুকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিয়া যাইতেন। মহারাজ বীরচন্দ্র অসুস্থ; অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হাস্য মুখেই তিনি আলোচনায় যোগ দিতেন, এ কথা রবিবাবু জানিতেন। তিনি এক দিন, মহারাজ অনর্থক কেন কষ্ট করিয়া সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাঁহাকে আগুয়াইয়া দেন এরূপ অনুযোগ করিলেন। তখন বীরচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"রবিবাবু পাছে অলসতা আসিয়া কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটায়, আমি সে ভয় করি, আপনি আমাকে বাধা দিবেন না।" পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের এরূপ ব্যবহার দর্শন এবং উত্তর শ্রবণ করিয়া রবিবাবু বলিতেন —"আমি আভিজাত্য বংশের মহিমার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম।"[১৮]

১২ ফাল্গুন ১৩৩২ আগরতলার কিশোর সাহিত্য সমাজে ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ভ্রমণের স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন:

> তিনি কার্সিয়াং-এ যাবার সময় আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় তিনি আমার লেখা শুনতেন আর গান গাইতে বলতেন।...মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান-গাওয়া যে কতদূর সঙ্কোচের ছিল তা' সহজেই অনুমেয়। কেবলমাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয়ে আমাকে সাহস দিয়েছিল।...
>
> তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে যখন আমি তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছিলেম, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানারকম আলাপ হতো। বৈষ্ণব পদাবলী যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল। কিন্তু তার পরই তাঁর সহসা মৃত্যু হওয়াতে সে সঙ্কল্প সফল হতে পারে নি।[১৯]

এক বৎসর পূর্বে ৯ কার্তিক ১৩০২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: 'বাজারে গুজব, আপনি বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা সংগ্রহ করিয়া একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক প্রস্তুত করিতেছেন'[২০]—এর থেকে মনে হয়, মহারাজ বীরচন্দ্রের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা অনেক দিন ধরেই চলেছিল।

৩০ বৈশাখ ১৩৪৮ তারিখে 'ভারত ভাস্কর' পদবী গ্রহণ উপলক্ষে ভাষণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি নূতন তথ্যের উল্লেখ করেন:

আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমাণ কম, এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করত। বীরচন্দ্র তা' জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখ বোধ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলংকৃত কবিতার সংস্করণ ছাপা হবে। তখন তিনি ছিলেন কার্শিয়াং পাহাড়ে, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য।[২১]

রবীন্দ্রনাথের কবিতার অলংকৃত সংস্করণ ছাপাবার সংকল্প বীরচন্দ্রের পূর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু ৭ কার্তিক [বৃহ 22 Oct] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মূল ফটোগ্রাফ-সহ কাব্য গ্রন্থাবলী-র একটি 'উৎকৃষ্ট সংস্করণ' উপহার দেন। মহারাজের অতিথি-রূপে তিনি 'কেম্প্‌সাইড' নামক ভবনে তখন অবস্থান করছিলেন। উপহার-পত্রে তারিখের সঙ্গে এই ভবনের নামটিও উল্লিখিত হয়েছে।[২২]

রথীন্দ্রনাথও কার্সিয়াঙে পিতার সঙ্গী হয়েছিলেন। শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ঁবীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'রবিবাবু মহারাজের কার্সিয়ংস্থিত ভবনে প্রায় এক মাস কাল সপুত্র আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন।'[২২ক] এই সময়ে তোলা রথীন্দ্রনাথের একটি আলোকচিত্র রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, মাধুরীলতার পত্রে তার উল্লেখ আছে।

বীরচন্দ্রের একান্তসচিব রাধারমণ ঘোষ ভগ্নহৃদয়-এর কবির কাছে মহারাজের বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। পরেও কলকাতায় তাঁদের সাক্ষাৎ হয়ে থাকতে পারে। কার্সিয়াঙে উভয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটল। মহিমচন্দ্র দেববর্মা এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

বীরচন্দ্র মাণিক্যের সভায় একটি রত্নের পরিচয় পাইয়া আনন্দ পাইয়াছেন বলিয়া রবিবাবুকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি ছিলেন রাধারমণ ঘোষ। কার্সিয়াং-এ রবিবাবুর পরিচর্য্যার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। একত্রে আহার বিহার করিয়া পরম আনন্দে দিন কাটিত। প্রায়ই সকালে ৮টার সময় আমি মহারাজের মনস্তুষ্টির জন্য নানা স্থানের ছায়াচিত্র সংগ্রহে বাহির হইয়া পড়িতাম। আর রবিবাবু রাধারমণ বাবুকে লইয়া বৈষ্ণব দর্শন এবং পদাবলী আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। একদিন Photo তুলিয়া প্রায় ১টার সময় বাসায় আসিয়া দেখিলাম, রাধারমণবাবু ও রবিবাবু আলাপে তন্ময় হইয়া আছেন। তখন বৈষ্ণবদর্শনের সহিত এমার্সনের (Emerson) লেখার তুলনামূলক আলোচনা চলিতেছিল। আমি আসিয়া রসভঙ্গ করিয়া দিলাম; কারণ, আমার উদরে ক্ষুধানল প্রজ্জ্বলিত। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রবিবাবুকে সে আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইল। ভাবে বুঝিলাম, এই শীর্ণকায় রাধারমণ ঘোষ তাঁহাকে বেশ পাইয়া বসিয়াছেন। রবিবাবু, রাধারমণের গভীর পাণ্ডিত্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বৈষ্ণবদর্শন পাঠ করিতে হইবে এ কথা তিনি স্বীকার করিলেন। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বেড়াইতে বাহির হইলে রবিবাবু মহারাজ বীরচন্দ্র এবং তাঁহার সহচর রাধারমণের প্রসঙ্গ অনর্গল আলোচনা করিতেন। ইহাতে বুঝা যায় রবিবাবুর গুণগ্রহণ করিবার শক্তির প্রখরতা।'[২৩]

কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের অল্প দিন পরেই ২৭ অগ্র° [শুক্র 11 Dec] মহারাজ বীরচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মহিমচন্দ্র লিখেছেন; 'রাধারমণবাবু আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়িলে রবিবাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়া তাঁহাকে সরকারে উচ্চ কর্ম্মচারী পদে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সারাজীবন বীরচন্দ্রের সেবা যিনি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অন্যত্র কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।'[২৪]

ছেলেভুলানো ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা ইত্যাদি লোকসাহিত্য সংগ্রহের যে প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ শুরু করেন তাতে বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁর সহায়তা করেছিলেন, সে-সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি। সাধনা-র শেষ বর্ষে তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের কর্মী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে 'মেয়েলি ব্রত' শিরোনামে 'রাম দুর্গা বা পূর্ণিমার ব্রত' [চৈত্র ১৩০১], 'দশপুত্তল ব্রত' ও 'হরিচরণ ব্রত' [জ্যৈষ্ঠ ১৩০২], 'সাঁজপূজনী' [আষাঢ়] এবং 'মঙ্গলবার বা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত' [শ্রাবণ] সংকলন করিয়েছিলেন; কৃষ্ণনগরের দীনেন্দ্রকুমার রায়কে [1869-1943] দিয়ে লেখান 'পৌষ সংক্রান্তি' [মাঘ ১৩০১], 'চড়ক সংক্রান্তি' [বৈশাখ ১৩০২], 'বারতলার মেলা' [আষাঢ়], 'পল্লীগ্রামে রথযাত্রা' [শ্রাবণ] প্রভৃতি পল্লীপার্বণের বর্ণনা-মূলক প্রবন্ধ। অঘোরনাথকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ

আরও কয়েকটি ব্রতকথা সংকলন করিয়ে 'মেয়েলি ব্রত' নামে প্রকাশের বন্দোবস্ত করে দেন। ৭ কার্তিক [বৃহ 22 Oct] কার্সিয়াঙে বসে তিনি এই বইটির জন্য পেনসিলে লেখা একটি দীর্ঘ ভূমিকা কালিতে কপি করে মুদ্রণের নির্দেশ দিয়ে অঘোরনাথকে পাঠিয়ে দেন*। লোকসাহিত্য-সংগ্রহ বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন, তার একটি পরিচয় হিসেবে রচনাটি মূল্যবান;

সাধনা পত্রিকা সম্পাদন কালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞয় আছি।

অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান কালে বঙ্গ সমাজে অতিশয় সলভ হইয়াছে।

বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাহারা বাল্যসম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্য্যসকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে কোন সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গসমাজের গম্ভীর-সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎ কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন এমন কোন লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সঙ্কোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিতেছে তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না—দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্ব্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে—এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন আমার কোন প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশত আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদের কোমলহৃদয়-পালিত মধুরকণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই সমস্ত মেয়েলিব্রত গ্রন্থ আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেজন্য গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, এই সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোন প্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না এমনও মনে করি না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি বঙ্গদেশের জনসাধারণ প্রচলিত পার্ব্বণ গুলির উজ্জ্বল এবং সুন্দর চিত্র সাধনায় প্রকাশ করিয়া সাধনা-সম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য এবং আশা করি দীনেন্দ্রকুমারবাবু সেগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্সিয়ং
৭ই কার্ত্তিক
১৩০৩

দীনেন্দ্রকুমার রবীন্দ্রনাথের আশা পূর্ণ করেছিলেন, তাঁর পল্লীপার্বণ-বিষয়ক রচনা-সংকলন 'পল্লীচিত্র' ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি তিনি 'পরম শ্রদ্ধাভাজন কবিবর/শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়/শ্রীকরকমলেষু' উৎসর্গ করেন।

'মেয়েলি ছড়া'র মতো 'একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয়' নিয়ে বক্তৃতা করার অর্থ হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন বুঝতে পারেননি,[২৫] তত্ত্ববোধিনী-তে তিনি ছড়াগুলিকে 'নীরস, অনর্থক ও উদ্দেশ্যশূন্য' বলে অভিহিত করে 'ঈশ্বরের মহিমাসূচক স্বভাববর্ণনামূলক ও পরস্পরের প্রতি প্রণয়োদ্দীপক ছড়া' রচনার ফরমাশ করেছিলেন—উদ্ধৃত রচনাটিতে এই মনোভাবের সমালোচনা লক্ষণীয়।

৯ কার্তিক [শনি 24 Oct] মাধুরীলতার দ্বাদশতম জন্মদিন। স্নেহময় পিতা সুদূরে থেকেও উপলক্ষটি মনে রেখেছিলেন। 'বেলির জন্মদিনের উপহার/৯ই কার্ত্তিক/১৩০৩ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/কার্সিয়ং' লিখে নিজের একটি ছবি কন্যাকে প্রেরণ করেন [দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৮৭। ১৬]।

সম্ভবত এই ছবিটি পেয়ে মাধুরীলতা তাঁকে লিখেছেন: 'তোমার ফোট পেয়ে খুসী হলুম। তোমার ফোট বেশ ভাল হয়েছে আর রথীরও ভাল হয়েছে কিন্তু ও ভয়নক গম্ভীর হয়ে বসে আছে...। রথী কি সেখানে গিয়ে কোনও fern কি অন্য গাছপালা দিয়ে বাগান করেছে? এখন ওর দু-একটা গাছ ছাড়া সব মোরে গেছে ওকে বোল না ওর ভয়নক কষ্ট হবে।' এই চিঠির নীচেই মৃণালিনী দেবী লিখেছেন: 'তোমাদের ছবি পেয়েছি। তোমারটা খুব ভাল হয়েছে তোমার যত ছবি আছে সবচেয়ে এইটে ভাল হয়েছে। খোকারটা তোমার মতন ওত ভাল ওঠেনি একটু সাদা হয়ে গেছে। তোমার মতন বড় করে আর চুলটা ভাল করে আঁচড়ে নেয়া হলে বেশ হোত।'[২৬] —এই চিঠিটির একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। স্ত্রীর লেখা কোনো চিঠি রবীন্দ্রনাথ রক্ষা করেননি। মাধুরীলতার চিঠির নীচে লেখা যে-দুটি মাত্র চিঠিতে তাঁর স্বামী-সম্ভাষণ আছে, এইটি তার মধ্যে প্রথমতম।

কার্সিয়াং থেকে রবীন্দ্রনাথ কবে কলকাতা ফিরে এসেছিলেন তা বলার মতো কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। বস্তুত কার্তিক মাসের বাকি দিনগুলিতে ক্যাশবহিতে রবীন্দ্রনাথ-সংক্রান্ত কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। তাঁর 'পার্কষ্ট ীট হইতে কেশববাবুর বাটী হইয়া আসিবার' হিসাব পাওয়া যায় ৪ অগ্র° [বুধ 18 Nov] তারিখে। হয়তো পুরো কার্তিক মাসটি কার্সিয়াঙে কাটিয়ে অগ্রহায়ণের প্রথমে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

উপরের হিসাবের 'কেশববাবু' হলেন কেশবচন্দ্র সেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রতিষ্ঠার [1866] পর মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্রের পত্র-বিনিময় হলেও ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিবারের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মহর্ষি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যেমন উদারভাবে অর্থসাহায্য করেছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তথা নববিধানকে তার এক-শতাংশ করেননি—উক্ত সমাজ হয়তো তা চায়-ও নি। নববিধান সমাজের অন্যতম নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে উক্ত সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে আদি ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তাছাড়া বিভিন্ন ব্রাহ্মসম্মিলনে যোগ দিলেও নববিধানের নেতারা দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যায়, কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র করুণাচন্দ্র সেন, এবং কন্যাদ্বয় কুচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবী ও ময়ূরভঞ্জের রানী সুচারু দেবী প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরপরিবারের সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। উপরের হিসাবটি সেই সম্পর্কের প্রথম বিবরণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে।

এখানে পাঠকের বিচারের জন্য আমাদের একটি অনুমান উপস্থিত করি। 'দুরাশা' [ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫, গল্পগুচ্ছ ২১।১৯১-২০৪] গল্পটির রচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন; "দার্জ্জিলিঙে একদিন কুচবিহারের মহারাণী বলিলেন—'আসুন, সকলে মিলিয়া একটা গল্প রচনা করা যাক্, আগে আপনি আরম্ভ করুন।' আমি আমাদের বাঙ্গালী-সমাজছাড়া একটা romantic গল্পের অবতারণা করিবার প্রয়াসে বলিলাম—'আচ্ছা, বেশ'; এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দিলাম—'দার্জ্জিলিঙে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্যে বসিয়া একটি হিন্দুস্থানী রমণী কাঁদিতেছে।' এই বলিয়া আমি ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেখিলাম, গল্পটা অন্যের মুখে অগ্রসর হইতে চাহিল না; অগত্যা আমাকেই সমস্তটা রচনা করিয়া লইতে হইল। এই রকম করিয়া আমার 'দুরাশা' গল্পটি রচিত হইয়াছে।"[২৭]

'দুরাশা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩০৫-এ; এর পূর্বে আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৩-এ দার্জিলিং-অঞ্চলে যাওয়া ছাড়া এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আর সেখানে যাননি। তাহলে অনুমান করতে হয় যে, ২৩ আশ্বিন

১৩০৩-এ রথীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর দার্জিলিং যাওয়ার যে হিসাব ক্যাশবহি-তে পাওয়া যায় তা ঠিক—তখন তাঁরা দার্জিলিঙেই গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ত্রিপুরা-রাজের আমন্ত্রণে কার্তিকের শুরুতে যান কার্সিয়াঙে। রবীন্দ্রনাথ ২২ ভাদ্র ১৩১১ [7 Sep 1904] একটি পত্রে সুনীতি দেবীকে লিখেছেন: 'এ বৎসরে দার্জিলিঙে যাইবার সম্ভাবনা আমি ত দেখি না। মেজোবৌঠাকরুণের সঙ্গে দীনু সেখানে যাইতেছে—তাহার কাছ হইতে অনেক গান শুনিতে পাইবেন। তখন আমাদের সেই আর একবার দার্জিলিঙে সম্মিলনের কথা স্মরণ করিবেন।'[২৮] এখানে রবীন্দ্রনাথ এই বৎসরের দার্জিলিং-ভ্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন।

তাঁর আরও কয়েকটি গল্পও সুনীতি দেবীর গল্প-শোনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গিয়ে রচিত হয়। তিনি বলেছেন: "একদিন Woodlands-এ নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, নাটোরের মহারাজও তথায় উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর মহারাণী বলিলেন—'রবিবাবু, এইবার আপনি একটি ভূতের গল্প বলুন, আপনি যে ভূত দেখেন নাই তা হতেই পারে না, আপনাকে ভূতের গল্প বলিতেই হইবে।' অগত্যা আমি বলিলাম, —'আচ্ছা, তবে একটা ঘটনা বলিতে পারি; নাটোরের মহারাজ সেই ঘটনার কতকটা অবগত আছেন, তিনি এ সম্বন্ধে কতকদূর পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতে পারেন।..."[২৯] এরপরে তিনি যে কাহিনী বলেন, পরে সেটি অবলম্বন করে 'মাস্টারমশায়' [প্রবাসী, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪; গল্পগুচ্ছ ২২। ৩২৪-৫৩] গল্পটি লেখেন। 'মণিহারা' [ভারতী, অগ্র° ১৩০৫; গল্পগুচ্ছ ২১। ২৪৯-৬৫] গল্পটিও সুনীতি দেবীর অনুরোধে রচিত হয়েছিল। ৭ আশ্বিন ১৩৩৮ হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'অনেক কাল পূর্ব্বে একবার যখন দার্জ্জিলিঙে গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের মহারাণী। তিনি আমাকে গল্প বল্‌তে কেবলি জেদ করতেন। এই গল্পটা ['দুরাশা'] তাঁর সঙ্গে দার্জ্জিলিঙের রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে মুখে মুখে বলেছিলুম। মাস্টারমশায় গল্পের ভূমিকা অংশটা এবং মণিহারা গল্পটিও এমনি করে তাঁরই তাগিদে মুখে মুখে রচিত।'[৩০] 'Woodlands' কুচবিহারের মহারাজার আলিপুর-স্থ প্রাসাদের নাম। ক্যাশবহিতে বহুবার রবীন্দ্রনাথের আলিপুর যাওয়ার কথা লেখা আছে। তিনি এখানেই যাতায়াত করতেন।

রবীন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ি গিয়েছিলেন ৪ অগ্র°, 'কুচবিহারের মহারাণীকে পার্ক স্ট্রীটের ৫২/২ নং বাটীতে খাওয়ান' হয় ১০ অগ্র° [মঙ্গল 24 Nov]। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়, 'কুচবিহারের মহারাণী এ বাটীতে আসায় খাওয়ার ব্যয় ২৮ পৌষের' হিসাব পাওয়া যায় ক্যাশবহিতে। মাঘ মাসের শেষে তিনি শান্তিনিকেতন পরিদর্শনেও গিয়েছিলেন, সেই রাজকীয় ভ্রমণের জন্য ২০৪৷৷৬ খরচের হিসাব পাওয়া যায় ২০ ফাল্গুন তারিখে। ২৬ ফাল্গুন [সোম 8 Mar 1897] 'কুচবিহারের মহারাণীর পার্কস্ট্রীটের বাটীতে সুভাগমন উপলক্ষে আহারের সময় ব্যবহারের জন্য প্লেট ও টেবেল ন্যাপকিন... হাপ প্লেট ১ ডজন ভাড়া' করা হয়েছিল। এছাড়াও ১৪ মাঘ [26 Jan] ও ১৮ চৈত্র [30 Mar] রবীন্দ্রনাথের 'কেশববাবুর বাটী যাতায়াতের' এবং ২১ ও ২২ চৈত্র [2-3 Apr] তাঁর কুচবিহারের মহারাণীর বাটী যাতায়াতের' হিসাব পাওয়া যায়। এই সব হিসাব থেকে বোঝা যায়, দু'টি পরিবারের সম্পর্ক ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে এবং রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ২৪ মাঘ ১৩০৪ [শুক্র 5 Feb 1897] রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে 'খামখেয়ালী সভা'র যে প্রথম অধিবেশন হয়, সেখানে অন্যান্য অভ্যাগতের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র করুণাচন্দ্র সেনও উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতায় থাকলেই রবীন্দ্রনাথকে প্রায়ই পার্ক স্ট্রীট-ভ্রমণে দেখা যায়। ক্যাশবহি-র হিসাব অনুযায়ী তিনি অগ্রহায়ণ মাসে ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১৮ ['কাছিয়া বাগান হইতে পার্কষ্ট্রীট'], ২০, ২৩, ২৪, ২৫ ও ৩০ তারিখে পার্ক স্ট্রীট যাতায়াত করেছেন। এর মধ্যে ৮ অগ্র° [রবি 22 Nov] একটি বিশেষ পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে পার্ক স্ট্রীটে মহর্ষির কাছে যেতে হয়। হেমেন্দ্রনাথের পঞ্চমা কন্যা শোভনা দেবীর সঙ্গে 'বাসুদেবপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল'[৩১]-এর বিবাহ-সম্বন্ধ হয়। ঠাকুর-পরিবারের রীতি-অনুযায়ী অ-ব্রাহ্ম ভাবী জামাতাকে বিবাহের পূর্বে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হত। এই দিন দীক্ষা গ্রহণের জন্য রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথকে পার্ক স্ট্রীটে নিয়ে যান। বিবাহটি হয় সম্ভবত ২১ অগ্র° [শনি 5 Dec] তারিখে।

ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হয় কলকাতায় ২৭ অগ্র° [শুক্র 11 Dec] তারিখে।* বীরচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে প্রীতিমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেই হিসেবে তিনি এই ঘটনায় নিশ্চয়ই যথেষ্ট বেদনা বোধ করেছিলেন।

২৮ অগ্র° [শনি 12 Dec] সন্ধ্যা ৬টার সময়ে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চম ও শেষ সন্তান দ্বিতীয় পুত্র শমীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। শমীন্দ্রনাথের রাশিচক্রটি এইরূপ:

জন্ম ১৮১৮ শক। ২৮ অগ্রহায়ণ। ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৬
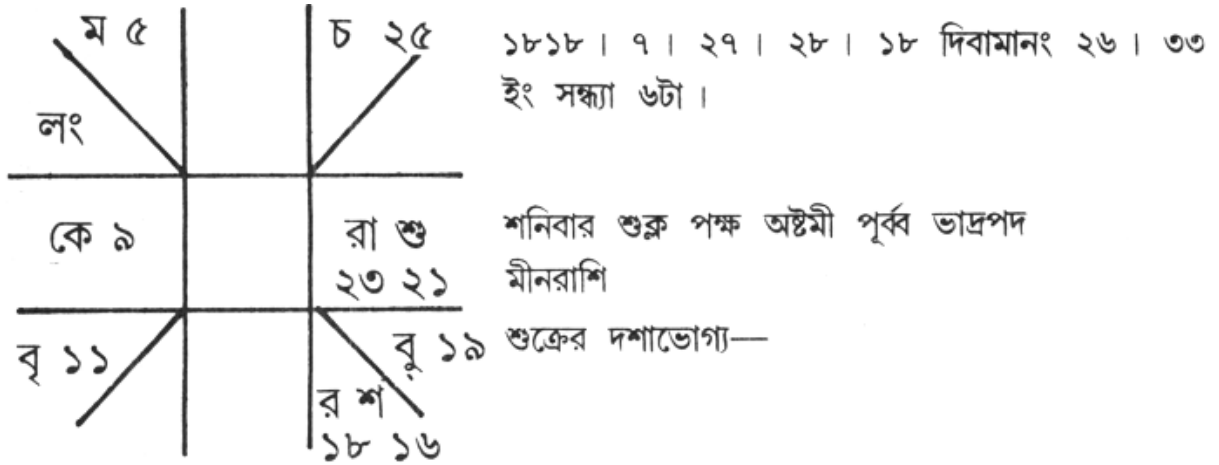
তত্ত্ববোধিনীর পৌষ-সংখ্যায় [পৃ ১৪৪] অগ্রহায়ণ মাসের 'আয়ব্যয়'-এর হিসাবে দেখা যায়ঃ 'শুভকর্ম্মের দান। শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৲'—নিশ্চয়ই পুত্রলাভের আনন্দেই এই দান।

পৌষ মাসেও রবীন্দ্রনাথ কলকাতাতে ছিলেন। ফলে তাঁর পার্ক স্ট্রীটে গতায়াত অব্যাহত। এই মাসে তিনি পার্ক স্ট্রীটে যান ২, ৪, ১০, ১৪, ১৬, ১৯ ['পার্ক স্ট্রীট যাওয়ার ও তথা হইতে আলিপুর যাওয়ার'], ২০, ২৩, ২৭ ও ২৯ ['পার্ক স্ট্রীট হইয়া বালিগঞ্জ যাওয়া আসার'] তারিখে।

৭ পৌষ [সোম 21 Dec] শান্তিনিকেতনে ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হয়। তত্ত্ববোধিনী-তে এই উৎসবের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাতে কোথাও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখিত হয়নি। তাহলে কি তিনি এই উৎসবে যোগ দেননি?

এই বৎসর 28 Dec [সোম ১৪ পৌষ] কলকাতায় বিডন স্কোয়ারে রহমতুল্লা সায়ানির সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন হয়। কংগ্রেস সম্পর্কে ঠাকুরবাড়ির বিশেষ উৎসাহ ছিল। সত্যপ্রসাদের হিসাব-খাতায় দেখা যায়, তিনি 'Congress Subscription' হিসেবে ৫০ টাকা চাঁদা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও আগের দুটি অধিবেশনের মতো এবারও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশন উপলক্ষে একটি গান রচনা করেন: 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' [দ্র গীত ১। ২৫৭; স্বর ৪৭]। মজুমদার-পুঁথিতে গানটির একটি পাণ্ডুলিপি আছে, গানের নীচে রচনাকাল 'পৌষ ১৩০৩'—এটি নিশ্চয়ই পৌষ মাসের প্রথমার্ধে লিখিত হয়েছিল। এই গানটি সম্পর্কে তিনি 20 Nov 1937 [৪ অগ্র° ১৩৪৪] তারিখে পুলিনবিহারী সেনকে লেখেন: 'এক দিন আমার পরলোকগত বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে, বিশেষভাবে দুর্গামূর্ত্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিলিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানকে নূতনভাবে দেশে প্রবর্ত্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনামিশ্রিত স্তবের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ। আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না; সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। বিষয়টা যদি কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রের অধিকারগত হোতো তাহলে আমার ধর্ম্মবিশ্বাস যাই হোক আমার পক্ষে তাতে সঙ্কোচের কারণ থাকত না;—কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে পূজার ক্ষেত্রে অনধিকারপ্রবেশ গর্হনীয়। আমার বন্ধুরা সন্তুষ্ট হননি। আমি রচনা করেছিলুম ভুবনমনোমোহিনী, এ গান পূজামণ্ডপের যোগ্য নয় সে কথা বলা বাহুল্য। অপরপক্ষে একথাও স্বীকার করতে হবে যে এ গান সর্ব্বজনীন ভারতরাষ্ট্রসভায় গাবার উপযুক্ত নয়, কেন না এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিতভাবে মর্ম্মঙ্গম হবে [না]।'[৩২]

কিন্তু কংগ্রেস অধিবেশনের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ গাইলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানের প্রথম দু'টি কলি—যেটি 'একান্তভাবে হিন্দুসংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত'। সুরটি তাঁর নিজেরই দেওয়া। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'বিডন স্কোয়ার আমাদের বাড়ির খুব কাছে। আমাদের বাড়িতেও তাই কংগ্রেসের আয়োজন নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। বাবার উপর ভার পড়ল গানের ব্যবস্থা করার। রিহার্সল চলতে থাকল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-এ বাবা সুর বসিয়েছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের আরম্ভে বাবা একা এই গান গাইলেন, সরলাদিদি সঙ্গে অর্গান বাজিয়েছিলেন। তখন মাইক প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। বাবার গলা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই প্যাণ্ডালের বিপুল জনতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিষ্কার শোনা গিয়েছিল।'[৩৩] 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এই প্রথম গৃহীত হল। পরে দ্বি-জাতিতত্ত্বের কলুষে 'বন্দে মাতরম্'-এর সর্বজনগ্রাহ্যতা নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও কিছু পরিমাণে সেই বিতর্কের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। সেই বিতর্কের প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচ্য।

কিন্তু রথীন্দ্রনাথের ও অন্যদের স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গান দিয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের সূচনা হলেও সমকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অন্য কথা বলে। অমৃতবাজার পত্রিকা-র 29

Dec 1896-সংখ্যায় লেখা হয়:

'Before the proceeding commenced, a party of gentlemen headed by Babu Rabindranath Tagore sang a number of songs composed to suit the occasions. Following is the translation of the first song.

Come, onward come! Ye sons of Ind!
The motherland your aid implores,
With dauntless hearts and ardent zeal
Enlist ye in your country's cause.

—স্পষ্টতই এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত 'চল্‌রে চল্ সবে ভারত সন্তান' গানটির ছন্দোমিল-বদ্ধ ইংরেজি অনুবাদ। সম্পূর্ণ গানটি এইভাবে অনূদিত হয়েছে। এরই সঙ্গে 'কোরাস' হিসাবে গাওয়া হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সব ভারতসন্তান' গানটি—এটিরও অনুবাদ আছে পত্রিকাটিতে:

Hail to India! Sing her praises,
Fill her heart with hope and joy;
May she win the crown of glory,
Sing, sing "Bharatera jay!"

উল্লেখ্য, গানটিতে রবীন্দ্রনাথ নূতন করে সুরারোপ করেন।

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: "ঠাকুরবাড়ি হইতে কন্‌গ্রেসের প্রতিনিধিদের জন্য একটি জমকালো পার্টি দেওয়া হইল। এই পার্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যারিস্টার মি. গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রীতি সম্মেলন উপলক্ষে একটি গান রচনা করিয়া স্বয়ং গাহিয়াছিলেন; গানটি 'অয়ি ভুবনমোহিনী।"[৩৪] আমরা যে ক'টি সংবাদপত্র দেখতে পেয়েছি, তার মধ্যে এরূপ কোনো পার্টির সংবাদ পাইনি। 'মি. গান্ধী'ও 1896-এর কলকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না। তাছাড়া রবীন্দ্রজীবনী-কার পাদটীকায় সরলা দেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা'র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সরলা দেবী বর্তমান অধিবেশনে গান্ধীজীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেননি, তিনি লিখেছেন দীনশা ওয়াচা-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 1901-এর কলকাতা কংগ্রেসে তাঁর রচিত 'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী' গানটির প্রসঙ্গ। সে-বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

অতুলপ্রসাদ সেনের স্মৃতিকথায় অবশ্য 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গাওয়ার উল্লেখ আছে: 'প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক গণ্যমান্য প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রবাসীরা বাংলা জানেন না, অন্তত প্রাঞ্জল প্রচলিত বাংলা বোঝেন না অথচ অনেকেই সংস্কৃত জানেন; তাই সংস্কৃতবহুল একটি অপূর্ব ভারত-সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে আমাদের অনেককে সেই গানটি শিখাইয়াছিলেন। মনে আছে বহুকণ্ঠে ও বহু বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমরা সেই গানটি গাহিয়াছিলাম। আমাদের সকলকেই—পুরুষ ও মহিলা—শুভ্রবসন পরিধান করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে আমাদের নেতা।'[৩৪ক]

মজুমদার-পুঁথিতে রচিত গানের ধারা আমরা ২৯ ভাদ্রে লেখা 'কে যায় অমৃতধামযাত্রী' [গীত ১। ১১০] পর্যন্ত অনুসরণ করে এসেছি। কিন্তু গানের স্রোত সেখানেই রুদ্ধ হয়নি। শুধু গান রচনার তারিখ নেই বলেই আমরা আলোচনা স্থগিত রেখেছিলাম। এখানে আমরা অন্তত ১১ মাঘ [শনি 23 Jan] মাঘোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত

রচিত গানের একটি তালিকা করে দিচ্ছি। এগুলি কাব্যগ্রন্থাবলী-র অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সুতরাং ১৫ আশ্বিনের পরে রচিত বলে ধরে নেওয়া যায়।

এই গানগুলি স্পষ্টত পূর্ব-রচিত গানের রীতিই অনুসরণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মতো কোনো গায়কের কাছ থেকে হিন্দি গান শুনে সেটি বা সেগুলি মজুমদার-পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করেছেন, তার পরে তাদের বাংলা গানে রূপান্তরিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আবার আগের মতোই কখনও কখনও শুধু হিন্দি গানটিই খাতায় লেখা আছে, সেটি ভেঙে নতুন গান লেখা হয়ে ওঠেনি। যেমন, পুঁথির 70 পৃষ্ঠায় আড়ানা-সুরের 'কওনবা মোরী লাদেরে অতি অনমূলে' বা 'রাজ দুলারকা বনারা আইল মা' [কানাই সামন্ত খেয়া-র 'শুভক্ষণ' কবিতাটির মধ্যে এই গানের 'উস্‌কানি' লক্ষ্য করেছেন][৩৫] বা 71 পৃষ্ঠার 'অজহুঁ জপ ভবানীএ নরসমুঝ দেখ তূ' গানগুলি লিখে রাখলেও সেগুলি 'ভাঙা' হয়নি। কিন্তু এই 71 পৃষ্ঠাতেই তিনি বাহার-রাগিণীর 'ফূলীবনঘন মোর আয় বসন্ত রী' গানটি ভেঙে 'আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে' [গীত ১। ৭৮-৭৯] গান রচনা করেছেন। এর পরের পৃষ্ঠাতেই 'নবীন বাবুর সাহায্যে/বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ'-এর রং, বেঞ্চ, নল বদ্‌লানো, বেতের ম্যাটিং ইত্যাদির জন্য ৯০০ টাকা ব্যয়ের এক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি হিসাব এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু তারই পাশে মার্জিনে সুরের প্রবাহে 'দর দর দরি দুরান/বংশী বাজাওত' দু'টি ছত্র—সবটাই রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে!

[১] বাহার—চৌতাল। আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে দ্র গীত ১। ৭৮-৭৯; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪; স্বর ৪; মূল গান: ফুলি বন ঘন মোর আয় বসন্ত রি দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ২১; ১৩০৩ মাঘোৎসবে গীত।

[২] হাম্বীর—ধামার। হরষে জাগো আজি দ্র গীত ১। ১২০; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৪; স্বর ২৭; মূল গান: হরষ জাগ লাল দ্র ত্রিবেণীসংগম। ১৩০৩ মাঘোৎসবে গীত।

[৩] ঝিঁঝিট—ঠুংরি। শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল দ্র গীত ১। ১১৪; স্বর ৪।

[মজুমদার-পুঁথির 74 পৃষ্ঠায় 'তু কাহাঁ পায়ো নয়ী হো অপরম্পার' গানটি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন:

> জাগোরে আজি জাগোরে তাঁহার সাথে
> সেই নিত্য প্রেমভরে একাকী আনন্দে নিরমল অন্তরে
>   ভক্তি যোগাসনে
> নির্ণিমেষ প্রেম নেত্র জাগিছে যাঁর নিত্যকাল নির্ব্বিকার
> দিকে ২ লোকে ২ গগনে ২ অধোঊর্দ্ধে নিত্যকাল।
> সর্ব্বজীবে দেহ প্রাণে নিশ্বাসেপ্রশ্বাসে জাগিছেন নয়নে ২
>   শয়ন স্বপনে

—গানটি রচনার পর তিনি নিজেই কেটে দিয়েছেন। এর পরে 75 পৃষ্ঠায় ৪ ছত্রের একটি হিন্দি গান লেখা আছে: 'সুদূর দূরে আয়োরী সো মুরা মুরা'—কিন্তু এই গানটি ভাঙা হয়নি।]

[৪] তিলক কামোদ—সুরফাঁকতাল। শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে দ্র গীত ১। ১৬৮; স্বর ৪; মূল গান: শম্ভু হর পদযুগ ধ্যানি বখানি দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৩৭-৩৮।

[৫] ইমনকল্যাণ—সুরফাঁকতাল। সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল দ্র গীত ১। ২১২; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৩-৭৪; স্বর ২৩; মূল গান: শঙ্কর শিব পিনাকী গঙ্গাধর দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৩৬; ১৩০৩ মাঘোৎসবে গীত।

১১ মাঘ [শনি 23 Jan] প্রাতে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ও রাত্রে মহর্ষিভবনে সপ্তষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথ-রচিত দশটি ব্রহ্মসংগীত গাওয়া হয়:

১। সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল ২। শীতল তব পদ ছায়া ৩। আজি কোন ধন হতে বিশ্বে আমারে ৪। আর কত দূরে আছে সে আনন্দ ধাম ৫। আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে ৬। হরষে জাগো আজি ৭। এ কি করুণা করুণাময় ৮। আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও ৯। আজি রাজ আসনে তোমারে বসাইব ১০। কে যায় অমৃত-ধাম-যাত্রী—এই গানগুলির সব-ক'টিই মজুমদার-পুঁথিতে রচিত হয়েছিল।

এই মাসেও তিনি অনেকবার পার্ক স্ট্রীট যাতায়াত করেছেন। ক্যাশবহির হিসাব অনুযায়ী, মাঘ মাসের ১২, ১৫, ১৭, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ তারিখে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। ১৪ মাঘ [মঙ্গল 26 Jan] তিনি 'কেশববাবুর বাটী'ও যান।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথেরা একটি 'ড্রামাটিক ক্লাব' স্থাপন করেছিলেন। এই ক্লাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমরা আগেই করেছি। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অলীকবাবু' নাটক অভিনয় করতে গিয়ে কী করে ড্রামাটিক ক্লাব উঠে গেল।[৩৬] তিনি বলেছেন:

তবে অনেক চাঁদার টাকা জমা রেখে গেল। এখন এই টাকাগুলো নিয়ে কী করা যাবে পরামর্শ হচ্ছে। আমি বললুম, কী আর হবে, ড্রামাটিক ক্লাবের শ্রাদ্ধ করা যাক—এই টাকা দিয়ে একটা ভোজ লাগাও। ধূমধামে ড্রামাটিক ক্লাবের শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করা গেল—এ হচ্ছে 'খামখেয়ালি'র অনেক আগে। ড্রামাটিক ক্লাবের শ্রাদ্ধে রীতিমত ভোজের ব্যবস্থা হল, হোটেলের খানা।...এই শ্রাদ্ধবাসরে দ্বিজুবাবু নতুন গান রচনা করে আনলেন 'আমরা তিনটি ইয়ার' এবং 'নতুন কিছু করো'। দ্বিজুবাবু আমাদের দলে সেই দিন থেকে ভরতি হলেন।...এই সভাতেই খামখেয়ালি সভার প্রস্তাব করেন রবিকাকা। সভার সভ্য যাকে-তাকে নেওয়া নিয়ম ছিল না, কিংবা সভাপতি প্রভৃতির ভেজাল ছিল না। ভালো কতক পাক্কা খামখেয়ালি তারাই হল মজলিশী সভ্য, বাকি সবাই আসতেন নিমন্ত্রিত হিসেবে। প্রত্যেক মজলিশী সভ্যের বাড়িতে একটা করে মাসে মাসে অধিবেশন হত। নতুন লেখা, অভিনয়, কত কী হত তার ঠিক নেই, সঠিক বিবরণও নেই কোথাও। কেবল চোঁতা কাগজে ঘটনাবলীর একটু একটু ইতিহাস টোকা আছে।[৩৭]

—স্মৃতিভ্রংশ ও বর্ণনার শৈথিল্যের জন্য এই বিবরণে সচেতন পাঠক কিছু-কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করবেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত উক্ত 'চোঁতা কাগজ'টি রক্ষিত হওয়ায় খামখেয়ালি সভার ইতিহাসটি মোটামুটি স্পষ্ট করা সম্ভব। রবীন্দ্রভবনে MS. 152-চিহ্নিত ১৩টি লিখিত পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি আছে। 'রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ নির্মীয়মান তালিকা' দ্বিতীয় খণ্ডের [১৩৮৯] অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বিবরণে এই পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের বলে শনাক্ত করা হয়েছে [P. 147]। সুরেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে লিখিত খসড়াটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ বিবরণটি সুসংস্কৃত করে লেখেন। আমরা রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বিবরণটি অনুসরণ করলেও কখনো কখনো টীকা হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ-লিখিত খসড়াটিও ব্যবহার করব।

'২৪ মাঘ ১৩০৩/ যোড়াসাঁকো' স্থান-কাল উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

১। খামখেয়ালী সভার সূচনা। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবমত এই সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়

[খসড়ায় আছে: '১. Dramatic Clubএর শ্রাদ্ধ এবং/খামখেয়ালী অন্নপ্রাসন = তারিখ ২৪ মাঘ'] নিমন্ত্রণকর্ত্তা।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুষ্ঠান।—রাধিকা গোস্বামীর গান। অক্ষয়কুমার মজুমদার কর্ত্তৃক "বিনিপয়সায় ভোজ" আবৃত্তি। ফোনোগ্রাফ্ যন্ত্র শ্রবণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "কুহেলিকা" নামক গল্প পাঠ [খসড়ায় লেখা: "(পাহাড়ী গল্প)"]। গান বাজনা। আহার।—বাঙ্গলা জলপান।

অভ্যাগতবর্গ। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বর্ম্মা।/ ,, করুণাচন্দ্র সেন।/ ,, নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়/ ,, অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ,, শেযেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়।/,, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ,, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর/ ,, অতুলচন্দ্র সেন।/ ,, চিত্তরঞ্জন দাস। [খসড়ায়: 'ক্ষিদ্দা (ক্ষিতীন্দ্রনাথ), প্রমথ চৌধুরী)']

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, ড্রামাটিক ক্লাবের শ্রাদ্ধ এবং রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত খামখেয়ালি সভার প্রথম অধিবেশন হয় ২৪ মাঘ ১৩০৩ [শুক্র 5 Feb 1897] তারিখে। সম্ভবত গগনেন্দ্রনাথদের বাড়িতে এই অনুষ্ঠান হয়। অভ্যাগতবর্গের তালিকায় করুণাচন্দ্র সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও চিত্তরঞ্জন দাসের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ-কথিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এতে উপস্থিত নন, আহারের ব্যবস্থাও 'বাঙ্গলা জলপান'—'হোটেলের খানা' 'নিয়াপোলিটান ক্রীম'-এর আয়োজন নিশ্চয়ই অন্য কোনো অধিবেশনের ব্যাপার।

আমরা আগেই বলেছি, আশ্বিন মাসে দার্জিলিং ভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখে 'দুরাশা' গল্পটি রচনা করে কুচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবীকে শুনিয়েছিলেন। এই গল্পটিই উপরের বিবরণে 'পাহাড়ী গল্প' বা 'কুহেলিকা' নামে অভিহিত হয়েছে। 'দুরাশা' নামান্তরিত হয়ে এটি দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ভারতী-র বৈশাখ ১৩০৫-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সঙ্গীত সমাজের অভ্যুদয়ে তখন খামখেয়ালি সভার লোকান্তর ঘটেছে।

খামখেয়ালি সভার প্রথম অধিবেশনের দু'এক দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ কুচবিহারের মহারানীকে শান্তিনিকেতন-পরিদর্শনে নিয়ে যান। ক্যাশবহির ২০ ফাল্গুনের হিসাবে দেখা যায়: '২৬ মাঘ কুচবিহারের মহারানীর শান্তিনিকেতনে গমন উপলক্ষে ব্যয় ২০৪॥৬'—'মহারানীর ভ্রমণের সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের সাথী হওয়া বিষয়টি অবশ্য আমাদের অনুমান-প্রসূত; এই অনুমানের কারণ সুনীতি দেবীকে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১ ভাদ্র ১৩২৬ [18 Aug 1919] তারিখের চিঠি: 'মনে আছে একদিন বেয়ান এখানে এসেছিলেন। তখন আশ্রম নীরব ছিল নির্জন ছিল।'[৩৮] সুনীতি দেবীর কন্যার সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের বিবাহ হয়েছিল, 'বেয়ান' সম্বোধন সেই কারণেই।

ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার এই সময়ে কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে গাড়িতে করে পার্ক স্ট্রীটে মহর্ষির কাছে নিয়ে যান। সংবাদটি জানা যায় প্রভাতকুমারের ১ ও ২২ ফাল্গুনের দু'টি পত্রে। ২২ ফাল্গুনে তিনি লিখেছেন: 'আপনার মনে আছে কিনা বলিতে পারি না, সেদিন Park Street-এ যাইবার সময় গাড়িতে আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার একটি রচনা (ছদ্মনাম—রাধামণি দেবী) কুন্তলীনের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।'[৩৯] ১ ফাল্গুনের পত্রে তিনি লেখেন: 'যেদিন মহর্ষির নিকট আপনি বসিয়া আমাদিগকে 'অগ্রসর' হইতে বলিলেন'[৪০] ইত্যাদি। 'আপনার মেয়েটি কি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে?' প্রশ্ন থেকে রবীন্দ্রনাথের কোনো কন্যার অসুস্থতার কথাও জানা যায়।

রবীন্দ্রনাথের সংকোচ-প্রবণ, আতিশয্য-বিমুখ মনটির পরিচয় আমরা আগেও পেয়েছি। প্রভাতকুমারের ভক্তি-ব্যাকুল সান্নিধ্য-প্রয়াসী চিত্তটি তাঁর আপাতশীতল আচরণে প্রতিহত হত। তিনি সেই অভিযোগ করে ১ ফাল্গুনের পত্রে লিখেছেন: 'এই তিন মাসে আপনার সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎ করিয়াছি—কিন্তু কিছু নিরাশ হইয়াছি। উপরকার মানুষটিকে—দিব্য টেড়ীযুক্ত মস্তক, সোনার চশমা পরা, কখনো শাদা, কখনও রেশমের, কখনও গরম কাপড়ের পিরাণ, কোট বা গ্রেট্‌কোট আবৃত, কখনও পাজামা, কখনও প্যান্ট, কখনও ধূতি (থান

কিম্বা কালা পেড়ে বা 'বাগানে'-পেড়ে) পরিহিত মানুষটিকে বেশ দেখিয়াছি ও চিনিয়াছি, কিন্তু ভিতরকার মানুষটি যে কোথায় লুকাইয়া থাকিত, তাহার 'টিকিটি' পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই।'[৪০]

প্রভাতকুমারের পরের পত্র থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির উত্তর দিয়েছেন পতিসর থেকে—চিঠির উত্তর দিতে তিনি দেরি করতেন না, সুতরাং অনুমান করতে পারি যে, শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরেই তিনি পতিসর যাত্রা করেছিলেন। পত্রের উত্তরে তিনি নিজের স্বভাব ব্যাখ্যা করেছিলেন: 'আমি কঠিনত্বক ফলের মত—নিজের অন্তরকে আমি নিজের বাহিরে আনিতে পারি না। যদি আমার ভিতরে কোনও রসশস্য থাকে, যে ব্যক্তি বলপূর্বক ভাঙ্গিয়া আদায় করিতে পারে সেই পায়'[৪১] —চিঠিটি পাওয়া যায় নি, প্রভাতকুমারই ২২ ফাল্গুনের পত্রে অংশটি উদ্ধৃত করেছিলেন।

প্রভাতকুমার তাঁর দুটি পত্রেই সংকল্পিত বিরাট বৈষ্ণবপদসংগ্রহ সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন, নিজেও সাহায্য করতে চেয়েছেন—কিন্তু তিনি জানতেন না যে, মহারাজ বীরচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তাবটির সমাধি ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু পতিসরে নয়, সাজাদপুরে গিয়ে ১১ ফাল্গুন [রবি 21 Feb] তিনি জমিদারির কাজকর্ম করেছেন তার প্রমাণ আছে সাজাদপুরের অর্ডার বুক-এঃ

পেসকারের কৈফিয়ৎ—নরিনা গ্রামের বদু প্রামাণিক-এর জমির খারিজ দাখিল প্রার্থনা। নায়েবের অভিপ্রায় হরেন্দ্র দেওয়ানকে যে দশ টাকা নজরে খারিজ দাখিল দেওয়া হয়, ইহার প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ হওয়া উচিত। কেন না, এ ব্যক্তির দ্বারা অনেক সময় অনেক সাহায্য পাওয়া যায় এবং হরেন্দ্র অপেক্ষা ইহারা অনেক পূ*র্বের* অবস্থাপন্ন *প্রজা। প্রার্থনা মঞ্জুর। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/* ১১-১১-১৩০৩[৪২]

১৮ ফাল্গুন* [রবি 28 Feb]ও রবীন্দ্রনাথ মফস্বলে ছিলেন, সেটি জানা যায় এই তারিখে লেখা মাধুরীলতার চিঠি থেকে:

> আমরা ২রা চৈত্রে বোলপুর যাইব। তুমিও কি যাইবে? তুমি কবে কলিকাতায় আসিবে? ইরুদিদি তাঁহার ননদ ও তাঁহার মেয়েকে লইয়া আসিয়াছেন প্রায় দুই তিন সপ্তাহ হইবে। রথী ও মীরার পানবসন্ত হইয়াছিল তাহার ৫।৬য় দিন হইল স্নান করিয়াছে। Miss Linton আর আমাদিগকে পড়ান্‌না তিনি বলিয়াছিলেন যে ডাক্তারে তাহাকে বলিয়াছিল তিনি অত্যন্ত দুর্বল পড়াইতে পারিবেন না।...[৪৩]

রবীন্দ্রনাথ ২ চৈত্র বোলপুরে যান নি, কিন্তু দু'তিন দিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে আসেন। ফাল্গুন মাসের ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৯ তারিখে তাঁকে পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াত করতে দেখা যায়। ২৫ তারিখে তিনি 'সতীশবাবুর বাটী'ও যান—ইনি বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী ডাঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ঠাকুর পরিবারের ব্যয়ে একটি গুরুতর অস্ত্রোপচারের জন্য বিলাত যাত্রা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ 1893-এর 31 May [১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০০] শিকাগোর ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন। বিপুল খ্যাতি লাভ করে আমেরিকা ও ইংলণ্ড ভ্রমণান্তর তিনি কলম্বো ও মাদ্রাজ হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন 19 Feb 1897 [শুক্র ৯ ফাল্গুন] তারিখে। 28 Feb [রবি ১৮ ফাল্গুন) শোভাবাজার রাজবাড়িতে কলকাতার জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। *Indian Mirror* [3 Mar] পত্রিকার বিবরণ অনুযায়ী নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, জে ঘোষাল এস্কোয়ার [জানকীনাথ ঘোষাল], রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, ড নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যয়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ

মফস্বলে বাস করছেন। সুতরাং উক্ত সভায় তাঁর উপস্থিতি সম্ভব নয়। কোনো পত্রিকার দায়িত্ব হাতে না থাকায় এই ঘটনা সম্পর্কে তাঁর গদ্যরচনাও নেই।

সমগ্র চৈত্র মাসটি রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় কাটান এবং তিনি যথারীতি ভ্রাম্যমান। জমিদারির বিভাগের কাজকর্ম তখনও চলেছে। ১ চৈত্র [শনি 13 Mar] তাঁর 'পালিত সাহেবের বাটী যাতায়াতের', ৯ চৈত্র 'মোহিনীবাবুর বাটী' ও ১৩ চৈত্র 'মোহিনীবাবুর আপিস হইতে আসিবার' হিসাব সম্ভবত এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও ২, ৪, ৮, ১১, ১৪, ১৭, ২০, ২৩, ২৬ ও ২৯ তারিখে তাঁর পার্ক স্ট্রীট যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। এছাড়া ১৮ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ 'কেশববাবুর বাটী' এবং ২১ ও ২২ চৈত্র 'কুচবিহারের মহারাণীর বাটী' গিয়েছিলেন। 'কঠিনত্বক ফলের মত' স্বভাব হলেও এই-সব সামাজিকতায় তিনি এই সময়ে যথেষ্ট অভ্যস্ত।

এরই মধ্যে কোনো একদিন আশুতোষ চৌধুরীর ধর্মতলার বাড়িতে খামখেয়ালি সভার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কার্যবিবরণীতে রবিন্দ্রনাথ তারিখের জায়গাটি শূন্য রেখেছেন, ফলে তারিখটি নির্ধারণ করা শক্ত। কার্যবিবরণীটি উদ্ধৃত করছি:

২। খাষ্ মজ্‌লিস্।
তারিখ।—

ধর্ম্মতলা স্ট্রীট্।

নিমন্ত্রণকর্ত্তা। শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

অনুষ্ঠান। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক "নূতন অবতার" আবৃত্তি। কবি মনোমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক ইংরাজি স্বরচিত কবিতা পাঠ। শ্রীরবিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক "বৈকুণ্ঠের খাতা" পাঠ। গান বাজনা।

আহার। টেবিলে জলপান।

অভ্যাগতবর্গ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস।/ ,, মনোমোহন ঘোষ।/,, চিত্তরঞ্জন দাস।/,, অমিয়নাথ চৌধুরী। [খসড়ায়: প্রমথ]

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকা অনুযায়ী 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রথম প্রকাশিত হয় 5 Apr 1897 [সোম ২৪ চৈত্র] তারিখে—সুতরাং খামখেয়ালি সভায় রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক প্রহসনটির পাঠ সম্ভবত কিছুদিন পূর্বের ঘটনা।

এই গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করছি:

বৈকুণ্ঠের খাতা।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।/ চৈত্র ১৩০৩ সাল।/ মূল্য ছয় আনা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+৫৫। মুদ্রণসংখ্যা: ১০০০।

সত্যপ্রসাদ তাঁর রাজর্ষি, কাব্য গ্রন্থাবলী প্রভৃতি কয়েকটি পুস্তকের প্রকাশক হলেও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' রবীন্দ্রনাথের নিজের খরচে মুদ্রিত হয়েছিল—'নদী' ও 'চিত্রা'ও তাই। তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহি-র ৩০ চৈত্রের হিসাবে 'বৈকুণ্ঠের খাতা ছাপাইবার ব্যয়/ কভারিংয়ের কাগজ ক্রয়', '১৩ চৈত্র নদীর বিজ্ঞাপন দিবার ব্যয়' ও 'চিত্রা পুস্তকের বিজ্ঞাপনের সাহিত্য প্রেসের শোধ' প্রভৃতি খরচ দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের এই নিজস্ব ক্যাশবহিটি একটি নতুন জিনিস—চৈত্র ১৩০৩ থেকে এই ক্যাশবহির হিসাব শুরু হয়। এটি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব পারিবারিক আয়ব্যয়ের বিবরণ—যদিও হিসাবগুলি লিখেছেন জোড়াসাঁকো সেরেস্তার কর্মচারীরা, সত্যপ্রসাদ যেমন নিজেই নিজস্ব Accounts Book-এ হিসাবপত্র লিখে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তেমন করেন নি। রথীন্দ্রনাথ পারিবারিক দায়দায়িত্ব পুরোপুরি গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ক্যাশবহি রক্ষিত হয়েছে। ফলে তাঁর জীবনের আরও খুঁটিনাটি খবর পাওয়ার সুযোগ পাওয়া গেছে।

এই ক্যাশবহির চৈত্র ১৩০৩-এর হিসাবে চিত্তরঞ্জন দাসের ভগিনী অমলা দাস সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। ৪ চৈত্র 'শ্রীমতী অমলা দাসকে দিবার জন্য স্কুলের বেতন হিঃ ১৫্', ১৩ চৈত্র 'শ্রীমতী অমলা দাসের জন্য এক জোড়া বিনামা ক্রয়' প্রভৃতি হিসাব থেকে রবীন্দ্র-পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাটি তথ্যভিত্তিক হয়ে ওঠে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "My mother made her come and stay with us. She was adopted as a member of the family and we called her Amaladidi....She was not handsome, and her generously built body, of a height quite unusual in this country, gave her a commanding appearance. But as soon as one heard her sweet voice one forgot about her rather manly appearance.[৪৪] অন্যত্র তিনি লিখেছেন: 'তাঁর গান গাইবার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে বাবা তাঁকে রাধিকা গোস্বামীর কাছে হিন্দি গান শিখতে দিলেন। অল্পদিনেই ওস্তাদি অনেক গান শিখে নিলেন। অমলাদিদির গলা যেমন অনায়াসে খাদে খেলত তেমনি চড়াতে উঠত। তাঁর গলার উপযোগী গান বাবা রচনা করতে লাগলেন। অমলাদিদি গাইবেন বলে যে গানগুলি তখন বাঁধা হয়েছিল তার মধ্যে একটা-দুটো মনে পড়ে; যেমন—

> চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না...
> এ পরবাসে রবে কে হায়...
> কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু...

আমার অনুমান এই গানগুলির সুর রাধিকাবাবুর কাছ থেকে বাবা নিয়েছিলেন ['এ পরবাসে' গানটির ক্ষেত্রে রথীন্দ্রনাথের অনুমান নির্ভুল নয়, এটি বহুপূর্বে ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল]। অমলাদিদি আসবার পর সান্ধ্য-মজলিসে তাঁকেই বেশি গাইতে হত।'[৪৫]

রান্নাতেও তাঁর যথেষ্ট নিপুণতা ছিল, শিলাইদহে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের অতিথিদের আপ্যায়নে তিনি মৃণালিনী দেবীকে সাহায্য করতেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

দ্বিপেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা নলিনী দেবীর বিবাহ হয় আশুতোষ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুহৃৎনাথ চৌধুরীর সঙ্গে ১৪ বৈশাখ [শনি 25 Apr] তারিখে। বিবাহটিতে জাঁকজমকের কোনো অভাব ছিল না। ক্যাশবহিতে ২৩ শ্রাবণে মোট খরচের হিসাবে লেখা হয়: 'শ্রীমতী নলিনী দেবীর শুভ বিবাহের ব্যয় শোধ/ ১৪ বৈশাখ বিবাহ হয়/ ৪৯১৩৷৷০/৬'—'শ্রীমতী নলিনী দেবীর শুভ বিবাহে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় সুহৃৎনাথ বাবুকে যৌতুক দিবার জন্য ১০০ খান গিনি ক্রয় হয় তাহার মূল্য' ১৭২৮০/০ অবশ্য এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। বিবাহের অব্যবহিত পরেই সুহৃৎনাথ উচ্চতর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বিলাত যাত্রা করেন। বিয়ের

আগেই তাঁর জন্য ঠাকুরপরিবারের খরচে প্যাসেজ বুক করা হয়েছিল। এর পরেও প্রতি মাসে তাঁকে ১৫ পাউণ্ড করে পাঠানো হয়েছে।

৩ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 15 May] মহর্ষির পার্ক স্ট্রীট-স্থ বাসভবনে তাঁর অশীতিতম জন্মদিন পালন করা হয়। তত্ত্ববোধিনী-র আষাঢ়-সংখ্যায় [পৃ ৩৬-৩৯] 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব'-শীর্ষক বিবরণে লেখা হয়: 'এই উপলক্ষে সকল সমাজের ব্রাহ্মেরা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মহর্ষিকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম মন্ত্রী সমস্বরে পঠিত হইল।' শিবনাথ শাস্ত্রী অভিনন্দন পত্র পাঠ করার পর নববিধান সমাজের গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় 'ভক্ত্যুপহার' পাঠ করেন। মহর্ষির স্ববক্তব্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ পাঠ করে শোনান। 'পূজ্যপাদ মহর্ষি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন তিনি নিজে কিছু বলিবেন না, মৌনী থাকিবেন; কিন্তু উৎসাহ তাঁহাকে শতগুণ উত্তেজিত করিয়া তুলিল।' এই উপলক্ষে পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনাও হয় ও দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন।

একটি হিসাবে দেখা যায়: 'ব° ডাক্তার ডি, এন, চাটুর্য্যে/ দং উঁহাকে পূজ্যপাদ মহাশয়ের জন্মতিথিতে আসির্ব্বাদী দান/ গিনি ৬ খান/ ভাল সন্দেশ ১ ঐ জিনিস লইয়া গ্রে ষ্টি ট উহার বাটি' যাওয়া হয়। ইনি হচ্ছেন অভিজ্ঞা দেবীর স্বামী ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বোঝা যায়, অভিজ্ঞার অকালমৃত্যুর পর এই সুপাত্রটিকে ঠাকুরপরিবার হাতছাড়া করতে চান নি। ১১ আষাঢ় [শনি 27 Jun] অভিজ্ঞার পরের বোন মনীষা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের অধীন এজমালি জমিদারি ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের তিন পৌত্রের সঙ্গে বাঁটোয়ারা করে নেবার বন্দোবস্ত হয়। ক্যাশবহিতে এই বিভাগ-সংক্রান্ত বহু হিসাব দেখা যায়। আমরা আগেই বলেছি, দেবেন্দ্রনাথ আশ্বিন ১২৯৭-এ একটি উইল করেন। এই উইলটির আমরা কোনো সন্ধান পাইনি। রবীন্দ্রানুরাগী কোনো আইনজীবী যদি এটি উদ্ধার করে দেন আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। বর্তমানে জমিদারি-বিভাগের আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই উইলটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যাশবহির ২১ ভাদ্রের হিসাব: 'বঃ বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এটর্নী দঃ ১৮৯৬ সালের ৩০ মে উইলের বাক্স পার্ক স্ট্রীটের বাটীতে নে জান ও ঐ উইলের বাক্সতে শীল করা ও রশিদ দেওয়া যায়'—এই গুরুত্বেরই প্রমাণ। জমিদারি-বিভাগের দেখাশোনা রবীন্দ্রনাথ যাতে ঠিকমতো করতে পারেন তার জন্য দেবেন্দ্রনাথ 8 Aug 1896 [শনি ২৫ শ্রাবণ] তারিখে রবীন্দ্রনাথকে সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়ে আমমোক্তারনামা [Power of Attorney] লিখে দেন। এরপর জমিদারি বিভাগের জন্য ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত ও ডব্লিউ. সি. বোনার্জিকে ব্রিফ দেওয়া হয়। নানারকম হিসাবপত্রের পর হাইকোর্টে একটি বাঁটোয়ারা-মামলা রুজু করা 7-Suit No. 585 of 1897 Debendranath Tagore vs. Gaganendranath Tagore & others নামে অভিহিত এই মোকদ্দমায় গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ কয়েকটি তালুক-সহ সাজাদপুর পরগণায় অবস্থিত জমিদারিটি লাভ করেন।

১৭ কার্তিক [রবি 1 Nov] সত্যপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র দিবপ্রকাশের জন্ম হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি [? ২১ অগ্র°] হেমেন্দ্রনাথের পঞ্চম কন্যা শোভনা দেবীর বিবাহ হয় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নগেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করা হয় ৮ অগ্র° [রবি 22 Nov] তারিখে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ২৮ অগ্র° [শনি 12 Dec] রবীন্দ্রনাথের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

৩ শ্রাবণ [শুক্র 17 Jul] আশুতোষ চৌধুরীর কন্যা অশোকার অন্নপ্রাশন হয়। এই দিনেরই একটি হিসাব: 'বঃ বাবু নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর /দ° ইছাপুর পলতার বাগান ও জমি মৌরশী লওয়া ও কৃষি কার্য্য ও বাঙ্গালা তৈয়ারী ব্যয় প্রভৃতি জন্য দেওয়া যায়'—ঠাকুরপরিবারের সন্তানেরা ক্রমশই নিজেদের জন্য বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছেন, এই তথ্যটি লক্ষণীয়। অবশ্য বর্তমান প্রচেষ্টাটি অধিকদূর অগ্রসর হয় নি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

১ বৈশাখ [রবি 12 Apr] ব্রাহ্মমুহূর্তে যথারীতি মহর্ষিভবনে নববর্ষ পালিত হয়।

৩ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 15 May] পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে মহর্ষির অশীতিতম জন্মদিন পালন করা হয়, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজের প্রধান নেতারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী অভিনন্দনপত্র পাঠ করলে 'একটী রৌপ্য কোষের মধ্যে ছয় শতের অধিক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণের [কলকাতা, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বাঁকিপুর, ভাগলপুর, আরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চুঁচুড়া, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের] স্বাক্ষরিত এই অভিনন্দন পত্র মহর্ষির হস্তে প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত একটী রুপার বাটী এবং ফ্রেমে বাঁধান আর একখানি মুদ্রিত অভিনন্দন পত্রও তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল।' নববিধান সমাজের নেতা গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় 'ভক্ত্যুপহার' পাঠ করেন। মহর্ষির শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁর বক্তব্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ পাঠ করে শোনালে তিনি নিজেও কিছু বলেন। এটি আদি সমাজে ও মহর্ষি-পরিবারে একটি অবশ্যপালনীয় উৎসবে পরিণত হয়। আদি সমাজের অন্যতম সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনাথ 'শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ মহাশয়ের জন্মদিনের প্রগ্রাম বাধান ব্যয়' হিসেবে ১৬ টাকা খরচ করেছেন, অনুষ্ঠানটির উৎসবে পরিণতির প্রমাণ রূপে এটিকে গণ্য করা যায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি মহর্ষির বিশেষ প্রীতি ছিল। ৯ জ্যৈষ্ঠের হিসাবে আছে, তিনি উক্ত সমাজকে ২০০ টাকা ও সমাজের লাইব্রেরিকে ২০০ টাকা দান করেছেন। এরপর ঐ লাইব্রেরির জন্য ২০ টাকা মাসিক দান নির্দিষ্ট হয়। তখনকার দিনের মূল্যমানে অঙ্কটি সামান্য নয়।

শান্তিনিকেতনে মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর এটিকে সর্বসাধারণের উপযোগী ও রমণীয় করে তোলবার জন্য অর্থব্যয়ে কোনো কার্পণ্য করা হয় নি। ২৭ আষাঢ়ের দু'টি হিসাব: 'ব° সিকদার কোম্পানী/দং শান্তিনিকেতন মন্দিরের দক্ষিণ দিকের গেটের দুই পাসে দুইটী লোহার (জুতা রাখিবার) ঘর তৈয়ারী হয় তাহার ব্যয়... ৭৩২। ৬' ও 'ব° সদয় মালী দং শান্তিনিকেতনে ৭০০ শত মাটীর ১৪ ইঞ্চী টব পাঠান হয় তাহার ব্যয়...৯৯৩ লও —এই টবগুলি বিভিন্ন দফায় ১৬ কার্তিক ১৩০২ থেকে ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩-এর মধ্যে পাঠানো হয়েছিল, প্রচুর গোলাপ গাছের চারা পাঠাবারও হিসাব পাওয়া যায়। ৮ শ্রাবণের একটি হিসাবে 'ব° লেসলি কোম্পানি দং শান্তিনিকেতনের জন্য জলের কল ক্রয় ও নে যাওয়া' বাবদ ১৮০ টাকা খরচ লেখা হয়েছে—মন্দিরের পূর্বদিকে পুষ্করিণীর মধ্যে ধারাযন্ত্রের কথা কোনো-কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিরণে লক্ষ্য করি, এটি হয়তো তারই হিসাব। আবার ২৭ কার্তিক 'জি সি দে কোং দং শান্তিনিকেতনের জন্য পাল্কী গাড়ি একখান (গোরুতে টানা)

তৈয়ারী... ৫০৲' হিসাবে বর্ণিত গাড়িটিকে প্রায় ১৫। ২০ বছর ধরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক-ছাত্র-অতিথিকে সেবা করার উল্লেখ দুর্লভ নয়।

৭ পৌষ [সোম 21 Dec] শান্তিনিকেতনে ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হল। মাঘ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১৪৮-৬০] প্রতিবেদক লিখেছেন: 'প্রাতঃকালে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল।..."অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি" [দ্বিজেন্দ্রনাথ- রচিত] এই সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম।' ক্ষিতীন্দ্রনাথের উদ্বোধন, 'স্বাধ্যায়ন্ত উপাসনা'র পর হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের উপদেশ ও শিবধন বিদ্যার্ণবের প্রার্থনায় সকালের উপাসনা সমাপ্ত হয়। 'মধ্যাহ্নের ব্যাপার স্মরণ করিলেও সুখোদয় হয়। এবার বিশ্রামের পর ব্রহ্মমন্দিরে খোল করতাল সহযোগে রাজকুমার বাবুর কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহার সেই "হৃদয় নিকুঞ্জবনে" গানটী যেন এখনও কর্ণে মধুবৃষ্টি করিতেছে। বেলা দুই প্রহরের পর হইতেই উদ্যানের ইতস্তত অনেকগুলি বাউলের দল গোপীযন্ত্র বাজাইয়া এবং তালে তালে নৃত্য করিয়া দেহতত্ত্ব প্রভৃতি নানাতত্ত্ব গান করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল।...এবার চক্ষু কর্ণের তৃপ্তিকর অন্য কোনও বাহ্যাড়ম্বর ছিল না তথাচ এত লোক!' সায়ংকালে 'সুপ্রশস্ত কাচময়-গৃহে নানাবর্ণের আধারে আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে শ্রদ্ধাস্পদ মঠাধ্যক্ষ স্বামীজী সাধকের মন পুলকিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন।' চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উপদেশ পাঠ, শম্ভুনাথ গড়গড়ির প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর উৎসব শেষ হয়। আতসবাজি, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি ব্যয়বহুল আয়োজন এ বৎসর না থাকলেও এবারের উৎসবের খরচ ৯৯২॥৯ পাই-কে সামান্য বলা চলে না।

তত্ত্ববোধিনী-র একটি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ: 'আদি ব্রাহ্মসমাজের গৃহ-সংস্কার জন্য বিগত ১৮ই আষাঢ় বুধবার হইতে সাপ্তাহিক ও মাসিক ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে হইতেছে।' মাঘোৎসবের পূর্বেই এই সংস্কারকার্য শেষ হলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়: 'আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহের জীর্ণসংস্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ১১ মাঘের প্রাতঃকালীন ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইয়া আসিতেছিল এ বৎসর হইতে তাহা রহিত হইয়া এই আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই হইবে। অতএব ঐ দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়ে ব্রহ্মোপাসনার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।'[৪৬] ১১ মাঘ [শনি 23 Jan] সপ্তষষ্টিতম সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে এই গৃহে প্রাতঃকালীন অধিবেশন হয়। বন্দনা গীত, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের পাঠ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধন ও প্রার্থনা এবং আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথের উপদেশ এই অধিবেশনের প্রধান বিষয়। রাত্রিকালীন অনুষ্ঠান হয় যথারীতি মহর্ষিভবনে। শিবধন বিদ্যার্ণব বেদমন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। উদ্বোধন, উপদেশ পাঠ ও প্রার্থনা করেন যথাক্রমে চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি। বেদগান হয় ঋগ্‌বেদের 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' মন্ত্রের চারটি শ্লোক রবীন্দ্রনাথ-কৃত সুরারোপিত হয়ে। আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ-রচিত দশটি ব্রহ্মসংগীত বর্তমান মাঘোৎসবে গীত হয়।

1893-তে শিকাগোর ধর্মমহাসভায় অভূতপূর্ব খ্যাতি লাভ করার পর স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বেদান্ত ধর্ম প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। তিন বছরেরও বেশি সময় বিদেশে অবস্থানের পর 16 Dec 1896 [বুধ ২ পৌষ] তারিখে তিনি লণ্ডন থেকে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন, তাঁর সঙ্গী হন বিদেশী ভক্ত সেভিয়ার [Sevier]-দম্পতি ও তাঁর বক্তৃতার বিশিষ্ট অনুলেখক গুডউইন [Goodwin]। কলম্বো ও মাদ্রাজ হয়ে তিনি কলকাতায় পৌঁছন 19 Feb* শুক্রবার [৯ ফাল্গুন]। সিংহলে ও দক্ষিণ ভারতে স্বামীজী কি বিপুল সংবর্ধনা

পেয়েছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ সংকলন করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' দ্বিতীয় খণ্ডে [পৃ ৩৪৪-৭৬]। বিবেকানন্দের জন্মভূমি কলকাতাও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে থাকে নি। প্রায় কুড়ি হাজার লোকের একটি বিশাল জনতা স্বামীজীকে শিয়ালদহ স্টেশনে অভ্যর্থনা করে এবং তাঁর গাড়ি টেনে নিয়ে যায় প্রথমে রিপন [অধুনা সুরেন্দ্রনাথ] কলেজে ও পরে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর প্রাসাদে। 28 Feb [রবি ১৮ ফাল্গুন] শোভাবাজার রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক মহতী সভায় স্বামীজীকে মানপত্র দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। উপস্থিতির তালিকায় ঠাকুর-পরিবারের জানকীনাথ ঘোষাল, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথের নাম দেখা যায়। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'এই সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।' পাদটীকায় তাঁর তথ্যসূত্র হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন: 'এই সংবর্ধনা-সভায় উপস্থিতির কথা রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅমল হোমকে বলিয়াছিলেন।'[৪৭] কিন্তু তথ্যটি মেনে নেওয়া শক্ত। এই সময়ে তিনি মফস্বলে বাস করছেন, তা আমরা আগেই বলেছি।

এর পরে ইণ্ডিয়ান মিরর-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে স্বামীজী 4 Mar [বৃহ ২২ ফাল্গুন] স্টার থিয়েটারে বেদান্ত বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। পূর্বোক্ত সংবর্ধনার প্রত্যুত্তর ছাড়া কলকাতায় এইটিই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। 7 Mar-এর *The Indian Mirror*-এ উপস্থিত ব্যক্তিদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম না থাকলেও তাঁর উপস্থিতির প্রমাণ চৈত্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১৮৮-৯১] মুদ্রিত তাঁর 'উপনিষদ্ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধ। এখানে তিনি স্বামীজীকে 'স্বাগত অভিবাদন' জানিয়ে লেখেন: 'তাঁহার যেরূপ প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, ভব্য বৈরাগ্য পরিচ্ছদ, তাঁহার যেরূপ বাক্‌পটুতা, শাস্ত্র পারদর্শিতা ও উৎসাহ-উদ্যম, তাহাতে তিনি যে তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে সফল মনোরথ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর তাঁহার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করুন।'

সরলা দেবী তখন মহীশূর থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। বিবেকানন্দের বক্তৃতার প্রতিবেদন এবং তিনি দার্জিলিং ও আলমোড়ায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের পর কিছুদিন বরানগর-মঠে কাটিয়ে আবার পাশ্চাত্যে যাবেন এই খবর সংবাদপত্রে পড়ে সরলা দেবী চৈত্র-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৭৭৯-৮২] 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন [রচনাটি লেখকের নাম-হীন, কিন্তু আত্মজীবনীতে তিনি রচনাটি তাঁর লেখা বলে উল্লেখ করেছেন], সেটি 'আশা' ও 'নিরাশা এই দুটি ভাগে বিভক্ত। লেখাটি স্বামীজীর চোখে পড়েছিল, তিনি 6 Apr [মঙ্গল ২৫ চৈত্র] দার্জিলিং থেকে সরলা দেবীকে একটি চিঠি লিখে তাঁর 'আশা'র জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে 'নিরাশা'র অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। এই পত্রে স্বামীজী সরলা দেবীর প্রশংসা করে লেখেন: 'প্রভু করুন, যেন আপনার মতো অধিক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।' স্বামীজীর পত্রে তাঁর স্বদেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে সরলা দেবী ভারতী-র বৈশাখ ১৩০৪-সংখ্যায় [পৃ ৬৭-৬৮] তাঁর 'নিরাশা' 'প্রত্যাহার করে লেখেন: 'স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশবাৎসল্য আমাদের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তির অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে, অপিচ সহস্রগুণে ব্যাপক ও কার্য্যকরী, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।...সন্দেহমাত্র নাই, স্বদেশের হিতকল্পে প্রারব্ধ অনুষ্ঠানে যথাকালে যথাযথরূপে বিবেকানন্দস্বামী স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করিবেন; আমাদের অধিক বলা নিষ্ফল।'

সরলা দেবী স্বামীজীর পত্রেরও উত্তর দিয়েছিলেন, স্বামীজী তার প্রত্যুত্তর দেন 24 Apr [শনি ১২ বৈশাখ ১৩০৪]—কিন্তু সে-বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচ্য।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বৎসর বাংলা দেশের সর্বাধিক উত্তেজনার কারণ কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন— কলকাতায় তৃতীয়বার এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। সুপ্রশস্ত বীডন স্কোয়ারে এই অধিবেশনের জন্য ১০০x১২০ ফুটের বিশাল মণ্ডপ নির্মিত হয়, চার থেকে পাঁচ হাজার দর্শকের স্থান সংকুলান করা সম্ভব হবে এই ছিল উদ্যোক্তাদের আশা। দুটি উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়, থামগুলি ফুলের মালা ও পাতায় ঢেকে দেওয়া হয়, লাল ও সবুজ কংগ্রেসী রঙের কাপড়ে মণ্ডিত হয় মণ্ডপের বাইরের দিকগুলি।

এবারে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৭৮৪। এঁদের মধ্যে ঠাকুরপরিবার ও তাঁদের আত্মীয়মণ্ডলীর অনেকেই ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশুতোষ চৌধুরীর নাম আমরা প্রতিনিধি-তালিকায় দেখতে পাই। সত্যপ্রসাদের হিসাব-খাতায় ১২ পৌষ [26 Dec] 'Congress Subcription' বাবদ ৫০ টাকা দেওয়ার কথা জানা যায়, অন্যেরাও নিশ্চয়ই এইরূপ চাঁদা দিয়েছিলেন। চৈত্র ১৩০৩-এর পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত হিসাবখাতা পাওয়া যায় নি, কিন্তু ১৪ বৈশাখ ১৩০৪ [26 Apr 1897]-এর হিসাব: 'বঃ কংগ্রেস কমিটী দং ১৮৯৭ সালের সবস্কৃপসন ১ বৎসরের শোধ…৬'—এইরূপ হিসাব পরেও পাওয়া গিয়েছে।

এবারের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রহিমতুল্লা এম. সায়ানি [Rahimtulla M. Sayani, 1847-1902]। ইনি বোম্বাই প্রদেশের প্রতিনিধি—উল্লেখযোগ্য, পূর্বের দুই অধিবেশনের সভাপতি দাদাভাই নৌরজী ও ফেরোজশা মেটা-ও বোম্বাইয়ের অধিবাসী ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবারেও ছিলেন রমেশচন্দ্র মিত্র, কিন্তু তাঁর অসুস্থতার জন্য লিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেন ড রাসবিহারী ঘোষ। অধিবেশনের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়, এ কথা আগেই বলা হয়েছে।

28 Dec [সোম ১৪ পৌষ] দুপুর একটায় অধিবেশন আরম্ভ হয়, 31 Dec [বৃহ ১৭ পৌষ] পর্যন্ত চার দিন ছিল এবারের মেয়াদ। যথারীতি সভাপতির বক্তৃতা, অসংখ্য প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। 31 Dec সন্ধ্যায় প্রতিনিধিদের ইণ্ডিয়া ক্লাবে ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হয়।[৪৮] আমাদের জানা নেই, রবীন্দ্রনাথ এই সভায় 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানটি গেয়েছিলেন কিনা।

কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হওয়ার পর 1 Jan 1897 [শুক্র ১৮ পৌষ] একই মণ্ডপে নরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে দশম সামাজিক সম্মেলন [Social Congress] অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল বহুবিধ: (১) স্ত্রী-শিক্ষা (২) মাদকবর্জন (৩) বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিত্রতা বৃদ্ধি (৪) বিবাহের ব্যয় হ্রাস (৫) বাল্যবিবাহ (6) বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা (৭) সমুদ্রযাত্রা (৮) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সুপরিচালনা (৯) বিদ্যালসমূহে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান (১০) হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদপ্রথা বিলোপ (১১) ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের হিন্দুসমাজে পুনর্গ্রহণ এবং (১২) হিন্দু বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ।[৪৯]

কংগ্রেসের অধিবেশনের সুযোগে একেশ্বরবাদী প্রতিনিধিদের সম্মিলিত করার চেষ্টা 1886-এর দ্বিতীয় অধিবেশন থেকেই দেখা গিয়েছিল। এবার 30 Dec [বুধ ১৬ পৌষ] বিচারপতি রানাডের সভাপতিত্বে সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে Theistic Conference অনুষ্ঠিত হয়।[৫০]

দ্বাদশ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রমেশচন্দ্র মিত্র 7 Feb 1897 [রবি ২৬ মাঘ] বাংলার প্রধান কংগ্রেস নেতাদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেন। 11 Feb-এর অমৃতবাজার পত্রিকার খবর: 'It was in orthodox Hindu style.' রবীন্দ্রনাথ এরই কাছাকাছি সময়ে কুচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবীকে নিয়ে শান্তিনিকেতন-ভ্রমণে গিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর এই ভোজসভায় উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা অল্প।

প্রাদেশিক রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রাদেশিক সম্মেলনের [Provincial Conference] সূচনা হয়েছিল 1888 থেকে। প্রথম দিকে কয়েক বৎসর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত কলকাতায়। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 1895 থেকে এই সম্মেলন বিভিন্ন মফস্বল শহরে আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয় Jun 1895-এ। বর্তমান বৎসরে অধিবেশন বসে নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরে। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন বলে ঠিক হলেও তাঁর অন্যবিধ ব্যস্ততার জন্য ['his presence elsewhere being urgently required'] গুরুপ্রসাদ সেন সভাপতি নির্বাচিত হন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট কৃষ্ণনাগরিক ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ,। 19 Jun [শুক্র ৬ আষাঢ়] কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির নাটমন্দিরে প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। অধিবেশন পরের দিনেও চলে। *The Bengalee* পত্রিকায় [20 Jun] লেখা হয়: "The proceedings were in a large measure conducted in Bengali, and they [সাধারণ শ্রোতারা] had no difficulty in following them.' কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সম্মেলনের সভাপতি ও অন্য অনেকে ইংরেজিতেই তাঁদের ভাষণ দেন। পরের বছর নাটোর সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ অনেকে বাংলা ভাষার কার্যপরিচালনার জন্য আন্দোলন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রধান ভাষণগুলি ইংরেজিতেই প্রদত্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 1908-এর পাবনা সম্মেলনে বাংলা ভাষায় সভাপতির অভিভাষণ দিয়ে এই রীতি ভঙ্গ করেন।

1896-এর শেষ দিকে পশ্চিম ভারতে বিভিন্ন শহরে মহামারী আকারে প্লেগ [bubonic plague] রোগের আবির্ভাব হয়। ভারতের রাজনীতিতে এই ব্যাধির সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও মহামারী দমনে বোম্বাই গভর্মেন্ট যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে দেশীয়দের সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার তার দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে আহত হয়, ফলে বিশেষত বোম্বাই ও পুনা শহরে এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়। কিন্তু গবর্মেন্ট তাতে কর্ণপাত না করে 4 Feb 1897 [২৩ মাঘ] তারিখে 'প্লেগ রেগুলেশন' বিধিবদ্ধ করে-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও প্লেগ রোগীকে পৃথকীকরণ এই রেগুলেশনের লক্ষ্য হলেও ইংরেজ সৈন্যদের দিয়ে যে পদ্ধতিতে এই কাজ করানো হয় তা দেশীয়দের, বিশেষত উচ্চবর্ণ হিন্দুদের, পারিবারিক সম্ভ্রবোধ ক্ষুণ্ণ করে। পুনার বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা বালগঙ্গাধর টিলক [1856-1920] মারাঠী সাপ্তাহিক 'কেশরী'তে এই সব ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। এরই মধ্যে 22 Jun 1897 [৯ আষাঢ় ১৩০৪] রাত্রে পুনায় প্লেগ কমিটির প্রেসিডেন্ট W. C. Rand ও আর একজন ইংরেজ Capt. Ayerst নিহত হন। ইংরেজ গবর্মেন্ট প্রতিহিংসায় তৎপর হয়ে ওঠে। টিলকের কারাবাস, নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্বাসন, দামোদর চাপেকরের ফাঁসি, সিডিশন আইন বিধিবদ্ধ করা ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক ঘটে যেতে থাকে। ভারতের রাজনীতিতে এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়া আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

উল্লেখপঞ্জী

১ দাসী, Dec 1997, পৃ ৫২৭
২ দ্র প্রদীপ, আষাঢ় ১৩০৫। ২২৩-২৯
৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৫৭। ১৫৯, পত্র ৩০
৪ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৪৪
৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৫৭। ১৫৯, পত্র ৩১
৬ ঐ। ১৬০, পত্র ৩৩
৭ ঐ। ১৬১, পত্র ৩৪
৮ 'চৈতালিটা আমার বড় আদরের', দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ৪৪
৯ অলকা, আশ্বিন, ১৩৪৯। ২
১০ রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী। ২৫-২৬
১১ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ৪৪
১২ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪ [পৌষ ১৩৯২]। ৩৪, পত্র ৬
১৩ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৬২, পত্র ৩৬ [১০ ভাদ্র ১৩০৩]
১৪ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৮৭
১৫ জীবনস্মৃতি ১৭। ৩১৪
১৬ *The Indian Messenger*, 4 Oct 1996, P. 308
১৬ক দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৬৬, পত্র ৪৫
১৭ ছিন্নপত্রাবলী। ১৮৬-৮৭, পত্র ৮৬
১৮ 'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ', দেশীয় রাজ্য। ২১০-১১
১৯ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৬১-৬৯
২০ দেশ, সাহিত্য, ১৩৭৫। ১৫৩, পত্র ২০
২১ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৩৬৭
২২ দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা', রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, কার্তিক ১৩৬৯। ১৯০-৯২
২২ক প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮। ১৯৬
২৩ দেশীয় রাজ্য। ২১১-১২
২৪ ঐ। ২১২
২৫ দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ৩৫৮, পত্র ১৬৩ [17 Oct 1894]
২৬ মাধুরীলতার চিঠি। ৩৪-৩৫, পত্র ৬

২৭ রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ [১৩৯১]। ১৫

২৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৭১। ১৯, পত্র ১

২৯ রবীন্দ্র-সঙ্গ-প্রসঙ্গ। ১৫-১৬

৩০ চিঠিপত্র ৯। ৯৪-৯৫, পত্র ৪৫

৩১ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ৩। ৩৫৯

৩২ দেশ, শারদীয়া ১৩৯৩। ১৫-১৭, পত্র ৭

৩৩ পিতৃস্মৃতি। ২৫

৩৪ রবীন্দ্র জীবনী ১। ৪৪৯

৩৪ক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত 'অতুলপ্রসাদ সেন' [1971]। ২২১

৩৫ রবীন্দ্রপ্রতিভা। ২৭৯-৮১, ৪০৭

৩৬ দ্র ঘরোয়া ১০৭-১০

৩৭ ঘরোয়া। ২৩

৩৮ দেশ, সাহিত্য ১৩৭১। ২০, পত্র ২

৩৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৬৩, পত্র ৩৮

৪০ ঐ। ১৬২, পত্র ৩৭

৪১ ঐ। ১৬৩, পত্র ৩৮

৪২ রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী। ২৫

৪৩ মাধুরীলতার চিঠি। ৩৩-৩৪, পত্র ৫

৪৪ *On the Edges of Time*, p. 12

৪৫ পিতৃস্মৃতি। ১৮-১৯

৪৬ তত্ত্ব°, পৌষ। ১৪৬

৪৭ রবীন্দ্রজীবনী ২ [১৩৮৩]। ৭

৪৮ দ্র *The Bengalee,* 2 Jan 1897, p. 7

৪৯ দ্র ঐ, 9 Jan 1897, p. 14

৫০ দ্র *The Indian Messenger*, 3 Jan 1897, p. 413

---

* রবীন্দ্রনাথের লেখা মূল পাণ্ডুলিপিটি অঘোরনাথের প্রপৌত্র ব্রতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে দেখার সুযোগ পেয়েছি। সম্ভবত বৈশাখ ১৩০২-এ অঘোরনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি তারিখহীন পত্রও তাঁর সৌজন্যে দেখতে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'তোমার ইন্দ্রপূজা এবং মেয়েলি ব্রত আমাদের সকলের এবং পাঠক সাধারণের ভাল লেগেছে। মেয়েলিব্রত [সাধনা, চৈত্র ১৩০১] অনেকেই আমার লেখা বলে মনে করেছে। অন্যান্য ব্রতকথা যত পার সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়ো।' 'ইন্দ্রপূজা' ফাল্গুন ১৩০১-সংখ্যা সাধনা-তে মুদ্রিত হয়েছিল।

* তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে *The Bengalee-র* 19 Dec-সংখ্যায় লেখা হয়: 'His Highness Bir Chandra Manikya Maharajah of Tipperah died on Friday Last [11 Dec] at his Calcutta residence in [1] Little Russel Street, at the age of 58. ...He had been suffering from Bright's disease, but the immediate cause of his death was pneumonia, which was the result of a chill he caught a few days ago at Kurseong.'

* মাধুরীলতা লিখেছেন 'রবিবার ১৭ই ফাল্গুন ১৩০৩', কিন্তু ১৭ ফাল্গুন রবিবার ছিল না।

* শঙ্করীপ্রসাদ বসু তারিখটি লিখেছেন 20 Feb শুক্রবার, দ্র বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৩ [১৩৮৬]। ৩—কিন্তু 20 Feb ছিল শনিবার, অথচ তিনি অমৃতবাজার পত্রিকা-র [20 Feb] সংবাদের যে বঙ্গানুবাদ দিয়েছেন, তাতে আছে: 'মোম্বাসা বৃহস্পতিবার রাত্রে বজবজে নোঙর করে। শুক্রবার ভোরে স্বামীজী বজবজে নামেন। তারপর স্পেশাল ট্রেনে আসেন শিয়ালদহে।'

স প্ত ত্রিং শ অ ধ্যা য়

১৩০৪ [1897-98] ১৮১৯ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের সপ্তত্রিংশ বৎসর

চৈতালির শেষ কবিতা রচিত হয়েছিল ১৫ শ্রাবণ ১৩০৩ [29 Jul 1896] তারিখে। তার পরে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান রচনা করেছেন, লিখেছেন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রহসন। কিন্তু এর প্রায় অনেকটাই বাইরের তাগিদে লিখিত। আশ্বিন ১৩০২-এ শিলাইদহে বোট থাকার সময়ে, এমন-কি কার্তিক মাসে কলকাতায় রচিত গানগুলি যেমন প্রকৃতি-প্রেম-ঈশ্বর-ভাবনায় স্বতোৎসারিত হয়ে উঠেছে, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩০৩-এ লিখিত গানগুলি তেমন নয়। তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের বেতনভোগী সুপ্রসিদ্ধ গায়ক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া হিন্দি গানের সুর তাঁকে মোহিত করেছিল বটে, কিন্তু অন্তরে সুরের উৎসটি উন্মুক্ত করেনি—ফলে পরবর্তী মাঘোৎসবের কথা মনে রেখে ঐ হিন্দি গানের সুরে কথা বসিয়ে তাদের ব্রহ্মসংগীতে পরিণত করেছেন। বৈকুণ্ঠের খাতা-ও লিখিত হয়েছিল প্রধানত খামখেয়ালি সভা-র তাগিদে। 'কুহেলিকা' ['দুরাশা'] নামে যে গল্প এই সভার প্রথম অধিবেশনে তিনি পাঠ করেন, আমরা আগেই বলেছি, সেটি রচিত হয় কুচবিহারের মহারানীর গল্প শোনার আগ্রহ মেটানোর উদ্দেশ্যে।

এর পর কবিতালক্ষ্মীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার ঘটল ১৫ বৈশাখ [মঙ্গল 27 Apr] তারিখে। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির নাম 'স্বর্গপথে', এক বৎসর পরে বৈশাখ ১৩০৫-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ১-২] এটি মুদ্রিত হয় 'দুঃসময়' শিরোনামে [দ্র কল্পনা ৭। ১২১-২২]।

কবিতাটির একটি লিপিচিত্র আছে রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণে। এইটি লক্ষ্য করলে পাঠকেরা দেখবেন, প্রথম দু'টি স্তবক লেখার পরেই রবীন্দ্রনাথ '১৫ই বৈশাখ' লিখে কেটে দিয়ে তৃতীয় স্তবকের পাশে সম্পূর্ণ স্থান-কাল লিখেছেন: '১৫ই বৈশাখ/ ১৩০৪/যোড়াসাঁকো'। এর পরেও একটি স্তবক লিপিচিত্রে রয়েছে—কিন্তু, আমাদের ধারণা, এটি অন্তত 26 May [বুধ ২৩ জ্যৈষ্ঠ) তারিখের পরে রচিত। আমাদের অনুমানের কারণ, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত Ms.File 10-এ প্রিয়ম্বদা দেবীকে লিখিত একটি খাম [পোস্টমার্ক: BOLPUR 26 MY 97]—শ্রদ্ধেয় শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, সম্ভবত এই খামের মধ্যে কল্পনা-র কয়েকটি কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুলিপি রক্ষিত ছিল। আমরা আগেই বলেছি [দ্র রবিজীবনী ৩। ১৭৭], প্রিয়ম্বদা দেবীর উপহার দেওয়া একটি নোট বইয়ে [Ms. 129] রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী ও চিত্রা-র অনেকগুলি কবিতা নকল করে দিয়েছিলেন। আশুতোষ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী কবিত্বশক্তির অধিকারিণী উচ্চশিক্ষিতা এই মেয়েটিকে রবীন্দ্রনাথ খুবই স্নেহ করতেন। দূর দেশে স্বামীর ঘর করতে যাওয়া প্রিয়ম্বদার জন্য তাঁর মনোবেদনা ইন্দিরা

দেবীকে লেখা একটি পত্রে [দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ১৩৫-৩৬, পত্র ৬৩] প্রকাশ পেয়েছে। প্রিয়ম্বদা দেবীর উপহৃত নোট বইয়ে কবিতার অনুলিপি রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন হয়তো এই স্নেহেরই উপরোধে। 26 May 97-চিহ্নিত খামে প্রেরিত কোনো চিঠি এখনো উদ্ধার করা যায় নি, সেটি পেলে হয়তো দেখা যেত অনুরূপ উপরোধে তিনি সদ্যোরচিত কয়েকটি কবিতা নকল করে 'শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী/ C/O Mrs Bagchi/ Babu Nilmani Mitter's Bunglow/ Madhupur/ E. I. Ry./ Chord Line' ঠিকানায় প্রেরণ করেছেন।

যাই হোক, F. 10-এর পাঠটিতে আমরা তিনটি মাত্র স্তবক [এখানেও শিরোনাম 'স্বর্গপথে'] দেখতে পাই। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কল্পনা-র পাণ্ডুলিপি [Ms. 274]তে প্রথমে এই তিনটি স্তবকই লিখিত হয়েছিল। লক্ষণীয়, তৃতীয় এবং পরে লিখিত চতুর্থ স্তবকটি ভারতী ও কল্পনা-র পাঠে গৃহীত হয় নি [চতুর্থ স্তবকটির কিয়ংদশের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আছে প্রকাশিত পাঠের চতুর্থ স্তবকে]—পরিবর্তে রচিত হয়েছে তিনটি নূতন স্তবক। এই পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতাটির পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

এখানে উক্ত Ms. 274 পাণ্ডুলিপিটি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। এটি 1885 [১২৯২-৯৩]-এর একটি খণ্ডিত ডায়ারি—বর্তমানে প্রাপ্ত আকারে এটিতে মোট ৩৮টি পৃষ্ঠা আছে। খাতাটি উলটো করে ধরে মোট ১৯টি পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গান লিখেছেন, একটি পৃষ্ঠায় কোনো শিশুর হস্তাক্ষর, ৮টি পৃষ্ঠায় কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতের লেখায় 'কুড়েমি' ও দার্শনিক বিষয়ে গদ্যরচনা এবং একটি পৃষ্ঠায় কোনো মুদ্রিত মধ্যযুগীয় কাব্যগ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন শব্দের অর্থ-বিচার করেছেন। প্রথম পৃষ্ঠাতে আগেই রয়েছে 'তবু মরিতে হবে' প্রথম পংক্তি-বিশিষ্ট একটি অগ্রন্থিত কবিতা, যেটি উপর-নীচ কয়েকটি রেখা টেনে কেটে দেওয়া। পাণ্ডুলিপিটি কোনোভাবে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী [1878-1948]-র সংগ্রহ-ভুক্ত হয়েছিল। মাসিক পত্রিকা মানসী-র অন্যতম সম্পাদক যতীন্দ্রমোহনই সম্ভবত এই পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করে কবিতাটি উক্ত পত্রিকার কার্তিক ১৩১৯ [পৃ ৬৮২-৮৩]-সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এই পৃষ্ঠার অপর দু'টি রচনা হল দু'টি গান—'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী' [দ্র গীত ২। ৩২৪] ও 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে' [দ্র ঐ ১। ৭৬]—দু'টি গানই কাব্য গ্রন্থাবলী-তে নেই, রচনাকাল অজ্ঞাত, দ্বিতীয়টির প্রাথমিক খসড়া পাওয়া যায় 10 Sep 1894-এ লেখা ছিন্নপত্রাবলী-র ১৫২ সংখ্যক পত্রে। পেনসিলে লেখা এই পৃষ্ঠার রচনাগুলি দুষ্পাঠ্য—পাতার প্রান্তদেশ ছিন্ন হওয়ায় 'তুমি নব নব রূপে' গানটির সম্পূর্ণ পাঠও পাওয়া যায় নি। 'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী' গানটি স্বরলিপি-সহ প্রথম প্রকাশিত হয় 'বীণাবাদিনী' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০৪ [১। ১]-সংখ্যার ১৬-২২ পৃষ্ঠায়।

এর পরের দু'টি পৃষ্ঠায় [p. 2-3] আছে চিত্রা-র 'স্নেহস্মৃতি' কবিতার পাণ্ডুলিপি। এখানে রচনার তারিখ নেই, কিন্তু Ms. 129-এর অনুলিপিতে তারিখ আছে: 'বৃহস্পতিবার ১২ এপ্রেল ১৮৯৪' [৩১ চৈত্র ১৩০০]। মুদ্রিত চিত্রা কাব্যে [দ্র ৪। ৩৭-৩৯] স্থান কাল 'জোড়াসাঁকো/বর্ষশেষ, ১৩০০'।

এর পরের পৃষ্ঠা [p. 4] থেকে শুরু হয়েছে কল্পনা-র কবিতা। 'স্বর্গপথে' ['দুঃসময়'], 'বর্ষামঙ্গল', 'চৈত্ররজনী', 'চৌরপঞ্চাশিকা' [পাঠান্তর-সহ], 'ভ্রষ্ট লগ্ন', 'মার্জনা', 'স্বপ্ন', 'ধরা পড়া' ['প্রকাশ' কবিতার পাঠান্তর], 'মদনভস্মের পূর্বে', 'মদনভস্মের পর', 'স্পর্ধা', 'পিয়াসী' [পাঠান্তর] ও 'পসারিনী'—এই মোট তেরোটি কবিতার পাণ্ডুলিপি এর পরের পনেরোটি পৃষ্ঠায় রচিত হয়েছে। এছাড়া আর একটি কবিতা ও

কয়েকটি গান ব্যতীত কল্পনা-র অন্যান্য কোনো কবিতার পাণ্ডুলিপি এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে 'স্বর্গপথে'-সহ ছ'টি কবিতার সুসংস্কৃত অনুলিপি পাওয়া যায় F. 10-এ, আর আছে ২৫ বৈশাখ ১৩০৬-এ লেখা 'অশেষ' [দ্র কল্পনা ৭। ১৭৮-৮২]—এটির কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব।

চৈতালি-র প্রাচীন ভারত-সম্পর্কিত কবিতাগুলির একদিকে আছে সেকালের বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যমণ্ডিত বিলাসোচ্ছল জীবনরঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে আছে তপোবনের শান্তরসাস্পদ ধ্যানমহিমার প্রতি শ্রদ্ধা। ভারতের এই রূপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল প্রধানত কালিদাস-বাণভট্টের কাব্যসমূহ ও উপনিষদের মাধ্যমে। তাঁর এই দ্বিবিধ মনোভাব একাধারে বিধৃত হয়েছিল চৈতালি-র সনেটগুচ্ছে—তার বিশ্লিষ্ট প্রকাশ ঘটেছে কল্পনা ও নৈবেদ্য কাব্য-দু'টিতে। কল্পনা-তে বিচিত্র স্বাদের কবিতা ও গান সংকলিত হয়েছে, সুতরাং কোনো একটি বিশিষ্ট ভাবের দিক দিয়ে সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না—কিন্তু এর বহুপরিচিত, বিশেষ করে প্রথম দিকের, কবিতাগুলি ছন্দে শব্দপ্রয়োগে ও চিত্রকল্পে কালিদাস-বাণভট্টের ও কিছুটা জয়দেবের কাব্যজগতের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'স্বর্গপথে' ['দুঃসময়'] কবিতাটিতে স্বর্গের নন্দনকাননের নৃত্যগীতোচ্ছল কিন্নরীদলের বর্ণনায় আমরা যে কাব্যজগতের আভাস পাই, দু'দিন পরে ১৭ বৈশাখ [বৃহ 29 Apr] তারিখে লেখা 'বর্ষামঙ্গল' [দ্র ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫। ২০৬-০৮; কল্পনা ৭। ১২২-২৪] কবিতাতে তা পূর্ণগৌরবে উদঘাটিত হয়েছে। কবিতাটির প্রায় ছত্রে ছত্রে ঋতুসংহার মেঘদূত ও গীতগোবিন্দের বর্ণনা ও চিত্রকল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, নৃত্যপর ছন্দে ও যুক্তাক্ষরবহুল তৎসম শব্দের ধ্বনি-সংঘাতে 'শতেক যুগের কবিদলে'র রচিত বর্ষাগীতি আধুনিক কালের কবির লেখনীতে নবরূপ ধারণ করেছে।

১৯ বৈশাখে [শনি 1 May] লিখিত কবিতা 'চৈত্ররজনী' [দ্র কল্পনা ৭। ১৩৩-৩৪] ও ২৩ বৈশাখের [বুধ 5 May] 'চৌরপঞ্চাশিকা' [দ্র ঐ ৭। ১২৫-২৬] কবিতা রচনার সময়েও রবীন্দ্রনাথ একই ভাবাবহে অবস্থান করছেন। 'চৌর-পঞ্চাশিকা' একটি বিশিষ্ট সংস্কৃত কাব্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে কাশ্মীরী পণ্ডিত বিল্হন গুজরাটের রাজকন্যার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে তার প্রতি গোপন প্রণয়ে আসক্ত হন ও রাজকন্যার গর্ভসঞ্চার-সংবাদে ক্রুদ্ধ রাজার দ্বারা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কবি পঞ্চাশটি শ্লোক রচনা করে রাজার মনস্তুষ্টি বিধান করেন। অপর মতে, চৌরপল্লীর রাজা গুণসাগরের পুত্র সুন্দর রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যার উদ্দেশ্যে অনুরূপ অবস্থায় এই শ্লোকগুলি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ 'চৌরপঞ্চাশিকা' কবিতায় দ্বিতীয় কাহিনীটিকে উপলক্ষ করেছেন এবং সুন্দর-রচিত পঞ্চাশটি শ্লোকের মধ্যে সর্বকালের প্রণয়ীদের হৃদয়বেদনা ধ্বনিত হতে শুনেছেন।

Ms. 274 পাণ্ডুলিপিতে এই পাঠটি ['ওগো সুন্দর চোর,/বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যার/কনকচাঁপার ডোর!'] রচনা করার কয়েকদিন পরে ৪ জ্যৈষ্ঠ [সোম 17 May] তারিখে কলকাতাতেই তিনি এর একটি ভিন্নতর পাঠ রচনা করেন। পাণ্ডুলিপির যে পৃষ্ঠায় [p. 8] প্রথম পাঠটি শেষ হয়েছে, সেই পৃষ্ঠাতেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পরিবর্তে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ একটি পাঠান্তর ['বহু বর্ষ হতে তব বিপুল প্রণয়/ বেদনাবিহীন!' দ্র কল্পনা-গ্র°প° ৭। ৫৩১-৩৪] লিখতে আরম্ভ করেছেন। F. 10-এ রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় পাঠটিকেই নকল করেছেন, তার শীর্ষে লিখেছেন: 'এই একটিমাত্র কাব্য আছে যা কবির আত্মকথা—এই পুরাতন কাব্যকথার উপরে আমি আধুনিক কবি একটি কাব্য রচনা করেছি। যথা:—', এর পরে সম্পূর্ণ দ্বিতীয় পাঠটির অনুলেখন

রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠটির গুরুত্ব ছিল এই অনুলেখনই তার প্রমাণ, আর একটি প্রমাণ আছে ভারতী-র ভাদ্র ১৩০৬-সংখ্যায় (পৃ ৩৮৫-৮৭] এই পাঠ প্রকাশের মধ্যে। কিন্তু কল্পনা কাব্য প্রকাশের সময়ে [২৩ বৈশাখ ১৩০৭] তিনি প্রথম পাঠটিকেই প্রকাশযোগ্য মনে করেছেন। এই দু'টি পাঠের তুলনামূলক একটি সুন্দর রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিচিত্রা' [১৩৯১] গ্রন্থের 'রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর' [দ্র পৃ ১৪৮-৪৯] প্রবন্ধে, কিন্তু রবীন্দ্র-রচনাবলী-র গ্রন্থপরিচয়-এ প্রদত্ত অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পাঠটিকে 'খসড়া' ধরে নিয়ে তিনি কিছুটা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বৈশাখ মাসটি কলকাতাতেই ছিলেন। ফলে পার্ক স্ট্রীট ও অন্যত্র তাঁর যাতায়াতের অনেক হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। ৫, ৯, ১১, ১৩ ['পার্ক স্ট্রীট হইতে ধর্ম্মতালা যাওয়ার'] ১৬, ১৯, ২২, ২৬ ও ২৯ বৈশাখ তাঁর পার্ক স্ট্রীট যাওয়ার হিসাব আছে—১০ ও ১২ বৈশাখ তিনি গিয়েছেন যথাক্রমে গ্রে স্ট্রীট ও 'কেশববাবুর বাটী'। শেষোক্ত যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ক্যাশবহিতে, এখানে তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গিয়েছিলেন। অন্য হিসাবগুলি পাওয়া যায় সরকারী ক্যাশবহিতে, পারিবারিক ও জমিদারি কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথের যাতায়াতের হিসাব এখানেই লিখিত হত। ৭ বৈশাখের এইরূপ একটি হিসাব: 'মকদ্দামার পরামর্শ করিতে সারদা মিত্র উকীলের বাটী যাতায়াতের'—সম্ভবত জমিদারি-বিভাগের মামলার তত্ত্বাবধান করাই উদ্দেশ্য ছিল।

'কুন্তলীন' কেশতৈল প্রস্তুতকারী ও 'কুন্তলীন পুরস্কার'-এর প্রবর্তক এইচ. বোস বা হেমেন্দ্রমোহন বসু [1864-1916] নানা সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ইনি ১৩০১ সাল থেকে 'কুন্তলীন পঞ্জিকা' নামে বাংলা তারিখ মুদ্রিত দু'পয়সা দামের একটি ছোটো [13.3x8.8 cm] ডায়ারি বিতরণ করতেন। রবীন্দ্রভবনে 'চতুর্থ বৎসর।/ কুন্তলীন পঞ্জিকা।/ ১৩০৪ সন।' -এর এইরূপ একটি ডায়ারি [Ms. ৪৪] আছে। এর মলাটে বিভিন্ন প্রখ্যাত ব্যক্তির Testimonials-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া যে প্রশংসাবাণী আছে সেটি আমরা উদ্ধৃত করছি:

Mr. Rabindra Nath Tagore, the celebrated and highborn poet of Bengal says:

We have been trying Kuntaline for about two months. A relation of mine was long suffering from falling off of the hair. But new hair began to grow on her head within a month's use of Kuntaline. It is a perfumed oil, and its fragrance does not deteriorate after use.

—এর আগে ডোয়ারকিন অ্যাণ্ড সন্‌স্-এর হারমোনিয়ামের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ একটি পত্র লিখেছিলেন, সেটি বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তা না হয়ে থাকলে উপরের প্রশংসা বাণীটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ভবিষ্যতে এইরূপ দৃষ্টান্ত ক্রমশই সহজলভ্য হয়ে এসেছে।

এই ডায়ারিটি অন্য কারণেও মূল্যবান, যথাস্থানে আমরা সে-বিষয়ে আলোচনা করব।

বৈশাখ মাসের শেষে সাধনা-য় ডায়ারি, পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি, পঞ্চভূতের ডায়ারি ইত্যাদি নামে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি 'পঞ্চভূত' নামে প্রকাশিত হল। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 12 May 1897 [বুধ ৩০ বৈশাখ], মুদ্রণসংখ্যা ১০২০। পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+২+১৯৫। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

পঞ্চভূত।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/প্রকাশক/সুর কোম্পানি।/১৪নং ডফ্‌ষ্ট্রীট্‌।/১৩০৪।

আখ্যাপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায়:

আদি ব্রাহ্মসমাজ/ প্রেস্।/মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থটি নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়কে উৎসর্গীত হয়:

উৎসর্গ।/মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর/সুহৃদ্বরকরকমলেষু।

রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত কপিটি 'শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী/করকমলেষু' লিখে রবীন্দ্রনাথ উপহার দিয়েছিলেন।

সুর কোম্পানি গ্রন্থটির প্রকাশক হলেও রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত প্রকাশব্যয়ের কিছুটা বহন করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহির ২১ বৈশাখের হিসাব থেকে এমনটিই মনে হয়: 'বঃ সুর কোম্পানী দং পঞ্চভূত নামক বইয়ের কবরিংয়ের জন্য কাগজ ৭ দিস্তে ক্রয়...৩লত [এই মূল্যমানের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আমরা কী-ই বা করতে পারি]। ৩ জ্যৈষ্ঠ এই পুস্তক-সংক্রান্ত আর একটি হিসাব আছে: 'পঞ্চভুত বই ৮খানা ডাকে স্থানে ২ পাঠান টিকিট ব্যয়... ॥০'।

এই বই রবীন্দ্রনাথ ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এক খণ্ড পাঠিয়েছিলেন; তিনি 11 May [২৯ বৈশাখ] 'নারিকেলডাঙ্গা' থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন:

'আপনার "পঞ্চভূত" নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম ও যত্নের সহিত পাঠ করিব।/ গ্রন্থখানি পাইবামাত্রই তাহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি, ও পাঠ করিয়া আপনার গূঢ়ার্থ সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছি কিনা যদিও তাহা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। একটা মোটামুটি এই মনে হইতেছে (আপনি হয়ত শুনিলে হাসিবেন) যে সাহিত্যক্ষেত্রেও যে পঞ্চভূত ময় ইহা আপনার "পরিচয়" শীর্ষক অধ্যায়ে সুন্দর রূপে দেখান হইয়াছে। তবে একথাটা ব্যোমের মত কথা হইল কি সমীরের মত হইল বলা যায় না।

—লক্ষণীয়, পত্রের তারিখটি বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে প্রদত্ত তারিখের পূর্ববর্তী। গ্রন্থটি যে এর আগেই প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, এই পত্রটিই তার প্রমাণ।

৩ জ্যৈষ্ঠ [রবি 16 May] পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে মহর্ষির একাশীতিতম জন্মোৎসব পালিত হয়। তত্ত্ববোধিনী-তে প্রকাশিত বিবরণে [আষাঢ়। ৩৩-৩৫] এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো ভূমিকা লক্ষিত না হলেও তিনি যে উপস্থিত ছিলেন তা জোর করেই বলা যায়।

৪ জ্যৈষ্ঠ তিনি 'চৌরপঞ্চাশিকা' কবিতার একটি পাঠান্তর রচনা করেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে তারিখের সঙ্গে 'কলিকাতা' উল্লিখিত। এই দিনই তিনি ও দ্বিপেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন রওনা হন; ক্যাশবহিতে তথ্যটি স্পষ্ট করেই লিপিবদ্ধ হয়েছে: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্র বাবু মহাশয় গত ৪ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বোলপুর শান্তিনিকেতনে গমন করেন তাহার ব্যয় শোধ...১৮৫ লত'। রবীন্দ্রনাথ ১৮ জ্যৈষ্ঠের [সোম 31 May] আগেই ফিরে এসেছিলেন, সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয়ের কারণ কী বলা শক্ত।

এবারের শান্তিনিকেতন-বাস রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার দিক দিয়ে খুব ফলপ্রসূ হয়েছে। ৭ জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৪ জ্যৈষ্ঠ এই আট দিনে তিনি আটটি কবিতা রচনা করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি তো রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের রত্নবিশেষ। আমরা এগুলির একটি তালিকা করে দিচ্ছি:

৭ [বৃহ 20 May] 'ভ্রষ্টলগ্ন' দ্র কল্পনা ৭। ১৩৮-৪০; প্রদীপ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬। ৩২৩

৮ [শুক্র 21 May] 'মার্জনা' দ্র কল্পনা ৭। ১৩২-৩৩; প্রদীপ, অগ্র° ১৩০৬। ৩৯৬-৯৭

৯ [শনি 22 May] 'স্বপ্ন' দ্র কল্পনা ৭। ১২৭-২৯; ভারতী, মাঘ ১৩০৫। ১২৩-২৫

১০ [রবি 23 May] 'ধরা পড়া' দ্র কল্পনা-গ্র°প° ৭। ৫৩৫-৩৭

এই পাঠটি Ms. 274-এ প্রথম রচিত হয়েছিল, পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, 'তখন মহাত্রিভুবন....ছিল না এত সাবধানী!' এই দ্বিতীয় স্তবকটি পরে যুক্ত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই পাঠটিকে বর্জন করেন ও আঠারো মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে 'প্রকাশ' শিরোনামে এটিকে নূতন রূপ দেন। এই পাঠের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, 'কল্পনা' [১৩০৭] গ্রন্থে গৃহীত [দ্র ৭। ১৬৯-৭১] হবার সময়ে কবিতার শেষে শুধু '১৩০৪' এই কাল-নির্দেশ আছে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিচিত্রা' গ্রন্থে [পৃ ১৪৫-৪৮] দু'টি পাঠের তুলনামূলক রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন; তবে তিনি-যে লিখেছেন: "খসড়ায় ইহার নাম 'ধরা-পড়া'—অবশ্য বন্ধনীমধ্যে 'প্রকাশ' শব্দটিও লিখিত আছে"—এই লেখা রবীন্দ্ররচনাবলী-সম্পাদকের, পান্ডুলিপিতে কেবল 'ধরা পড়া'ই লেখা।

১১ [সোম 24 May] 'মদনভস্মের পূর্বে' দ্র কল্পনা ৭। ১২৯-৩১; ভারতী, আশ্বিন ১৩০৫। ৪৯৮-৫০০

১২ [মঙ্গল 25 May] 'মদনভস্মের পর' দ্র কল্পনা ৭। ১৩১-৩২; ভারতী, আশ্বিন ১৩০৫। ৫০০-০১

দু'টি কবিতারই পাণ্ডুলিপি Ms. 274-এ আছে। 'মদনভস্মের পূর্বে' [পাণ্ডুলিপিতে নামকরণ হয় নি] কবিতার চতুর্থ স্তবকটি পরে যুক্ত।

১৩ [বুধ 26 May] 'স্পর্ধা' দ্র কল্পনা ৭। ১৩৪-৩৫

একটি কবিতা কিভাবে 'নির্মিত' হয়ে ওঠে, এই কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে তার সুন্দর পরিচয় আছে। উদাহরণ স্বরূপ পাণ্ডুলিপির প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করি:

> যবে সে আসি কহিল, প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও
> আমি বিষম রুষিয়া কহিনু তাহারে যাও
> শুধু কেন সে শুনিল না

এইরূপে অন্য স্তবকগুলি যথাক্রমে 'তবু কেন সে মানিল না', 'তবু কেন সে শুনিল না', 'তবু কেন সে ফিরিল না', 'তবু কেন সে ছাড়িল না' ও 'তবু কেন সে ফিরিল না' ছত্রগুলি দিয়ে প্রথমে রচিত হয়েছিল। পরে প্রতিটি স্তবকের অন্তিম ছত্র-দু'টি নতুন করে লেখার ফলে কতখানি নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে, তুলনার সাহায্যে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন।

১৪ [বৃহ 27 May] 'এখনো ভোরের অলস নয়নে তন্দ্রা ভাঙেনি ভালো' দ্র কল্পনা-গ্র°প° ৭। ৫৩৪-৩৫

এই কবিতাটিই 'পিয়াসী' [দ্র কল্পনা ৭। ১৩৫-৩৬] নামে পাঠান্তরিত হয়ে কল্পনা গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। লক্ষণীয়, এখানেও পাঠান্তর ঘটেছে প্রধানত নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। প্রথম খসড়াটি Ms. 274 পাণ্ডুলিপিতে তারিখ-সহ পাওয়া যায়, দ্বিতীয় পাঠটির পাণ্ডুলিপি নেই, গ্রন্থে রচনাকাল '১৩০৪'।

কল্পনা-র কবিতার একটি গুচ্ছ এখানে শেষ হল। এর পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতা যাত্রা করেন। কলকাতায় আসার সঠিক তারিখটি নির্ধারণ করা যায় নি, কিন্তু ১৮ জ্যৈষ্ঠ [সোম 31 May] তাঁকে পার্ক স্ট্রীটে যেতে দেখা যায়। ২০ জ্যৈষ্ঠও তিনি পার্ক স্ট্রীটে যান, ২২ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 4 Jun] যান 'বালিগঞ্জের বাটীতে থিয়টার দেখিতে'—বালিগঞ্জে তখন কার বাড়িতে কোন্ নাটক হয়েছিল আমাদের জানা নেই।

এইখানে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয়ের কথা বলে রাখা দরকার। বৈকুণ্ঠের খাতা প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩০৩-এর শেষে। আশুতোষ চৌধুরীর ধর্মতলা স্ট্রীটের বাড়িতে খামখেয়ালী সভার অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি

পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। এর পরে নাটকটি অভিনয়ের আয়োজন হয়। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন:

....খামখেয়ালীতে পড়া হল, ঠিক হল আমরা অভিনয় করব। কেদার হলেন রবিকাকা, মতিলাল চক্রবর্তী সাজলেন চাকর [ঈশান], দাদা বৈকুণ্ঠ, নাটোরের মহারাজা অবিনাশ, আমি সেই তিনকড়ি ছোকরা। ওই সেবারেই আমার অভিনয়ে খুব নাম হয়। তখন আরো মোটা লম্বা-চওড়া ছিলুম অথচ ছোকরার মতো চট্‌পটে, মুখেচোখে কথা; ....একটা বোতাম-খোলা বড়ো ছিটের জামা গায়ে, পানের পিচ্‌কি বুকময়। ....এক হাতে সন্দেশের ঝুড়ি, আর-এক হাতে খেতে খেতে স্টেজে ঢুকছি, রবিকাকার সঙ্গে সমানে সমানে কথা কইছি, প্রায় ইয়ার্কি দিচ্ছি খুড়ো-ভাইপোতে। প্রথম প্রথম বড়ো সংকোচ হত, হাজার হোক রবিকাকার সঙ্গে ও-রকম ভাবে কথা বলা, কিন্তু কী করব—অভিনয় করতে হচ্ছে যে। কথা তো সব মুখস্থ ছিলই, তার উপর আরো বানিয়ে টানিয়ে বলে যেতে লাগলুম। রবিকাকা আর থৈ পান না। আমাদের সেই অভিনয় দেখে গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন, এরকম অ্যাক্টর সব যদি আমার হাতে পেতুম তবে আগুন ছিটিয়ে দিতে পারতুম।[১]

—অবনীন্দ্রনাথের কথা থেকে মনে হয়, প্রহসনটি একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল।

অভিনয়টি কবে হয়েছিল বলার মতো তথ্য নেই। তবে এর আয়োজক ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, অভিনয় হয় তাঁদেরই বৈঠকখানা বাড়িতে। খামখেয়ালী সভার খসড়া কার্যবিবরণীর তালিকায় পঞ্চম অধিবেশনের বিবরণে আছে:

৫ গগনদাদা
বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয়
Evening Party
Standing supper
অনেক বাইরের লোক

—রবীন্দ্রনাথ এই খসড়াটিকে সুসংস্কৃত করে লিখে রাখেন নি।

খামখেয়ালী সভার তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনের কথাও এখানে আমরা বলে নিতে পারি, কারণ খসড়া ও সুসংস্কৃত কার্যবিবরণীর কোনোটিতেই এগুলির তারিখ উল্লিখিত হয় নি। তৃতীয় অধিবেশনের আহ্বায়ক ছিলেন বলেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কার্যবিবরণীতে লিখেছেন:

৩।—খাষ্‌ মজলিস্‌।

তারিখ।	
স্থান।	যোড়াসাঁকো।
নিমন্ত্রণকর্ত্তা।	শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর॥
অনুষ্ঠান।	শ্রীগগনেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক “অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি” আবৃত্তি। শ্রী রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক “ মানভঞ্জন” ও “ক্ষুদিত পাষাণ” নামক গল্প পাঠ [খসড়ায়: ‘রবিকার গল্প পড়া পুরোন’]। গোঁসাইজীর গান ও তাঁহার দাদার [কৃত্তিবাস গোস্বামী] সঙ্গৎ। গীতবাদ্য।
আহার।	ধূপধূনা রসুনচৌকি সহযোগে, তাকিয়া আশ্রয় করিয়া, রেশমবস্ত্রমণ্ডিত জলচৌকিতে জলপান। অভ্যাগতবর্গ। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস।/,, অতুলপ্রসন্ন [প্রসাদ] সেন।/,, অমিয়নাথ চৌধুরী/,, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর/,, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর/,, অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর [খসড়ায় অতিরিক্ত নাম: প্রমথ (চৌধুরী)/ শেষেন্দ্র (ভূষণ) চট্টোপাধ্যায়)]।

বলেন্দ্রনাথ-আয়োজিত তৃতীয় অধিবেশনের অন্যতম অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার-গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেন। তিনি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে দিল্লিতে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে এই অধিবেশনের একটি চমৎকার স্মৃতিচারণ করেছেন:

একটি দিনের কথা আমার খুব মনে আছে। সেবার বলেন্দ্রনাথের পালা। কবিবরের কবিতা ও অন্যান্যের রচনা পাঠ। সংগীত, হাসির গান ইত্যাদি খামখেয়ালীর উৎসবানন্দ সম্ভোগের পর স্বল্পভাষী ও বিনয়ী বলেন্দ্রনাথ আমাদিগকে আহারের জন্য অন্য একটি ঘরে লইয়া গেলেন। সে ঘরটি এমনভাবে পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত ছিল যে মনে হইতেছিল নন্দনের ফুলকুঞ্জে প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দেখিলাম একটি জলাশয়, তার মাঝে মাঝে দু'একটি বনস্পতি, জলে রাজহংস, জলপদ্ম, সরসীর তটের চারিপার্শ্বে নবদুর্বাদল—সকলই প্রকৃতির অনুকারী। কিন্তু হংস, তরুলতা, দুর্বাদল সকলই কৃত্রিম। সেই কাচ-নির্মিত সরোবরের চারিপাশে নিমন্ত্রিতের বসিবার স্থান; প্রত্যেকটি আসনের সম্মুখে নানাপ্রকার খাদ্যসম্ভার, তাহাতেও বিচিত্র বর্ণবিন্যাস। আমরা যেই খাইতে বসিলাম অমনি কোন এক প্রচ্ছন্ন স্থান হইতে মৃদু-মধুর সানাই বাজিতে লাগিল। আর বাক্যশিল্পী, আলাপকুশলী, হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, জগদীন্দ্র রায়, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী আমাদিগকে তখন এমন হাসাইতে লাগিলেন যে, সে আলোড়নে সুখ-খাদ্য কোথায় যে তলাইয়া যাইতে লাগিল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এরূপ নানাবিধ আনন্দের বিচিত্র সমাবেশ আমি কখনও সম্ভোগ করি নাই।'[১ক]

কার্যবিবরণীতে অতুলপ্রসাদ-কথিত দ্বিজেন্দ্রলাল, জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর নাম পাওয়া যায় না।

খামখেয়ালী-র চতুর্থ অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁর ওল্ড্ পোস্ট অফিস স্ট্রীটের চেম্বারে। রবীন্দ্রনাথ কার্যবিবরণীতে লিখেছেন:

৪।—খাষ্ মজ্‌লিস্

তারিখ।	
স্থান।	৭ ওল্ড্ পোষ্ট্ অফিস ষ্ট্রীট্।
কর্ত্তা।	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।
কর্ম্ম।	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক "গোড়ায় গলদ্" নাটক পাঠ [খসড়ায়: 'সুইদার (সুধীন্দ্রনাথ) গল্প']।
আহার।	ফরাসে বসিয়া প্লেট্‌পাত্রে মোগ্‌লাই খানা।
অভ্যাগত।	শ্রীযুক্ত উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [খসড়ায়: 'একজন member বাদ']।

রবীন্দ্রনাথ কার্যবিবরণীতে এই চারটি মাত্র অধিবেশনের বিবরণ লিখে রেখেছেন। এছাড়াও খসড়ায় কয়েকটি বিবরণ আছে। পঞ্চম অধিবেশনের কথা আমরা বলেছি। অন্যগুলির কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হবে।

আমরা আগেই বলেছি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার জন্য 1888 [১২৯৫] থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন [Bengal Provincial Conference] অনুষ্ঠানের সূচনা হয় [দ্র রবিজীবনী ৩। ১১৩-১৪]। প্রথম দিকে কয়েক বছর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। কিন্তু প্রাদেশিক সম্মেলনে যে-সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত তা প্রধানত মফস্বলের জনগণের সমস্যা, সুতরাং তার আলোচনা মফস্বল শহরেই হওয়া বাঞ্ছনীয় এই ধারণায় মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে 1895-এ প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়। 1896-এ এই সম্মেলন হয় নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের আগ্রহে রাজশাহী জেলার নাটোরে বর্তমান বৎসরের সম্মেলন আহূত হয়। সিভিল সার্ভিস থেকে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সত্যেন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের সভাপতি হন। নাটোরের মহারাজা হন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। তাঁর সঙ্গে ঠাকুরপরিবারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তার ফলে অন্যান্য প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে

ঠাকুরপরিবারের অনেকে নাটোরে উপস্থিত হন। কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে কীরকম রাজসমাদরে তাঁরা নাটোরে পৌঁছেছিলেন তার সরস বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ [দ্র ঘরোয়া। ৭২-৭৪]।

রবীন্দ্রনাথ এর আগেই শিলাইদহে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি শিলাইদহ বোটে ২৫ জ্যৈষ্ঠ [সোম 7 Jun] লেখেন 'পসারিনী' [দ্র কল্পনা ৭। ১৩৭-৩৮; ভারতী, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৬। ৬১৭-১৯] কবিতা। Ms. 274-এ কবিতাটি রচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত শিলাইদহ থেকে নাটোরে যান। অবনীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যেরা যে ২৭ জ্যৈষ্ঠের [বুধ 9 Jun] মধ্যে নাটোরে পৌঁছে গেছেন, তার প্রমাণ রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচের খাতায়—এইদিন তিনি নাটোর প্রাসাদে অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের ছবি আঁকেন। এইবারে তিনি অনেক ব্যক্তির ছবি এঁকেছিলেন। তালিকায় দেখা যায় তিনি 10 Jun নৃত্যগোপাল বাবু যোগেশ চৌধুরী ও অমিয় চৌধুরী, 11 Jun নলিন সরকার প্রমথ চৌধুরী ও প্রমথ চট্টোপাধ্যায় এবং 13 Jun রমণীকান্ত রায় (চৌগ্রাম) প্রভৃতির স্কেচ করেছেন। তাঁর তারিখহীন একটি ছবির বর্ণনায় আছে: 'a sketch of the President's Table and a bell with a humourous paragraph on the President's Bell written by the artist [২০৪৯-সংখ্যক চিত্র]। নাটোরের পুরোনো বাড়ি ঘর মন্দির ও সম্মেলনের নেতাদের ['চাঁইদের'] অনেক স্কেচ অবনীন্দ্রনাথও করেছিলেন [দ্র ঘরোয়া। ৪৫-৪৬]।

10 Jun [বৃহ ২৮ জ্যৈষ্ঠ] বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন আরম্ভ হল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> প্রথম দিনেই যা কনফারেন্স হয়েছিল। ঘটনার অনেকদিন পরে বাবার কাছে তার একটি গল্প শুনি। ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার হয় তার মানে আছে, কিন্তু প্রাদেশিক সম্মিলনেও ইংরেজিতে বক্তৃতা হবে বাবার তাতে খুব আপত্তি ছিল। কনফারেন্সের সভাপতি মেজজ্যাঠামহাশয়েরও তাই মত দেখে, বাবা বললেন বাংলাভাষা ব্যবহার হোক এই মর্মে সভার প্রারম্ভেই তিনি এক প্রস্তাব তুলবেন। স্থির হল মহারাজা এই প্রস্তাবের সমর্থন করবেন। প্রস্তাব উপস্থিত হতেই অধিকাংশ সভ্যেরা উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের সম্মতি জানালেন। প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু কংগ্রেসের যাঁরা প্রকৃত পাণ্ডা তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন দেখে বাবা তাঁদের শান্ত করলেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, তাঁদের ইংরেজি বক্তৃতা তিনি নিজে সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তর্জমা করে দেবেন। তাঁরা তখনকার মত আশ্বস্ত হলেন বটে, কিন্তু তাঁদের মনে রাগ রয়ে গেল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেসের মহারথীরা বরাবর ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাঁদের ইংরেজি ভাষায় যেমন দখল, বক্তৃতা দেবার ক্ষমতাও তেমনি আশ্চর্য। তাঁরা বাংলায় কি করে বক্তৃতা দেবেন? তাঁরা কয়েকজন ইংরেজিতেই বললেন, বাবা সেগুলি বাংলায় তর্জমা করে দিলেন। অধিবেশন ভাঙার সময় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) ঠাট্টা করে বাবাকে শোনালেন—"Rabi Babu, your Bengali was wonderful, but do you think your *chasas* and *bhusas* understood your mellifluous Bengali better than our English?"[২]

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-সম্পর্কে লিখেছেন:

> রাজসাহী-সম্মিলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রূপ করেছিলেন।....পর বৎসরে রুগ্নশরীর নিয়ে ঢাকা-কন্ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্‌যোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ ইংরেজি আমি জানি নে।'[৩]

The Bengalee [19 Jun] পত্রিকার বিবরণেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তির্যক কটাক্ষ অস্পষ্ট থাকে নি:

> One noteworthy feature of this year's Conference was the prominence that was given to Bengali speeches with a view to make the proceedings thoroughly intelligible to those of the audience who did not know English. Babu Rabindranath Tagore rendered the Presidential speech in Bengali, and need we say that this was done in the speaker's felicitious style?

সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য ইংরেজিতে অভিভাষণ দেন, রবীন্দ্রনাথ সেই ভাষণের বঙ্গানুবাদ করে শুনিয়েছিলেন। তবে প্রসিদ্ধ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ বাংলাতেই বক্তৃতা করেছিলেন, তাঁর বক্তৃতা অবনীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। অবশ্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা এই প্রথম নয়, 1889 [১২৯৬]-এ দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাংলায় বক্তৃতা করেন—তাঁর বক্তৃতা উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল [দ্র রবিজীবনী ৩। ১৩৯]।

কৃষ্ণনগর-সম্মেলনেও অনেকে বাংলায় বলেছিলেন, এ কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

সভার শুরুতে রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনী সংগীত করেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'রবিকাকার গান ছিল, গান তো আর ইংরেজিতে হতে পারে না, বাংলা গানই হল। 'সোনার বাংলা' গানটা বোধ হয় সেই সময়ে গাওয়া হয়েছিল—রবিকাকাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো।'[৪] শেষোক্ত তথ্যটি অবশ্য ঠিক নয়—'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' [গীত ১। ২৪৩] গানটি 1905 [১৩১২-এ] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রচিত হয়েছিল। সমসাময়িক পত্রিকায় অবশ্য সংগীত-পরিবেশনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

পরের দিন 12 Jun [শনি ৩০ জ্যৈষ্ঠ] প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়। C. E. Buckland লিখেছেন:

At 5 o'clock P. M., of the 12th June 1897 an earthquake shock, varying in severity, was felt throughout the province of Bengal, from the South Lushai hills on the east to Shahabad on the west, and from Puri on the south to Sikhim on the north. The shock was far more severe over a larger area than that of any previous earthquake in Bengal of which any authentic record exists. .....It was strongest in the districts of the Rajshahi division, the Kuch Bihar State, and the districts of Dacca and Mymensingh.[৫]

নাটোরে এই ভূমিকম্পের ফলে উদ্ভূত অবস্থার সরস ও জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ [দ্র ঘরোয়া। ৭৭-৮১] —কিন্তু তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় প্রথম দিনের অধিবেশনের শেষে ভূমিকম্প হয়েছিল, বস্তুত তা হয়েছিল তৃতীয় দিনে। সেই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য সবাই উদ্বিগ্ন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'আমরা সবাই যাবার জন্য ব্যস্ত ছিলুম। রবিকাকাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, বাড়ির জন্য ওরকম ভাবতে তাঁকে কখনো দেখি নি—মুখে কিছু বলতেন না অবশ্য, তবে খবর পাওয়া গিয়েছিল কলকাতায় বাড়ি দু-এক জায়গায় ধসে গেছে, তাই সবার জন্যে ভাবনায় ছিলেন খুব।'[৬] ভাবনার কারণও ছিল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'নীচে নামবার সময় ছাদ থেকে টালি ভেঙে মা-র মাথায় পড়ল। একতলার একটা ঘরে তাঁকে শুইয়ে রাখা হল। নিজের আঘাতের যন্ত্রণা অপেক্ষা দুশ্চিন্তা তাঁর বেশি হল। বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই—নাটোরে তাঁদের কি হচ্ছে খবর নেবার উপায় নেই। রেলপথ বন্ধ, টেলিগ্রাম যাতায়াত বন্ধ।'[৭] রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য সেইদিনই টেলিগ্রাম করার হিসাব পাওয়া যায় ক্যাশবহিতে: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের নিকট নাটরে টেলিগ্রাম করার ব্যয় ৩০ জ্যৈষ্ঠ...১ল০'। ভূমিকম্পে জোড়াসাঁকোয় মহর্ষিভবনের ক্ষতিরও উল্লেখ আছে ক্যাশবহিতে: 'ব° রহিম বক্স মিস্ত্রী দং ভুমিকম্পে বাটীর স্থানে স্থানে ফাটিয়া যাওয়ায় তাহা সকল খুড়িয়া একজামিন করায় ও বালি রাবিশ ইত্যাদি সাফ'।

১ আষাঢ় [সোম 14 Jun] রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের সংবাদও ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় ১ আষাঢ় সেহালদহায় ষ্টীসেন হইতে বাটী আসিবার...'। এই দিনই তিনি পার্ক

স্ট্রীটেও যান সম্ভবত উদ্বেগক্লিষ্ট পিতাকে সমস্ত সংবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে।

আষাঢ় মাসে তাঁর পার্ক স্ট্রীটে যাওয়ার আরও হিসাব আছে। ৩, ৬, ৮, ১২, ১৪, ১৬, ১৭ ['রবীন্দ্রবাবু মহাশয় ও সত্যবাবু মহাশয়ের'], ১৮, ২১, ২৫, ২৮ ও ৩১ আষাঢ় তিনি পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াত করেছেন। ১৩ আষাঢ় [শনি 26 Jun] তিনি যান মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। এই হিসাবগুলি সরকারী ক্যাশবহির, তিনি পারিবারিক কাজে এই সব যাতায়াত করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে ২ ও ২৭ আষাঢ় বিডন স্ট্রীটে যাতায়াত ও ৩ আষাঢ় 'বালিগঞ্জ হইতে আসিবার' হিসাব পাওয়া যায়—এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যাতায়াত। কিন্তু ক্যাশবহি শুধু ভ্রমণের সংবাদই দিতে পারে, ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার কিছু বলার ক্ষমতা অত্যন্ত পরিমিত।

অবশ্য 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রবাবু শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রবাবু শ্রীযুক্ত সত্যবাবু মহাশয় প্রভৃতি ভবানীপুর যাতায়াতের গাড়িভাড়া বিঃ ৯ আষাঢ়ের' [মঙ্গল 22 Jun] হিসাবটি উক্ত সমাজের সাংবৎসরিক উৎসবে যোগদানের তথ্যটি সরবরাহ করেছে। কলকাতায় ভবানীপুর ও বেহালা ব্রাহ্মসমাজ আদি সমাজের মতাদর্শের অনুসারী ছিল, ফলে এই দু'টি সমাজের অনুষ্ঠানে ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা—কলকাতায় থাকলে রবীন্দ্রনাথও—উপস্থিত থাকতেন।

এই দিন রবীন্দ্রনাথ 'নাটর মহারাজ' ও 'কে, সি, সেন' [? করুণাচন্দ্র সেন]-কে দু'টি চিঠি লিখেছেন, ১৬ আষাঢ় [মঙ্গল 29 Jun] লেখেন 'বিলাতে সতীশবাবুর [ভগ্নীপতি ডাঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়] নিকট'—কিন্তু এই চিঠিগুলির কোনোটাই পাওয়া যায় নি।

সম্ভবত ২৮ আষাঢ় [রবি 11 Jul] খামখেয়ালী সভার একটি অধিবেশন হয়। এই অনুমানের কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ২ শ্রাবণের [শনি 17 Jul] একটি কবিতা-পত্র:

> 'লোকেশ্বরী' যে গল্প
>   আপনার দ্বারা গঠিত
> গত রবিবারে যেটি সেই
>   খামখেয়ালিতে পঠিত
> 'সাহিত্যে' সেটি প্রকাশে
>   যদি কোন বাধা নাহি গো
> প্রকাশ করিতে সেটিকে
>   আপনার কাছে চাহি গো
> সুরেশচন্দ্র দিনরাত
>   ক্রমাগত পীড়াপীড়িয়া
> সেটির জন্য আমাকে
>   খাইছেন যেন ছিঁড়িয়া
> ক্রমাগত আর পারি না
>   এই খেঁচাখেঁচি সহিতে
> হইল এ ছোট অনুরোধ
>   মুখ ফুটে তাই কহিতে

রবীন্দ্রনাথ এই অনুরোধ রাখতে পারেন নি, পত্রের উপরেই পেনসিল দিয়ে লিখেছেন:

> চেয়েছেন মোর রচনা

সে জন্যে আমি গর্ব্বিত
কিন্তু কাগজে ছাপালে
হয়ে যায় সেটা চর্ব্বিত
তা ছাড়া এ সব লেখাতে
খামখেয়ালেরই অধিকার।
লেখক কেবল উপলক্ষ্য
কি বলিব আমি অধিক আর।
দিয়েছি যা খামখেয়ালে
ফিরে নেওয়া মোর কার্য্য না,
অতএব আজ দয়া করে
করিবেন মোরে মার্জ্জনা*

—এই পত্র থেকে অনুমান হয়, পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক বা তারও আগে সঞ্জীবনী সভার মতো খামখেয়ালী সভায় পঠিত রচনার ক্ষেত্রেও প্রকাশের ব্যাপারে বিধিনিষেধ ছিল—এইজন্য এই সভায় পঠিত বহু রচনা অনেক পরে যখন প্রকাশিত হয়, তখন খামখেয়ালী সভার অপমৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু 'লোকেশ্বরী' নামে কোনো গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, গল্পটি হল অবনীন্দ্রনাথ-রচিত 'দেবীপ্রতিমা' [দ্র ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫। ২৮৯-৯৮]—দেবী লোকেশ্বরী সেখানে অন্যতম চরিত্র। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ ঘরোয়া-য় [পৃ ১২০] বলেছেন: "আমি খামখেয়ালীতে প্রথম পড়ি 'দেবীপ্রতিমা' বলে একটা গল্প"—দ্বিজেন্দ্রলালের চিঠি থেকে মনে হয়, গল্পটি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন।

৪ শ্রাবণ [সোম 19 Jul] সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে জোড়াসাঁকোতে খামখেয়ালী সভার একটি অধিবেশন বসে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'নিমন্ত্রণপত্রও বেশ মজার ছিল। একটা শ্লেট ছিল, সেটা পরে দারোয়ানরা নিয়ে রামনাম লিখত, সেই শ্লেটটিতে রবিকাকা প্রত্যেকবারে কবিতা লিখে দিতেন, সেইটি সভার সভ্য ও অভ্যাগতদের বাড়ি বাড়ি ঘুরত। ওই ছিল খামখেয়ালীর নেমন্তন্ন পত্র।'[৮] শ্লেটে লেখবার আগে রবীন্দ্রনাথ কবিতাপত্রটির খসড়া করে নিতেন টুকরো কাগজে। এইরূপ কয়েকটি কাগজ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে খামখেয়ালী সভার কার্যবিবরণী [Ms. 152]-র সঙ্গে। বর্তমান অধিবেশনের নিমন্ত্রণপত্রটি হল:

এতদ্বারায় notification
খামখেয়ালীর সভাধিবেশন
চৌঠা শ্রাবণ শুভ সোমবার
যোড়াসাঁকো গলি ৬ নম্বার
ঠিক ঘড়ি ধরা রাত সাড়ে সাত
সত্যপ্রসাদ কহে যোড় হাত।
যিনি রাজি আর যিনি গর্‌রাজি
অনুগ্রহ করে লিখে দিন্ আজই।

—ঈষৎ পাঠান্তর-সহ অবনীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ-পত্রটি ঘরোয়া [পৃ ১২০]-য় স্মরণ করেছেন। পত্রে কার্যসূচীর উল্লেখ নেই, কার্যবিবরণীতেও এই সভার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর দাদা সমরেন্দ্রনাথ-কর্তৃক আহূত একটি অধিবেশনের আমন্ত্রণপত্রের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত খসড়াটি আমরা উদ্ধৃত করছি:

শুন সভ্যগণ যে যেখানে থাকো।

সভা খামখেয়াল, স্থান যোড়াসাঁকো;
বার রবিবার রাত সাড়ে সাত,
নিমন্ত্রণকর্ত্তা সমরেন্দ্রনাথ।
তিনটি বিষয় যত্নে পরিহার্য্য,
দাঙ্গা, ভূমিকম্প, পুণাহত্যাকার্য্য।
এই অনুরোধ রেখো খামখেয়ালী
সভাস্থলে এসো ঠিক punctually।

—বার উল্লিখিত হলেও, তারিখ না লেখায় অধিবেশনটি কোন্ দিনে হয়েছিল নির্ধারণ করা শক্ত। এমন হতে পারে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-উল্লিখিত রবিবারে অর্থাৎ ২৮ আষাঢ় [11 Jul] এই অধিবেশন বসেছিল। কার্যবিবরণীতে এই অধিবেশনেরও বর্ণনা নেই।

উপরোক্ত পত্রটির কিছু টীকা আবশ্যক। 'দাঙ্গা, ভূমিকম্প, পুণাহত্যাকার্য্য'-এর মধ্যে ভূমিকম্পের ব্যাপারটি পাঠকদের জানা। এ নিয়ে তখন পূর্বভারতের সকলেই সরব। অন্য দু'টি ব্যাপারও তখন বহু আলোচিত। 1896-এ বোম্বাই প্রদেশে মহামারী আকারে প্লেগ-রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই রোগ দমনের উদ্দেশ্যে 'প্লেগ রেগুলেশন' জারি করা হয়। অত্যুৎসাহী কিছু সরকারী কর্মচারী প্লেগ রোগীর অনুসন্ধানে দেশীয়দের অন্তঃপুরে হানা দিতে শুরু করলে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর ফলে 22 Jun [মঙ্গল ৯ আষাঢ়] পুনার রাজপথে প্লেগ কমিটির প্রেসিডেন্ট W. C. Rand ও Lieutenant Ayerst দুজন মহারাষ্ট্রীয় যুবকের দ্বারা নিহত হন। ঘটনাটি সমগ্র ভারতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। একেই 'পুণাহত্যাকার্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'দাঙ্গা'র ঘটনাটি ঘটে কলকাতায় 30 Jun ও 1 Jul [১৭-১৮ আষাঢ়] তারিখে। C. E. Buckland ঘটনাটির বিবরণে লিখেছেন:

Serious riots occured at Chitpore and in the northern parts of Calcutta on the 30th June and 1st July 1897 in connection with the delivery of possession, in execution of a decree, of a piece of land at Talla belonging to Maharaja Sir Jotindra Mohun Tagore, K. C. S.I., containing a hut which was alleged by the Muhammadan tenant to be a mosque. The lower class Muhammadans collected in great numbers to resist the demolition of the hut. They were dispersed by the police on the morning of the 30th June, a detachment of the Gloucester Regiment from the Fort being present, but later on they reassembled in parties, one of which attacked the Calcutta Water-Works pumping station at Talla and did not disperse until the arrival of a body of police. During the night there was some disorder in Harrison Road, and the rioters had to be fired upon. On the morning of the 1st July the Deputy Commissioner of Police found it necessary to disperse a body of rioters by the use of buck-shot, and several men were killed and wounded. The riots then ceased, the casualties throughout the disturbances having been 11 killed and about 20 wounded among the rioters.....Much excitement and alarm prevailed in the town in consequence of the riots.'[৯]

—এই বিবরণ ও তার শেষ বাক্যটি থেকে বোঝা যায়, কেন 'দাঙ্গা'র আলোচনাও 'পরিহার্য' ঘোষিত হয়েছিল।

উপরোক্ত নিমন্ত্রণপত্রের রবীন্দ্রনাথ-কৃত খসড়ার নীচে ইংরেজিতে কয়েকটি নামের আদ্যক্ষর লিখিত আছে, তার থেকে খামখেয়ালী সভার সদস্যদের তালিকা করা চলে: A. T. [অবনীন্দ্রনাথ বা অরুণেন্দ্রনাথ], A. P. Sen [অতুলপ্রসাদ সেন], A. Chau [আশুতোষ চৌধুরী], I. P. Ganguly [ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গো°], GNT [গগনেন্দ্রনাথ], Ch. r. D [চিত্তরঞ্জন দাস], J. P. Ganguly [জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গো°], IN Ray [?], DNT [দ্বিপেন্দ্রনাথ], N. Sen [নির্মলচন্দ্র সেন], P. Chau [প্রমথ চৌধুরী], A Chau [অমিয়নাথ চৌধুরী], JST

[?], S. T. (1) [সমরেন্দ্রনাথ], S. T. (2) [সুরেন্দ্রনাথ], MMC [মোহিনীমোহন চট্টো°], RMC [রমণীমোহন চট্টো°], J Chau [যোগেশচন্দ্র চৌধুরী], RT [রবীন্দ্রনাথ], Rajani [রজনীমোহন চট্টো°], LP [লোকেন পালিত] এবং SPG [সত্যপ্রসাদ গঙ্গো°]।

এই তালিকা দেওয়ার পর আমরা অনুমান করতে পারি যে, সমরেন্দ্রনাথ আহূত অধিবেশনের আগে আরও কয়েকটি অধিবেশন [সম্ভবত আষাঢ় মাসেই] বসেছিল। কার্যবিবরণীর খসড়ায় লিখিত পাঁচটি অধিবেশনের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। মন্তব্য-সহ বাকি তিনটি বিবরণ উদ্ধৃত করলেই আমাদের অনুমানের কারণ বোঝা যাবে। ষষ্ঠ অধিবেশনটি হয়েছিল ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আহ্বানে। খসড়া কার্যবিবরণীতে আছে:

৬. ইন্দুদাদা
= অক্ষয়বাবুর বিনিপয়সা
বৈকুণ্ঠ অভিনয়
Evening party
Supper

এই বিবরণী থেকে জানা যাচ্ছে, খামখেয়ালী সভার উদ্যোগে দু'বার বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হয়েছিল। সপ্তম অধিবেশন হয় সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে তাঁদের বালীগঞ্জের বাড়িতে। খসড়া কার্যবিবরণীতে পাই:

৭. সুরেন =
দ্বিজু রায়ের গান
রবিকার Detectiveএর গল্প
নূতন কবিতা বর্ষা, স্বর্গ [পথে?]
গান বাজনা—খাওয়া [...]

পাশে একটি দুষ্পাঠ্য ইংরেজি শব্দের নীচে লেখা আছে 'বরফের অভাব'। অভ্যাগতের তালিকাও আছে, কিন্তু এটি সম্ভবত অসম্পূর্ণ—কয়েকজনের পরিচয়ও স্পষ্ট নয়: জগদীশ [? জগদিন্দ্রনাথ রায়], জ্যোতিদা [জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গো°], চিত্ত [রঞ্জন দাস], উপেন্দ্র [কিশোর রায়চৌধুরী?], প্রমথ [চৌধুরী], অতুল [প্রসাদ সেন], দ্বিজু [দ্বিজেন্দ্রলাল রায়], অমি [অমিয়নাথ চৌধুরী], প্রসন্ন [?]।

অনুষ্ঠানসূচীটি যথেষ্ট তথ্যবহুল। 'দ্বিজু রায়ের গান' সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'খামখেয়ালি সভায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যেদিন উপস্থিত থাকতেন তাঁকে গান গাইবার জন্য সকলে অনুরোধ করতেন। তিনি গাইতেন তাঁর হাসির গান। সকলে হেসে কুটিকুটি—কিন্তু দ্বিজুবাবু টেবিল-হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়ে যেতেন গম্ভীর মুখে।'[১০]

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান সম্পর্কে অতুলপ্রসাদ সেন লিখেছেন: "এ খামখেয়ালীর মজলিসকে মজগুল রাখিতেন পরম হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি আমাদিগকে হাসির বন্যায় ভাসাইতেন তাঁহার হাসির গান গাহিয়া। আমরা সকলে তাঁর হাসির গানের কোরাসে যোগ দিতাম, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোরাসের নেতা। ...দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন—'হোতে পাত্তেম আমি একজন মস্ত বড় বীর' আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন—'তা বটেইত, তা বটেইত'। দ্বিজেন্দ্র গাহিতেন—'নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ', রবীন্দ্র গাহিতেন 'বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল'।"[১০ক]

কিন্তু মাঘ ১৩৩৮-সংখ্যা উত্তরা-য় অতুলপ্রসাদের এই রচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ 28 Mar 1932 তারিখে তাঁকে লেখেন: 'খামখেয়ালী পর্বের একটা কথা বোধ হয় অযথা হয়েছে—সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের অভিমুখে কৃষ্ণপক্ষের কালিমা উদঘাটন করেচেন তাঁকে আমাদের মজলিসে পাবার সৌভাগ্য হয়নি। তুমি যে ব্যাপারের বর্ণনা করেছ সেটা প্রাক্-খামখেয়ালী যুগের। তখন আমি আমার স্বজন বন্ধুমহলে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতির ভূমিকা রচনা করে বেড়াচ্ছিলুম। বস্তুত আমি ছিলুম তাঁর প্রথম ও প্রধান নকীব। তুমি সেদিনকার ইতিহাসের দুই অধ্যায়কে এক অধ্যায়ে মিলিয়েছ।'[১০খ] বস্তুত অতুলপ্রসাদ তা করেন নি, ভুল রবীন্দ্রনাথই করেছেন—তার প্রমাণ খামখেয়ালী সভার খসড়া কার্যবিবরণীতে 'দ্বিজু রায়ের গান'-এর উল্লেখ।]

'ডিটেক্‌টিভ' [দ্র ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫। ১৯৩-২০৫; গল্পগুচ্ছ ২১। ২০৯-১৭] গল্পটি রবীন্দ্রনাথ যে এই সময়েই রচনা করেছিলেন 'রবিকার Detective-এর গল্প' এই কার্যসূচীর মধ্যে সেই তথ্যটি রয়েছে।

'নূতন কবিতা' বলতে এখানে কিছুদিন পূর্বে রচিত 'বর্ষামঙ্গল' ও 'স্বর্গপথে' ['দুঃসময়']-কে বোঝানো হয়েছে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> বাবা সেই সময় যা কিছু নতুন কবিতা বা ছোটোগল্প লিখতেন খামখেয়ালি সভাতে পড়ে শোনাতেন। অনেক সময় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাতেন। তাঁর হাত ভারি মিষ্টি ছিল।
>
> ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে...
> যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে...
> হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে...
>
> কবিতাগুলির ছন্দের ঝংকার পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর বোলের সঙ্গে চমৎকার শোনাত।[১১]

রথীন্দ্রনাথ এখানে কার্যবিবরণীতে লিখিত ক্রমেই কবিতাগুলির কথা স্মরণ করেছেন। শেষোক্ত কবিতাটি অবশ্য আরো পরের রচনা [২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭]—স্মৃতির টানে একত্রিত হয়ে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

খসড়া কার্যবিবরণীতে এর পরেই আছে রবীন্দ্রনাথ-আহূত অধিবেশনের বিবরণ। এটিতে অন্যগুলির মতো কোনো সংখ্যা নেই:

রবিকাকার খাওয়া—
  রবিকাকার বামাচরণের গল্প
    গানবাজনা
    নতুন খেয়ালী বাহাল
      লোকেন/নির্ম্মল/ মোহিনীবাবু/রমণী
  নিয়মাবলী আলোচনা/যথা:
    খেয়ালী নির্ব্বাচন প্রণালী/কাঁচাপাকা খেয়ালীর প্রভেদ
    খাতায় লেখা
    কমিটি নিযুক্ত/রবিকাকা গগনদাদা/সুরেন
    কমিটির উপর খেয়ালের বন্দোবস্তের/ভার।—
      গানবাজনা—/ভূমিকম্পের/আলোচনা বন্ধ

পাতার বাঁদিকে কাৎ করে লেখা: বোলদা/সাজান নিদ্দা পল্লীদৃশ্য

অভ্যাগতবর্গ: প্রমথবাবু [? প্রমথনাথ রায়চৌধুরী]/ চিত্ত/ অতুল/ অমি/সুইদা/ লোকেন/নির্ম্মল/ মোহিনী/রমণী

লক্ষণীয়, লোকেন পালিত, নির্মল সেন, মোহিনী ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে এই অধিবেশনেই 'নতুন খেয়ালী' রূপে 'বাহাল' করা হয়েছে—অথচ সমরেন্দ্রনাথ-আহূত অধিবেশনে সদস্যদের নামের তালিকায় এঁরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এই কারণেই আমরা সমরেন্দ্রনাথ-আহূত অধিবেশনটিকে পরবর্তী বলে অনুমান করেছি। তাছাড়া 'রবিকাকার খাওয়া'য় কেবল 'ভূমিকম্পের আলোচনা বন্ধ', পরবর্তী অধিবেশনে এর সঙ্গে 'দাঙ্গা' ও 'পুণাহত্যাকার্য্য' পরিহার করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

'অধ্যাপক' [দ্র ভারতী, ভাদ্র ১৩০৫। ৩৮৫-৪১১; গল্পগুচ্ছ ২১। ২১৮-৩৬] গল্পটি এই অধিবেশনে পঠিত হয়, এইটিকেই কার্যবিবরণীতে 'রবিকাকার বামাচরণের গল্প' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কার্যসূচীর অন্তর্গত 'নিয়মাবলী আলোচনা' 'কমিটি নিযুক্ত' ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপার খামখেয়ালী সভায় প্রথমাবধি ছিল না। কিন্তু এর প্রয়োজন কেন ঘটল তার কারণ বিবৃত করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁদের এক ইয়ং বিলেত-ফেরত বন্ধু কলকাতার বাইরে তাঁর এক ক্লায়েন্টের বাগানবাড়িতে অধিবেশনের আয়োজন করেছিলেন। নানারকম অব্যবস্থায় 'সেবারকার মজলিস যতদূর ডিপ্রেসিং ব্যাপার হতে হয় তাই হয়েছিল।...রবিকাকা বললেন, না, এ একটু বেশিরকম খামখেয়ালী হয়ে যাচ্ছে, এ-রকম করে চলবে না।/সেই থেকে কমিটি সৃষ্টি হল। কমিটির উপর ভার পড়ল, তারাই সব ঠিক করে দেবে মজলিসে কী হবে না হবে। কমিটি মানেই তো ডাক্তার ডাকা। আমরাও কমিটির হাতে ভার দিয়ে আস্তে আস্তে যে যার সরে পড়লুম। এইভাবে ওটা চাপা পড়ে গেল।'[১২]

রবীন্দ্রনাথ অধিবেশনের জন্য কেমন আয়োজন করেছিলেন তার ইঙ্গিত আছে পাতার বাঁদিকে কাৎ করে লেখা কয়েকটি শব্দে, স্পষ্ট করে বর্ণনা দিয়েছেন রথীন্দ্রনাথ:

বাবার যেবার নিমন্ত্রণ করার পালা পড়ল, বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গেল। মাকে ফরমাশ দিলেন খাওয়ানোর সম্পূর্ণ নতুনরকম ব্যবস্থা করতে হবে।...বাবা মনে করতেন খাওয়াটা উপলক্ষ্য মাত্র, রান্না ভালো হলেই হল না—খাবার পাত্র, পরিবেশনের প্রণালী, ঘর সাজানো, সবই সুন্দর হওয়া চাই। যেখানে খাওয়ানো হবে তার পরিবেশে শিল্পীর হাতের পরিচয় থাকা চাই। মা রান্নার কথা ভাবতে লাগলেন, অন্যরা সাজানোর দিকে মন দিলেন। বলুদাদা জয়পুরের শ্বেতপাথরের বাসন আনিয়ে দিলেন। নীতুদাদা ঘর সাজানোর ভার নিলেন। মাটিতে বসে খাওয়া, কিন্তু খাবার রাখার জন্য প্রত্যেকের সামনে শ্বেতপাথরের একটি করে জলচৌকি থাকবে। অনেকগুলি পাথরের জলচৌকি করানো হল, ...জলচৌকিগুলি চতুষ্কোণ ভাবে সাজিয়ে মাঝখানে যে জায়গা রইল তাতে বাংলাদেশের একটি গ্রামের দৃশ্য বানানো হল। বাঁশবন, শ্যাওলাপড়া ডোবা, খড়ের ঘর কিছুই বাদ গেল না, ছবির মতো সম্পূর্ণ একটি গ্রাম। কৃষ্ণনগর থেকে কারিগর আনিয়ে খড়ের ঘর, ছোটো ছোটো মানুষ, গোরু, ছাগল বানিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হল। এই সুন্দর পরিবেশে নৈশভোজন যে উপভোগ্য হয়েছিল, বলা বাহুল্য।[১৫]

এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে 'বোলদা [বলেন্দ্রনাথ] সাজান নিদ্দা [নীতিন্দ্রনাথ] পল্লীদৃশ্য' ইত্যাদির তাৎপর্য নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে। জলচৌকি ইত্যাদি হয়তো বলেন্দ্রনাথ-আহূত অধিবেশনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল—খসড়া কার্যবিবরণীতে উক্ত অধিবেশনের বিবরণের পাশে 'জলপান/জলচৌকী/হাইদ্রাবাদী' শব্দগুলি লেখা।

কিন্তু আলোচনাসূত্রে আমরা খানিকটা পিছিয়ে এসেছি। ইতিপূর্বে ৪ শ্রাবণ [সোম 19 Jul] তারিখে সত্যপ্রসাদের দ্বারা আহূত খামখেয়ালী সভার অধিবেশনের কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এইদিন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে একটি পত্র লেখেন:

অদ্য রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় আমাদের যোড়াসাঁকোর বাটিতে উপস্থিত হইয়া আহার ও আলাপ করিলে বড় সুখী হইব। যদি ভোজন সম্বন্ধে আপনি বিশেষ নিয়ম পালন করিয়া থাকেন তবে আহারের পরেও আসিতে পারেন:—আমাদের ভোজটা হিন্দু-মুসলমানী। অনুগ্রহপূর্ব্বক একটা উত্তর পাঠাইবেন।[১৪]

রামেন্দ্রসুন্দর সাধনা পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন, বলেন্দ্রনাথ তাঁর বাড়ি যাতায়াত করতেন—কিন্তু এই পত্রের ভাবে মনে হয় ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎপরিচয় হয় নি। রামেন্দ্রসুন্দর আহার ও আলাপে যোগ দিয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন।

এই দিন রবীন্দ্রনাথ 'জগদীশচন্দ্র বসু' [দ্র কল্পনা ৭। ১৫৭] কবিতাটি ['বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে'] রচনা করেন। কল্পনা গ্রন্থে এটির রচনা-কাল '১৩০৪' উল্লিখিত হলেও মাঘ ১৩০৪-সংখ্যা প্রদীপ পত্রিকায় [পৃ ৭১]* 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি' শিরোনামে মুদ্রিত কবিতাটির নীচে তারিখ আছে: ৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪।[১৫] জগদীশচন্দ্র ১২৯৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে ফনোগ্রাফ যন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের গাওয়া ব্রহ্মসংগীত রেকর্ড করলেও [দ্র রবিজীবনী ৩। ১৭৮], উভয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে বর্তমান সময়েই। এই সৌহার্দ্যের সূচনা প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার Patrick Geddes লিখেছেন: 'On the occasion of Bose's return [Apr 1897] from his successful visit to Europe in 1896, Tagore called to congratulate him and, not finding him at home, left on his work-table a great blossom of magnolia, as a fitting and characteristic message of regard. Since that time the two have been increasingly together, each complementing and thereby widening and deepening the other's characteristic outlook on nature and life.'[১৬] জগদীশচন্দ্র নিজেও 2 Nov 1900 [১৭ কার্তিক ১৩০৭] লণ্ডন থেকে লেখা একটি পত্রে এই তথ্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন: 'তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তারপর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম।'[১৭] রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় স্বদেশের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানাচার্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

১৬ শ্রাবণ [শনি 31 Jul] রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে খামখেয়ালী সভার একটি অধিবেশন হয়। Vidyasagar Library and Jhamapukur Reading Rooms-এর উদ্যোগে 28 Jul 1897 এমারেল্ড্ থিয়েটারে সত্যেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বিদ্যাসাগরের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। এই সভার মুদ্রিত আমন্ত্রণপত্রের পিছনে প্রচুর কাটাকুটি করে রবীন্দ্রনাথ খামখেয়ালী সভার আমন্ত্রণলিপিটি রচনা করেন:

> শ্রাবণমাসের ১৬ই তারিখ শনির সন্ধ্যাবেলা
> সাড়ে সাত ঘটিকায় খামখেয়ালীর মেলা
> সভ্যগণ যোড়াসাঁকোয় করেন অবরোহণ
> বিনয়বাক্যে নিবেদিছে শ্রীরজনীমোহন।

—অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিভ্রমে বা মুদ্রণপ্রমাদে ঘরোয়া-য় [পৃ ১১৯] '১৬ই তারিখ'টি '১৩ই তারিখ' রূপে ছাপা হয়ে আসছে, ফলে বিভিন্ন গবেষকের হিসাবে সভাটির তারিখ দাঁড়িয়েছে 28 Jul 1894 [শনি ১৩ শ্রাবণ ১৩০১]—ফলে খামখেয়ালী সভার আয়ুষ্কাল অনাবশ্যক রূপে দীর্ঘায়িত হয়েছে।

এই সভার আর একটি আমন্ত্রণলিপি অবনীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ-লিখিত মূল পাণ্ডুলিপিটিও পাওয়া যায়:

এবার

খামখেয়ালি সভার
অধিবেশন হবার
স্থান কিছু দূরে
সেই আলিপুরে।
নির্ম্মল সেন
সবে ডাকিছেন।
শনিবার রাত
ঠিক সাড়ে সাত।

—এই অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি।

খামখেয়ালী সভার অন্যতম তরুণ সদস্য উদীয়মান ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেনের [1871-1934] বাড়িতেও একটি অধিবেশন বসেছিল। তিনি লিখেছেন: 'মনে আছে যেদিন আমার বাড়িতে খামখেয়ালীর অধিবেশন হয় সেদিন কবি বাড়ি গেলেন রাত্রি বারোটার পরে, মহারাজ নাটোর গেলেন বাড়ি একটা দু'টোর সময় আর দ্বিজেন্দ্রলাল ও আমরা কয়েকজন সারারাত কীর্তন শুনিয়া ও তাঁর হাসির গান শুনিয়া কাটাইলাম। তারপরদিন প্রাতে হাস্যরাজকে আমি বাড়ি পৌঁছাইয়া আসি।'[১৭ক]

এছাড়া খামখেয়ালী সভার আর কোনো অধিবেশন হয়েছিল কিনা জানা যায় না। প্রতিটি অধিবেশনের কার্যসূচীর বিবরণও পাওয়া যায় নি। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন: "আমি খামখেয়ালীতে প্রথম পড়ি 'দেবীপ্রতিমা' বলে একটা গল্প। পুরোনো 'ভারতী'-তে [শ্রাবণ ১৩০৫। ২৮৯-৯৮] যদি থেকে থাকে খোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে। রবিকাকা আমাকে প্রায়ই বলতেন, অবন, তোমার সেই লেখাটি কিন্তু বেশ হয়েছিল।"[১৮] 'পুত্রযজ্ঞ' [দ্র ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫। ৯৭-১০২; গল্পগুচ্ছ ২১। ২০৪-০৮] গল্পটি সমরেন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত বলে রবীন্দ্রনাথ খামখেয়ালী সভায় পাঠ করেন, ভারতী-র বার্ষিক সূচীতেও গল্পটির লেখক হিসেবে সমরেন্দ্রনাথের নাম আছে। 'প্রথম সংস্করণ বিশ্বভারতী-গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৩৩) ইহা রবীন্দ্রগ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গল্পটি গ্রহণকালে এ সম্বন্ধে সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে পত্রোত্তরে লেখেন—

পুত্রযজ্ঞ গল্পটি রবীন্দ্রনাথের লিখিত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আমি কেবলমাত্র উহার আখ্যানবস্তুটি আমার কাঁচা ভাষায় লিখিয়া খামখেয়ালী সভায় পাঠের জন্য তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম, তিনি উহা দেখিয়া তাহার আমূল সংশোধন করিয়া ও নিজের অতুলনীয় ভাষায় লিখিয়া সেই সভায় আমার লিখিত বলিয়া পাঠ করেন; বোধ হয় সেই কারণে গল্পটি আমার লিখিত বলিয়া সেই সময় উক্ত মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, পরে পুনর্মুদ্রণের সময় গল্পগুচ্ছে সে ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত ও সুখী হইলাম। ২১ ফাল্গুন ১৩৫১।'[১৯]

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এ-বিষয়ে লিখেছেন: 'কবির কাছে শুনেছিলাম, ঐ গল্পের আখ্যানভাগটিও কবি নিজে প্রথমে সমরবাবুকে মুখে মুখে বলে দিয়েছিলেন।'[২০]

শ্রাবণ ও ভাদ্র দু'টি মাস রবীন্দ্রনাথ কলকাতাতেই ছিলেন। সুতরাং যথারীতি তাঁর পার্ক স্ট্রীট ও অন্যত্র বহুবার যাতায়াতের হিসাব সরকারী ও তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। এই হিসাব অনুযায়ী তিনি পার্ক স্ট্রীট যাতায়াত করেছিলেন শ্রাবণ মাসের ১, ৫ ['লালদিঘি হইতে পার্কষ্ট ীট'], ৬, ৭, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮ ['বেনেপুকুর হইয়া পার্কষ্ট ীট'], ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭ ও ৩০ তারিখে। নিজের খরচে তিনি

বিডন স্ট্রীট যান ২০ ও ২৬ তারিখে, বৌবাজার যান ১৬ই ও 'যোড়া গির্জা হইতে আসিবার' খরচ দেন ২৫ শ্রাবণে। এইসব স্থানে তিনি কেন গিয়েছিলেন, তা অবশ্য আমরা জানি না।

জমিদারি বিভাগের মোকদ্দমা তখনও চলছিল। মহর্ষির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ এ-ব্যাপারে দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, অ্যাটর্নি ছিলেন মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। এই কারণে উপরে উল্লিখিত পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াতের সময়ে কয়েকবার এঁরা রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়েছেন, মধ্যাহ্নে বাড়ি ফিরতে না পারার জন্য হোটেলে বা অন্যত্র খাওয়ার হিসাবও পাওয়া যায়। যেমন, ৭ শ্রাবণের হিসাব: 'পার্টীসেনের মকদ্দমায় শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের সাক্ষরের জন্য শ্রীযুক্ত মহিনীমোহন বাবুকে লইয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু ও সত্যপ্রসাদ বাবু মহাশয় সকালে পার্কস্ট্রীট গমন করায় মধ্যাহ্নে খাবার ব্যয়', এর আগের দিন তাঁরা এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্যই মোহিনীমোহনের বাড়ি হয়ে পার্ক স্ট্রীটে গমন করেন।

২১ শ্রাবণ [বৃহ 5 Aug] তারিখে জোড়াসাঁকোয় মহর্ষিভবনের উত্তর-পশ্চিম দিকে ১২ কাঠা ৮ ছটাক ২৭ বর্গফুট এবং কমবেশি ১ কাঠা ৪ ছটাক ১৯ বর্গফুট জমি [ঘোষিত আনুমানিক মূল্য সাত হাজার টাকা] মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে দান করেন। 'Dated the 5th Day of August 1897/Devendra Nath Tagore/To/Rabindra Nath Tagore/Deed of Gift/Ghose & Kar' লেখা এই দানপত্রটির নকল রবীন্দ্রভবনে আছে [Registered Deed of Gift (copy of 2536 for 1897)—Tagore Family Papers No. 85]। দলিলে উল্লিখিত আছে যে, অ্যাটর্নি প্রমথনাথ করের উপস্থিতিতে সত্যপ্রসাদ 5.8.97 তারিখে দলিলটি মহর্ষিকে পড়ে শোনান, 6 Aug দুপুর ১টা থেকে ২টার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দলিলটি রেজেস্ট্রির জন্য পেশ করেন ও 7 Aug ৫২/২ পার্ক স্ট্রীটে রেজিস্ট্রার প্রতাপচন্দ্র ঘোষের উপস্থিতিতে মহর্ষি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও executed হয়। এই তিন দিনই রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ হাইকোর্ট ও পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াত করেছেন। এই দানপত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন হিসাব ক্যাশবহিতে আছে।

জমি পাবার আগেই রবীন্দ্রনাথ সেখানে বাড়ি করার আয়োজন শুরু করে দেন। ১৯ শ্রাবণ [3 Aug]-এর হিসাব: 'বঃ নিতীন্দ্রবাবু মহাশয় দং বাটীর পেলান নক্সা ৫ খানা তৈয়ারি (নুতন যে পশ্চিম ধারে বাটী তৈয়ারি জন্য)...১৮্'। দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র নীতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন—তিনি এই বাড়ি তৈরির সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাড়ি তৈরির খরচ রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন দফায় পেয়েছিলেন মহর্ষির কাছ থেকেই। কিছুদিন ধরেই সরকারী তহবিল থেকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে 'রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের নামে' ১০০০্ [৮ শ্রাবণ], ২৫০০্ [৯ শ্রাবণ] প্রভৃতি জমা পড়ছিল ২ ভাদ্র [মঙ্গল 17 Aug] 'নুতন বাটীর ইট বাবত ১২৬০০ শত জন্য ১২১।০' খরচ করা হয়। এর পরে 'নুতন বাটী তৈয়ারির হিসাবে' তাঁকে ৪ ভাদ্র ৫০০০্ ও ২০ ভাদ্র ১০০০্ টাকা দেওয়া হয়। অবশ্য এই টাকার অনেকটাই শতকরা বার্ষিক ৬্ টাকা সুদে ঠাকুর কোম্পানিকে 'হাওলাত' দেওয়া হয়েছে, ২০ ভাদ্রের ১০০০্ টাকা সরাসরি দেওয়া হয়েছে উক্ত কোম্পানির অন্যতম অংশীদার সুরেন্দ্রনাথের হাতেই। এরপর ২৯ ভাদ্র [সোম 13 Sep]রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে যে ১২০০০ টাকা পেয়েছেন, তার থেকেও ৩১ ভাদ্র ৭০০০্ টাকা ধার দিয়েছেন ঠাকুর কোম্পানিকে। এছাড়া ৯ ভাদ্র ১৩০৬ তারিখে রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে হিসাব দেখা যায়; 'মা° মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দং নতুন বাটীর জমির মধ্যে সম্মুখের চারি ছটাক ১৩ ফিট

জমি বিক্রী করায় তাহার মূল্য পাওয়ায় বিঃ ৩১ শ্রাবণ...৫০০্', । তিনি ঠিকই লিখেছিলেন: 'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয় গো'!

ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথ পার্ক ষ্ট্রীট যাতায়াত করেছেন ১, ৪, ৭, ৯ ['পার্ক স্ট্রীট হইতে যোড়া গির্জায়'], ১০, ১১, ১৫ ['হাইকোর্ট হইতে পার্ক ষ্ট্রীট'], ১৬, ১৭ ['হাইকোর্ট হইতে...'], ১৮, ১৯, ২০ ['হাইকোর্ট হইতে...'], ২২, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০ ও ৩১ তারিখে। এছাড়া তিনি নিজের খরচে ১ তারিখে আলিপুর, ১৯ তারিখে। বিডন স্ট্রীট ও ২৩ তারিখে পটলডাঙ্গায় যাতায়াত করেন।

'রাজা ও রানী' এর আগে সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল এমারেল্ড্ থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল [প্রথম অভিনয়: 7 Jun 1890, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭], একথা আমরা জানি। বর্তমানে একই রঙ্গমঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-পরিচালিত ক্লাসিক থিয়েটারের উদ্যোগে পুনরায় 'রাজা ও রানী'র ধারাবাহিক অভিনয় শুরু হয় 24 Jul 1897 [শনি ৯ শ্রাবণ] থেকে। বিক্রমদেবের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমারসেন মহেন্দ্রলাল বসু ও দেবদত্তের ভূমিকায় হরিভূষণ ভট্টাচার্য অভিনয় করেন। 'শ্রীশ্রীঁ কালীমাতার মন্দির নির্ম্মানার্থ সাহায্য রজনী' উপলক্ষে ২৭ ভাদ্র [শনি 11 Sep] রাত্রি ৯টার সময়ে 'নাটোরাধিপতি অনারেবল্ মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত জগতীন্দ্র [জগদিন্দ্র] নাথ রায় বাহাদুর মহোদয়ের আনুকূল্যে ও উপস্থিতিতে এবং কবিবর শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সমক্ষে' 'হৃদয় বিদারক বিয়োগান্ত নাটক' রাজা ও রানী-র একটি বিশেষ অভিনয় হয়। শিশির বসু-রচিত 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার' গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠার মুদ্রিত একটি হ্যাণ্ডবিলের লিপিচিত্র থেকে উদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ উক্ত বিশেষ অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথ [1876-1916] রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র ছিলেন। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথকে কয়েকবার বিডন স্ট্রীটে যেতে দেখা যায়, এমন হতে পারে যে, তিনি উক্ত নাটকের মহড়ায় সাহায্য করেছিলেন। গায়ক ও অভিনেতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি কিছু কম ছিল না। বর্তমান বৎসরে ক্লাসিক থিয়েটারে 'রাজা ও রানী' অভিনয়ের অন্যান্য তারিখগুলি হল: ১৬ শ্রাবণ [শনি 31 Jul], ২৩ শ্রাবণ [শনি 7 Aug], ২২ কার্তিক [রবি 7 Nov] ও ৭ অগ্র° [রবি 21 Nov]—দ্র বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান। ৪৯৫-৯৮। পরেও মাঝে মাঝে নাটকটি ক্লাসিকে অভিনীত হয়েছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৫ তারিখে 'পসারিনী' কবিতা লেখার পর রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মী বিদায় নিয়েছিলেন, গীতলক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটল ভাদ্র মাসে। এই সময়ে মজুমদার-পুঁথি-ই তাঁর রচনার বাহন। পাণ্ডুলিপিতে সব-ক'টি গানে রচনার তারিখ নেই, ২৮ ভাদ্রে [রবি 12 Sep] রচিত 'বৃথা গেয়েছি বহু গান'-এর তারিখ থেকে অনুমান করে নিতে হয় অন্য পাঁচটি গান এরই অব্যবহিত পূর্বে লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে তিনটি হিন্দি গান-ভাঙা। মন্তব্য-সহ আমরা গানগুলির একটি তালিকা করে দিচ্ছি:

[১] ভক্তহৃদিবিকাশ প্রাণবিমোহন দ্র গীত ১। ১৮৫; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৯ ছায়ানট—সুরফাঁকতাল; স্বর ৪; মূল গান; শম্ভু শিব মহেশ আদি ত্রিলোচন দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৩৮ মজুমদার-পুঁথিতে মূল গানটি সম্পূর্ণ লিখে রবীন্দ্রনাথ প্রতি ছত্রের উপরে বাংলা কথা বসিয়েছেন।

[২] ললিত/পান্থ এখনো কেন অলসিত অঙ্গ দ্র গীত ১। ১১৯; তত্ত্ব°, ফাল্গুন ১৮২৪ শক [১৩০৯]। ১৬১ ললিত-সুরফাঁক্তা; স্বর ২৭; মূল গান; রঙ্গ জুগত সোঁ গায়ে বাজায়ে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৩৩। এখানেও

মূল গানটি সম্পূর্ণ লিখে প্রতি ছত্রের উপরে বাংলা কথা বসানো হয়েছে।

[৩] ভৈরবী/আনন্দ উষাকালে মঙ্গল রবি [আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি] দ্র গীত ১। ১০৪-০৫; তত্ত্ব°, ফাল্গুন ১৮২৪ শক [১৩০৯]। ১৬৩ ভৈরবী-সুরফাঁক্তা; স্বর ২৭; মূল গান: ওঙ্কার মহাদেব দ্র ত্রিবেণী সংগম। ২১; রবীন্দ্রনাথ মজুমদার-পুঁথিতে ৮ ছত্রের মূল গানটি লিখে রাখলেও প্রথম ছত্রটিতে মাত্র বাংলা কথা বসিয়েছিলেন, সেটিও পরবর্তী কোনো সময়ে পাঠান্তর লাভ করেছে।

[৪] লচ্ছাসার/বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা দ্র গীত ১। ১৩৬; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮০ লচ্ছাসার—ঝাঁপতাল; বীণাবাদিনী, বৈশাখ ১৩০৫। ২৬৭-৭০, স্বরলিপি ইন্দিরা দেবী-কৃত; স্বর ২২; মূল গান: দুসহ দোখ-দুখ দলনি, করু দেবি দয়া দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৪৮-৪৯। এই গ্রন্থে মূল গানের ১৯টি ছত্র উদ্ধৃত হলেও রবীন্দ্রনাথ মজুমদার-পুঁথিতে প্রথম সাতটি মাত্র ছত্র লিখে সেই ছত্রগুলির উপরেই কথা বসিয়েছেন।

[৫] কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে দ্র গীত ২। ৩৬৭; স্বরলিপি: বীণাবাদিনী, আশ্বিন। ৮৪-৮৮ [ইন্দিরা দেবী-কৃত] মিশ্র কালাংড়া; স্বর ১০।

[৬] মিশ্র কানাড়া/বৃথা গেয়েছি বহু গান দ্র গীত ৩। ৮৯৪; স্বরলিপি নেই। মজুমদার-পুঁথিতে গানটির একটি বর্জিত পাঠ আছে:

> বৃথা গেয়েছি বহু গান
> হইল দিবা অবসান।
> নীরব নিশা ধীরে ধীরে
> আঁধারে দশ দিক ঘিরে,—
> মহাসাগর-বালুতীরে
> ধূ ধূ করিছে এ শ্মশান।
> যাত্রী ছিল যারা, হায়
> পেয়েছে অনুকূল বায়,
> তরণী বেয়ে চলে যায়,—
> সুদূর পারে উঠে তান।

এর পরে রবীন্দ্রনাথ গীতবিতান-এ উদ্ধৃত পাঠটি রচনা করেছেন। আবার এইটিই তিনি ইন্দিরা দেবীর নিজস্ব গানের বহি-তে সংযোজিত পৃষ্ঠাতে লিখে দিয়েছেন—মজুমদার-পুঁথি ও গানের বহি উভয়তই রচনার তারিখ: ২৮ ভাদ্র ১৩০৪ [রবি 12 Sep]।

মজুমদার-পুঁথিতে এর পরের গান: কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে দ্র গীত ২। ৩১৯; 'লীলা' কল্পনা ৭। ১৬১-৬২, সিন্ধু-ভৈরবী; স্বর ১০। এই গানটি গানের বহি-তেও আছে, কিন্তু কোথাও রচনার তারিখ ও রচনা-স্থলের উল্লেখ নেই। তবে ২৮ ভাদ্র থেকে ৬ আশ্বিনের মধ্যে গানটি রচিত হয়েছিল, তা নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে।

৩১ ভাদ্র [বুধ 15 Sep] পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন, ক্যাশবহিতে এইদিন তাঁর পার্ক স্ট্রীট যাওয়ার হিসাব থেকে তা জানা যায়। ১ আশ্বিন তিনি ১৫৯ টাকা ১ আনা গগনেন্দ্রনাথকে 'ইংরাজী পুরাতন পুস্তক বিক্রয়' করেছেন। এর আগে ১৩ শ্রাবণ 'থ্যাকার কোম্পানী' থেকে ১৮১ টাকা ৪ আনার 'পুস্তক খরিদ' করেছেন—এই পুস্তকগুলিও নিশ্চয় ইংরেজি বই। এইভাবেই তাঁর পড়াশুনো চলত। তাঁর বই কেনা ও বিক্রয়

করা সম্পর্কে আমরা আগেই কিছু আলোচনা করেছি। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিতে এ-প্রসঙ্গে অনেক উল্লেখ আছে।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে বোটে করে ভ্রমণরত দেখতে পাই। তিনি সম্ভবত প্রথমে শিলাইদহ গিয়েছিলেন, তার পরে সেখান থেকে নদীপথে সাজাদপুর রওনা হন। তাঁর এই ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে মজুমদার-পুঁথিতে লেখা ১৪টি গানের মধ্যে। কলকাতাতেই তাঁর মনে সুরের আবির্ভাব ঘটেছিল, নদীপথে চলমান থাকার সময়ে তা ঝর্ণাধারায় উৎসারিত হয়েছে। অধিকাংশ গানই শিরোনাম-সহ কল্পনা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। গানগুলি হল:

৬ [মঙ্গল 21 Sep] 'নব বিরহ' [হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে] ইছামতী। ঝড় বাদলা দ্র কল্পনা ৭। ১৬২, মল্লার; গীত ২। ৪৪০। স্বর ১১।

৭ [বুধ 22 Sep] 'বিদায়' [এবার চলিনু তবে] ইছামতী দ্র প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৫। ১৪৭ বিভাস। একতালা; কল্পনা ৭। ১৬০-৬১, বিভাস; গীত ৩। ৭৮৯-৯০; স্বরলিপি নেই।

৭ [,,] 'লজ্জিতা' [যামিনী না যেতে জাগালে না কেন] যমুনা দ্র কল্পনা ৭। ১৬৩, ভৈরবী; গীত ২। ৩২০; স্বর ৫০।

৭ [,,] 'হতভাগ্যের গান' [কিসের তরে অশ্রু ঝরে] বড়ল নদী [পরিবর্ধন: নাগর নদী ৭ আষাঢ় ১৩০৫]; দ্র ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫। ২৯৯-৩০২; কল্পনা ৭। ১৪৮-৫২ বিভাস। একতালা; গীত ৩। ৭৯০-৯১; স্বরলিপি নেই, তবে গানটিতে সুর দেওয়া হয়েছিল—ইন্দিরা দেবী শুধু প্রথম ছত্র-দুটির সুর মনে করতে পেরেছেন দ্র গীত—গ্র°প° ৩। ৯৮৬। ৯৮৬।

৮ [বৃহ 23 Sep] 'কাল্পনিক' [আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন] বলেশ্বরী দ্র কল্পনা ৭। ১৬৪ বেহাগ; গীত ২। ৫৭৩; স্বর ৫১।

৮ [,,] 'যাচনা' [ভালোবেসে সখী, নিভৃত যতনে] সাহাজাদপুর। বোট দ্র কল্পনা ৭। ১৫৯ কীর্তনের সুর; গীত ২। ২৮৩-৮৪; স্বর ৫৬।

৯ [শুক্র 24 Sep] 'মানসপ্রতিমা' [তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর] চলন বিল। ঝড়বৃষ্টি দ্র বীণাবাদিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫। ৩১৩-১৮, ইমন্-কল্যাণ—একতালা; কল্পনা ৭। ১৬৪-৬৫ ইমনকল্যাণ; গীত ২। ২৮৫ [পাঠান্তর: তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা]; স্বর ১০।

এই দিন রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর ছেড়ে পতিসরের দিকে যাত্রা করেছেন।

৯ [,,] 'সংকোচ' [যদি বারণ কর, তবে গাহিব না] চলন বিল। দিনে দুতিন বার করে ঝড় হচ্চে। বোট টলমল দ্র বীণাবাদিনী, মাঘ ১৩০৪। ১৮৮-৯১, ছায়ানট—কাওয়ালি; কল্পনা ৭। ১৬৫-৬৬ ছায়ানট; গীত ২। ৩১৯; স্বর ১০।

১০ [শনি 25 Sep] 'প্রার্থী' [আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা] নাগর নদী দ্র বীণাবাদিনী, বৈশাখ ১৩০৫। ২৭৪-৭৭, কালাংড়া—একতালা; কল্পনা ৭। ১৬৬-৬৭ কালাংড়া; গীত ২। ২৯৩; স্বর ৫০। মজুমদার-পুঁথিতে রবীন্দ্রনাথ গানটির একটি অসম্পূর্ণ পাঠ প্রথমে রচনা করে কেটে দেন।

১০ [,,] 'সকরুণা' [সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে] নাগর নদী। মেঘ বৃষ্টি। শনিবার। অমাবস্যা দ্র বীণাবাদিনী, বৈশাখ ১৩০৫। ২৭৮-৮১, মিশ্র ছায়ানট—একতালা; কল্পনা ৭। ১৬৭ আলেয়া; গীত ২। ২৯৬; স্বর ৫০। গানটির প্রথম চার ছত্র পরে নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা [১৩৪৫]-তে গৃহীত হয়। ইন্দিরা দেবী গানটি সম্পর্কে স্মৃতিচারণে বলেছেন: '[তাঁর প্রণয়প্রার্থীদের মধ্যে] সব চেয়ে রোমাঞ্চকর পূর্ব্বপাত্র ছিলেন একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি। যিনি অনেকদিন ধরে' আমাদের ফটকের ও-পারে মাঠের মধ্যে এক গাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পরে তাঁর নাম জানতে পারি এবং তাঁর দিদি ভাইয়ের হয়ে আমাদের কাছে বলতেও [আসেন]। কিন্তু বলা বাহুল্য এ সম্বন্ধ আমাদের কারোরই মনোনীত হল না। ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু আমার মনে হয়, "সখী প্রতিদিন হায়" গানটি এই পরিস্থিতি অবলম্বনে রচিত। কারণ একথা বাড়ীর কারো জানতে ত বাকি ছিল না।'[২১]

১০ [,,] ভৈরবী-ঝাঁপতাল/'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে' নাগর নদী/ ধানক্ষেতের ভিতর দ্র গীত ৩। ৮৯৪-৯৫; স্বর ৫১; গান ও স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হয় সঙ্গীত প্রকাশিকা, শ্রাবণ ১৩১২। ২৩৭-৩৯-তে, কল্পনা-তে গানটি সংকলিত হয় নি।

১০ [,,] বারোয়াঁ মূলতাল 'বঁধু মিছে রাগ কোরো না' পতিসর দ্র গীত ৩। ৮৯৫; স্বর ৩২; গান ও স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হয় বীণাবাদিনী, কার্তিক ১৩০৪। ৯৮-১০১-তে, এটিও কল্পনা-তে গৃহীত হয়নি। উল্লেখ্য, বীণাবাদিনী-তে মুদ্রিত স্বরলিপিটি রবীন্দ্রনাথ-কৃত বলে অভিহিত।

১২ [সোম 27 Sep] 'ভিখারি' [ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ] পতিসর দ্র উৎসাহ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫। ৪১; কল্পনা ৭। ১৫৮ ভৈরবী। একতালা; গীত ২। ২৮৪; স্বর ৩৫।

১৩ [মঙ্গল 28 Sep] 'এ কি সত্য সকলি সত্য' রেলপথে দ্র গীত ৩। ৭৮৮-৮৯; স্বর ৩৫; রবীন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি ইন্দিরা দেবীর সৌজন্যে পাওয়া গিয়েছে; কল্পনা ৭। ১৪০-৪১-তে 'প্রণয়প্রশ্ন' কবিতায় গানটির কাব্যরূপ আছে, এটি নিশ্চয়ই পরবর্তী কালে রচিত।

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ৬ আশ্বিন বোটে রওনা হয়ে ইছামতী, যমুনা, বড়ল [? বলেশ্বরী] নদী দিয়ে ৮ আশ্বিন সাজাদপুরে পৌঁছান, আবার পরদিন চলন বিল ও নাগর নদী হয়ে পতিসরে পৌঁছন ১০ আশ্বিন, দু'দিন সেখানে কাটিয়ে ১৩ আশ্বিন রেলপথে তিনি কলকাতা রওনা হন।

কলকাতায় ফিরে তিনি যথারীতি ভ্রাম্যমান। ক্যাশবহির হিসাবে আছে, তিনি 'গত ১৫ আশ্বিন [বৃহ 30 Sep] পার্ক ষ্ট্রীট হইতে কুচবিহারের মহারানীর বাটী যাতায়াত' করেছেন। এর পর তিনি ১৭, ১৮, ২০, ২১ ['ও পালিত সাহেবের বাটি'], ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৯ ও ৩১ আশ্বিন এবং ১ কার্তিক পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াত করেন। নিজ খরচে তিনি ১৮ তারিখে হ্যারিসন রোড, ২৬ তারিখে যোড়াগির্জা ও ২৭ আশ্বিন চৌরঙ্গী যাতায়াত করেছেন।

এই সময়ে কয়েকটি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যস্ত। ২৯ আশ্বিন [বৃহ 14 Oct] তিনি মুর্শিদাবাদের কান্দীতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে যে পত্র লিখেছেন, সেটি উদ্ধৃত ও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করলে তাঁর সমসাময়িক কার্যধারার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে:

> ...প্রদর্শনীর সঙ্কল্প ছাড়িতে হইয়াছে—কারণ, লোকে বড় একটা গা করিল না। আপনি যদি আপনাদের অঞ্চলের সমস্ত শিল্পদ্রব্যজাতের তালিকা পাঠাইয়া দেন ত আমাদের স্বদেশ ভাণ্ডারের কাজে লাগিবে। আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে ভারতীর সম্পাদকীয় কার্য্যভার আমি গ্রহণ

করিতেছি। আপনাকে সত্বর একটা কিছু প্রবন্ধ লিখিতে হইতেছে। সাধনা আর বাহির করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। ভারতীর দ্বারাই আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে।

তিলকের সমস্ত খবর কাগজে পড়িয়াছেন। এক্ষণে প্রীভি কাউন্সিলে আপিল করিবার খরচা সংগ্রহে ব্যস্ত আছি। আপনাদের অঞ্চলের জমিদারবর্গের নিকট হইতে কিছু কিছু জোগাড় করিতে পারেন না? আমরা মেয়েদের কাছ হইতেও কিছু কিছু পাইতেছি।

আমি দুই এক দিনের মধ্যে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করিব। যদি তিলকের চাঁদা সম্বন্ধে কোন সংবাদ দিবার থাকে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের বাড়ির ঠিকানায় শ্রীমান সুরেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখিবেন।[২২]

দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়-প্রসারের জন্য স্বদেশী ভাণ্ডার লিমিটেড নামে একটি যৌথ-কারবারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় Sep 1896-এ। অম্বিকাচরণ উকিল [?-1923] নামক একজন শিক্ষিত যুবক ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। The Indian Pioneers' Co. Ld. নামে সমবায়িক আদর্শে 1893-তে গঠিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি আগেই ব্যবসায় জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর কর্মতৎপরতাকে বিস্তৃত করেছিলেন। ৮২ হ্যারিসন রোডে অবস্থিত স্বদেশী ভাণ্ডারের সঙ্গে ঠাকুরপরিবারের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সত্যপ্রসাদের হিসাবখাতায় ৩১ ভাদ্র [15 Sep] 'স্বদেশী ভাণ্ডারের ৩০ খানা share খরিদ ৩০০৲' ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায়। সরকারী ক্যাশবহিতে ৬ আশ্বিন [21 Sep] 'হা° রবীন্দ্র বাবু মহাশয়/স্বদেশী ভাণ্ডারের/ গুঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬০০৲' হিসাব দেখা যায়—অর্থাৎ এই টাকা সরকারী তহবিল থেকে ধার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী ভাণ্ডারকে দিয়েছিলেন, বিভিন্ন কিস্তিতে ভাণ্ডার এই টাকা পরিশোধ করে। তাছাড়া বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কিংবা পুস্তক মুদ্রণের জন্য কাগজ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথ এখান থেকে কিনেছেন, তার হিসাবও পাওয়া যায়। স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতিবিধান হওয়া প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনায় এই মত প্রচার করেই ক্ষান্ত হন নি, বাস্তব প্রয়াসের সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত করেছেন এই তথ্য উপেক্ষণীয় নয়। স্বদেশী ভাণ্ডারের একটি বিজ্ঞাপনে এর উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে: 'The Bhandar aims at being an emporium of the products of Indian Arts and Manufactures. It has already in stock a number of well-selected specimens of textile fabrics—Silk, cotton and woollen—turned out of Indian handlooms and factories.' এর পর সোলাপুরে প্রস্তুত চামড়ার জিনিস, কটকের জুতো ও চটি, জয়পুরে নির্মিত শ্বেতপাথরের দ্রব্যাদি, মুর্শিদাবাদ বা মালদহের সিল্ক প্রভৃতি জিনিসের বর্ণনা ও মূল্য উক্ত বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হয়েছে। 'সাময়িক সমস্যা'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধে অজ্ঞাতনামা লেখকের বক্তব্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে 'সংসার'-পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন [২৫ বৈশাখ ১৩০৫, পৃ ১৫২]: 'লেখক শুনিয়া সুখী হইবেন, সুশিক্ষিত কোন কোন বাঙ্গালী জমিদারের ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহার ফলে স্বদেশীভাণ্ডার নামে এক লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার লাহাবাবুরা, ঠাকুর বাবুরা, ময়মনসিং, গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রাজসাহী, চৌগার রাজা রমণীকান্ত রায়, নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় এবং সন্তোষের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ রায়চৌধুরীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।' অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন; 'ঠিক হল স্বদেশী জিনিস ছাড়া আর কিছু থাকবে না দোকানে। বলু [বলেন্দ্রনাথ] খুব খেটেছিল—নানা দেশ ঘুরে যা স্বদেশী জিনিস পাওয়া যায়—মায় পায়ের আলতা থেকে মেয়েদের পায়ের জুতো সব-কিছু জোগাড় করেছিল, তার ওই সখ ছিল।'[২৩] কিন্তু শুধু শখ থাকাই যথেষ্ট নয়। ব্যবসায়িক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য চাই উপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থা। বিলিতি দ্রব্যাদির চাকচিক্যময় বিপণনের পাশে স্বদেশী দ্রব্যাদির উৎকর্ষ তুলে ধরার উৎকৃষ্ট উপায় মেলা বা প্রদর্শনী। এক সময়ে হিন্দু বা জাতীয় মেলা

এই চেষ্টা করেছিল, বর্তমানে মোহন মেলা নামে একটি বার্ষিক মেলা মানিকতলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে বোঝা যায়, স্বদেশী ভাণ্ডারের উদ্যোগেও এইরূপ একটি মেলার আয়োজন করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রয়াস বর্তমানে সফল হয় নি। 1901-এর কলকাতা কংগ্রেস উপলক্ষে একটি শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যা পরে একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ উক্ত পত্রে 'কার্ত্তিক মাস হইতে ভারতীর সম্পাদকীয় কার্য্যভার' গ্রহণের কথা লিখলেও সেটি কার্যকর হয় বৈশাখ ১৩০৫ থেকে। বস্তুত প্রস্তাব সেই রকমই ছিল। ভাদ্র-সংখ্যা ভারতী-র একটি বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মন্তব্য করেছেন: 'এবারকার "ভারতী"র একটি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে, নব বর্ষের প্রারম্ভ হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতী"র সম্পাদকতা গ্রহণ করিবেন। "ভারতী" অধঃপাতের প্রায় চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, এ সময়ে রবীন্দ্র বাবু যদি তাহার উদ্ধারসাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইবেন।'[২৪] বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে ভারতী-র বিভিন্ন সংখ্যা প্রকাশের যে তারিখ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় ভারতী-র প্রকাশ এই সময়ে কত অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য প্রচুর পরিমাণ রবীন্দ্র-রচনায় সমৃদ্ধ হলেও তাঁর সম্পাদিত ভারতী-র প্রকাশও নির্ধারিত সময়-সূচী রক্ষা করতে পারে নি, ১৩০৫-এর পৌষ-মাঘ ও ফাল্গুন-চৈত্র যুগ্ম-সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়েছে, শেষোক্ত সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৬ বৈশাখ ১৩০৬ তারিখে—এর পরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করেন।

'পুণা হত্যাকার্য' অনুষ্ঠিত হবার পর বোম্বাই গবর্মেন্ট প্রতিহিংসা গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠে। মারাঠী সাপ্তাহিক 'কেশরী' পত্রিকার 15 Jun [২ আষাঢ়]-সংখ্যায় সম্পাদক বালগঙ্গাধর টিলকের [1856-1920] 'শিবাজী ও আফজল খাঁ' বিষয়ক একটি বক্তৃতা মুদ্রিত হয়। এরই কয়েক দিন পরে 22 Jun [৯ আষাঢ়] ভিক্টোরিয়ার রাজ্যশাসনের ষষ্ঠিতম বর্ষপূর্তির দিন র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টের হত্যাকাণ্ড ঘটে। হত্যাকারীর সন্ধানে ব্যর্থ বোম্বাই পুলিশ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করল রাজদ্রোহের অভিযোগে টিলক ও নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়কে যথাক্রমে 27 ও 28 Jul [১২-১৩ শ্রাবণ] তারিখে গ্রেপ্তার করে। টিলক তখন বোম্বাই গবর্মেন্টের আইনসভার সম্মানিত সদস্য, তবু তাঁকে জামিন না দিয়ে বোম্বাই প্রেরণ করা হয়। 4 Aug বিচারপতি বদরুদ্দিন তায়েবজি তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। এর পরের ঘটনার কথা লিখেছেন অমল হোম:

> ১৮৯৭ সনে টিলক যখন প্রথম রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত, বোম্বাই হাইকোর্টে তখন তাঁহার পক্ষ-সমর্থনের জন্য কৌঁসুলী পাওয়া দুর্লভ হইল—উকিল-মহলেও এমনি আতঙ্ক। টিলক কলিকাতায় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবস্থা জানাইলেন। কলিকাতা হইতে কৌঁসুলী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য "অমৃতবাজার পত্রিকা"-আপিসে পরামর্শসভা আহূত হইল। আমন্ত্রিতদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। মতিলাল ঘোষ-মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, সভাকক্ষে শুভ্র-উত্তরীয় রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন—ললাটে তাঁহার রক্ততিলক! টিলকের জন্য কলিকাতার কৌঁসুলী-নিয়োগের ব্যয়নির্বাহার্থ চাঁদা তুলিবার কাজে রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে যোগদান করিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, চাঁদার জন্য তারকনাথ পালিত মহাশয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা না করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট গিয়া এক হাজার টাকা আদায় করেন। প্রায় সতেরো হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার দুইজন বিখ্যাত ইংরাজ ব্যারিস্টার—পিউ ও গার্থ সাহেবকে বোম্বাইয়ে পাঠানো হয়; তাঁহাদের 'জুনিয়র'-হিসাবে যান আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা ও সুরেন্দ্রনাথের জামাতা ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী।[২৫]

বোম্বাই হাইকোর্টে টিলকের মামলা আরম্ভ হয় 8 Sep [বুধ ২৪ ভাদ্র) তারিখে। কিন্তু বিচারপতি Mr Strachey য়ুরোপীয় জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে 14 Sep [মঙ্গল ৩০ ভাদ্র] টিলককে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এই প্রতিশোধমূলক দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য 'টিলক ডিফেন্স ফাণ্ড' গড়ে চাঁদা

তোলা আরম্ভ হয়। রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রেও বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন। অবশ্য প্রিভি কাউন্সিলে টিলকের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ২৯ আশ্বিনের পত্রে 'দুই এক দিনের মধ্যে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা' করার কথা লিখেছিলেন। এই কথা অনুযায়ী তিনি উড়িষ্যা যাত্রা করেন ২ কার্তিক [সোম 18 Oct] তারিখে। এর আগে যে দু'বার তিনি উড়িষ্যা যান, সেই দু'বারই স্টীমারে সমুদ্রপথে গিয়েছিলেন। এবারে তাঁর যাত্রা নদী ও খালের পথে নৌকাযোগে। যাত্রাপথের বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষেপে তিনি লিখে রেখেছিলেন ১৩০৪ সনের 'কুন্তলীন পঞ্জিকা'-য়, যেটির কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যাত্রাপথের এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখে রাখা রবীন্দ্রনাথের অভ্যাসের অন্তর্গত ছিল। হাজারিবাগ-ভ্রমণ, 1890[১২৯৭]-র য়ুরোপ-ভ্রমণ ও 1893[১২৯৯]-র উড়িষ্যা-ভ্রমণের এইরূপ বিবরণ তিনি রক্ষা করেছিলেন। 'দশদিনের ছুটি' রচনায় ও 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম দু'টি বিবরণ সাহিত্য-রূপ লাভ করেছিল। শেষোক্তটিকে ব্যবহার করেছিলেন বলেন্দ্রনাথ উড়িষ্যা-বিষয়ক তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। বর্তমান বিবরণটির সেরূপ সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু এই ভ্রমণ সাহিত্যসৃষ্টির দিক থেকে ব্যর্থ হয় নি, 'কথা ও কাহিনী'-র অনেকগুলি কবিতা এই ভ্রমণপথে রচিত।

২ কার্তিক [সোম 18 Oct] রবীন্দ্রনাথ 'কুন্তলীন পঞ্জিকা'-য় লিখেছেন: 'কলিকাতা ছেড়ে রাজগঞ্জ। রথীকে নিয়ে বাড়ি ফিরি। বৃষ্টি।' রথীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন: 'জলপথ তাঁর এত ভালো লাগত যে কলকাতা থেকে কয়েকবার তিনি খাল দিয়ে বোটে করে বরাবর কটক পর্যন্ত গিয়েছিলেন।'[২৬] আমাদের অনুমান, রবীন্দ্রনাথ এবার পুত্রকে [৯] সঙ্গে নিয়েছিলেন, কিন্তু 'রথীকে নিয়ে বাড়ি ফিরি' বাক্যটি কিছুটা সংশয় সৃষ্টি করে।

৩ কার্তিক [মঙ্গল 19 Oct]: 'রাজগঞ্জ হতে উলুবেড়ে খালের মধ্যে প্রবেশ। দামোদর পর্য্যন্ত। সমস্ত দিন বৃষ্টি।'

৪ কার্তিক [বুধ 20 Oct]: 'কাঁটাপুকুর হয়ে রূপনারায়ণ নদী বেয়ে গেঁয়োখালির খালের মধ্যে প্রবেশ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি।'

৫ কার্তিক [বৃহ 21 Oct]: 'হলদি নদী ও কালীনগরের নদী পেরিয়ে উড়িষ্যা খালের মধ্যে প্রবেশ করা গেছে। সুন্দর পরিষ্কার দিন।'

এই দিন তিনি লেখেন 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' [দ্র কথা ৭। ১১-১৩] কবিতাটি। এই কবিতাটির কথাবস্তু তিনি সংগ্রহ করেছেন ড রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* [1882] গ্রন্থের অন্তর্গত অবদান শতক-এর ৫৫-সংখ্যক [p. 33] কাহিনীসার থেকে:

নগরের সকলের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ভগবান [বুদ্ধের] জন্য ভিক্ষা করবার অনুমতি অনাথপিণ্ডদ রাজার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। একটি হাতির পিঠে চড়ে ভ্রমণের সময়ে তিনি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধাতুপাত্র, কঙ্কণ প্রভৃতি অলঙ্কার ভিক্ষারূপে পেলেন। একটি দরিদ্র রমণী, যার একটিই মাত্র বস্ত্র ছিল, ঝোপের আড়াল থেকে সে বস্ত্রটি হস্তীর উপর নিক্ষেপ করল। ভিক্ষুক [অনাথপিণ্ডদ] তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন এবং তাকে মূল্যবান উপহারে ভূষিত করলেন। রমণীটি ভগবান [বুদ্ধের] কাছে গেল এবং তাঁর কাছ থেকে সত্যজ্ঞান লাভ করল।

—'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতার পাঠক জানেন, প্রচারমূলক এই কাহিনী-বীজ অনাবশ্যক বস্তু পরিত্যাগ করে কিভাবে কাব্যরূপ লাভ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন সমালোচকও দুর্লভ ছিলেন না, যিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, মেয়েটি তার একমাত্র বস্ত্র ভিক্ষা দেওয়ার পর কি করে ঘরে ফিরে গিয়েছিল!

৬ কার্তিক [শুক্র 22 Oct]: 'গেঁয়োখালি থেকে প্রায় ৬০ মাইল আসা গেছে। দিন মেঘাবৃত। অত্যন্ত গুমট।'

এইদিন রবীন্দ্রনাথ লেখেন মারাঠি গাথা অবলম্বনে 'প্রতিনিধি' [দ্র কথা ৭। ১৪-১৭] কবিতাটি। গ্রন্থে মুদ্রণের সময়ে তিনি শিরোটীকায় লেখেন: "অ্যাক্‌ওয়ার্থ্‌ সাহেব কয়েকটি মারাঠি গাথার যে ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজীর গেরুয়া পতাকা 'ভাগোয়া ঝণ্ডা' নামে খ্যাত।" এখানে কথাবস্তুর নিজস্ব মহিমার জন্য রবীন্দ্রনাথ কাহিনীটিকে সরাসরি কবিতায় পরিণত করেছেন, তার বিশেষ কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

বোম্বাই প্রদেশ মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল হওয়ার ফলে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সেখানকার জীবনযাত্রা ও ইতিহাস সম্পর্কে একটা মোটামুটি জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের ছিল। তাছাড়া বর্তমান সময়ে পুনার হত্যাকাণ্ড, শিবাজী ও আফজল খাঁ-বিষয়ক বক্তৃতার জন্য তিলকের কারাবাস, তাঁর মুক্তির জন্য অর্থসংগ্রহের প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রভৃতি কারণে তিনি হয়তো বিশেষ করে মারাঠি ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। 'প্রতিনিধি' কবিতাটি তারই ফল রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

৭ কার্তিক [শনি 23 Oct]: 'সুবর্ণরেখা ও পাচপাড়া নদী পার হয়ে বালেশ্বর থেকে দেড় ক্রোশ তফাতে বুড়বলঙ্গের মুখে বোট রাখা গেছে। কালকের জোয়ারে যাব। মাঝে মাঝে বৃষ্টি। প্রায় সমস্ত রাস্তা পাল পাওয়া গেছে।'

৮ কার্তিক [রবি 24 Oct]: 'বালেশ্বরের পরে পুনরায় উড়িষ্যার খালে এসে ঢুকেছি। বালেশ্বরে যাওয়া বৃথা হল। কিছুই পাওয়া গেল না।/শীত আরম্ভ।' কী পাওয়ার আশায় রবীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে গিয়েছিলেন তিনি নিজেও তা লেখেন নি ও উপকরণের অভাবে স্পষ্ট করাও সম্ভব নয়।

৯ কার্তিক [সোম 25 Oct]: 'চারবাটিয়া পর্য্যন্ত মোতাই নদীর মুখে বোট রেখেছি। মাঝে ২ সমুদ্র দেখা গেছে। পথের মধ্যে কাঁশবাঁশ নদী পার হয়েছি। মোতাই নদী বেয়ে ব্রাহ্মণী নদীতে প্রবেশ করতে হবে।'

এইদিন রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'পতিতা' [দ্র কাহিনী ৫। ৮৪-৯৩] কবিতাটি। রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনী কবিতাটির অবলম্বন, কিন্তু আধুনিক কবির রসদৃষ্টিতে সেই প্রাচীন কাহিনীর সম্পূর্ণ ভাবান্তর ঘটেছে। পূর্বে 'অহল্যার প্রতি' কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। কয়েক বৎসর পরে [১৩০৮] মজুমদার লাইব্রেরির সান্ধ্য-মজলিস 'আলোচনা সমিতি'র বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা সম্পর্কে বলেন: 'রমণী পুষ্পতুল্য—তাকে ভোগে ও পূজায় নিয়োগ করা যেতে পারে। তাতে যে কদর্যতা বা মাধুর্য প্রকাশ পায় তা ফুলকে বা রমণীকে স্পর্শ করে না, —রমণী বা ফুল চির-অনাবিল—তাতে ফুল বা রমণীর কোন ইচ্ছা মানা হয় না ব'লে সে ভোগে বা পূজায় নিয়োজিত হয়, তাতে নিয়োগকর্তার মনের কদর্যতা বা মাধুর্য মাত্র প্রকাশ পায়। যে সহজপূজ্য তাকে ভোগের পদবীতে নামিয়ে আনে যে সেও একটা আনন্দ পায় বটে, কিন্তু সে আনন্দ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। পতিতা হলেও নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, অনুকূল অবস্থা পেলে সে পুনর্বার পবিত্রতা লাভ করতে পারে। পাপের অন্যায়ে সে তার আত্মাকে কলুষিত করেছে মাত্র, কিন্তু তার আত্মা একেবারে নষ্ট হয় নি—তার আত্মা বাষ্পাচ্ছন্ন দর্পণের মত হয়ে আছে। ঋষির কুমারই পতিতার কলুষতামস জীবনের মধ্যে প্রেমের জ্যোতি বিকীর্ণ করে প্রকৃত জীবনপথের সন্ধান তাকে দেখিয়ে দিলেন।... পতিতার নারীত্বের পূজারী কেউ ছিল না, ঋষিকুমার তার প্রথম পূজারী হয়ে তাকে তার নারীত্বের সঙ্গে

পরিচিত করে দিলেন। সৎগুণ সে পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় যে পর্যন্ত না ভাবের ভাবুক এসে তার উপাসনা করছে। শক্তিমানের পূজা না পেলে শক্তি জাগরিত হয় না।'[২৭]

১০ কার্তিক [মঙ্গল 26 Oct]: 'মোতাই ছোট নদী, খরস্রোত, কুমীরভরা—দুইতীরে শরবন।

মোতাই বেয়ে ধামরায় এসে রাত্রের জোয়ারে দিশাহারা হয়ে এক ষ্টীমারের অনুসরণ। তীরে লোক নেই—নদীতে নৌকো নেই, আকাশে চাঁদ নেই। গভীর জলে নোঙর করে অবস্থান। সারারাত কোটালের জোয়ারের কলকল।'

১১ কার্তিক [বুধ 27 Oct]: 'পথভুলে [যদ্দৃষ্টং] ব্রাহ্মণী নদীর নানা শাখা প্রশাখায় পরিভ্রমণ।'

১২ কার্তিক [বৃহ 28 Oct]: 'Alva আল্‌বা খালে প্রবেশ।'

১৩ কার্তিক [শুক্র 29 Oct]: 'খালের মধ্যে। শীত কম। অল্প মেঘ।'

এই দিন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর সুপরিচিত কবিতা 'দেবতার গ্রাস' [দ্র ভারতী, কার্তিক ১৩০৫। ৫৭৭-৮৪; কাহিনী ৭। ১০১-০৭]। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন, কবিতাটি 'স্থানীয় গল্প শুনিয়া রচিত'।[২৮] যে পরিবেশের মধ্যে কয়েক দিন ধরে রবীন্দ্রনাথ নৌকাযোগে দীর্ঘ জলযাত্রা করে চলছিলেন, এই কবিতাতে সেই অভিজ্ঞতা নাটকীয় কাহিনীর আকারে কাব্যরূপ লাভ করেছে। এরই সঙ্গে সংকল্পসিদ্ধির কামনায় গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জনের নিষ্ঠুর প্রথার ইঙ্গিত সমস্ত কাহিনীতে এক অপ্রতিরোধ্য কারুণ্যের সঞ্চার ঘটিয়েছে। এই কারণেই কবিতাটি এত জনপ্রিয়।

১৪ কার্তিক [শনি 30 Oct]: 'খাল পেরিয়ে এসে রাত্রে মহানদীতে অবস্থান। জ্যোৎস্নারাত্রি।'

১৫ কার্তিক [রবি 31 Oct]: 'মহানদীর চরে ঠেক্‌তে ২ কটকে উপস্থিত। তালদণ্ডা খালে প্রবেশ করে রাত্রে অরছিলিতে আগমন।'

ডায়ারিতে ভ্রমণবিবরণ এইখানেই সমাপ্ত। এর পরে রবীন্দ্রনাথ কোথায় কতদিন অবস্থান করেছিলেন বলার উপযোগী তথ্য নেই। তবে তিনি যে ২৪ কার্তিকের [মঙ্গল 9 Nov] আগেই কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, এই দিন তাঁর পার্ক স্ট্রীটে যাওয়ার হিসাব থেকে তা বোঝা যায়।

এরই অন্তর্বর্তী সময়ে তিনি রচনা করেছেন 'সতী' কাব্যনাট্য [দ্র কাহিনী ৫। ৯৭-১০৬] ও 'মস্তকবিক্রয়' [দ্র কথা ৭। ২০-২৪] কবিতা—প্রথমটি ২০ কার্তিক [শুক্র 5 Nov] ও দ্বিতীয়টি তার পরবর্তী দিনে রচিত, দু'টিই সম্ভবত কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে লেখা।

'সতী' কাব্যনাট্য 'প্রতিনিধি' কবিতার মতো মারাঠি গাথা অবলম্বনে রচিত। কাব্যনাট্যটির শিরোটীকায় উল্লিখিত হয়েছে: 'মিস্ ম্যানিং-সম্পাদিত ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাক্‌ওআর্থ্ সাহেব-রচিত প্রবন্ধবিশেষ হইতে বর্ণিত ঘটনা সংগৃহীত।' লোকধর্ম ও নিত্যধর্মের বিরোধ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনার বিষয়—মারাঠি গাথার মধ্যে তার উপকরণ পেয়ে তিনি 'সতী' কাব্যনাট্যটি রচনা করেন। কাব্যনাট্য রবীন্দ্রসাহিত্যে নূতন নয়—মূলত লিরিক্যাল অনুভূতি নাট্যরূপে বৈচিত্র্য অর্জন করেছে, ইতিপূর্বে রচিত 'বিদায়-অভিশাপ' কবিতায় তার উদাহরণ দেখা গেছে। বর্তমান পর্যায়ের কাব্যনাট্যগুলির বৈশিষ্ট্য তাদের আপেক্ষিক ক্ষুদ্র আকার, অথচ তারই মধ্যে চরিত্রগুলি ঘটনার দ্বন্দ্বে ও মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের নাটকীয়তায় ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে। 'সতী' কাব্যনাট্যে পিতা বিনায়ক রাও এমনই এক চরিত্র।

'মস্তকবিক্রয়' কবিতাটির বিষয়বস্তুর জন্য রবীন্দ্রনাথ আবার ড রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddist Literature of Nepal* গ্রন্থের শরণাপন্ন হয়েছেন; উক্ত গ্রন্থের 158-59 পৃষ্ঠায় বর্ণিত মহাবস্ত্ববদান-এর অন্তর্গত অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্যের কাহিনী অবলম্বনে তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন:

অপর এক জন্মে অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্য ছিলেন এক বণিক যিনি, কাশীরাজের সঙ্গে যুদ্ধে রক্তপাত এড়াতে রাজ্য পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছানির্বাসন-ব্রতী মহানুভব ও ধর্মশীল কৌশলরাজের দ্বারা, উপকৃত হয়েছিলেন। যখন তিনি [কোশলরাজ] দক্ষিণাপথে ভ্রমণ করছিলেন, তখন তিনি এক নিমগ্ন-পোত বণিকের সাক্ষাৎ পেলেন যে তার ভাগ্যবিপর্যয় থেকে উদ্ধারের আশায় কোশলরাজের বদান্যতার উপর নির্ভর করে তাঁর উদ্দেশেই চলেছিল। হতভাগ্য ব্যক্তিটি জানত না যে যাঁর সঙ্গে সে কথা বলছে, তিনিই সেই কোশলরাজ যাঁর ভাগ্য তার চেয়ে একটুও ভালো ছিল না। রাজা তখনই তার ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দিলেন, তাঁর নিজের দুর্ভাগ্যের বিবরণ দিলেন, দুঃখের সঙ্গে জানালেন, তিনি আর কোনদিন বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনে লাগবেন না। আশার শেষ আশ্রয়টি হারিয়ে হতভাগ্য বণিকটি মুহ্যমান হয়ে দীর্ঘকাল অচৈতন্যের মতো পড়ে রইল।

কিন্তু একটি আশার ঝলক সেই মহান নৃপতির হৃদয়ে আঘাত করল। তাঁর মাথার জন্য একটি মূল্য ধার্য হওয়ার কথা তাঁর মনে পড়ল, মূর্ছাবস্থা থেকে সুস্থ হতভাগ্য ব্যক্তিটিকে তিনি প্ররোচিত করলেন তাঁকে জীবিত অবস্থায় কাশীরাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই আত্মত্যাগের মহিমা কাশীরাজকে বিস্মিত করল, তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেন, এবং সেই বণিককে শুধু প্রভূত পরিমাণ অর্থই দিলেন না, [কোশল] রাজাকে তাঁর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীর সামান্য পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু সেই পরিবর্তনের ফলেই কাহিনীর শেষাংশ অসামান্য নাটকীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

কলকাতায় ফিরেই রবীন্দ্রনাথ ২৫ কার্তিক [বুধ 10 Nov] শান্তিনিকেতনে রওনা হন। তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহির এই দিনের হিসাবে 'শ্রীযুক্ত বাবু মহাশয়ের বোলপুর গমন জন্য ২০ ষ্টেসনে যাওয়ার গাড়ীভাড়া' বারো আনার উল্লেখ থেকে তারিখটি নির্ধারিত হয়েছে।

এই দিন কলকাতা ত্যাগের পূর্বে তিনি ব্রাহ্মযুবক বসন্তকুমার গুপ্তের জন্য একটি সুপারিশপত্র লিখে দেন, পত্রপ্রাপকের নাম অজ্ঞাত:

সাদরসম্ভাষনমেতৎ /আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার গুপ্ত আপনার অধীনস্থ নিমক্‌মহালের ইন্‌স্পেকটরী অথবা অনুরূপ কোন প্রার্থী আছেন। ইনি সচ্চরিত্র ভদ্রবংশজাত, বি. এ. পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী যুবক: ইঁহার সততা সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহ করিবার বিষয় নাই। যদি কোন সুযোগ থাকে ইঁহাকে উক্ত বিভাগের কোন উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিলে অপাত্রে কার্য্যভার পড়িবে না ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা। ইনি যথারীতি আপনার নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন, যদি ইঁহার প্রতি আনুকূল্য করিতে কোন বাধা না থাকে তবে বাধিত হইব। ইতি। ২৫শে কার্ত্তিক। ১৩০৪[২৯]

বসন্তকুমার গুপ্ত ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানির ব্যবসা-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। পরে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই সুপারিশক্রমে ত্রিপুরা রাজকুমারীদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন।

মৃণালিনী দেবী পুত্রকন্যা-সহ কার্তিক মাসের প্রথম থেকেই শান্তিনিকেতনে বাস করছিলেন। ৪ কার্তিক সরকারী ক্যাশবহিতে 'শ্রীমতী ছোটবধূঠাকুরাণী বোলপুর গমন জন্য ১৩৫' ধার দিতে দেখা যায়। ২৫ কার্তিক [বুধ 10 Nov] রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। ৩ পৌষ [শুক্র 7 Dec] তিনি সপরিবারে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

শান্তিনিকেতনে অবসরযাপন ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর কী করছিলেন, তা বলা শক্ত। তবে সম্ভবত তিনি সেখানে একটি ঘর তৈরি করাচ্ছিলেন, তার কিছু হিসাবপত্র পাওয়া যায় পূর্বোল্লিখিত 'কুন্তলীন পঞ্জিকা'য়; ১৭ অগ্র° 'গাছকাটাই মজুরী ॥০/ রাজমজুরদের—', ১৯ অগ্র° 'তাল ও অর্জ্জুন গাছ কাটাই—২ মজুর/ সুরুল হইতে ২ গাড়ি তালগাছ গাড়ি ভাড়া', ২৬ অগ্র° 'সাঁওতাল মিস্ত্রি ও মজুর—।ল/০ /জমা—৮ (বিদ্যার্ণব মহাশয়)', ২৯ অগ্র° 'সূচাঁদ—১/ বিদ্যার্ণবমশায়—১' প্রভৃতি হিসাব এখানে লেখা আছে রবীন্দ্রনাথের

হস্তাক্ষরে। এখানে উল্লিখিত 'বিদ্যার্ণব মহাশয়' হচ্ছেন শিবধন বিদ্যার্ণব—ইনি ২৪ অগ্র° [বুধ 8 Dec] তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্য ৫০্ টাকা নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন, একই দিনে 'বোলপুরে সংস্কৃত শিক্ষা তিনখানি' পাঠানোর হিসাব দেখে মনে হয় মাধুরীলতা রথীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সংস্কৃত শিক্ষার ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল।

শান্তিনিকেতন-বাসও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার দিক দিয়ে ফলপ্রসূ হয়েছিল। ৭ অগ্র° [রবি 21 Nov] 'নরকবাস' [দ্র কাহিনী ৫। ১০৭-১৫] ও ২৯ অগ্র° [সোম 13 Dec] 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' [দ্র ভারতী, ফাল্গুন ১৩০৫। ৯৩১-৭৮; কাহিনী ৫। ১১৫-৫৪ কাব্যনাট্য-দু'টি লিখিত হয়—সম্ভবত 'ভাষা ও ছন্দ' [দ্র ভারতী, ভাদ্র ১৩০৫। ৪১১-১৬; কাহিনী ৫। ৯৩-৯৭] কবিতা ও 'গান্ধারীর আবেদন' [দ্র ঐ ৫। ৬৫-৮৪] কাব্যনাট্যও এখানে রচিত হয়েছিল।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি যেন ইতিহাস ও পুরাণ অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যনাট্যগুলির ভূমিকা-স্বরূপ। আমরা দেখেছি, ড রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhistic Literature of Nepal*, অ্যাকওয়ার্থের *Ballads of the Marathas*, রামায়ণ প্রভৃতির বস্তু অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলি এই সময়ে রচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে তাঁর আধুনিক কবিদৃষ্টি সেই প্রাচীন বস্তুগুলির ব্যাপক রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই পরিবর্তনের কাব্যিক কৈফিয়ৎ রচিত হয়েছে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটিতে। এতে দেবর্ষি নারদের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন:

সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

একই ভাবে আধুনিক কবির মনোভূমিতে ইতিহাস-পুরাণের কাহিনীগুলির বীজ রোপিত হয়ে নূতন শস্য উৎপন্ন করেছে।

'নরকবাস' মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত সোসক রাজার কাহিনী অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীর রূপান্তর ঘটিয়েছেন সামান্যই, কিন্তু কৃত্রিম শাস্ত্রধর্ম ও মানবধর্মের দ্বন্দ্বকে সুকৌশলে উপস্থাপিত করেছেন যা তাঁর এই জাতীয় রচনার সাধারণ লক্ষণ।

'গান্ধারীর আবেদন'-এর কাহিনীও মহাভারত-আশ্রিত; ধর্মশীলা তেজস্বিনী গান্ধারী পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে মানবধর্মে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন এই কাহিনী নাট্যাকারে এখানে উপস্থাপিত। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সাধর্ম্য ঘটায় কাব্যনাট্যটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল, এ-সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' কাব্যনাট্য রবীন্দ্রনাথের একটি অভিনব সৃষ্টি। ইতিহাস-পুরাণের কাহিনী ত্যাগ করে তিনি এখানে রূপকথার আবহকে অবলম্বন করেছেন, কিন্তু পুরুষচরিত্রহীন এই নাটিকায় মেয়েলি কলহপরায়ণতা চিত্তদৈন্য লুব্ধতা চাটুকারিতা প্রভৃতির চিত্রটি বাস্তবসদৃশ—কাব্যনাটিকার উপভোগ্যতার কারণ এইটিই। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যথোপযোগী শব্দবিন্যাস ও চটুল মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সুনিপুণ ব্যবহার। পরবর্তীকালে আশ্রম বিদ্যালয়ের বালিকা শাখায় নাটিকাটি বহুবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

৩ পৌষ [শুক্র 17 Dec) 'হাবড়া ষ্টেশন হইতে...তিন খানা গাড়ী' ভাড়া করে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে বাড়ি ফিরে আসেন। এই দিনই তিনি পার্ক স্ট্রীটে যান পিতার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু আবার তাঁকে শান্তিনিকেতনে যেতে হয় ৭ পৌষ [মঙ্গল 21 Dec] সপ্তম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য। এই দিন প্রাতঃকালীন উপাসনার পর 'সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্র বাবু অনাথ দীন দরিদ্রদিগের জন্য সমন্ত্রক ভোজ্য উৎসর্গ করিলেন।'[৩০]

শান্তিনিকেতন থেকে তিনি পরের দিনেই ফিরে আসেন। ক্যাশবহির হিসাবে এই দিন তাঁকে পার্কস্ট্রীটে যেতে দেখা যায়। এছাড়াও ১০, ১১, ১৩, ১৭, ২০, ২১, ২৩, ২৬, ২৭ ও ২৮ পৌষও তিনি পার্ক স্ট্রীটে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহির হিসাব অনুযায়ী তিনি ১২ পৌষ [রবি 26 Dec] 'রাধারমণ [? কর] বাবুর বাটী নিমন্ত্রণে', ২৮ পৌষ [মঙ্গল 11 Jan 1898] 'কুচবিহারের মহারাজার বাটী নিমন্ত্রণে' ও পরদিনে বালিগঞ্জ যাতায়াত করেন।

২১ পৌষ [মঙ্গল 4 Jan] 'দেওঘর যোগেন্দ্র [যোগীন্দ্র] নাথ বসুর নিকট রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের পত্র পাঠান'র হিসাব পাওয়া যায়। যোগীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পত্রটি পাওয়া যায় নি।

গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে জমিদারি ভাগ-সংক্রান্ত মোকদ্দমা তখনও চলছে, ফলে এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ততা দেখা যায়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'Suit No. 585 of 1897—Minutes of 18th, 19th January and 4th February 1898' - শীর্ষক একটি দলিলে [Tagore Family Papers No. 71] এ-সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার বিবরণ আছে। ক্যাশবহির ৭ মাঘের [বুধ 19 Jan] হিসাবেও 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়/ পার্টীশেনের মোকাদ্দামার কারণ হাইকোর্টে যাওয়ায় উঁহার হোটেলে খাবার খরচ'-এর উল্লেখ দেখা যায়। ১৯ মাঘ [সোম 31 Jan]ও তিনি হাইকোর্টে গিয়েছিলেন।

এছাড়াও কলকাতায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ যথারীতি ভ্রাম্যমান। ১ মাঘ 'রমণীবাবুর বাটী ও ধর্ম্মতলা হইয়া আসিবার', ২ মাঘ 'যোড়া গির্জ্জা ও আলিপুর যাতায়াতের', ২৫ মাঘ 'গোলতালা হইয়া পার্কষ্ট ীট যাতায়াতের', ২৯ মাঘ 'পার্কষ্ট ীট হইতে আলিপুর যাওয়ার' ও ৩০ মাঘ তাঁর 'বালিগঞ্জ যাতাতের' হিসাব পাওয়া যায়। আর তিনি শুধু পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াত করেছিলেন ৪, ৫, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৯ মাঘ তারিখে।

১১ মাঘ [রবি 23 Jan] 'অষ্টষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ' অনুষ্ঠিত হয় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ও মহর্ষিভবনে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ-রচিত সাতটি ব্রহ্মসংগীত গাওয়া হয়, এর মধ্যে 'সুধাসাগরতীরে হে এসেছে নরনারী' গানটি কাব্য গ্রন্থাবলী [আশ্বিন ১৩০৩]-তে মুদ্রিত হয়েছিল, 'ভক্ত হৃদ্‌বিকাশ প্রাণবিমোহন' ও 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা' ২৮ ভাদ্র ১৩০৪-এর পূর্বে রচিত—বাকিগুলি ১৩ আশ্বিনের পরে কোনো সময়ে লেখা, মজুমদার-পুঁথিতে 'সুধাসাগরতীরে' ছাড়া সবগুলিরই পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। অন্য গানগুলি হল [মজুমদার-পুঁথির ক্রম অনুসারে সজ্জিত]:

[১] আড়ানো-ঝাঁপতাল। নিত্য সত্যে চিন্তন কর রে বিমল হৃদয়ে দ্র গীত ৩। ৯৪৮; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮০; স্বর ২৪; মূল গান: কালীনাম চিন্তন করো রে মেরে মন দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৪৭; মজুমদার-পুঁথিতে মূল গানটি লিখে রবীন্দ্রনাথ প্রতিটি ছত্রের উপরে কথা বসিয়েছেন।

[২] সিন্ধু-আড়াঠেকা। কে বসিলে আজি হৃদাসনে [হৃদয়াসনে] ভুবনেশ্বর প্রভু দ্র গীত ১। ১৭৭-৭৮; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৯; স্বর ৪৫; মূল গান: বে পরি জাঁ তাঁড়ে তাঁড়ে পর দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮৮; মজুমদার-পুঁথিতে পাণ্ডুলিপি আছে, কিন্তু মূল গানটি রবীন্দ্রনাথ লিখে রাখেন নি।

[৩] কেদারা—সুরফাঁকতাল। উঠি চল সুদিন আইল দ্র গীত ৩। ৮৪৬; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৯; স্বরলিপি নেই; মূল গান: উঠি চলে সুদিন নাচত রে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ২৮; রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে মূল গানের চারটি ছত্র লিখে কথা বসিয়েছেন।

[4] আড়ানা-কাওয়ালি। লহ লহ তুলি লহ হে ভূমিতল হতে দ্র গীত ১। ১৬৯; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮০; স্বরলিপি নেই; পাণ্ডুলিপিতে গানটি আছে, কিন্তু হিন্দি গান ভেঙে রচিত কি না বোঝার উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। আমরা বলেছি, তিনি সম্ভবত শান্তিনিকেতন বাস-কালে অগ্রহায়ণ মাসে 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকাব্যটি রচনা করেন। ১ ফাল্গুন [শনি 12 Feb] তিনি এটি ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে পাঠ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকা-র 10 Feb সংখ্যায় এ-বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়: 'A meeting of the Calcutta University Institute will be held on Saturday, the 12th February, at 6 P. M., in the hall of the Institute, College Square, when Babu Rabindra Nath Tagore will recite a poem, composed by himself on the exile of the Pandavas. The Hon. Dr. Gooroo Das Banerji will preside.' কবিতাপাঠের পর 'সংসার' নামক একটি ক্ষণজীবী সাপ্তাহিকের ৮ ফাল্গুন-সংখ্যায় লেখা হয়: 'গত শনিবার কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হলে শ্রীযুক্ত রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর পাণ্ডব নির্ব্বাসন উপলক্ষে, ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন সংবাদ নামে একটি নাট্য কাব্য পাঠ করেন। মাননীয় জজ শ্রীযুত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতী ছিলেন। নাট্য কাব্য পাঠ সময়েই আমাদের মনে হইতেছিল যে কাব্য খানি বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী। সিডিশন আইন লইয়া রাজপুরুষেরা যে রূপ কার্য্য করিতেছেন তাহার প্রতি এই কাব্যে কটাক্ষ আছে মনে হইতেছিল। সভাপতি মহোদয়ও বলিলেন যে বর্ত্তমান আন্দোলন সময়ে রাজপুরুষেরা এই কাব্য হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।'

কিন্তু এই বিবরণ সম্পূর্ণ নয়। কিছুদিন আগে ২৬ অগ্র° [শুক্র 10 Dec 1897] তারিখে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের একটি সভায় তরুণ সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'রবীন্দ্রবাবুর চৈতালি' নামে একটি সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বেই পাঠ করেন। 'মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি সেই সভায় আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন।'* প্রবন্ধটি Dec 1897-সংখ্যা 'দাসী' [পৃ ৫১৩-৩২]-তে মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বিরক্ত হন। তাঁর কবিতাপাঠের আসরের অন্যতম শ্রোতা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

> রবিবাবু তাঁর নবরচিত নাটিকা পাঠ করতে উঠে ভূমিকা স্বরূপ বলতে লাগলেন—"কয়েক বৎসর পূর্বে স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু আমাকে এই হলে কোনো লেখা পড়তে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষা করবার সুযোগ আমার হয় নি। সম্প্রতি আজকার মাননীয় সভাপতি মহাশয় আমাকে এখানে কিছু পাঠ করতে অনুরোধ করেন। আমি মনে করলাম যে এই সুযোগে বঙ্কিমবাবুর অনুরোধের ঋণ পরিশোধ করতে পার্‌ব, তাই আমি আমার লেখা পাঠ কর্‌তে সম্মত হয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমার লেখা এখানে পাঠ কর্‌তে আমার স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কারণ, অল্প কয়েক দিন আগে এই হলে, এই সভাপতির অধীনে, হয়তো বা ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কবিতার বিরুদ্ধ সমালোচনা পাঠ হয়ে গেছে।

যিনি সমালোচক, তিনি বয়সে তরুণ। তরুণ বয়স যথার্থ সমালোচনার সময় নয়। তরুণ বয়সে লোকে কবি হতে পারে, কিন্তু সমালোচক হতে হলে প্রবীণ বয়সের দরকার। কাঁচা বাঁশে বাঁশী হতে পারে বটে, কিন্তু লাঠি হতে হলে পাকা বাঁশের দরকার। মানুষকে ভাইপো হয়েই জন্মিতে হয়, কিন্তু অনেক লোকে জ্যাঠা হবার পূর্বেই জ্যাঠাইয়া যান। সকল মানুষের মধ্যে সকল গুণ থাকে না, আর তা প্রত্যাশা করাও যায় না। ময়ূরের পুচ্ছ আছে, কিন্তু তার কণ্ঠে কোকিলের সুস্বর নেই; আবার কোকিলের কণ্ঠ আছে, তার ময়ূরের মতন সুন্দর পুচ্ছ নেই। ইক্ষুদণ্ডে আম্রফল ফলে না, আর আম্রশাখায় ইক্ষুরস পাওয়া যায় না। অতএব কবির কাব্যে কি আছে তারই বিচার না করে, কি নেই তাই নিয়ে তাকে দোষারোপ করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। তাই আজ আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এখানে এসেছি আমার লেখা পাঠ করতে।"...

এই নাটিকা পাঠ শেষ হলে গুরুদাসবাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ বাবুকে দিয়ে রবিবাবুকে ধন্যবাদ দেওয়ালেন। হেমেন্দ্রবাবু প্রথমে কিছুতেই সম্মত হচ্ছিলেন না, শেষে গুরুদাসবাবুর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ধন্যবাদ দিলেন, সে যেন বেহুলার অনুরোধে চাঁদ সদাগরের হাতে মনসাদেবীর পূজা পাওয়া।

যখন রবিবাবু হেমেন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ ক'রে কবিত্বরসালো তিরস্কার কর্‌ছিলেন, তখন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি হেমেন্দ্রবাবুর কয়েকজন বন্ধু সভাগৃহ ত্যাগ ক'রে চলে গিয়ে নিজেদের বিরক্তি ও প্রতিবাদ প্রকাশ করেছিলেন।[৩১]

ঘটনাটি এখানেই শেষ হয়নি। পূর্বোল্লিখিত 'সমালোচক' লিখেছেন:

ঐ বক্তৃতার জন্য হেমেন্দ্র বাবু রবীন্দ্র বাবুকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন—

"গত শনিবারে Calcutta University Institute গৃহে আপনার কাব্য-পাঠের প্রারম্ভে, আমার লিখিত 'বৈতালী' সমালোচনা উপলক্ষ করিয়া আপনি যাহা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা যদি শীঘ্র মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে একটা নকল পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব। ইতি

বিনয়াবনত শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।"

উত্তরে রবীন্দ্র বাবু ঐ পত্রের উপরই লিখিয়া দিয়াছিলেন—

'পাঠ করি নাই, মুখে বলিয়াছিলাম, তাহা ছাপাইবার কোন অভিপ্রায় নেই। যে notes ছিল, তাহা নকলের যোগ্য নহে—এবং বিষয়টি স্থায়িভাবে রক্ষা করিবার উপযুক্ত গুরুতর নহে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'[৩২]

হেমেন্দ্রপ্রসাদ এই উত্তরে সন্তুষ্ট হন নি, তিনি রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করে বৈশাখ ১৩০৬-সংখ্যা [পৃ ২৭-৩৯] সাহিত্য-তে 'প্রণয়ের পরিণাম' নামে একটি গল্প লেখেন। সেটি নিয়ে সেই সময়ে একটি সাহিত্যিক কলহ ঘনিয়ে ওঠে, আমরা যথাস্থানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, কবিতাপাঠ, ধন্যবাদজ্ঞাপন ইত্যাদির পরে শ্রোতারা 'রবিবাবুর গান' শোনার দাবি জানালে 'কে এসে যায় ফিরে ফিরে' গানটি গেয়ে শোনান। গানটি নব-রচিত, মজুমদার-পুঁথিতে ঈষৎ ভিন্ন পাঠে গানটি প্রথম রচিত হয়েছিল দ্র গীত ৩। ৮২১; উৎসাহ, বৈশাখ ১৩০৫। ১৩ 'সে আমার জননী রে', ভৈরবী—রূপক; কল্পনা ৭। ১৫৬-৫৭; স্বর ৪৭; বীণাবাদিনী পত্রিকার ফাল্গুন ১৩০৪-সংখ্যায় [পৃ ২২৩-২৭] গানটি ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি-সহ প্রথম প্রকাশিত হয়।

চারুচন্দ্র লিখেছেন: 'সেই সভায় অনেক বিলাতফেরত ঈঙ্গবঙ্গ না-ইংরেজ-না-বাঙালী-গোছের বিদেশী পোশাক-পরা বিদেশী ভাষায় কথা বলায় চেষ্টিত লোক ছিলেন, তাঁদের অবস্থা দেখে আমরা তখন অত্যন্ত সুখ অনুভব করেছিলাম।'[৩৩]

সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিকায় 'গান্ধারীর আবেদন' বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। 'সংসার' পত্রিকার প্রতিবেদক এই নাট্যকাব্যে সিডিশন আইনের বিরুদ্ধে কটাক্ষ দেখেছেন, চারুচন্দ্রদের মনে হয়েছিল: 'ধৃতরাষ্ট্র হচ্ছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, দুর্যোধন Bureaucracy, গান্ধারী ইংরেজ জাতির ন্যায়নিষ্ঠা

(British sense of justice) ভানুমতী British prestige, পাণ্ডবেরা স্বাধিকার-বঞ্চিত ভারতবাসী এবং দ্রৌপদী ধর্মপথে চলার শক্তি ও গৌরব!' আবার 'সেই সময় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের পত্নীর অপমান-সূচক লেখা প্রকাশ ক'রে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। গান্ধারীর উক্তির মধ্যে আমরা রবিবাবুর ধিক্কার অনুমান ক'রে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেছিলাম'।[৩৪]

কালীপ্রসন্ন সিংহের ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িটি লীজ নিয়ে সরস্বতী পুজোর পরের দিন ১৫ মাঘ [বৃহ 27 Jan 1898] ভারতীয় সংগীত সমাজ-এর উদ্বোধন হল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথও এই সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ২৯ মাঘ [বৃহ 10 Feb] তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহির হিসাবে দেখা যায়: 'ব° ইণ্ডিয়ান সংগীত সমাজ/দং উক্ত সমাজে ভরতি হওয়ার ফি ৫/১৮৯৮ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী দুই মাসের দান ৪'। সংগীত সমাজে বিভিন্ন উপলক্ষে গান ও অভিনয়ের আয়োজন করা হত, বিশেষ চাঁদা দিয়ে সদস্যদের খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা হত। রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে এইরূপ বিশেষ চাঁদা দেওয়ার কয়েকটি হিসাব পাওয়া যায়—'উক্ত সভায় ২ ফাল্গুন। [রবি 13 Feb] খাওয়া হওয়ায় তাহার ব্যয়...৩ ৴৬' ['Baboo Dwijendra Lal Roy has kindly consented to sing his comic songs in the Sangit Somaj to-morrow evening at 7 P. M.'—*Amrita Bazar Patrika,* 12 Feb], 'উক্ত সমাজে ২০ ফেব্রুয়ারী [রবি ৯ ফাল্গুন] খাওয়ার ব্যয়....২' ['The usual weekly entertainment of the Sangit Samaj will be held on Sunday, the 20th February at 7 P. M. and the programme will consist of recitations by several of the members. This will be followed by Mr. Lobo's concert at 9 P.M., which will play selections from music composed by the late Kumar Promode Kumar Tagore:'—*Amrita Bazar Patrika*, 19 Feb], 'খাবার হিসাবে ব্যয় ১ মার্চ [মঙ্গল ১৮ ফাল্গুন] ২' ইত্যাদি। অমৃতবাজার পত্রিকা-র 6 Apr-সংখ্যায় দেখা যায়, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আসবাবপত্র বাদ্যযন্ত্রাদি সংগীতসমাজকে উপহার দিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ দেন এক খণ্ড 'বাল্মীকি প্রতিভা'। তাঁর রচিত সংগীত পরিবেশন, কবিতা আবৃত্তি, নাট্যাভিনয়ও সংগীতসমাজের অনুষ্ঠানসূচীর অঙ্গ ছিল।

ফাল্গুন মাসটি রবীন্দ্রনাথের বেশ ব্যস্ততায় কেটেছে। 'গান্ধারীর আবেদন' পাঠ ও সংগীতসমাজের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দেওয়ার কথা আমরা আলোচনা করেছি। তিনি পার্ক স্ট্রীটে গেছেন ফাল্গুন মাসের ২, ৩ [এই দিন নিজস্ব খরচে যান ধর্মতলা ও বীডন স্ট্রীটে], ৭, ৮, ১৪, ১৭, ২৪ ও ২৯ তারিখে; 'কেশব [চন্দ্র সেন] বাবুর বাটী' যান ১৫ ফাল্গুন। ক্যাশবহির এই দিনের একটি হিসাব: 'দং বি, এল, গুপ্ত প্রভৃতিকে লইয়া রবীন্দ্রবাবু মহাশয় শান্তিনিকেতনে গমনাগমনের ও আহারাদির ব্যয় ৬৪ ৴৩'—সম্ভবত ১০-১৩ ফাল্গুনের মধ্যে দু'একদিন তিনি বিহারীলাল গুপ্ত ও তাঁর পরিবারকে শান্তিনিকেতন দেখিয়ে নিয়ে আসেন। তাঁর ভগ্নীপতি বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী ডাঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চিকিৎসার জন্য ইংলণ্ডে যান এই বৎসরের গোড়ার দিকে। সেখানে অপারেশনের পরও তাঁর রোগমুক্তি না হওয়ায় তিনি দেশে ফিরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ সতীশচন্দ্রকে দেখতে যান ২৫ ফাল্গুন [মঙ্গল 8 Mar]। ৬ চৈত্র [শনি 19 Mar] সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

আমরা আগেই বলেছি, পুনায় র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টের হত্যাকাণ্ডের পর ইংরেজ গবর্মেন্ট প্রতিহিংসায় তৎপর হয়ে ওঠে। তিলকের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড, নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়ের নির্বাসন, দামোদর চাপেকরের ফাঁসি, পুনায় প্যুনিটিভ [punitive] পুলিশ নিয়োগ ইত্যাদি এই প্রতিহিংসারই ফল। এগুলি ছিল প্রাদেশিক সরকারের কাণ্ড। স্বভাবতই এই-সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে দেশীয় পত্রপত্রিকাগুলি সোচ্চার হয়ে ওঠে। তখন এই প্রতিবাদী কণ্ঠগুলিকে স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় পেনাল কোডের কয়েকটি ধারা সংশোধন করতে চেয়ে ভারত সরকারের আইন-সদস্য Mr Chalmers 21 Dec 1897 [৭ পৌষ] তারিখে Sedition bill কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। দেশব্যাপী বিক্ষোভকে উপেক্ষা করে স্থির হয় 18 Feb 1898 তারিখে বিলটি আইনে পরিণত হবে। তার পূর্ব দিন ৬ ফাল্গুন [বৃহ 17 Feb] এই বিলের বিরোধিতা ও বিলটিকে আইনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য ভাইসরয়ের কাছে আবেদনের উদ্দেশ্যে কলকাতার টাউন হলে একটি সভা আহ্বান করা হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবটি সমর্থন করে ‘কণ্ঠরোধ’ প্রবন্ধটি পাঠ করেন, বৈশাখ ১৩০৫-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ২৩-৩৪; দ্র রাজাপ্রজা ১০। ৪২৪-৩১] প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়।

কিছুদিন আগে ‘গান্ধারীর আবেদন’-এ রবীন্দ্রনাথ ধৃতরাষ্ট্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন:

> নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
> নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
> গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
> নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।

—এই প্রবন্ধেও সেই কথা বললেন: ‘অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ না হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে।’ সেই ‘অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থা’ রাজাপ্রজা কারো পক্ষেই হিতকর নয়। তাছাড়া মানবচরিত্রের উপর পরাধীনতার অবনতিকর ফল হিসেবে ‘অসত্যাচারণ কপটতা অধীন জাতির আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ হইয়া তাহার আত্মসম্মানকে, তাহার মনুষ্যত্বকে নিশ্চিতরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে।’ সুতরাং এই অবস্থায় ‘শাসিত ও শাসনকর্তার মধ্যবর্তী শাসনশৃঙ্খলটাকে সর্বদা ঝংকার না দিয়া সেটাকে আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনরূপে ঢাকিয়া রাখিলে অধীন জাতির ভার লাঘব হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এই প্রকারের একটা আচ্ছাদনপট।....এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল একমুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে।’ তা পরাধীন জাতির আত্মমর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর, শাসকসম্প্রদায়ের পক্ষেও বাঞ্ছনীয় নয়।

লক্ষণীয়, সিডিশন আইন কতটা তীব্রতার সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে মত প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ভারতী-র প্রথম সংখ্যাতেই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে তাঁর বক্তব্য কঠোরতর ও ভাষা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল ২৮ অগ্র° ১৩০৩ [শনি 12 Dec 1896] তারিখে। তাঁর অন্নপ্রাশন হল প্রায় পনেরো মাস পরে ১৬ ফাল্গুন [রবি 27 Feb 1898]। আমরা আগেও দেখেছি, এক্ষেত্রে হিন্দু রীতিনীতির চেয়ে পারিবারিক সুবিধা-অসুবিধাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ক্যাশবহি থেকে উৎসবের সমারোহের হিসাব পাওয়া যায়। অন্নপ্রাশনের মোট ব্যয় ৫১৭।৶৯, এর মধ্যে ‘রোশনচৌকিওয়ালা’ও আছে। আচার্যের কাজ করেন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শিবধন বিদ্যার্ণব, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও

হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজে ১০ টাকা দান করেন, তত্ত্ববোধিনী-র বৈশাখ ১৮২০ শক-সংখ্যায় [পৃ ১৬] এটি 'আনুষ্ঠানিক দান' হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য, মাধুরীলতা বা রথীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশনে যা খরচ হয়েছিল এবারে ব্যয়ের পরিমাণ তার চেয়ে বেশি।

সমগ্র চৈত্র মাসটিও রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় কাটান। তাঁর পার্ক স্ট্রীট যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায় ১, ৩, ৮, ১২, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২২, ২৭ ও ২৯ চৈত্র তারিখে। জমিদারি বিভাগের মামলা নিয়ে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই ব্যস্ত। তাই উকিল ও অ্যাটর্নির বাড়ি, হাইকোর্ট প্রভৃতি জায়গায় যাওয়ারও কয়েকটি হিসাব পাওয়া যায়। ৪ চৈত্র 'রেজষ্টারি আপিশ ও হাইকোর্ট', ১২ চৈত্র 'উকিল পাড়া', ১৫ই 'পার্ক স্ট্রীট হইতে হাইকোর্ট হইয়া আসা', ১৭ই হাইকোর্ট, ১৮ই 'সরকারী কার্য্যে যোড়া গীর্জ্জা যাতায়াতের', ২২শে 'উকীলপাড়ায় মোহিনীবাবুর আফিস' যাওয়া জমিদারি বিভাগের কাজ দেখাশোনা ও পরামর্শের কারণেই। কয়েক দিন তিনি সত্যপ্রসাদকেও পার্ক স্ট্রীটে নিয়ে যান—উল্লেখ্য, সত্যপ্রসাদ কিছুকাল আগে থেকেই মাসিক ২০০ টাকা বেতনে জোড়াসাঁকো সেরেস্তার ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হয়েছেন। প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পর্কে পিতাকে অবহিত রাখতে হত, হাইকোর্ট থেকে পার্ক স্ট্রীট ও পার্ক স্ট্রীট থেকে হাইকোর্ট যাওয়া-আসা সম্ভবত সেই কারণেই।

এর মধ্যে বন্ধুসমাগমের জন্যও তিনি সময় করে নিয়েছেন—সরকারী ক্যাশবহির একটি হিসাব: 'শ্রীযুত ত্রিপুরার মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানর ব্যয় (৫ চৈত্র খাওয়ান হয়)...৯৬ ⁄৬' তারই স্মারক। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। গত বৎসর ২৭ অগ্রহায়ণ তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সংকল্প অচরিতার্থ থেকে গেলেও ত্রিপুরা রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি, বরং অনেক দিক থেকে দৃঢ় হয়েছে। বীরচন্দ্রের পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজ্যাভিষেক হয় 5 Mar 1897 [শুক্র ২৩ ফাল্গুন ১৩০৩] তারিখে। 14 Feb 1898 [৩ ফাল্গুন ১৩০৪] অমৃতবাজার পত্রিকা জানাচ্ছে, ত্রিপুরার মহারাজা কিছুকাল ধরে আগ্রা দিল্লি লক্ষ্ণৌ বেনারস এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করছেন—এই পত্রিকারই খবর, 2 Mar [বুধ ১৯ ফাল্গুন] তিনি এলাহাবাদ থেকে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন। তার পরেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর এই আপ্যায়ন একটি দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সূচনা করল। কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন: 'রবিবাবুর সঙ্গে রাধাকিশোর মাণিক্যের যুবরাজ-জীবনে কলিকাতায় পিতার দরবারে একবার মাত্র ক্ষণকালের জন্য দেখা হইয়াছিল। বিশিষ্ট ইংরাজ কর্ম্মচারীর হঠাৎ আবির্ভাবে, আলাপ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেই মুহূর্ত্তকাল দর্শনেই একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন।'[৩৫] সেই আকর্ষণ এখন বন্ধুত্বে পরিণত হল।

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময়ে উভয়ের সংযোগের একটি লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। 25 Mar [শুক্র ১২ চৈত্র] দ্বারভাঙ্গার মহারাজের সভাপতিত্বে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে জগদীশচন্দ্র একটি বক্তৃতা করেন 'on Electro-Magnetic Radiation, illustrated by experiments.' অমৃতবাজার পত্রিকা-র 28 Mar-সংখ্যায় এই বক্তৃতার একটি সুদীর্ঘ প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়। এতে দেখা যায়, বক্তৃতা-সভায় রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, আশুতোষ চৌধুরী, ফাদার লাফোঁ, ড প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন।

৭ চৈত্র [রবি 20 Mar] রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে বউবাজারে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাড়ি যান। বৈশাখ ১৩০৫ থেকে রবীন্দ্রনাথ ভারতী-র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন, এই পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহ এই পরিদর্শনের হেতু হতে পারে। পত্রিকাটির জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় [পৃ ১০৭-২৪] 'শিক্ষাপ্রণালী' নামক রামেন্দ্রসুন্দরের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়।

পুত্র রথীন্দ্রনাথের [৯] এই সময়ে উপনয়নের আয়োজন হয়। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

বলুদাদা সেই সময় ভাবছিলেন কি করে বাংলার ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখা, বোম্বাইয়ের প্রার্থনা-সমাজ ও পাঞ্জাবের আর্যসমাজ প্রভৃতির মিলন ঘটিয়ে একটি ভারতবর্ষীয় একেশ্বরবাদী সমাজ গড়ে তোলা যায়। মহর্ষিকে এই বিষয়ে জানালে তিনি পরামর্শ দেন, এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রথমে শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রণ করতে হবে। স্থির হল আমার উপনয়ন উপলক্ষ করে সেখানে সকলকে নিমন্ত্রণ করা হবে। মহর্ষির কাছ থেকে নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে বলুদাদা চলে গেলেন লাহোর বোম্বাই কাশী প্রভৃতি শহরে, একেশ্বরবাদী-সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে।

ইতিমধ্যে আমাকে উপনয়নের জন্য প্রস্তুত হতে হল। শিবধন বিদ্যার্ণব পণ্ডিতমহাশয়কে ডেকে মহর্ষি আদেশ দিলেন আমাকে উপনিষদের মন্ত্র শেখাতে। ব্রাহ্মধর্মের মন্ত্রগুলি আগাগোড়া মুখস্থ করতে হবে, যাতে নিমন্ত্রিত বিদেশী পণ্ডিতদের সামনে বিশুদ্ধ উচ্চারণে শ্লোকগুলি আবৃত্তি করতে পারি। শুনে ছাত্র ও অধ্যাপক, দুজনেরই মাথায় বজ্রাঘাত! সময় খুব কম, উঠে-পড়ে লাগতে হল বৈদিক সংস্কৃত পড়তে।

তার পর একদিন শিক্ষার শেষে দুরুদুরু বুকে যেতে হল মহর্ষির কাছে পরীক্ষা দিতে। আবৃত্তি শুনে মহর্ষি খুশি হলেন। এই কঠিন পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হলুম, কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল পারিতোষিক হিসাবে একটা মোটা দক্ষিণা পেলেন কেবল পণ্ডিতমশায়।[৩৬]

১৫ চৈত্র [সোম 28 Mar] এই পরীক্ষাকার্যটি হয়, ক্যাশবহির হিসাবে আছে: 'শ্রীযুত রথিবাবু মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম পরীক্ষা দিতে পার্ক ষ্ট্রীট যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া ১৫ চৈত্র'। উপনয়ন অনুষ্ঠানটি হয় ১০ বৈশাখ ১৩০৫ [শুক্র 22 Apr] তারিখে।

ইতিপূর্বে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা একটি পত্রে 'সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট বাঙ্‌লা' বানানোর ইচ্ছা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করেছিলেন।[৩৭] সেই স্বপ্নই এবার সত্য হল। ৩ চৈত্র [বুধ 16 Mar] তারিখের হিসাব: 'দং পুরীর বাড়ী ক্রয় জন্য কটকের উকীল পরমানন্দ বাবুর নিকট পাঠান হয়···৬০০্', রবীন্দ্রনাথের হয়ে বাড়িটি ক্রয় করেছিলেন পরমানন্দবাবুই, সেইজন্য 'আমমোক্তার নামার স্ট্যাম্প' বাবদ ১ টাকা খরচের হিসাবও রয়েছে। এর পর সরকারী তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে আরও এক হাজার টাকা পাঠানো হয় ৮ চৈত্র। কার্তিক মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন কটকে গিয়েছিলেন, তখনই হয়তো এই জমি ও বাড়ি কেনার বন্দোবস্ত করে এসেছিলেন। এর পরে কয়েক বৎসর ধরে ৫০ টাকা করে ষান্মাসিক খাজনা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই জমি ও বাড়ি রবীন্দ্রনাথ ভোগ করতে পারেন নি। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বাড়ি তৈরির দেনা শোধ করার জন্য 'পুরীর সমুদ্রতীরবর্ত্তির জমী ও বাঙ্গালা' কুমার নগেন্দ্রনাথ মল্লিককে বৈশাখ ১৩১২ [Apr 1905]-তে তিন হাজার টাকায় বিক্রি করে দিতে হয়। এ বাড়ি ও জমি নিয়ে আরও কিছু ঝামেলা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল, যথাস্থানে সে-প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

বর্তমান বৎসরে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশের পরিমাণ অত্যন্ত কম, বৎসরের প্রথম দিকে অনেকগুলি কবিতা ও মধ্যবর্তী সময়ে কয়েকটি কাব্যনাট্য তিনি রচনা করলেও সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তী কালে পত্রিকায় বা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। কেবলমাত্র ৪ শ্রাবণ ১৩০৪ তারিখে লিখিত 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি' [দ্র কল্পনা ৭। ১৫৭ 'জগদীশচন্দ্র বসু'] কবিতাটি মুদ্রিত হয় মাঘ ১৩০৪-সংখ্যা 'প্রদীপ' [প ৭১] মাসিকপত্রে। অবশ্য স্বরলিপি-সহ তাঁর বিভিন্ন সময়ে রচিত অনেকগুলি গান ভারতী ও বীণাবাদিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, এইগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা আমরা এখানে সংকলন করে দিচ্ছি:

ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৪ [২১ / ১]:

৩২ টোড়ি-কাওয়ালী। নব আনন্দে জাগো, আজি

কথা ও সুর: রবীন্দ্রনাথ; স্বরলিপি: সরলা দেবী, দ্র স্বর ২৪।

ভারতী, আষাঢ় ১৩০৪ [২১ / ৩]:

১৬৫-৬৬ মল্লার—ঢিমে তেতালা। ঝর ঝর বরিষে বারিধারা

কথা ও সুর: রবীন্দ্রনাথ; স্বরলিপি: সরলা দেবী; দ্র স্বর ১১।

ভাদ্র-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ৩৩১] 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় গানটি সম্পর্কে লেখা হয়: "স্বরলিপিতে" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান আছে। গানটি সুনির্ব্বাচিত সুমিষ্ট শব্দের সমষ্টিমাত্র;—ভাবের বিশেষত্ব, যাহা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবির নিকট আশা করা যায়,—ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব।' গান ছাপানো নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধার যৌক্তিকতা এই সমালোচনা থেকেই বোঝা যায়। অবশ্য এ-বিষয়ে কেবল সুরেশচন্দ্রকে অভিযুক্ত করা উচিত নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক 'সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত' 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' প্রকাশিত হলে [12 Jun: ৩০ জ্যৈষ্ঠ] বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় [1846-1904] জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে 3 Oct [১৮ আশ্বিন] তারিখে লেখেন: 'ঐসকল গানের কথাগুলির উপর আমার বড়ই বিরক্তি হয়, কারণ কথাগুলিতে প্রায়ই, বিশেষ রবিবাবু-কৃত কথাগুলিতে ছন্দমাত্র নাই। ঐসকল কথাতে ভাব ও কবিত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু ছন্দহীন কথা গানের নিতান্ত অনুপযোগী। রবিবাবু ভাবের খাতিরে ছন্দ এড়াইয়া পদ্য রচনা সহজ করিয়া লইয়াছেন'।[৩৮]

বীণাবাদিনী, শ্রাবণ ১৩০৪ [১ / ১]:

৪-৭ মালকোষ—কাওয়ালি। আনন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে দ্র স্বর ৪৫।

৯-১২ ললিতা গৌরী—ঝাঁপতাল। হৃদয় নন্দন বনে দ্র স্বর ২৩।

এই দুটি গান 'পারমার্থিক সঙ্গীত' পর্যায়-ভুক্ত।

১২-১৬ মিশ্র খাম্বাজ—একতালা। ওহে, সুন্দর মম গৃহে আজি

'এই গানের স্বর-বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত।' দ্র স্বর ৩২।

১৬-২২ কাফি—একতালা। মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী

'[এই] গানটির সুরও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া।' দ্র স্বর ১০। শেষোক্ত দুটি গান 'লৌকিক সঙ্গীত' পর্যায়-ভুক্ত। চারটি গানেরই স্বরলিপি সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত। আশ্বিন-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ৩৯৬] সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'মম যৌবন নিকুঞ্জে' গানটি সম্পর্কে লেখেন: 'গানটিতে সুমিষ্ট শব্দসমষ্টি ব্যতীত আর কি আছে, বলিতে পারি না। এরূপ গানের প্রচারে, কেবল "বীণাবাদিনী"র নয়, আমাদের প্রিয় কবিরও প্রতিষ্ঠাহানি হয়। "মম হৃদয় শয়ন-মাঝে শুন মধুর মুরলী বাজে মম অন্তরে থাকি থাকি" কেবল কষ্টকল্পিত চর্ব্বিতচর্ব্বণ নয়, নিতান্তই হাস্যরসের উদ্দীপক।'

বীণাবাদিনী, ভাদ্র ১৩০৪ [১। ২]:

৩৯-৪১ মিশ্র টোড়ি—ঢিমে-তেতালা। নব আনন্দে জাগো আজি

৪১-৪৭ মিশ্র কাণেড়া—একতালা। কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে দ্র স্বর ১০।

‘এই সুর রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত’। প্রথম গানটি ‘পারমার্থিক’ ও দ্বিতীয় গানটি ‘লৌকিক’ পর্যায়-ভুক্ত। এই দুটি গানের স্বরলিপিও সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত। উল্লেখ্য, প্রথম গানটির সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতী, আশ্বিন ১৩০৪ [২১ / ৬]:

৩৭৫-৭৮ শঙ্করাভরণ—তালফেরতা। বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে

কথা: রবীন্দ্রনাথ; সুর: মহারাষ্ট্রীয় প্রবন্ধ; স্বরলিপি; সরলা দেবী; দ্র স্বর ৩৬।

বীণাবাদিনী, আশ্বিন ১৩০৪ [১ / ৩]:

৮৪-৮৮ মিশ্র কালাংড়া। কেন ধরে রাখা—ও যে যাবে চলে’

সুর: রবীন্দ্রনাথ; স্বরলিপি: ইন্দিরা দেবী; দ্র স্বর ১০।

ভারতী, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৪ [২১ / ৭-৮]:

৪২৫-২৬ বেহাগ—একতালা। আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন

কথা ও সুর: রবীন্দ্রনাথ; স্বরলিপি: সরলা দেবী; দ্র স্বর ৫১।

বীণাবাদিনী, কার্তিক ১৩০৪ [১ / ৪]:

৯৮-১০১ মিশ্র—একতালা। বঁধু মিছে রাগ কোরো না কোরো না

গানটি ‘লৌকিক’ পর্যায়-ভুক্ত। ‘সুর ও কথা:—রবীন্দ্র’; ‘স্বরলিপি:—রবীন্দ্র’: দ্র স্বর ৩২।

১১৩-১৬ মিশ্র—কাওয়ালি। অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি! (মা)

গানটি ‘ভারতের গান’ পর্যায়-ভুক্ত। সুর: রবীন্দ্রনাথ; স্বরলিপি: সরলা দেবী: দ্র স্বর ৪৭।

ভারতী, পৌষ ১৩০৪ [২১ / ৯]:

৪৮৮-৯০ যোগিয়াবিভাস—একতালা। আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে

কথা ও সুর: রবীন্দ্রনাথ: স্বরলিপি; সরলা দেবী; দ্র স্বর ৫০।

বীণাবাদিনী, মাঘ ১৩০৪ [১ / ৭]:

১৮৩-৮৫ ইমনভূপালি—কাওয়ালি। এ কি এ সুন্দর শোভা দ্র স্বর ২৩।

১৮৫-৮৮ বেহাগ-ঝাঁপতাল। অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী দ্র স্বর ২৫।

১৮৮-৯১ ছায়ানট—কাওয়ালি। যদি বারণ কর তবে গাহিব না দ্র স্বর ১০।

১৯৬-২০১ মিশ্র-মূলতান—একতালা। আমার মন মানে না দ্র স্বর ১০।

স্বরলিপিকার অনুল্লেখিত, সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত।

বীণাবাদিনী, ফাল্গুন ১৩০৪ [১ / ৮]:

২২৩-২৭ ভৈরবী—রূপক। কে এসে যায় ফিরে ফিরে

সুর: রবীন্দ্রনাথ; স্বরলিপি: ইন্দিরা দেবী: দ্র স্বর ৪৭।

বীণাবাদিনী, -চৈত্র ১৩০৪ [১ / ৯]:

২৩৯-৪৩ পূর্ণষড়জ (মহিশূরী)—একতালা। (একি) লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে দ্র স্বর ৪৫।

২৪৭-৫৭ মিশ্র—একতালা। কি হল তোমার বুঝি বা সখি দ্র স্বর ২০।

দুটি গানেরই স্বরলিপি সরলা দেবী-কৃত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ‘বিরহ’ নামে নাতিদীর্ঘ যে প্রহসন রচনা করেন [১৩০৪: 1897], সেটি ‘উৎসর্গ’ করেন ‘কবিবর/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের/করকমলে’। উৎসর্গ-পত্রে তিনি লেখেন:

বন্ধুবর! আপনি আমার রহস্যগীতির পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনার করে অর্পিত হইল।

সব বিষয়েরই দুইটি দিক আছে—একটি গম্ভীর, অপরটি লঘু। বিরহেরও তাহা আছে। আপনি ও আপনার পূর্ববর্তী কবিগণ বিষাদবেদনাপ্লুত বিরহের করুণগাথা গাহিয়াছেন। আমি—‘মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী’ হইয়া বিরহের রহস্যের দিকটা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। আপনাদের বিরহ-বেদনাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

....আমার এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্যকর অংশটুকু দেখানো। তাহাতে আপনার ও আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে যৎসামান্য পরিমাণেও কৃতকার্য হইলে আমি শ্রম সফল বিবেচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত পত্রে এই গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেরূপ পত্র পাওয়া যায় নি। স্বভাবতই তাঁর পক্ষে পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচনা লেখা সম্ভব ছিল না, কিন্তু পরের বৎসর দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আষাঢ়ে’ প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ স্ব-সম্পাদিত ভারতী-র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তার সমালোচনা প্রকাশ করেন। প্রহসনটি ১৯ কার্তিক ১৩০৬ [শনি 4 Nov 1899] স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও ‘বিরহ’ অভিনীত হয়—রবীন্দ্রনাথ ২৩ বৈশাখ ১৩১২ [শনি 6 May 1905] দ্বিজেন্দ্রলালকে লিখেছেন: ‘আপনি বোধ হয় জানেন আপনার “বিরহ” সমারোহ সহকারে আমাদের বাড়িতে অভিনীত হয়েছে’।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

বর্তমান বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় ঘটনার পরিমাণ বেশি নয়। দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের পৌত্রদের মধ্যে জমিদারি বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে যে মোকদ্দমা [Suit No. 585 of 1897] গত বৎসরে আরম্ভ হয়, তা বর্তমান বৎসরেও চলেছে। এর মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ 5 Aug [২১ শ্রাবণ] তারিখে দানপত্র করে রবীন্দ্রনাথকে ভদ্রাসন বাড়ির পশ্চিম দিকে নিজস্ব বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রায় ১৪ কাঠা জমি দান করেন। বাড়ি তৈরির জন্য বিভিন্ন দফায় তিনি অনেক টাকাও মঞ্জুর করেছেন, এ আমরা পূর্বেই দেখেছি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্রী নলিনীর বিবাহের পর তাঁর স্বামী ডাঃ সুহৃৎনাথ চৌধুরীকে বিলাতে প্রেরণ করা হয় ঠাকুরপরিবারের খরচে, এ বৎসরেও তাঁর কাছে প্রতি মাসে টাকা পাঠানা হয়েছে। বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী ডাঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে অস্ত্রচিকিৎসার জন্য বিলাতে যান, তাঁকেও প্রতি মাসে টাকা ও প্রত্যাবর্তনের খরচ পাঠানো হয়। সম্ভবত তাঁর শারীরিক অবস্থা জানার জন্য রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি চিঠি বিলাতে পাঠিয়েছিলেন। সতীশচন্দ্র সুস্থ হন নি, দেশে ফেরার পর ৬ চৈত্র [শনি 19 Mar 1898] তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন হয় ১৬ ফাল্গুন [রবি 27 Feb 1898] তারিখে। অনুষ্ঠানটি সমারোহপূর্ণ হয়েছিল।

রথীন্দ্রনাথ উপনয়নের ভূমিকা-স্বরূপ মহর্ষির কাছে ব্রাহ্মধর্ম পরীক্ষা দেন ১৫ চৈত্র। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১০ বৈশাখ [শুক্র 22 Apr] আর্যসমাজের বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে তাঁর উপনয়ন হয়। এই অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন আয়োজন পূর্বেই আরম্ভ হয়েছে, এমন অনেক হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়।

এই বৎসর আশ্বিন মাসে হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ি থেকে 'পুণ্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির 'সূচনা'য় উল্লিখিত হয়েছে: '...এই পত্রখানি এক্ষণে আমরা জনসমাজে প্রকাশ করিলাম সত্য, কিন্তু ইহা বহুপূর্ব্বাবধিই অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় আমাদের ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে প্রবাহিত হইয়া গৃহকেই পরিষিক্ত রাখিয়াছিল।/ পূর্ব্বাবধি এই নামেই ইহা আমাদের গৃহে পরিচালিত হইত এবং হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া আমাদের আপনাদের মধ্যেই প্রকাশিত হইত।' পত্রিকার লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে: 'এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানবমাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতি মাসেই থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি অভাবও দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হইবে।' লেখক-লেখিকাদের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথের পরিবারের প্রাধান্য থাকলেও সখারাম গণেশ দেউস্কর, ব্যোমকেশ মুস্তফি, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি পরিবার-বহির্ভূত ব্যক্তিরাও পত্রিকাটিতে লিখেছেন। দ্বিতীয় বর্ষে রবীন্দ্রনাথও লেখক-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হন। অত্যন্ত অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৩১২ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটির অবলুপ্তি ঘটে। সরকারী ক্যাশ থেকে পত্রিকাটিকে সাহায্য করার হিসাব পাওয়া যায় ৩০ আশ্বিন [15 Oct] তারিখে: 'শ্রীমতী প্রজ্ঞা দেবী/ দং উহার পূর্ণ [পুণ্য] পত্রিকার কাগজের সাহায্য দেওয়া যায় ১০০্'।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

৩ জ্যৈষ্ঠ [রবি 16 May] মহর্ষির একাশীতিতম জন্মোৎসব পালিত হয় পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। 'প্রাতে তাঁহার পরিবারস্থ নর নারী সকলেই ব্রহ্মাপাসনার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। যথা সময়ে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মোপাসনা করিয়া একটী প্রার্থনা পাঠ করিলেন।' পাদটীকা থেকে জানা যায়, প্রার্থনাটি দ্বিজেন্দ্রনাথের জবানীতে লিখেছিলেন তাঁর পৌত্র দিনেন্দ্রনাথ। 'পরে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সকলকে...আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে তিনি উপবিষ্ট হইলে সকলে তাঁহাকে পুষ্পোপহার দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।' 'ঐ দিনে সময়ান্তরে শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব স্বরচিত...কএকটী শ্লোক মহর্ষিদেবকে উপহার দিয়াছিলেন।'[৩৯]

৩০ জ্যৈষ্ঠ [শনি 12 Jun] ভারতের পূর্বাঞ্চলে যে তীব্র ভূমিকম্প হয় তার ফলে কলকাতার অনেক পুরোনো বাড়ির সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহও দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সাপ্তাহিক ও মাসিক উপাসনা মহর্ষিভবনেই অনুষ্ঠিত হতে থাকে। মাঘোৎসবের পূর্বে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহের সংস্কার সম্পন্ন হওয়ায় উক্ত উৎসবের প্রাতঃকালীন উপাসনা সেখানে অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তিনিকেতনে সপ্তম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হল ৭ পৌষ [মঙ্গল 21 Dec] তারিখে। তত্ত্ববোধিনী-র প্রতিবেদক লিখেছেন: 'রাত্রি-প্রভাতে আমরা শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের সুমধুর ভজন গীতে প্রবুদ্ধ হইলাম।...ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল।...আমরা সমবেত হইয়া 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি' এই বন্দন গীতি গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তিভরে সমস্বরে 'দেহজ্ঞান দিব্যজ্ঞান' এই প্রার্থনা সঙ্গীত শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন উদ্বোধন ও 'স্বাভিপ্রায় ব্যাখ্যান পাঠ' করেন এবং চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উপদেশ ও হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রার্থনার পর 'সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্র বাবু অনাথ দীনদরিদ্রদিগের জন্য সমন্ত্রক ভোজ্য উৎসর্গ করিলেন। অনন্তর আমরা সকলে মিলিয়া মহর্ষিদেবের সাধনস্থান সপ্তপর্ণমূলে উপস্থিত হইলাম এবং তথায় প্রস্তরনির্ম্মিত বেদির পার্শ্বে সকলে দণ্ডায়মান হইলে খোল-করতাল-যোগে মধুর ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন হইতে লাগিল।' ত্রৈলোক্যনাথ একটি 'সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তর স্বরচিত 'ওহে শান্তিদাতা স্থান দাও শান্তিনিকেতনে' গানটি করেন।

এর পর প্রতিবেদক আশ্রমের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এখনকার পক্ষে যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক: 'ঐ সপ্তপর্ণ বেদির নিকটে একটা তোরণাকার প্রস্তরফলকে 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' খোদিত।...পরে ইতস্তত আরও দেখিলাম এক একটী স্তম্ভোপরি কোথাও বেদমন্ত্রের একাংশ, কোথাও ব্রহ্মসঙ্গীতের অল্পাংশ লিখিত। উদ্যানের অনেক স্থানে বৃক্ষমূলে সাধনবেদি এবং স্তম্ভোপরি লিখিত সাধন-সঙ্গীত। কাচময় মন্দিরের সম্মুখে একটী পুষ্করিণী আছে। তাহার মধ্যস্থলে একটা ধারাযন্ত্র মুক্তধারায় অনবরত জল উদগার করিতেছে। উহার চতুস্পার্শ্বে বসিবার নানারূপ সুশোভন মঞ্চ নানা-জাতীয় বিকশিত পুষ্পবৃক্ষ এবং স্তম্ভে স্তম্ভে হৃদয়াকর্ষক বৈরাগ্যসূচক নানারূপ সঙ্গীত। উহারই অদূরে সুদৃশ্য এক সাধনশৈল আছে। তাহার শিখরদেশে এক সুরচিত সমবৃত্ত পর্ণকুটীর, একটা ঘনচ্ছায় বংশীবট প্রকাণ্ড দুই শাখাবাহু দ্বারা আবৃত করিয়া যেন বাত বর্ষা প্রভৃতি নানারূপ উত্তাপ হইতে উহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে।'[৪০]

এর পর মেলার বিবরণ দিয়ে লেখক জনৈকা ভিখারিনীর একটি গান 'ভেবে মরি কি সম্পর্ক তোমার সনে' উদ্ধৃত করেছেন। 'এই সময়ে ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে ত্রৈলোক্য বাবু এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুত্র করুণা বাবু প্রভৃতি ভক্তেরা খোল করতাল ও একতারা যোগে সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।'

সায়ংকালীন উপাসনায় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন ও উপদেশ প্রদান করেন এবং শিবধন বিদ্যার্ণব ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি প্রার্থনা করেন। 'অনন্তর মঠাধ্যক্ষ স্বামীজী [পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ] দাঁড়াইয়া বেদমন্ত্রে একটী প্রার্থনা করিলে সুমধুর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।' 'বহ্ন্যুৎসব পর্ব্ব'তে "সর্ব্বশেষে একটা তোরণে আলোকরচিত 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই কথাটী পরিস্ফুটরূপে দেখাইয়া নির্ব্বিঘ্নে" সমাপ্ত হয়। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, এই উৎসব উপলক্ষে ১৬২৭।৬ খরচ হয়েছিল।

১১ মাঘ [রবি 23 Jan 1898] অষ্টষষ্ঠিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ অনুষ্ঠিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে অনুষ্ঠিত প্রাতঃকালীন উপাসনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শিবধন বিদ্যার্ণব বেদি গ্রহণ করেন। বন্দনা গান, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধন, দ্বিজেন্দ্রনাথের উপদেশ ও শম্ভুনাথ গড়গড়ির প্রার্থনা অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। মহর্ষিভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় শিবধন বিদ্যার্ণবের বেদমন্ত্রে শান্তিপাঠ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বেদগান হয় 'এতস্য বাঅক্ষরঃ স্য প্রশাসনে গার্গি'। সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন। বেদিগ্রহণ করেন

দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। মাঘোৎসবে রবীন্দ্রনাথ-রচিত সাতটি ব্রহ্মসংগীত পরিবেশিত হয়েছিল, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এছাড়া আরও একটি গান এই উৎসবে গাওয়া হয়—'এস হে এস, বরেণ্য, সুমহান্, সহস্র সূর্য্য বিভাস'।

বলেন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই সময়ে পাঞ্জাবের আর্যসমাজের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের একটি যোগসূত্র গড়ে ওঠে। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের [1825-83] সঙ্গে ঠাকুরপরিবারের বহু পূর্বেই যোগ স্থাপিত হয়েছিল, Dec 1873-তে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে মাঘোৎসবে উপস্থিত হন। দু'টি সমাজের মতাদর্শগত কিছু কিছু সাদৃশ্যের জন্য পরবর্তীকালেও মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল। বর্তমান বৎসরে সত্যেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে তত্ত্ববিদ্যা সমিতির একটি অধিবেশনে ক্ষিতীন্দ্রনাথ 'স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও রাজা রামমোহন রায়'- শীর্ষক যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন, সেটি 'পুণ্য' পত্রিকার পৌষ-মাঘ ১৩০৪ পৃ ১৩৬-৪৭]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। কলকাতা-স্থিত আর্যসমাজীরা আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতেও যোগ দিতে থাকেন। দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদ-সংক্রান্ত বিভিন্ন মত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সমালোচিত হচ্ছে, ১৮১৯ শকের [১৩০৪] তত্ত্ববোধিনী-র কয়েকটি সংখ্যায় তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই অবস্থায় মহর্ষি দুটি সম্প্রদায়কে একত্রিত করার পরিকল্পনা করলেন পৌত্র রথীন্দ্রনাথের উপনয়নকে উপলক্ষ করে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'মহর্ষির কাছ থেকে নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে বলুদাদা চলে গেলেন লাহোর বোম্বাই কাশী প্রভৃতি শহরে, একেশ্বরবাদী-সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে।'[৪১] উপনয়নটি হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১০ বৈশাখ তারিখে।

স্বামী বিবেকানন্দের কার্যধারা সম্পর্কে 'নিরাশা' সরলা দেবী 'প্রত্যাহার' করে নিয়েছিলেন, আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ-কথা বলেছি। বাঙালি নারীর মধ্যে এইরূপ অকপট ভাষণ ও তেজস্বিতা স্বামীজীকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করেছিল। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তিনি কিছু এই ধরনের নারীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, কিন্তু বাংলা দেশে তা অভাবনীয় বলেই মনে হয়েছে। তাই সরলা দেবীর পত্রের উত্তরে স্বামীজী তাঁকে 24 Apr [শনি ১২ বৈশাখ] তারিখে লেখেন: 'পাশ্চাত্ত্যদেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব। যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী বিদূষী বেদান্তজ্ঞা কেউ এই সময়ে ইংলণ্ডে যান, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক বৎসরে অন্ততঃ দশ হাজার নরনারী ভারতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। এক রমাবাঈ অস্মদ্দেশ হইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষা, বা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান বা শিল্পাদিবোধ অল্পই ছিল, তথাপি তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। যদি আপনার ন্যায় কেউ যান তো ইংলণ্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম্ম প্রচার করিলে আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এক মহান্ তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্ত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে।...আমি দীন ভিক্ষুক পরিব্রাজক, আমি কি করিতে পারি? আমি একা অসহায়। আপনাদের ধনবল, বুদ্ধিবল, বিদ্যাবল—আপনারা এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন কি?'[৪২]

সরলা দেবী এই চিঠির কি উত্তর দিয়েছিলেন জানা নেই, কিন্তু উত্তরভারতে বক্তৃতা-সফর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রভৃতি গুরুতর কাজের চাপে স্বামীজী বেশ কিছুকাল তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে তুলতে পারেন নি। এই যোগাযোগ ঘটল আরও কিছুকাল পরে স্বামীজীর বিদেশিনী ভক্ত মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্ল বা ভগিনী নিবেদিতার [1867-1911] ভারত আগমনের পর। মিস্ নোব্ল কলকাতায়

পদার্পণ করেন 28 Jan 1898 [শুক্র ১৬ মাঘ] তারিখে। 11 Mar [শুক্র ২৮ ফাল্গুন] স্টার থিয়েটারে রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সভায় স্বামীজী তাঁকে দেশীয় সমাজের কাছে পরিচিত করে দেন। ইংলণ্ডে ভারতের অধ্যাত্ম ভাবনার বিস্তার সম্পর্কে তিনি যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন, তাতেই তিনি শ্রোতাদের মনোহরণ করেন। এর পর স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা দেন 25 Mar [শুক্র ১২ চৈত্র]—তাঁর নূতন নামকরণ হয় 'নিবেদিতা', ভগিনী নিবেদিতা নামেই অতঃপর তিনি পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ পরে তাঁকে 'লোকমাতা' আখ্যায় ভূষিত করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

বর্তমান বৎসরটি রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলা তথা ভারতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। 23 Sep 1896 [৮ আশ্বিন ১৩০৩] বোম্বাই গবর্মেন্ট সেই প্রদেশে প্লেগের আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করে। এর পর এক বৎসরের ভিতর বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক প্লেগের আক্রমণে মারা যায়। [৪৩] কিন্তু ব্রিটিশ শাসনে দুর্ভিক্ষে বা মহামারীতে এই পরিমাণ বা এরও বেশি লোকের মৃত্যু কিছু নূতন ঘটনা নয়, যেটি অভিনব সেটি হল প্লেগ-দমনের নামে ইংরেজ সৈন্যদের বর্বর অত্যাচার—যা বিশেষ করে পুনায় দেশীয় মানুষদের সম্ভ্রমবোধকে দারুণভাবে আহত করেছিল। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল। বালগঙ্গাধর টিলক তাঁর 'মারাঠা' ও 'কেশরী' পত্রিকায় সৈন্যদের অত্যাচারের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এর মধ্যে 22 Jun [মঙ্গল ৯ আষাঢ়] মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে খানাপিনার আসর থেকে গাড়িতে ফিরে আসার সময়ে পুনায় প্লেগ কমিটির প্রেসিডেন্ট W. C. Rand আততায়ীর হাতে নিহত হন, তাঁর সঙ্গে ভ্রমক্রমে নিহত হন Lt. Ayerst নামক একজন ইংরেজ কর্মচারী। আততায়ীর তাৎক্ষণিক অনুসন্ধানে ব্যর্থ প্রতিশোধপরায়ণ বোম্বাই গবর্মেন্ট রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে কেশরী-সম্পাদক টিলককে গ্রেপ্তার করে 27 Jul [১২ শ্রাবণ] এবং পরদিন Regulation XXV of 1827-নামক এক পুরোনো আইন বলে রাজানুগত্যের অভাবের অপরাধে বলবন্তরাও নাটু ও তাঁর ভাই হরি পন্থ রামচন্দ্র নাটু ওরফে তাতিয়া সাহেবকে গ্রেপ্তার ক'রে বিনা বিচারে আমেদাবাদের এক জেলে অন্তরীণ রাখে। এছাড়া কেশরী-র মুদ্রাকর ও আর্যভূষণ প্রেসের মালিক কেশব মহাদেও বাল এবং পুনা বৈভব পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর বিশ্বনাথ কেলকার-কেও গ্রেপ্তার করা হয়। আমরা আগেই বলেছি, বিচারে টিলকের আঠারো মাস সশ্রম কারাদণ্ড হওয়ার পর প্রিভি কাউন্সিলে তাঁর আপীল অগ্রাহ্য হয়। মনীষী ম্যাক্সমূলারের চেষ্টায় প্রায় এক বৎসর কারাবাসের পর 6 Sep 1898 [২২ ভাদ্র ১৩০৫] টিলক মুক্তিলাভ করেন। টিলকের মামলার জন্য রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের ভূমিকার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এর মধ্যেই র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টের হত্যাকারী দামোদর চাপেকার গ্রেপ্তার হন। তিনি স্বীকার করেন ভিক্টোরিয়ার মূর্তির ক্ষতিসাধন করা বা য়ুনিভার্সিটির প্যাণ্ডেলে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতিও তাঁরই কাজ। পুনার সেশন্‌স্ জজ Mr. Crowe-র বিচারে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, 18 Apr 1898 [৬ বৈশাখ ১৩০৫] তারিখে

তাঁর ফাঁসি হয়। তাঁর ভাই বালকৃষ্ণ চাপেকরও একই দণ্ড লাভ করেন। যে দু'জন বিশ্বাসঘাতক এঁদের ধরিয়ে দিয়েছিল তাদের হত্যা করেন এঁদের সর্বকনিষ্ঠ ভাই বাসুদেও চাপেকর। তাঁকেও ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হয়।

দেশীয়দের মনোভাব বুঝতে অক্ষম ইংরেজ গবর্মেণ্ট স্বভাবতই এইসব ঘটনার পিছনে বিদ্রোহাত্মক চক্রান্ত লক্ষ্য করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় তারা একদিকে যেমন বিশেষত বোম্বাই প্রদেশে দমনমূলক পীড়ন আরম্ভ করেছে, অপরদিকে তেমনই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য সুপ্রীম লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে Mr. Chalmers-এর দ্বারা Sedition Bill আনয়ন করে। অবস্থা এমনই গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যে, Dec 1897-এ অমরাবতীতে কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশনের ভবিষ্যৎ সংশয়ান্বিত হয়ে পড়ে। জনসাধারণ ও দেশীয় সংবাদপত্রগুলির প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সিডিশন বিল আইনে পরিণত হয় 18 Feb 1898 [শুক্র ৭ ফাল্গুন] তারিখে। এই আইনের প্রতিবাদে বাংলা 'সহচর' পত্রিকা নিজের অবলুপ্তি ঘোষণা করে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের নবম অধিবেশন হয় রাজশাহী জেলার অন্তর্গত নাটোরে—মফস্বল শহরে অনুষ্ঠিত এইটি তৃতীয় অধিবেশন—এর আগের দু'টি অধিবেশন হয়েছিল বহরমপুর ও কৃষ্ণনগরে। সিভিল সার্ভিস থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাস-কয়েক আগে কলকাতায় ফিরে এসেছেন, তাঁকেই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়—সম্মেলনটি হয় 10-12 Jun 1897 [বৃহ-শনি ২৮-৩০ জ্যৈষ্ঠ] তিন দিনে। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—রাজশাহী জেলার বহু ছোট-বড়ো জমিদার এই সমিতির সদস্য ছিলেন—ফলে আদর-আপ্যায়নের কোনো অভাব ছিল না। জগদিন্দ্রনাথের নির্বন্ধাতিশয্যে ঠাকুর-পরিবারের অনেকেই এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বাংলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারাও বিপুল হারে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

10 Jun [বৃহ ২৮ জ্যৈষ্ঠ] বিকেল তিনটায় প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণের পর যথারীতি সত্যেন্দ্রনাথকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজিতে দেওয়া অভিভাষণের পরে রবীন্দ্রনাথ তা বাংলায় অনুবাদ করে শোনান। বিষয়-নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয় ও সন্ধ্যাবেলায় কমিটি পরবর্তী অধিবেশনের কার্যসূচী প্রস্তুত করে।

11 Jun [শুক্র ২৯ জ্যৈষ্ঠ] বিকেল তিনটায় দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা [13 Jun] লেখে: 'All speeches were made in Bengalee, and very much appreciated, especially by the mass.'

12 Jun [শনি ৩০ জ্যৈষ্ঠ] বিকেলে যথাসময়ে তৃতীয় অথবা শেষ অধিবেশন বসে। প্রস্তাবাদি আলোচনা শেষ হওয়ার মুখে বিকেল পাঁচটায় এক ভয়াবহ ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। পত্রিকার বিবরণে প্রকাশ, সেই বিপর্যয়ের মধ্যেও প্রতিনিধিরা আশ্চর্য সংযম ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। আধ ঘণ্টা পরে পুনরায় সভা বসে। তাঁকে সভাপতি নির্বাচন করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিনিধিদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে রাজা যোগীন্দ্রনাথ রায় ও প্রতিনিধিদের পক্ষে তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাবার পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পরে সন্নিকটস্থ দিঘাপতিয়ার রাজপ্রাসাদে প্রতিনিধিদের এক সান্ধ্যভোজে আপ্যায়ন করার জন্য বিরাট আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু ভূমিকম্পে প্রাসাদটি বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য এই আয়োজন পরিত্যক্ত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা এ-সম্পর্কে 16 Jun-এর সম্পাদকীয়তে লেখে; 'If the

earthquake had taken place two hours' later, the pick of the Bengali nation would have disappeared from the face of the earth, at Dighapatia in a few minutes.'

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

বিখ্যাত সংগীতযন্ত্র-বিক্রেতা ডোয়ার্কিন অ্যাণ্ড সন্-এর উদ্যোগে ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় সংগীত-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'বীণাবাদিনী' প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩০৪-এ। এই সংখ্যার ৩৬ পৃষ্ঠায় 'কলিকাতা সঙ্গীত-সমাজ' শিরোনামায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ:

> উৎসাহদাতার অভাবে হিন্দু-সঙ্গীতের ক্রমশই অবনতি ও লোপাপত্তি হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানার্থ সঙ্গীত-সমাজ নামক একটি সভা যাহাতে আমাদের মধ্যে স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা ও উদ্যোগ চলিতেছে। হিন্দু সঙ্গীতের সংরক্ষণ, ও উন্নতি সাধনই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সমাজের অধীনে, একটি সঙ্গীতশালা থাকিবে। সঙ্গীত নিপুণ সঙ্গীতানুরাগী সৌখীন ব্যক্তিগণ প্রতিদিন কিম্বা আপাততঃ সপ্তাহের মধ্যে একদিন সায়াহ্নে, তথায় একত্র সমবেত হইয়া গান বাদ্য এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে আলাপ ও আলোচনা করিবেন। সভার বেতন-ভুক্ একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ও বাদক সঙ্গীত-শালায় নিয়ত উপস্থিত থাকিবেন। উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে যিনি যাহা পারেন, কেহ বা কোন যন্ত্র বাজাইবেন, কেহ বা গান গাহিবেন, কেহ বা সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ পাঠ করিবেন; মধ্যে মধ্যে, কোন পেষাদার গুণীজনকে আহ্বান করিয়া তাঁহার গান-বাদ্য শুনা যাইবে। কখন কখন উৎকৃষ্ট যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া সভ্যগণের চিত্ত-বিনোদন করা হইবে। বর্ষে বর্ষে, সভার সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন, কিম্বা সরস্বতী পূজার দিন, দেশ-বিদেশ হইতে সঙ্গীত গুণীগণকে আহ্বান করিয়া সঙ্গীত-উৎসবের অনুষ্ঠান ও তাঁহাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইবে। ২ টাকা মাসিক চাঁদা ও দুই টাকা প্রবেশ-মুদ্রা প্রদান করিলে এই সভার সভ্য হওয়া যাইবে। আপাততঃ দেড় শত সভ্য জুটিলেই সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে।'

'কলিকাতা সঙ্গীত সমাজ' নামের পরিবর্তে এই সভার নাম রাখা হয় 'ভারত সংগীত সমাজ।' এ-প্রসঙ্গে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'-তে লেখা হয়েছে:

> পুণায় সত্যেন্দ্রনাথের নিকট অবস্থান কালে, তথাকার 'গায়ন-সমাজ' দেখিয়া কলিকাতায় তদনুরূপ একটি সভাস্থাপন করিতে জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা হয়। কলিকাতায় ফিরিয়া, তিনি 'গায়ন-সমাজের'র আদর্শে এক সভা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইলেন।...সভাস্থাপনকল্পে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইল। চাঁদার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ধনীদের দ্বারস্থ হইলেন। কেহ সহস্র, কেহ পঞ্চশত, কেহ বা দুইশত রজতমুদ্রা দান করিবেন বলিয়া স্বাক্ষর করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজ পরিবার হইতেই দ্বিসহস্রেরও অধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। সভা স্থাপিত হইল, নাম হইল—'ভারত সঙ্গীত সমাজ'।

দান সংগ্রহ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই 'পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'যখন আমি সঙ্গীতসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করি, সেখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চ্চা হইবে শুনিয়া তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] ১০০০ৎ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিতে আমাকে অনুমতি করেন।'[৪৫] রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৫০০ৎ টাকা, ত্রিপুরার বড়োঠাকুর কুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ একটি উৎকৃষ্ট বেহালা ও গগনেন্দ্রনাথ অনেক আসবাবপত্র সংগীতসমাজকে উপহার দেন, অমৃতবাজার পত্রিকায় এরূপ অনেক সংবাদ দেখা যায়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাজের সদস্য হন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন: 'পাইকপাড়ার সতীশচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র সিংহ, শ্যামবাজারের বিপিনবিহারী মিত্র এবং প্রমথনাথ মিত্র ("বদীবাবু") ও চন্দ্রনাথ মিত্র ("চুনীবাবু"), সরলচাঁদ মিত্র, পাতুরিয়াঘাটার রমানাথ ঘোষ, দুনিয়ালাল শীল, ঝামাপুকুরের নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় "সঙ্গীত সমাজে" সমবেত হইতেন। উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, নগেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি উৎসবের দিন আসিয়া উপস্থিত হইতেন। মহারাজা গিরিজানাথ রায়, মুক্তাগাছার ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি সময় সময় তথায় যাইতেন।'[৪৬]

১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের স্ট্রীটে অবস্থিত কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িটি এক বৎসরের জন্য লীজ নিয়ে সেখানে দ্বারভাঙার মহারাজার সভাপতিত্বে ভারত সংগীত সমাজের উদ্বোধন হয় 27 Jan 1898 [বৃহ ১৫ মাঘ ১৩০৪] তারিখে সরস্বতী পূজার বিসর্জনের দিনে। *The Amrita Bazar Patrika* [28 Jan] এই অনুষ্ঠানের বিবরণে লেখে:

> Mr. Justice Gurudas Banerji proposed the Maharaja to the chair with an excellent speech, and the proposal was seconded by Maharaja Jotindra Mohan Tagore. The Secretary of the Samaj, Babu Jotirindra Nath Tagore, gave a short history of the foundation of the Society, and then the Maharaja of Durbhanga declared the Samaj open with a neat little speech. The Hon'ble A. P. Ananda Charlu proposed a vote of thanks to the chair.

—অতঃপর বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীরা কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন। পত্রিকাটির 3 Feb-এর খবর থেকে জানা যায়, সমাজ প্রত্যহ সন্ধ্যা ৫টা থেকে ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

এরপর সংগীত-সমাজে নিয়মিত গান বা অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে। ২ ফাল্গুন [রবি 13 Feb] দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বরচিত হাসির গান গেয়ে শোনান। ৯ ফাল্গুনের [রবি 20 Feb] অনুষ্ঠানে কয়েকজন সদস্য কবিতা আবৃত্তি করেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ২৩ ফাল্গুন [রবি 7 Mar] মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের কাছ থেকে নিয়ে আসা এডিসনের মাইকো-ফনোগ্রাফ যন্ত্র সভ্যদের বাজিয়ে শোনানো হয়। ১৪ চৈত্র [রবি 27 Mar] বড়িশা নাট্যসম্প্রদায় 'মাথুর-লীলা' ও ২৮ চৈত্র [রবি 10 Apr] বসুপাড়া আদি বান্ধব নাট্যসম্প্রদায় 'আবুহোসেন' অভিনয় করে। তথ্যগুলি অমৃতবাজার পত্রিকা-র বিভিন্ন সংখ্যা থেকে গৃহীত। সদস্যেরা এই-সব অনুষ্ঠানের দিনে চাঁদা তুলে খাওয়াদাওয়া করতেন। আমরা পূর্বেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন: 'অভিনয়ের জন্য নাটক-প্রহসনাদি নির্ব্বাচন যে সমিতি দ্বারা হইত, তাহার সদস্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। সে সমিতির সম্পাদক বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক।'[৪৭] প্রথম দিকে অন্যান্য সম্প্রদায়কে দিয়ে অভিনয় করানো হত, পরে সমাজের সদস্যেরাই নাট্যাভিনয়ে ব্রতী হন।

উল্লেখপঞ্জী

১ ঘরোয়া। ১২০-২১

১ক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত 'অতুলপ্রসাদ সেন' [1971]। ২২০

২ পিতৃস্মৃতি। ২৪-২৫

৩ 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', কালান্তর ২৪। ৪৩৯

৪ ঘরোয়া। ৭৭

৫ *Bengal Under the Lieutenant-Governors,* Vol. II [1901], p. 1001

৬ ঘরোয়া। ৮১

৭ পিতৃস্মৃতি। ২৪

৮ ঘরোয়া। ১২৯

৯ *Bengal Under the Lieutanant-Governors,* Vol. II, p. 1004

১০ পিতৃস্মৃতি। ২২

১০ক অতুলপ্রসাদ সেন। ২১৯

১০খ ঐ। ২৭৩

১১ পিতৃস্মৃতি। ২১

১২ ঘরোয়া। ১২৩

১৩ পিতৃস্মৃতি। ২৩

১৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ৯, পত্র ১

১৫ দ্র চিঠিপত্র ৬। ১৫৬

১৬ *The Life and Works of Sir Jagadis C. Bose,* [1920], p. 222—চিঠিপত্র ৬। ১৫৫-তে উদ্ধৃত

১৭ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩। ৪১২

১৭ক অতুলপ্রসাদ সেন। ২২০

১৮ ঘরোয়া। ১২০

১৯ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, তথ্যপঞ্জী। ২২-২৩, পাদটীকা ১৫

২০ ঐ। ৩০

২১ শ্রুতি ও স্মৃতি [অপ্রকাশিত]

২২ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ৯, পত্র ২

২৩ ঘরোয়া। ২৪-২৫

২৪ সাহিত্য, কার্তিক। ৪৬৬

২৫ 'বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক', বি. ভা. প. শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩। ৪৮-৪৯

২৬ পিতৃস্মৃতি। ৪৫

২৭ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: রবি-রশ্মি ২ [১৩৮৮]। ৪৭৯-৮০

২৮ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৫৯

২৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি

৩০ তত্ত্ব°, মাঘ। ১৫২

৩১ রবি-রশ্মি ২। ৪৭৩-৭৫

৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭১

৩৩ রবি-রশ্মি ২। ৪৭৬

৩৪ ঐ ২। ৪৭৪

৩৫ দেশীয় রাজ্য। ২১৩

৩৬ পিতৃস্মৃতি। ৬০

৩৭ দ্র চিঠিপত্র ১। ৩৫, পত্র ১৫

৩৮ গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০। ২৮

৩৯ তত্ত্ব°, আষাঢ়। ৩৩-৩৫

৪০ ঐ, মাঘ। ১৫২

৪১ পিতৃস্মৃতি। ৬০

৪২ পত্রাবলী, শেষার্ধ [১৩৮৪]। ৫৩৬

৪৩ দ্র ভারতী, বৈশাখ ১৩০৬। ৫৩

৪৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি [১৩৮৯]। ৮৫

৪৫ প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮। ৩৮৮

৪৬ 'সঙ্গীত সমাজ': বসুমতী, বৈশাখ ১৩৬০। ১২-১৩

৪৭ ঐ। ৯

---

* গায়ত্রী মজুমদার: রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল [১৩৮৬]। ১৫-১৭; পাঠে কিছু ভুল আছে, মূল পত্রের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা সংশোধন করে দিয়েছি।

* এই পৃষ্ঠার সম্মুখে আর্ট পেপারে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর-সহ তাঁর ফটোগ্রাফ মুদ্রিত হয়।

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে আখ্যাপত্র ও লেখকের নাম-হীন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামক তীব্র রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচনাপূর্ণ ৮৪ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ অন্য কয়েকটি গ্রন্থের সঙ্গে একত্রে বাঁধানো অবস্থায় আছে। এই গ্রন্থে লেখক রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্যিক কলহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন—লেখকের মতে, প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতাই কলহের কারণ। এই আলোচনায় লেখক 'চৈতালি' গ্রন্থটিকে সর্বদা 'বৈতালী' নামে অভিহিত করেছেন। বর্তমান উদ্ধৃতিটি এই গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠার অন্তর্গত।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

১৩০৫ [1898-99] ১৮২০ শক॥ রবীন্দ্রজীবনের অষ্টাত্রিংশ বৎসর

১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ [বুধ 13 Apr] মহর্ষিভবনে প্রাতে ব্রাহ্মমুহূর্তে নববর্ষের উপাসনা হয়, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন উদ্বোধন ও আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন। 'কবিকেশরী রবীন্দ্রনাথ...উপাসনান্তে একটী ভাগবত-সংগীত গান করিয়া সমুপস্থিত সভাস্থ সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।'*

ভারতীয় সংগীত-সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের কথা আমরা আগেই বলেছি। ৫ বৈশাখ [রবি 17 Apr] রাত্রি আটটার সময়ে উক্ত সমাজের যে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় তার বিষয়ই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অমৃতবাজার পত্রিকা পূর্বেই অনুষ্ঠানটির বিজ্ঞপ্তি দিয়ে 20 Apr বিবরণে লেখে:

Babu Ardhendu Sekhar Mustafi and Babu Akshoy Kumar Mozumdar delighted the audience at the Samaj Hall by their successful recitations of the two comic pieces namely "Nutan Avatar" and "Bina Payshay Bhoj" from the works of the well known poet Babu Robindranath Tagore. The performance elicited roars of laughter.

অক্ষয়কুমার মজুমদার ইতিপূর্বেই খামখেয়ালী সভা-য় 'বিনি পয়সার ভোজ' আবৃত্তি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গত বৎসরের শেষে রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন উপলক্ষে ঠাকুরপরিবারে কিছু ব্যস্ততা আমরা লক্ষ্য করেছি। বর্তমান বৎসরে শান্তিনিকেতনে উপনয়ন অনুষ্ঠানটি হল ১০ বৈশাখ [শুক্র 22 Apr] তারিখে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ৮ বৈশাখ পর্যন্ত কলকাতাতেই ছিলেন। ১, ৩, ৪ ও ৮ তারিখে তাঁকে পার্ক স্ট্রীট যাতায়াত করতে দেখা যায়, ৬ বৈশাখ তিনি এসেছেন 'যোড়াগীর্জ্জা হইতে যোড়াসাঁকো'। ৮ বা ৯ বৈশাখ তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় [পৃ ২৮-৩১] সম্পাদককে লিখিত জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর একটি 'পত্র' প্রকাশিত হয়, এতে বিবিধ মন্তব্য-সহ রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন-অনুষ্ঠানটির একটি বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে:

আমরা গত ১০ বৈশাখে শ্রীযুক্ত বাবু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়ন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম।...এবার আমাদের সঙ্গে কএকটী আর্য্য-সমাজের সভ্য নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা পাশ্চাত্ত্য ব্রাহ্মণ।...আমরা যথা সময়ে সমবেত হইয়া ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। আর্য্য ব্রাহ্মণেরা উহার একদেশে আসন গ্রহণ করিলেন।...পরে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্র বাবু বেদি-গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর ঐ কএকটী আর্য্য ব্রাহ্মণ যথাবিধি সদস্যরূপে বৃত হইলে রথীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল এবং পরিধান গৈরিক বস্ত্র। এই দেবকুমারকল্প বিপ্রকুমার ব্রহ্মচারীবেশে উপবিষ্ট হইলে রবীন্দ্র বাবু মধুর কণ্ঠে বেদগান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত বেদগানে সকলের মন পুলকিত হইল। পরে আচার্য্য 'আগন্ত্রা সমগন্মহি' এই বেদমন্ত্রে প্রকৃত কর্ম্ম আরব্ধ করিয়া দিলেন।...

পরে ব্রহ্মচারী রথীন্দ্রনাথ বিল্বদণ্ড ধারণ ও ভিক্ষা ভাজন গ্রহণ পূর্ব্বক 'ভবন্ ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত আচার্য্যের হস্তে সম্যক সমর্পণ পূর্ব্বক এক কম্বলাসনে বাক্‌যত হইয়া দিবসের অবশেষ গায়ত্রীচিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার দিনত্রয় অতীত হইয়া যায়। এই তিন দিন তিনি নিয়মিত রূপে আচার্য্যের নিকট বেদাধ্যয়ন ও গায়ত্রীমন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনাদি শিক্ষা করিতেন। ইহার পর সমাবর্ত্তন। এই বারে অধীতবেদ ব্রহ্মচারী গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। আচার্য্য কহিলেন 'অধীতং বেদমধীহি' অধীত বেদ অধ্যয়ন কর। শিক্ষিত ব্রহ্মচারী কোমল কণ্ঠে বর্ণস্বরাদি যথাযথ রক্ষা করিয়া বেদগান করিতে লাগিলেন। সে সময়ে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অনেকেরই সেই প্রাচীন কালের কথা মনে উদিত হইল।...পরে ব্রহ্মচারী বেণুদণ্ড গ্রহণ এবং পদে পাদুকা ধারণ করিয়া মঙ্গলাচারের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইহাই সমাবর্ত্তন।[১]

সম্ভবত ১৩ বৈশাখ [সোম 25 Apr] সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি হয়েছিল। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে আয়োজনের অভাব ছিল না, রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'শান্তিনিকেতনে ধুম পড়ে গেল। নানা দেশ থেকে বিখ্যাত পণ্ডিতেরা সমবেত হলেন। তাঁদের আতিথ্যের জন্য কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া হল প্রচুর পরিমাণে মাখন মিছরি পেস্তা বাদাম, আরো কত কি!'[২] ক্যাশবহির হিসাব থেকে জানা যায়, উপনয়নের জন্য ১৩৪৫ টাকা ৪ আনা ৯ পাই খরচ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শান্তিনিকেতনে বেশিদিন থাকতে পারলেন না। ১৪ বৈশাখেই তাঁকে পার্ক স্ট্রীটে যেতে ও 'শ্রীমতী ছোটবধু ঠাকুরাণীকে টেলিগ্রাম' করতে দেখা যায়। 'কবিকেশরী'-লেখক লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকিয়া নিশ্চিন্তমনে তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনকরতঃ পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তথায় সংবাদ পঁহুছিল, কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে।'[৩] বোম্বাই অঞ্চলে প্লেগের ভয়াবহ আক্রমণের বিবরণে গত এক বছরের সংবাদপত্র পূর্ণ ছিল—কলকাতায় যাতে তার সংক্রমণ ঘটতে না পারে, তার জন্য বাংলার বিভিন্ন স্থানে বহিরাগতদের পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১২-১৩ বৈশাখের [24-25 Apr] সংবাদপত্রে যখন প্লেগাক্রান্ত দু'একটি রোগীর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হল, তখন শহরবাসীর মধ্যে এক ভয়ানক আতঙ্ক দেখা দিল। উক্ত লেখক পলায়নপর নরনারীর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন: '১৫, ১৬ই, ১৭ই বৈশাখ সহরে জনস্রোতের বিরাম ছিল না। সহরের গাড়ী পাল্কী ক্রমশঃ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল—অবশেষে তাহাও অপ্রাপ্য হইয়া উঠিল। ১৷৹ আনা ॥ ০ আনা স্থলে ৬ ৮ টাকাতে আর ভাড়াটিয়া গাড়ী পাল্কী পাওয়া গেল না। যখন গাড়ী পাল্কী পাওয়া একেবারে দুর্লভ হইয়া পড়িল, তখন এই দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া কত ভদ্রপরিবারের অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী কলিকাতা সহরের রাজপথে বহিষ্কৃত হইয়া পদব্রজে চলিয়া গিয়াছে—কে তাহার গণনা করিয়াছে।'[৪] 30 Apr [শনি ১৮ বৈশাখ] তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা এই ঘটনাকে 'The exodus of the East Bengal people and the Marwaris' বলে বর্ণনা করেছে। প্লেগের টীকা দেওয়া নিয়ে 3 May কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা বাধে—প্রধানত য়ুরোপীয়েরা ছিল এই দাঙ্গার লক্ষ্য।

সুতরাং প্লেগের খবর পেয়েই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শান্তিনিকেতনে বসে থাকা সম্ভব হল না—'তিনি পুত্র কন্যাদিগকে বোলপুরে রাখিয়া ত্বরায় প্লেগ-সংক্রামিত সহরে উপস্থিত হইলেন।...রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া দেবতুল্য পিতার শরীর-রক্ষার্থে প্রথমে মনোনিবেশ করিলেন।'[৫] ১৪ ও ১৫ বৈশাখে পার্ক স্ট্রীটে যাওয়া, ১৪ তারিখে 'শ্রীমতী ছোটবধু ঠাকুরাণীকে টেলিগ্রাম করার ব্যয়' ও ১৫ তারিখে 'শ্রীমতী ছোটবধু ঠাকুরাণীকে পত্র লেখার টীকেট' [এই পত্রটি পাওয়া যায় নি] প্রভৃতি হিসাব উক্ত বিবরণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। উদ্বিগ্ন পত্নীকে কুশল-জ্ঞাপক টেলিগ্রাম ও পত্রের হিসাবটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ক্যাশবহির অন্তর্গত। 'দোতালা, তেতালা এবং নীচে প্লেগ নিবারণের জন্য condis fluid ছড়ানর ঠিকে মুজুরী বৈশাখ মাসের ১৫ দিন হইতে

[জ্যৈষ্ঠ মাসের] ১৫ রোজ পর্য্যন্ত ১ মাসের ৭৲' খরচের সরকারী হিসাব থেকে পারিবারিক সুরক্ষার আয়োজনটিও বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ ২৬ বৈশাখ পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন—এর মধ্যে তাঁর ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৬ তারিখে পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়।

কিন্তু এই যাত্রায় কলকাতায় প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করে নি, ফলে উদ্বেগ-আশঙ্কা অল্প দিনেই কেটে গিয়েছিল—এমন কি, ২৫ বৈশাখ [শনি 7 May] রবীন্দ্রনাথের অষ্টাত্রিংশ জন্মদিনে সত্যপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র দিবপ্রকাশের 'শুভ অন্নপ্রাসন' মোটামুটি সমারোহ-সহকারে অনুষ্ঠিত হয়—রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে ৪ টাকা যৌতুক দেন।

এরপর তিনি ২৭ বৈশাখ [সোম 9 May] শান্তিনিকেতনে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে মিলিত হন। কয়েকদিন সেখানে থেকে ৬ জ্যৈষ্ঠের [বৃহ 19 May] আগে তিনি সপরিবারে কলকাতায় ফিরে আসেন। এই দিন তাঁর পার্ক স্ট্রীটে যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়।

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ ১৩০৫-সংখ্যা থেকে ভারতী-র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। প্রধানত তিনি ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এই দুই 'কবি-বিহঙ্গ'-এর 'নীড়' রচনার জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথকে নামমাত্র সম্পাদক করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শ্রাবণ ১২৮৪-তে ভারতী প্রকাশ করেন। বিলাত-প্রত্যাবর্তনান্তে কার্যত রবীন্দ্রনাথই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় আত্মহননের পর ভারতী বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলে স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে পত্রিকাটির অপমৃত্যু রোধ করেন। চৈত্র ১৩০১-সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনার পর 'শরীর অসুস্থ হওয়াতে' তিনি কার্যভার ত্যাগ করলে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী সম্পাদনার দায়িত্ব নেন, কিন্তু প্রধানত সংকোচের জন্য মহীশূর-প্রবাসিনী কনিষ্ঠা ভগিনী সরলা দেবীকেও অংশভাগিনী করেছেন। এই সময়ে হিরণ্ময়ী সম্পাদক হবার জন্য তাঁর 'রবিমামা'কেও পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন সাধনা-র সম্পাদক এবং সাধনা-র অবলুপ্তি ঘটলে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন—সুতরাং নূতন দায়িত্ব নিতে তিনি স্বভাবতই রাজি হন নি। কিন্তু হিরণ্ময়ী হাল ছাড়েন নি, তিনি লিখেছেন: 'তিন বৎসর কাল আমরা দুই ভগিনী ভারতীর সম্পাদক ছিলাম। আমি কিন্তু ইহার মধ্যে একটি দিনও মাতুল মহাশয়কে ভারতী গ্রহণের জন্য ভজাইতে ছাড়ি নাই। ক্রমাগত জল ঢালিলে পাথরও ক্ষয় হয় মামা মহাশয়েরও আমার প্রতি করুণার উদ্রেক হইল। তিনি ভারতীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে অর্থাৎ লিখিতে ও লেখা নির্ব্বাচন করিতে সম্মত হইলেন। ম্যানেজারী করা, প্রুফ দেখা, লেখা সংগ্রহ করিবার ভার আমার উপর রহিল। এইরূপে পুনরায় ভারতীকে যোগ্য হস্তে সমর্পণ করিয়া আমার সে কি আনন্দ! তবু মামাটির স্বভাব আমার জানা ছিল—বেশীদিন যে এ আনন্দ ভোগ করা আমার ভাগ্যে ঘটিবে না মনে মনে তাহা বুঝিতাম'।[৬] হিরণ্ময়ী দেবীর আশঙ্কা সত্য ছিল, এক বৎসর পরেই 'ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া' রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকের পদ থেকে 'বিদায় গ্রহণ' করেছেন।

তবে রবীন্দ্রনাথ যে এই সময়ে ভারতী-র ভার গ্রহণ করেছিলেন, হিরণ্ময়ী দেবীর তাগিদ ছাড়াও সম্ভবত তার অন্য কারণও ছিল। তাঁর অভিভাবকত্বে ও সম্পাদনায় প্রকাশিত সাধনা-য় তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিমূলক রচনার প্রকাশ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি গঠনমূলক মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন—সাধনা সত্যই তাঁর হাতের কুঠার-স্বরূপ ছিল। সাধনা-পরবর্তী গত আড়াই বছরে বাংলাদেশের

সামাজিক আন্দোলনের স্রোত কিছু-পরিমাণে মন্দীভূত, সুতরাং সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বলবার কথা বিশেষ কিছু ছিল না—কিন্তু সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকা তখন যেভাবে আন্দোলিত হচ্ছিল, সেক্ষেত্রে অবস্থার বিশ্লেষণ ও পথনির্দেশের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব না করে থাকতে পারেন নি। 1897-এ নাটোরের প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় থেকে তিনি নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ভারতী-র সম্পাদনা-সূত্রে তিনি এইসব প্রসঙ্গে নিজের মতামত ও ভূমিকা স্পষ্ট করার সুযোগ পেয়েছিলেন। গত বছরের মাঝামাঝি তিনি যখন ভারতী-সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন, তখন এই কারণেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছিলেন: 'সাধনা আর বাহির করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। ভারতীর দ্বারাই আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে।'[৭]

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী [২২ বর্ষ ১ সংখ্যা] প্রকাশের তারিখ 27 Apr 1898 [বুধ ১৫ বৈশাখ]। রয়েল আট পেজি ফর্মার বদলে ক্রাউন সাইজে মুদ্রিত[৮] এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঁচটি:

১-২ 'দুঃসময়' দ্র কল্পনা ৭। ১২১-২২

৩-২৩ 'দুরাশা' দ্র গল্পগুচ্ছ ২১। ১৯১-২০৪

২৩-৩৪ 'কণ্ঠরোধ' দ্র রাজাপ্রজা ১০। ৪২৪-৩১

৭৪-৮১ 'বঙ্গভাষা' দ্র সাহিত্য ৮। ৪৮৮-৯২

৮৬-৯৬ 'প্রসঙ্গ কথা' দ্র শিক্ষা-পরিশিষ্ট। ১২।৫০৫-১২

এছাড়াও রবীন্দ্র-সম্পাদিত ভারতী-র প্রথম সংখ্যায় লেখেন ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ, সরলা দেবী ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি অপেক্ষাকৃত পুরোনো। 'দুঃসময়' কবিতাটির কিয়দংশ 'স্বর্গপথে' নামে ১৫ বৈশাখ ১৩০৪ তারিখে রচিত হয়েছিল, পরবর্তী সংস্কার কবে হয়েছিল আমাদের জানা নেই। 'দুরাশা' গল্পটিও আশ্বিন ১৩০৩-এ দার্জিলিঙে কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবীর গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মুখে মুখে রচিত হয়, লিখিত আকারে 'কুহেলিকা' নামে রবীন্দ্রনাথ এটি পাঠ করেন ২৪ মাঘ ১৩০৩ [5 Feb 1897] খামখেয়ালী সভার প্রথম অধিবেশনে। 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধটি তিনি 'সিডিশন বিল পাস্ হইবার পূর্ব্ব দিনে টৌন্‌হল মীটিংয়ে' ৬ ফাল্গুন ১৩০৪ [বৃহ 17 Feb 1898] তারিখে পাঠ করেন। এগুলি সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি।

'বঙ্গভাষা' দীনেশচন্দ্র সেনের [1866-1939] 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের [1896] আরম্ভভাগে বাংলাভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে, তারই উপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখিত। ত্রিপুরার গুণগ্রাহী মহারাজ বীরচন্দ্রের অর্থানুকূল্যে গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরিচিত দীনেশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ পত্র দ্বারা অভিনন্দিত করেন। দীনেশচন্দ্র আত্মকথায় লিখেছেন: "কুমিল্লায় ১৮৯৬ সনে যখন আমি উৎকট রোগ-শয্যায় পড়িয়াছিলাম, এবং যখন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম প্রকাশিত হয়,… আমি রবীন্দ্রবাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহা একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া আমি অনেক দিন রাখিয়া দিয়াছিলাম। ছোট একখানি কাগজ দোভাঁজ করিয়া মুক্তার মত হরফে কবিবর লিখিয়াছিলেন, সেই প্রত্যেকটি

হরফ আমার নিকট মুক্তার মত মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে কত আদর, সম্মানের, তাহা সহজেই অনুমেয়।"[৯] রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্রের কঠিন অসুখ, প্রথম সংস্করণের নিঃশেষিতপ্রায় অবস্থা, দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রণ- ব্যয় সংগ্রহের আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয় অবগত ছিলেন। সেইজন্য প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন: 'সৌভাগ্যের বিষয় এই যে পুস্তকখানি সাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়া প্রথম সংস্করণের প্রান্তশেষে উত্তীর্ণ হইয়াছে।... রোগশয্যাশায়ী লেখক মহাশয় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। আশা করি অর্থসাহায্য-অভাবে তাঁহার এই ইচ্ছা নিষ্ফল হইবে না।' তিনি অবশ্য শুধু আশা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, বর্তমান ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর মাণিক্যকে এ-বিষয়ে অনুরোধ করে পত্রও লিখেছিলেন। ১০ আষাঢ় 23 Jun] দীনেশচন্দ্রকে লিখিত পত্রে তাঁর এই প্রয়াসের কথা জানা যায়: 'দীর্ঘকাল হইল ত্রিপুরায় পত্র লিখিয়াও এ পর্য্যন্ত যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না তখন সেখানকার আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার বোধ হয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদের নিকট চাঁদা করিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে।...আমি কিছুকাল কলিকাতায় স্থির নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিলে ইতস্ততঃ চেষ্টা করিতে পারিতাম।'[১০]

রবীন্দ্রনাথ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্র-বর্ণিত বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে কোন আলোচনা করেন নি, এখানে বাংলা ভাষাতত্ত্বই তাঁর আলোচনার লক্ষ্য। বিষয়টি তাঁর কাছে কত আকর্ষণীয় ছিল, তরুণ বয়স থেকে রচিত তাঁর অনেক প্রবন্ধেই তার সাক্ষ্য বর্তমান। দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যে আলোচনা আছে, তার সূত্র অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ এখানে নূতন করে ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আলোচনাটি ভারতী-র পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যাতে বিস্তৃত হয়েছিল। জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় [প ১৫৪-৬৭] 'বাঙ্গালা বহুবচন' ও শ্রাবণ-সংখ্যায় [পৃ ৩১৫-১৯] 'সম্বন্ধে কার' প্রবন্ধ প্রত্যক্ষতই দীনেশচন্দ্রের আলোচনা অবলম্বনে লিখিত, পৌষ-সংখ্যায় [পৃ ৮৩০-৪২] মুদ্রিত 'বীম্‌সের বাঙ্গলা ব্যাকরণ।/ (উচ্চারণ-পর্য্যায়)' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে দীনেশচন্দ্রের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্র-রচনায় উদ্ধৃতি ও উল্লেখের আপেক্ষিক স্বল্পতার জন্য তাঁর পড়াশোনার পরিধি পরিমাপ করা দুঃসাধ্য—কিন্তু বর্তমান সময়ে রচিত ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনায় সৌভাগ্যক্রমে তিনি ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করেছেন। 'বাঙ্গালা বহুবচন' প্রবন্ধের শেষে তিনি লিখেছেন: 'দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হ্যর্নলে-সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ [A. F. R. Hoernle: *A Grammar of the Eastern Hindi compared with the other Gaudian Languages,* 1880], কেলগ্-সাহেবের হিন্দি ব্যাকরণ [S.H. Kellogg: *A Grammar of the Hindi Language* 2nd ed., 1893], গ্রিয়র্সন-সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ [G. A. Grierson, *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar containing a Grammar, Chrestomathy and Vocabulary*, 1882], এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ [Dr. N. Brown, *Grammatical Notes on the Assamese Language,* 2nd ed. 1862] অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।'[১১]

এছাড়াও রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ আছে, মার্জিনে লিখিত টীকা ও বিভিন্ন দাগ থেকে বোঝা যায় কত মনোযোগ-সহকারে রবীন্দ্রনাথ এই দুরূহ গ্রন্থগুলি পাঠ করেছিলেন:

১. THE PRAKRITA-PRAKASA:/or,/the Prakrit Grammar/of/Vararuchi./.../by/ E. B. Cowell. M. A./.../1868.

২. HANDBOOK OF PALI/Being/An Elementary Grammar,/a Chrestomathy, and a Glossary,/ Compiled by/O. Frankfurter, Ph. D./.../1883.

৩. ELEMENTS/OF THE/ COMPARATIVE GRAMMAR/ OF THE/ INDO-GERMANIC LANGUAGES./.../by/Karl Brugmann./.../1888.

8. A/SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY/.../by/Sir Monier Monier-Williams.../1899.

৫. PRAKRITA-PAINGALAM/.../By/Chandramohan Ghosha, M.B.B.A. /.../1902

৬. THE/ORIGIN AND DEVELOPMENT OF/THE BENGALI LANGUAGE/By/Suniti Kumar Chatterji/.../1926.

—উপরে লিখিত Grierson-এর বইটিও এই সংগ্রহে আছে। ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধে ও পরিভাষা-রচনায় রবীন্দ্রনাথ এগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক ড সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব-চর্চায় রবীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে লিখেছেন:

‘But the first Bengali with a scientific insight to attack the problems of the language was the poet Rabindranath Tagore; and it is flattering to the votaries of Philology to find in one who is the greatest writer in the language, and a great poet and seer for all time, a keen philologist as well, distinguished alike by an assiduous enquiry into the facts of the language and by a scholarly appreciation of the methods and findings of the modern western philologist.’[১২]

—এই উক্তি ভক্তের অতিরঞ্জন নয়।

সাধনা-য় যে বিভাগের নাম ছিল ‘আলোচনা’, ভারতী-তে তার নামকরণ হয় ‘প্রসঙ্গকথা’। বর্তমান সংখ্যায় দুটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার [1833-1904] দেশে বিজ্ঞানচর্চার উন্নতির জন্য 1876-এ Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠা করেন। দেশবাসীর অর্থেই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় তৎকালীন লেফটেনান্ট গবর্নর ম্যাকেঞ্জির সভাপতিত্বে মহেন্দ্রলাল দেশবাসীর উদাসীনতাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন নি এবং বিদেশী রাজপুরুষদের সামনে বাঙালির নিন্দার জন্য তাঁর জাতীয় আত্মসম্মান আহত হয়েছে। তাই তিনি লিখেছেন: ‘গাড়ি চলে না বলিয়া দেশাধিপতির নিকট দেশের নামে নালিশ রুজু না করিয়া আপাতত রাস্তা বানাইতে শুরু করা কর্তব্য।...বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে-উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়। সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন যদি গত পঁচিশ বৎসর এই কার্যে যত্নশীল হইতেন তবে যে-ফললাভ করিতেন তাহা রাজপুরুষবর্গের সমুচ্চ প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে দৃষ্টিগোচর না হইলেও আমাদের এই বিজ্ঞানদীন দেশের পক্ষে অত্যন্ত মহার্ঘ হইত।’ এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসংকলনে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রয়াসের সঙ্গে সংযুক্ত হবার জন্য সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাছাড়া ‘বাংলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার, সাময়িক পত্র প্রকাশ, স্থানে স্থানে যথাস্থানে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা

আবশ্যক। নিজের উপযোগিতা উপকারিতা সর্বতোভাবে প্রমাণ করা আবশ্যক। তবেই দেশের সহিত সভার দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, কেবলমাত্র বিলাপের দ্বারা তাহা হইতে পারে না।'

'প্রসঙ্গকথা'র দ্বিতীয় রচনাটি বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-রচিত 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' [পৃ ৮১-৮৬] প্রবন্ধের উপরে মন্তব্য-রূপে লিখিত। ইতিহাস-সংকলনে দেশের লোক যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহী নয় বলেই দেশের যথার্থ ইতিহাস লিখিত হয় নি—এই আক্ষেপ করে অক্ষয়কুমার লিখেছিলেন: 'ইহার জন্য স্বদেশের সাহিত্যসেবকদিগের সমবেত চেষ্টার আবশ্যক, স্বদেশের ধনীসন্তানদিগের সহানুভূতির প্রয়োজন, এবং ভারতাধিপতি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের কৃপা কটাক্ষের আবশ্যক।' এই ধরনের মনোভাব প্রকাশের জন্যই রবীন্দ্রনাথ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সমালোচনা করেছিলেন, তাই অন্যতম সহযোগী প্রিয়বন্ধু অক্ষয়কুমারকেও সমর্থন করতে পারেন নি। 'আমাদের দেশে সভাস্থাপনের প্রতি আমাদের বড়ো-একটা বিশ্বাস নাই।...যে-দেশে কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে অনেকগুলি লেখকের সুদৃঢ় উৎসাহ আছে, সেই দেশে উৎসাহী লোকেরা একত্র হইয়া বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। যে-দেশে উৎসাহী লোক স্বল্প সে-দেশে সভা করিতে গেলে ঠিক বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা।...আমরা লেখকমহাশয় ও তাঁহার দুই চারিজন সহযোগীর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রতিই লক্ষ করিয়া আছি। তাঁহারা নিজেদের উৎসাহের উদ্যমে ভুলিয়া যাইতেছেন যে, দেশের লোকের অধিকাংশের মনে এ-সকল বিষয়ে অকৃত্রিম অনুরাগ নাই। অতএব তাঁহারা প্রথমে নিজের রচনা ও দৃষ্টান্তদ্বারা দেশে ইতিহাসানুরাগ বিস্তার করিয়া দিলে যথাসময়ে সভাস্থাপনের সময় হইবে।' এই কারণেই তিনি অক্ষয়কুমার-প্রণীত 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থখানির উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন: 'সভার দ্বারা তেমন কাজ হয়না প্রতিভার দ্বারা যেমন হয়।'

কিন্তু প্রবন্ধটির প্রকৃত মূল্য ইতিহাস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে। এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে প্রবন্ধের প্রথম অংশটিতে। তিনি লিখেছেন: 'অতীত সময়ের অবস্থা কেবল ঘটনার দ্বারা নির্ণয় হয় না, লোকের কাছে তাহা কিরূপ ঠেকিয়াছিল সেও একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানবমন মিশ্রিত হইয়া যে-পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য। সেই সত্যের বিবরণই মানবের নিকট চিরন্তন কৌতুকাবহ এবং শিক্ষার বিষয়।' পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার অনেকটাই এই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত।

বৈশাখ ১৩০৫-এ ভারতী ছাড়া অন্য কয়েকটি পত্রিকাতেও রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, অবশ্য তার সবগুলিই পুরোনো লেখা।

প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৫ [১ । ৫]:

১৪৭ 'বিদায়' [বিভাস। একতালা।/ এবার চলিনু তবে] দ্র কল্পনা ৭।১৬০-৬১; গীত ৩। ৭৮৯-৯০

কবিতাটি ৭ আশ্বিন ১৩০৪ [22 Sep 1897] তারিখে ইছামতী নদী দিয়ে যাওয়ার সময়ে রচিত।

উৎসাহ, বৈশাখ ১৩০৫ [২ । ১]:

১৩ 'সে আমার জননী রে' [ভৈরবী। রূপক/কে এসে যায় ফিরে ফিরে] দ্র কল্পনা ৭।১৫৬-৫৭; গীত ৩।৮২১

ইন্দিরা দেবী-কৃত স্বরলিপি-সহ গানটি ইতিপূর্বেই ফাল্গুন ১৩০৪-সংখ্যা বীণাবাদিনী-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

ঘোড়ামারা, রাজশাহী থেকে সুরেশচন্দ্র সাহা-সম্পাদিত এই ক্ষণজীবী পত্রিকাটিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হয়। সম্ভবত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন।

বীণাবাদিনী, বৈশাখ ১৩০৫ [১/১০]:

২৬৭-৭০ লচ্ছাসার—ঝাঁপতাল। বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ-ধারা

২৭০-৭৩ বাহার—চৌতাল। আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে

'পারমার্থিক গান' পর্যায়-ভুক্ত এই দু'টি গানেরই স্বরলিপি ইন্দিরা দেবী-কৃত।

২৭৪-৭৭ কালাংড়া—একতালা। আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা

২৭৮-৮১ মিশ্র-ছায়ানট—একতালা। সখি, প্রতিদিন হায়,

২৮৩-৮৫ মিশ্র—একতালা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল

'লৌকিক গান' পর্যায়-ভুক্ত এই তিনটি গানের স্বরলিপিকারের নাম অনুল্লেখিত, সম্ভবত সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বরলিপি করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী [1864-1919] সাধনা-র লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও, আমরা বলেছি, গত বৎসর শ্রাবণ মাস থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে। ২৯ আশ্বিন ১৩০৪ [14 Oct 1897] তারিখের চিঠিতেই তিনি ভারতী-র ভাবী সম্পাদক হিসেবে রামেন্দ্রসুন্দরকে তাগাদা দিয়ে রেখেছেন: 'এবার আমার হাতে যখন কাগজ আসিতেছে তখন আপনার আর নিস্তার নাই। নিয়মিত লেখার জন্য আপনার প্রতি নিয়মমত জুলুম চলিবে। পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাপন করিয়া রাখিলাম—কারণ, দস্যুবৃত্তির মধ্যেও একটু ধর্ম্ম থাকা চাই।'[১৩] বৈশাখ ১৩০৫-সংখ্যা ভারতী-র জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের লেখা পাওয়া যায় নি। রবীন্দ্রনাথ 'সোমবার' [? ২০ বৈশাখ 2 May]-লিখিত একটি পত্রে লেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: 'ভারতী পাইয়া থাকিবেন। কিছুলেখার প্রার্থনা করি। প্লেগের বিভীষিকায় কয়দিন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল।' রামেন্দ্রসুন্দর-প্রণীত ছাত্রপাঠ্য 'ভূগোল' [চৈত্র ১৩০৪] গ্রন্থ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রেই লেখেন: 'আপনার "ভূগোল" গ্রন্থ পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বইখানি আমার মনের মত হইয়াছে। স্কুলে গ্রাহ্য হইবে কি না জানি না কিন্তু আশা করি সন্তানহিতৈষী পিতা মাত্রেই আপনার এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ছেলেদের ভূগোল শিক্ষা দিবেন।'[১৪] রামেন্দ্রসুন্দর এই গ্রন্থে 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছেন: 'আমার প্রধান ভয়, অনেক কথা বর্জন করিয়াও যাহা রাখিয়াছি, তরুণ মস্তিষ্কের পক্ষে তাহাও নিতান্ত অল্প হইবে না। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক বিবরণ আয়ত্ত করা অনেকটা কঠিন হইবে। কিন্তু সকল কথাই আয়ত্ত করিতে হইবে এমন কোন কারণ নাই। পাঠের সময় বালকেরা যদি একটা অনতিস্ফুট ছবি মানসচক্ষুতে দেখিতে পায়, তাহাতেও ফল আছে। গ্রন্থের ভাষা যাহাতে বালকেরা মুখস্থ করিতে অবসর না পায়, তাহার যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা অবলম্বন করিয়া শিক্ষক মহাশয় যদি ছাত্রগণকে উপদেশ দেন, ও তাঁহার যত্নে বালকের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত করিতে এবং শিখিবার বাঞ্ছার উদ্রেক করিতে যদি এই গ্রন্থ কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করে তাহা হইলেই গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইবে।'[১৫] এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হল বইটি কেন রবীন্দ্রনাথের 'মনের মত' হয়েছে সেইটি বোঝাবার জন্য—রামেন্দ্রসুন্দর 'বিজ্ঞাপন'-এ যা লিখেছেন তা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের একটি

অন্যতম বৈশিষ্ট্য, প্রথমে পুত্রকন্যাদের শিক্ষা-পরিকল্পনায় ও পরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষণ-পদ্ধতিতে তিনি এই আদর্শের ব্যাপক প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছেন। National Council of Education-এর প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম রচনায় রামন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহযোগী ছিলেন, বর্তমান প্রসঙ্গে এই তথ্য আমরা স্মরণ করতে পারি। জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের নাম 'শিক্ষা প্রণালী' [পৃ ১০৭-২৪]।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর পরস্পরের সহযোগী ছিলেন। ১৪ শ্রাবণ ১৩০১ [রবি 29 Jul 1894] পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে যে 'পারিভাষিক সমিতি' গঠিত হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর উভয়েই সদস্য ছিলেন। এ-বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের ভূমিকাই সর্বাধিক কার্যকরী ছিল, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সহযোগী মাত্র। 'পরিভাষা-সমিতি'র কার্যবিবরণে প্রকাশ: "পদার্থবিদ্যা বিষয়ক পরিভাষা সঙ্কলনে সম্পাদক মহাশয় সম্প্রতি নিযুক্ত আছেন। ...শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থালয় হইতে এই বিষয়ের দুই খানি পুরাতন গ্রন্থ সম্পাদককে ব্যবহারের জন্য দিয়া তাঁহাকে ও সাহিত্য-পরিষদ্‌কে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম গ্রন্থখানি—জন মার্ক সাহেব কর্ত্তৃক শ্রীরামপুর প্রেস হইতে ১৮০৪ সালে প্রকাশিত 'কিমিয়া বিদ্যার সার', সম্ভবতঃ রসায়ন শাস্ত্রে বাঙ্গালা ভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। দ্বিতীয় গ্রন্থ খানি ১৮২৫ সালে গভর্ণমেন্ট লিথোগ্রাফিক যন্ত্রে মুদ্রিত—পিটার ব্রেনটন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'বৈজ্ঞানিক অভিধান'।"[১৬] পরিভাষা বা প্রতিশব্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার অজস্র পরিচয় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে, দ্র বাংলা শব্দতত্ত্ব [১৩৯১]। ১৮৩-২০২, ৩৬৩-৪০৬।

রবীন্দ্রনাথ ৬ জ্যৈষ্ঠের [বৃহ 19 May] পূর্বে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, এ দিন তাঁর পার্ক স্ট্রীটে যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়। ৭ ও ৮ জ্যৈষ্ঠও তিনি পার্ক স্ট্রীটে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব হিসাবখাতায় এই সময়ে কিছু চিঠিপত্র পাঠানোর হিসাব আছে। ৭ জ্যৈষ্ঠ 'বোলপুর ও শিবধন বিদ্যার্ণবের নিকট ও ত্রিপুরায় পত্র পাঠান' এই নির্দিষ্ট উল্লেখ ছাড়া এই দিন আরও চার আনা এবং ১০ জ্যৈষ্ঠ সাড়ে তিন আনা ডাকব্যয় উল্লিখিত হয়েছে। তখন পোস্টকার্ডের দাম ছিল এক পয়সা ও খাম দু'পয়সা—সুতরাং চিঠির সংখ্যা অনেকগুলিই; কিন্তু কাদের কাছে কি বিষয়ে তিনি চিঠি লিখেছিলেন তা অনুমানেরও কোনো উপায় নেই। ত্রিপুরায় যে পত্র পাঠানো হয়েছিল তা মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বা মহিমচন্দ্র দেববর্মা বা রাধারমণ ঘোষকে লেখা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই সময়ে তাঁদের কাউকে লেখা কোনো চিঠির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

এই বছর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকা নগরীতে। 21 May [শনি ৮ জ্যৈষ্ঠ] Indian Relief Society-র এক সভায় আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, গগনেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও এ সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি [Delegate] নির্বাচিত হন।[১৭] এবারে সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হন রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [1847-1907] —মহরমের ছুটিতে 30 ও 31 May এবং 1 Jun [সোম-বুধ ১৭-১৯ জ্যৈষ্ঠ] ঢাকার ক্রাউন থিয়েটারে বিশেষভাবে প্রস্তুত একটি মণ্ডপে এই সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল।

26 May-র অমৃতবাজার পত্রিকা সংবাদ দেয়: 'The Hon'ble Kali Charan Banerjee, the President elect of the Dacca Conference, leaves for Dacca by the Friday [১৪ জ্যৈষ্ঠ 27 May] night mail. So do Mr. A. Chowdry, J. Chowdry and brothers and Babu Robindra Nath Tagore, Gagendra [sic] Nath Tagore, Surendra Nath Tagore and some other gentlemen.' এর আগে রবীন্দ্রনাথকে জমিদারির কাজে শিলাইদহে যেতে হয়েছিল; ক্যাশবহির হিসাবে আছে: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর পরগণায় গমন জন্য দ্রব্যাদি ক্রয় ২২৫/১১ জ্যৈষ্ঠ গমন করেন'—এর থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ ১১ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 24 May] প্রথমে জমিদারির কাজের জন্য শিলাইদহে যান; সেখান থেকে আবার কলকাতায় এসে বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঢাকা পৌঁছন ১৬ জ্যৈষ্ঠ [রবি 29 May] তারিখে—30 May-র অমৃতবাজার পত্রিকার খবর: 'Telegrams./Dacca, May 29...Babus Surendranath Banerjee, Rabindranath Tagore, Mr. J. Choudhuri, Editors of the *Hitabadi* and *Sahitya,* with others from Calcutta, arrived this afternoon.'

30 May [সোম ১৭ জ্যৈষ্ঠ] প্রথম দিনের অধিবেশনের উদ্বোধন সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকা-য় [4 Jun] লেখা হয়েছে: 'The first day's proceedings were opened punctually at 2 o'clock on Monday, Babu Rabindra Nath Tagore, the sweet singer of Israel, as the President called him later on, singing a national anthem in Bengali'. রবীন্দ্রনাথ কোন্ বাংলা জাতীয় সংগীত গেয়েছিলেন, প্রতিবেদনে তার উল্লেখ নেই। গোপালচন্দ্র রায় 'কবি এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচক ঢাকা-নিবাসী' সুখরঞ্জন রায়ের বৈশাখ ১৩৭২-সংখ্যা 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে, গানটি হল কড়ি ও কোমল-এর অন্তর্ভুক্ত 'আমায় বোলো না, গাহিতে বোলো না'।[১৮] গানটি রচনার রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত পটভূমিকাটির কথা আমরা জানি [দ্র রবিজীবনী ৩।৬২], সুতরাং একটি সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে এইরূপ একটি জাতীয় সংগীত গাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব কিনা পাঠক ভেবে দেখতে পারেন।

The Bengalee [11 Jun]-র খবরে প্রকাশ, প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে: 'The proceedings closed with a touching and admirable peroration from the presidential chair, followed by a song, sung by Babu Robindra Nath Tagore. Dacca has never witnessed such a sight. The chariot, with Babus Kali Churn Banerji, Surendra Nath Banerjea, Robindra Nath Tagore, was drawn by the volunteers and delegates from the pavilion to their *basha.*'

এই দিন রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথারীতি ইংরেজিতে তাঁর সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ও তিনিই সভাপতির সম্ভাষণের সারমর্ম বাংলায় পাঠ করিয়াছিলেন।'[১৯] সমকালীন কোনো পত্রিকায় এই বিষয়ে কোনো উল্লেখ না পাওয়ায় গোপালচন্দ্র রায় এই তথ্যের বিরোধিতা করেছেন।[২০] তাঁর অন্য যুক্তি হল, রবীন্দ্রনাথ আষাঢ় ১৩০৫-সংখ্যা ভারতী-তে 'প্রাদেশিক সভার উদ্বোধন' [পৃ ২৪৮-৫৭] শিরোনামায় সভাপতির বক্তৃতার 'সারমর্ম্ম' বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন; এর মুখবন্ধ হিসেবে তিনি লিখেছেন: 'এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, অনুবাদটি কালীচরণবাবুকে দেখাইবার অবকাশ পাই নাই, এজন্য যদি কোন অনৈক্য অসঙ্গতি ঘটিয়া থাকে তবে আমরা তাঁহার ও পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।' কিন্তু এই ধরনের সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ আগেই মুদ্রিত করে

সভায় ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে বিতরণ করা হত—তাছাড়া আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী প্রকাশের [বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুসারে প্রকাশের তারিখ [12 Jul ২৯ আষাঢ়] বহু পূর্বেই বিভিন্ন পত্রিকায় তা সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছিল—সুতরাং রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষমা প্রার্থনা'কে বিনয় মনে করাই সংগত। তাছাড়া বহু বছর পরে 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' প্রবন্ধে নাটোর-সম্মেলনে বাংলাভাষা প্রবর্তনে তাঁর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে তিনি-যে লিখেছিলেন; 'পর বৎসরে রুগ্নশরীর নিয়ে ঢাকা কন্‌ফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল'[২১]—দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা উত্থাপিত একটি প্রস্তাবের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যার মধ্যে এই 'চেষ্টা' সীমাবদ্ধ থাকলে তাঁর দাবি একটু অতিরিক্ত বলে গণ্য হতে পারে, যেখানে সভাপতির অভিভাষণই এই শ্রেণীর সম্মেলনের সর্বাধিক আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল। সেইজন্য আমাদের ধারণা, সংবাদপত্রে উল্লেখ না থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণের মর্মানুবাদ সভায় পাঠ করে পূর্ববর্তী সম্মেলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছিলেন এবং এইজন্যই অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী-র 'প্রসঙ্গ কথা'য়* লিখেছেন: 'আশার কথা এই যে প্রাদেশিক সমিতি ক্রমে বিলাতী ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া দেশী সাজে দেশের দ্বারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আমাদের রাজনৈতিক কর্ম্মকাণ্ডের যে সকল পুরোহিত দেশীমন্ত্রে দেশী অনুষ্ঠানবিধিতে অনভ্যস্ত, এ জনসভা হইতে তাঁহাদের দুর্ব্বোধ জল্পনা ক্রমশঃ নির্ব্বাসিত হইবে এবং দেশের জনসাধারণ মাতৃভূমির নিজের মুখে নিজের ভাষায় আহ্বান পাইয়া এ সভায় আপন স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ক্রমশঃ অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে।' সম্মেলনে বাংলাভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে অপ্রচুর উল্লেখ দেখা যায়, সেটি যথার্থ হলে এই দাবি ও আশাকেও আমরা ভিত্তিহীন বলে মনে করতে পারি।

দ্বিতীয় দিনের [১৮ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল 31 May] অধিবেশন বসে দুপুর সাড়ে বারোটায়। এই দিনের অধিবেশনে, সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা উত্থাপিত পঞ্চম প্রস্তাবের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অমৃতবাজার পত্রিকা [2 Jun] এ-বিষয়ে লেখে: 'The fifth [resolution] thanked Sir John Woodburn for his sympathetic plague policy and prayed with reference to the terms of the Venice Convention that no locality be deemed infected because of a few plague cases, that Calcutta be declared as non-infected, and that the extension of home-segregation be conceded to Mofussil. The Hon'ble Surendranath Banerjea moved this Resolution and Babu Rabindranath Tagore gave expression, in a speech in Bengali, to the heartfelt gratitude for Sir John Woodburn for whom three cheers were given by the assembly. The Resolution was carried enthusiastically. Mr. Kemp, Editor of the *Bengal Times*, strongly supported the Resolution'. এ-বিষয়ে *The Bengalee* [4 Jun]-র বিবরণ একটু ভিন্ন: 'Proposed by—the Hon'ble Surendra Nath Banerjea. Translated by R. N. Tagore Esq. Seconded by—Babu Trailakya Nath Bose. Supported by—Babu Sarat Chandra Ghosh.'

এইদিন সন্ধ্যায় প্রতিনিধিদের একটি স্টীমার-পার্টিতে আপ্যায়িত করা হয়। অমৃতবাজার পত্রিকায় [2 Jun] 'Dacca, June 1'-এর টেলিগ্রামের খবর: 'A very grand river trip on their own steamer launch, flat and green boats, was given yesterday evening to the delegates to the Conference, who are

treated with sumptuous refreshments and excellent music by Babu Jogendra Nath Roy, son of Babu Janoki Nath Roy, the millionaire of Bhagyakul.' তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ঢাকার নর্থব্রুক হলে প্রতিনিধিদের জন্য সান্ধ্যভোজের আয়োজন করা হয়। আমরা অনুমান করতে পারি, অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও এই দু'টি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তৃতীয় দিনের [১৯ জ্যৈষ্ঠ বুধ 1 Jun] অধিবেশনে দশটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। শেষে 'Babu Robindranath Tagore invited the Conference next year at 24-Perganas.'[২২] রবীন্দ্রনাথ হয়তো চব্বিশ পরগণা জেলার কোনো প্রধান শহরে 1899-এর প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন—কিন্তু সম্মেলনটি হয় বর্ধমান শহরে।

কলকাতার প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার সকালের ট্রেনে ঢাকা ত্যাগ করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গী হন নি। তিনি বুধবার রাত্রেই শিলাইদহ যাত্রা করেন। রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র রবীন্দ্রনাথের বন্ধু মনোমোহন ঘোষ তখন ঢাকার সরকারী কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন; তাঁর 2 Jun-এর পত্র থেকে উক্ত বিষয়টি জানা যায়:

'I am so sorry that I was not able to join you last night, as agreed upon....Since you have so kindly given me a standing invitation to come at any time to stay with you at Shillada....I think I will postpone coming for the present and take advantage of your offer on the next earliest occasion, and I am sure I shall have many.'[২৩]

—এই পত্র থেকে বোঝা যায়, ১৯ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 1 Jun] রাত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মনোমোহনেরও শিলাইদহ যাত্রা করার কথা হয়েছিল; আরও জানা যায়, ঢাকাতে রাজনীতি-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বন্ধুত্ব-চর্চারও সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরী যে ঢাকা-সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন সে খবরটি পাওয়া যায় এই পত্র থেকে।

জাতীয় কর্তব্যবোধে অসুস্থ শরীর নিয়ে ঢাকায় গেলেও সেখানকার প্রাদেশিক সম্মেলন রবীন্দ্রনাথকে খুশি করতে পারে নি। তিনি নিজে অবশ্য এ-বিষয়ে কিছু লেখেন নি, কিন্তু ভারতী-র সম্পাদকীয় রচনা 'প্রসঙ্গ কথা'র আষাঢ়-সংখ্যায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-রচিত প্রবন্ধটিকে তিনি যখন প্রথমেই স্থান দিয়েছেন, তখন বোঝা যায় প্রবন্ধটির বক্তব্য সম্বন্ধে তাঁর দ্বিমত নেই। অক্ষয়কুমারের অভিযোগ অনেকগুলি। বহরমপুর কৃষ্ণনগর ও নাটোরের প্রাদেশিক সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধির সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল—কিন্তু ঢাকায় সেই সংখ্যা কেবল অর্ধেকই হয় নি, অনুপস্থিত প্রতিনিধিদের অনেকেই পূর্বাহ্নে কোনো সংবাদও প্রেরণ করেন নি। ফলে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য উদ্যোক্তাদের অনর্থক অপব্যয় ও আনুষঙ্গিক উদ্বেগ বহন করতে হয়েছিল। আর যাঁরা অনুগ্রহ করে সেখানে গিয়েছিলেন, তাঁরা 'অতিরিক্ত মাত্রায় আদর অভ্যর্থনা উপভোগ করিয়া...বরযাত্রীর মত অসহিষ্ণু' ও 'ক্ষুদ্র নবাব রূপে প্রতিভাত' হয়েছেন। নাটোর সম্মেলনে রাজশাহী অঞ্চলের জমিদারেরা সকলে 'একবাক্যে সমিতিতে যোগদান' করেছিলেন, কিন্তু ঢাকা সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের ধনাঢ্য জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই অনুপস্থিত ছিলেন। এর কারণ কী? অক্ষয়কুমার লিখেছেন: 'রাজপুরুষবর্গের আকস্মিক স্বপ্নবিভীষিকায় প্রচলিত রাজবিধির যে সকল অভিনব সংস্কার সংসাধিত হইয়া

দেশের মধ্যে এক অকারণ উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকেই যদি ইহার কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে ত ঢাকার অধিবেশনে বাঙ্গালীর অন্তঃসারশূন্যতাই সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে!'

অবশ্য প্রবন্ধটিতে আশার কথাও আছে। অক্ষয়কুমার লিখেছেন: 'এতদিন পরে এই সমিতিতে এ কথা প্রথম উচ্চারিত হইয়াছে যে, রাজদ্বারে আবেদন ছাড়া আমাদের স্বচেষ্টাসাধ্য গুরুতর কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে এবং দেশের সেই ধনবৃদ্ধি শিল্পোন্নতিতে হস্তক্ষেপ না করিলে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনদ্বারা আমাদের লজ্জা দূর হইবে না। আমরা বিবেচনা করি এই মন্তব্য প্রকাশ ঢাকা প্রাদেশিক সমিতির বিশেষ গৌরবের কারণ।' অক্ষয়কুমার রাজশাহী শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এ-বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ নানা উপায়ে তাঁর সহযোগিতা করেন—যথাস্থানে আমরা প্রসঙ্গটি উত্থাপন করব।

রবীন্দ্রনাথ ১৯ জ্যৈষ্ঠ রাত্রে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে সম্ভবত ২০ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 2 Jun] শিলাইদহে পৌঁছন। এখানে এসেই কলকাতার বৃহৎ পরিবারের স্বার্থ-দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট পত্নী মৃণালিনী দেবীর একটি পত্র পান। সেই দিনই তিনি পত্রটির যে দীর্ঘ উত্তর লেখেন,[২৪] উভয়ের সমকালীন সম্পর্কের চিত্রায়ণে ও ভাবী সম্পর্কের পরিকল্পনার বিশ্লেষণে তা খুবই মূল্যবান। তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে গোড়াতেই লিখেছেন: 'কিন্তু ভাই, তুমি অনর্থক মনকে পীড়িত কোরো না। শান্ত স্থির সন্তুষ্ট চিত্তে সমস্ত ঘটনাকে বরণ করে নেবার চেষ্টা কর। এই একমাত্র চেষ্টা আমি সর্ব্বদাই মনে বহন করি এবং জীবনে পরিণত করবার সাধনা করি। সব সময় সিদ্ধিলাভ করতে পারিনে—কিন্তু তোমরাও যদি মনের এই শান্তিটি রক্ষা করতে পারতে তাহলে বোধ হয় পরস্পরের চেষ্টায় সবল হয়ে আমিও সন্তোষের শান্তি লাভ করতে পারতুম। অবশ্য তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক অল্প, জীবনের সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতা অনেকটা সীমাবদ্ধ, এবং তোমার স্বভাব একহিসাবে আমার চেয়ে সহজেই শান্ত সংযত এবং ধৈর্য্যশীল। সেইজন্যে সর্ব্ব প্রকার ক্ষোভ হতে মনকে একান্ত যত্নে রক্ষা করবার প্রয়োজন তোমার অনেক কম। কিন্তু সকলেরই জীবনে বড় বড় সঙ্কটের সময় কোন না কোন কালে আসেই —ধৈর্য্যের সাধনা, সন্তোষের অভ্যাস কাজে লাগেই। এর পরে লিখেছেন: 'আমি তোমাকে বড় বড় কথায় বক্তৃতা দিতে বসেছি বলে তুমি আমার উপর রাগ কোরো না। তুমি জান না অন্তরের কি সুতীব্র আকাঙক্ষার সঙ্গে আমি এ কথাগুলি বল্‌চি। তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি, শ্রদ্ধা এবং সহজ সহায়তার একটি সুদৃঢ় বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় হয়ে আসে, যাতে তার কাছে প্রতিদিনের সমস্ত দুঃখ নৈরাশ্য ক্ষুদ্র হয়ে যায়—আজকাল এই আমার চোখের কাছে একটা প্রলোভনের মত জাগ্রত হয়ে আছে।' তাঁর মতো সচল চিন্তাশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান পুরুষের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনযাপন মৃণালিনী দেবীর পক্ষে খুব সহজ ছিল না, একথা রবীন্দ্রনাথও বুঝতেন হয়তো। তাই তিনি লিখেছেন: 'আমি জানি তুমি আমার জন্যে অনেক দুঃখ পেয়েছ, এও নিশ্চয় জানি যে আমারই জন্যে দুঃখ পেয়েছ বলে হয়ত একদিন তার থেকে তুমি একটি উদার আনন্দ পাবে।' আড়ম্বরশূন্য ও কল্যাণপূর্ণ যুগ্মজীবনের আকাঙ্ক্ষায় এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন: 'সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আস্‌তে এত উৎসুক হয়েছি'—মাস-দুয়েকের মধ্যে পরিবারটিকে শিলাইদহে নিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আকাঙক্ষার একাংশ পূরণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ চিঠিটির গোড়ায় লিখেছিলেন: 'আমি তাহলে একবার শীঘ্র কালিগ্রামের কাজ সেরে কলকাতায় গিয়ে যথোচিত বন্দোবস্ত করে আসব।' কিন্তু তিনি ২৩ জ্যৈষ্ঠ [রবি 5 Jun] তারিখেই যে কলকাতায় ফিরে আসেন, সে খবরটি পাওয়া যায় ক্যাশবহির হিসাবে: 'বিরাহিমপুর হইতে আগমন করায় সিয়ালদহার স্টেসন হইতে বাটী ২৩ জ্যৈষ্ঠ'—এই দিনই তিনি আবার পার্ক স্ট্রীটও গিয়েছিলেন। হয়তো কোনো বিশেষ পারিবারিক বা বৈষয়িক কর্মে তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল।

এবারে কলকাতায় এসে তিনি যে কয়দিন ছিলেন তার প্রায় প্রত্যেকটা দিন তাঁকে ভ্রাম্যমাণ দেখা যায়। ২৪ জ্যৈষ্ঠ 'বিডিন ষ্ট্রীট যাতায়াতের' ও 'যোড়াগীর্জ্জা হইতে আসার', ২৫ জ্যৈষ্ঠ 'হাবড়া হইতে আসার' খরচ তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহির এবং সরকারী খরচে তিনি ২৯ জ্যৈষ্ঠ 'মোহিনীবাবুর বাটীতে ও বালিগঞ্জে' এবং ২৯ ও ৩০ জ্যৈষ্ঠ পার্ক স্ট্রীট যাতায়াত করেছেন। এরপর ৩১ জ্যৈষ্ঠ [সোম 13 Jun] তিনি কালীগ্রাম রওনা হন—'কালীগ্রাম গমনে জন্য রেলভাড়া...৩১ জ্যৈষ্ঠ ৩৮'—এই হিসাব থেকে আমরা তারিখটি নির্ধারণ করেছি।

রবীন্দ্রনাথ হয়তো আশা করেছিলেন, বৈশাখ-সংখ্যার মতো ভারতী-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাও ১৫ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হবে—সেই কারণে ঢাকার প্রাদেশিক সম্মেলনের ভূমিকা রচনার জন্য সেখানকার ঐতিহাসিক বিবরণ-সংবলিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-রচিত 'ঢাকা' [পৃ ১৬৮-৭৫] প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ৪ Jun [বুধ ২৬ জ্যৈষ্ঠ] তারিখে, সম্মেলন শেষ হয়ে যাওয়ার পর। রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির সম্পাদক হলেও প্রকাশ-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতেন হিরণ্ময়ী দেবী—এইজন্য একটি তারিখ-হীন [জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫] পত্রে তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছেন: 'আপনি নূতন ভারতী পান নাই শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, আমি মফস্বলে ভ্রমণ করিতেছিলাম এবং ভারতীর সমস্ত কর্ম্মভার হিরণ্ময়ীর উপরে।'[২৫] যে-কোনো কারণেই হোক, তাঁর পক্ষে নিয়মিত সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি—পৌষ-মাঘ ও ফাল্গুন-চৈত্র তো যুগ্ম-সংখ্যা রূপে প্রকাশ করতে হয়েছিল।

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যার অধিকাংশ রচনাই রবীন্দ্রনাথের:

৯৭-১০২ 'পুত্রযজ্ঞ' দ্র গল্পগুচ্ছ ২১। ২০৪-০৮

১০৩-০৭ 'জুতা-আবিষ্কার' দ্র কল্পনা ৭। ১৫২-৫৬

১৪৩-৪৭ 'সিরাজদ্দৌলা' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪৯৯-৫০১

১৫৪-৬৭ 'বাঙ্গালা বহুবচন' দ্র শব্দতত্ত্ব ১২। ৩৫৮-৬৭ ['বাংলা বহুবচন']

১৭৫-৮৪ 'প্রসঙ্গ কথা' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৫৪৯-৫৪

১৮৪-৯০ 'গ্রন্থ সমালোচনা' দ্র দেশ, শারদীয়া ১৩৮৩। ২১-২৩

> ১৮৪-৮৫ সাহিত্য চিন্তা। পূর্ণচন্দ্র বসু; ১৮৫-৮৭ ভারতবর্ষের ইতিহাস। হেমলতা দেবী [দ্র ইতিহাস। ১৫৪-৫৭]; ১৮৪-৮৮ বামাসুন্দরী বা আদর্শ নারী। চন্দ্রকান্ত সেন; ১৮৮-৮৯ শুশ্রূষা প্রথম ভাগ। শ্যামাচরণ দে; ১৮৯ বাসনা। বিনোদিনী দাসী; ১৯০ পুষ্পাঞ্জলি। রসময় লাহা ১৯০-৯২ 'সাময়িক সাহিত্য'
>
> ১৯০-৯১ প্রদীপ। বৈশাখ; ১৯২ উৎসাহ। ফাল্গুন-চৈত্র

‘পুত্রযজ্ঞ’ গল্পটির লেখক হিসেবে বার্ষিক সূচী-তে সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আছে। খামখেয়ালী সভায় পঠিত গল্পটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

‘জুতা-আবিষ্কার’ কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না, রচনার তারিখ হিসেবে শুধু ‘১৩০৪’ মুদ্রিত হয়েছে। এমন হতে পারে যে, অগ্র° ১৩০৪-এ ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’ কাব্যনাট্য রচনার সমসাময়িক কালে এটি রচিত হয়—উদ্ভট কল্পনা এবং ভাষা ও ছন্দের কারিগরিতে কৌতুক-কবিতাটি উক্ত কাব্যনাট্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু কবিতাটি পাঠ করে সাহিত্য-সম্পাদকের প্রতিক্রিয়াটিও কম কৌতুকের নয়: ‘...লেখকের বিদ্রূপরচনার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, কবির চেষ্টা ‘কমিক’ বটে!’[২৬]

‘সিরাজদ্দৌলা’ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-প্রণীত ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমালোচনা। এই গবেষণামূলক রচনাটির প্রথম কিস্তি রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাধনা-র ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; এরপর সাধনা বন্ধ হয়ে গেলে ভারতী-র অগ্র° ১৩০২-সংখ্যা থেকে চৈত্র ১৩০৩-সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় মাঘ ১৩০৪ [21 Jan 1898]-এ। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সিরাজদ্দৌলা সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির ইতিহাস যেভাবে বিকৃত করে পরিবেশন করছিলেন, তার বিরুদ্ধে কিছুদিন পূর্ব থেকেই রজনীকান্ত গুপ্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নিখিলনাথ রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা সোচ্চার হচ্ছিলেন। বাঙালির যথার্থ ইতিহাস রচনার যে আহ্বান বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন বঙ্গদর্শন-এ, এই-সব ঐতিহাসিকের রচনায় তা রূপ পেল। Gibbon-এর ‘দশ-বারো খণ্ডে বাঁধানো বৃহদাকার’ রোমের ইতিহাস পিতাকে পড়তে দেখে বালক রবীন্দ্রনাথ সেই অকারণ দুঃখবহনের কোনো অর্থ খুঁজে পান নি—কিন্তু পরিণত রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসগ্রন্থের মনোযোগী পাঠক ছিলেন, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত তাঁর ক্ষীণকায় গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যেও তার প্রমাণ পাওয়া শক্ত নয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র বন্ধুত্ব তাঁকে আরও ইতিহাসমুখী করে তুলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে তাঁর সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি। অক্ষয়কুমারের প্রচারে ও প্রয়োজনমতো তাঁর পক্ষসমর্থনে রবীন্দ্রনাথ এই কারণেই বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

বর্তমান সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রধানত সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে গ্রন্থটিকে বিচার করেছেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে যে যথেষ্টপরিমাণ ঐতিহাসিক উপন্যাসরস বা রোম্যান্স ছিল, প্রায় ‘রাজসিংহ’ উপন্যাস-সমালোচনার ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ তা অক্ষয়কুমারের ইতিহাস-গ্রন্থ থেকে নিষ্কাশিত করে এনেছেন। এক্ষেত্রে উভয় সমালোচনার বর্ণনাভঙ্গির সাদৃশ্যও লক্ষণীয়: ‘নিপুণ সারথি যেমন এককালে বহু অশ্ব যোজনা করিয়া রথ চালনা করিতে পারে, অক্ষয়বাবু তেমনি প্রতিভাবলে এই বহুনায়কসংকুল কুটিল দ্বন্দ্ববিবরণকে আরম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত সবলে অনিবার্যবেগে ছুটাইয়া লইয়া গিয়াছেন।’ কিন্তু ভাষা, ঘটনাবিন্যাস ও প্রমাণবিশ্লেষণের প্রশংসা করেও ‘কিঞ্চিৎ উদ্যম সহকারে’ সিরাজদ্দৌলার পক্ষ অবলম্বন করার জন্য তিনি অক্ষয়কুমারের বিরুদ্ধে ইতিহাস-নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছেন: ‘শান্তভাবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদৃঢ় প্রতিকূল সংস্কারের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া এবং প্রচলিত বিশ্বাসের অন্ধ অন্যায়পরতার দ্বারা পদে পদে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি স্বভাবতই এইরূপ বিচলিত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে সত্যের শান্তি নষ্ট হইয়াছে এবং পক্ষপাতের অমূলক আশঙ্কায় পাঠকের মনে মধ্যে মধ্যে ঈষৎ উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে।’

এই সংখ্যার 'প্রসঙ্গ কথা'য় রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্লেগ-রেগুলেশন যে উগ্রমূর্তি ধারণ করে নি তার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ঢাকার প্রাদেশিক সম্মেলনে যে ৫ নং প্রস্তাব তিনি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন, বস্তুত বর্তমান 'প্রসঙ্গ কথা'য় সেই বিষয়টিই আলোচিত হয়েছে। ইতিপূর্বে দেখা গেছে, কোনো বিষয়ে আন্দোলনকারী প্রজারা পাছে প্রশ্রয় পেয়ে যায় এই ভয়ে গবর্মেন্ট তাদের ন্যায্য দাবী পূরণেও কুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় প্লেগের আবির্ভাবে যখন দেখা গেল, বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর Sir John Woodburn পূর্বদেশীয় প্রজাদের পারিবারিক সংস্কারকে আহত না করার সংকল্প নিয়েছেন—তখন 'বুঝিলাম, বাংলাদেশে রাজার অভ্যুদয় হইয়াছে; এখানে রেগুলেশন-নামক এঞ্জিনের শাসন নহে, রাজার রাজ্য। ইহাতেই রাজভক্তি জাগিয়া উঠে। রাজার ইচ্ছা আমার ইচ্ছার সহিত একভাবে মিলিতে পারে ইহা জানিতে পারিলে রাজাকেও মনুষ্য বলিয়া প্রীতি করি এবং আপনার প্রতিও মনুষ্য বলিয়া শ্রদ্ধা জন্মে।' কিপ্‌লিং প্রভৃতি লেখকদের উপন্যাসে ভারতবর্ষ ও তার অধিবাসীদের যে বর্ণে চিত্রিত করা হচ্ছে এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের মধ্যে এ-দেশীয়দের বিরুদ্ধে ক্রমশই যে-একটা সাম্প্রদায়িক সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতবাসীর মনেও ইংরেজ ও ইংরেজি সভ্যতা সম্পর্কে একটা প্রতিকূল মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে—এ অবস্থার প্রতিকার করতে পারে উডবার্ন-প্রবর্তিত উদারনীতি। এ-বিষয়ে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'প্রজাবিদ্রোহ' নামে একটি অভিনব শব্দ উদ্ভাবন করে লিখলেন: 'আমরা ক্ষুব্ধ হইলে তাহা রাজবিদ্রোহ। কিন্তু রাজারা রুখিয়া থাকিলে তাহা কি প্রজাবিদ্রোহ নহে। উভয়েরই ফল কি রাজ্যের পক্ষে সমান অমঙ্গলজনক নহে।' এর পর তিনি শাসক ও সাধারণ ইংরেজের অনেকগুলি 'প্রজাবিদ্রোহ'-মূলক ঘটনার উল্লেখ করে ['আকাশবিহারী কবি' সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে কতখানি সচেতন ছিলেন ও তার দ্বারা আলোড়িত হতেন, এই ঘটনা-বর্ণনা তার অন্যতম প্রমাণ] সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন: 'যে-সকল ইংরেজ কথায় কথায় ঘুষা লাথি চড়, এবং শুয়র নিগর সম্ভাষণ প্রয়োগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত তাঁহারা প্রত্যহই ভারতবর্ষে কিপ্রকার বিপৎপাতের ভিত্তি রচনা করিতেছেন তাহা তাঁহারা জানেন না, এবং যে ইংরেজসমাজ এইরূপ রূঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতার বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার নৈতিক বাধা প্রদান করেন না তাঁহারা যে শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা ছেদনে প্রবৃত্ত।' উল্লেখ করা দরকার, রবীন্দ্রনাথ যখন এই-সব প্রবন্ধ লিখছেন তখন সিডিশন বিল আইনে পরিণত হয়েছে এবং পেশাদারী রাজনীতিকদের মার্জার-ধ্বনির পাশাপাশি এই 'কবি-কণ্ঠ' একেবারেই অন্যরকম লাগার কথা।

'গ্রন্থ সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথ এবার ছ'খানি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে দুটি গ্রন্থ ছাড়া আর কোনোটিরই তিনি বিশেষ প্রশংসা করতে পারেন নি, কিন্তু কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করেছেন। পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্য চিন্তা' সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: 'পূর্ণ বাবু আর্য্য সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সাহিত্য তুলনা করিয়া সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়াছেন।...কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, যে, যে সরস্বতী এতদিন বিশ্বজনের বিচিত্রদল হৃৎপদ্মের উপর বিরাজ করিতেছিলেন তিনি হঠাৎ অদ্য পূর্ণবাবুর কঠিন গণ্ডীটুকুর মধ্যে আসিয়া বাস করিতে সম্মত হইবেন কিনা।...সাহিত্যের কল্পনাসংসার এই বাস্তব সংসারের ন্যায় অসীম বিচিত্র এবং পরম রহস্যময়, তাহা কেবল মাত্র, একখণ্ড আর্য্যদের বেড়া-দেওয়া ধর্ম্মের ক্ষেত এবং আর এক খণ্ড অনার্য্যদের প্রবৃত্তির কাঁটাবন নহে।'

হেমলতা দেবীর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' সম্পর্কিত আলোচনাটি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের দিক দিয়েও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন: 'বাল্যাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গেও আনন্দের স্বাভাবিক স্ফুর্তি ও স্বাধীনতা

অত্যাবশ্যক। কিন্তু অবস্থাগতিকে পুরুষের হাতে বিদ্যাদানের ভার পড়িয়া জগতে বহুল দুঃখ এবং অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বালকের স্বাভাবিক মুগ্ধতার প্রতি পুরুষের ধৈর্য নাই, শিশুচরিত্রের মধ্যে পুরুষের সস্নেহ প্রবেশাধিকার নাই।...এইজন্য মানুষের বাল্যজীবন নিদারুণ নিরানন্দের আকর হইয়া উঠিয়াছে।...সমালোচ্য বাল্যপাঠ্যগ্রন্থখানি শিক্ষিতমহিলার রচনা বলিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি।...অধুনা আমাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোক উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষা যদি তাঁহারা মাতৃভাষায় বিতরণ করেন তবে বঙ্গগৃহের লক্ষ্মীমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সরস্বতীমূর্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে।' গ্রন্থকর্ত্রীর সরল ভাষা ও ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের একটি চেহারা দেখাবার প্রয়াসের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন: 'আমাদের মতে ইতিহাসের নামাবলী ও ঘটনাবলী মুখস্থ করাইবার পূর্বে আর্য-ভারতবর্ষ, মুসলমান-ভারতবর্ষ এবং ইংরেজ-ভারতবর্ষের একটি পুঞ্জীভূত সরস সম্পূর্ণ চিত্র ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। তবেই তাহারা বুঝিতে পারিবে ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতবর্ষ জিনিষটা কী। এমন-কি আমরা বলি, ভারতবর্ষের ভূগোল ইতিহাস এবং সমস্ত বিবরণ জড়াইয়া শুদ্ধমাত্র 'ভারতবর্ষ' নাম দিয়া একখানি বই প্রথমে ছেলেদের পড়িতে দেওয়া উচিত। পরে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস পৃথক্ ভাবে ও তন্ন-তন্ন-রূপে শিক্ষা দিবার সময় আসিবে। আমরা বোধ করি, ইংরাজিতে এরূপ গ্রন্থের বিস্তৃত আদর্শ সার উইলিয়ম হন্টারের ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার। এই সুসম্পূর্ণ সুন্দর পুস্তকটিকে যদি কোন শিক্ষিত মহিলা শিশুদের অথবা তাহাদের পিতামাতাদের উপযোগী করিয়া বাংলায় রচনা করেন তবে বিস্তর উপকার হয়।'

শ্যামাচরণ দে 'উপযুক্ত গ্রন্থ এবং সুচিকিৎসক বন্ধুর সাহায্যে' 'শুশ্রূষা' নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন, সেটিকে রবীন্দ্রনাথ 'বালিকামাত্রেরই...স্কুলপাঠ্য এবং পরীক্ষার বিষয় হওয়া উচিত' বলে সুপারিশ করেছেন। মেয়েরাও পুরুষদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করুক—জীবনের শেষ দিকে অবস্থার চাপে মেনে নিলেও—রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না। এখানেও সেই কথা লিখেছেন: 'আজকাল দুরূহ শিক্ষা প্রণালী, পরীক্ষা-প্রতিযোগিতা এবং জীবিকা চেষ্টায় পুরুষজাতির মধ্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রুগ্নসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, রোগী-পরিচর্য্যা বিদ্যাটা যদি আমাদের স্ত্রীগণ বিশেষরূপে শিক্ষা করেন তবে দেশটা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারে। তাঁহারাও যদি বাতিজ্বালিয়া রাত জাগিয়া আকণ্ঠ পড়া গিলিয়া পুরুষদের সহিত উর্ধ্বশ্বাসে বিদ্যা-বাহাদুরীর ঘোড়দৌড় খেলাইতে যান, দেহলতা জীর্ণ, মেরুদণ্ড নত এবং হরিণচক্ষু চষ্‌মাচ্ছন্ন করিয়া তোলেন তবে জয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়—কিন্তু পরাজয় আমাদের জাতীয় সুখস্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যের!'

বিনোদিনী দাসী-কৃত 'বাসনা' গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'বঙ্গ সাহিত্যের এক সময় গিয়াছে যখন স্ত্রীলোকের রচনামাত্রকেই অযথা উৎসাহ দেওয়া, সমালোচকগণ সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই সময়ে লেখিকা এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ করিলে কিঞ্চিৎ যশঃ সঞ্চয় করিতে পারিতেন।'

কতকগুলি চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সমষ্টি রসময় লাহা-বিরচিত 'পুষ্পাঞ্জলি' চেষ্টার লক্ষণহীন সরল সংযত সুকুমার মৃদু সৌরভের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করেছে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য: 'যদি এই সকল পুষ্পের মধ্যে ভবিষ্যৎ ফলের আশা থাকে, যদি লেখকের রচনা চিন্তার বীজ এবং ভাবের রসে ভরিয়া পাকিয়া উঠে তবেই তাহা সার্থক হইবে, নচেৎ আপন মৃদু গন্ধ ক্ষণকালের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিয়া ধূলিতে তাহার অবসান।'

অযথা শত্রুবৃদ্ধি হয় দেখে সাধনা পত্রিকায় এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই [ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯] রবীন্দ্রনাথ 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' বন্ধ করে দিয়েছিলেন, স্ব-সম্পাদিত ভারতী-তে আবার বিভাগটির প্রবর্তন করলেন 'সাময়িক সাহিত্য' নাম দিয়ে। বর্তমান সংখ্যায় তিনি বৈশাখ-সংখ্যা প্রদীপ ও ফাল্গুন-চৈত্র-সংখ্যা উৎসাহ-এ মুদ্রিত কয়েকটি রচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে 'বিজ্ঞান বা প্রকৃতির ইচ্ছা'-শীর্ষক একটি গদ্য রচনার মধ্যে অন্তঃসারশূন্য 'ভাবুকতার চেষ্টা ও চিন্তাশীলতার আড়ম্বর' তাঁর কাছে নিন্দনীয় হয়েছে, অন্য রচনাগুলি সম্পর্কে তিনি মোটামুটি প্রশংসামুখর। এর মধ্যে বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-রচিত 'লাল পল্টন' [প্রদীপ] ও 'অজ্ঞেয়বাদ' [উৎসাহ] তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে, অপাঠ্যতার কারণে নয়, সম্পাদকীয় আদর্শের বিচারে। তিনি লিখেছেন: 'আমাদের বিবেচনায় ধারাবাহিকরূপে গ্রন্থ প্রকাশ সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য নহে। সাময়িক পত্রে বিচিত্র খণ্ড প্রবন্ধ এবং সাময়িক বিষয়ের আলোচনায় পাঠকের চিত্তকে নানা দিকে সজাগ করিয়া রাখে। কোন শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বিস্তৃত বিষয়কে শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করা স্বভাবতই ইহার কাজ নহে। কারণ, বৃহৎ বিষয় অখণ্ড মনোযোগের দাবী রাখে, একক-সমগ্রতাই তাহার প্রধান গৌরব, নানা বিচিত্র বিষয়ের মাঝখানে তাহাকে টুক্‌রা করিয়া বসাইয়া দেওয়া অসঙ্গত। এইরূপে, গৌরবমান রচনাও তাহার লঘুপক্ষ সঙ্গীদের দ্রুতগামী জনতার মধ্যে পাঠকদের মনোযোগ হইতে ক্রমশই দূরে পিছাইয়া পড়িতে থাকে, এবং কথঞ্চিৎ অবজ্ঞার বিষয় হইয়া উঠে। ক্ষমতাপন্ন লেখকদের লেখায় এরূপ দুর্গতিসম্ভাবনা আমাদের নিকট অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিয়া মনে হয়। যাহাই হোক্, বৃহৎ গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রের মধ্যে একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকা কর্ত্তব্য।' উপন্যাস ছাড়া নিজের অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই নীতি মেনে চলেছেন [কৈশোর-রচনা 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' ছাড়া]—তাঁর ভ্রমণ-সাহিত্য জাতীয় যে রচনা সাময়িকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রতিটি কিস্তির মধ্যেই এক-ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে।

রবীন্দ্র-সম্পাদিত ভারতী-তে রচনার সঙ্গে লেখকের নাম প্রকাশিত হত না—প্রতি মাসে মলাটে সূচীপত্রের সঙ্গেও লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নি। ৬ বৈশাখ ১৩০৬ [18 Apr 1899] তারিখে প্রকাশিত ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫ যুগ্ম-সংখ্যার সঙ্গে মুদ্রিত বার্ষিক সূচীতে বর্ণানুক্রমিক রচনা-তালিকার সঙ্গে রচয়িতার নাম প্রদত্ত হয়েছে। এরই মধ্যে কয়েকটি রচনা তারকা-চিহ্নিত করে জানানো হয় যে, লেখকের নাম হারিয়ে গেছে। কিন্তু এই তালিকায় আরও কিছু রচনা আছে, যাতে লেখকের নাম বা কোনো চিহ্ন নেই। এগুলির নাম-রহস্য উদঘাটন করা কঠিন। লেখক নাম প্রকাশ করতে চান নি, কয়েকটি রচনার ক্ষেত্রে এমনও ভাবা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাহিত্যের সৌন্দর্য্য' [পৃ ১৩৬-৪০]-শীর্ষক যে রচনাটি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমরা এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি, তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সম্ভবত অন্যবিধ। রচনাটি আদিত্য নগেন্দ্র ও মন্মথ নামক তিন ব্যক্তির সাহিত্য-বিষয়ক সংলাপ, যা আমাদের পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এর 1 Oct 1889 [১৬ আশ্বিন ১২৯৬] তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী ও লোকেন্দ্রনাথ পালিতের মধ্যে আলোচনার 'নোট' 'Dialogue/Literature'-কে [দ্র রবীন্দ্রবীক্ষা ১। ২৪-২৬] স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত 'সাহিত্যের সৌন্দর্য্য' রচনাটি উক্ত 'নোট'-এরই সুসংস্কৃত রূপ—রবীন্দ্রনাথ এখানে 'আদিত্য' নাম-ধারণ করেছেন। উভয়ের সাদৃশ্যের একটি উদাহরণ নেওয়া যাক:

Dialogue: P. C. Guide booksএ খালি fact পাওয়া যায়—Book of travelsএ personal element আছে—আর তাইতেই literature হয়। impersonal informationএ science হতে পারে। literature হয়

না।

সাহিত্যের সৌন্দর্য্য: মন্মথ। গাইড্ বইয়ে কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ থাকে, ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভ্রমণকারী লেখকের ব্যক্তিগত প্রভাব বিদ্যমান, এবং তাহাতেই সাহিত্যের বিকাশ। ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জিত সমাচারমাত্র বিজ্ঞানে স্থান পাইতে পারে সাহিত্যে নহে।

—আমাদের অনুমান, পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথই ‘নোট’টির সুসংস্কৃত রূপ রচনা করেছিলেন, কিন্তু মূল আলোচনায় তিনজনের অংশ ছিল বলে রচনাটি লেখকের নামচিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি।

উৎসাহ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ [২।২]:

৪১ ‘ভিখারী’।/ভৈরবী—একতালা।/ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ দ্র কল্পনা ৭। ১৫৮; গীত ২। ২৮৪

১২ আশ্বিন ১৩০৪ তারিখে পতিসরে রচিত গানটি সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন: ‘কবিবর কি সম্প্রতি কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি অভিমান করিয়া হেঁয়ালি-উপদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ বিচিত্র অমর সঙ্গীতে বঙ্গভূমির কবিকুঞ্জ মুখরিত, তাঁহার সঙ্গীত-শিল্পের কি এই ক্রমবিকাশ? স্বাক্ষরের স্থলে রবীন্দ্র বাবুর নাম না থাকিলে, গানটি রবীন্দ্র বাবুর রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না।’[২৭]

বীণাবাদিনী [১।১১]:

৩০৪-০৯ মিশ্র-ভৈরোঁ—কাওয়ালি। তারে কেমনে ধরিবে সখি

৩০৯-১৩ ভৈরবী—একতালা। ওগগা কাঙ্গাল আমারে কাঙ্গাল করেছ

৩১৩-১৮ ইমন্-কল্যাণ—একতালা। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা তুমি আমার নিভৃত সাধনা

রবীন্দ্রনাথ ৩১ জ্যৈষ্ঠ [সোম 13 Jun] কলকাতা থেকে কালীগ্রাম রওনা হন, একথা আমরা আগেই বলেছি। ঢাকা প্রাদেশিক সম্মেলন থেকে শিলাইদহে ফিরে তাঁর কালীগ্রাম যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পারিবারিক বা বৈষয়িক কারণে কলকাতা যেতে হওয়ায় তাঁর ভ্রমণসূচী পরিবর্তিত হয়। ৯ আষাঢ় [বুধ 22 Jun] তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। পতিসর থেকে নাগর নদী পথে আত্রাই স্টেশনে আসার সময়ে ৭ আষাঢ় [সোম 20 Jun] তিনি ‘হতভাগ্যের গান’ [দ্র কল্পনা ৭। ১৪৮-৫২] কবিতাটির পরিবর্ধন করেন—মূল রচনাটি ৭ আশ্বিন ১৩০৪ তারিখের। অমল হোমের সৌজন্যে এই পরিবর্ধনের একটি পাণ্ডুলিপি-চিত্র রবীন্দ্র-রচনাবলী-সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এটিতে সুর-যোজনা করেছিলেন, কিন্তু ইন্দিরা দেবী কেবল প্রথম ছত্রটির সুর মনে আনতে পেরেছেন দ্র গীতবিতান—গ্রন্থপরিচয়। ৯৮৬।

এই দিন ‘নাগর নদী। আত্রাই পথে’ রবীন্দ্রনাথ ‘মাতার আহ্বান’ [দ্র কল্পনা ৭। ১৪৬-৪৭] কবিতাটিও রচনা করেন। স্বাদেশিকতার যে মানসিক আবহে এই সময়ে তিনি বাস করছিলেন, দেশজননীর আহ্বানের আকাঙ্ক্ষা সেখান থেকেই উৎসারিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ৯ আষাঢ় কলকাতায় এসে ২১ আষাঢ় পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। এর মধ্যে তিনি পার্ক স্ট্রীটে গেছেন ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮ ও ২১ তারিখে—১৮ তারিখে সত্যপ্রসাদও তাঁর সঙ্গে যান—তাছাড়া কোনো কোনো দিনের গাড়িভাড়ার পরিমাণ দেখে মনে হয় তিনি সপরিবারে পিতার কাছে গিয়েছিলেন। এই

সময়ে তিনি পরিবার-সহ শিলাইদহে বসবাস করবার আয়োজন করছিলেন, তারই কিছু ব্যস্ততা তখন ছিল। তারই মধ্যে জোড়াসাঁকোয় নিজের বাড়ি তৈরি শুরু হয়েছে, ২১ আষাঢ় লোকেন্দ্রনাথ পালিতের কাছ থেকে ৫০০ টাকা ধার করে নীতীন্দ্রনাথকে দিয়েছেন 'বাটী তৈরী হিসাবে'। ধার না করে উপায় ছিল না, বাড়ি তৈরি বাবদ পিতার কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিলেন তিনি তা লগ্নী করেছিলেন ঠাকুর কোম্পানির ব্যবসায়ে। ২৯ আষাঢ় [মঙ্গল 12 Jul] তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহির একটি হিসাবে দেখা যায়, তখন পর্যন্ত তাঁর 'পাওনা'—ঠাকুর কোম্পানির কাছে ১৬২৫০৲ শিকদার কোম্পানির কাছে ৪০০০৲ ও বিহারীচরণ সেনের কাছে ২০০৲ —মোট সুদ পাওনা আছে ৩৯৬ ০/। লোকেন্দ্রনাথের ঋণ তিনি পরিশোধ করেন ১৫ শ্রাবণ 30 Jul] তারিখে।

২১ আষাঢ় [সোম 4 Jul] রবীন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকে নিয়ে শিলাইদহ রওনা হন। এবারে তাঁর সেখানে যাওয়ার কারণ বিরাহিমপুর পরগণায় অবস্থিত জমিদারির পুণ্যাহ-অনুষ্ঠান। জন্মভূমি পত্রিকায় 'কবিকেশরী'-লেখক এ-বিষয়ে লিখেছেন:

'এই বৎসর শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এষ্টেটে তাঁহার সুসংস্কৃত ব্রাহ্মবিধান মতে পুণ্যাহের কার্য্য প্রথম আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের জমিদারী নদীয়ার অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগণায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অতি সমারোহের সহিত শুভ পুণ্যাহ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ২৩শে আষাঢ় [বুধ 6 Jul] এই শুভ পুণ্যাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ অনুবাদক এবং "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক,—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় শুভ পুণ্যাহ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

আচার্য্যের কর্ম্ম সমাধান হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয় কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পীড়া সহসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ পীড়ার ভীষণ যন্ত্রণায় বিদ্যরত্ন মহাশয় জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ...অন্তিমকালে ব্রাহ্মণের অতি প্রিয় পুঁথিগুলির কথা স্মরণ হইল। তিনি অতি কষ্টে বলিলেন, "রবি দাদা! আমি তো চলিলাম, আমার সকলই তোমরা জান। তবে আমার একটী প্রার্থনা এই যে, আমার কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি ও পুস্তক আছে; সেইগুলি যাহাতে আমার ছাত্র ও পুত্রপ্রতিমের হস্তগত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিও।" এই কথা বলিতে বলিতে বিদ্যারত্ন মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রবীন্দ্রনাথ ভাল ডাক্তার-বৈদ্যহীন দেশে তাঁহাকে লইয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িলেন।...নিজের প্রাণাধিক পুত্রের কি পরিবারস্থ অন্য কাহারো ব্যারাম হইলে, তিনি বিচলিত হয়েন না। সে সময় তাঁহার ধীর ও শান্ত প্রকৃতি অতুলনীয়। কিন্তু অপর কোন আশ্রিত ব্যক্তির পীড়া হইলে তাঁহার অস্থিরতালক্ষণ প্রকাশ পায়। উদ্যম ও অধ্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া আমন্ত্র থাকিয়া মনে প্রাণে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। এবং ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য কুমারখালিতে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসাগুণে বিদ্যারত্নের ক্রমশঃ রোগের উপশম হইতে লাগিল। শেষে তিনি রোগমুক্ত হইলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, "রবি দাদার অসামান্য গুণপণা সন্দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তিনি চাকর-মুনিব সম্পর্ক ভুলিয়া আমার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। অধিক কি, রবিদাদা সেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম না করিলে, বৃদ্ধের হাড় কয়খানা পদ্মাতেই রাখিয়া আসিতে হইত। রবিদাদা আমাকে যমের দক্ষিণ দ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন।"[২৮]

'মানুষ' রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রটি অতুলনীয়। নিতান্ত অপরিচিত অসুস্থ পথচারীকে ঘরে তুলে নিয়ে এসে তার সেবা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এমন ঘটনাও দুর্লভ নয়।

আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী [২২৩] প্রকাশিত হয় 12 Jul [মঙ্গল ২৯ আষাঢ়]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়:

১৯৩-২০৫ 'ডিটেকটিভ' দ্র গল্পগুচ্ছ ২১।২০৯-১৭

২০৬-০৮ 'বর্ষামঙ্গল' দ্র কল্পনা ৭।১২২-২৪

২৩৭-৩৮ 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' দ্র কল্পনা ৭।১৪৭-৪৮

[২৪৮-৫৭ 'প্রাদেশিক সভার উদ্বোধন']

২৭৪-৮১ 'প্রসঙ্গ কথা'

২৮২-৮৮ 'সাময়িক সাহিত্য'

২৮২-৮৫ নব্যভারত। বৈশাখ; ২৮৫-৮৭ প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ; ২৮৭-৮৮ উৎসাহ। বৈশাখ; ২৮৮ নির্ম্মাল্য। জ্যৈষ্ঠ

'ডিটেকটিভ' গল্প ও 'বর্ষামঙ্গল' [১৭ বৈশাখ ১৩০৪] কবিতা দু'টিই রবীন্দ্রনাথের পুরোনো রচনা ও দু'টিই খামখেয়ালী সভায় পঠিত হয়, একথা আমরা আগেই বলেছি।

'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, মুদ্রিত কবিতার নীচে রচনা-কাল হিসেবে মাত্র '১৩০৪' মুদ্রিত। এই কাল-নির্দেশ যদি ঠিক হয়, তাহলে সম্ভবত নাটোর প্রাদেশিক সম্মেলনের পরে কবিতাটি রচিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ-কথিত 'চাঁই'দের পোশাক আশাক ও মানসিকতার প্রতি বিদ্রূপ কবিতাটিতে পরিলক্ষিত হয়।

'প্রাদেশিক সভার উদ্বোধন' ঢাকা প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি বক্তৃতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত মর্ম্মানুবাদ। প্রারম্ভিক সম্পাদকীয় টীকায় তিনি লিখেছেন: 'ইহাতে মূল বক্তৃতার অসামান্য গাম্ভীর্য্য নৈপুণ্য ও তেজ, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করিবার দুরাশা পরিত্যাগ করিয়াছি কেবল তাঁহার প্রধান বক্তব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে,—আশা করি, পাঠকগণ ইহা হইতে সংক্ষেপে আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতির অবস্থা ও আমাদের রাজনৈতিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবেন।'

এবারের 'প্রসঙ্গ কথা'য় দুটি অংশ আছে—আমরা আগেই বলেছি, ঢাকা সম্মেলন নিয়ে লেখা প্রথমাংশটি [পৃ ২৬৬-৭৪] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের রচিত—দ্বিতীয় অংশটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। এই একই বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পৌষ-সংখ্যা প্রদীপ-এ [পৃ ২-৫] 'মন্দিরাভিমুখে' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন, তবে দুটি প্রবন্ধের স্বাদ আলাদা।

গণপত কাশীনাথ ম্হাত্রে [ম্হাত্রে, 1876-1947]* নামক বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ের একটি দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয় ছাত্র প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে 'মন্দিরাভিমুখে' [To the Temple, প্রদীপ-এ নামকরণ 'মন্দিরপথবর্ত্তিনী'] নামে একটি নারীমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। এই মূর্তির সম্মুখ ও পার্শ্বের দু'টি ফোটোগ্রাফ ভারতশিল্পের বিশিষ্ট পণ্ডিত Sir George Birdwood-এর কাছে পাঠিয়ে ছাত্রটির য়ুরোপে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছিল। য়ুরোপীয় কলাবিদ্যা না শিখেই গ্রীক ভাস্কর্যের চরমোন্নতিকালীন রচনার সঙ্গে তুলনীয় একটি মূর্তি সৃষ্টির জন্য প্রভূত প্রশংসা করে Sir Birdwood ম্হাত্রেকে তাঁর ক্ষমতার পূর্ণবিকাশের পূর্বে বিলেতে পাঠাতে নিষেধ করেন, 'কারণ য়ুরোপীয় শিল্পের অনুকরণে ভারতবর্ষের বিশেষ শ্রী, বিশেষ প্রাণটুকু অভিভূত হইয়া যাইতে পারে।'

বোম্বাই আর্ট স্কুলে য়ুরোপীয় শিক্ষকদের কাছে তালিম-প্রাপ্ত ম্হাত্রের প্যারিস-প্লাস্টারে নির্মিত মূর্তিকে ফোটোগ্রাফ দেখে প্রস্তরমূর্তি বলে ভুল করার জন্য চিজ্‌হলম্ নামধারী একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এলাহাবাদের *The Pioneer* পত্রিকায় বার্ডবুর্ডের সমালোচনা করেন ও 'ম্হাত্রে রচিত মূর্ত্তির গুণপনা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়া তাহাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।'

এবং এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের দেশাভিমান আহত হয়েছে। শিল্প সম্বন্ধে আধুনিক ভারতীয়দের শিক্ষা অসম্পূর্ণ একথা মেনে নিয়েও বার্ডবুড-সম্পাদিত *The Journal of Indian Arts and Industries* পত্রিকায় উল্লিখিত ফোটোগ্রাফ-দু'টি [পৌষ-সংখ্যা প্রদীপ-এ এ-দুটির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে] দেখে তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন এই ভাষায়: 'এই চিত্রটি দেখিতে দেখিতে আমাদের বহুকালের বুভুক্ষিত আকাঙক্ষা প্রতিক্ষণে

চরিতার্থতা লাভ করিতে থাকে। সহসা বুঝিতে পারি যে, আমরা ভারতবর্ষীয় নারীরূপের একটী আদর্শকে মূর্ত্তিমান দেখিবার জন্য এতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সৌন্দর্য্যকে আমরা লক্ষ্মীরূপে সরস্বতীরূপে অন্নপূর্ণারূপে অন্তরে অনুভব করিয়াছি, কিন্তু কোন গুণীশিল্পী তাহাকে অমর দেহদান করিয়া আমাদের নেত্রসম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন নাই।...ম্হাত্রেরচিত মূর্ত্তির ছবিখানি দেখিলে মনে হয়, সে শুদ্ধশুচি ভক্তিমতী হিন্দুনারী চিরদিন মন্দিরের পথে গিয়াছে এবং চিরদিন মন্দিরের পথে যাইবে, এ সেই নামহীন জন্মহীন মৃত্যুহীন রমণী—ইহার সম্মুখে কোন্ এক অদৃশ্য নিত্য তীর্থ দেবালয়, ইহার পশ্চাতে কোন এক অদৃশ্য নিত্য গৃহ-প্রাঙ্গণ।'

ম্হাত্রে-রচিত মূর্তির মধ্যে গ্রীসীয় শিল্পকলার ছায়াকে রবীন্দ্রনাথ দোষণীয় মনে করেন নি। ইতালীয় ভাব-আন্দোলনের সংঘাতে উদ্ভূত শেক্স্পীরীয় যুগের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি 'আমাদের মনকেও সুগভীর নিশ্চেষ্টতা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য একটি নূতন এবং প্রবল ভাবপ্রবাহের সংঘাত'-এর আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর ফল সর্বদা শুভ ও শোভন হয় না, প্রথমে বাহ্য অনুকরণের প্রাবল্য ঘটে—'কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের লক্ষ্মী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে, অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি আনিবে—এবং সেই বিদেশী বন্যায় আনীত পলিমাটির ভিতর দিয়া দ্বিগুণ তেজে আপনারই শস্যগুলিকে অঙ্কুরিত, পুষ্পগুলিকে বিকশিত, ফলগুলিকে পরিণত করিয়া তুলিবে।' বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্রগুলি এরই উদাহরণ।

কিন্তু এর জন্য দেশের মাটিতে যেমন শিকড় নামানো দরকার, উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনও তেমনই। সেইজন্য তিনি দরিদ্র ছাত্র ম্হাত্রের য়ুরোপীয় শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের জন্য দেশীয় ধনীদের আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন: 'সকল বিদ্যারই যে একটি বাহ্য অংশ আছে তাহাকে একান্ত আয়ত্ত করিতে পারিলে তবেই তাহাকে স্বাধীন ব্যবহারের স্বকীয় ভাবপ্রকাশের অনুকূল করা যায়। ভাস্কর্যবিদ্যার বাহ্য নিয়ম কৌশল এবং কারিগরীটুকু যখন ম্হাত্রের অধিকারগত এবং অনায়াসগম্য হইবে, তখন তাঁহার স্বদেশীয় প্রতিভা স্বাধীন সঞ্চরণের প্রশস্ত ক্ষেত্র লাভ করিবে, নতুবা তাঁহার রচনায় যখন-তখন পরকীয় আদর্শের ছায়া আসিয়া পড়িবে এবং তিনি অনুকরণবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না।'

প্রসঙ্গত বিদেশে শিল্পশিক্ষারত দুজন বাঙালি ছাত্রের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। ইটালিতে শিল্প অধ্যয়নে নিযুক্ত এবং অর্থাভাবে অনাহারে দুরারোগ্য রোগে মৃত 'রুক্মিনীকান্ত নাগ' *সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: 'আমাদের এই শিল্পদরিদ্র দেশের পক্ষে এ মৃত্যু যেমন লজ্জাজনক তেমনি শোকাবহ।' অপর জন কলকাতা আর্ট স্কুলের ক্ষমতাশালী ছাত্র 'শশিভূষণ হেষ' [শশীকুমার হেশ, 1869-?]-এর বিদেশী শিক্ষার ব্যয়ভার মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী বহন করেছেন বলে তিনি বঙ্গদেশের হয়ে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। 1900 খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি দেশে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যতম পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এই 'প্রসঙ্গ কথা'টি সম্পর্কে এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হল, এটি সম্পর্কে আলোচনা দূরে থাকুক, এটির কথা কেউ উল্লেখ করেন নি বলে। অথচ রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধ, দেশীয় শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ও উপযুক্ত শিল্পীদের মর্যাদাদানের জন্য তাঁর আগ্রহ রচনাটির প্রতি ছত্রে ব্যক্ত হয়েছে। এইরূপ রচনা সহজলভ্য না হওয়ায় আমাদের রবীন্দ্রপরিচয়ে অনেক শূন্যতা থেকে গেছে।

এই সংখ্যার 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক নিষ্ঠুর আঘাত করেছেন নব্যভারত-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর নববর্ষীয় প্রবন্ধ 'কি চাই কি পাই?' সম্পর্কে। এর আগেও তিনি জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯-সংখ্যা সাধনা-য় নব্যভারত-সম্পাদকের 'পুরাতন ও নূতন' প্রবন্ধের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৩। ২১৭], কিন্তু এবারের আক্রমণ কঠোরতর। প্রবন্ধটি থেকে দীর্ঘ দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে তিনি পরিশেষে লিখেছেন: 'এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের নিকট আমাদের একটি মিনতি আছে। যদিও তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশি তথাপি বিস্ময়সূচক বা প্রবলতাসূচক তিলকচিহ্নগুলি (!) স্থানে স্থানে দ্বিগুণীকৃত করিয়া কোন লাভ নাই। উহাকে লেখার মুদ্রাদোষ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার চিহ্নকে [যদ্দৃষ্টং] একাধিক করিয়া তুলিলে কোথাও তাহার সীমা স্থাপন করা যায় না। ভাবিয়া দেখুন কোন একটি নব্যতরভারত সম্পাদকের হৃদয়োচ্ছ্বাস যদি দুর্দ্দৈবক্রমে দ্বিগুণতর হয় তবে তিনি "কি তীব্র অভিজ্ঞতা" লিখিয়া তাহার পশ্চাতে চারটি!!!! তিলক চিহ্ন বসাইতে পারেন—এবং এইরূপ রোখ চড়িয়া গেলে ক্রমে ভাষার অপেক্ষা ইঙ্গিতের উপদ্রব বাড়িয়া চলিবে। একথা সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহার ভাষাই যথেষ্ট, তাঁহার ভঙ্গিমাও সামান্য নহে, তাহার পরে যদি আবার মুদ্রাদোষ যোগ করিয়া দেন, তবে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে কিছু অধিক হইয়া পড়ে!' অসূয়াহীন বিদ্রূপ কত তীব্র হতে পারে এটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রদীপ-এ মুদ্রিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নবদ্বীপ' কবিতা সম্পর্কে তিনি আবার প্রশংসামুখর: 'কবিতাটি একদিকে সহজ এবং ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ অপরদিকে গম্ভীর এবং ভক্তিরসার্দ্র; একত্রে এরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন যেমন দুরূহ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে ভাষা ছন্দ এবং মিলের প্রতি কবির অনায়াস অধিকার পদে পদে সপ্রমাণ হইয়াছে।' 'ওয়েল্‌স্‌-কাহিনী' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন: 'আমাদের দেশের উড়িয়া, আসামী ও বেহারীগণ যদি সামান্য অন্তরায়গুলি নষ্ট করিয়া ভাষা ও সাহিত্যসূত্রে বাঙ্গালীর সহিত মিশিতে পারে তবে বাঙ্গালী জাতির অভ্যুত্থান আশাজনক হইয়া উঠে'—এই বক্তব্য কিছুদিনের মধ্যে, অন্তত অসমীয়াদের দিক থেকে, বিতর্কমূলক হয়ে ওঠে।

বৈশাখ-সংখ্যা উৎসাহ-তে মুদ্রিত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'পুণ্যাহ' ও নিখিলনাথ রায়ের 'জগৎশেঠ' রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে—সুলিখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ক্রমশই তাঁর চিত্তকে আকর্ষণ করছে এটি তার অন্যতম প্রমাণ। এরই পরিণতি ইতিহাস-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রকাশের জন্য অক্ষয়কুমারকে উৎসাহদানে।

কিশোরীমোহন সাঁতরাকে 1 Oct 1938 [১৪ আশ্বিন ১৩৪৫] তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: '১৩০৫-এর কীটদষ্ট ভারতী আমার হাতে এল। এটা আমার সম্পাদিত এবং অধিকাংশ লেখাই আমার রচনা। আমার পাঠ-প্রচয় প্রভৃতি টেক্‌স্‌ট বইয়ে এর অনেকগুলো লেখার ভাষা সহজ করে ব্যবহার করা যেতে পারে। তালিকা দেওয়া গেল'। তালিকায় তিনি নিজস্ব রচনা 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'বিদ্যাসাগর'-এর সঙ্গে 'লাপ্লাটার প্রাণীতত্ত্ববিৎ ২২৬ (বোধ হয় আমার)' ও 'ভারত আবিষ্কার (আমার) বোধ হয়' বলে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত ভারতী-টিতে নিশ্চয়ই সূচীপত্র ছিল না, নইলে তিনি দেখতেন, বর্তমান আষাঢ়-সংখ্যায় মুদ্রিত 'লাপ্লাটার প্রাণীতত্ত্ববিৎ,' [পৃ ২২৬-৩৭] রচনাটি প্রিয়ম্বদা দেবীর ও কার্তিক-সংখ্যায় মুদ্রিত 'ভারত-আবিষ্কার' [পৃ ৫৮৪-৯১] রচনাটি গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর লেখা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে মুদ্রিত রচনাগুলির প্রচুর সংস্কার করতেন, কোনো কোনোটি তো পুনর্লিখিত হত। হয়তো এই কারণেই রচনা-দুটি

তাঁর নিজের বলে মনে হয়েছিল। প্রিয়ম্বদা দেবীর রচনাটি W. H. Hudson [1841-1922]-এর *The Naturalist in La Plata* ও *Idle Rambles in Patagonia* [1893] অবলম্বনে লিখিত। বই-দু'টি রবীন্দ্রনাথেরও প্রিয় ছিল; প্রথম বইটি তিনি রথীন্দ্রনাথ ও মাধুরীলতাকে পড়ে শোনাতেন, দ্বিতীয়টির উল্লেখ আছে প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৭৬-সংখ্যক পত্রে। রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি'-তে [পৃ ১৫৬-৫৭] লিখেছেন: 'সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের মধ্যে ডব্লিউ এইচ. হাডসন সম্বন্ধে বাবার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। মনে পড়ে দিদি আর আমি যখন বেশ ছোটো ছিলাম, আমাদের ইংরেজি জ্ঞান ছিল যৎসামান্য, বাবা হাডসনের ভ্রমণকাহিনী থেকে বাছাবাছা অংশ আমাদের পড়ে শোনাতেন। হাডসনের রচনার মধ্যে বাবার বিশেষ প্রিয় বই ছিল *The Naturalist in La Plata* ও *Green Mansions*।' পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক কবি সতীশচন্দ্র রায় [1882-1904]কে রবীন্দ্রনাথ আলমোড়া থেকে রবিবার' [৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০: 17 May 1903] একটি পত্রে লেখেন: 'Naturalist in Laplata পড়িতেছ শুনিয়া বড় খুসি হইলাম। ঐ বইটি পড়িয়া আমি নিবিড় আনন্দ পাইয়াছি। কোন ইংরাজি বইয়ে আমি প্রকৃতির সঙ্গে লেখকের এমন আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা খুঁজিয়া পাই নাই। ...প্রকৃতিদেবীর অন্তঃপুরের মধ্যে এমন করিয়া আত্মীয়তার সম্বন্ধ পাতাইবার ক্ষমতা সকলের নাই। ইংরাজের মধ্যে বোধ করি এই একটি লোককে পাইলাম।'

রবীন্দ্রনাথ ২৯ আষাঢ় [মঙ্গল 12 Jul] একবার কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন কিনা নিশ্চিত করে বলা শক্ত, কিন্তু এই দিন সরকারী ক্যাশবহিতে 'শিবধন বিদ্যার্ণবের নিকট রবীন্দ্রবাবুর চিঠি'র হিসাব পাওয়া যায় —তিনি ২২ আষাঢ় বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে কালীগ্রামে পুণ্যাহ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ৩ শ্রাবণ [সোম 18 Jul] 'শ্রীরবীন্দ্র বাবুর নিকট পত্র পাঠান টীকেট' হিসাব থেকে তাঁর শিলাইদহে অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। ৫ ও ৮ তারিখেও তাঁর কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে, এগুলি সবই পারিবারিক চিঠি—কিন্তু ১০ শ্রাবণ সরকারী তহবিল থেকে 'শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সিলাইদহে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম' পাঠানো হয়, তিনি 'সেয়ালদহার ষ্টেসেন হইতে বাটী (বিরাহিমপুর হইতে আগমন করেন) ১৩ শ্রাবণ' [বৃহ 28 Jul] তারিখে।

ভারতী-র জন্য লেখা-সংগ্রহ, মুদ্রণ-ব্যবস্থা ইত্যাদির ভার হিরণ্ময়ী দেবীর উপর থাকলেও রবীন্দ্রনাথও যে পরিচিত মহলে লেখার জন্য দরবার করতেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫-এর চিঠিতে তার দৃষ্টান্ত আছে। আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ৮ শ্রাবণ [শনি 13 Jul] শিলাইদহ থেকে শিবনাথ শাস্ত্রীকে লেখা চিঠিতে: 'নিজের জীবনবৃত্ত লিখিতে আপনি যখন অনিচ্ছুক, তখন আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলাম। এক্ষণে অবসরমত ভারতীর জন্য মাঝে মাঝে কিছু প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহায্য করিলে বাধিত হইব। বঙ্গসাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবে না—কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে।' রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ধারাবাহিকভাবে আত্মজীবনী লেখার জন্য শিবনাথকে অনুরোধ করেন নি, আষাঢ়-সংখ্যায় মুদ্রিত রাজনারায়ণ বসুর 'আমার ছাত্রাবস্থা' [পৃ ২০৮-১৯]-জাতীয় কোনো 'জীবনবৃত্ত' তাঁর প্রার্থিত ছিল। যাই হোক, রবীন্দ্র-সম্পাদিত ভারতী শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছ থেকে কোনো লেখা পায় নি। 11 Apr 1899 [মঙ্গল ২৯ চৈত্র] শিবনাথ তাঁর নবপ্রকাশিত উপন্যাস 'নয়নতারা' রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে মতামত জানিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু ভারতী-র সম্পাদনার দায়িত্ব পরিত্যাগ করায় তাঁর মতামত মুদ্রিত

হওয়ার সুযোগ পায় নি। তাঁর কাছ থেকে গ্রন্থটি পেয়ে সরলা দেবী তার সমালোচনা করেন কার্তিক ১৩০৬ [পৃ ৬৫০-৫৭]-সংখ্যা ভারতী-তে।

১৩ শ্রাবণ কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ ১৮ তারিখ পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তাঁর পার্ক স্ট্রীট যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায় ১৩, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ তারিখে—গাড়িভাড়ার পরিমাণ থেকে বোঝা যায় ১৭ ও ১৮ শ্রাবণ তিনি সপরিবারে সেখানে গিয়েছিলেন; ১৫ ও ১৬ শ্রাবণ তাঁরা বালিগঞ্জের আত্মীয়দের সঙ্গেও দেখা করে আসেন, সত্যেন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবী তখন বালিগঞ্জে বাড়ি করে সেখানেই বাস করছেন।

রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহে যাত্রা করেন ১৯ শ্রাবণ [বুধ 3 Aug] তারিখে। মৃণালিনী দেবী ও তাঁর সন্তানদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র নীতীন্দ্রনাথের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। তিনিও এই দিন তাঁদের সঙ্গে শিলাইদহে যান—'নীতিন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহ গমনাগমনের ব্যয় ১৯ শ্রাবণের' এরই হিসাব।

গোরাই ও পদ্মার সঙ্গমের কাছে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে তৈরি নীলকুঠি আগে ছিল ঠাকুর-এস্টেটের কাছারিবাড়ি। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে যখন শিলাইদহে গিয়েছিলেন, তখন এই তেতালা কুঠিবাড়িতেই বাস করেছেন। খামখেয়ালি পদ্মা হঠাৎ এই বাড়ির দিকে পাড় ভাঙতে শুরু করলে, রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বাড়িসুদ্ধ নদীগর্ভে যাবে এই ভয়ে বাড়িটা আগে থেকেই ভেঙে ফেলা হল। তার মালমশলা নিয়ে নদী থেকে খানিকটা দূরে আর-একটা কাছারি ও কুঠিবাড়ি তৈরি করা হয়। আমরা যখন শিলাইদহে গেলুম—এই নতুন বাড়িতে বাস করতে লাগলুম।'[২৯]

এখানকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'শিলাইদহে আমরা যে পরিবেশের মধ্যে এসে বাস করতে লাগলাম, কলকাতার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধারা থেকে তা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের বাড়ি খোলা মাঠের মধ্যে; খরসেদপুর গ্রাম, কাছারিবাড়ি বা শিলাইদহের ঘাট থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। বাবা মা ও আমরা পাঁচ ভাইবোন বাড়িতে থাকি। আমার ছোটোবোন রানী ও মীরা আর ছোটোভাই শমী তখনো নিতান্ত শিশু। এই নির্জনতার মধ্যে দিদি আর আমি বাবা ও মাকে আরো কাছাকাছি পেলুম। বাবা তখন আমাদের দুজনকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন।'[৩০]

নিজের নিরানন্দ ছাত্রজীবনের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রকন্যাদের কাউকেই প্রথাগত বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন নি। প্রথমে বাড়িতেই বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রতিবেশী কিছু বালক-বালিকার সঙ্গে মাধুরীলতা ও রথীন্দ্রনাথের পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিলাইদহে পরিবার সরিয়ে নিয়ে আসার ভাবনা যখনই তাঁর মনে এসেছে তখন থেকেই সেখানকার গৃহ-বিদ্যালয়ের কথা তাঁকে নতুন করে ভাবতে হয়েছে। গত এপ্রিল মাসে মিঃ লরেন্স নামক একজন ইংরেজকে তিনি গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহির ১৫ বৈশাখের [27 Apr 1898] হিসাবে আছে: 'বঃ মিঃ লরেঞ্চ সাহেব দং উঁহার এপ্রিল মাসের বেতন শোধ··· ৩০্'—লরেন্সের বেতন ছিল মাসিক ৫০ টাকা, সুতরাং তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন উক্ত মাসের মাঝামাঝি। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'ইংরেজির জন্য একজন খাঁটি ইংরেজকেই পাওয়া গেল। দেশ-বিদেশ ঘুরে ফিরে তিনি ভারতবর্ষেই থেকে যান। তাঁর নাম ছল মিস্টার লরেন্স। তিনি পড়াতেন খুব ভালো—তাঁর হাতে ইংরেজিভাষার গোড়াপত্তন আমাদের পাকারকমের হল। কিন্তু লোকটি মজার—পাগলাটে-গোছের ছিলেন।'[৩১] 'কবিকেশরী'-লেখক এঁর বর্ণনায় লিখেছেন: 'বয়স কিঞ্চিৎ উর্ধ্ব পঞ্চাশৎ বর্ষ। সাহেবপুঙ্গব বড় সরল,

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং মিষ্টভাষী। সাহেবের কোনো কোনো দোষ থাকিলেও তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার গুণে রবীন্দ্রনাথ তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করেন; অধিকন্তু তাহার সকল আব্দার রক্ষা করিয়া থাকেন।'[৩২] রবীন্দ্রনাথও তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৩৩]

শিবধন বিদ্যার্ণব নিয়োজিত হয়েছিলেন সংস্কৃত শেখানোর কাজে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'শিবধন বিদ্যার্ণব যদিচ শ্রীহট্টের টোলে-পড়া পণ্ডিত, তাঁর সংস্কৃত-উচ্চারণ বিশুদ্ধ ছিল। মহর্ষির মতো বাবাও বাঙালি-ধরনের সংস্কৃত উচ্চারণ পছন্দ করতেন না। শিবধন বিদ্যার্ণবের কাশীর পণ্ডিতদের মতোই বিশুদ্ধ উচ্চারণ দেখে বাবা তাঁকে আমাদের সংস্কৃত পড়াবার জন্য রাখলেন।'[৩৪] তাছাড়া রথীন্দ্রনাথের জন্য Geography, Grammar, Dictionary [২৫ জ্যৈষ্ঠ], গ্লোব, য়ুরোপের ম্যাপ [২৭ জ্যৈষ্ঠ] প্রভৃতি কেনার হিসাব থেকে তাঁর জন্য বিবিধ শিক্ষার আয়োজনটিও বুঝে নেওয়া যায়। কিছু পূর্বে 'রথীন্দ্রবাবুর জন্য কাঠের মুগুর' [১৩ চৈত্র ১৩০৪] কেনার হিসাবও পাওয়া যায়—পুত্রের স্বাস্থ্যচর্চার দিকটিও পিতার কাছে উপেক্ষিত হয় নি। 'ঘোড়ায় চড়া, মাছ-ধরা, নৌকা বাওয়া, লাঠি-সড়কি খেলা, সাঁতার-কাটা ইত্যাদি সবরকম খেলাধুলা দৌড়ঝাঁপ করার' স্বাধীনতা যে তাঁর ছিল, সেকথা রথীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন।[৩৫]

সন্তানদের বাংলাশিক্ষার গোড়াপত্তন করে দেওয়ার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজেই গ্রহণ করলেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'বাবা নিজেই আমাদের বাংলা পড়াতে লাগলেন। দিদি তবু একটু বাংলা শিখেছিলেন, আমি তখন নিতান্তই অজ্ঞ। কিন্তু বাবা তা অগ্রাহ্য করে ভালো ভালো কবিতা শুনিয়ে আমাদের মুখস্থ করতে দিতেন, বুঝি আর নাই বুঝি। অল্পবয়সের ছেলেমেয়েদের নীরস ও আধোআধো ভাষায় লেখা ছেলেমানুষী পাঠ্যপুস্তক পড়তে হবে তা তিনি পছন্দ করতেন না। সুখপাঠ্য সত্যিকার সাহিত্য তাদের গোড়া থেকেই পড়ানো উচিত বলে তিনি মনে করতেন। সবটা প্রথমে বুঝতে না পারলেও, শুনতে শুনতে পড়তে পড়তে আপনা থেকেই বুঝবে।'[৩৬] রথীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে 'কথা' [১৩০৬: 1900] কাব্যগ্রন্থের কবিতা মুখস্থ করার কথা বলেছেন, কিন্তু সে কিছুকাল পরের কথা—কিন্তু ১৬ ভাদ্র [31 Aug] কলকাতার সিটি বুক সোসাইটি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ দুর্গেশনন্দিনী দেবীচৌধুরাণী ও ২৫ ভাদ্র [9 sep] চন্দ্রশেখর কিনে শিলাইদহে পাঠানোর যে সংবাদ পাওয়া যায়, আমাদের ধারণা, তা মাধুরীলতা ও রথীন্দ্রনাথের জন্যই কেনা হয়েছিল—এই-সব বই ছোটোদের পড়তে দিতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সিটি বুক সোসাইটি [প্রতিষ্ঠা: 1896] প্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের [1866-1937] প্রকাশন-সংস্থা, সাধনা-র মাঘ ১৩০১-সংখ্যায় এঁর সংকলিত 'হাসি ও খেলা'র সপ্রশংস সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ এঁর বন্ধুত্ব অর্জন করেন। এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ নীলরতন সরকার [1861-1943] রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

রথীন্দ্রনাথ তাঁদের বিদ্যাশিক্ষার আয়োজন থেকে নিতান্ত শিশু বলে তাঁর ছোটোবোন রানী বা রেণুকাকে বাদ দিলেও সাড়ে ছ' বছরের রেণুকার জন্য পড়াশোনার ব্যবস্থায় কার্পণ্য ছিল না। ২৬ শ্রাবণ [10 Aug] 'শ্রীমতী রেণুকা দেবীর জন্য রামায়ণ খরিদ...কঙ্কাবতী ১ খান খরিদ', 'শ্রীমতী রেণুকা দেবীর জন্য শিলাইদহ কঙ্কাবতী বই পাঠান ডাক টীকেট' ইত্যাদি হিসাব পাওয়া যায়, ১৬ ভাদ্র বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলির সঙ্গে 'Child's Grammar', 'Elementary Composition', 'ভূত ও মানুষ' [ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত] রেণুকার

জন্যই কেনা হয়েছে, এই সঙ্গে ক্রীত 'শিশুশিক্ষা ১ম'-এর পাঠিকা ছিলেন সম্ভবত সাড়ে তিন বছরের মীরা দেবী। সুতরাং শিলাইদহের গৃহবিদ্যালয় বেশ জমজমাট ছিল বলা চলে।

এরই মধ্যে বাইরের হাওয়া নিয়ে আসতেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবান বন্ধুরা। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'রাজশাহি থেকে ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় বাবার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন। অগাধ তাঁর পাণ্ডিত্য, কিন্তু তার মধ্যে একটুও শুষ্কতা ছিল না। তিনি যখন বাংলাদেশের ইতিহাসের কথা বলতেন, গল্পের মতো ফুটে উঠত চোখের সামনে পুরানো ইতিবৃত্তের কথা। বাবার সঙ্গে ইতিহাস ছাড়াও নানা বিষয়ে আলোচনা হত, যা থেকে তাঁর মনের গভীরতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যেত।'[৩৭] এর পরে পরে এসেছেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত, বিহারীলাল গুপ্ত, জগদিন্দ্রনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এঁদের বাক্যালাপের যেটুকু স্রোত রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের উপর দিয়ে বয়ে যেত, আমরা অনুমান করতে পারি, তাতেই তাঁদের মনের ক্ষেত্র বেশ উর্বর হয়ে উঠত।

রথীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন: 'শিলাইদহে থাকতে বাবা আমাদের লেখাপড়া শেখাবার দিকে যেমন নজর দিয়েছিলেন, অন্য দিকে মা চেষ্টা করতেন আমাদের সবরকম ঘরকন্নার কাজ শেখাতে। তাঁর প্রণালী ছিল বেশ নতুন রকমের। রবিবার দিন তিনি চাকর-বামুন সকলকে ছুটি দিতেন। সংসারের সমস্ত কাজ আমাদের করতে হত।'[৩৮] এই পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথেরও সোৎসাহ সমর্থন ছিল। মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গতার যে আদর্শ তাঁর মনে বিরাজ করত, সন্তানদের শিক্ষাপদ্ধতিতে তিনি তার প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য [বিদ্যারত্ন] কর্তৃক সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত সংস্কৃত শিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ 4 Aug 1896 [২৫ শ্রাবণ ১৩০৩] তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল, তার কথা আমরা পূর্বে বলেছি। ১৬ শ্রাবণ ১৩০৫ [রবি 31 Jul] ক্যাশবহির হিসাবে তার তৃতীয় ভাগ মুদ্রণের কথা জানা যায়: 'ব° ব্যানার্জি প্রেস দং সংস্কৃত শিক্ষা তৃতীয় খণ্ড ছাপান মুজুরী শোধ ১১ ৺৩ দপ্তরী ৷৷০ /১২৷৩'। চতুর্থ ভাগ মুদ্রণের খবর পাওয়া যায় ১৩ পৌষের [মঙ্গল 27 Dec] হিসাবে: 'সংস্কৃত শিক্ষা ৪ ভাগ ছাপানর ব্যয় গুঃ শিবধন বিদ্যার্ণব ১৮্'। দ্বিতীয় ভাগ ছাড়া অন্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-চর্চা 'ব্যাকরণ-পুষ্ট' ছিল না, 'সংস্কৃত শিক্ষা'-র এতগুলি খণ্ড এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে।

কলকাতা থেকে শিলাইদহে বাসস্থান পরিবর্তনের টানাপোড়েনের জন্যই সম্ভবত শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতী প্রকাশিত হয় 22 Aug [৭ ভাদ্র]। এই সংখ্যায় মুদ্রিত রবীন্দ্র-রচনাগুলি হল:

২৯৯-৩০২ 'হতভাগ্যের গান' দ্র কল্পনা ৭। ১৪৮-৫২

৩০২-০৮ 'ভাষাবিচ্ছেদ' দ্র শব্দতত্ত্ব-পরিশিষ্ট ১২। ৫৪৬-৫০

৩০৯-১৫ 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪৯৪-৯৮

৩১৫-১৯ 'সম্বন্ধে কার' দ্র শব্দতত্ত্ব ১২। ৩৬৮-৭০

৩৫৫-৭৩ 'প্রসঙ্গ কথা'

৩৫৫-৬৬ দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৫৫৫-৬২

৩৬৬-৭১ দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৫০২-০৫

৩৭৩-৮১ ‘সাময়িক সাহিত্য’

৩৭৩-৭৬ নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়; ৩৭৬-৭৮ সাহিত্য। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ১৩০৪;

৩৭৮-৮০ পূর্ণিমা। শ্রাবণ; ৩৮০-৮১ প্রদীপ। আষাঢ়; ৩৮১ অঞ্জলি। জ্যৈষ্ঠ

৩৮২-৮৪ ‘গ্রন্থ সমালোচন’ দ্র দেশ, শারদীয়া ১৩৮৩। ২৩-২৪

৩৮২-৮৩ মুর্শিদাবাদ কাহিনী। নিখিলনাথ রায় [দ্র ইতিহাস। ১৫২-৫৪]; ৩৮৩-৮৪ চিন্তালহরী। চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ; ৩৮৪ ভূমিকম্প। বিপিনবিহারী ঘটক

আষাঢ়-সংখ্যা ভারতী-র ‘সাময়িক সাহিত্য’ বিভাগে জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রদীপ-এ মুদ্রিত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের ‘ওয়েল্‌স্- কাহিনী’ প্রবন্ধের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: ‘প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন, ওয়েল্‌ষ্ ভাষা ইংরাজি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেখানকার অধিবাসীগণ স্বপ্রদেশের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। কিন্তু আমরা বলিতেছি তৎসত্বেও যদি তাহার দায়ে পড়িয়া ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যকে গ্রহণ পূর্ব্বক ইংরাজের সহিত এক হইয়া না যাইত তবে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার হস্ত এড়াইয়া তাহারা কখনই জাতিমহত্ত্ব লাভ করিতে পারিত না।’ এর পরে তিনি উড়িষ্যা, আসাম ও বিহার-বাসীদের ‘সামান্য অন্তরায়গুলি নষ্ট করিয়া’ ভাষা ও সাহিত্যের সূত্রে বাঙালির সঙ্গে মেশার যে আশা প্রকাশ করেছেন, তা আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। বস্তুত এই চিন্তার সূত্রেই ‘ভাষাবিচ্ছেদ’ প্রবন্ধটি লেখা। এখানে তাঁর বক্তব্য, এক রাজার শাসনপ্রণালীর বন্ধন, পথের সুগমতা, ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরির টানে ইংরেজ রাজত্বে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি অনেকটা কাছাকাছি এসেছে—এর ফলে আসাম উড়িষ্যা ও বাংলার মতো প্রদেশসমূহে ভাষার ঐক্য ঘটার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ইংরেজের ভেদনীতির প্রভাবে এই তিন অঞ্চলের ভাষার ব্যবধান পূর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও দৃঢ় হতে চলেছে। ‘তাঁহারা বাংলাকে আসাম ও উড়িষ্যা হইতে যথাসম্ভব নির্বাসিত করিয়া স্থানীয় ভাষাগুলিকে কৃত্রিম উত্তেজনায় পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত।’ এরপর তিনি ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষা—বিশেষ করে অসমীয়া ভাষার সঙ্গে—বাংলাভাষার শব্দগত ও উচ্চারণগত সাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

কিন্তু আশার উত্তেজনায় সম্ভবত তিনি উক্ত ভাষাভাষীদের জাতিগত আত্মস্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনীতিগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এর ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চকিত হয়ে উঠল। আশ্বিন-সংখ্যা ভারতী-তে ‘আসামের কথা’ [পৃ ৫৩৪-৩৮]-শীর্ষক প্রবন্ধে এক নামহীন লেখক রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিবাদ করলেন। হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল অসমীয়া যুবক লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া-র। এঁকে বাঙালি করার চেষ্টায় প্রজ্ঞাসুন্দরী-সম্পাদিত ‘পুণ্য’ পত্রিকায় এঁর পদবী ছাপা হত ‘বিদ্যাবর্য্য’-রূপে। লক্ষ্মীনাথ লিখেছেন: ‘‘শ্বশুরবাড়ির এই সাহিত্যিক মহিলা আর পুরুষেরা অসমীয়া ভাষা ও বাংলা ভাষার পার্থক্য এবং বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন ধীরে ধীরে। তাঁরাই এগিয়ে এসে আমাকে তর্ক যুদ্ধে নামাতেন।...তাঁরা মনে করতেন পূর্ববঙ্গের ভাষা যেমন বাংলা ভাষারই একটা অঙ্গ অসমীয়া ভাষাও তেমনি।...আমার সঙ্গে যখন আমার সাহিত্যিক শ্যালকদের তর্কাতর্কি হতে শুরু হল এবং পরে ‘রবিকাকা’র কাছে গিয়ে পৌঁছাল, তখন

শ্বশুর জামাইয়ের মধ্যেও একটি ছোট খাট তর্কযুদ্ধ বাধল। তার পরে মুখের তর্ক বন্ধ হলে রবিকাকা 'ভারতী' পত্রিকায় অসমীয়া ভাষার উপর মন্তব্য প্রকাশ করে লিখলেন এক প্রবন্ধ। আমি তার প্রতিবাদ লিখে 'ভারতী'তে ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। 'প্রতিবাদ'টা ভারতীতে ছাপা হয়। ওদিকে 'পুণ্য' পত্রিকাতেও আমার প্রতিবাদ বেরুল।[৩৯] এরকম ভাবে তর্কযুদ্ধের শেষ হল।"[৪০] বর্তমান তর্কযুদ্ধ শেষ হলেও সমস্যার শেষ হয় নি। কয়েক বৎসর পরে [চৈত্র ১৩১১] রবীন্দ্রনাথকে 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল বাংলার চারটি অঞ্চলের কথ্যভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। 'মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা' [ভাদ্র ১৩৩৯] লিখে তাঁকে আর-একবার প্রতিবাদ জানাতে হয়েছিল মুসলমানী বাংলা-প্রচারের অপপ্রয়াস রোধ করতে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি সাময়িক সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত, কিন্তু ভাষাবিচ্ছেদের পরিণতি কী বিষময় ফল প্রসব করে তার আধুনিক দৃষ্টান্তের পটভূমিকায় এগুলি আর সাময়িকতার সীমানায় আবদ্ধ থাকে না।

'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' আবদুল করিম-প্রণীত 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত। প্রবন্ধটিতে অবশ্য মূল গ্রন্থের ভালো-মন্দ কিছুই আলোচিত হয় নি, সমালোচ্য গ্রন্থে পৃথিবীর জন্য ভয়ংকর কাড়াকাড়ি রক্তপাত ও মহাপাতকের একত্রিত বিবরণ পড়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে হিন্দুজাতির 'অপাপের, অমন্দের একটি নির্জীব সুবৃহৎ সমতল নিশ্চলতা'র কথা—এরই ফলে 'মুসলমানেরা যুদ্ধ করিয়াছে, আর হিন্দুরা দলে দলে আত্মহত্যা করিয়াছে। মুসলমানদের যুদ্ধের মধ্যে একদিকে ধর্মোৎসাহ, অপরদিকে রাজ্য- অথবা অর্থ-লোভ ছিল; কিন্তু হিন্দুরা চিতা জ্বালাইয়া স্ত্রীকন্যা ধ্বংস করিয়া আবালবৃদ্ধ মরিয়াছে—মরা উচিত বিবেচনা করিয়া; বাঁচা তাহাদের শিক্ষাবিরুদ্ধ সংস্কারবিরুদ্ধ বলিয়া। তাহাকে বীরত্ব বলিতে পার কিন্তু তাহাকে যুদ্ধ বলে না। তাহার মধ্যে উদ্দেশ্য অথবা রাষ্ট্রনীতি কিছুই ছিল না।' এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবে নয়, জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ উদ্বুদ্ধ করার জন্য লিখেছেন: 'কিন্তু শাস্ত্রে যখন ভারতবর্ষকে দুর্গপ্রাচীরের মতো রক্ষা করিতে পারে না, পরজাতির সংঘাত যখন অনিবার্য, যখন লোভের নিকট হইতে স্বার্থরক্ষা এবং হিংসার নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে আমরা বাধ্য,—তখন মানবের মধ্যে যে-দানবটা আছে, সেটাকে সকালে সন্ধ্যায় আমিষ খাওয়াইয়া কিছু না হউক, দ্বারের বাহিরেও প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখা সংগত। তাহাতে কিছু না হউক, বলশালী লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।' এরই পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেছেন: 'নবভাবোৎসাহে এবং ঐক্যপ্রবণ ধর্মবলে একটা জাতি যে কিরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি লাভ করে পরবর্তীকালে শিখগণ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল।' জাতিগত আত্মানুসন্ধান ও আত্মাদ্বোধনের পথনির্দেশের প্রয়াস এই সময়ের অনেক রবীন্দ্ররচনার বিশেষত্ব, আলোচ্য প্রবন্ধটিও সেই দিক দিয়ে বিচার্য।

'সম্বন্ধে কার' ভাষাতত্ত্ব-মূলক প্রবন্ধ, বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী-তে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার প্রকৃতি বিষয়ে যে আলোচনা শুরু করেছিলেন এটি সেই ধারায় রচিত তৃতীয় প্রবন্ধ—এই পর্যায়ের শেষ রচনা 'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ-(উচ্চারণ পর্যায়)' পৌষ-মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

এবারের 'প্রসঙ্গ কথা' চারটি ছোটো প্রবন্ধের সমষ্টি—শেষেরটি 'ঢাকা' প্রবন্ধে উল্লিখিত পদ্মার 'কীর্তিনাশা' নামের অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-বর্ণিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে জনৈক পত্রলেখকের প্রতিবাদ—অপর তিনটি কোনো-না-

কোনো ভাবে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে যুক্ত। এদের মধ্যে প্রথমটিতে [দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৫৫৫-৫৯]* তিনি 'পরজাতীয়ের প্রতি বিদ্বেষ যে স্বাভাবিক এবং কিয়ৎপরিমাণে তার সার্থকতা আছে' এ-প্রসঙ্গে স্পেক্টেটর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করে জাতি হিসেবে হিন্দুর বৈশিষ্ট্য ও দোষ-গুণ বিচার করেছেন। তাঁর মতে, আদিম আর্যদের মধ্যে পরজাতিবিদ্বেষ প্রচুর পরিমাণে ছিল বলে তারা অনেকদিন নানাভাবে অনার্যদের সংস্রব থেকে নিজেদের দূরে রাখবার চেষ্টা করলেও ধীরে ধীরে উভয়ের ব্যবধান কমে এসেছে এবং অনার্যদের সংস্কার পূজাবিধি দেবতা প্রভৃতি আর্যসমাজে প্রবেশ করেছে, আর 'সেইজন্যই আজ হিন্দুজাতি জ্ঞানে-অজ্ঞানে আচারে-অনাচারে বিবেকে এবং অন্ধ কুসংস্কারে এমন একটা অদ্ভুত মিশ্রণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।' অনেক ক্ষেত্রে এমন জাতি-মিশ্রণ শক্তির উদ্বোধন ঘটায়, কিন্তু আর্য-অনার্যের মধ্যে অনিবার্য মিলনের মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা বজায় থাকায় সেই শক্তি লাভ করা যায় নি। অথচ শারীরসংস্থানে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হীন অনার্যেরা এই মিশ্রণের ফলে আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করে আর্যধর্ম ও আর্যসমাজকে বিকৃত করেছে—'অর্থাৎ ঐক্যের যা ক্ষতি তাহাও ঘটিয়াছে এবং অনৈক্যের যা দোষ তাহাও বর্তমান।'

এই কারণে ভারতবর্ষে কোনোদিন 'রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা' গড়ে ওঠে নি। 'শত্রুকে আক্রমণ, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, এবং এক শাসনতন্ত্রের অধীনে পরস্পরের স্বার্থ ও শুভাশুভের একত্ব অনুভব আমরা কখনো দীর্ঘকাল করি নাই। আমরা চিরদিন খণ্ড খণ্ড দেশে খণ্ড খণ্ড সমাজে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দ্বারা বিভক্ত।... আমরা প্রাদেশিক, আমরা পল্লীবাসী; বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ সমাজের উপযোগী মতের উদারতা, প্রথার যুক্তিসংগতি এবং সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্যোগপরতা আমাদের মধ্যে নাই।' কিন্তু ইংরেজ-রাজত্বে আমরা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়েছি, এখন প্রাদেশিক বিচ্ছেদগুলি ভেঙে ফেলে 'বহুদিনের বিরোধ-দ্বন্দ্বের মধ্যে যে একটি প্রাচীন ঐক্যগ্রন্থি আমাদের নাড়িতে নাড়িতে বাঁধিয়া গিয়াছে সেইটেকেই প্রবল করিয়া আমাদের স্থানীয় এবং সাময়িক অনৈক্যগুলিকে' ঝেড়ে ফেলা প্রয়োজন। বিদেশী সভ্যতার প্রবল সংঘর্ষে নূতন শিক্ষায় যে জাতি জাগ্রত হয়ে উঠেছে, নিজেরই 'চিরোদ্‌ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির' মধ্য থেকেই তাকে অভ্যুত্থানের উপাদান সংগ্রহ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা 'মহাত্মা' দয়ানন্দ স্বামীর মতের কথা উল্লেখ করেছেন, যে মত 'দেশীয়তাকেও লঙ্ঘন করে নাই অথচ মনুষ্যত্বকেও খর্ব করে নাই। তাহা ভাবে ভারতবর্ষীয় অথচ মতে সার্বভৌমিক। তাহা হৃদয়ের বন্ধনে আপনাকে প্রাচীন স্বজাতির সহিত বাঁধিয়াছে, অথচ উন্মুক্ত যুক্তি এবং সত্যের দ্বারা সর্বকালের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।' এই প্রসঙ্গে নেপাল মজুমদার রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে লিখেছেন: "সেই সময় তাঁহার ধর্মভাব তাঁহার দৃষ্টিকে এতখানি আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, 'আর্যসমাজে'র মত একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম-আন্দোলনের মধ্যেও তিনি মহৎ আশার লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। অথবা ইহাও হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সেই সময় আর্যসমাজ সম্পর্কে বড়ো একটা খবর রাখিতেন না।" [৪১] এই সময়ে বলেন্দ্রনাথের উদ্যোগে আর্যসমাজ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটি সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়াস চলছে এবং বিভিন্ন প্রশ্নে উভয় সমাজের মত ব্যাখ্যা করে লিখিত পত্র তত্ত্ববোধিনী-র বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হচ্ছে—সুতরাং রবীন্দ্রনাথ আর্যসমাজ সম্পর্কে খবর রাখতেন না একথা ঠিক নয়। আর আদি ব্রাহ্মসমাজের 'ভাবে ভারতবর্ষীয় অথচ মতে সার্বভৌমিক' আদর্শের প্রভাবে আর্যসমাজ 'ভারতে আর-একটি অভিনব সম্প্রদায় রূপে নূতন বিচ্ছেদ আনয়ন' করবে না বলেই রবীন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করেছেন।

রচনাটি শেষে রবীন্দ্রনাথ ‘বারান্তরে আর্যসমাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা’ করবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় নি।

‘প্রসঙ্গ কথা’র দ্বিতীয় রচনাটি [দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৫৫৯-৬২] ইংরেজজাতির পরজাতিবিদ্বেষের কঠিন সমালোচনা। জাতীয়তার অত্যুগ্র বিকাশের ফলে ইংরেজ দেশে ও বিদেশে অন্য কোনো জাতির প্রতি সুগভীর অবজ্ঞা প্রকাশ করে, এর উপর যখন স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটার উপক্রম হয় তখন ‘খৃস্টীয় ধর্মনীতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের উচ্চতর আদর্শ টেঁকাই কঠিন হয়। ইহাতে যে অন্ধতা আনয়ন করে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতারশ্মি তাহা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না।’ আর এই কারণেই ভূতপূর্ব ভারত-স্টেট-সেক্রেটারি সার্ হেনরি ফাউলার যখন বলেন যে, ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড ক্লাইভের কার্যবিধি পার্লামেন্টের বিচারাধীন ছিল না বলেই ভারতসাম্রাজ্য ইংরেজের করায়ত্ত হয়েছে, তখন ‘স্বার্থজনিত অন্ধতা এবং পরজাতি বিশেষত প্রাচ্য পরজাতির প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক সুগভীর অবজ্ঞাপরতা’ থেকে পার্লামেন্টে ‘খুব-একটা উৎসাহসূচক করতালি’ পড়েছিল। পরজাতিবিদ্বেষ-প্রসূত ধর্মনীতির প্রতি এই অবজ্ঞা কিন্তু ‘বল্‌গেরীয় ও আর্মানিদের প্রতি তুরস্কের অত্যাচার, ক্যুবান্‌দের প্রতি স্পেনের কঠোরতা সম্বন্ধে পার্লামেন্টের সভ্যগণ প্রবলপক্ষের প্রতি উৎসাহ-করতালি বর্ষণ করে না।’ এর কারণ স্বজাতি-বিজাতির ক্ষেত্রে ইংরেজের দ্বিখণ্ডিত নীতিবোধ। আর এইজন্যই ‘ওআরেন হেষ্টিংস, লর্ড ক্লাইভ পরজাতির সম্বন্ধে যেমনই হোন, স্বজাতির সম্বন্ধে তাঁহারা মহৎ।’

এরপর রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের ঔপনিবেশিক বীভৎস রূপটি উদঘাটিত করে লিখেছেন: ‘ইংরেজের এই পরবিদ্বেষ, বিশেষত প্রাচ্যবিদ্বেষ, নেটাল অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে কিরূপ নখদন্ত বিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। অথচ ইহাও দেখা যাইতেছে, ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সৈন্যকে আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যের মধ্যে রক্তপাত করাইতে কুণ্ঠিত নহেন। তখন, এক রাজ্ঞীর প্রজা, এক সাম্রাজ্যের অধিবাসী, এমনসকল সৌভ্রাত্র্যমধুমাখা কথা শুনা যায়। ইংরেজ-মহারানীর অধিকার-বিস্তারে প্রাণপাত করিতে ভারতবাসীর কোনো বাধা নাই, কিন্তু সেই অধিকারে স্থানলাভ করা তাহার পক্ষে নির্বাধ নহে। এইপ্রকার ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ক্ষুদ্রতা হীনতা আছে তাহা ইংলণ্ড উপলব্ধি করেন না।’

এর সঙ্গে আছে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খবরের কাগজগুলির চক্ষুলজ্জা-হীনতা: ‘সমস্তিপুর-ব্যারাকপুরের হত্যাব্যাপার ইংরেজি কাগজে কোনোপ্রকার আখ্যা পাইল না, কিন্তু শালিমারের দুর্ঘটনা “শালিমার ট্র্যাজেডি” নামে সমুচ্চস্বরে বারংবার ঘোষিত হইতে লাগিল। তাহাতেও খেদ নাই, কিন্তু দুর্বিনীত নেটিভের হস্তে প্রবাসী ইংরেজের প্রাণমান উত্তরোত্তর বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেছে বলিয়া যে-সমস্ত প্রেরিতপত্র বাহির হইতেছিল তাহা পাঠ করিয়া যদি আমাদের শঙ্কার উদয় না হইত তবে বড়ো দুঃখে হাসিতে পারিতাম। আমরা হাসিতে সাহস করিলাম না, কিন্তু অদৃষ্ট একটা ভীষণ কৌতুকের সৃষ্টি করিল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজকর্তৃক কতকগুলি দেশীয় লোকের বীভৎস হত্যা পরে পরে সংঘটিত হইল—ইংরেজ সম্পাদকগণ একেবারেই মৌন অবলম্বন করিলেন।’

মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ যখন এই প্রবন্ধ লিখছেন, দেশে তখন ‘সিডিশন আইন’ বর্তমান—অথচ ইংরেজের পরজাতিবিদ্বেষ, দ্বিখণ্ডিত নীতিবোধ ও আগ্রাসী ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে যে ধিক্কার এই রচনায় ধ্বনিত হয়েছে, তখনকার কোনো পেশাদারী রাজনীতিকও সে-সব কথা বলতে কুণ্ঠিত হয়েছেন—

কল্পনাবিলাসী 'কবি'র সাহস যে রাজনীতিজীবী দেশনেতাদের চেয়ে অনেক বেশি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘজীবনে বারবার তার প্রমাণ রেখেছেন।

অথচ সিডিশন আইন সম্পর্কে তিনি যে সচেতন ছিলেন তার পরিচয় আছে তৃতীয় রচনাটিতে [দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৫০২-০৫]। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'সিরাজদ্দৌলা' পাঠ করে কোনো অ্যাংলা-ইণ্ডিয়ান পত্র ক্রোধ প্রকাশ করেছে দেখে রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে মন্তব্য করেছেন: 'আমাদিগকে বিদেশী-লিখিত নিন্দোক্তি বাধ্য হইয়া অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু অক্ষয়বাবুর সিরাজদ্দৌলা কোনো কালে সম্পাদক মহাশয়ের সন্তানবর্গের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত হইবার সম্ভাবনা দেখি না!' এবং 'ইহা ইতিহাস; যুক্তির দ্বারা প্রমাণের দ্বারা ইহাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া দেওয়া কঠিন নহে। এমন কি, আইনের কোনো অভাবনীয় ব্যাখ্যায় ইতিহাস-সমেত ঐতিহাসিককেও লোপ করিয়া দেওয়া অসম্ভব না হইতে পারে।' আর সম্ভবত এই কারণেই তিনি বন্ধুর হয়ে কিছু কৈফিয়ৎ দিয়েছেন; তিনি লিখেছেন: 'ইংরেজ আমাদের ক্ষমতাশালী প্রভু। সেই ক্ষমতা ও প্রভাবের প্রত্যক্ষ আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক। এত অধিক যে, অন্যায় ও অত্যাচারও যদি ঘটে তথাপি তাহা দুর্বল ব্যক্তিদিগকে ভয়ে বিস্ময়ে এবং একপ্রকার অন্ধ আসক্তিতে অভিভূত করিয়া রাখে। অতএব দেড় শত বৎসর পূর্বে ইংরেজ বণিক তৎকালীন রাজস্থানীয়দের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া ইংরেজের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে থাকিবে এমন ভারতবাসী নাই।' তাছাড়া ইংরেজের অন্যায় নিন্দা সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। 'প্রাচ্য চরিত্র, প্রাচ্য শাসননীতি সম্বন্ধে ইংরেজি গ্রন্থে ছোটো বড়ো স্পষ্ট-অস্পষ্ট, সংগত-অসংগত অজস্র কটূক্তি পাঠ করিয়া শিক্ষিত-সাধারণের মনে যে একটা অবমাননাজনিত ক্ষোভ' জন্মেছিল, ঘাতপ্রতিঘাতের স্বাভাবিক নিয়মেই 'অক্ষয়বাবু যে অন্ধকূপহত্যার সহিত গ্লেনকোর হত্যাকাণ্ড ও সিপাহিবিদ্রোহকালে অমৃতসরের নিদারুণ নিধন-ব্যাপারের তুলনা করিয়াছেন ইতিহাসবিবৃতিস্থলে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে এবং ইংরেজ সমালোচকের তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাতও সংগত হইতে পারে কিন্তু আমরা ইহাকে নিরর্থক বলিতে পারি না।' 'শত্রুর প্রতি অন্ধ হিংস্রতা বিকৃত মানবচরিত্রের পশুপ্রবৃত্তি, তাহা বিশেষরূপে প্রাচ্যচরিত্রের নহে' একথা বলার সুযোগ নেওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয় বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের হয়ে ওকালতি করলেও 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে শ্রাবণ-সংখ্যা পূর্ণিমা-য় মুদ্রিত 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়' প্রবন্ধের সমালোচনায় মীরকাসিম-লেখক অক্ষয়কুমারের প্রতি তিনি সহানুভূতি দেখাতে পারেন নি: 'বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে ইতিহাস যদি বা বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে তাহাতে বঙ্কিমবাবুর কোন খর্ব্বতা হয় নাই।...অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ইতিহাসকে মানিবে না তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তর এই যে, ইতিহাসের সংশ্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রস টুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোন খাতির নাই।...কিন্তু ইতিহাস অক্ষয়বাবুর এতই অনুরাগের সামগ্রী যে ইতিহাসের প্রতি কল্পনার লেশমাত্র উপদ্রব তাঁহার অসহ্য, সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে নবীনবাবু তাহা টের পাইয়াছেন। ইতিহাস-ভারতীর উদ্যানে চঞ্চলা কাব্য-সরস্বতী পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র ইচ্ছানুসারে তাহার অপরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রহরী অক্ষয়বাবু সেটা কোনমতেই সহ্য করিতে পারেন না—কিন্তু মহারাণীর খাস হুকুম আছে।...ইহাতে ইতিহাসের কোন ক্ষতি হয় না অথচ কাব্যের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিশেষ স্থলে যদি শ্রী সাধন না হয় তবে

কাব্যের প্রতি দোষারোপ করা যায় সৌন্দর্য্য হানি হইল বলিয়া, সত্য হানি হইল বলিয়া নহে।'[৪২] এই সমালোচনা পাঠ করে অক্ষয়কুমার একটি পত্রে [? ভাদ্র ১৩০৫] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'এবারকার সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা উপলক্ষে আমার কথা কিছু বেশী বলিয়া ফেলিয়াছেন, উহা আপনার স্নেহোদ্ভূত ভিন্ন আমার ন্যায্যপ্রাপ্য প্রশংসা বলিয়া গ্রহণ করিলাম না। কবিকল্পনার সীমা কোথায় তাহার মীমাংসা করিতে গিয়া আপনি তাহাকে যতদূর প্রসর দিয়াছেন তাহাতে আমার নালিশের সুবিচার হয় নাই।' এরপর তিনি লেখেন: 'যে ইতিহাসে মহাবীর, উপন্যাস তাহাকে কাপুরুষ সাজাইতে পারিবে না—ইহাই আমার মূল বক্তব্য। উপন্যাসে কল্পনা নানারূপ ঘটনা সৃষ্টি করুক, তাহাতে কেহ বাধা দিতে চাহে না, কিন্তু কাল্পনিক ঘটনা সৃষ্টির ক্ষমতা থাকিলেও মূল চরিত্র বিকৃত করিয়া দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।'[৪৩] প্রধানত এই চিঠিরই জবাব হিসেবে আশ্বিন-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৫১০-১৮] রবীন্দ্রনাথ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' [দ্র সাহিত্য ৮। ৪৪৬-৫১] নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথই বিতর্কটি আবার জাগিয়ে তোলেন 'কথা' [মাঘ ১৩০৬] কাব্যের 'বিজ্ঞাপন'-এ, অক্ষয়কুমার তার জবাব দেন কাব্যটির দীর্ঘ সমালোচনায় [দ্র প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৮। ৩৫১-৫৫]।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-সংখ্যা নব্যভারত-এ প্রকাশিত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী-লিখিত 'সহরৎ-এ-আম্' প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ-লেখক মুসলমান আমলের water works-এর বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন: 'পিপাসিতকে পানীয় জল দিয়া তাহার নিকট হইতে পয়সা লওয়া আসিয়ার (oriental) রাজাদিগের ধর্ম্ম ও আচারবিরুদ্ধ।' রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য-প্রসঙ্গে লিখলেন:

ইংরাজের ব্যবস্থায় জলও যেমন কলে আসে, সঙ্গে সঙ্গে করও তেমনি কলে আদায় হইয়া যায়। ইংরাজরাজ্যের সুশাসন ও সুব্যবস্থা যে আমাদের কাছে কলের মত বোধ হয়, তাহা যে অনেক সময় আমাদের কল্পনা এবং হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না তাহার কারণ ইংরাজ-রাজকার্য্যে রাজোচিত প্রত্যক্ষ ঔদার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজত্ব যেন একটা বৃহৎ দোকান; সওদাগরের "একচেটে" রাজকার্য্য নামক মালগুলি প্রজাদিগকে অগত্যা কিনিতে হয়। এমন কি, রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইলেও দীনতম প্রজাকেও ট্যাঁক্ হইতে পয়সা গণিয়া দিতে হয়।...তখন রাজপথ, পান্থশালা, দীর্ঘিকা রাজার দান বলিয়া প্রজারা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিত। এখন পথকর পাব্লিক কর গণিয়া দিয়াও তাহার প্রত্যক্ষফল অল্প লোকে দেখিতে পায়। পূর্ব্বে রাজার জন্মদিনে রাজাই দান বিতরণ করিয়া সাধারণকে বিস্মিত করিয়া দিতেন এক্ষণে রাজকীয় কোন মঙ্গল উৎসবে প্রজাদিগকেই চাঁদা যোগাইতে হয়। জেলায় ছোটলাট প্রভৃতি রাজ প্রতিনিধির শুভাগমনকে আপনাদের নিকট স্মরণীয় করিবার জন্য প্রজাদের আপনাদিগকেই চেষ্টা করিতে হয় এবং তাহাদের সেই কৃতকীর্ত্তিতে রাজা নিজের নাম অঙ্কিত করেন। কানু[? খানা] জংশনে* যখন প্লেগ্-সন্দিগ্ধদের বন্দীশালা দেখিতাম তখন বারম্বার একথা মনে হইত যে, অশোকের ন্যায় আকবরের ন্যায় কোন প্রাচ্য রাজা যদি সাধারণের হিতের জন্য এই প্রকারের অবরোধ আবশ্যক বোধ করিতেন তবে তাহার ব্যবস্থা কখনই এমন দীনহীন ও একান্ত অপবৃত্তিকর হইত না—অন্ততঃ নিরপরাধ অবরুদ্ধদের পানাহার রাজব্যয়ে সম্পন্ন হইত;—যথেষ্ট বেতনভুক্ ডাক্তার প্রভৃতিরা সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন অথচ রাজ্যের হিতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট যে সকল দুর্ভাগা তাঁহাদের সযত্নসেব্য অতিথিস্থানীয়, যাহারা পরদেশে বিনাদোষে নিরুপায় ভাবে বন্দীকৃত, হয় ত পাথেয়বান্ সঙ্গীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় নিজব্যয়ে কষ্টে জীবনধারণ করিতে দেওয়া অন্ততঃ প্রাচ্য প্রজাদের চক্ষে কোনমতে রাজোচিত বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণের জন্য রাজার হিতচেষ্টা বিভীষিকাময় না হইয়া যথার্থ রমণীয় মূর্ত্তিধারণ করিত যদি এই সকল অবরোধশালা এবং মারী হাঁসপাতালের মধ্যে যত্ন ও ঔদার্য্য প্রকাশ পাইত। দৃষ্টিমাত্রেই যাহার বহিরাকারে দৈন্য এবং অবহেলা পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহার মধ্যে যে সাংঘাতিক অবস্থায় যথোপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা মিলিবে ইহা কাহারও প্রতীতি হয় না;...ঘোষণাদ্বারা আশ্বাসের দ্বারা যথেষ্ট ফল হয় না;—-যে সকল প্রত্যক্ষ রাজচেষ্টা বরাভয় উদারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের কল্পনাবৃত্তিকে রাজার কল্যাণ ইচ্ছার দিকে স্বতই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় তাহাই ফলদায়ক। যাহা সংকল্পে শুভ এবং যাহা পরিণামে শুভ তাহাকে আকারে প্রকারেও শুভসুন্দর করিয়া না তুলিলে তাহার হিতকারিত্ব সম্পূর্ণ হয় না, এমন কি, অনেক সময় তাহা হিতে বিপরীত হয়।'[৪৪]

—রবীন্দ্রনাথের এ-ধরনের রচনার সঙ্গে অধিকাংশ পাঠকেরই পরিচয় নেই, অথচ এগুলি ছাড়া আমাদের রবীন্দ্র-পরিচয় অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্লেগ-দমনে ছোটলাট জন উডবার্নের উদারনীতিকে তিনি প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু খুঁটিনাটি ব্যবস্থার ত্রুটির দিকেও প্রকৃত জনদরদী নেতার মতো তাঁর লক্ষ্য ছিল এবং নির্ভয়ে শাসকবর্গের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করেছেন এই তথ্যটি উপেক্ষণীয় নয়। সে-যুগে অনেক এই-ধরনের বাংলা রচনা ইংরেজিতে অনুবাদিত হয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হত, এই তথ্যটিও মনে রাখা দরকার। বেঙ্গল লাইব্রেরির ত্রৈমাসিক পুস্তক তালিকায় সাময়িকপত্রের বিশেষ-বিশেষ রচনা সম্পর্কে মন্তব্যের আকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়।

'সাহিত্য' পত্রিকার ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৪ সংখ্যায় 'সহযোগী সাহিত্য' বিভাগের একটি রচনার সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ একটি বিতর্ক সৃষ্টি করেন। সূক্ষ্মচর্মী সাহিত্যসেবীদের সমালোচনা সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা বিষয়ে লেখক [সুরেশচন্দ্র সমাজপতি] যা লিখেছিলেন, তার কিছুটা উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লেখেন: 'এরূপ তীব্র ভাষায় এরূপ অনুতাপ-উক্তি আমরা দেখি নাই। কিন্তু লেখক নিজের প্রতি যতটা কালিমা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ সূক্ষ্মচর্ম্ম কেবল তাঁহার একলার নহে, প্রায় লেখকমাত্রেরই। এবং তিনি আত্মগ্লানির প্রাবল্য বশতঃ লেখকবর্গ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন ঠিক সেই কথাই সমালোচকদিগকেও বলা যায়। সকল লেখাও নির্দ্দোষ নহে, সকল সমালোচনাও অভ্রান্ত নহে।...সমালোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমালোচকের প্রবীণতা অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ত শিক্ষা অভাবে আমাদের দেশের সমালোচনা অনেক স্থলেই কেবলমাত্র উদ্ধত স্পর্দ্ধার সূচনা করে, এবং কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে জানিব যে তাহা "আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান" করে না? যে লেখকের কিছুমাত্র পদার্থ আছে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই দলই থাকিবে,—বিপক্ষ দল স্বপক্ষকে বলেন স্তাবক, এবং স্বপক্ষ দল বিপক্ষকে বলেন নিন্দুক;—সমালোচ্য প্রবন্ধের লেখকও কোন এক পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া "মোসাহেব" "স্তাবক" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিকাংশ স্থলেই ভক্তকে "স্তাবক" এবং বিরক্তকে "নিন্দুক" বলে তাহারাই, যাহারা সত্য প্রচার করিতে চাহে না, বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে চায়।'[৪৫] সাহিত্য-সম্পাদক স্বভাবতই এই বক্তব্যকে আক্রমণ করেছেন: "...'টুপী' ব্যক্তিবিশেষের মাথায় 'ফিট' হইয়া বসিলে টুপীওয়ালা বেচারা কি করিতে পারে? স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহার প্রতিবাদের ভাষা সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—"মেছোহাটার ভাষা এত দূর পৌঁছে না", তাঁহার আক্রমণের নমুনা নতুন করিয়া না দিলেও চলে। আমরা কবি-বরের এই 'চাপানে'র 'উতোর' গাহিতে বস্তুতই অসমর্থ।"[৪৬] 'উতোর' সুরেশচন্দ্র আরও গেয়েছিলেন ভাদ্র-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত 'অধ্যাপক' গল্পের সমালোচনায়: "...মহীন্দ্রের অধ্যাপক প্রতিমুহূর্ত্তে শিষ্যের শূন্যগর্ভ সাহিত্যগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেন; এবং মহীন্দ্র তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া অধ্যাপককে 'ব্রহ্মদৈত্য' বলিত;—সমালোচকের উক্তি তাহার মনঃপূত হইত না, এ জন্য সে নিজেকে 'বড়' এবং সমালোচকদের 'ছোট' মনে করিয়া যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি সম্ভোগ করিত। কিন্তু মহীন্দ্র বোধ করি, কলেজের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া কখনও আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যসমাজে পায়ের ধূলা দিবার অবকাশ পায় নাই। তাই সে সমালোচকের বা তাহার চক্ষুঃশূল অধ্যাপকের অন্য লাঞ্ছনা করিয়াই নিরস্ত ছিল;—বিদ্বেষবশে বা নীচতার আতিশয্যে কেহ যে তাহার বিরুদ্ধ বা অপ্রিয় সমালোচনা করিতেছে, বা করিতে পারে,

এমন সম্ভাবনাও এই অল্পবুদ্ধি 'নকল' কবির অন্তঃসারশূন্য বুদ্বুদবহুল চিত্তে একবারও উদিত হয় নাই। বিরুদ্ধ সমালোচনায় চটিয়া সে যে অসঙ্কোচে আপনার অসন্তোষ অপ্রীতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারিয়াছে,—এবং সরলহৃদয়ে বিরুদ্ধবাদীকে গালি দিয়াছে, নিরীহ সমালোচকের শিরে কোনও মতলবের আরোপ করে নাই— ইহাতে আমরা তাহার যথেষ্ট সরলতার পরিচয় পাই।...আমাদের দেশের 'আসল' সাহিত্যিকগণ যদি এই কবিসৃষ্ট 'নকল' কবির সরলতার অনুসরণ করিতেন!"[৪৭] —সুরেশচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা পড়ে আমাদের মনে হতে পারে, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'চৈতালি'-সমালোচনার [২৬ অগ্র° ১৩০৪ তারিখে পঠিত ও Dec 1897-সংখ্যা দাসী-তে মুদ্রিত] পটভূমিকায় 'অধ্যাপক' গল্পটি রচিত, কিন্তু 'বামাচরণের গল্প' নামে খামখেয়ালী সভায় এটি অনেক আগেই পঠিত হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সুরেশচন্দ্রের উক্ত সমালোচনা নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। এরপর তিনি 'সাহিত্য' পড়া বন্ধ করে দেন, ভারতী-র আশ্বিন-সংখ্যার পর 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে 'সাহিত্য' পত্রিকার কোনো রচনার সমালোচনা প্রকাশিত হয় নি। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো সমালোচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ৩ ফাল্গুন [14 Feb 1899] তাঁকে লেখেন: '..."সাহিত্য" আমি পড়ি না এবং সাহিত্যে কি লেখা বাহির হয় তাহা আলোচনামাত্র করি না। সাহিত্য এখানে পাঠাইতে আমি হিরণকে নিষেধ করিয়া দিয়াছি। অযোগ্য হস্তের অপমান ক্ষোভ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া আমি শান্তিতে নির্জনে নিজের কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।'[৪৮]

আষাঢ়-সংখ্যা প্রদীপ-এ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'রবীন্দ্র বাবুর "চৈতালী"—প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে রমণীমোহন ঘোষ- কৃত "চৈতালি" — সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য' [পৃ ২২৩-২৯] প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ-সংখ্যা সাহিত্য-তে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লেখাটির তীব্র সমালোচনা করেন [পৃ ২৬১-৬২]। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিনীতভাবে লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখেছেন: "চৈতালি-সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য" নামক প্রবন্ধরচয়িতার প্রতি ভারতী সম্পাদক যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তবে প্রার্থনা করি পাঠকগণ সেই অহমিকা ক্ষমা করিবেন। কোন লেখকের কবিতা যে সকল পাঠকেরই ভাল লাগিবে এমন দুরাশা কেহ করিতে পারেন না, কিন্তু যিনি সরল শ্রদ্ধার সহিত তাহার মর্ম্মগ্রহণে প্রবৃত্ত হন এবং উপভোগের আনন্দ মুক্তভাবে প্রকাশ করেন তাঁহার উৎসাহ লেখকের কাব্যকাননে বসন্তের দক্ষিণ সমীরণের ন্যায় কার্য্য করে।'[৪৯]

রাজেশ্বর গুপ্ত-সম্পাদিত শিক্ষা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'অঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। শিক্ষা-বিষয়ে তিনি ইতিমধ্যেই অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং এই সময়ে সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালী নির্ধারণে ব্যাপৃত; সুতরাং এইরূপ একটি পত্রিকাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য হল: 'শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষবিধান সম্বন্ধে য়ুরোপে উত্তরোত্তর আলোচনা বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষা কি উপায়ে সহজ, মনোরম স্থায়ী এবং যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার পদ্ধতি এবং পুস্তকের প্রচার হইতেছে। ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাসাধন করিতে হয় বলিয়া বাঙ্গালীর শিক্ষাকার্য্য একটি গুরুতর ভার স্বরূপ হইয়া আমাদের শরীর মনকে জীর্ণ করিতেছে—অতএব শিক্ষার নবাবিষ্কৃত সহজ ও প্রকৃষ্ট পথগুলির সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দেশে বিশেষ ফলপ্রদ হইবার কথা কিন্তু আমাদের দেশের উদাসীন শিক্ষকগণ চিরপ্রচলিত দুঃখাবহ পথগুলি যে সহজে ছাড়িবেন এমন আশা রাখি না। যাহা হউক্ আমাদের স্কুলে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়, যথা ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, জ্যামিতি, সংস্কৃতভাষা, ইংরাজিভাষা, ব্যাকরণ,

প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা, এবং প্রতিবৎসর যে সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট ও পরীক্ষার প্রশ্ন দেওয়া হয় তাহার উপযুক্ত সমালোচনা আমরা অঞ্জলির নিকট হইতে আশা করি।'[৫০]

ভারতী-র শ্রাবণ-সংখ্যায় 'গ্রন্থ সমালোচন' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত নিখিলনাথ রায়ের [1865-1932] ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে, তাঁর 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' সম্পর্কেও তিনি সপ্রশংস; 'এপ্রকার ঐতিহাসিক চিত্র-গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। নিখিলবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলা-নিবাসী লেখকগণ তাঁহাদের স্থানীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্রাবলী সংকলন করিতে থাকেন তাহা হইলে বাংলাদেশের সহিত বঙ্গবাসীর যথার্থ সুদূরব্যাপী পরিচয় সাধন হইতে পারে। নিখিলবাবুর এই সদ্‌দৃষ্টান্ত, তাঁহার এই গবেষণা ও অধ্যবসায়ের জন্য, বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।'

কিন্তু চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের 'চিন্তালহরী' ও বিপিনবিহারী ঘটকের 'ভূমিকম্প' গ্রন্থ-দুটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব প্রতিকূল। প্রথমটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'ইংরাজিতে যাহাকে বলে সেন্টিমেন্টালিজম অর্থাৎ ভাবুকগিরি ফলানো, সহৃদয়তার ভড়ং করা, তাহার একটা বাঙ্গলা কথা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু কথা না থাকিলেও জিনিসটা যে থাকে বাঙ্গলা সাহিত্যে এই ভাবুকতাবিকারে কৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাসের উদ্‌ভ্রান্ত তাণ্ডব নৃত্যে তাহার প্রমাণ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এবং বর্তমান গ্রন্থখানি তাহার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।' দ্বিতীয় গ্রন্থটি 'পদ্যে অমিত্রাক্ষরছন্দে গত বর্ষের ভূমিকম্পমূলক ইতিহাস বর্ণনা ও তত্ত্বোপদেশ' হলেও এখানেও রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা গদ্য-সম্পর্কিত: 'গদ্যে উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস এক সম্প্রদায় পাঠকের রুচিকর; তাহার রচনা সহজসাধ্য ও অহমিকাগর্ভ হওয়ায় অনেক লেখক তাহাতেও আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই কারণে সেই সকল অশোভন অশ্রুজলার্দ্র বিলাপ প্রলাপ ও কাকূক্তির আক্রমণ হইতে গদ্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টা সমালোচকমাত্রেরই করা কর্ত্তব্য।' দুটি গ্রন্থেরই প্রারম্ভে অন্যের লিখিত প্রশংসামূলক সমালোচনা মুদ্রিত দেখে প্রথমটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি অভিনব: 'শামুক যেমন তাহার নিজের বাসভবনটি পিঠে করিয়া লইয়া উপস্থিত হয়, এ গ্রন্থখানিও তেমনি আপনার সমালোচনা আপনি বহন করিয়া বাহির হইয়াছে।'

প্রদীপ, শ্রাবণ ১৩০৫ [১/৮]:

২৪৭ 'যাচনা' [ভালবেসে সখি নিভৃত যতনে] দ্র কল্পনা ৭।১৫৯

কীর্তনের সুরে রচিত গানটি ৮ আশ্বিন ১৩০৪ [23 Sep 1897] তারিখে সাজাদপুরে রচিত হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য, এই সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ-রচিত 'রেখা শব্দাভিজ্ঞান বিদ্যা বা সঙ্কেত লিখন' [পৃ ২৫৭-৬১] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন' গানটি লেখক-উদ্ভাবিত সংকেত-লিপিতে [shorthand] লিখিত হয় [পৃ ২৬০] নমুনা হিসেবে।

সমগ্র ভাদ্র মাস ও আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহটি রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে কাটান। এই সময়ে লিখিত তাঁর কোনো পত্র পাওয়া যায় নি, সুতরাং শিলাইদহে পারিবারিক জীবন তাঁর কেমন ভাবে কাটছিল তার স্পষ্ট চিত্র দেওয়া কঠিন। 'আলিপুর জেল' ঠিকানা থেকে ২১ ভাদ্র [সোম 5 Sep] তারিখে লিখিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি পত্র থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শিলাইদহে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন

—কিন্তু 'ডেপুটিগিরি পরীক্ষা'র জন্য ব্যস্ত থাকায় তাঁর এই সময়ে যাওয়া হয় নি।[৫১] অন্য বন্ধুরা কেউ এসেছিলেন কিনা জানা যায় নি।

শিলাইদহ গৃহবিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক মিঃ লরেন্সের সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে। 'কবিকেশরী'-লেখক তাঁর সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সেটি সম্ভবত বর্তমান সময়ের কাছাকাছি ঘটেছিল: 'লরেন্সের জন্মোৎসব—...এই বৎসর ২৯শে শনিবার [? ২৯ শ্রাবণ শনি 13 Aug] সাহেবের জন্মোৎসব পর্ব্ব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। সাহেব রবীন্দ্রনাথের নিকট আব্দার জ্ঞাপন করিলেন যে, দেখ মিঃ ঠাকুর, আজ আমার জন্ম দিন; আজ আমাকে ছুটী দিতে হইবে। আমার পিতা মাতা থাকিলে আমার জন্মোৎসব করিত। সাহেবের আব্দার হৃদয়বানের হৃদয়ে বড় লাগিয়াছিল। তিনি বিশেষ আয়োজন করিয়া সাহেবের জন্মোৎসব পর্ব্ব সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্থানীয় স্কুলের ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। শিলাইদহ বাস ভবনের সম্মুখের ময়দান, বালকদিগের খেলিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাহেব বালকদিগকে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া তাহাদের দেশের নানাপ্রকার খেলা দেখাইলেন, Huddle Race, Long run, Long jump, High jump প্রভৃতি নানা প্রকার খেলা হইয়াছিল। এই সকল ক্রীড়াতে যাহারা ১ম, ২য় ও ৩য় হইয়াছিল—সেই সকল, বালকদিগকে রবীন্দ্রনাথ নানাপ্রকার পুস্তক, দোয়াত, ছুরী, ছবির বহি ইত্যাদি পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এবং পরিশেষে সকল বালকদিগকে প্রচুর পরিমাণে সন্দেশ ভোজন করিয়া [করাইয়া] সম্যক্ প্রকারে বালকদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।'[৫২] ১৯ শ্রাবণ [বুধ 3 Aug] সরকারী ক্যাশবহিতে একটি হিসাব দেখা যায়: 'বিরাহিমপুরের স্কুলের ছাত্রদের পারিতোষিক দিবার জন্য...১১৷৷/০'—এই হিসাব হয়তো লরেন্সের জন্মোৎসবের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী ভাদ্র-সংখ্যা ভারতী প্রকাশিত হয় 12 Sep [সোম ২৮ ভাদ্র]। এই সংখ্যায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি হল:

৩৮৫-৪১১ 'অধ্যাপক' দ্র গল্পগুচ্ছ ২১।২১৮-৩৬

৪১১-১৬ 'ভাষা ও ছন্দ' দ্র কাহিনী ৫।৯৩-৯৭

৪২১-৩১ 'মুখুয্যে বনাম বাঁড়ুয্যে' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৫৭৬-৮২ ['মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে']

৪৬৭-৭৭ 'প্রসঙ্গ কথা' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯।৫০৬-১২ ['ঐতিহাসিক চিত্র']

৪৭৯-৮০ 'সাময়িক সাহিত্য'

    ৪৭৯-৮০ সাহিত্য। বৈশাখ; ৪৮০ প্রদীপ। শ্রাবণ;

    ৪৮০ অঞ্জলি। আষাঢ়

রবীন্দ্রনাথ-আমন্ত্রিত খামখেয়ালী সভার অধিবেশনে 'অধ্যাপক' গল্পটি পঠিত হয়েছিল, একথা আমরা আগেই বলেছি। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটিও পূর্ব-রচিত, সম্ভবত অগ্র° ১৩০৪-এ শান্তিনিকেতনে লেখা। কবিতাটি সম্পর্কে আমরা আগে আলোচনা করেছি।

'মুখুজ্জে ও বাঁড়ুজ্জে' প্রবন্ধের 'মুখুজ্জে' হচ্ছেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের [1808-1888] পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় [1840-1922], জমিদার-সভা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের

অন্যতম নেতা; 'বাঁড়ুজ্জে' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [1848-1925], এক্ষেত্রে কংগ্রেস-আন্দোলনের নেতাদের প্রতিভূ। ১৫ শ্রাবণ [শনি 30 Jul] ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় প্যারীমোহন জমিদার-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হয়ে কন্‌গ্রেসপক্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশপূর্বক আক্ষেপ করেছিলেন যে, নানা অস্বাভাবিক কারণে দেশের যাঁরা 'ন্যাচারাল লীডার' বা স্বাভাবিক অধিনেতা বা প্রকৃত মোড়ল তাঁদের হাত থেকে ক্ষমতা বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ গবর্মেন্টের 'খয়ের-খাঁ' জমিদার-সম্প্রদায়ের মুখপাত্রের এই আক্ষেপের মধ্যে 'একটু পাকা চাল' লক্ষ্য করেছেন: 'উপরওআলা রাজপুরুষেরা আজকাল যখন স্পষ্টত নূতন জনসভাসকলের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন তখন এ কথা বলিবার সুযোগ হইয়াছে যে, সরকার যদি মুখুজ্জে মহাশয়দিগকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেন তাহা হইলে বাঁড়ুজ্জেমহাশয়রা আর এত বাড়াবাড়ি করিতে পারেন না।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জমিদারদের দেশের স্বাভাবিক অধিনেতা বলে মানতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য, ইংলন্ডের লর্ড প্রভৃতি উপাধিধারী জমিদারদের সঙ্গে দেশীয় জমিদারদের কোনো তুলনা হয় না, কারণ এদের অধিকাংশেরই প্রাচীনতার গৌরব নেই। তাছাড়া এদেশে ধনমর্যাদার চেয়ে জাতিগত কৌলীন্যের মর্যাদা অনেক বেশি, যার ফলে 'বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে যাহাদের সহিত তাঁহাদের আদানপ্রদান চলে তাহাদের কেহ হয়তো যাত্রার দলে বেহালা বাজায় এমনকি কেহ হয়তো কন্‌গ্রেসের উপাধিহীন প্রতিনিধি।'...বৈবাহিকমহাশয়েরা আভিজাত্যের ব্যূহ চারি দিক হইতেই ভেদ করিয়া দেন' [রবীন্দ্রনাথ নিজের পরিবারেই এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি লক্ষ্য করেছেন]। সুতরাং এই অবস্থায় 'বর্তমান জমিদারগণ যদি সেকালের দৃষ্টান্ত অনুসারে, কেবল রাজার মুখ না চাহিয়া, খেতাবের লক্ষ্য ছাড়িয়া, জনহিতসাধন ও দেশের শিল্পসাহিত্যের রক্ষণ-পালনে সহায়তা করেন তবেই তাঁহাদের ক্ষমতার সার্থকতা হয় এবং গৌরব বাড়িয়া উঠে।' কিন্তু এদেশের জমিদারেরা যে সেই পথ গ্রহণ করেন না তা রবীন্দ্রনাথ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন: 'সার আল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট হয়তো ভালো লোক এবং বড়োলোক, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁহা অপেক্ষা অনেক বেশি ভালো লোক এবং বড়োলোক, এবং সকলের বেশি, তিনি আমাদের স্বদেশী লোক। কিন্তু ক্রফ্‌ট্ সাহেব ভারত ছাড়িয়া স্বদেশে গিয়াছেন, সেই শোকে বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-নির্মাণে ধনীগণ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন; আর, বিদ্যাসাগর ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন, দেশের ধনশালীরা কোনোপ্রকার চেষ্টা করিলেন না! ইঁহারা দেশের ন্যাচারাল লীডর! আমাদের স্বাভাবিক চালক।' এঁদেরই ব্যঙ্গ করে তিনি 'উন্নতিলক্ষণ' কবিতায় লিখেছিলেন:

গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব
করিয়া উদর পূর্তি,
এঁরা বড়োলোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্তি।[৫৩]

রবীন্দ্রনাথ পরিশেষে লিখেছেন: 'সাহেবের জন্য তাঁহারা অনেক করেন, কিন্তু সাহেবেরা চেষ্টা করিলেও তাঁহাদিগকে দেশীয় সাধারণের স্বাভাবিক অধিনেতা করিতে পারিবেন না। কারণ, ইংরেজ-রাজা অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারেন না। যদি তাঁহারা আপন পুরাতন উচ্চ স্থান অধিকার করিতে চাহেন তবে গবর্মেন্ট-প্রাসাদের গম্বুজটার দিকে অহরহ ঊর্ধ্বমুখে না তাকাইয়া নিম্নে একবার দেশের দিকে, সাধারণের দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে।'

কিন্তু ‘বাঁড়ুজ্জে’দেরও রবীন্দ্রনাথ ছেড়ে দেন নি; আশ্বিন-সংখ্যায় ‘অপর পক্ষের কথা’ [দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০।৫৮৩-৮৭] প্রবন্ধের লক্ষ্য তাঁরাই। যথাস্থানে বিষয়টি আলোচিত হবে।

এবারের ‘প্রসঙ্গ কথা’র বিষয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-সম্পাদিত ‘ঐতিহাসিক চিত্র’ ত্রৈমাসিকপত্রের প্রস্তাবনা। মুদ্রিত আকারে এই প্রস্তাবনা কিছুদিন আগেই বিভিন্ন ব্যক্তি এবং সংবাদ ও সাময়িকপত্রের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। 23 Jul [শনি ৮ শ্রাবণ] অমৃতবাজার পত্রিকা এ-সম্পর্কে লেখে: ‘We have received a prospectus of a Bengali Quarterly to be called "The Aitihasik Chitra," which has secured the co-operation of several reputed Bengali writers, among whom the name of Babu Rabindra Nath Tagore may be mentioned.’ রবীন্দ্রনাথও তাঁর রচনার প্রথমেই এই মুদ্রিত প্রস্তাবনার উল্লেখ করে তার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ইতিহাস পড়তে রবীন্দ্রনাথ ভালবাসতেন। অল্প বয়স থেকে তাঁর অনেক রচনার বিষয় ইতিহাস। কিন্তু ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র বন্ধুত্ব ও ভারতী-র সম্পাদনা-সূত্রে বর্তমান পর্বে তাঁর ইতিহাস-বিষয়ক রচনার প্রাচুর্য দেখা যায়। এই-সব রচনার অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য ইতিহাস-রচনার তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ। এ-প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস যে অন্য দেশের ইতিহাসের আদর্শে রচিত হওয়া উচিত নয়, এ-কথা তিনি বারবারই বলেছেন। কল্পনা ও সহানুভূতির সাহায্যে বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীকে একত্রিত করে মৃত তথ্যগুলিতে জীবনসঞ্চার করা ইতিহাস- রচনার আদর্শ এমন একটি ধারণা তাঁর এই প্রবন্ধগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে।

প্রথমেই তিনি রাজপুত, মারাঠা ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহাসিক সচেতনতার উল্লেখ করে জনবন্ধনের দৃঢ়তাই তার কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, ‘জীবের ধর্ম যেমন বর্তমানে জীবনরক্ষা এবং ভবিষ্যতে বংশানুক্রমে আপনাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা, তেমনি যখন বহুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন লোককে কোনো একটি বিশেষ মত বা ভাব বা ধারাবাহিক স্মৃতিপরম্পরা এক জীবন দিয়া এক জীব করিয়া তোলে তখন সে বহিঃশত্রুর আক্রমণে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে, এবং ভবিষ্যৎ অভিমুখে আপন ব্যক্তিত্ব, আপন সম্প্রদায়গত ঐক্যকে প্রেরণ করিবার জন্য যত্নবান হইয়া উঠে। ইতিহাস তাহার অন্যতম উপায়।’ এইজন্যই আর্যেরা যখন ভারতবর্ষে এসে প্রাকৃতিক বাধা ও আদিম অনার্যদের সঙ্গে সংগ্রামে দলবদ্ধ হয়েছিল, যখন বীরপুরুষদের স্মৃতি তাদের বীর্যে উৎসাহিত করত, তখন তাদের লিপিহীন সাহিত্যে ইতিহাসগাথার প্রাদুর্ভাব ছিল বলেই তাঁর বিশ্বাস। সেই-সব পুরোনো খণ্ড-ইতিহাস বহুকাল পরে নানা বিকারসহকারে রামায়ণ ও মহাভারতে সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু আর্যেরা যখন ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হয়ে তাদের জাতিগত ঐক্যসূত্র হারিয়ে ফেলল, তখন বর্ণগত সামাজিক ঐক্য ও ভাটেদের মুখে ‘শ্রেণী-গোত্র-গাঁই-মেল-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত সাহিত্য’ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে—জনগত ঐক্যের অভাবে ইতিহাস রক্ষার আগ্রহ থেমে গেছে।

এই অবস্থায় বর্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যে যে ইতিহাস-উৎসাহ জেগে উঠেছে তাকে রবীন্দ্রনাথ একটি আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী ‘বিশেষ ধরণের সংক্রামক রচনা-কণ্ডু’ বলে মনে করেননি, কংগ্রেস প্রভৃতির বিক্ষোভে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলি ঘনিষ্ঠতর হয়ে জনসাধারণের ব্যক্তিগত পল্লীগত বিচ্ছিন্নতা ঘুচে গিয়ে সুখে-দুঃখে মানে অপমানে চিন্তায়-চেষ্টায় যে ঐক্যের বেগ দেখা দিয়েছে এই ইতিহাস বুভুক্ষাকে তারই একটি পরিণতি রূপে তিনি অনুভব করেছেন। পুরাবৃত্তের দুর্গম পথে পরিভ্রমণ করার এই আগ্রহ জাতীয় গৌরব অনুসন্ধানের জন্য নয়, দেশকে প্রকৃতরূপে প্রত্যক্ষরূপে সম্পূর্ণরূপে জানার জন্য—তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস,

'ইতিহাসের পথ বাহিয়া ভারতবর্ষকে যদি আমরা সমগ্রভাবে দেখিতে পাই আমাদের লজ্জা পাইবার কারণ ঘটিবে না। তাহা হইলে আমরা এমন একটি নিত্য আদর্শ লাভ করিব, যাহা সকল পরাভব ও অবমাননার ঊর্ধ্বে আপন উচ্চশির অম্লান রাখিতে পারিয়াছে', যে আদর্শ য়ুরোপের আদর্শের দ্বারা পরিমেয় নয়।

এরপরে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের আদর্শের পরিণতি প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, তা তাঁর পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতনতা ও সুনিপুণ বিশ্লেষণের পরিচয় বহন করে—এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা যেন ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার: 'ভারতবর্ষ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—য়ুরোপ প্রবৃত্তিকে লালন করিয়া আত্মহত্যার উদ্‌যোগ করিতেছে। নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আমাদের আসক্তি ছিল না বলিয়া বিদেশীর নিকট আমরা দেশকে বিসর্জন দিয়াছি,—নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আসক্তি সযত্নে পোষণ করিয়া য়ুরোপ আজ কোন্‌ রক্তসমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অস্ত্রে শস্ত্রে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া তুলিয়া তাহার এ কী বিকট মূর্তি। কী সন্দেহ ও কী আতঙ্কের সহিত য়ুরোপের প্রত্যেক রাজশক্তি পরস্পরের প্রতি ক্রূর কটাক্ষপাত করিতেছে।...আফ্রিকায় এসিয়ায় য়ুরোপের ক্ষুধিত লুব্ধগণ আসিয়া ধীরে ধীরে এক-এক পা বাড়াইয়া একটা থাবায় মাটি আক্রমণ করিতেছে এবং আর-একটা থাবা সম্মুখের লোলুপ অভ্যাগতের প্রতি উদ্যত করিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার হিংসা ও লোভে অদ্য পৃথিবীর চারি মহাদেশ ও দুই মহাসমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার মহাজনদের সহিত মজুরদের, বিলাসের সহিত দুর্ভিক্ষের, দৃঢ়বদ্ধ সমাজনীতির সহিত সোশ্যালিজ্‌ম ও নাইহিলিজ্‌মের দ্বন্দ্ব য়ুরোপের সর্বত্রই আসন্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রবৃত্তির প্রবলতা, প্রভুত্বের মত্ততা, স্বার্থের উত্তেজনা কোনো কালেই শান্তি ও পরিপূর্ণতায় লইয়া যাইতে পারে না, তাহার একটা প্রচণ্ড সংঘাত, একটা ভীষণ রক্তাক্ত পরিণাম আছেই।' নৈবেদ্য-এর অনেকগুলি কবিতায় তিনি এই 'লোভক্ষুধানল'কে ধিক্কার জানিয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন: 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে'–1914-18-র প্রথম মহাযুদ্ধ এই অপঘাতের প্রথম কিস্তি।

এই য়ুরোপীয় আদর্শের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে ভারতীয় আদর্শেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার আহ্বান জানিয়ে লিখেয়েছেন: "ঐতিহাসিক চিত্র ভারত-ইতিহাসের বন্ধনমোচন-জন্য ধর্মযুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত। আশা করি ধর্ম তাহার সহায় হইয়া তাহাকে রক্ষা ও তাহার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিবেন।' অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কেবল ধর্মের সহায়ের উপর নির্ভরশীল না থেকে পত্রিকাটির জন্য নিজেও সহায়-সম্বল সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছেন।

এবারের 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ-সংখ্যা সাহিত্য-তে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'মহারাজ রামকৃষ্ণ', শ্রাবণ-সংখ্যা প্রদীপ-এ যোগেশচন্দ্র রায়ের 'জীবজাতি নির্ব্বাচন' ও আষাঢ়-সংখ্যা অঞ্জলি-তে মুদ্রিত 'বণিক বন্ধু' প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। দীর্ঘ উদ্ধৃতি-বহুল এই আলোচনা রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য-বর্জিত।

বীণাবাদিনী, ভাদ্র ১৩০৫ [২।২]:

১৭-১৮ শ্রীরাগ-চৌতাল। আইল শান্ত সন্ধ্যা দ্র গীত ৩/৮৪৬, স্বর ৪৫

গানটি রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো গীত-গ্রন্থে পাওয়া যায় নি। "স্বরলিপিযুক্ত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে ও 'বীণাবাদিনী'র ১৩০৫ ভাদ্র সংখ্যায় পাওয়া যায়।"—গীতবিতান-গ্রন্থপরিচয় ৩।৯৯৮।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় আসেন ৮ আশ্বিন [শুক্র 23 Sep] তারিখে; ১২ আশ্বিন [মঙ্গল 27 Sep] তিনি শিলাইদহে প্রত্যাবর্তন করেন। এর মধ্যে তিনি যথারীতি ভ্রাম্যমান—৯ আশ্বিন পার্ক স্ট্রীট ও 'যোড়াগির্জা হইতে আসার', ১০ই 'বিডন ষ্ট্রীট যাতায়াতের', এবং ১১ই 'পার্ক স্ট্রীট হইতে বালিগঞ্জ' ও 'যোড়াসাঁকো আসিবার' হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। তাঁর কলকাতা আসার অন্যবিধ প্রয়োজনও থাকতে পারে, কিন্তু একটি পারিবারিক সমস্যার সমাধানও তাঁর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরার বয়স তখন প্রায় পঁচিশ—ঠাকুর পরিবারে মেয়েদের বিয়ের বয়সের পক্ষে অস্বাভাবিক রকমের বেশি। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর পরিবারে ইঙ্গবঙ্গীয় পরিবেশে শিক্ষিত নারীপুরুষের সামাজিক মেলামেশায় স্বাধীনতা ছিল—ফলে এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ঘটাও ছিল স্বাভাবিক। হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবীর সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরীর বিবাহের পর চৌধুরী পরিবারের অনেকেরই নিত্য গতায়াত শুরু হয় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সান্ধ্য আসরে—পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকের অনেকগুলি পৃষ্ঠায় চৌধুরীভ্রাতা যোগেশচন্দ্র ও প্রমথনাথের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই মেলামেশার একটি পর্যায়ে উদীয়মান ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর বিবাহের প্রস্তাব জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্মতি লাভ করে এবং রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিতব্য পত্র থেকে জানা যায় তাঁর 'পীড়াপীড়ি'তে ইন্দিরা দেবীও এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন এবং ইন্দিরা দেবীর পত্রে এই সংবাদ জেনে রবীন্দ্রনাথও 'অন্তরের সঙ্গে' তার অনুমোদন করে ও উৎসাহ দিয়ে তাঁকে পত্র লেখেন। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনী চেয়েছিলেন বিবাহের পর জামাতা তাঁদের সঙ্গেই একত্রে বাস করুন, যা প্রথমে যোগেশচন্দ্র মেনে নিতে পারেন নি। ফলে জ্ঞানদানন্দিনী বিরূপ হন তাঁর প্রতি, প্রস্তাবিত বিবাহ ভেঙে যাওয়ার মুখে সরলা দেবীর প্ররোচনায় প্রমথনাথ ইন্দিরা দেবীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন যা তিনি ও জ্ঞানদানন্দিনী সানন্দে গ্রহণ করেন। কিন্তু এর পারিবারিক প্রতিক্রিয়া, বিশেষত চৌধুরীপরিবারের দিক দিয়ে, খুবই তীব্র ভাবে দেখা দিয়েছে। আশুতোষ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে রবীন্দ্রনাথের উপর দায়িত্ব পড়ল এই সমস্যার সমাধানের। ইন্দিরা দেবী 20 Sep [মঙ্গল ৫ আশ্বিন] একটি পত্রে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন যে, সেইদিন ভোরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিলাইদহে যান।[৫৪] আমাদের অনুমান, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শের জন্যই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও বলেন, কিন্তু স্বল্প অবকাশে এই 'delicate' বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত না হওয়ায় শিলাইদহে ফিরে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ পত্র লিখে সেটি বিবেচনার জন্য সুরেন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন। এ বিষয়ে 'রবিবার' [১৭ আশ্বিন 2 Oct] ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন: 'আজ সকালে সুরেন রবিকার এক চিঠি পেলে, সেই সঙ্গে আশুবাবুকে লেখা তাঁর এক মস্ত চিঠি পাঠিয়েচেন, আমাদের দেখাবার জন্যে। যা লিখেচেন বেশ লিখেচেন বলা বাহুল্য, চারিদিকে বেশ ভাল করে' দেখিয়ে বুঝিয়ে ও গুছিয়ে, কেবল পূর্ব ঘটনার সমস্ত খুঁটিনাটি ভাল করে জানেন না বলে' দু-চার জায়গায় সত্যের একটু অপলাপ ঘটেচে, এমন বিশেষ গুরুতর কোন গরমিল নয়, তবু যখন কাজটা হাঙ্গাম করে করাই হচ্ছে তখন আগাগোড়া যথাসাধ্য সঠিক রাখাই ভাল—তাই আমি ভাবচি আজ দুফুরবেলা বসে বসে চিঠিখানার সঙ্গে যেখানে যেখানে আমার মতের অনৈক্য, একটু পেন্সিলের দাগ দিয়ে আর একটা আলাদা চিঠিতে সে সব বিষয়ে আসল তথ্য লিখে সবসুদ্ধ তাঁকে পাঠিয়ে দেব, তারপর তিনি যেমন ভাল বিবেচনা করেন আশুবাবুকে পাঠাতে পারেন।'[৫৫] 'সোমবার' তিনি লিখেছেন: 'সে সম্বন্ধে আমার মতে কি কি সংশোধন

আবশ্যক সেই সব লিখে রবিকাকে এইমাত্র এক মস্ত চিঠি শেষ করলুম—এইরকম ৪/৫ খানা কাগজ পুরে এক প্রকাণ্ড চিঠি।'[৫৬] রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি পেয়ে তাঁর পূর্ববর্তী পত্রের যথোপযুক্ত সংশোধন করে দীর্ঘ ২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি চিঠি আশুতোষ চৌধুরীকে লেখেন সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের প্রত্যাশা জানিয়ে। শিলাইদহে এসে আলোচনারও আহ্বান জানান তিনি। ঈষৎ তিক্ততা বজায় রেখে ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীর বিবাহ হয় কয়েক মাস পরে ১৭ ফাল্গুন [মঙ্গল 28 Feb 1899] তারিখে।

আশ্বিন-সংখ্যা ভারতী-তে রবীন্দ্র-রচনাই সর্বাধিক স্থান গ্রহণ করেছে:

৪৮১-৯৭ 'রাজটীকা' দ্র গল্পগুচ্ছ ২১। ২৩৭-৪৯ ['রাজটিকা']

৪৯৮-৫০০ 'মদনভষ্মের পূর্ব্বে' দ্র কল্পনা ৭। ১২৯-৩১ ['মদনভস্মের পূর্বে']

৫০০-০১ 'মদনভষ্মের পর' দ্র ঐ ৭। ১৩১-৩২ ['মদনভস্মের পরে']

৫০১-১০ 'কোট্ বা চাপ্‌কান' দ্র সমাজ ১২। ২২৩-২৯

৫১০-১৮ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' দ্র সাহিত্য ৮। ৪৪৬-৫১

৫২২-৩৪ 'সাকার ও নিরাকার' দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৫১৩-২০

৫৪০-৪৯ 'অপর পক্ষের কথা' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৫৮৩-৮৭

৫৬৭-৭৩ 'প্রসঙ্গ কথা' দ্র ঐ ১০। ৫৬২-৬৬

৫৭৪-৭৬ 'সাময়িক সাহিত্য'

> ৫৭৪ সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা; ৫৭৪-৭৫ প্রদীপ। ভাদ্র; ৫৭৫-৭৬ উৎসাহ। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়; ৫৭৬ অঞ্জলি। শ্রাবণ

'রাজটিকা' গল্পটি যেন পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে' প্রবন্ধের কল্পনাশ্রিত শিল্পরূপ। উপাধিলোলুপ অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি পরিহাস-বাণ নিক্ষেপ করা উভয় রচনারই লক্ষ্য। এরই সঙ্গে বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত 'কোট বা চাপ্‌কান' প্রবন্ধের বক্তব্যের কিছু আভাস পাওয়া যায় প্রমথনাথের আচারব্যবহারে।

'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে' যুগ্ম-কবিতা বহু পূর্বে ১১-১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ [24-25 May 1897] তারিখে শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন: 'এই কবিতাযুগলের ছন্দ ও ধ্বনি পরমরমণীয়। বিশেষতঃ "মদনভষ্মের পর" ইতিশীর্ষক কবিতাটির রচনাকৌশল ও শব্দচয়নচাতুরী অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। শিল্পী কবিতা দেবীর মন্দিরগঠনে অত্যন্ত অবহিত হইয়া, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রতি কিছু ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বোধ করি অনতিক্রমণীয় কেন না, শব্দসঙ্গীত-সৃষ্টির মোহে একান্ত মুগ্ধ হইলে অন্য দিকে কবির দৃষ্টি থাকে না।'[৫৭] সূচীপত্রে রচয়িতার নাম না থাকলেও তাঁর পরিচয় সুরেশচন্দ্রের কাছে গোপন ছিল না এবং এই সময়ে তাঁর সমালোচনার মূল ধূয়া হল এই যে, রবীন্দ্র-কবিতায় ভাবসৌন্দর্যের ঘাটতি ধ্বনিমাধুর্য দিয়ে মেটানো হচ্ছে!

বাঙালির বিলাতী পোশাকের মোহকে ধিক্কার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'কোট বা চাপকান' প্রবন্ধে। এই ধিক্কার অবশ্য নতুন নয়, চৈতালি-র 'পরবেশ' কবিতায় এদের উদ্দেশেই তিনি লিখেছিলেন:

'কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ।
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ।'

পরেও 'উন্নতিলক্ষণ' কবিতাতে এদের কথা আছে।

কোটের বদলে চাপকানের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন, তার মধ্যে অবশ্য নতুন কথা আছে। চাপকান মুসলমানী পোশাক এই মত অগ্রাহ্য করে তিনি একে 'হিন্দুমুসলমানের মিলিত বস্ত্র' বলে উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ ও মুসলমান শাসকদের মধ্যে পার্থক্য এই কারণেই, কেননা 'মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই; এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনই স্বভাবের অমোঘ নিয়মে কেবল আপন বিপুলতা আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য-নির্মাণ, দন্তকার্য, নৃত্য, গীত, এবং রাজকার্য, মুসলমানের আমলে ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে।' সুতরাং 'এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনোদিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে, তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়াও বিচিত্র হইবে না। হিন্দু মুসলমানে ধর্মে না-ও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে,—আমাদের শিক্ষা আমাদের চেষ্টা আমাদের মহৎ স্বার্থ সেইদিকে অনবরত কাজ করিতেছে।' রবীন্দ্রনাথ এখানে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতাদের আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়েছেন, কিন্তু নানাধরনের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বিভেদকামী বিদেশী শক্তির প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের বহু রাজনৈতিক প্রবন্ধ হিন্দু-মুসলমান মিলনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধটি বস্তুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র উদ্দেশ্যে লেখা একটি খোলা চিঠি। শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতী-র 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে ইতিহাস ও উপন্যাসের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের দৃষ্টিভঙ্গির যে সমালোচনা করেছিলেন, একটি ব্যক্তিগত পত্রে অক্ষয়কুমার সে-বিষয়ে মন্তব্য করেন—তার প্রাসঙ্গিক অংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাই পূর্বোক্ত আলোচনার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্য বিশদ করেছেন। 'ঐতিহাসিক রস' নামে একটি নূতন রসের উল্লেখ করে শেক্স্‌পীয়রের 'অ্যান্টনি ও ক্লিয়োপেট্রা' নাটকের উদাহরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন: 'আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। হৃদবিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর, প্রেমদ্বন্দ্বের সঙ্গে একবন্ধনের দ্বারা বদ্ধ রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন। ক্লিয়োপেট্রার বিলাসকক্ষে বীণা বাজিতেছে, দূরে সমুদ্রতীর হইতে ভৈরবের সংহারশৃঙ্গধ্বনি তাহার সঙ্গে এক সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে। আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।' কিন্তু কাব্যের মতো ইতিহাসেরও সিদ্ধরস আছে, তার ব্যতিক্রম করে ইতিহাসের হিরোকে ভিলেন-রূপে চিত্রিত করে বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অপরাধ করেছেন—অক্ষয়কুমারের এই অভিযোগের উত্তর

‘তাঁহাদের গ্রন্থের বিশেষ সমালোচনা-স্থলে বলা যাইতে পারে’ বলে রবীন্দ্রনাথ স্থগিত রেখেছেন—কিন্তু ভবিষ্যতে বিষয়টি নিয়ে আর আলোচনা করেন নি।*

‘সাকার ও নিরাকার’ প্রবন্ধ ‘শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি. এ. প্রণীত’ ‘সাকার ও নিরাকারতত্ত্ব’ গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রচিত। দীর্ঘকাল পূর্বে ১১ শ্রাবণ ১২৯২ [26 Jul 1885] তারিখে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ‘সাকার ও নিরাকার উপাসনা’-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, প্রবন্ধটি শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতী ও ভাদ্র-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে মুদ্রিত হয় [দ্র রবিজীবনী ৩। ১২-১৩]। তারুণ্যের উত্তেজনায় উক্ত প্রবন্ধে যে মত ঈষৎ তীব্রভাবে উচ্চারিত হয়েছিল, বর্তমান সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধে সেই একই বক্তব্য পরিণত মননশীলতা ও রচনানৈপুণ্যে সংযত আকারে পরিবেশিত হয়েছে। কিছুদিন পরে ৭ পৌষ [21 Dec] শান্তিনিকেতনে অষ্টম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, সেটি পৌষ-মাঘ-সংখ্যা ভারতী [পৃ ৮৮৪-৯১] ও মাঘ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী [পৃ ১৬৮-৭১]-তে মুদ্রিত হয় [দ্র আধুনিক সাহিত্য-পরিশিষ্ট ৯। ৫৩৭-৪১]। উপনিষদের মন্ত্রসমূহ কত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন, এই রচনাগুলিতে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

‘মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে’ ও ‘অপর পক্ষের কথা’ যুগ্ম-প্রবন্ধ—প্রথমোক্ত প্রবন্ধে ইংরেজ-প্রসাদ-লোভী জমিদারদের দেশের স্বাভাবিক অধিনেতা হবার যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছিলেন, শেষোক্ত প্রবন্ধে রাজনৈতিক নেতাদের দাবিও অগ্রাহ্য করলেন: ‘জমিদারগণ দেশের জন্য যাহা করেন তাহা গবর্মেন্টের মুখ তাকাইয়া, ইঁহারা যাহা করেন তাহাও ইংরেজের প্রতি লক্ষ রাখিয়া। তাহার ভাষা ইংরেজি, তাহার প্রণালী ইংরেজি, তাহার প্রচার ইংরেজিতে। ইংরেজ-দৃষ্টির প্রবল আকর্ষণ হইতে ইঁহারা আপনাদিগকে প্রাণ ধরিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন না।’ অথচ দেশকে স্পর্শ করতে হলে দেশের ভাষা বলা ও দেশের বস্ত্র পরা আবশ্যিক—এরই মাধ্যমে দেশবাসীর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা সম্ভব। ভিন্নভাষী ভারতকে এক করার জন্য কংগ্রেসের ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে গ্রহণ করতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি নেই—কিন্তু বাংলার প্রাদেশিক কনফারেন্সেও ইংরেজি ব্যবহার করার প্রলোভন তাঁর কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। ‘অতএব ভালো করিয়া দেখিলে দেখা যায়, জমিদারের চরিত্রে যে ঘুণ ঢুকিয়াছে আমাদের জননায়কদের চরিত্রেও সেই ঘুণ। ইংরেজের কৈশিকার্ষণ আমাদের দুই পক্ষেরই মস্তকের উপরে। ইংরেজকে বাদ দিলে আমাদের কর্তব্যে স্বাদ থাকে না, সম্মানে গৌরব থাকে না, বেশভূষায় মর্যাদা থাকে না; আমাদের দেশের লোকের খ্যাতি অপেক্ষা গবর্মেন্টের খেতাব, আমাদের দেশের লোকের আশীর্বাদ অপেক্ষা বিলাতি কাগজের রিপোর্ট আমাদের কাছে শ্রেয়।’ এর মধ্যে বিপদ কোথায় সে-কথা তিনি বলেছেন প্রবন্ধের গোড়ার দিকে: ‘ইংরেজি-শিক্ষিত এবং ইংরেজিতে অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে যে কেবল শিক্ষার তারতম্য তাহা নহে, শিক্ষার শ্রেণীভেদ বর্তমান। পরস্পরের বিশ্বাস সংস্কার রুচি এবং চিন্তা করিবার প্রণালী ভিন্ন রকমের হইয়া যায়।’ এই অবস্থায় জনগণ ও জননায়কদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটার সম্ভাবনা সে উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

লর্ড রিপনের সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন আইন প্রবর্তিত হওয়ার পরে করদাতাদের ভোটে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের দ্বারা কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত হচ্ছিল, যদিও ইংরেজ শাসকদের কর্তৃত্ব সেখানে ভালোভাবেই বজায় ছিল। তবুও দেশীয় কাউন্সিলরদের ক্ষমতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি 1898-এ ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল আনয়ন করেন। স্বভাবতই

রাজনৈতিক নেতারা এই বিলের বিরোধিতা করতে থাকেন। বিলটি বিধিবদ্ধ হবার পূর্বেই অসুস্থতার জন্য ম্যাকেঞ্জি অবসর গ্রহণ করেন [Apr 1898]। বিলেতে ফিরে তিনি একটি ভোজসভায় বাঙালি কাউন্সিলরদের উদ্দেশে যে বিষোদগার করেন, এবারের 'প্রসঙ্গ কথা'য় তার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'তিক্ত বড়িকে মিষ্ট-আকারে গেলানো রাজনীতির নৈপুণ্য। রাজ্যশাসনের পথকে যত সংঘাত-সংঘর্ষ-হীন করিয়া তোলা যায় ততই রাজ্যের পক্ষে এবং শাসনকর্তাদের পক্ষে মঙ্গল।...আজকাল ইংরেজ-শাসনে এই নীতির ব্যতিক্রম দেখিতেছি। ম্যাকেঞ্জি-সাহেব যখন বাংলার রাজপদে ছিলেন, যখন একেবারে অনেকগুলা অপ্রিয় বিধির প্রস্তাব উপলক্ষে সমস্ত দেশ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হইয়া আছে, সেই সংকটের সময়, দেশের সেই দুর্ভাগ্যের সময়, সেই কঠোর বিলগুলি পাস করিবার সময় ম্যাকেঞ্জি-সাহেব বঙ্গভূমির ক্ষতবেদনার উপরে অকারণে তাঁহার বাক্যহলাহলজ্বালা যোগ করিয়া দিলেন।...ইহাতে অমিশ্র কুফল ছাড়া আর কিছু দেখি না। ম্যুনিসিপ্যাল-বিল পাস করা যদি কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত হয় তবে ভূতপূর্ব বঙ্গাধিপ এ সম্বন্ধে যতই চুপ করিয়া থাকেন ততই ভালো। তিনি বিলাতে বসিয়া খানার পরে অসংযত বক্তৃতা করিয়া উপদ্রব বাড়াইয়া তুলিতেছেন। তিনি কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গিতে বাঙালি-বিদ্বেষ ও স্বজাতিপক্ষপাত দেখাইয়া কেবল যে আত্মমর্যাদা লাঘব করিতেছেন তাহা নহে, শাসনকার্যকেও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছেন।' দেশীয় আত্মমর্যাদার উপর যে-কোনো আঘাতকে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল এইভাবেই প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছেন।

এবারের 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে আলোচিত পত্রিকাগুলির যে-সমস্ত প্রবন্ধের কথা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধের বাহুল্য লক্ষণীয়—কিন্তু সেগুলি তিনি উল্লেখমাত্রেই ক্ষান্ত হয়েছেন; বিস্তৃত মন্তব্য করেছেন ভাদ্র-সংখ্যা প্রদীপ-এ মুদ্রিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'ছেলেকে বিলাতে পাঠাইব কি?' প্রবন্ধ উপলক্ষে: 'এসম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এই যে, বিলাত ফের্‌তার দল যত সংখ্যায় বাড়িবে ততই তাঁহাদের বাহ্য বেশভূষার অভিমান ও উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য কমিয়া যাইবে। প্রথম চটকে যে বাড়াবাড়ি হয় তাহার একটা সংশোধনের সময় আসে। হিন্দুসমাজও ক্রমে আপন অসঙ্গত ও কৃত্রিম কঠোরতা শিথিল করিয়া আনিতেছে তাঁহারাও যেন তাঁহাদের পুরাতন পৈতৃক সমাজের প্রতি অপেক্ষাকৃত বিনীতভাব ধারণ করিতেছেন। তাহা ছাড়া বোধ করি কন্‌গ্রেস্‌ উপলক্ষ্যে বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের সবল ও সরল জাতীয় ভাবের আদর্শ আমাদের পক্ষে সুদৃষ্টান্তের কাজ করিতেছে।' শিক্ষা-বিষয়ক পত্রিকা অঞ্জলি-র শ্রাবণ-সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য: 'আমরা আশা করি, অঞ্জলিতে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত প্রবন্ধ বাহির হইবে; নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শিক্ষকেরা বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন না। আজ কাল শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া ইংরাজিতে এত পুস্তক এবং পত্রিকা বাহির হইতেছে যে শিক্ষাসুগমের নূতন নূতন উপায় সম্বন্ধে লেখা শেষ করা যায় না।' রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিশ্চয়ই এই-সব ইংরেজি পুস্তক ও পত্রিকা প্রচুর পরিমাণে পাঠ করতেন—শিক্ষাচিন্তা তাঁর মানসজগতের একটি অন্যতম অংশ, সন্তানদের জন্য শিক্ষাবিধি রচনা বর্তমান সময়ে তাঁর প্রধান লক্ষ্য হলেও পরে সেই চিন্তা শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রযুক্ত হয়েছে।

উৎসাহ, আশ্বিন ১৩০৫ [২ / ৬]:

২০১ 'আশা' দ্র কল্পনা ৭। ১৪১-৪২

কবিতাটির রচনাকাল আমাদের জানা নেই—প্রকাশকাল দেখে অনুমান করা যায় যে, অন্তত আশ্বিন ১৩০৫-এর পূর্বে কবিতাটি রচিত হয়েছিল।

বীণাবাদিনী, আশ্বিন ১৩০৫ [২ / ৩]:

৩৭-৪০ (ভারতের গান) গৌড় মল্লার—চৌতাল। ঢাকোরে মুখচন্দ্রমা জলদে

৪১-৪৪ (প্রণয়ের গান) কুকভ—ঢিমাতেতালা। দেখো সখা ভুল করে ভালবেস না

গানগুলির স্বরলিপিকার সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

১ কার্তিক [সোম 17 Oct] রবীন্দ্রনাথ আবার কলকাতায় আসেন। মহর্ষি এই সময়ে পার্ক স্ট্রীটের ভাড়া বাড়ি ত্যাগ করে পূর্বপুরুষের বসতবাটীতে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প নিয়েছিলেন। তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসেন ২৬ কার্তিক [শুক্র 11 Nov] তারিখে। জানি না, এই বিষয়ে পরামর্শ ও আয়োজন করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন কিনা। কিন্তু শিয়ালদহের স্টেশন থেকে পার্ক স্ট্রীট হয়ে তিনি জোড়াসাঁকোয় এসেছিলেন এরূপ খবর আছে সরকারী ক্যাশবহিতে: 'বিরাহিমপুর হইতে আগমন করায় সেয়ালদহার ষ্টেসেন হইতে পার্কষ্ট ীট হইয়া যোড়াসাকোর বাটীতে আসার গাড়ী ভাড়া ১ কার্ত্তিকের ২'। পরের দিনও তিনি পার্ক স্ট্রীট যান ও নিজের খরচে বিডন স্ট্রীট যাতায়াত করেন। ৩ কার্তিক [বুধ 19 Oct] তিনি শিলাইদহে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতির সঙ্গেও কিছু পরিমাণে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য এই সময়ে 'উত্তরাধিকারী সৃজন' মানসে পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করতে চাইলে তাঁর ভ্রাতা 'বড়ঠাকুর' সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা [1862-1935] 'গভর্নমেন্টের শরণাপন্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন রাজকর্ম্মচারীদের সহায়তায় কলিকাতায় আইনজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণে তৎপর' হন। সত্যরঞ্জন বসু 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'কাজেই মহারাজ রাধাকিশোরের অনুগত মহিমচন্দ্র [দেববর্মা] কলিকাতা যাইয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সেখানে আছেন—রাজেন্দ্র মুখার্জ্জির অতিথি হিসাবে তাঁহার বাড়ীতেই। রবীন্দ্রনাথ নিজের বলিয়াই বিষয়টি গ্রহণ করিলেন—নিজের যাহা করণীয় সবই করিলেন। মহিমঠাকুর নিম্নোক্ত কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উক্তি বলিয়া মহারাজকে চিঠিতে জানাইলেন—(কার্ত্তিক ১৩০৫)..."আমি রাজখান্দান জানি না—এই মাত্র জানি সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার প্রতি অবজ্ঞার পাপ কোন মতেই প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নহে—পৃথিবীতে জন্মিয়া সকলেই রাজা হয় না—কিন্তু রাজভক্ত হইবার অধিকার সকলেরই আছে—এমন ক্ষেত্রে যে তাহা জানিয়া শুনিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক তাহার প্রতি আমার সহানুভূতি মাত্র নাই"।'[৫৮] আশুতোষ চৌধুরী, নাটোরের মহারাজা ও আনন্দমোহন বসু বড়ঠাকুরকে সমর্থন করতে অস্বীকার করেন। অমৃতবাজার পত্রিকা ও ইংলিশম্যান তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। সত্যরঞ্জন বসু লিখেছেন: 'মনে হয় এই সমস্ত যোগাযোগ ও আলোচনার ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।'[৫৯] আমরা জানি, এই সময়ে তিনি শিলাইদহ-বাসী ও কলকাতায় এলেও তাঁর অবস্থানকাল সংক্ষিপ্ত—সুতরাং এই-সব যোগাযোগ তিনি পত্রের মাধ্যমেই করেছিলেন বলে মনে হয়, তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে ৮-৩১ আশ্বিনের ডাকমাশুলের খরচ এক টাকা সাড়ে বারো আনা! এই খরচে তখনকার দিনে অজস্র চিঠি পাঠানো যেত, দুঃখের বিষয় তার একটিও আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর আর-একটি যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র কবি মনোমোহন ঘোষের রবীন্দ্রনাথকে লেখা 17 Oct [সোম ১ কার্তিক]-এর পত্রে। ঢাকা কলেজে ইংরেজি

সাহিত্য পড়ানোর কাজে ক্লান্ত হয়ে তিনি লিখেছেন: 'I sometime feel sorry that I did not take advantage of the opening which you once kindly discovered for me in Tipperah.'[৬০]—এর থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্য ত্রিপুরার রাজ-সরকারে কোনো কর্মের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরে তাঁরই প্রস্তাবে অক্ষয় চৌধুরীর জামাতা যতীন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ত্রিপুরায় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন।

'কবিকেশরী'-প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বিবরণে এই বছরে কার্তিক মাসে শিলাইদহে আলু চাষের জন্য রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা করেছেন। কৃষিতত্ত্ববিদ্ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শদাতা ছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের যে-কয়টি চিঠি পাওয়া গেছে তার সবই ১৩০৬ বঙ্গাব্দে লিখিত। তাই আমাদের বিশ্বাস, এ-ব্যাপারে কবিকেশরী'-প্রণেতা কিছু সময়ের গোলমাল করে ফেলেছেন। সেইজন্য আমরা বিষয়টির আলোচনা পরবর্তী বৎসরের জন্য স্থগিত রাখছি। তবে প্রচলিত কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন, উন্নত ও ভিন্ন ধরনের বীজ ব্যবহার করে চাষের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা প্রভৃতি নিয়ে তিনি যে চিন্তা করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে ১০ আষাঢ় ১৩০৬ [24 Jun 1899] তারিখে জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা তাঁর একটি পত্রে, তাতে তিনি আমেরিকান ভুট্টা ও মান্দ্রাজি সরু ধান চাষ নিয়ে তাঁর পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন।[৬১] কিন্তু সেটিও পরবর্তী বৎসরের কথা এবং যথাসময়ে আলোচ্য।

আগে পূজার সময়ে ভারতী-র যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশিত হত—এবারে ৫ কার্তিক [শুক্র 21 Oct] সপ্তমীপূজার দিন ছিল—কিন্তু আশ্বিন ও কার্তিক-সংখ্যা আলাদা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কার্তিক-সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনার পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে কম:

৫৭৭-৮৪ 'দেবতার গ্রাস' দ্র কাহিনী ৭। ১০১-০৭

৬৫৯-৬৬ 'আল্ট্রা-কন্সার্ভেটিভ্' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৫৮৭-৯২

৬৬৭ 'সুও রাণীর সোহাগ' দ্র কণিকা ৬। ১৩ ['চুরি-নিবারণ']

৬৬৭-৭৫ 'প্রসঙ্গ কথা' দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৫৬৬-৭১

'দেবতার গ্রাস' কাহিনী-কবিতাটি পুরোনো রচনা, ১৩ কার্তিক ১৩০৪ [29 Oct 1897] তারিখে উড়িষ্যা-পথে বোটে রচিত। এই সংখ্যায় কোনো গল্প নেই, কবিতাটি হয়তো সেই অভাব পূর্ণ করেছিল।

মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে কংগ্রেসের আন্দোলনে জমিদার-সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সরকার-পক্ষ অবলম্বন করে। এঁদেরই কোনো প্রতিনিধি Ultra-conservative স্বাক্ষরে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র *The Pioneer*-এ একটি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রটিকে ব্যঙ্গ করেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'আল্ট্রা-কন্সার্ভেটিভ' প্রবন্ধটি। এ-বিষয়ে গগনেন্দ্রনাথকে একটি তারিখ-হীন পত্রে তিনি লিখেছেন: 'কার্তিকের ভারতীতে "আল্ট্রাকন্সার্ভেটিভ" বলে একটা প্রবন্ধে আমি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ দলকে বেশ একটু গরম রকমে গাল দিয়েছি—তাদের পক্ষে সুখের বিষয় এই যে, তারা কেউ বাঙ্গলা পড়তে পারে না—ইংরাজিও যে ভাল করে বোঝে তাও বোধ হয় না।' এই চিঠিরই প্রারম্ভে তিনি লিখেছেন: 'তোমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা থেকে নাম খারিজ করে নিতে চাও নি বলে আশু[তোষ চৌধুরী] ভারি দুঃখ করে আমাকে চিঠি লিখেছেন। উক্ত সভা ম্যুনিসিপাল বিল সম্বন্ধে সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে যে রকম দাঁড়িয়েচেন তাতে সে সভা থেকে অনেকে মিলে নাম

তুলে নেওয়া উচিত। একমাত্র মুনিসিপালিটিতে আমাদের আত্মকর্তৃত্ব ছিল—সে আমাদের শিক্ষা এবং গৌরবের জায়গা; ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ সভা যে কি বুদ্ধিতে দেশের লোকের আত্মসম্মানে এমনতর গুরুতর আঘাত দিতে উদ্যত হতে পারলে বুঝতে পারিনে। এই ঘটনায় দেশের লোকেরও সভাকে শাসন করা উচিত। অবশ্য আত্মীয়তাস্থলে একটু সঙ্কোচ হতে পারে কিন্তু আত্মীয়তার সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা যে জড়িত এটা কি ধরে নেওয়া চাই? আদিব্রাহ্মসমাজে যতীন্দ্রমোহন [ঠাকুর] যোগ না দিলে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করব? আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তাও রাখ্ব অথচ নিজের মতের স্বাধীনতা এবং কর্ত্তব্য রক্ষা করে চল্ব এ দুটোর মধ্যে কোন অবশ্য-বিরোধ নেই।'[৬২] 27 Aug [শনি ১২ ভাদ্র] বিলের বিরোধিতা করার জন্য কলকাতার টাউন হলে যে সভা হয় রবীন্দ্রনাথ তাতে উপস্থিত ছিলেন না বটে, কিন্তু 14 Jan 1899 [শনি ১ মাঘ] কুমার মণীন্দ্র মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতির আহ্বানে চোরবাগানে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রাসাদে একটি প্রতিবাদ-সভার সংবাদ পাওয়া গেছে।[৬৩] সভার প্রতিবেদনে উপস্থিতির তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নাম না থাকলেও সভায় তাঁর উপস্থিত থাকা সম্ভব, এইদিন তিনি কলকাতাতেই ছিলেন।

'সুও রাণীর সোহাগ' কবিতাটি 'চুরি-নিবারণ' নামে 'কণিকা' [অগ্র° ১৩০৬] গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। কণিকা-র সম্ভবত এই একটি কবিতাই গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয়। ভারতী-র পাঠে ষষ্ঠ চরণের পর দু'টি অতিরিক্ত ছত্র আছে:

> ছেলে তার ট্যাঁট্যাঁ করে কাঁদে রাত্রি দিবা,
> এবার তাহার কান্না থামিল বুঝিবা!"

এদেশের ইংরেজ সম্প্রদায়ের প্রকৃতি যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল, সে-সম্পর্কে কিছু উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবারের 'প্রসঙ্গ কথা'য়। তিনি লিখেছেন: 'রাজকর্মচারীগণ ব্যতীত অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ইংরেজই বাণিজ্যজীবী। তুচ্ছতম উৎপাত উপলক্ষেই তাঁহারা গুরুতর আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক।...ইংরেজ বণিকগণ ভারতবর্ষকে যেখান হইতে নিরীক্ষণ করেন সে জায়গাটা যতই উচ্চ হউক তাহার ভিত্তি সংকীর্ণ, তাহা ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত লাভক্ষতির উপর দাঁড়াইয়া; একটু নাড়া খাইলেই তাহা দুলিয়া উঠে।' 1855-এ মহাজনকর্তৃক উৎপীড়িত সাঁওতালদের বিদ্রোহী ভেবে আতঙ্কগ্রস্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা যে-ধরনের 'অসংগত ও অসংযত ভাষা' প্রয়োগ করেছিল হাণ্টার-প্রণীত *The Annals of Rural Bengal* থেকে তার দৃষ্টান্ত তুলে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ইংরেজের আতঙ্ক বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও এমন দুর্ঘটনা ঘটাবে। কারণ ইংরেজ পত্রসম্পাদকের মূঢ় অন্ধতা ধীরে ধীরে রাজকর্মচারীদেরও গ্রাস করছে, দেশীয় লোকের যে-কোনো অসন্তোষের পিছনে কুমন্ত্রীর অবস্থান আছে ভেবে তারা কঠোর প্রতিবিধানের রাস্তা নিচ্ছে। আরও একটি কারণ রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন, সেটি হল ভারতবর্ষীয় ইংরেজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি। ভারতবর্ষে পূর্বাপেক্ষা ইংরেজ নারীদের প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়ায় দেশীয়দের সঙ্গে ইংরেজের ব্যবধান দৃঢ়তর ও নিজেদের মধ্যে বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, ফলে 'এখন যে-কোনো বিধান বা রাজনীতি ভারতবর্ষীয় ইংরেজ-সাধারণের অপ্রিয় তাহাতে হাত দিতে গেলেই সামাজিক চক্ষুলজ্জাটা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে।' তাছাড়া কোনো শাসনকর্তা ঔদার্যের সঙ্গে কোনো অসন্তোষের প্রতিকার করতে গেলে তাঁর নামে আন্দোলনকারীদের দ্বারা চালিত হওয়ার দুর্বলতার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন: 'আজকাল শাসনকর্তাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে ইংরেজ-সমাজের দ্বারা চালিত না হওয়া, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে

দুর্বলতা। পাছে এমন কথা উঠে যে কন্‌গ্রেসের দলবদ্ধ কাতরতায় ভুলিল, সেই মনে করিয়া কোনো উদারনীতি প্রবর্তনে দ্বিধা বোধ করা, ইহাই দুর্বলতা; ইংরেজ পত্রসম্পাদকের সহিত রাজসিংহাসন ভাগাভাগি করিয়া লওয়া, ইহাই দুর্বলতা। এখনকার ভারত-শাসন-ব্যাপার ভারতবর্ষীয় ইংরেজের সামাজিকতাজালে আপাদমস্তক জড়িত এবং সেইজন্যই দুর্বল। সেইজন্য প্রেমনীতি-ক্ষমানীতির উপরে ভারতসাম্রাজ্যকে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা যে কেবল রহিত হইতেছে তাহা নহে, তাহা প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষিত অবজ্ঞাত উপহসিত হইতেছে।' এর পরের সংখ্যার 'প্রসঙ্গ কথা'-তে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন এই অবজ্ঞা কিভাবে 'শাপে-বর' হয়েছে।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রায় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহেই কাটান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 28 Nov [সোম ১৩ অগ্র°] পুত্র রথীন্দ্রনাথের একাদশতম জন্মদিন পালন। অনুষ্ঠানের বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় নি, শুধু তেরো বছরের দিদি মাধুরীলতার 'To my dearest brother Rothi on his birthday, the 28th November 1898' একটি উপহার রক্ষিত হয়েছে—উপহারটি হল একটি কাগজে লেখা ১৫ ছত্রের একটি কবিতা, যার প্রথম কয়েকটি ছত্র:

Thine heart must be
As pure as the lily that
blooms on the lea,...

—ক'দিন আগে ৯ কার্তিক [মঙ্গল 25 Oct] মাধুরীলতাও তাঁর ত্রয়োদশতম জন্মদিন পালন করেছেন।

এই মাসে রবীন্দ্রনাথের কিছু সংবাদ পাওয়া যায় ১৯ অগ্র° [রবি 4 Dec] বাঁকিপুর থেকে তাঁকে লেখা অতুলচন্দ্র ঘোষের [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু এই রবীন্দ্রভক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী ছদ্মনামে প্রবন্ধাদি লিখতেন] একটি পত্রে: '...হরিহরছত্র হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার উত্তর আসিয়াছে দেখিলাম। আপনি মেলার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যদিও উহা প্রায় মাসাবধি থাকে তবে অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা হইতে ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়। আমার কি এমন সৌভাগ্য যে আপনার পদধূলি আমাদের বাটীতে পড়িবে!/"বরাবর" প্রবন্ধের সম্বন্ধে আপনি যে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহাই হইবে। আর "ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ" প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আমি একপ্রকার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। উহা খুব সম্ভবতঃ শিলাইদহে পাঠাইব। "বরাবর" প্রবন্ধ পৌষের প্রথমে কলিকাতায় পাঠাইব।' এই চিঠি থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রে বাঁকিপুর অঞ্চলে ভ্রমণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন ও পৌষের প্রথম দিকে তিনি কলকাতায় থাকবেন সেকথাও জানিয়েছিলেন। 'বরাবর' প্রবন্ধ ভারতী-তে প্রকাশিত হয় নি, 'ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ' মুদ্রিত হয় পৌষ-মাঘ সংখ্যায় [পৃ ৮৯১-৯১০]। ৮ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছেন: 'ভারতচন্দ্র ও কবিরঞ্জন [যদ্দৃষ্টং] বীরেশ্বর গোস্বামীর, আমার দ্বারা সংশোধিত।'[৬৪] এইরূপ সংশোধন তাঁকে প্রায়ই করতে হত।

ভারতী-র অগ্রহায়ণ-সংখ্যা প্রকাশিত হয় প্রায় মাসের শেষে, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 12 Dec [সোম ২৭ অগ্র°]। এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-রচনার তালিকা মোটামুটি দীর্ঘ:

৬৭৭-৭০০ 'মণি-হারা' দ্র গল্পগুচ্ছ ২১। ২৪৯-৬৫

৭০৯-২৫ ‘স্বাধীন ভক্তি’ দ্র সমাজ ১২। ২৫০-৬০ [‘অযোগ্য ভক্তি’]

৭৪২-৫৭ ‘বিদ্যাসাগর’ দ্র চারিত্রপূজা ৪। ৫০২-১১ [‘বিদ্যাসাগরচরিত’: ২]

৭৫৭-৬১ ‘আষাঢ়ে’ দ্র আধুনিক সাহিত্য ৯। ৪৮৬-৮৮

৭৬২-৬৬ ‘সাময়িক সাহিত্য’

৭৬২-৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৫। ৩]; ৭৬৪-৬৬ প্রদীপ। আশ্বিন-কার্তিক ৭৬৭-৭১ ‘প্রসঙ্গ কথা’ দ্র সমূহ-পরিশিষ্ট ১০। ৫৭২-৭৫

৭৭২ ‘গ্রন্থ সমালোচন’/শ্রীমদ্ভগবদগীতা। সমন্বয় ভাষ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দ্র দেশ, শারদীয়া ১৩৮৩। ২৪

‘মণিহারা’ গল্পটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেন: “কুচবিহারের মহারাণী ভূতের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। আমায় বলিতেন—‘আপনি নিশ্চয়ই ভূত দেখিয়াছেন, একটা ভূতের গল্প বলুন।’—আমি যতই বলিতাম যে আমি ভূত দেখি নাই, তিনি ততই মাথা নাড়িতেন, বলিতেন,—‘না, কখনই না, নিশ্চয়ই আপনি ভূত দেখিয়াছেন।’ অগত্যা আমাকে একটি ভূতের গল্পের অবতারণা করিতে হইল।—ভাঙ্গা পোড়া বাড়ী, কঙ্কালের খটখট শব্দ, এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া আমি ‘মণিমালিকা’ [‘মণিহারা’] গল্পটি তাঁহাকে শুনাইলাম। গল্পটি তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল।”[৬৫]

‘স্বাধীন ভক্তি’ [‘অযোগ্য ভক্তি’] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অযোগ্য ব্যক্তি বা প্রথাকে ভক্তি করার অভ্যাসের জন্য আমাদের দেশের মানুষের মনের জড়ত্বকে দায়ী করে লিখেছেন: ‘আমাদের দেশে মোহান্তের মহৎ, পুরোহিতের পবিত্র এবং দেবচরিত্রের উন্নত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ আমরা ভক্তি লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছি। যে-মোহান্ত জেলে যাইবার যোগ্য তাহার চরণামৃত পান করিয়া আমরা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করি না, যে-পুরোহিতের চরিত্র বিশুদ্ধ নহে এবং যে-লোক পূজানুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির অর্থ পর্যন্তও জানে না তাহাকে ইষ্ট গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের মুহূর্তের জন্যও কুণ্ঠাবোধ হয় না, এবং আমাদেরই দেশে দেখা যায়, যে সকল দেবতার পুরাণবর্ণিত আচরণ লক্ষ্য করিয়া আলাপে ও প্রচলিত কাব্যে ও গানে অনেকস্থলে নিন্দা ও পরিহাস করি, সেই দেবতাকেই আমরা পূর্ণ ভক্তিতে পূজা করিয়া থাকি।’ এই মানসিক জড়ত্বের জন্যই ‘তিলক রাজদ্রোহ অভিযোগে জেলে গিয়াছেন—সেখানে অনিবার্য রাজদণ্ডের বিধানে তাঁহাকে দূষিত অন্ন গ্রহণ করিতে হইয়াছে; মাথা মুড়াইয়া গোঁফ কামাইয়া কঠিন প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য সমাজ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিলক যে সত্য রাজদ্রোহী এ-কথা কেহ বিশ্বাস করে না এবং যদি-বা করিত সেজন্য তাঁহাকে দণ্ডনীয় করিত না,—কিন্তু যে অনিচ্ছাকৃত অনাচারে তাঁহার সাধু চরিত্রকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নাই তাহাই তাঁহার পক্ষে পাপ, এবং সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মস্তকমুণ্ডন।’ এই অদ্ভুত অসংগতি সমাজকে ‘ঘোরতর জড়বাদ’ ও ‘নিগূঢ় নাস্তিকতায়’ উপনীত করেছে এই সিদ্ধান্ত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: ‘অভ্যাস বা পরের নির্দেশবশত নহে, পরন্তু স্বাধীন বোধশক্তি যোগে ভক্তিবলে আমরা মহত্ত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করি, তাহাই সার্থক ভক্তি’—এই স্বাধীন ভক্তিই ‘সচেষ্ট মনকে নিশ্চেষ্ট জড়বন্ধনের জাল’ থেকে উদ্ধার করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ধরনের একটি বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখতে গেলেন কেন। আমাদের মনে হয়, প্রবন্ধটি পূর্ববর্তী ‘সাকার ও নিরাকারতত্ত্ব’ গ্রন্থের সমালোচনা ‘সাকার ও নিরাকার উপাসনা’ প্রবন্ধেরই অনুবৃত্তি। দেবতা ও ভক্তের সম্পর্কের যে বিশ্লেষণ তিনি সেখানে করেছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে তার বিস্তার

ঘটেছে মাত্র। এবং সমালোচনার সুরটি এখানেও প্রাধান্য লাভ করায় 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার সময়ে তিনি প্রবন্ধটির নাম পরিবর্তন করে নূতন নাম দেন 'অযোগ্য ভক্তি'।

'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধটি সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: "জমিদারী সফরান্তে শিলাইদহে ফিরিয়া কলিকাতায় বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভার (১৩ শ্রাবণ ১৩০৫) জন্য ভাষণ লিখিতেছেন। এই ভাষণ রচনাকালে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন;...শ্রাবণের দ্বিতীয় সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ১৩ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভায় ভাষণটি পাঠ করিলেন।"[৬৬] তথ্যটি ঠিক নয়। বস্তুত ১৩ শ্রাবণ [বৃহ 28 Jul] বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি অ্যাণ্ড ঝামাপুকুর রীডিং রুমের উদ্যোগে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নীলমণি ন্যায়ালঙ্কারের সভাপতিত্বে শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের জীবন ও রচনা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন[৬৭] এবং প্রবন্ধটি 'পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' শিরোনামে আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা প্রদীপ-এ [পৃ ৩১১-২২] মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি সম্পর্কে অগ্র°-সংখ্যা ভারতী-র 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে লেখেন: 'বাঙ্গলা সাময়িক পত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের" মত প্রবন্ধ কদাচিৎ বাহির হয়। শাস্ত্রী মহাশয় প্রচুর ভাবসম্পদের অধিকারী হইয়াও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কৃপণতা করিয়া থাকেন এ অপরাধ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে।'[৬৮] রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে যোগবাশিষ্ঠ থেকে যে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, তা শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্ত প্রবন্ধ থেকেই গৃহীত। প্রবন্ধটির বেশির ভাগ অংশেই তিনি এই শ্লোকটিকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরের চরিত্রলক্ষণ বিশ্লেষণ করেছেন: 'তাঁহার মতো লোক পারমার্থিকতাভ্রষ্ট বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, চতুর্দিকের নিঃসাড়তার পাষাণখণ্ডে বারংবার আহত-প্রতিহত হইয়াছিলেন বলিয়া, বিদ্যাসাগর তাঁহার কমর্সংকুল জীবন যেন চিরদিন ব্যথিতক্ষুব্ধভাবে যাপন করিয়াছেন।...তাঁহার মননজীবী অন্তঃকরণ তাঁহাকে প্রবল আবেগে কাজ করাইয়াছিল, কিন্তু গতজীবন বহিঃসংসার তাঁহাকে আশ্বাস দেয় নাই। তিনি যে শবসাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উত্তরসাধকও ছিলেন তিনি নিজে।' প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি বিদ্যাসাগরকে স্যামুয়েল জনসনের সঙ্গে তুলনা করে আক্ষেপ করেছেন: 'বিদ্যাসাগরের বসওয়েল কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই।'

"আষাঢ়ে" দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-কৃত উক্ত নামীয় গ্রন্থের সমালোচনা। অগ্র° ১৩০১-সংখ্যা সাধনা-য় দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা' সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা সাহিত্যজগতে পরিচিত করে দিয়েছিলেন, 'আষাঢ়ে'-সমালোচনায় তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন হল। দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা রবীন্দ্রনাথকে ঈষৎ বিব্রত করলেও তিনি আশা করেছেন, 'তাঁহার হাস্যসৃষ্টির নীহারিকা ক্রমে ছন্দে বন্ধে ঘনীভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে হাস্যালোকের ধ্রুব নক্ষত্রপুঞ্জ রচনা করিবে।' এরপর হাস্যরসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন: 'সমালোচ্য গ্রন্থে "বাঙালি মহিমা", "কর্ণবিমর্দনকাহিনী" প্রভৃতি কবিতায় যে-হাস্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহা লঘু হাস্য মাত্র নহে, তাহার মধ্যে কবির হৃদয় রহিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে জ্বালা ও দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।' দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতিটি সঠিক বুঝে নিতে রবীন্দ্রনাথের ভুল হয় নি।

‘সাময়িক সাহিত্য’ বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ৫ম ভাগ ৩য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা প্রদীপ-এর অনেকগুলি রচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। চণ্ডিদাসের নূতন পদাবলী [সা. প. প.] সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: ‘সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সে জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। প্রাচীন-গ্রন্থ সকলের যে সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাঙ্গলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাঙ্গলা বানান নির্ব্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্যের বাঙ্গলা বহুল পরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্ভাবিত বলিয়া বাঙ্গলা বানান, এমন কি, বাঙ্গলা পদবিন্যাসপ্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন।’

অচ্যুতচরণ চৌধুরী-লিখিত প্রবন্ধে উৎকলবাসিনী ‘স্ত্রীকবি মাধবী’র বৈষ্ণব কবিতার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: ‘সেই প্রাচীনকালে উৎকল ভূমি বাঙ্গলা ভাষার উপর যে অধিকার লাভ করিয়াছিল এক্ষণে নব্যউৎকল তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছে তাহা বাঙ্গলার পক্ষে দুঃখের কারণ এবং উৎকলের পক্ষেও দুর্ভাগ্যের বিষয়।’ ইতিপূর্বে অসমীয়া ভাষা সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করে তিনি বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন, তাঁর বর্তমান মন্তব্য নিয়ে কোনো উৎকলবাসী বিতর্কে অবতরণ করেছিলেন কি না জানা নেই।

প্রদীপ-এর অধিকাংশ রচনা সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ প্রশংসামুখর। শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ‘হাফ্‌টোন্‌ ছবি’ প্রবন্ধ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: ‘অনেকেই হয়ত জানেন না হাফ্‌টোন্‌ লিপি সম্বন্ধে উপেন্দ্র বাবুর নিজের আবিষ্কৃত বিশেষ সংস্কৃত পদ্ধতি বিলাতের শিল্পীসমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; উপেন্দ্র বাবু স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও এ ঘটনার আভাসমাত্র দেন নাই। তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম নিজচেষ্টায় হাফ্‌টোন্‌ শিক্ষা করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহার সংস্কার সাধনে কৃতকার্য্য হন। ভারতবর্ষের প্রতিকূল জলবায়ু এবং সর্ব্বপ্রকার সহায়তা ও পরামর্শের অভাব সত্ত্বেও এই নূতন শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত এবং তাহাকে সংস্কৃত করিতে যে কি পরিমাণ অধ্যবসায় ও মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা অব্যবসায়ীর পক্ষে মনে আনাই কঠিন। উপেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ অপেক্ষা তাঁহার রচিত যে সুন্দর আলেখ্যগুলি প্রদীপে বাহির হইয়াছে তাহাতেই তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।’ উপেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু এবং বিজ্ঞানে বাঙালির যে-কোনো কৃতিত্ব তাঁর গর্বের কারণ হয়েছে—উপরের মন্তব্যে তাঁর উভয়বিধ গর্বই প্রকাশ পেয়েছে।

একই রকম গর্ব দেখা যায় বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ‘রাসায়নিক পরিভাষা’ প্রবন্ধের আলোচনায়। প্রফুল্লচন্দ্র এক রুশ বিজ্ঞানীর উদাহরণ দেখিয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় পরিভাষা রচনার প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য: ‘বঙ্গভাষাও রুশীয় ভাষার ন্যায় গৌরব লাভ করিবে এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে আমরা আর সঙ্কোচ বোধ করি না;—সম্প্রতি যে দুই একজন বাঙ্গালী আমাদিগকে এই উচ্চ আশার দিকে লইয়া যাইতেছেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের মধ্যে একজন।’ আর একজন হচ্ছেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—এঁর সাফল্যের পথ বাধামুক্ত করতে রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

রবীন্দ্র-সম্পাদিত ভারতী-তে ‘সাময়িক সাহিত্য’ বিভাগের এইটিই শেষ কিস্তি।

মিউনিসিপ্যাল বিলের দ্বারা ইংরেজ গর্বমেন্ট দেশবাসীকে প্রদত্ত স্বায়ত্বশাসনের অধিকার যেভাবে হরণ করতে চেয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথ কতখানি আশাহত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তার প্রকাশ ইতিপূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি 'প্রসঙ্গ কথা'য় আছে। এই সময়ে তিনি বরিশালের 'দেশবন্ধু' অশ্বিনীকুমার দত্তের [1856-1923] কাছ থেকে 'কন্‌গ্রেস সম্বন্ধে একটি আলোচনাপত্র' পেলেন। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'সমালোচ্য পত্রখানির এক জায়গায় আভাস আছে যে, নূতনত্বের হ্রাস হওয়াতে আমাদের উৎসাহ ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যেমন বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে জগতের রহস্য অধিকতর প্রসারিত হইয়া যায় তেমনি কাজ যত সম্পন্ন হয় উদ্যমের নূতনত্ব ততই বাড়িতে থাকে। কিন্তু যেখানে কাজ নাই, কেবলই আয়োজন, সেখানে উৎসাহের নবীনতা কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা অসাধ্য। ভিক্ষাচর্যা যতই নৈপুণ্যসহকারে নব নব কৌশলে নিষ্পন্ন হউক, তাহাকে কাজ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।' সুতরাং 'গবর্মেন্ট অবজ্ঞাসহকারে কন্‌গ্রেসের আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে শাপে-বর দিতেছেন। আমাদিগকে যথার্থ পথে প্রেরণ করিতেছেন। সে পথ আত্মশক্তির পথ। ভিক্ষা যদি পূরণ করিতেন তবে আমাদিগকে কঠিন কর্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া সহজ দেশহিতৈষিতার সুকোমল হীনতাপঙ্কের মধ্যে, ভিত্তিহীন আত্মশ্লাঘা, অমূলক কৃত্রিম উন্নতি, এবং অনধিকারলব্ধ আরামনিদ্রার রসাতলে লইয়া ফেলিতেন।' এই রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম 'আত্মশক্তি' শব্দটি ব্যবহার করে সেই পথে দেশবাসীকে আহ্বান করলেন। বোম্বাইয়ের পার্শি ব্যবসায়ী জামসেদজি টাটা তখন একটি আধুনিক বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর অর্থ দান করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই দানের সুযোগ নেওয়ার জন্য কংগ্রেসকে আহ্বান জানালেন: 'ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া যদি টাটা-সাহেবের এই প্রস্তাবটিকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন তবে কন্‌গ্রেসের জন্ম সার্থক হয়।' কেন না, 'নিজের চেষ্টায় যতটুকু হয় তাহারই উপর যথার্থ স্থায়ী নির্ভর।'

'গ্রন্থ সমালোচন' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ নববিধান মণ্ডলীর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়-কৃত শ্রীমদ্ভগবদগীতা-র সমন্বয় ভাষ্য প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন: 'ইংরাজি সাময়িক পত্র সম্পাদকগণের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনেকগুলি সমালোচক সমালোচনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। বিষয়ভেদে যথোপযুক্ত লোকের হস্তে গ্রন্থ সমালোচনার ভার পড়ে। বাঙ্গলা পত্রিকার কম্পোজ করা এবং ছাপানো ছাড়া বাকি অধিকাংশ কাজই একা সম্পাদককে বহন করিতে হয়। অথচ সম্পাদকের যোগ্যতা সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। সুতরাং সাধারণের নিকট মুখরক্ষা করিতে হইলে অনেক চাতুরী অনেক গোজামিলনের প্রয়োজন হয়।' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তা না করে নিজের পাণ্ডিত্যের দীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

ভারতী-র পরবর্তী দু'টি যুগ্ম-সংখ্যাতেই 'প্রসঙ্গ কথা' ও 'গ্রন্থ সমালোচন' বিভাগ-দু'টি অনুপস্থিত—সম্পাদকের সময়াভাবই সম্ভবত তার অন্যতম কারণ।

প্রদীপ, অগ্র° ১৩০৫ *[১ । ১২]:*

৩৭৫ 'বঙ্গলক্ষ্মী' দ্র কল্পনা ৭। ১৪২-৪৩

৩৭৫-৭৬ 'শরৎ' দ্র ঐ ৭। ১৪৩-৪৫

দু'টি কবিতারই রচনার তারিখ উল্লিখিত হয় নি, সম্ভবত বর্তমান বৎসরেরই শরৎকালে লেখা।

বীণাবাদিনী, অগ্র° ১৩০৫ [২ । ৫]:

৭১-৭৩ পরজ সোহিনী—কাওয়ালি। কে ডাকে, আমি কভু ফিরে নাহি চাই

৭৪-৭৭ দেশ-ছায়ানট—ঝাঁপতাল। যেও না যেও না ফিরে

দু'টি গানই মায়ার খেলা গীতিনাট্যের অন্তর্ভুক্ত, পত্রিকায় 'প্রণয়ের গান' শিরোনামায় উল্লিখিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে সপরিবারে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ফিরে আসেন ২৯ অগ্র° [বুধ 14 Dec] তারিখে—'বিরাহিমপুর হইতে আগমন করায় সেহালদহায় হইতে যোড়াসাঁকো আসিবার গাড়ি ভাড়া ২৯ অগ্র° ৪' এই হিসাব থেকে সিদ্ধান্তটিতে আসা যায়। মহর্ষি এর আগেই ২৬ কার্তিক [শুক্র 11 Nov] পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি থেকে জোড়াসাঁকোর পৈতৃক ভিটায় চলে এসে বাহির-তেতালার একটি ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন, সুতরাং কলকাতায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রাত্যহিক পার্ক স্ট্রীট যাতায়াত করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাঁর ভ্রাম্যমাণতা অব্যাহতই থেকেছে। ১ পৌষ [বৃহ 15 Dec] 'পিপুলপটী ও যোড়াগির্জ্জা', ২ পৌষ 'হাইকোর্ট হইয়া পিপুলপটী' ও ৫ পৌষ 'যোড়াগির্জ্জা' যাওয়ার হিসাব তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়—কিন্তু যাতায়াতের উদ্দেশ্য সেখানে লিখিত হয় নি।

৭ পৌষ [বুধ 21 Dec] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অষ্টম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করেন। তাঁর বন্ধু ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবারে তাঁর সঙ্গী হন। প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথের সামগান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সন্ধ্যায় স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনার পর তিনি একটি বক্তৃতা করেন। এই জাতীয় অনুষ্ঠানে এইটিই তাঁর প্রথম ভাষণ। ভাষণটি মাঘ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে উৎসবের প্রতিবেদনের মধ্যে মুদ্রিত হয় [প ১৬৮-৭১], ভারতী-র পৌষ-মাঘ-সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয় 'নিরাকার উপাসনা' [পৃ ৮৮৪-৯১; দ্র আধুনিক সাহিত্য-পরিশিষ্ট ৯।৫৩৭-৪১] শিরোনামে। যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'সাকার ও নিরাকারতত্ত্ব' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে যে নিরাকার উপাসনাকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন, উপনিষদের বিভিন্ন মন্ত্রের সহায়তায় এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

পরের দিন ৮ পৌষেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এসেছেন, এই দিন তাঁকে ধর্মতলায় যেতে দেখা যায়, ১২ পৌষ তিনি গেছেন 'নারকেলডাঙ্গা'য়। এই সময়ে তিনি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের চাঁদাও মিটিয়ে দিয়েছেন—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের [১৩০৫] ১২, কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটের [1898-99] ৫, ভারত সঙ্গীত সমাজের [Aug-Dec 1898] ১০ এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 'কন্‌গ্রেস কমিটির ১ বিল ৬'; রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের রীতিমত চাঁদা-দেওয়া সদস্য হয়েছিলেন শুধু নয়, কংগ্রেসের স্থানীয়-শাখা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেও তিনি নিয়মিত চাঁদা দিতেন।

সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু বিহারীলাল গুপ্তকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিনের জন্য শিলাইদহে যান। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ১৩০৫ বঙ্গাব্দের জমিদারির ক্যাশবহিতে ১৪ পৌষের হিসাব: 'বি, এল, গুপ্ত সাহেবকে লইয়া সিলাইদহায় যাতায়াতের ব্যয় ৫৬।লo—কবে গিয়েছিলেন ও কবে এসেছিলেন তার বিবরণ এই হিসাবে নেই, নিছক ভ্রমণ কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এই যাতায়াত কি না তারও হদিশ হিসাবে মেলে না। তবে কালীগ্রাম পরগণার তৎকালীন নায়েব শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে [বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা] লেখা কয়েকটি পত্রে বিহারীলাল গুপ্তের উল্লেখ আছে। সম্ভবত মাঘ মাসের প্রথমে একটি তারিখ-হীন পত্রে

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: '[বিহারী বাবুর] সেই বোট তিনি ৫০০ টাকায় বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—আমি কালিগ্রামের জন্য তাহা কিনিব বলিয়া [তাঁহার] নিকট প্রস্তাব করিয়াছি।'[৬৯] এই বোট শেষ পর্যন্ত এস্টেটের জন্য কেনা হয় নি, তখন শৈলেশচন্দ্র নিজেই তা কিনতে চাইলে ৩ ফাল্গুন* তাঁকে লেখেন: 'তোমাদের বোট এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহা B.L. Guptaর সম্পত্তি—মূল্য পাঁচশত তাঁহারই প্রাপ্য সেটা তাঁহাকে পাঠাইতে পারিবে? এখন যদি টাকার সুবিধা না থাকে কবে দিতে পারিবে আমি তাঁহাকে বলিয়া রাখিব।'[৭০] এই বোট-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের সঙ্গে শিলাইদহে গিয়ে থাকতে পারেন।

ভারতের নূতন ভাইসরয় লর্ড কার্জন [1859-1925] কলকাতায় পদার্পণ করেন 3 Jan 1899 [মঙ্গল ২০ পৌষ] তারিখে। স্বভাবতই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেশীয় রাজ্যের রাজা-মহারাজারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এই সময়ে রাজধানী কলকাতায় সমবেত হন। ত্রিপুরা রাজ্যের যুবরাজ নির্বাচন নিয়ে গোলমালের কথা আমরা আগেই বলেছি। তারই সুষ্ঠু সমাধান ও নূতন বড়োলাটের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কলকাতায় উপস্থিত হন পৌষের গোড়াতেই। এই সুযোগে যাতায়াতের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেল। ক্যাশবহিতে উভয়েরই যাতায়াতের অনেকগুলি হিসাব পাওয়া যায়। ৫ পৌষ [সোম 19 Dec] সরকারী ক্যাশবহির হিসাব: 'ত্রিপুরার মহারাজার এবাটীতে আগমন হওয়ায় গাছের টব দিয়া সাজান' রাজকীয় অভ্যর্থনার ও মহর্ষিভবনে মহারাজার প্রথম আগমনের স্মারক। এরপর রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজার বাড়িতে যান ২৫ পৌষ [রবি ৪ Jan 1899]। এর পরেও তিনি তাঁর বাড়িতে যান ১৪ [শুক্র 27 Jan] ও ১৬ মাঘে। ত্রিপুরার মহারাজকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয় ৪ মাঘ [মঙ্গল 17 Jan] তারিখে। ২ আশ্বিন ১৩০৬-এর আগে লিখিত উভয়ের কোনো পত্র এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সেই দিক দিয়ে রাজা ও কবির সংযোগসূত্র রচনায় এই হিসাবগুলি খুব মূল্যবান। মহারাজ এই নিমন্ত্রণের প্রতিদান দেন রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরায় আমন্ত্রণ জানিয়ে—রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় যান চৈত্র মাসের মাঝামাঝি।

শুধু ত্রিপুরার মহারাজকে নয়, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়কেও রবীন্দ্রনাথ আপ্যায়ন করেন এই সময়ে। তাঁকে খাওয়ানো হয় দু'দিন ১ মাঘ [শনি 14 Jan]ও ১৫ মাঘ [শনি 28 Jan]। জগদিন্দ্রনাথ মহর্ষির পার্ক স্ট্রীট থেকে জোড়াসাঁকো আসার সময়ে তাঁর গাড়ি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। মহর্ষি সেই উপকারের প্রতিদান দিয়েছেন নানাভাবে—১ মাঘের খাওয়ানোর খরচ দেওয়া হয় সরকারী ক্যাশ থেকে, তাঁকে ৪০০ টাকা মূল্যের একটি 'সিলিভার বাক্স'ও উপহার দেওয়া হয়—'নাটরের মহারাজা বোলপুর সান্তীনিকেতনের বাগানে গমনাগমনের ব্যয় ১৬ মাঘ হইতে ২৯ মাঘ পর্য্যন্ত খাবার ও যাতায়াতের' জন্য ৩০৩ টাকা ১২ আনা খরচ করা হয়েছে, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ কয়েক দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে তাঁকে সাহচর্য দান করেন। তাঁকে ১৫ মাঘ খাওয়ানোর খরচ দেন রবীন্দ্রনাথ নিজে।

৭ই পৌষের উৎসবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যোগদান করেছিলেন, এ-কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এর কয়েকদিন পরে তাঁর সম্পাদনায় ইতিহাস-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র 'ঐতিহাসিক চিত্র'-এর Jan 1899-সংখ্যা প্রকাশিত হল, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ 5 Jan [বৃহ ২২ পৌষ]। পত্রিকাটির 'অনুষ্ঠানপত্র' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ভাদ্র-সংখ্যা ভারতী-তে 'প্রসঙ্গ কথা' লিখেছিলেন, প্রথম সংখ্যার 'সূচনা'টিও [পৃঃ ১-৪] তিনি লিখে দিলেন। কিন্তু এছাড়াও তাঁর অন্যবিধ সাহায্যের কথা লিখেছেন 'কবিকেশরী'-লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু: 'রবীন্দ্রনাথ ঐ ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রচারকালে ইহার একটি সুন্দর

হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা লিখিয়াছেন। শেষে ঢাকি বহির্বাটীতে বসিয়া ঢাক বাজাইয়া যেমন পূজা বাড়ীর সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিন্ত, বিনয়ের আধার রবীন্দ্রনাথ তেমনি ঢাকিস্বরূপ ভূমিকা দ্বারা ঐতিহাসিক চিত্রের প্রচার ঘোষণা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন বলিয়া ভূমিকা শেষ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, পত্রিকাটীর অঙ্গহীন হইবার আশঙ্কায় তাঁহাকে তন্ত্রধারকের কার্য্যও করিতে হইয়াছিল, এবং পত্রিকাটির দীর্ঘজীবন কামনায় যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছিলেন, বন্ধুবান্ধবদিগের দ্বারা তদর্থে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেও ত্রুটী করেন নাই। পত্রিকাটীর পুষ্টিসাধন ও গৌরববৃদ্ধির জন্য তাঁহার প্রবন্ধবর্ষিণী লেখনীও বিরাম পায় নাই।'[৭১] 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রথম পর্যায়ে মাত্র এক বছর স্থায়ী হয়েছিল, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আর-কোনো প্রবন্ধ লিখেছিলেন কি না আমাদের জানা নেই—কিন্তু গগনেন্দ্রনাথকে লেখা একটি তারিখহীন চিঠিতে অক্ষয়কুমারের হয়ে পত্রিকার চাঁদার জন্য তাগিদ দিতে দেখা যাচ্ছে: 'অক্ষয়বাবু তাঁর ঐতিহাসিক চিত্রের চাঁদার জন্যে আবার তাগিদ্ পাঠিয়েছেন। তাঁর ঠিকানায় টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ো।'[৭২]

'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "অদ্য 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র শুভ জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতিসাধনের আশ্বাসে নহে। তাহার আরো একটি বিশেষ কারণ আছে।...স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্‌যোগ সেই উদ্‌যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য—আমাদের প্রাণ।'[৭৩]

'ঐতিহাসিক চিত্র'-এর লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পাদক-বর্ণিত কাজগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও কিছু কাজ নির্দেশ করে দিয়েছেন: 'এখন সংগ্রহ এবং সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমস্ত জনশ্রুতি, লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা—এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য-হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাস-রূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস। আমরা একান্ত আশা করিতেছি, এই সংগ্রহকার্যে 'ঐতিহাসিক চিত্র' সমস্ত দেশকে আপন সহায়তায় আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবে।' রবীন্দ্রনাথের এই আশা আপাতত সফল হয় নি—মাত্র একবৎসর পরেই 'ঐতিহাসিক চিত্র' বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ইতিহাস-চর্চার যে সূত্রপাত পত্রিকাটি করেছিল, তারই ফলে নিখিলনাথ রায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ দীর্ঘজীবন লাভ করে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার আছে। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা থেকেই 'চাঁদ কবির বীর-গাথা/রেবাতট পর্ব্ব' শিরোনামায় চাঁদ কবির মূল রচনা বঙ্গানুবাদ-সহ ধারাবাহিক ভাগে মুদ্রিত হতে থাকে। এর প্রথম কিস্তির শেষে লেখা হয়েছিল: 'মন্তব্য।—কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চাঁদ কবির বীরগাথা বাঙ্গলায় কবিতানিবদ্ধ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন; তাহা যথাকালে প্রকাশিত হইবে।'[৭৪] রবীন্দ্রনাথ 'রুদ্রচণ্ড' নাটকে চাঁদ কবিকে একটি বিশেষ ভূমিকা দিয়েছিলেন, ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে চাঁদ কবির ব্যবহৃত শব্দ উদ্ধৃত করেছেন [দ্র 'বাংলা বহুবচন', বাংলা শব্দতত্ত্ব। ৩০-৩১]। সুতরাং চাঁদ কবির বীরগাথা বাংলায় 'কবিতানিবদ্ধ' করার জন্য তাঁর আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু উক্ত প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারেন নি।

অবশ্য ‘কথা’র বিভিন্ন কবিতায় তিনি ভারত-ইতিহাসের বীর্যময় যুগের অনেক কাহিনীকে ‘কবিতানিবদ্ধ’ করে তাঁর প্রতিশ্রুতি অন্য অর্থে রক্ষা করেছিলেন।

পৌষ-সংখ্যা প্রদীপ-এ ‘মন্দিরাভিমুখে’ [পৃ ২-৫] নামে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। গণপত কাশীনাথ স্মাত্রে [ম্হাত্রে]-নির্মিত ‘মন্দিরপথবর্ত্তিনী’ (To the Temple) নামক মূর্তিটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে তিনি ভারতী-তে একটি ‘প্রসঙ্গ কথা’ [দ্র আষাঢ় ২৭৪-৮১] রচনা করেছিলেন। বর্তমান সচিত্র প্রবন্ধটিও একই বিষয়ে লেখা—উভয় প্রবন্ধের প্রথমাংশ অনেকটা সদৃশ—কিন্তু ‘মন্দিরাভিমুখে’ শিল্প-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের গভীরতর বোধের পরিচায়ক।

রবিবর্মার ছবি এক সময়ে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছিল। বর্তমানে সে-বিষয়ে তিনি কিছু সমালোচনা-মুখর হলেও স্বীকার করেছেন: ‘তাহা বুভুক্ষিতের রিক্তস্থালীর উপর যবের মুষ্টি বর্ষণ করিয়াছিল—আপাততঃ সেই যবমুষ্টি ভবিষ্যতের পূর্ণোদর ব্যক্তির স্বর্ণমুষ্টির চেয়ে বেশি।’ ম্হাত্রে-রচিত মূর্তি সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব একই ধরনের: ‘সম্প্রতি আমাদের যে আনন্দ তাহা শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য্যসম্ভোগের আনন্দ নহে, তাহা আশার আনন্দ। আমরা দেখিতেছি ভারতবর্ষের নিদ্রিত অন্তঃকরণের এক প্রান্তে সৌন্দর্য্যরচনার একটা চেষ্টা জাগিয়া উঠিতেছে। তাহা যতই অপরিস্ফুট অসম্পূর্ণ হউক না কেন, তাহা অত্যন্ত বিরাট আকারে আমাদের কল্পনাকে অভিভূত করিয়া তোলে। প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই যে সকল যুগের ইতিহাসপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেছে, যে সময়ে এক অপূর্ব্ব শিল্পচেষ্টা ভারতের নির্জ্জন গিরিগুহায় এবং দেবালয়ের পাষাণপুঞ্জমধ্যে আপনাকে অমরসুন্দর-আকারে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেছিল, সেই মূর্ত্তিগড়া, মন্দিরগড়া, সেই ভাবুকস্পর্শে পাথরকে-প্রাণ-দেওয়া যুগ ভবিষ্যতের দিগন্তপটে নূতন করিয়া প্রতিফলিত দেখিতে পাই।’ এইভাবেই যাঁদের প্রতিভা জগতে কিছুমাত্র স্বীকৃতিলাভের যোগ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্পর্কেই আশা-মিশ্রিত গর্ব অনুভব করেছেন। রোহিণীকান্ত নাগ, শশিকুমার হেশ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পর্কে তাঁর সগর্ব প্রশংসার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। এখানে জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: ‘জগদীশ বসু জগতের রহস্যান্ধকার মধ্যে বিজ্ঞানরশ্মিকে কতটুকু অগ্রসর করিয়াছেন তাহা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঠিকমত জানি না এবং জানিবার শক্তি রাখি না, কিন্তু সেই সূত্রে আশা এবং গৌরবের উৎসাহে আমাদের ক্ষমতা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।’ এইরূপ সময়ে জর্জ বার্ডবুডের মতো একজন বিদেশী শিল্পরসজ্ঞ যখন ম্হাত্রে-রচিত মূর্তিটির প্রশংসা করেন, তখন ‘শিল্পকলা সম্বন্ধে আমরা যতই মূঢ় হই, আশার পুলকে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বিদ্যুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।’ এরপর তিনি অন্যান্য কলাবিদ্যার মধ্যে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের আপেক্ষিক সুবিধা প্রসঙ্গে লিখেছেন: ‘চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর্য্যের একটা মহৎ সুযোগ এই যে তাহার ভাষা সর্ব্বজনবিদিত। অবশ্য তাহার সূক্ষ্ম গুণপনা যথার্থভাবে বুঝিতে বিস্তর শিক্ষা এবং চর্চ্চার প্রয়োজন। কিন্তু তাহাকে শুদ্ধমাত্র প্রত্যক্ষ করিতে বিশেষ কোনো বাধা অতিক্রম করিতে হয় না। এইজন্য ইহা বিনা-পরিচয়েই সমস্ত জগৎসভার মধ্যে আসিয়া খাড়া হইতে পারে। অদ্য আমাদের মধ্যে যদি একজন প্রতিভাসম্পন্ন ভাস্করের অভ্যুদয় হয় তবে কল্যই তিনি বিশ্বলোকে প্রকাশলাভ করিবেন।...আমাদের দেশের পট-আঁকা যে চিত্রবিদ্যা তাহা প্রাদেশিক, তাহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য কেবলমাত্র সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে। যখন আমাদের চিত্রবিদ্যাকে আমরা সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিতে পারিব, তখন সর্ব্বজনসভায় স্থানলাভ করিয়া আমাদের মনুষ্যত্ব প্রসারিত হইবে।’

এরপর রবীন্দ্রনাথ মূর্তিরচনাকে 'প্রতিভার ইন্দ্রজাল' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন: 'ম্হাত্রেরচিত মূর্ত্তির মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বসনভূষণ, বেশবিন্যাস এবং উদ্যত-লঘুসুন্দর ভঙ্গীটির মধ্য হইতে সেই বিচিত্র অথচ সরল সঙ্গীতটি নীরবে ঊর্ধ্বদেশে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, যেমন করিয়া একটি শুভ্র বিকচ রজনীগন্ধা আপন উদ্যত বৃন্তটির উপর ঈষৎ-হেলিত সরল ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া স্তব্ধনিশীথের নক্ষত্রলোকমধ্যে পরিপূর্ণতার একটি রাগিণী প্রেরণ করে।'

প্রবন্ধের শেষে ম্হাত্রের একটি পত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। এই পত্র রবীন্দ্রনাথকেই লেখা, না, প্রদীপ-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহ, প্রবন্ধটি থেকে তা বোঝার উপায় নেই।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তার কিছু-কিছু বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। এইসব কারণেই ভারতী-র লেখায় মন দিতে পারেন নি তিনি। ফলে পৌষ মাসের পত্রিকা ঐ মাসের মধ্যে প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় পৌষ-মাঘ যুগ্ম-সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করার। শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে একটি তারিখ-হীন পত্রে তিনি লিখেছিলেন: 'লেখার কিছু সুবিধা করিতে পারিলে মনে করিতেছি পৌষ-মাঘের ভারতী একসঙ্গে বাহির করিব।' এই পত্রেই তিনি লিখেছেন: 'জ্বর ও বুকে ব্যথা লইয়া অনেক ভুগিয়াছি। দুই-একদিন ভাল আছি।'[৭৫] লিখতে না পারার হয়তো এটিও একটি কারণ। আর-একটি চিঠিতে তিনি শৈলেশচন্দ্রকে লিখছেন; 'পৌষ মাঘের ভারতী ছাপা [চলিতেছে]। প্রবন্ধাভাবে বিব্রত আছি।'[৭৬] এই পত্রটিও তারিখ-হীন, তবে ১১ মাঘের পূর্বে লেখা।

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে পৌষ-মাঘের ভারতী প্রকাশিত হয় 4 Feb [শনি ২২ মাঘ] তারিখে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা মাত্র চারটি, তার মধ্যে 'নিরাকার উপাসনা' ইতিপূর্বেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় 'শান্তিনিকেতনে অষ্টম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব' প্রতিবেদনের অন্তর্গত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল:

৭৯৭-৮২৯ 'দৃষ্টি-দান' দ্র গল্পগুচ্ছ ২১।২৬৫-৮৬

৮৩০-৪২ 'বীম্‌সের বাঙ্গলা ব্যাকরণ।/(উচ্চারণ পর্য্যায়)' দ্র শব্দতত্ত্ব ১২।৩৫০-৫৮

৮৮৪-৯১ 'নিরাকার উপাসনা' দ্র আধুনিক সাহিত্য-পরিশিষ্ট ৯।৫৩৭-৪১

৯২৩-২৫ 'স্বপ্ন' দ্র কল্পনা ৭।১২৭-২৯

'দৃষ্টিদান' গল্পটি সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন: '..."দৃষ্টিদান" গল্পটি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। গল্পটির প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্য ও কোমল তরুণতার অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা প্রবাহিণীর মত করুণরসের স্নিগ্ধ পূতধারা বহিয়া যাইতেছে। সুদক্ষ কবি, কঠোর দার্শনিকের মত কঠিনভাবে নায়কের চিত্তবৃত্তির আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আবার করুণকোমল কবির ন্যায় সমবেদনাপূর্ণহৃদয়ে সেই ক্ষতবিক্ষত নারীহৃদয় ভক্তিপ্রেমের সুকোমল কমলদলে আবৃত করিয়া দিয়াছেন।'[৭৭]

'বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ' বাংলার ভূতপূর্ব সিভিলিয়ান John Beames-এর *Grammar of the Bengali Language: Literary & Colloquial* [Oxford, 1894] গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় উচ্চারণ পর্যায় নিয়ে আলোচনা। আলোচনাটি রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ করেছেন লঘুভাবে। বাঙালির ইংরেজিকে 'বাবু-ইংরেজি' নাম দিয়ে ইংরেজেরা

প্রায়শই কৌতুক করে থাকেন, 'সেইজন্য আমাদেরও বড়ো ইচ্ছা করে, যে-সকল ইংরেজ এদেশে সুদীর্ঘকাল বাস করিয়া, দেশীভাষা শিক্ষার বিশেষ চেষ্টা করিয়া ও সুযোগ পাইয়াও সে-ভাষা সম্বন্ধে ভুল করেন তাঁহাদের প্রতি হাস্যবর্ষণ করিয়া পালটা জবাবে গায়ের ঝাল মিটাই।' কাজেই এদেশে বহু বছর কাটিয়ে ও বাংলা সাহিত্যের রীতিমতো চর্চা করে বীম্‌স্‌ সাহেব যে ব্যাকরণ রচনা করেছেন তাতে যদি পদে পদে অসংগত ভুল দেখা যায় 'তবে সেই সাহেবি অজ্ঞতাকে পরিহাস করিবার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে'। 'কিন্তু যখন দেখি আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি প্রকৃত বাংলাব্যাকরণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, তখন প্রলোভন সংবরণ করিয়া লইতে হয়। আমরা কেন বাংলাব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃতব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোনো শিক্ষিত লোককেও বাংলাভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া যায় কেন, এ-সব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার এবং সাহেবের উপর শ্রদ্ধা জন্মে।' রবীন্দ্রনাথ চিরকালই প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ রচনা করার জন্য প্রচার চালিয়েছেন, সুতরাং 'শুদ্ধমাত্র জ্ঞানানুরাগ দ্বারা চালিত' হয়ে বীম্‌স্‌ যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন তার ভুলগুলিও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, কারণ এর দ্বারা 'অতিপরিচয়-বশত ভাষার যে-সমস্ত রহস্য সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্নমাত্র উত্থাপিত হয় না, সেইগুলি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং বিদেশীর মধ্যস্থতায় স্বভাষার সহিত যেন নবতর এবং দৃঢ়তর পরিচয় স্থাপিত হয়।'

'স্বপ্ন' কবিতাটি বহু পূর্বে ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ [শনি 22 May 1897] শান্তিনিকেতনে লিখিত হয়েছিল।

মাঘ মাসে ত্রিপুরা ও নাটোরের মহারাজাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ততার কিছু বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি। কলকাতার আরও কোনো-কোনো জায়গায় তাঁর যাতায়াতের বিবরণ আছে ক্যাশবহিতে। ১ ও ৮ মাঘ তিনি বিডন স্ট্রীটে যান। এছাড়া তিনি ৫ মাঘ পিপুলপটী, ৯ মাঘ বাগবাজার, ১০ মাঘ পটলডাঙ্গা, ২৬ মাঘ সংগীত সমাজ ও ২৮ মাঘ 'চৌধুরী সাহেবের বাটী' যাতায়াত করেন। 'চৌধুরী সাহেব' সম্ভবত আশুতোষ চৌধুরী—১৭ ফাল্গুন প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর বিবাহ হয়, সম্ভবত সেই বিষয়ে কথাবার্তার জন্য রবীন্দ্রনাথ আশুতোষের কাছে যান। পরের দিনই তিনি শিলাইদহে প্রত্যাবর্তন করেন।

এছাড়াও তাঁর ৬ মাঘ 'শ্রেজাপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্বন্ধে যাতায়াতের' ও ১৯ মাঘ 'ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্পর্কে রাজার বাগানে' যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ২৬ ফাল্গুন ১২৯৪ [8 Mar 1888] তারিখে সম্পাদিত শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রাস্টডীডের একটি অংশে ছিল: 'এই ট্রস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথিসৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন'।[৭৮] এই নির্দেশ অনুযায়ী ইতিপূর্বেই অতিথিসৎকারের আয়োজন ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করা হয়েছিল, আর-একটি নির্দেশ অনুযায়ী পৌষমেলা শুরু হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দ থেকে। বাকি ছিল ব্রহ্মবিদ্যালয়। এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন বলেন্দ্রনাথ। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন তিনি। তাঁর এই প্রস্তাব পিতামহ দেবেন্দ্রনাথের সাগ্রহ সম্মতি লাভ করে, ২৪ পৌষ [7 Jan] সরকারী ক্যাশবহির একটি হিসাবে এই সম্মতির প্রতিফলন দেখা যায়: 'বঃ শান্তিনিকেতনের ট্রাষ্টী...দং বোলপুর শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ ও তৎসংক্রান্ত খরচ জন্য দান ৫০০০্'। এই

অর্থে শান্তিনিকেতনে একটি একতলা গৃহের নির্মাণকার্য শুরু হয়। পরবৎসর ৭ পৌষ [21 Dec 1899] তারিখে সত্যেন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন, কিন্তু তার আগেই ৩ ভাদ্র [শনি 19 Aug] যক্ষ্মারোগে বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। কাজেই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উদ্বোধন হলেও বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় নি। অথচ বিদ্যালয়ের বিস্তৃত নিয়মাবলী বলেন্দ্রনাথ প্রণয়ন করে গিয়েছিলেন।* রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের স্বপ্ন সফল করেন ৭ পৌষ ১৩০৮ [রবি 22 Dec 1901] তারিখে প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের গৃহটির আশ্রয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু বর্তমান সময়েও যে তিনি বলেন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন, মির্জাপুর ও রাজাবাগানে এই উপলক্ষে তাঁর যাতায়াতই তার প্রমাণ। শান্তিনিকেতন আশ্রমের তিনি একজন ট্রাস্টী ছিলেন ও শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট ভাবনারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে—সুতরাং খুবই স্বাভাবিক যে, প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের সংকল্প তাঁর সোৎসাহ সমর্থন লাভ করবে। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাটিকে বিলম্বিত করে। তিন বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন তখন তাঁর ব্যবহারিক ও আত্মিক প্রয়োজন ছিল ভিন্নতর, কিন্তু তা অবলম্বন করেছিল বলেন্দ্রনাথের দ্বারা প্রস্তুত ভিত্তিটিকে—দুঃখের বিষয়, এই 'সল্‌তে-পাকানো' ইতিহাসটিকে তিনি কোথাও স্বীকৃতি দিয়ে যান নি।

১১ মাঘ [মঙ্গল 24 Jan] সকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ও রাত্রে মহর্ষিভবনে একোনসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ বা মাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ-রচিত এই ব্রহ্মসংগীতগুলি গীত হয়:

[১] বাহাদুরী টোড়ী—ঢিমা তেতালা। বিমল আনন্দে জাগো দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৭; গীত ১। ১২০; স্বর ৪৫; মূল গান: সো নহি মারেঙ্গে মোরি রে দ্র ত্রিবেণীসংগম। ৩০।

[২] ভৈরবী—কাওয়ালি। পিপাসা হায় নাহি মিটিল দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৭; গীত ১। ১৭৬; স্বর ২৫; মূল গান: সৈঁয়া যাও যাও নহি বোলেঙ্গে দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৯১-৯২।

[৩] কীর্তন। তুমি কাছে নাই বলে হের সখা তাই [আখর-সহ] দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৭-৭৮; গীত ৩। ৮৪৯-৫০; স্বরলিপি নেই।

[৪] কীর্তন। নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে [আখর-সহ] দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৮; গীত ৩। ৮৫০-৫১; স্বর ২৭। গানটি ১২৯৩ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে প্রথম গীত হয়েছিল, কিন্তু এইবারেই গানটিতে আখর সংযুক্ত করা হয়।

এইদিন সায়ংকালীন অনুষ্ঠানে গীত রবীন্দ্রনাথ-রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি হল:

[৫] ভীমপলশ্রী—আড়াঠেকা। দিন ফুরাল হে সংসারী দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৯৫; গীত ১। ২০২; স্বরলিপি নেই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গানটির সুর-স্মৃতি থেকে যায় অমলা দাসের বোনঝি বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সাহানা দেবীর কাছে। Aug 1923-তে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

"আমাকে দেখেই কবির ইচ্ছে হল আমাকে দিয়ে এই নাটকে গান গাওয়াবেন।...আর এ সূত্রেই তিনি প্রথম জানতে পারলেন তাঁর—'দিন ফুরালো হে সংসারি' গানটি আমি জানি। আমার মাসিমার কাছে শিখেছিলাম। এই গানটি একমাত্র আমার মাসিমা "অমলা দাস ছাড়া আর কেউ জানত না। গানটির একটু ইতিহাস আছে। শুনেছি আমার মাসিমা এই রাগপ্রধান গানের সুরটি কণ্ঠে তুলেছিলেন কোনও এক বিয়েবাড়ির নহবৎ শুনে তাই থেকে। এবং রবীন্দ্রনাথ মাসিমার কণ্ঠে সুরটি শুনে তখুনি তাতে কথা বসিয়ে দেন। মাসিমার কাছে আমি এই গানটি শিখেছিলাম শুনে

কবি খুবই উৎফুল্ল ও আশ্বস্তও হলেন। কেননা ওঁর ধারণা হয়েছিল মাসিমার মৃত্যুর সঙ্গে ওঁর এই গানটিও হয়ত বা লুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। তাই আমার কণ্ঠে গানটি শুনেই তখুনি স্থির করে ফেললেন গানটি আমাকে দিয়ে 'বিসর্জন'-এ গাওয়াতেই হবে।"[৭৯]

[৬] তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল। মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজা দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৯৫; গীত ১। ২১৪; স্বর ৪; গানটি ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে রচিত হয়।

[৭] বেহাগ—কাওয়ালি। চিরসখা ছেড় না মোরে ছেড় না দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৯৫-৯৬; গীত ১। ১৬৯; স্বর ৪; গানটি কোনো পূর্ববর্তী গানের আদর্শে রচিত জানা গেলেও মূল গানের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। অমলা দাসের গলার উপযোগী করে যে ক'টি গান রচিত হয়েছিল বলে রথীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, এ গানটি তার অন্যতম। তিনি লিখেছেন: 'আমার অনুমান এই গানগুলির সুর রাধিকাবাবুর [গোস্বামী] কাছ থেকে বাবা নিয়েছিলেন।'[৮০]

[৮] কীর্তন। মাঝে মাঝে তব দেখা পাই [আখর-সহ] দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৯৬; গীত ৩। ৮৫১; স্বর ২৩; গানটি ৯ মাঘ ১২৯১ [21 Jan 1885] জোড়াসাঁকো বাড়িতে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মসম্মিলনে প্রথম গীত হয়, বর্তমানে তাতে আখর যোজনা করা হল।

[৯] ঝিঁঝিট—মধ্যমান। হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৯৬; গীত ১। ১৩৮; স্বর ৬২; মূল গান: মিয়া বে মানুলে সাটিগলা এরিভলা দ্র গবেষণা-গ্রন্থমালা ৩। ৮৯।

[১০] কীর্তন। ওহে জীবন বল্লভ [আখর-সহ] দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৯৬-৯৭; গীত ৩। ৮৫২; স্বর ৪; গানটি ৮ বৈশাখ ১৩০১ [20 Apr 1894] তারিখে রচিত, ইতিপূর্বে কাব্যগ্রন্থাবলী-তে [পৃ ৪৭০] গানটির আখর-হীন রূপ মুদ্রিত হয়েছিল, আখর-সহযোগে গীত হল বর্তমান বৎসরের মাঘোৎসবে।

সায়ংকালীন উপাসনায় 'শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মধুর স্বরে বেদ গান করিলেন।'[৮১]

লক্ষণীয়, এই বৎসর মাঘোৎসবের জন্য রবীন্দ্রনাথ নূতন ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন ছ'টি, তার মধ্যে দু'টি গানের স্বরলিপি নেই। তিনটি কীর্তন সুরে রচিত পুরোনো গানে রবীন্দ্রনাথ নূতন করে আখর যোজনা করেছেন। সদ্যোরচিত একটি কীর্তন গানও আখর-সংযুক্ত, কিন্তু এটির সুর রক্ষা করা হয় নি।

১৫ মাঘ [শনি 28 Jan] ব্রাহ্মসম্মিলন হয়। এই দিন প্রাতঃকালে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কিছু প্রধান সদস্য মহর্ষির আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত হন। শিবধন বিদ্যার্ণব অনুষ্ঠানের বিবরণে লিখেছেন: "শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি সঙ্গীতের ভার সমর্পিত হইয়াছিল। প্রথমেই সেই চিরপরিচিত বিশ্ববিমোহন কণ্ঠে একটি সঙ্গীত গীত হইল।...[দ্বিজেন্দ্রনাথের] উদ্বোধনের পর আবার সঙ্গীত হইল। 'বসে আছিহে! কবে শুনিব তোমার বাণী'।"[৮২]

এই দিনই একটি ঘটনা ঘটল যাকে ঐতিহাসিক বলা যায়—সেটি হল ভগিনী নিবেদিতা-আয়োজিত একটি চা-পানের আসরে রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার। আমাদের ধারণা, প্রাক্-সন্ন্যাস যুগে সংগীতকুশলী নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে মাঘোৎসবে বা অন্য-কোনো সংগীতসভায় রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়েছিল—কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য রক্ষিত হয় নি। কিন্তু বর্তমান সাক্ষাৎকারটির বিবরণ পাওয়া যায় মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে [Miss Josephine MacLeod] 'Jan 30th 1899—Tuesday'[*১] [১৮ মাঘ] তারিখে লেখা নিবেদিতার পত্রে।

লিজেল রেমঁ [Lizelle Reymond] তাঁর নিবেদিতা-জীবনীতে [অনুবাদ: নারায়ণী দেবী] লিখেছেন যে, Dec 1898-এ উত্তর-ভারত থেকে ফিরে এসে মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুল কলকাতায় আমেরিকান কন্‌সালের অতিথি হন, কন্‌সাল-পত্নী তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন স্থানীয় ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের সঙ্গে —'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও এঁদের বন্ধুত্ব হল। তিনি তখন শিলাইদহ থেকে একরাশ কবিতা [?] লিখে ফিরে এসেছেন, সেসব কবিতা বাংলার গর্বের ধন।'[৮৩] নিবেদিতার জন্য একটি সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করে মিস ম্যাকলাউড তাঁর বিভিন্ন ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে দিলেন—এঁদের মধ্যে ছিলেন ঠাকুর পরিবারের অনেকে, ডাঃ ও মিসেস পি. কে. রায়, জগদীশচন্দ্র বসু ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। স্বামীজী এই যোগাযোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন—"Make inroads into the Brahmos"—'ব্রাহ্মদের মধ্যে ঢুকে পড়ো' এই নির্দেশ তিনি নিবেদিতাকে দিয়েছিলেন। নিবেদিতা এই কথা বাগবাজারের ১৬ বোসপাড়া লেন থেকে 'Monday evening'-এ*[২] মিস ম্যাকলাউডকে [ইনি ও মিসেস বুল 5 Jan জাহাজে বোম্বাই ত্যাগ করেন] জানিয়ে লিখেছেন: 'Anyway he told me to get up a tea party and invite all my Brahmo friends and he would come and talk!!!...I'm going to ask the Boses—Roys (the other Roys also,...) Mr. Mukherji—Mr. Mohini [mohan Chatterji]—Mr. Tagore and Sarola Ghosal and her mother.'[৮৪] এই চিঠিরই 'Wednesday evening, pretty late' [25 Jan: ১২ মাঘ]-এ লেখা শেষাংশে নিবেদিতা লিখেছেন: 'He is always asking about the tea party—which I hope will happen next Monday.'[৮৫] সোমবারে নয়, টি-পার্টি হয়েছিল শনিবার 28 Jan: ১৫ মাঘ তারিখে। নিবেদিতা পূর্বোক্ত ১৮ মাঘের পত্রে এর বিবরণ দিয়ে লিখেছেন: 'On Saturday also I had a sort of unarranged party. Mrs. P. K. Roy and young Mr. Mukherji [?], Mr. Mohini and the Poet—and presently Swami with Dr. Sirkar (Mahendralal). It was quite a brilliant little gathering, for Mr. Tagore sang 3 of his own compositions in a lovely tenor—and Swami was lovely. Only there was some cloud—I could not tell what.'[৮৬] এই চিঠিরই পরের দিকে নিবেদিতা লিখছেন: 'At this moment the evensong gongs and bells are sounding in the homes all round me. It is the hour that they call "Candlelight"—the hour of worship. I cannot forget the lovely poem "Come O' Peace" ("Escho Santi")—with its plaintive minor air, that Mr. Tagore composed and sang for us the other day at this time.'[৮৭] মঙ্গলবার 7 Feb [২৫ মাঘ]-এর চিঠিতেও তিনি এই চা-পান সভার বিবরণ দিয়েছেন: 'I told you of my tea party I think and how they all came in magnificent raiment and drank tea in the Courtyard, and we had to wait for the milk—and there would never have been any tea if Mrs. P. K. Roy had not taken Gee [ঝি] and the tea pot too, in hand, and dismissed me to talk. And how afterwards we all came in here and Swami talked magnificently by candlelight.'[৮৮]

নিবেদিতা-প্রদত্ত বিবরণে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মনোরম চড়া সুরে' স্বরচিত তিনটি গান গেয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি "সেই অপূর্ব কবিতাটি—'এসো শান্তি'—তার মৃদু উদাস সুর—মিঃ টেগোর

যেটি আমাদেরই জন্য রচনা করেছিলেন ও গেয়েছিলেন" [শঙ্করীপ্রসাদ বসু-কৃত অনুবাদ]। এটি কোন্ গান? অধ্যাপক বসু এ-সম্পর্কে লিখেছেন: "গীতবিতানের পৃষ্ঠা উল্টে 'এসো শান্তি' শব্দ দুটি দিয়ে কোনো গান শুরু হয়েছে, এমন দেখিনি। (এক্ষেত্রে আমার ভুল হতে পারে)। সন্ধানমতো আমার যতদূর মনে হয়, পূজা-পর্যায়ে নিম্নের গানটি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, যার শেষের দিকে 'এসো শান্তি' কথা দুটি আছে, এবং এর ভাব নিবেদিতার বর্ণনার অনুরূপ—বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।"[৮৯] কিন্তু 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' [দ্র গীত ১। ৬৮-৬৯] গানটি ৮ আশ্বিন ১৩০২ তারিখে শিলাইদহে বোটে লেখা, সুতরাং এটিকে 'আমাদেরই জন্য রচনা করেছিলেন' বললে তথ্য পরিবেশনে কিছুটা ত্রুটি থেকে যায়; অবশ্য গীতসুধারসে আপ্লুত নিবেদিতা নিজেই যদি এইরকম ভেবে নিয়ে থাকেন তাহলে আর অসংগতি থাকে না—গানটির ভাব অবশ্যই তাঁর বর্ণনার অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ আর যে দু'টি গান গেয়েছিলেন, সে-সম্পর্কে কোনো আভাস নিবেদিতা দেন নি। মাঘোৎসবের জন্য তিনি ছ'টি নূতন গান রচনা করেছিলেন, তারই মধ্যে কোনো-কোনো গান তিনি গেয়ে থাকতে পারেন।

গান ছাড়া এই সভায় কি হয়েছিল, নিবেদিতার চিঠিতে তার স্পষ্ট বর্ণনা নেই। 'Swami talked magnificently'—মিসেস পি. কে. রায় চা-তৈরির ভার নিয়ে নিবেদিতাকেও কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন—কিন্তু কী-বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় নি। অধ্যাপক বসুর অনুমানানুযায়ী রবীন্দ্রনাথ নীরব থাকলে এই ঐতিহাসিক সম্মিলনকে অর্থহীন বলেই গণ্য করতে হবে। অবশ্য এক হিসেবে এটি নিছক ঘটনাতেই পর্যবসিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের রচনা বা উক্তিতে এই সম্মিলনের কোনো উল্লেখ নেই। নিবেদিতা যে লিখেছেন: 'Only there was some cloud—I could not tell what'—রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের পারস্পরিক মনোভাব সেইরূপ মেঘাচ্ছন্নই থেকে গেছে, এই সম্মিলন সম্পর্কটিকে আলোকিত করতে পারে নি। অবশ্য নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরপরিবারের সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে।

এই চা-পান সভার কয়েকদিন পরে ২০ মাঘ [বৃহ 2 Feb] রবীন্দ্রনাথ কুষ্টিয়া যাত্রা করেন। 'শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয় কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত যাওয়ার রেল ভাড়া ও লগেজ ভাড়া ইত্যাদির ব্যয় তারিখ ২০ মাঘ ১৩০৫' লিখিত কয়েকটি টুকরো কাগজ—সম্ভবত একটি ফর্দের বিভিন্ন অংশ—থেকে রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে যাওয়ার বিপুল আয়োজনের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। এই ফর্দের একটি টুকরোতে 'অলেস্কটী হুইসকী ১ বোতল—২।।ল০, ভার্মাউথ ৬টা ৯।।০, সোডাওয়াটার ২ ডজন ১্, লেমনেড ১্ ডজন ০, জিঞ্জারেড্ ৩ ডজন ২/০' প্রভৃতির হিসাব আছে—জমিদারিতে বিভিন্ন ব্যক্তির আপ্যায়নের বন্দোবস্তটি এই হিসাবে ধরা পড়ে। 'তুলসীরাম দরয়ান' এই-সব জিনিস পৌঁছে দিয়ে পর দিন কুষ্টিয়া থেকে শিয়ালদহে ফিরে এসেছে, তার হিসাবও ফর্দটিতে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ২৯ অগ্র° [বুধ 14 Dec] সপরিবারে শিলাইদহ থেকে কলকাতা এসেছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ২০ মাঘ [বৃহ 2 Feb] তিনি সম্ভবত সপরিবারেই সেখানে ফিরে যান—জমিদারির ক্যাশবহিতে 'রবীন্দ্রনাথ বাবু মহাশয়ের ২০ মাঘ যাইবার রেলভাড়া...২৩৪ ল৩' —এই বিপুল ব্যয় আমাদের অনুমানের কারণ।

তিনি কিন্তু কয়েকদিন বাদেই ২৪ মাঘ [সোম 6 Feb] আবার কলকাতায় আসেন। ২৫ মাঘ 'থ্যাকার কো°র বাটী', ২৬ মাঘ সংগীত সমাজ ও ২৮ মাঘ 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বাবু মহাশয়ের চৌধুরী সাহেবের বাটী যাতাতের' হিসাব পাওয়া যায়। এর পর ২৯ মাঘ [শনি 11 Feb] তিনি 'শিবধন বিদ্যার্ণব বামুন ও দাসী'দের নিয়ে শিলাইদহে ফিরে যান।

এই সময়ে শিলাইদহ থেকে শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা তাঁর দু'টি পত্র পাওয়া যায়। শৈলেশচন্দ্র তখন কালীগ্রামের নায়েব। ফসলহানি ইত্যাদি কারণে এই বছর কালীগ্রামের প্রজারা খুব অসুবিধায় পড়ে। মাঘ মাসের গোড়ায় একটি পত্রে তিনি শৈলেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন: 'কালিগ্রামের অবস্থা [শুনিয়া] চিন্তিত হইলাম। প্রজাগণ [যাহাতে অতিষ্ঠ] হইয়া না উঠে তৎপ্রতি দৃষ্টি [রাখিয়া আদায়] করিবে। এ বৎসর বোধ করি আমার [পক্ষে কালিগ্রামে না যাওয়াই শ্রেয় হইবে।]* ৩ ফাল্গুনের [সোম 16 Jan] পত্রেও বিষয়টি আছে: 'তোমার পত্রে কালিগ্রামের অবস্থা অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিতে মধুকে তোমার ওখানে পাঠান হইয়াছে শুনিয়াছি—সে কেবল একটা কাজের দস্তুর বলিয়া জানিবে—সেজন্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না'।[৯০] এই চিঠি-দু'টিতে প্রজাদরদী রবীন্দ্রনাথের একটি পরিচয় পাওয়া যায়—পরে কালীগ্রাম যখন তাঁর নিজস্ব জমিদারি হয়েছে, অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি প্রজাদের দেয় খাজনা মাপ করে দিয়েছেন। জমিদারির প্রধান কর্মচারীর মর্যাদারক্ষা ব্যাপারে তাঁর সচেতনতাটিও লক্ষণীয়।

৮ ফাল্গুন [রবি 19 Feb] শৈলেশচন্দ্রকে তিনি যে পত্রটি লিখেছেন, তার একটি বিষয় বিশেষ আলোচনার যোগ্য। তিনি লিখছেন: 'আমরা [এখানে] গুটি পোকা চাষের পরীক্ষা করে দেখ্‌লুম বিশেষ লাভজনক তোমাদের ওখানে চালাতে পারলে প্রজাদের বিশেষ উপকার হয়। খুব সহজ এবং খরচ প্রায় নেই বল্লেই হয়।'[৯১] এর আগেও মাঘের গোড়ায় তিনি শৈলেশচন্দ্রকে লিখেছিলেন: 'রামপুর শিল্প বিদ্যালয়ে রেশমতত্ত্ব শিক্ষার জন্য কালিগ্রাম হইতে দুইজন ছাত্র পাঠাইবার কথা ছিল। তাহার কি করিলে?'[৯২]

উক্ত 'রামপুর শিল্প বিদ্যালয়' হল অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-কর্তৃক ১৩০৪ বঙ্গাব্দে রাজশাহী জেলার সদর রামপুর-বোয়ালিয়ায় প্রতিষ্ঠিত রেশম-শিল্প-বিদ্যালয়। স্বদেশপ্রেম অক্ষয়কুমারকে একদিকে যেমন দেশের গৌরবময় লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী করেছে, অন্যদিকে তেমনই দেশের প্রাচীন সমৃদ্ধ রেশমশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেছেন তিনি। উভয়ত্রই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহযোগী ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত ভারতী-তে অক্ষয়কুমার 'পট্ট বস্ত্র' [আষাঢ়। ২২০-২৫], 'বস্ত্ররঞ্জন-বিদ্যা' [শ্রাবণ। ৩৪৪-৫৫] ও 'এণ্ডি' [অগ্র°। ৭২৫-৩২] প্রবন্ধে এই শিল্পের বিবিধ ব্যাবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন। রেশম-শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রস্তুত রেশমবস্ত্র নিজে ব্যবহার করে ও বন্ধুদের উপহার দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই শিল্পকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেছেন। ৩০ চৈত্র [বুধ 12 Apr] ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে তিনি লিখেছেন: 'মহারাজার জন্য সর্ব্বানন্দের হস্তে একটী সাদা রেশমের থান উপহার পাঠাইলাম।/আপনার জন্য রাজসাহী শিল্প বিদ্যালয় হইতে মট্‌কার থান প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে উপহার পাঠাইব—ইহার প্রস্তুত এক সুট সাজ পরিয়া আমার সহিত শিলাইদহে যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন বিশেষ আনন্দলাভ করিব।/শিল্প বিদ্যালয়কে উৎসাহ দিবার জন্য সেখান হইতে আমি সর্ব্বদাই রেশমের বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকি—দোষের মধ্যে লোক ও সামর্থ্য অল্প হওয়াতে তাহারা শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে কাপড় যোগাইতে পারে না,—বন্ধুদের নিকট আমার এই সকল বস্ত্র

উপহার কেবল আমার উপহার নহে তাহা স্বদেশের উপহার। অতএব আশা করি আপনারা তুচ্ছ বলিয়া ইহাকে অনাদর করিবেন না।'[৯৩]

শুধু এই নয়, শিলাইদহে তিনি রেশমগুটির চাষেও প্রবৃত্ত হন। ১০ আষাঢ় ১৩০৬ [শনি 24 Jun 1899] তিনি জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখছেন: 'শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—দশ বারোজন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে—লরেন্স্ স্নান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত।...এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিতে পারিতেন তবে একটা দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।'[৯৪] রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন: 'শিলাইদহের নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে।...লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত।...চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা—সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ—কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই করে জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য।....সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে।'[৯৫] রবীন্দ্রনাথের এই 'নিস্ফল অধ্যবসায়' আমাদের জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজী-ব্যবসায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়—কিন্তু এর মধ্যে দেশের মৃতপ্রায় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার যে সদর্থক প্রয়াস দেখা গেছে তার মূল্য সামান্য নয়।

৮ ফাল্গুন [রবি 19 Feb] রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে শৈলেশচন্দ্রকে লিখেছেন: 'আগামী ১৭ই ফাল্গুন ইন্দিরার বিবাহ। সেই উপলক্ষ্যে আমাকে একবার সপরিজনে কলকাতায় যেতে হবে। তোমাদের ওখান থেকে ভাল দই কিছু পরিমাণে সংগ্রহ করে বিবাহ উপলক্ষ্যে ওখানে যথাসময়ে পাঠাতে পারবে?'[৯৬] উল্লেখযোগ্য, এই দিন স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর আগেও ৩ ফাল্গুন [মঙ্গল 14 Feb] নিবেদিতা মহর্ষির কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই উভয় দিনেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিলাইদহে।

ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীর বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে কলকাতায় আসেন ১৪ ফাল্গুন [শনি 25 Feb] তারিখে। তিনি শিলাইদহে ফিরে যান ২৭ ফাল্গুন [শুক্র 10 Mar]। এই সময়ের মধ্যে ইন্দিরা দেবীর বিবাহে যোগ দেওয়া ছাড়াও ১৬ ফাল্গুন জোড়াগির্জা, ২০ ফাল্গুন বালিগঞ্জ ও ২১ ফাল্গুন নরেন্দ্রনাথ

সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান—তিনটি হিসাবই জমিদারি ক্যাশবহির, সুতরাং অনুমান করা যায় জমিদারি-সংক্রান্ত কাজেই এই যাওয়া-আসা। ২২ ফাল্গুনের হিসাব: 'যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌত্রের আয়ুবড় ভাতের নিমন্ত্রণে হিতেন্দ্র, সত্য, সুধীন্দ্র ও রবীন্দ্র', ২৩ ও ২৪ ফাল্গুনেও এই বিবাহোপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বেনেপুকুরে যজ্ঞেশপ্রকাশের বাড়ি গিয়েছেন। উক্ত 'পৌত্র'টি হলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগুরু ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিখ্যাত শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় [1876-1953]—পৌত্র-স্থানীয় এই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন—এঁর আকা 'শূদ্রকের রাজসভা' চিত্রটি অবলম্বনে তিনি মাঘ ১৩০৬-সংখ্যা প্রদীপ-এ 'কাদম্বরী চিত্র' [দ্র প্রাচীন সাহিত্য ৫। ৫৩৭-৪৮] প্রবন্ধটি রচনা করেন।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে পূর্বোল্লিখিত ৮ ফাল্গুনের পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'চৈত্রমাসের আরম্ভে ত্রিপুরার মহারাজার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আমাকে একবার ত্রিপুরায় যেতে হবে।' রাজ-সন্দর্শনের উপযুক্ত আয়োজনের বর্ণনা পাওয়া যায় সরকারী ক্যাশবহির ৭ চৈত্র [সোম 20 Mar] তারিখের হিসাবে: 'ত্রিপুরার মহারাজাকে দিবার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ক্রয়ের মূল্য শোধ...শ্রীযুত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের ক্যাশে জমা দেওয়া যায়/আলয়ান ১ জোড়া ৫৫ সাটী ১ জোড়া ২৫ চাদর ২ জোড়া ৩২ /পূর্ব্বের ৮/১২০'। ফাল্গুন মাসের শেষদিকে 'ত্রিপুরার রাজার উপহারের জন্য বাস্কেট তৈয়ারি' উপলক্ষে সত্যপ্রসাদ কয়েকবার এইচ. সি. গাঙ্গুলির অফিসে যাতায়াত করেছেন সরকারি ক্যাশবহিতে এরূপ হিসাবের সাক্ষাৎ মেলে।

রবীন্দ্রনাথ কবে ত্রিপুরা যাত্রা করেন বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। 'বৃহস্পতিবার'-উল্লিখিত একটি তারিখ-হীন পত্রে তিনি শৈলেশচন্দ্রকে লিখেছেন: 'এবারে গোলমালে ফাল্গুন চৈত্রের জন্য গল্প লিখিতে পারি নাই। তোমার সেই বুড়া দেওয়ানের গল্পটা আমাকে পাঠাইয়া দিলে আমি সেটা আমার মনের মত সংশোধনপূর্ব্বক যদি ছাপাইতে পারি চেষ্টা দেখিব। আগামী কল্য বোধ হয় সপ্তাহখানেকের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি, সেখানকার ঠিকানায় পাঠাইতে পার।'[৯৭] শৈলেশচন্দ্রের 'বুড়া দেওয়ানের গল্প' ফাল্গুন-চৈত্র-সংখ্যা ভারতী-তে ছাপা হয় নি, কিন্তু পত্রটি যে এই সময়েই লেখা এই উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ ১০ চৈত্র [বৃহ 23 Mar] 'বিদায়' [দ্র ভারতী, ফাল্গুন-চৈত্র। ১১১৪-১৬; কল্পনা ৭। ১৮২-৮৩] নামে একটি কবিতা লেখেন—হয়তো তার পরদিনই ত্রিপুরার পথে কলকাতা যাত্রা করেন।

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে সত্যরঞ্জন বসু 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি' প্রবন্ধে ও দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত 'তথ্যক্রমপঞ্জী'-তে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ত্রিপুরা ভ্রমণের সময় উল্লেখ করেছেন ১৩০৬ বঙ্গাব্দের শ্রীপঞ্চমী [২২ মাঘ রবি 4 Feb 1900]। কিন্তু উক্ত সময়ে তিনি কলকাতায় ছিলেন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং শৈলেশচন্দ্রকে লিখিত পত্রে [৮ ফাল্গুন] 'চৈত্রমাসের আরম্ভে ত্রিপুরার মহারাজার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে' ত্রিপুরায় যাওয়ার উল্লেখ ও পূর্বোক্ত উপহার-সামগ্রীর আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে চৈত্র ১৩০৫-এর মাঝামাঝি সময়ে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় প্রথম গিয়েছিলেন এমন সিদ্ধান্ত করাই সংগত। কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন: 'রবিবাবু সেইবার প্রথম আগরতলা রাজধানীতে আসিলেন; তখন বসন্তকাল—রাজধানীর উত্তরভাগে পাহাড়ের উপর কুঞ্জবনের বসন্তোৎসবে কবি-সম্মিলনের ঘটা, রাজা-প্রজার সমব্যবহার, কবি রবীন্দ্রনাথের যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময় উৎপাদন করিল। মহারাজ রাধাকিশোরের মহৎ চরিত্রের মহানুভবতা দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।'[৯৮] এই বৎসরের দোলপূর্ণিমার তারিখ ছিল ১৪ চৈত্র [সোম 27 Mar 1899]—সম্ভবত এই দিনে অনুষ্ঠানটি হয়।

১৩০৪ বঙ্গাব্দের ভূমিকম্পে আগরতলার রাজপ্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়েছিল তাই রবীন্দ্রনাথের বাসস্থান নির্ধারিত হয় মহিমচন্দ্রের বাড়িতে। দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: '...মহারাজের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় সর্ব্বপ্রথম আগমন করেন এবং রাজ-অতিথিরূপে কর্ণেল মহিম ঠাকুরের জন্য নবনির্ম্মিত গৃহে অবস্থান করেন। উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের নির্ম্মাণকার্য্য তখনও চলিতেছে। কবির শুভাগমন উপলক্ষে সহরের উপকণ্ঠস্থ পুরান কুঞ্জবনের শৈলশিরে কবির সম্মানে বসন্তোৎসবের ও মণিপুরী নৃত্যগীতাদির মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজিত হইল।'[৯৯]

রবীন্দ্রনাথ কতদিন ত্রিপুরায় ছিলেন এবং কবে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন জানা নেই। তবে তিনি ২৪ চৈত্র [বৃহ 6 Apr] যে কলকাতায় ছিলেন, তা বোঝা যায় ঐদিন জোড়াসাঁকো থেকে বরিশালের বসন্তকুমার গুপ্তকে লেখা তাঁর একটি পত্র থেকে। পত্রটিতে শুধু 'বৃহস্পতিবার' লেখা, কিন্তু রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্রের পোস্টমার্ক থেকে স্থান-কাল নির্ধারণ করা যায়।

বসন্তকুমার গুপ্তের কর্মসংস্থানের জন্য রবীন্দ্রনাথের সুপারিশপত্র আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। বর্তমান সময়ে তাঁকে লেখা দু'টি চিঠিতে এইরূপ চেষ্টার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই পত্র-দু'টির অন্য তাৎপর্য আছে। ২৯ ফাল্গুন [রবি 12 Mar] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছেন: 'ফাল্গুন অতীত হইল নিশিকান্ত টাকা পাঠাইল না—এমনি সঙ্কটে পড়িয়াছি সে আর কি বলিব। নিশিকান্তের নিকট একখানা পত্রও পাওয়া যায় না। ঠিকানাও জানি না —সুতরাং অস্থির ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। নিয়মিত পত্রাদি না লিখিলে বড়ই উদ্বেগ ভোগ করিতে হয় ইহা সে বুঝিল না।'[১০০] ২৪ চৈত্রের পত্রেও লিখছেন: 'নিশিকান্ত সম্বন্ধে একটা আস্কারা হইয়া গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।'[১০০] পরবর্তীকালেও তাঁকে লেখা পত্রে উক্ত নিশিকান্তের উল্লেখ আছে। ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ [বুধ 17 May 1899] অসুস্থ বলেন্দ্রনাথ বসন্তকুমারকে লিখেছেন: 'নিশিকান্তের কোনও সাড়াশব্দ নাই। ৫।৭ খান পত্র তাহাকে লেখা হইয়াছে—উত্তর পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সকলেই কিছু বিস্মিত হইয়াছেন। তাহাকে বলিবেন।'[১০০] এই পত্রগুলির ভাবে বোঝা যায়, ইনি ঠাকুর কোম্পানির একজন বিশিষ্ট কর্মচারী। আখের কলের যে ব্যবসা ঠাকুর কোম্পানি শুরু করেছিল, তা কুষ্টিয়া ছাড়া বরিশালেও বিস্তৃত হয়েছিল। বরিশালের ব্যবসা দেখার ভার ছিল উক্ত নিশিকান্তের উপর। কিন্তু তাঁর অমনোযোগিতা ও অসাধুতার ফলে এই ব্যবসা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ব্যক্তির পুরো নাম কী তা কোনো পত্রেই উল্লিখিত হয় নি। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'মৈত্রেয় উপাধিযুক্ত কোনো ব্যক্তি ছিলেন এই কারবারের ম্যানেজার। তাঁহার উপর বলেন্দ্রের অপার বিশ্বাস; সেই ব্যক্তি বাণিজ্যতরণীর তলদেশ এমন সুনিপুণভাবে ছিদ্র করিয়া দিয়াছিলেন যে, উহা ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইতেছে, তাহা বাহির হইতে কেহ বুঝিতে পারেন নাই। শোনা যায় বলেন্দ্রের অতিবিশ্বাসী ম্যানেজার সত্তর-আশি হাজার টাকার গরমিল করিয়া সরিয়া পড়েন।'[১০১] জানি না, এই 'মৈত্রেয়' ও নিশিকান্ত একই ব্যক্তি কি না; কিন্তু 'ক্ষণিকা' কাব্যের পাণ্ডুলিপির [Ms. 120] 105 পৃষ্ঠায় জনৈক 'Nishi kanta Gupta C/o Pyarimohan Gup[ta]/1 Shyamach[aran]. Dey's St' নাম ও ঠিকানা রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে দেখা যায়—ইনিই কি উক্ত 'নিশিকান্ত' এবং বসন্তকুমার গুপ্তের ভ্রাতা বা আত্মীয়?

রবীন্দ্রনাথ ২৪ চৈত্রের [বৃহ 6 Apr] পরে শিলাইদহে যান। ২৮ চৈত্র 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের নিকট সিলাইদহ ২৮ চৈত্র ১ পত্র রেজেষ্টরি করিয়া' ও ২৯ চৈত্র 'শিলাইদহায় বাবু মহাশয়ের নিকট পত্র পাঠান'র

হিসাব পাওয়া যায়। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও সম্ভবত তাঁর সঙ্গে শিলাইদহে যান দিন-দুয়েকের জন্য। বিষয়টি আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

৩০ চৈত্র [বুধ 12 Apr] তিনি এখানেই লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বর্ষশেষ' [দ্র ভারতী, চৈত্র। ১১১৬-২২; কল্পনা ৭।১৮৪-৮৮] '১৩০৫ সালে ৩০ চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত'।

ভারতী-সম্পাদনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ যথাযথ পালন করতে পারেন নি। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের শেষ চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় দু'টি যুগ্ম-সংখ্যা রূপে। ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ৬ বৈশাখ ১৩০৬ [মঙ্গল 18 Apr 1899]। 'সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ' রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: 'এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম। ইতিমধ্যে নানা প্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। সে সকল ত্রুটির যত কিছু কৈফিয়ৎ প্রায় সমস্তই ব্যক্তিগত। সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়া কর্ম্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীকেও নানা রূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে। নিরুদ্বিগ্ন অবকাশের অভাবে পাঠকদেরও আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই এবং সম্পাদকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিজেরও আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছি।...ঠিক মাসান্তে ভারতী বাহির করিতে পারি নাই; সে জন্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। একা সম্পাদককে লিখিতে হয়, লেখা সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক অংশে প্রুফ ও প্রবন্ধ সংশোধন করিতে হয়।...যে ব্যক্তি পত্র চালনাকেই জীবনের মুখ্য অবলম্বন করিতে পারে, এই সকল বাধাবিঘ্নের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করা তাহাকেই শোভা পায়। কিন্তু পত্রের অধিকাংশ নিজের লেখার দ্বারা পূরণ করিবার মত যাহার প্রচুর অবকাশ ও ক্ষমতা নাই, নিয়মিত পরের লেখা সংগ্রহ করিবার মত অসামান্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নাই, এবং ছাপাখানা ইত্যাদির সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট নিবারণ যাহার সাধ্যের অতীত তাহার পক্ষে সম্পাদকের গৌরবজনক কাজ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহু বামনের চেষ্টার মত হয়।...আশা করি এই ফলের যাহা কিছু মিষ্ট তাহাই পাঠকদের পাতে দিয়াছি, এবং যাহা কিছু তিক্ত তাহা চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে হজম করিবার চেষ্টা করিয়াছি।...এক্ষণে গত বর্ষশেষে যে স্থান হইতে ভারতীর মহত্তার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম বর্ষান্তে ঠিক সেই জায়গায় তাহা নামাইয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া সকলকে নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।' অবশ্য সাধনা ও ভারতী-র অভিজ্ঞতার পরও রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি—তিনি এর পরও বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার, তত্ত্ববোধিনী ও শান্তিনিকেতন পত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই পর্বগুলিতে তাঁকে সাহায্য করার লোকের বিশেষ অভাব ছিল না, তবু তিনি সেই কাজে স্থায়ী হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের পর ভারতী-র সম্পাদনার দায়িত্ব নেন সরলা দেবী—প্রথম-প্রথম রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখা দিয়ে অনেক সহায়তা করেছেন।

ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি রচনা মুদ্রিত হয়:

৯৩১-৭৮ 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' দ্র কাহিনী ৫।১১৫-৫৪

১০০৬-৪৫ 'গ্রাম্যসাহিত্য' দ্র লোকসাহিত্য ৬।৬৩৯-৬৪

১১১৪-১৬ 'বিদায় কাল' দ্র কল্পনা ৭।১৮২-৮৩ ['বিদায়']

১১১৬-২২ 'বর্ষ শেষ' দ্র ঐ ৭।১৮৪-৮৮

১১২২-২৫ 'সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ' দ্র দেশ, শারদীয়া, ১৩৮৪।২২

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অগ্র° ১৩০৪-এ শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছিল, রচনা-শেষের তারিখ ২৯ অগ্র° ১৩০৪ [13 Dec 1897]। 'গোলমালে ফাল্গুন চৈত্রের জন্য গল্প' লিখতে না পারার কথা রবীন্দ্রনাথ শৈলেশচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন, সেই ক্ষতি তিনি পূরণ করলেন বৎসরাধিকাল পূর্বে রচিত এই হাস্যরসাত্মক কাব্যনাটিকাটি প্রকাশ করে।

'গ্রাম্যসাহিত্য' একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩০১-এ 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ পাঠ ও প্রকাশ করার বহু পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছড়া সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ ব্যাপক প্রয়াসের সূচনা করেছিলেন, বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত ছড়ার ভিত্তিতেই তিনি ওই প্রবন্ধটি রচনা করেন। পরবর্তী কালেও তাঁর প্রয়াস যে অব্যাহত ছিল, বর্তমান প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ। হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে প্রচলিত যে-সব ছড়া তিনি সংগ্রহ করেন 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে তারই বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু রচনাটি কেবল এই ছড়াগুলির বিশ্লেষণেই পর্যবসিত হয় নি,—'হরগৌরী-বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা-বিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে' এই উক্তির দ্বারা বাংলা সাহিত্যের এই দুই বিশেষ ধারার মর্মসত্যটি উদঘাটিত হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে বাংলাদেশে প্রচলিত হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ কথার সঙ্গে পশ্চিম দেশে প্রচলিত রামায়ণকথার একটি তুলনামূলক আলোচনা আছে, সেটি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন জাতীয়তাবোধের আদর্শের আলোকে পঠিতব্য। বাঙালি জাতিকে তিনি যে 'কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য', ও 'ভাবের অপরিসীম মাধুর্য' দ্বারা একত্রিত দেখতে চেয়েছেন, তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ তিনি দেখেছেন রামায়ণকথার মধ্যে। তাই তিনি আক্ষেপের সুরেই প্রবন্ধটি শেষ করেছেন: 'বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণকথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।' তিনি বাঙালিজাতির কাছে কি চাইছিলেন তা এই আক্ষেপের মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে।

বীণাবাদিনীর চৈত্র-সংখ্যায় [২।৯] রবীন্দ্রনাথের দু'টি গানের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়:

১৩৩-৩৫ তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল। মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজা

১৪১-৪৪ ইমন্ কল্যাণ—একতালা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো

—প্রথমোক্ত গানটি এই বৎসরের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

বর্তমান বৎসরে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস কিছু পরিমাণে ঘটনাবহুল।

১০ বৈশাখ [শুক্র ২২ Apr] শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়। এই উপনয়নের বিবরণ রবীন্দ্র-জীবনকথার সঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে।

২৫ বৈশাখ [শনি 7 May] সত্যপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র দিবপ্রকাশের আনুষ্ঠানিক অন্নপ্রাশন হয়। এঁর জন্মতারিখ ১৭ কার্তিক ১৩০৩ [রবি 1 Nov 1896]। সত্যপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র শিবপ্রকাশের জন্ম হয় বর্তমান বৎসরের ২২ আষাঢ় [বুধ 6 Jul 1898] রাত্রি ১টা ৫ মিনিটে।[১০২]

৩ জ্যৈষ্ঠ [সোম 16 May] মহর্ষির পার্ক স্ট্রীট-স্থ বাসভবনে তাঁর দ্ব্যশীতিতম জন্মোৎসব পালিত হয়। 'ঐ দিবস ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত্ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মোপাসনা করিলে পর মহর্ষিদেব পরিবারস্থ সকলকে...আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।•••এই জন্মোৎসব উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্যে অনুবাদ করিয়া মহর্ষিদেবকে উপহার দিয়েছিলেন।'[১০৩]

১৭ ফাল্গুন [মঙ্গল 28 Feb 1899] ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর বিবাহ হয়। মহর্ষি-পরিবারের প্রথানুযায়ী বিবাহের পূর্বে প্রথম চৌধুরীকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিতে হয়েছিল। বিবাহে যথেষ্ট ধূমধাম হয়েছিল—ক্যাশবহিতে দেখা যায় এই বিবাহে মোট খরচ হয় ৫৯৫১ টাকা সাড়ে তেরো আনা। কী-ধরনের পারিবারিক সংকটের মধ্য দিয়ে বিবাহ হয়েছিল রবীন্দ্র-জীবনকথা অংশে আমরা তার কিছু আভাস দিয়েছি। পাত্রপাত্রীর মানসিক সংকটের বর্ণনা আছে সুভাষ চৌধুরী-সম্পাদিত 'ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী' [1985] গ্রন্থে। উৎসাহী পাঠক বইটি পড়লে ফরাসী সাহিত্যের রসে পুষ্ট দু'জন মননজীবী মানুষের পরিচয় লাভ করে উপকৃত হবেন। এও বোঝা যাবে, ছিন্নপত্রাবলী-র অন্তর্গত অপূর্ব চিঠিগুলি লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ কেন বেছে নিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবীকে।

চৌধুরী-পরিবার এই বিবাহকে সহজে মেনে নিতে পারেন নি। 'যার ফলে বিবাহের পরদিন প্রমথ চৌধুরী ইন্দিরাদেবীকে নিয়ে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে না-উঠে ছোটো বোন মৃণালিনী দেবীর বাড়িতে যান।'[১০৪] তাঁদের জন্য আগেই বাড়ি ভাড়া করে রাখা হয়েছিল—১৪ ফাল্গুনের সরকারী ক্যাশবহির হিসাব: 'বঃ নবাব সইয়েদ আহাম্মদালি দং শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর থাকিবার বালিগঞ্জের বাটীর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বাটীর ভাড়া ১৩০্ টাকার মধ্যে...১০০্'। এরপর দীর্ঘদিন সরকারী ক্যাশ থেকে ১০০ টাকা করে বাড়িভাড়া দিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঠাকুরপরিবারে ফাল্গুন মাসে আর-একটি বিবাহ হল ২৯ ফাল্গুন [রবি 12 Mar] শরৎকুমারী দেবীর চতুর্থ কন্যা চিরপ্রভার সঙ্গে নলিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের: 'বাবু নলিনীকান্ত বন্দপাধ্যায়কে শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় গত ৩০ ফাল্গুন যৌতুক দেন ৪০০০্' —বিবাহের অন্যবিধ খরচ ১৪৭১ টাকা সাড়ে ন'আনা।

মহর্ষির প্রপৌত্র দিনেন্দ্রনাথেরও এই সময়ে বিবাহ স্থির করা হয়, পাত্রী গগনেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী সুনয়নী দেবীর কন্যা বীণাপাণি দেবী। ২৮ চৈত্রের হিসাব: 'বঃ বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর দং শ্রীযুক্ত দ্বিনেন্দ্রবাবুর বিবাহের জন্য আশীর্ব্বাদ করিবার মুক্তার অলঙ্কার ক্রয়', কন্যাকে আশীর্বাদ করা হয় ৫ বৈশাখ ১৩০৬ [17 Apr 1899] তারিখে।মহাসমারোহে বিবাহটি অনুষ্ঠিত হয় অবশ্য কয়েক মাস পরে ২৩ মাঘ [সোম 5 Feb 1900] তারিখে।

কিন্তু এই বৎসরের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা বোধ হয় মহর্ষির দীর্ঘকাল পরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন।১২৯০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের কিছু আগে মুসৌরী পাহাড় থেকে নেমে এসে পৌষ-মাঘ মাসে কয়েকদিন জোড়াসাঁকো বাড়িতে থাকা [দ্র রবিজীবনী ২।২৪৮] ছাড়া তিনি চুঁচুড়া, বোম্বাই ও কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে বিভিন্ন বাড়িতেই প্রায় পনেরো বছর বাস করেন। তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসেন ২৬ কার্তিক [শুক্র 11 Nov] তারিখে। বাড়িতে সেদিন 'রোশন চৌকী'ও বসেছিল। ক্যাশবহিতে আছে: 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয় গত ২৬ কার্ত্তিক পার্ক স্ট্রীট হইতে নাটোর মহারাজের গাড়িতে যোড়াসাঁকোর বাটী আগমন করেন তজ্জন্য উক্ত মহারাজার কৌচম্যান সহিসকে বকসিস ৫্'। নাটোরের মহারাজাকেও মহর্ষি নানাভাবে

আপ্যায়িত করেছিলেন, তার কিছু বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। বাহির-তেতালার একটি ঘরে তিনি আশ্রয় নেন। সেইখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে ৬ মাঘ ১৩১১ [বৃহ 19 Jan 1905] তারিখে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

গত দু'বছর ধরে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও স্বামী দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের মধ্যে একটি যোগসূত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছিল, রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠানে তা একটি স্পষ্ট রূপ লাভ করল।

আমরা আগেই বলেছি, এই যোগসূত্র রচনার কাজে বলেন্দ্রনাথই সর্বাধিক কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। লাহোরের *Arya Patrika* ও *Arya Messenger*-এর সম্পাদকের উদ্দেশ্যে প্রেরিত 21 May [৮ জ্যৈষ্ঠ] ও 31 May [১৮ জ্যৈষ্ঠ] তারিখের দু'টি পত্রে বলেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের তাত্ত্বিক দিকটি ব্যাখ্যা করে আর্যসমাজের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার প্রয়াস করেছেন [দ্র তত্ত্ব°, আষাঢ়। ৪২-৪৭]। দ্বিতীয় চিঠিটি থেকে জানা যায়, আর্যসমাজের কয়েকজন পণ্ডিতের সঙ্গে এ-বিষয়ে ইতিপূর্বেই মহর্ষির আলোচনা হয়েছিল। বলেন্দ্রনাথকে লাহোরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, এই সংবাদও পত্রটি থেকে জানা যায়। দুই সমাজের সম্মিলন বিষয়ে প্রেরিত আরও কয়েকটি পত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। ভাদ্র মাসে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত রাঁচি আর্যসমাজের সাংবৎসরিক উপলক্ষে বলেন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হন ও সেখানে এই মিলন বিষয়ে তিনি বক্তৃতাদি করেন। লাহোর আর্যসমাজের একবিংশ সাংবৎসরিক উপলক্ষে অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ায় বলেন্দ্রনাথ লাহোরে যান এবং আর্যসমাজে ও ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতার দ্বারা উভয় সমাজের একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রটি প্রসারিত করেন। তাঁর মা প্রফুল্লময়ী দেবী লিখেছেন: 'পাঞ্জাবে আর্যসমাজের সহিত আমাদের ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাহাতে মিলন স্থাপন হয় সেইজন্য তাহার প্রাণের প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং তাহারই জন্য বলু, আর্যসমাজে যাতায়াত করিতে থাকে, তাঁহারাও তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি কখনো বিবাদ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে বলুকে মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিতেন, এবং সে গিয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া মিলন স্থাপন করিয়া আসিত। ...দ্বিতীয়বার যখন সে তাঁহাদের টেলিগ্রাম পাইয়া চলিয়া যায়, সেইদিন আমার মেজ জায়ের কন্যা ইন্দিরার ফুলশয্যা [১৯ ফাল্গুন: 2 Mar]। সেইজন্য সকলেই তাকে যাইতে বারণ করিলেন, কিন্তু তাহাদের টেলিগ্রাম পাওয়াতে পাছে কর্তব্যের অবহেলা হয় বলিয়া নিষেধ সত্ত্বেও সে চলিয়া গেল।'[১০৫] এখান থেকে ফিরে এসেই বলেন্দ্রনাথ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ও কয়েকমাস পরে ৩ ভাদ্র [শনি 19 Aug 1899] তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের সম্মিলনের প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।

৭ পৌষ [বুধ 21 Des] শান্তিনিকেতনে অষ্টম সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসবেও আর্যসমাজ তাঁদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল। আর্য সমাজের আচার্য্য স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন।:...কিন্তু হিন্দীভাষা অবশ্য সকলের বোধায়ত্ত নয় এই জন্য শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার বক্তৃতা বিবৃত করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন।'[১০৬]

এইদিন প্রাতঃকালীন উপাসনায় হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করেন। ‘পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইলে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনাথ দীন দরিদ্রদিগের জন্য সমন্ত্রক ভোজ্য উৎসর্গ করিলেন।’ সায়ংকালীন উপাসনায় চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন। যথারীতি মেলা ও বন্ধ্যুৎসব হয়।

একই দিনে ‘শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিন উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা’র জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উমেশচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে প্রায় চল্লিশ জন ব্রাহ্ম কীর্তন-সহকারে জোড়াসাঁকোয় মহর্ষির কাছে উপস্থিত হন। তাঁদের আশীর্বাদ করে মহর্ষি বলেন: ‘আমি যে, চিরপ্রবাসের পর বাড়ীতে আসিয়াছি, তাহার কারণ কি তাহা জান?—যেখানে আমি জন্মিয়াছি, সেখান হইতে নিত্যধামে চলিয়া যাইব; সেখান হইতে এখন অহরহ মধুরাহ্বান আসিতেছে!’[১০৭]

১১ মাঘ [মঙ্গল 24 Jan] আদি ব্রাহ্মসমাজের একোনসপ্ততিতম সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন, দ্বিজেন্দ্রনাথ উপদেশ ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন। মহর্ষিভবনে সায়ংকালীন উপাসনায় ‘বেদগান সমাপ্ত হইলে...সত্যেন্দ্রনাথ...দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা’ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদিগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ-রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত ইমন কল্যাণ-চৌতাল সুর-তালে বিধৃত ‘তব রাজ-সিংহাসন বিরাজিত বিশ্বমাঝে’ সংগীতটি সায়ংকালীন উপাসনায় গীত হয়।

‘১১ মাঘের উৎসব সমাধানান্তে...শ্রীমন্মহর্ষিদেবের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য’ ১৫ মাঘ [শনি 28 Jan] প্রাতঃকালে নববিধান ও সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মেরা মহিষভবনে উপস্থিত হন। উপাসনা শেষে সকলে মহর্ষির আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ফ্লেচার উইলিয়ম প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের উপর সংগীতের ভার প্রদত্ত হয়েছিল।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টীরা ১ শ্রাবণ [16 Jul] থেকে সত্যপ্রসাদকে সমাজের কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

আর্যসমাজের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলন প্রয়াসের মতো বলেন্দ্রনাথের আর একটি অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা হল শান্তিনিকেতনে একটি ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ স্থাপন। প্রস্তাবটি মহর্ষির আর্থিক আনুকূল্য লাভ করেছিল, একথা আমরা আগেই বলেছি। শান্তিনিকেতন ট্রাস্টডীডেও এইরূপ একটি বিদ্যালয়ের সংস্থান ছিল। বলেন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের জন্য একটি খসড়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন:

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের জন্য বলেন্দ্রনাথ যে নিয়মাবলীর খসড়া করিয়াছিলেন তাহা আমি বহুবৎসর পূর্বে উত্তরায়ণের কাগজপত্রের মধ্যে হইতে সংগ্রহ করি এবং প্রতি করিয়া রাখি। নিম্নে সেই প্রতিটি উদ্ধৃত করিলাম—

১ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করিয়া অধ্যাপন করা হইবে।

২ বিদ্যালয় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে।

৩ আপাততঃ দশজন ছাত্র বিনা ব্যয়ে বিদ্যালয়ে থাকিয়া আহার ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

৪ আহার্যের ব্যয় স্বরূপ মাসিক ১০ দিলে আরও ২০ জন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে লওয়া যাইতে পারিবে।

৫ শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রস্টীগণ ব্যতীত আরও চারজন সভ্যকে লইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-সমিতি গঠিত হইবে। প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে আশ্রমের ট্রস্টীগণের কর্তৃত্ব থাকিবে। তৎপরে কোনো অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট অধ্যক্ষেরা মিলিয়া অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া লইবেন।

৬ অধ্যক্ষ-সমিতি ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিবেন।

৭ শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রস্টীগণের মধ্যে একজন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইবেন। সম্পাদক অধ্যক্ষ-সভার অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন হিসাবপরীক্ষা শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ও পরিবর্তন ছাত্র-নির্বাচন পুস্তক শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

৮ বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠগ্রন্থের সঙ্গে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম এবং চতুর্থ বার্ষিক হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্যাখ্যান অধ্যাপন হইবে।

৯ ৩য় বার্ষিক শ্রেণী হইতে এন্ট্রান্স পর্যন্ত সমুদয় ছাত্র অধ্যাপকগণসহ আশ্রমের প্রতি সায়ং-উপাসনায় যোগ দিবে। এবং নিম্নশ্রেণীর বালকগণকে লইয়া অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট উপাসনা করিবেন।...

১২ সকল ছাত্রকেই বিদ্যালয়-ভবনে বাস করিতে হইবে। এবং শিক্ষকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিরূপিত সময়ে একত্র আহারাদি করিবেন। এবং যথাসম্ভব ছাত্রগণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকেও যোগ দিবেন।

১৩ ছুটির সময় ব্যতীত মাসে ৩ দিন অভিভাবকের সম্মতি থাকিলে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া বাটী যাইতে পারিবে।

১৪ অভিভাবকগণ প্রতি রবিবারে গিয়া বালকদিগকে দেখিয়া আসিতে পারিবেন।[১০৮]

আমরা আগেই দেখেছি, বলেন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পরিকল্পনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, বলেন্দ্রনাথ-রচিত এই খসড়া নিয়মাবলীর কথা তাঁর জানা ছিল। উত্তরায়ণের কাগজপত্রের মধ্যে এই খসড়াটি পাওয়া হয়তো তারই অন্যতর প্রমাণ। অথচ দু'বছর পরে রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি এই নিয়মাবলী অনুসরণ করেন নি। ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা দেওয়া তাঁর আদর্শের পরিপন্থী ছিল।

ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান যোগসূত্র ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। 'Make inroads to the Brahmos'—স্বামীজীর 23 Jan 1899 [সোম ১০ মাঘ]-এর এই নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এর পূর্বেই আমেরিকান কনসাল-পত্নীর সহযোগিতায় কয়েকটি বিশিষ্ট ব্রাহ্মপরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল—ঠাকুরপরিবার তাদের অন্যতম। মিস ম্যাকলাউডকে 'Wednesday' [11 Jan ২৮ পৌষ] তিনি লিখেছেন: 'Sarola came in Yesterday—and was lovely—so gentle and thoughtful and really loving!'[১০৯] পরদিন 'Thursday' তিনি আবার লিখেছেন: 'Sarola Ghosal has just gone-after 2 hours visit.'[১১০] এর পরেই 28 Jan [শনি ১৫ মাঘ] সেই ঐতিহাসিক চা-পান সভা হয়, যাতে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিবেদিতা এই সময়ে বাগবাজারে ১৬ বোসপাড়া লেনে বাস করছেন এবং সেখানেই 13 Nov [রবি ২৮ কার্তিক] কালীপূজার দিন শ্রীরামকৃষ্ণ-পত্নী সারদা দেবী নিবেদিতার বালিকা-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন, নিবেদিতার চিঠি থেকে জানা যায় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়কে প্রতি মাসে ১৫ টাকা সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক ব্রাহ্মদের অজানা ছিল না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরপরিবার ও অন্যান্য ব্রাহ্ম পরিবার প্রথমত তাঁর শিক্ষক-সত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। লিজেল রেমঁ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন:

রবি ঠাকুর তাঁর ছোট মেয়েকে [?] ইংরেজী শেখাবার জন্য নিবেদিতাকে অনুরোধ করেন। নিবেদিতা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, 'সে কি! ঠাকুরবংশের মেয়েকে একটি বিলাতী খুকী বানাবার কাজটা আমাকেই করতে হবে?' রাগে দুই চোখ জ্বলে ওঠে নিবেদিতার। 'ঠাকুরবাড়ীর ছেলে হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আপনি এমনই আবিষ্ট হয়েছেন যে নিজের মেয়েকে ফোটবার আগেই নষ্ট করে ফেলতে চান?'[১১১]

তিনি আরও লিখেছেন: 'সরলা ঘোষাল ঠাকুরবাড়ির এক মহিলা, এর মধ্যে অনেকবার বাগবাজারে এসেছেন। নতুন বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা বাস্তবে কি রূপ ধরছে তাই দেখতে আসতেন। ফিরে গিয়ে শতমুখে

নিবেদিতার প্রশংসা করতেন। শুনে ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা 'ফ্রী এডুকেশন' সম্বন্ধে নিবেদিতার মতামত শোনবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন।'[১১২] নিবেদিতার 15 Feb [বুধ ৪ ফাল্গুন]-এর চিঠিতেও এর উল্লেখ আছে।

এর আগে ৩ ফাল্গুন [মঙ্গল 14 Feb] সকালে তিনি জোড়াসাঁকোয় গিয়ে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন [ক্যাশবহিতেও এই সংবাদটি আছে: 'মিস নবেল আসায় উহার যাবার গাড়িভাড়া ৩ ফাল্গুন ০'] 15 Feb মিস ম্যাকলাউডকে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন:

Yesterday morning I went early to be blessed by the old Devendra Nath Tagore—Miss Padshah and I together. Swami sent word round early that he was particularly pleased—and I told the old man this and said I felt that I was making Swami's pranams as well as my own—he was quite touched. Said he had met Swami once when wandering round in a boat and would greatly like him to come to him once more.[১১৩]

এই কথা স্বামীজীকে বলাতে তিনি নিবেদিতাকে নিয়ে মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান 19 Feb [রবি ৮ ফাল্গুন] তারিখে। 23 Feb [বৃহ ১২ ফাল্গুন] মিসেস ওলি বুলকে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন নিবেদিতা:

We were shown up, one or two of the family accompanying. Swami went forward and said "Pranam", and I *made* it, offering a couple of roses. The old man gave me his little blessing first and then he told Swami to sit down, and for about 10 minutes he went on making a kind of charge to him in Bengali. Then he paused and waited—and Swamiji very humbly asked for his blessing. It was given, and with the same salutation as before we came to downstairs. Then Swami would have gone at once but that was not our plan. And he came into the drawing room where miss Tagore [? Indira] came to see him and the family assembled by degrees rather the men of it. He refused tea, but suggested its being brought to me. Then he accepted a pipe—and all these little things prolonged the talk till 10 O'clock. Mr Mohini came at 9.

Of Course Symbolism, especially Kali-Symbolism was the subject.[১১৪]

স্বভাবতই কালী-প্রতীকের আলোচনা এই সময়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল, কারণ এর কিছুদিন আগেই 13 Feb [সোম ২ ফাল্গুন] অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতা 'Kali-worship' বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধটি পাঠ করে শোনান। এই বক্তৃতা যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। সভাস্থলেই নিবেদিতানুরাগী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করেন ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে সমর্থন করেন। জনৈক কালী-ভক্ত ক্রুদ্ধভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ডাঃ সরকারকে 'an old devil' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এই বক্তৃতাই সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আকৃষ্ট করে নিবেদিতার কাছে নিয়ে আসে। 15 Feb [বুধ ৪ ফাল্গুনী] নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন: 'One lovely gift my lecture has brought me. The heart friendship and enthusiasm of a young Tagore boy full of noble impulses and freshness.'[১১৫] এরপর সুরেন্দ্রনাথ ও সরলা দেবী আরও বহুবার নিবেদিতার কাছে আসেন—নিবেদিতাও বালিগঞ্জে তাঁদের বাড়ি এবং জোড়াসাঁকোয় ইন্দিরা দেবীর আইবুড়ো-ভাতে, বিবাহে ও ফুলশয্যার নিমন্ত্রণে যথাক্রমে 26 Feb [রবি ১৫ ফাল্গুন], 28 Feb [মঙ্গল ১৭ ফাল্গুন] ও 2 Mar [বৃহ ১৯ ফাল্গুন] গিয়েছিলেন, বিবাহের বর্ণনাটি তিনি *Empress* পত্রিকাটির জন্য লিখবেন বলে মিস ম্যাকালাউকে একটি পত্রে জানিয়েছেন। 22 Mar [বুধ ৯ চৈত্র] তিনি সুরেন্দ্র ও সরলাকে দক্ষিণেশ্বরে ও বেলুড় মঠে নিয়ে যান। শিক্ষা ও সেবামূলক ক্ষেত্রে এঁদের সহানুভূতি আকর্ষণ করা ছাড়া দলভারি করাও যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মিস ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর 5 Apr [বুধ ২৩ চৈত্র]-এর চিঠিতে তার হদিশ আছে: "I

see what has happened—the Tagores are won and perhaps the modern Brahmo Samaj are trembling on the verge but I have not yet sent an arrow into the family and church of K. C. Sen. I wonder if that will happen soon.'[১১৬] কিন্তু এই সময়েই স্বামীজীকে লেখা একটি পত্রে সরলা দেবী তাঁকে জানান, নিবেদিতার ভাষায়, 'that she and Suren regarded these things in the right light —but if he would only sweep, away the worship of Ramkrishna all the others would join him too—for they loved their country and would be glad to help us all.'[১১৭] কার পরামর্শে সরলা দেবী এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন জানা নেই, কিন্তু স্বামীজী স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেই 16 Apr [রবি ৪ বৈশাখ ১৩০৬] এক তীক্ষ্ণ বিদ্রুপপূর্ণ উত্তর প্রেরণ করেন। এরপরেও তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সরলা দেবীকে য়ুরোপে নিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু সেই পরিকল্পনা সার্থক হয় নি। অতঃপর স্বামীজীর সঙ্গে সরলা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিন্ন হয়, কিন্তু তাঁর দেহাবসানের পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা নিবেদিতার অন্যতম সহযোগী হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা সম্ভবত আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃপক্ষও ভালো চোখে দেখেন নি, তাই ১ বৈশাখ ১৩০৬ থেকে ক্ষিতীন্দ্রনাথের পরিবর্তে সুরেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আদি সমাজের সম্পাদক-পদে নিয়োগ করা হয়।

নিবেদিতার চেষ্টায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ একটি চা-পানের আসরে একত্রিত হয়েছিলেন। সেই আসরে নিবেদিতা যে মেঘ লক্ষ্য করেছিলেন বিবেকানন্দের দিক থেকে তার গর্জন শোনা গেছে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা তাঁর 12 Mar [রবি ২৯ ফাল্গুন]-এর পত্রে: 'He [vivekananda] said "as long as you go on mixing with that [Tagore) family Margot I must go on sounding this gong. Remember that that family has poured a flood of erotic venom over Bengal." Then he described some of their poetry.'[১১৮] নিবেদিতা গৌরবার্থে বহুবচন ব্যবহার করলেও স্পষ্টতই এই উক্তির লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ এবং সম্ভবত কড়ি ও কোমল-এর কিছু সনেট। বিবেকানন্দের দুর্ভাগ্য, তিনি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিতা ও গদ্যরচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। না—থাকলে এইরূপ উক্তি করতে তিনি অবশ্যই দ্বিধাগ্রস্ত হতেন। এই অপরিচয় থেকেই তিনি পরবর্তীকালে 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে লিখেছেন: "ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মত বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠি হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাসেন হোসেন' করেন"—এখানেও সম্ভবত গৌরবার্থে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও এইটি লেখার সময়ে রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্য-যুগে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য নিবেদিতাকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে দূরে রাখা। এই উদ্দেশ্যে তিনি বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাসাবাড়িটিকে পুরুষবর্জিত 'জেনানা' করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নি। 23 Mar [বৃহ ১০ চৈত্র] নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন: 'I prefer when I do take a holiday to go to the Tagore's. The Poet has asked me—and in that house there will always be common interests in poetry and music and the chance of carrying an idea...'[১১৯] কলকাতায় প্লেগ-সেবায় ব্যস্ত থাকার জন্য এই সংকল্প সিদ্ধ হয় নি। কিন্তু এই ইচ্ছা ত্যাগ করেন নি, 8 May 1899 [সোম ২৬ বৈশাখ ১৩০৬] তিনি মিস ম্যাকলাউডকে

লিখেছেন: 'They say the King goes in a fortnight. If so I shall probably take 10 days up the river with the Robindra Nath Tagores immediately after.'[১২০] কিন্তু পক্ষকালের মধ্যে স্বামীজী বিদেশযাত্রা করেন নি, নিবেদিতারও শিলাইদহে যাওয়া হয় নি। পরে 20 Jun [মঙ্গল ৬ আষাঢ়] তাঁরও বিদেশযাত্রার দিন ধার্য হলে 16 Jun [শুক্র ২ আষাঢ়] দুঃখের সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন:

> You have heard long ago, I fancy, that I must go to England this summer & that therefore I shall not be able to accept that fascinating invitation to your river-house, towards which I had been steadily pressing for so long! I was within a day or two of writing to you that, if you would allow me I would come to Mrs. Tagore & yourself as soon as the Swami had started. Little did I think that before I should have written, my own fate would have been reversed!
>
> I am really not at all happy to be going away from India—even for a little while—and long talks with yourself on all sorts of delightful things are amongst the many disappointments of the change of plan.[১২১]

—যদিও এই প্রসঙ্গ পরবর্তী বৎসরের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু বিষয়টির সম্পূর্ণতা বিধানের জন্য এখানে বিবৃত হল।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:৩

পশ্চিম ভারতে প্লেগের আবির্ভাবে কি-ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, গত বৎসরের বিবরণে তার কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পত্রিকায় বিদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে বালগঙ্গাধর টিলককে গ্রেপ্তার করে দেড় বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্‌ ম্যাক্সমুলারের প্রচেষ্টায়। তিনি মুক্তি লাভ করেন 6 Sep [মঙ্গল ২২ ভাদ্র] তারিখে। রেগুলেশন ২৫-এ নির্বাসিত নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়কে 10 May [মঙ্গল ২৮ বৈশাখ] মুক্তি দেওয়া হয়।

এই পটভূমিকায় বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি কলকাতায় যখন প্লেগ দেখা দিল, তখনকার চাঞ্চল্যের কিছু বিবরণ আমরা আগেই দিয়েছি। প্লেগের টীকা দেওয়া নিয়ে কলকাতায় দাঙ্গা বাধে 4 May [বুধ ২২ বৈশাখ] —এই দাঙ্গার একটি প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ পাওয়া যায় নিবেদিতার রচনায়।[১২২] কিন্তু প্লেগের আক্রমণ এই বৎসর ভয়াবহ রূপ ধারণ করে নি। বাংলা গবর্মেন্টও প্লেগ-দমনে অত্যন্ত সংযত পদ্ধতি গ্রহণ করে। এর ফলে লেফটেনান্ট গবর্নর স্যার জন উডবার্নের প্রতি বাঙালির কৃতজ্ঞতা ভাষা পেয়েছে ঢাকা প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ-অনূদিত প্রস্তাবে ও তাঁর অনেকগুলি রাজনৈতিক রচনায়।

ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 30 May- 1 Jul [১৭-১৯ জ্যৈষ্ঠ] তিন দিনে। জীবনকথা অংশে এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে আন্দোলনের কথাও পূর্বে বলা হয়েছে। দেশীয় কাউন্সিলরদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য ইংরেজ কাউন্সিলরদের সংখ্যা বৃদ্ধি এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি ছিলেন এই বিলের স্রষ্টা। কিন্তু অসুস্থতার জন্য অবসর নিতে বাধ্য হওয়ায় তিনি বিলটিকে আইনে পরিণত করতে পারেন নি। প্রবল আন্দোলনকে উপেক্ষা করে এই অপ্রিয় কাজ করার দায়িত্ব নিতে হয়

পরবর্তী লেফটেনান্ট গবর্নর স্যার জন উডবার্নকে। বিলটি আইনে পরিণত হলে মিউনিসিপ্যালিটির আঠাশ জন কাউন্সিলর একযোগে পদত্যাগ করেন। এই বিষয়ে লিখিত অমৃতলাল বসুর প্রহসন 'সাবাস আটাশ' স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় 23 Sep 1899 [শনি ৭ আশ্বিন ১৩০৬] তারিখে।

এই বৎসর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্দশ অধিবেশন হয় আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে মাদ্রাজে 29-31 Dec 1898 [১৫-১৭ পৌষ] তারিখে।

ইংলণ্ডের প্রাক্তন উদারপন্থী প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের মৃত্যু হয় 19 May 1898 [বৃহ ৬ জ্যৈষ্ঠ] সকালে। ভারতীয়রা এই মৃত্যুকে স্বজনবিয়োগ বলে গণ্য করে। কংগ্রেসের অধিবেশনেও দীর্ঘ শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতের নূতন ভাইসরয় হিসেবে ব্যারন [পরে লর্ড] কার্জন কলকাতায় আসেন 3 Jan 1899[মঙ্গল ২০ পৌষ] তারিখে। অতীব রক্ষণশীল দাম্ভিক দুর্মুখ দুরাচারী এই ব্যক্তিটির শাসনকাল [1899-1905] ভারতের, তথা বাংলার, একটি দুঃস্বপ্নের সময়। যথার্থতই 1905-এ বেনারসে অনুষ্ঠিত একবিংশ কংগ্রেসে সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে কার্জনকে ঔরংজীবের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ড রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: 'লর্ড কার্জন ভারতীয় সেক্রেটারী অব ষ্টেটকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভারত-শাসন শেষ হইবার পূর্বেই তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সমাধি রচনা করিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বঙ্গভঙ্গ দ্বারা ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমাধিমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।'[১২৩]

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

ভারত সংগীত সমাজের উদ্বোধন হয়েছিল ১৫ মাঘ ১৩০৪ [27 Jan 1898] তারিখে। ঐ বৎসরে অনুষ্ঠিত কিছু কিছু অনুষ্ঠানের বিবরণ আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দিয়েছি। বর্তমান বৎসরের প্রথম অনুষ্ঠানটি হল ৫ বৈশাখ [রবি 17 Apr]—এইদিন প্রসিদ্ধ কৌতুকাভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি ও অক্ষয়কুমার মজুমদার যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'নূতন অবতার'ও 'বিনি পয়সার ভোজ' অভিনয় করেন। এই অনুষ্ঠানটির বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

৯ জ্যৈষ্ঠ [রবি 22 May] সংগীত সমাজের সাধারণ অধিবেশনে [General meeting] নিয়মাবলী গৃহীত ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন করা হয়। অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক প্রদ্যোকুমার ঠাকুর পারিবারিক জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্বের জন্য পদত্যাগ করলে তাঁর জায়গায় হেমচন্দ্র মল্লিক নির্বাচিত হন, অপর সম্পাদক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন: 'হেমচন্দ্র "সমাজে" আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে নানা উন্নতিকর পরিবর্তন প্রবর্তিত করিতে লাগিলেন—সে সকলের ব্যয়বাহুল্যের প্রতি দৃষ্টি দিলেন না।'[১২৪] হেমচন্দ্রেরই উৎসাহে সংগীতসমাজে জাঁকজমকপূর্ণ স্টেজ, মূল্যবান সাজসজ্জা প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছিল।

উপকরণের অভাবে সংগীত সমাজের প্রতিটি অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রস্তুত করা কঠিন। অমৃতবাজার পত্রিকা অবলম্বনে আমরা মাত্র কয়েকটি অনুষ্ঠানের তালিকা করে দিচ্ছি: ২৩ জ্যৈষ্ঠ [রবি 5 Jun] কথকতা, ১৫ শ্রাবণ [শনি 30 Jul] নাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক 'পূর্ণচন্দ্র' অভিনয়, ১৬ শ্রাবণ [রবি 31 Jul] লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুজি কর্তৃক ধ্রুপদ ও মৈজুদ্দিনের টপ্পা পরিবেশন, ২২ শ্রাবণ [শনি 6 Aug] 'অভিমন্যু-বধ' যাত্রাভিনয়, ২৩ শ্রাবণ [রবি 7

Aug] মাদ্রাজ আক্রোবেটিক ড্যান্সার-দলের অনুষ্ঠান, ২৯ শ্রাবণ [শনি 13 Aug] নাট্যাভিনয় [?], ৩০ শ্রাবণ [রবি 14 Aug] গ্রামোফোন ও যন্ত্রসংগীত, ১৩ ভাদ্র [রবি 28 Aug] সংগীত ও যাদুবিদ্যা-প্রদর্শন, ১৬ আশ্বিন [শনি 1 Oct] বোসপাড়া আদি বান্ধব নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক 'আলিবাবা' নাট্যাভিনয়, ৩১ আশ্বিন [রবি 16 Oct] সংগীত, ৫ অগ্র° [রবি 27 Nov] ও ১২ অগ্র° [রবি 27 Nov] সংগীত। এছাড়াও আরও অনুষ্ঠান হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা তার বিবরণ সংগ্রহ করতে পারি নি।

এর পরেই ভারত সংগীত সমিতি নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল। 20 Jan 1899 [শুক্র ৭ মাঘ] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এমারেল্ড্ থিয়েটারে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ভারত সংগীত সমিতির উদ্বোধন হয়। ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ছিল সমিতির ঠিকানা। এই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পটভূমিকা বিবৃত করেছেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। শ্রীগোপাল বসুমল্লিকের জামাতা সওদাগরী অফিসের বড়ো কর্মচারী অমূল্যপ্রসাদ ঘোষ সংগীত সমাজের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। হেমচন্দ্র মল্লিক সম্পাদক হবার পর নানা কারণেই 'অমূল্য বাবুর সহিত হেমচন্দ্রের মতান্তর হইতে লাগিল। অমূল্য বাবু পদত্যাগ করিলেন। হেমচন্দ্রের ব্যবস্থায় "সঙ্গীত সমাজ" কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে (১৩ নং বাড়ী) নীত হইল।...ওদিকে অমূল্য বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে "সঙ্গীত সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করিয়া—অর্থাৎ "ভাঙ্গা দল" গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা অল্প দিনেই ব্যর্থ হইয়া গেল।'[১২৫]

কিন্তু এ কিছুদিন পরের কথা। এর আগে সংগীত সমাজ এক দুভাগ্যজনক মামলায় জড়িয়ে পড়ে। 30 Mar 1899 [বৃহ ১৭ চৈত্র] ভারত সংগীত সমাজ নদার্ন ডিভিশন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নবাব বাহাদুর সৈয়দ আমীর হোসেনের কাছে কালীপ্রসন্ন সিংহের পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহ ['মাখম বাবু'] ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে সমাজের গৃহে প্রবেশ ও আসবাবপত্র অপহরণের অভিযোগ করে। এর পূর্বে লীজ বৃদ্ধি করতে রাজি হয়েও দলিল স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করার জন্য সংগীতসমাজ 16 Mar [বৃহ ৩ চৈত্র] বিজয়চন্দ্রের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা করে। দু'টি মামলাতেই সংগীতসমাজ পরাজিত হয়ে ১৩ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে উঠে যেতে বাধ্য হয়। পরে ভারত সংগীত সমাজ নিকটবর্তী ২০৯ নং বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন: "বাঙ্গালীর সমবেত কার্যে দেবতার অভিশাপ আছে, সেই অভিশাপের ফলে অনতিবিলম্বেই মতদ্বৈধ ঘটিল এবং সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল।•••একদল অন্যদলকে 'সঙ্গীতসমাজ' হইতে নির্বাসিত করিতে চায়, প্রতিপক্ষও 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমি' বলিয়া কৃতসংকল্প। ফলে জোর-দখল এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা।...যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, এই গৃহবিবাদে প্রায় সমস্তই ব্যয়িত হইল। প্রথম দল মোকদ্দমায় হারিয়া গৃহচ্যুত হইল।"[১২৬]

রবীন্দ্রনাথ সংগীত সমাজ প্রতিষ্ঠার পর মহা উৎসাহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, কিন্তু শিলাইদহে চলে যাওয়ার জন্য তাঁর উপস্থিতি কমে যায়। তাহলেও তিনি নিয়মিত চাঁদা দিয়ে গেছেন এবং সমস্ত খবরাখবর রেখেছেন। গগনেন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন: 'আজকাল দেখ্‌চি বিরোধের আর শেষ নেই। সঙ্গীতসভাতেও খুব ঝড় চল্‌চে। তোমাদের পরে পরে উত্তেজনার আর শেষ নেই। নানা প্রকার মীটিং, তকবিতর্ক, বোঝাপড়া, রাগারাগি লেগেই আছে। প্লেগ ত গেল কিন্তু এগুলিও কম নয়।'[১২৭]

উল্লেখপঞ্জী

১ তত্ত্ব°, জ্যৈষ্ঠ। ২৮-২৯
২ পিতৃস্মৃতি। ৬০
৩ 'কবিকেশরী', জন্মভূমি, চৈত্র ১৩০৭। ২৭৯
৪ ঐ। ২৮০
৫ ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮। ৩৩৪-৩৫
৬ 'স্মৃতি', ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩। ১৯
৭ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ৯, পত্র ১
৮ দ্র সুনীল দাস: ভারতী: ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী [১৩৯১]। ৩২
৯ ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য [১৩৭৬]। ১৭৭
১০ চিঠিপত্র ১০ [১৩৭৪]। ১, পত্র ১
১১ শব্দতত্ত্ব ১২। ৩৬৭
১২ *The Origin and Development of the Bengali Language,* Vol. I (1926), p. xvi.
১৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ৯-১০, পত্র ২
১৪ ঐ। ১০, পত্র ৩
১৫ ঐ। ৩৩, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'পত্রপরিচিতি'তে উদ্ধৃত।
১৬ সা. প. প., চতুর্থ বার্ষিক বিবরণী। ২৭
১৭ দ্র *The Amrita Bazar Patrika,* 24 May 1898.
১৮ দ্র ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ [১৩৭৯]। ১০০-০১
১৯ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৭১
২০ দ্র ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ৯৫-৯৬
২১ কালান্তর ২৪। ৪৩৯
২২ *The Amrita Bazar Patrika,* 2 June 1898.
২৩ *Visva-Bharati News,* Dec 1968, pp. 155-56.
২৪ দ্র চিঠিপত্র ১। ৩৬-৩৮, পত্র ১৬
২৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ১০, পত্র ৪
২৬ সাহিত্য, আষাঢ়। ১৯৬
২৭ ঐ। ১৯৮
২৮ জন্মভূমি, আষাঢ় ১৩০৮। ৩৭৩-৭৫

২৯ পিতৃস্মৃতি। ২৭

৩০ ঐ। ২৮

৩১ ঐ। ৩১

৩২ জন্মভূমি, আষাঢ় ১৩০৮। ৩৭৫

৩৩ দ্র আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭। ৩২৯

৩৪ পিতৃস্মৃতি। ৩১

৩৫ ঐ। ৩০

৩৬ ঐ। ৩০

৩৭ ঐ। ৩১-৩২

৩৮ ঐ। ৩৪

৩৯ দ্র জনৈক আসাম বাসী, "আসামী ভাষা': পুণ্য, আশ্বিন-কার্তিক। ২২-৩২

৪০ আমার জীবনস্মৃতি [আরতি ঠাকুর-অনুদিত, 1975]। ১২৯-৩০

৪১ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তজাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ ১ [১৩৮৯]। ১১৮

৪২ ভারতী, শ্রাবণ। ৩৭৯-৮০

৪৩ বি. ভা, প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩। ২৬৩-৬৪

৪৪ ভারতী, শ্রাবণ। ৩৭৩-৭৫

৪৫ ঐ। ৩৭৭-৭৮

৪৬ সাহিত্য, আশ্বিন। ৩৯১-৯২

৪৭ ঐ, কার্তিক। ৪৫৫-৫৬

৪৮ প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩। ২৮

৪৯ ভারতী, শ্রাবণ। ৩৮০-৮১

৫০ ঐ। ৩৮১

৫১ দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৬৪, পত্র। ৪০

৫২ জন্মভূমি, আষাঢ় ১৩০৮। ৩৭৫

৫৩ কল্পনা ৭। ১৭২

৫৪ সুভাষ চৌধুরী-সম্পাদিত ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী [1985]। ৩৩, পত্র ২২

৫৫ ঐ। ৭৭, পত্র ৪৩

৫৬ ঐ। ৮৩, পত্র ৪৭

৫৭ সাহিত্য, অগ্র°। ৫২৪

৫৮ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৫

৫৯ ঐ। ৬

৬০ *Visva-Bharati News,* Dec 1968, p. 159.

৬১ দ্র চিঠিপত্র ৬। ৬, পত্র ৩

৬২ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩। ১৩৩-৩৪

৬৩ দ্র *The Amrita Bazar Patrika,* 13 Jan 1899.

৬৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৭। ১৮

৬৫ রবীন্দ্রসঙ্গ-প্রসঙ্গ। ১৫

৬৬ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৮২

৬৭ দ্র *The Amrita Bazar Patrika,* 25 July 1898.

৬৮ ভারতী, অগ্র°। ৭৬৪

৬৯ প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩। ২৮

৭০ ঐ। ২৮

৭১ জন্মভূমি, পৌষ ১৩০৭। ১৮৬

৭২ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪। ৩৩, পত্র ৪

৭৩ ইতিহাস। ১৪২-৪৩

৭৪ ঐতিহাসিক চিত্র, প্রথম বর্ষ প্রথম খণ্ড। ১৪৬

৭৫ প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩। ২৮

৭৬ ঐ। ২৮

৭৭ সাহিত্য, ফাল্গুন। ৭১৫

৭৮ অজিতকুমার চক্রবর্তী, ব্রহ্মবিদ্যালয় (১৩৫৮]। ৬৬

৭৯ স্মৃতির খেয়া [1978]। ১৫৯-৬০

৮০ পিতৃস্মৃতি। ১৯

৮১ তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৮

৮২ ঐ। ১৯৮-৯৯

৮৩ নারায়ণী দেবী-অনূদিত, নিবেদিতা [১৩৬২]। ২৫৮

৮৪ *Letters of Sister Nivedita,* Vol. [1982], p. 31

৮৫ ঐ, p. 34

৮৬ ঐ, p. 43

৮৭ ঐ, p. 45

৮৮ ঐ, p. 48

৮৯ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৪। ২০১, টীকা ২৮

৯০ প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩। ২৮

৯১ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৭। ১৮

৯২ প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩। ২৮

৯৩ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪৫৭

৯৪ চিঠিপত্র ৬। ৫-৬, পত্র ৩

৯৫ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭। ৩২৯-৩০

৯৬ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৭। ১৮

৯৭ প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩। ২৯

৯৮ 'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ', দেশীয় রাজ্য। ২১৩

৯৯ 'তথ্যক্রমপঞ্জী', রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ১৬৬-৬৭

১০০ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

১০১ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৮৭

১০২ দ্র সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের হিসাব-খাতা

১০৩ তত্ত্ব°, জ্যৈষ্ঠ। ৩১

১০৪ ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী। ১২০

১০৫ দেবদাস জোয়ারদার-সম্পাদিত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ [1972]। ২৯-৩০

১০৬ তত্ত্ব°, মাঘ। ১৫৬

১০৭ ঐ। ১৫১

১০৮ রবীন্দ্রজীবনী ২ [১৩৮৩]। ৩৭-৩৮, পাদটীকা ১

১০৯ *Letters of Sister Nivedita,* vol. I, p. 41

১১০ ঐ, p. 42

১১১ নিবেদিতা। ২৬৪

১১২ ঐ। ২৬১

১১৩ *Letters of Sister Nivedita,* vol. I, p. 53

১১৪ ঐ, p. 64

১১৫ ঐ, p. 52

১১৬ *Letters of Sister Nivedita, Vol. I, P.103*

১১৭ ঐ, p. 108

১১৮ ঐ, p. 82

১১৯ ঐ, p. 92

১২০ ঐ, p. 138

১২১ ঐ, pp. 165-66

১২২ দ্র ঐ, pp. 28-30

১২৩ বাংলা দেশের ইতিহাস ৪ [১৩৮২]। ১৯

১২৪ 'সঙ্গীত সমাজ', বসুমতী, বৈশাখ ১৩৬০। ১৩

১২৫ ঐ। ১৩

১২৬ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। ৮৬

১২৭ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩। ১৩৪

---

* জন্মভূমি, অগ্র° ১৩০৭। ১৩৬; বঙ্গবাসী-কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকার ১৩০৭-০৮ বঙ্গাব্দের অনেকগুলি সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু 'কবিকেশরী/শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের এক পরিচ্ছেদ। /(১৩০৫ সাল।)' নামক একটি ধারাবাহিক রচনায় রবীন্দ্রজীবনের এই বিশেষ বৎসরের অনেক ঘটনা বিবৃত করেন। প্রয়োজনমতো আমরা এই রচনাটিতে প্রদত্ত বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করব।

* গোপালচন্দ্র রায় রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের যুগ্ম-রচনা বলে মনে করেছেন দ্র ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ। ১৩; রবীন্দ্রজীবনী-কার এটিকে রবীন্দ্রনাথের একক রচনা ধরে নিয়েই আলোচনা করেছেন দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১।৪৭১-৭২। কিন্তু আমাদের ধারণা, এটি অক্ষয়কুমারের একক রচনা। আষাঢ়-সংখ্যার 'প্রসঙ্গ কথা'য় দুটি 'প্রসঙ্গ' আলোচিত হয়েছে—প্রথমটি ঢাকার সম্মেলন বিষয়ে, দ্বিতীয়টি মহারাষ্ট্রীয় ছাত্র ম্হাত্রে-রচিত 'মন্দিরপথবর্ত্তিনী' নামক ভাস্কর্য সম্পর্কে। প্রথমটি অক্ষয়কুমারের ও দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে বার্ষিক সূচীতে এই সংখ্যার 'প্রসঙ্গ কথা'র লেখক হিসেবে 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও সম্পাদক' উল্লিখিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'মন্দিরাভিমুখে'-শীর্ষক একই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি সচিত্র-রচনা পৌষ ১৩০৫-সংখ্যা প্রদীপ-এ মুদ্রিত হয়েছিল।

* ম্হাত্রে [Mahatre]-র পরিচয় দিয়ে কমল সরকার লিখেছেন: '১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ পুনায় জন্ম। পিতা কাশীনাথ কেশবজি মিলিটারি অ্যাকাউন্টস দপ্তরের চাকুরে ছিলেন। পুনায় বাল্যশিক্ষা সমাপ্তির পর জন গ্রিফিৎসের অধ্যক্ষতাকালে বোম্বাইয়ের স্যার জে জে স্কুল অব আর্টে ভর্তি হন (১৮৯১)। সাফল্যের সঙ্গে অনুশীলন শেষে 'টু দি টেম্পল' (মন্দিরাভিমুখে: ৫ ফিট) নামের প্ল্যাস্টারের এক নারীমূর্তি রচনার জন্যে বম্বে আর্ট সোসাইটি প্রদত্ত পদক লাভ করেন (১৮৯৫)। পরের বছর স্যার জে জে স্কুল অব আর্টে ভাস্কর্য ও চিত্রকলার জন্যে যথাক্রমে ভিক্টোরিয়া এবং মেয়ো মেডেলে পুরস্কৃত হন। প্রকৃতপক্ষে এ মূর্তির মাধ্যমেই তিনি ভাস্কর্যকলার জগতে পরিচিত হন এবং মূর্তিটি প্যারিস ইন্টারন্যাশনাল একজিবিশানেও প্রদর্শিত হয় (১৯০০)। রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লিতে আয়োজিত 'ইণ্ডিয়ান আর্ট অ্যাট দিল্লি' প্রদর্শনীতেও এ মূর্তির জন্যে তাঁর স্বর্ণপদক প্রাপ্তি (১৯০৩)।'—ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী [১৩৯১]। ১৫৯-৬০

* এঁর নাম রোহিণীকান্ত নাগ [1868-95]। কমল সরকার এঁর সম্পর্কে লিখেছেন: 'ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগণার বারদী গ্রামের এক ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান...উইলিয়ম হেনরি জবিন্স-এর অধ্যক্ষতাকালে কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে তাঁর চারুকলা অনুশীলন। অতঃপর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রায় বাইশ বছর বয়সে 'রুব্যাটিনো' জাহাজযোগে ইটালি যাত্রা এবং ইটালির প্রধানমন্ত্রী ফ্রানসিসকো ক্রিসপির (১৮১৯-১৯০১) সহায়তায় রোমের রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। পরবর্তী সময়ে ফাইন আর্টের বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন (১৮৯১)।...প্রায় পাঁচ বছর ইটালি প্রবাসের পর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত অবস্থায় 'পেশোয়ার' জাহাজযোগে তাঁর কলকাতা প্রত্যাবর্তন...১৩ মে সাতাশ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাসত্যাগ।...

'রোহিণীকান্তের পরলোকগমনের দুই বছর পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজ ব্যয়ে ইটালি থেকে পরলোকগত শিল্পীর চিত্র ও ভাস্কর্য ভারতে নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে এক সংবাদও পাওয়া যায়। কলকাতার 'দি ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' সংবাদপত্রে এ বিষয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তা উদ্ধৃত করা হল (১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭):

"Babu Rohini Kanta Nag, who had attained some repute as a sculptor died...leaving behind him some good specimens of his work. Babu Rabindranath Tagore, of Calcutta, is said to be arranging to procure them at his own cost."

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর কয়েকটি চিত্র রক্ষিত ছিল।'—ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। ১৯১-৯২

* রবীন্দ্রজীবনী-কার কেন যে রচনাটি 'বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীতে নাই' বলে মন্তব্য করেছেন [দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৭৪, পাদটীকা ১], বোঝা শক্ত।

* এই সময়ে বহিরাগত যাত্রীদের জন্য প্লেগ-নির্ণায়ক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল খানা জংশন, কাটিহার ও দামুকদিয়া-য়; পরে চৌসা, চক্রধরপুর, খুরদা রোড প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

* এ-বিষয়ে উৎসাহী পাঠক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ইতিহাস তপস্বী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়'-শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন দ্র দেশ, সাহিত্য ১৩৭৩। ১৫৭-৬৮; আমরা বর্তমান আলোচনায় প্রবন্ধটি দ্বারা বহুল পরিমাণে উপকৃত হয়েছি।

* পত্রটির তারিখ '৩রা মাঘ' সম্ভবত ভুল; কারণ এই পত্রেই আছে: 'পৌষ-মাঘের ভারতী হপ্তাখানেক হইল বাহির হইয়াছে', বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 4 Feb 1899 [২২ মাঘ]।

*১ 30 Jan 1899 মঙ্গলবার ছিল না, ছিল সোমবার। নিবেদিতার পত্রে এইরকম বার ও তারিখের গোলমাল প্রায়ই দেখা যায়। এক্ষেত্রে সম্ভবত 'বার'ই নির্ভরযোগ্য, সেইজন্য আমরা বাংলা তারিখটি 'বার'-অনুসারে নির্ধারণ করেছি। সেক্ষেত্রে ইংরেজি তারিখটি হবে 31 Jan 1899.

*২ শঙ্করীপ্রসাদ বসু এই চিঠির তারিখ অনুমান করেছেন 1 Jan 1899 দ্র বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৪ [১৩৮৭]। ১৯৭; তাঁর সম্পাদিত *Letters of Sister Nivedita,* Vol. I [1982], P. 31-এও এই তারিখ অনুমিত হয়েছে। কিন্তু স্বামীজীর ইংরেজি জীবনী থেকে জানা যায় যে, তিনি 19 Dec 1898 বৈদ্যনাথ [দেওঘর] যাত্রা করে সেখান থেকে ফিরে আসেন 22 Jan 1899 রাত্রে [দ্র pp. 408, 412]। সেখানে নিবেদিতার এই চিঠির তারিখ দেওয়া হয়েছে 23 Jan [সোম ১০ মাঘ]—আমাদের এই তারিখটিই ঠিক বলে মনে হয়; কেন না এই চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন: 'As I sit writing this you are probably in or near Genoa'—মিস ম্যাকলাউডেরা বোম্বাই ত্যাগ করেন 5 Jan তারিখে। তাছাড়া 1 Jan 1899 ছিল রবিবার।

* প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩। ২৮; পত্রের জীর্ণতার জন্য তৃতীয় বন্ধনীর মধ্য-স্থিত শব্দগুলি সম্পাদক সুমিত মজুমদারের অনুমিত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

১৩০৬ [1899-1900] ১৮২১ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের ঊনচত্বারিংশ বৎসর

এই বছর রবীন্দ্রনাথ নববর্ষের দিনটি [বৃহ 13 Apr] কাটান শিলাইদহে। ভারতী-র সম্পাদনা-ভার ত্যাগ করেছেন—তাঁর সম্পাদিত ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৬ বৈশাখ [মঙ্গল 18 Apr]—সুতরাং মন বেশ খুশি থাকার কথা। ৭ জ্যৈষ্ঠ [20 May] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁকে লিখেছেন: 'ভারতী ছাড়িয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। আশা করি আলস্য চর্চায় বেশ আরামে আছেন।'[১] এমন কথা হয়তো রবীন্দ্রনাথই কোনো পত্রে তাঁকে লিখে পাঠিয়েছিলেন—'বালক' ও 'সাধনা' পত্রিকার দায়িত্ব ত্যাগ করেও অনুরূপ মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গত দু'বছর ধরে নানা সূত্রে গড়ে উঠছিল তার কিছু কিছু বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। জাতীয় আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যে-কোনো বাঙালির কৃতিত্ব তাঁর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর যে বিজ্ঞানচর্চার শক্তিতে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সারা পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছে, সেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই জগদীশচন্দ্রের অভাবনীয় কৃতিত্ব 'বিদেশের মহোজ্জ্বল-মহিমা-মণ্ডিত/পণ্ডিতসভায়/বহু সাধুবাদধ্বনি' যে তাঁর অন্তরেও ধ্বনিত হয়ে উঠবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই—তাই জগদীশচন্দ্রের সার্থক বিদেশ ভ্রমণ অন্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরে ৪ শ্রাবণ ১৩০৪ [19 Jul 1897] তারিখেই তিনি 'জগৎসভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত/কবিকণ্ঠে' দেশজননীর আশীর্বাদ 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি' প্রেরণ করেছিলেন।[২] ভারতীর বিভিন্ন 'প্রসঙ্গ কথা'-য় জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটুটে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার আসরে তাঁর উপস্থিতির উল্লেখও আমরা দেখেছি।

সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, অন্য অনেকের মতো জগদীশচন্দ্রকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিলাইদহের পল্লীভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং জগদীশচন্দ্র চৈত্রের শেষে সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। লরেন্স শিলাইদহে রেশমগুটির চাষের বিস্তারিত আয়োজন করেছিলেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। জগদীশচন্দ্র শিলাইদহ থেকে ফেরার সময় বৈজ্ঞানিক কৌতূহল-বশত কয়েকটি গুটি কলকাতায় নিয়ে আসেন।১ বৈশাখ তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন:

> প্রজাপতিগুলি এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। গত শনিবার হইতে প্রত্যহ গুটিগুলিকে নাড়িয়া দেখিতেছি, ভিতরে যেন পূর্ণতর হইয়া আসিতেছে। আশঙ্কা হয় এত ঘন ঘন কম্পনে কীটের প্রাণবায়ু হয়ত বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও একরূপ নিশ্চিন্ত হইতাম, কারণ যে এর

বৃক্ষের কথা বলিয়াছিলাম তাহার পাতাগুলি একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই দুর্ভিক্ষের সময় সহসা প্রজাবৃদ্ধি মনে করিয়া ভীত আছি। বিশেষতঃ লরেন্স সাহেবের নিকট আমি কি করিয়া মুখ দেখাইব জানি না।*

রেশমগুটির পরিণতির কথা লিখেছেন তাঁর 25 Apr [মঙ্গল ১৩ বৈশাখ]-এর পত্রে।[৩] এই দু'টি পত্রেই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য একজন শিক্ষক ও একজন চিকিৎসক খোঁজার কথা আছে। চৈত্রের মাঝামাঝি রাধাকিশোর মাণিক্যের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা গিয়েছিলেন। সম্ভবত মহারাজই রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন উপযুক্ত শিক্ষক ও চিকিৎসক সংগ্রহ করে দিতে। রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করেন জগদীশচন্দ্রকে [তাঁর যে দু'টি পত্রের উল্লেখ জগদীশচন্দ্র করেছেন সেগুলি পাওয়া যায়নি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের লেখা অনেকগুলি পত্র রক্ষিত হয়নি]। পরে তাঁর সূত্রেই রাধাকিশোর ও জগদীশচন্দ্রের মধ্যে একটি হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে, জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনায় ত্রিপুরার মহারাজা অকৃপণ অর্থসাহায্য করেন।

জগদীশচন্দ্র 25 Apr-এর পত্রের শেষে রবীন্দ্রনাথকে একটি দায়িত্ব অর্পণ করেন:

Mrs. কথাটা বাঙ্গলাতে অতি বীভৎসাজনক। আপনি একটি নূতন কথা বাহির করিবেন। আপাতত 'গৃহলক্ষ্মী' বলিতে পারেন, কারণ আমার সহধর্মিণী একান্ত সে কালের। আধুনিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিমণ্ডিতা হইলে 'গৃহসরস্বতী' লিখিতে বলিতাম।[৪]

এখানে জগদীশচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে একটু বিনয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর স্ত্রী অবলা বসু [1864-1951] প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বাংলা গবর্মেন্টের বৃত্তি নিয়ে কিছুদিন মাদ্রাজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। রবীন্দ্রনাথ 'Mrs.' কথাটির পরিভাষা করেছিলেন 'আর্যা'—তাঁর কয়েকটি চিঠিতে শব্দটির প্রয়োগ আছে—কিন্তু বর্তমান পত্রের উত্তরটি পাওয়া যায়নি।

কিন্তু এই পত্রটি যখন লেখা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় অবস্থান করছেন।৩ বৈশাখ 'শিলাইদহায় রবীন্দ্র বাবুর নিকট পত্র পাঠান' হয়, ৬ বৈশাখ সরকারী ক্যাশ থেকে আর একটি পত্র 'রেজেষ্টারি' করে পাঠানো হয় তাঁকে। কবে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন জানা নেই, কিন্তু ১২ বৈশাখ [সোম 24 Apr] তিনি যান বালিগঞ্জে ও ১৪ বৈশাখ বিডন স্ট্রীটে—দু'টি খরচই তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহির। এর পরেই তিনি শিলাইদহে ফিরে যান, ১৭ ও ১৯ বৈশাখ তাঁর কাছে পত্র পাঠানো হয়েছে।

২৫ বৈশাখ [রবি 7 May] তিনি ঊনচল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শুভকামনা পাঠান একটি কবিতা-পত্রে:

বঙ্গদেশের কাব্য আসর
  আলো করিয়াছ রবি ভাই।
আজিকে তোমার জনম দিবসে
  কি আশীষ করি ভাবি তাই।
বন্ধুর মুখে দিয়ে সন্দেশ
  শত্তুর মুখে দিয়ে ছাই,
সুখে সম্পদে উপভোগ কর
  শত বৎসর প্রমাই
রবি রচি দাও কবিতা কুসুম
  মোরা বসে বসে মধু খাই
কি আর লিখিব—দ্রুম্ তা না না না
  মিল আর নাহি খুঁজে পাই

রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ব কবিতার কী উত্তর দিয়েছিলেন জানা নেই, কিন্তু এটিকে তিনি যে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন তাতেই তাঁর মনের প্রসন্নতা ধরা পড়ে।

এই দিন তিনি লেখেন তাঁর বহু-আলোচিত কবিতা 'অশেষ' [দ্র ভারতী, জ্যৈষ্ঠ। ৯৭-১০০; কল্পনা ৭। ১৭৮-৮২। পত্রিকায় বা গ্রন্থে কবিতাটির রচনা—তারিখ নেই-তারিখটি পাওয়া গেছে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত Ms. File 10-এর অন্তর্ভুক্ত কবিতাটির পাণ্ডুলিপি তথা অনুলিপিতে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনা-ভার ত্যাগ করার পর ভারতী-র দায়িত্ব নেন সরলা দেবী। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী তাঁর সম্পাদনায় ত্রয়োবিংশ খণ্ডের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় 4 May 1899 [বৃহ ২২ বৈশাখ]। সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতী-তে রবীন্দ্র-রচনার সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কমে গেছে। বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী-তে তাঁর একটিমাত্র রচনা মুদ্রিত হয়:
৫৬-৭৩ 'উপসর্গ সমালোচনা' দ্র শব্দতত্ত্ব-পরিশিষ্ট ১২। ৫৫১-৬২

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৪ অগ্র° ১৩০৪ [রবি 28 Nov 1897] চতুর্থ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে ও ২০ আষাঢ় ১৩০৫[রবি 3 Jul 1898] পঞ্চম বর্ষের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে 'উপসর্গের অর্থ-বিচার' নামে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং প্রবন্ধ-দু'টি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার যথাক্রমে চতুর্থ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা [মাঘ-চৈত্র ১৩০৪। ২৪১-৭৬] ও পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় [শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩০৫। ১১২-৩৭] মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধদ্বয়ের সমালোচনা করে ২৭ ভাদ্র ১৩০৫ [রবি 11 Sep 1898] রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে 'উপসর্গ বিচারের সমালোচনা' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ও প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চম ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় [মাঘ-চৈত্র ১৩০৫। ২৩২-৪৫] 'উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা' নামে মুদ্রিত হয়। এই শেষোক্ত প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার লক্ষ্য। বাংলা ভাষাতত্ত্ব-চর্চার ইতিহাসে প্রবন্ধটির গুরুত্ব অসামান্য—ইন্দো-ইরানীয় বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে তুলনা করে সংস্কৃত উপসর্গগুলির মূল অর্থ ও অর্থান্তর রবীন্দ্রনাথ যেভাবে আলোচনা করেছেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সেই প্রাথমিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিস্ময়কর।

১৩০৬ বঙ্গাব্দ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ও নূতন গ্রন্থের প্রকাশের দিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। এই বৎসরের প্রথমার্ধে তাঁর তিনটি নাটক পুনর্মুদ্রিত হয়—'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', এবং 'গোড়ায় গলদ'; পুনর্মুদ্রিত হয় 'রাজর্ষি ও 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস-দু'টি ও বৎসরের শেষার্ধে প্রকাশিত হয় তিনটি কাব্য— 'কণিকা', 'কথা' ও 'কাহিনী এবং একটি পুস্তিকা 'ব্রহ্মৌপনিষদ'।

প্রথম দুটি নাটক পুনর্মুদ্রণের আয়োজনের হিসাব পাওয়া যায় ২৩ বৈশাখ [শুক্র 5 May] তারিখে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ক্যাশবহিতে: 'ব° স্বদেশী ভাণ্ডার দং রাজারাণী ও বিসজ্জন ছাপানর কাগজ ২২ পৌন [পাউণ্ড] ডিমাই ১৫ রিম…৬০৷৬'; মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের খরচ মেটানো হয়েছে ২০ আষাঢ় [মঙ্গল 4 Jul]: 'ব° আদি ব্রাহ্মসমাজ দং রাজারাণী ছাপানর ব্যয় ১৪ ফরমা ৫্ হিসাবে ৭০্ /দপ্তরীর মজুরী ১৪/০/৮৪/০'; একই দিনে বিসর্জ্জন-এর জন্য খরচ 'ব° আদি ব্রাহ্মসমাজ দং বিসর্জ্জন বই ছাপান ১১ ফরমা ৫্ হিসাবে ৫৫্ /বাঁধান দপ্তরীর মজুরী ১০৷০/৬৫০'। রবীন্দ্রনাথের বই সাধারণত আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিক্রয় করা হত; কিন্তু এই

দু'টি গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে সিকিমূল্যে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। ২৪ জ্যৈষ্ঠের [মঙ্গল 6 Jun] হিসাব: 'মা° গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দং রাজারাণী বই ১৪৯৭ খান বিক্রীর মূল্য ৩৭৪।০' ও ১৯ আষাঢ়ের [সোম 3 Jul] হিসাব: 'বিসর্জ্জন বই বিক্রী মা° গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দং ১৫০০ বই বিক্রী সিকি মূল্যে ৩৭৫'।—সিকি মূল্যে বিক্রি করেও রবীন্দ্রনাথের লাভের পরিমাণ নিতান্ত কম ছিল না, পাঠক সামান্য যোগ-বিয়োগ করলেই তা জানতে পারবেন। কিন্তু কাগজের দাম ও মুদ্রণব্যয়ের হিসাব দেখে আজকের প্রকাশক ও ক্রেতা-পাঠক দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারেন!

রাজা ও রানী এবং বিসর্জন-সংবলিত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থাবলী কিন্তু ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হয়নি, তত্ত্ববোধিনী-র বিভিন্ন সংখ্যায় গ্রন্থটির বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঠাকুর কোম্পানির বরিশাল শাখার প্রধান কর্মচারী নিশিকান্ত [গুপ্ত]কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের সমস্যার কথা আমরা আগেই বলেছি। ৪ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 17 May] বলেন্দ্রনাথ 'যোড়াসাঁকো' থেকে বসন্তকুমার গুপ্তকে লিখেছেন: 'সম্প্রতি এখানে আমি শয্যাগত।.../নিশিকান্তের কোনও সাড়াশব্দ নাই। ৫/৭ খান পত্র তাহাকে লেখা হইয়াছে—উত্তর পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সকলেই কিছু বিস্মিত হইয়াছেন। তাহাকে বলিবেন।/ কলগুলি কুষ্টিয়ায় পাঠাইতে আর বিলম্ব না হয়।'[৫]

দুর্বলস্বাস্থ্য বলেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের সম্মিলনের জন্য কাজ করতে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, ঠাকুর কোম্পানি সম্পর্কিত দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রম তাঁর মৃত্যুশয্যা রচনা করল। তাঁর মা প্রফুল্লময়ী দেবী লিখেছেন:

> সেখান [লাহোর] হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে মথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ এবং কাছাকাছি অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়া আসিল। সীতাকুণ্ডতে স্নান করিবার পর তার কানে খুব যন্ত্রণা হয় এবং তাহা লইয়াই বাড়িতে ফিরিয়া আসে। বাড়ি আসার পর নানারকম সেবা যত্নে কানের যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সেই সময় ঠাকুর কোম্পানীর হিসাবপত্তর চুকাইবার জন্য তাহাকে শিলাইদহে জমিদারীতে যাইতে হয়। সাহানা [বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী সুশীলতা দেবী] ওখানে আমার ছোটজায়ের [মৃণালিনী দেবী] কাছে ছিল, তাহাকে সেই সময় ওখানে একজন ইংরাজ মাষ্টার [মিঃ লরেন্স] পড়াইত। সারা দিন রাত হিসাবপত্র লইয়া বলু এত ব্যস্ত থাকিত যে, সময়মত স্নানাহার তাহার হইত না, কখনও বা বেলা তিনটায় কখনো বা পাঁচটায় খাইত এইরূপ অনিয়ম হওয়াতে পুনরায় কানের যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া উঠে।...সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার চিন্তার অবধি রহিল না, কিসে সে আরাম হইবে এই কেবল ভাবিতে লাগিলাম। অঘোর ডাক্তার, উমাদাস বাঁড়ুয্যে, ডাক্তার সাল্‌জার এই তিনজনে দেখিতে লাগিলেন।[৬]

বলেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী খুব ভালোবাসতেন। সুতরাং তাঁরাও প্রফুল্লময়ী দেবীর উদ্বেগের অংশীদার ছিলেন। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় কলকাতা চলে আসেন। তিনি ১৩ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 26 May] জগদীশচন্দ্রকে লিখেছেন: 'বলেন্দ্রনাথ ও আমার পুত্র রথীর রোগপরিচর্য্যার জন্য আমাকে হঠাৎ কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে—প্রায় পনেরো দিন এইখানেই কাটিয়াছে, আরও দিন পাঁচ সাত কাটিতে পারে। নিজেও সুস্থ নহি।'[৭]

রথীন্দ্রনাথকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে আসা হলেও রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ফেরার আগেই তাঁকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেটি জানতে পারা যায় মাধুরীলতার 29 May সোমবারের [১৬ জ্যৈষ্ঠ] চিঠি থেকে। চিঠিটির কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি, এর থেকে রবীন্দ্র-পরিবারের শিলাইদহ-পল্লীভবনের জীবনযাত্রা ও তাঁর পুত্রকন্যাদের, বিশেষ করে মাধুরীলতার, মানসপ্রকৃতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে:

আজ তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ হল। আজ সুশী বৌঠান, কৃতীদাদার সঙ্গে বাড়ী গেলেন। কাল রাত্রে আমার সঙ্গে শুয়েছিলেন।···আমি বোঠান্‌কে রোজ রাত্রে গ্রন্থাবলি থেকে যা হয় কিছু পড়িয়ে শোনাতুম।···বোঠানকে "বিসর্জ্জন", "বাল্মীকি প্রতিভা" আর "মায়ার খেলা" পড়িয়ে শুনেছি। "বিসর্জন" আর "বাল্মীকি প্রতিভা" আমরা দুজনেই বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু "মায়ার খেলা" একটু শক্ত বলে মনে হল।... রথীকে তুমি খাইয়ে দিয়ে মোটা সোটা করে দিতে বলেছ।···তুমি ফিরে আসবার আগে রথীকে মোটা সোটা, গোল গাল, কর্‌তে খুব চেষ্টা করব। আজ ওকে বেশ ভাল করে ক্ষীর আর বোম্বাই আমের রস খাইয়েছি। একটা পোনা মাছের মুড়, আর ভাত খাইয়েছি। এরকম রোজ যদি খেতে পারে, তো, মোটা হবে। কিন্তু ও যে আমার কথা শোনে না। বড় দিদি বলে মান্যও করে না। ওকে এবার থেকে আমাকে "দিদি" বলাতে হবে। ···আজই সমস্তক্ষণ Pickwick Papers পড়ে, মাথা ধরে দাঁত কন্‌কন্ করছে।...সারাদিন গল্পের বই পড়ে, আর ৪টি ঘণ্টা Mr. Lawrence-এর কাছে পড়ে দিন কাটান শক্ত হয়ে উঠে। রাণীকে পড়াতে আমার খুবই ইচ্ছে করে কিন্তু আমরা দুজনেই অধৈর্য্য, একটুতে বিরক্ত হয়ে পড়ি।··· খোকাবাবু ভাল আছেন। তার হাম বেরিয়েছে।...এখন বেশ মীরির সঙ্গে খেলাধূলা করছে।··· খোকাতে, আমাতে রাণীতে আর মীরাতে মিলে তাসের দুর্গ করে, আর পুতুল সৈন্য করে প্রায় ঘণ্টা খানেক খেলা করি।... নীদ্দার সঙ্গে আমার সারাদিন টোকাটুকি লেগেই আছে। নীদ্দা [নীতিন্দ্রনাথ] আমার সঙ্গীত গুরু হয়েছেন। ব্রহ্মসঙ্গীত থেকে আমাকে "তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ", গান শিখিয়েছেন।···আমার ব্রহ্মসঙ্গীতের কতকগুলি গান ভাল করে শেখ্‌বার ইচ্ছে আছে, তুমি এসে আমাকে কি শেখাবে?...তুমি যাহা লিখেছ, আমি তা করতে খুব চেষ্টা করব। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে চলব। বাবা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, আমি খুব ভাল হতে চেষ্টা করব। আমি দিদিয়ার[ইন্দিরা দেবী] মত বুদ্ধিমতী আর ভাল হতে পারব না, কিন্তু আমি যদ্দূর পারি ভাল হব।...আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে আমি যা করব আমার ভাইবোনেরা তাই দেখে আমার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করবে। আমি যদি ভাল না হই, তাহলে ওদের পক্ষে, আমার পক্ষেও মন্দ।'[৮]

—রবীন্দ্রনাথের পত্রটি পাওয়া যায় নি, কিন্তু মাধুরীলতার পত্রের দর্পণে তিনি সন্তানদের কিভাবে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তার আদর্শটি প্রতিফলিত হয়েছে। এই চিঠি থেকে এটাও স্পষ্ট হয়, শিলাইদহের পল্লীভবন রবীন্দ্র-পরিবারের পক্ষে নির্বাসন ছিল না, আত্মীয়-সমাগমে তা প্রায়ই মুখরিত হত। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধুরা প্রায়ই সেখানে সমবেত হতেন।

বলেন্দ্রনাথের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এলেও রবীন্দ্রনাথ যথারীতি ভ্রাম্যমাণ। ২ জ্যৈষ্ঠ মানিকতলা [সরকারী খরচে এইদিন 'জোড়া গিজা হইতে বালিগঞ্জ'], ৪, ৭ ও ২০ জ্যৈষ্ঠ বালিগঞ্জ, ৬, ১২ ও ১৩ জ্যৈষ্ঠ নিমতলা স্ট্রীট এবং ২৪ জ্যৈষ্ঠ তাঁর 'সুখিয়া স্ট্রীট' যাওয়ার হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে নিমতলা স্ট্রীটে যাওয়ার কারণ অবশ্যই প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে দেখা করা। প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের ইতিহাস যথেষ্ট পুরোনো হলেও ১২৯৬-১৩০৫ বঙ্গাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে উভয়ের পত্রালাপের কোনো নিদর্শন রক্ষিত হয় নি, কিন্তু বর্তমান সময় থেকে মোটামুটি ১৩১১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত উভয়ের সম্পর্ক যথেষ্ট নিবিড়—রবীন্দ্রনাথের ব্যবসায়িক ও পারিবারিক বহু সমস্যার সমাধানে প্রিয়নাথ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, বন্ধু-সংসর্গের উত্তাপ তো ছিল-ই। জ্যৈষ্ঠ মাসে যে-তিনবার রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের কাছে গেছেন তার কারণ সম্ভবত ব্যবসায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। এইরূপ অনুমানের কারণ, চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ডের অন্তগর্ত রবীন্দ্রনাথের তারিখ-হীন ৬৯-সংখ্যক পত্রের রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূলের সাদা অংশে '28-5-99/Sunday/Morning' [১৫ জ্যৈষ্ঠ] তারিখ দিয়ে ইংরেজিতে প্রিয়নাথের স্বহস্ত-লিখিত একটি পত্রের খসড়া—যাতে তিনি জনৈক অমৃতলাল[? অনন্তলাল]-কে অনুরোধ করেছেন, দলিল বন্ধক রেখে রবীন্দ্রনাথকে চল্লিশ হাজার টাকা ধার দেবার জন্য রাজা শরৎচন্দ্র ঘোষালের [?] সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। 'কুষ্টিয়ার সমস্ত জঞ্জাল যথাসম্ভব সত্বর চুকিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব' হওয়ার জন্য ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করার অনুরোধ আষাঢ় ১৩০৬-এ প্রিয়নাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পত্রের বিষয়বস্তু। ঠাকুর কোম্পানির অপর দুই অংশীদারের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ মরণান্তিক পীড়ায় অসুস্থ, সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঋণ বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্য

কয়েকটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে অনুরোধ করেছেন—সুতরাং তাঁর বালিগঞ্জে যাওয়ার উদ্দেশ্য হয়তো সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করা।

কিন্তু কলকাতায় অবস্থান সত্বেও তিনি ৮ জ্যৈষ্ঠ [রবি 21 May] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে যোগ দেন নি। এইদিন চন্দ্রনাথ বসু 'বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হলে চন্দ্রনাথ ১৬ শ্রাবণ [সোম 31 Jul] একটি খণ্ড রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে লেখেন:

…তোমাকে দিতে এতদিন ইতস্তত করিয়াছিলাম। যখন প্রবন্ধটী পড়ি তখন তুমি এখানে ছিলে, কিন্তু সভায় আস নাই। তাহার পর শুনিয়াছিলাম আমার মত অনেক সময় তোমার প্রীতিকর হয় না, এবারও হইবে না, এরূপ ভাবিয়া আস নাই। সুতরাং এতদিন ভাবিতেছিলাম যাহা তোমার প্রীতিকর না হইবার সম্ভাবনা তাহা তোমাকে দিয়া বিরক্ত করিব কিনা।…শেষে স্থির করিয়াছি তোমাকে না দিলে আমার অপরাধ হইবে। …বাঙ্গালা সাহিত্যে তোমার অত্যুচ্চ স্থান এবং মহতী প্রতিষ্ঠা। প্রবন্ধটি পড়িতে তোমাকে আহ্বান না করিলে আমার কর্তব্যের ত্রুটী হইবে অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়া উহা তোমার নিকট পাঠাইলাম।[৮ক]

চন্দ্রনাথের কটাক্ষ ভুল নয়, কিন্তু তাঁর সামাজিক মতামত রবীন্দ্রনাথের পছন্দসই না হলেও ব্যক্তি-চন্দ্রনাথের প্রতি তিনি সশ্রদ্ধ ছিলেন। তিনি যে চন্দ্রনাথকে তাঁর 'পঠদ্দশার কথা' ভারতী-তে লিখতে অনুরোধ করেছিলেন এই পত্রেই তার উল্লেখ আছে। কণিকা থেকে ক্ষণিকা পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থগুলিকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চন্দ্রনাথকে উপহার পাঠিয়েছিলেন, চন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্র কপি করে প্রিয়নাথ সেনকে পাঠাচ্ছেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। বহুক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি না পাওয়ায় বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিরোধের ইতিবৃত্তটিই প্রাধান্য লাভ করেছে, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্কটি স্পষ্ট হয় নি।

বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চর্চা খুবই অল্প। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৯৭-১০০] মুদ্রিত তাঁর একমাত্র রচনা 'অশেষ' [দ্র কল্পনা ৭। ১৭৮-৮২] কবিতাটি ২৫ বৈশাখ [রবি 7 May] তাঁর ঊনচত্বারিংশতম জন্মদিনে লিখিত, একথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে যে রচনার প্রেরণা রয়েছে, সেকথা বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে জানিয়েছেন পূর্বোল্লিখিত ১৩ জ্যৈষ্ঠের [শুক্র 26 May] পত্রে:

…রোগতাপের মধ্যে লেখাপড়া বন্ধ আছে—সুযোগের অপেক্ষা করিতেছি—এক একবার ভাবি সুযোগও হয়ত আমার অপেক্ষা করিতেছে—জোর করিয়া মনটাকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একবার লিখিতে বসিলেই হয়—কিন্তু সেই জোরটুকু সম্প্রতি পাইতেছি না।

কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে—যেমন করিয়া হৌক্ তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে—তাহারা আমার কন্যাদায়ের মত—পাব্লিকের সহিত তাহাদের পরিণয় সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিবে—কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধেও বাল্যবিবাহটা ভাল নয়—উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত ইহাদের কলরব ও উপদ্রব আমাকে সহ্য করিতেই হইবে।[৯]

মানসকন্যাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ আরও চার মাস বড়ো হতে দিয়েছিলেন, বৌদ্ধকাহিনী-সংকলন 'অবদানশতক' অবলম্বন করে 'পূজারিণী' কবিতা লিখিত হয় ১৮ আশ্বিন [বুধ 4 Oct] —এর পর প্রায় দেড় মাসের মধ্যে আরও ১৯টি কবিতা রচিত হয়েছে।

পৌরাণিক কবিতা বিষয়ে জগদীশচন্দ্র ফরমাশ করেছিলেন দার্জিলিং থেকে লিখিত 20 May [শনি ৭ জ্যৈষ্ঠ]র পত্রে:

…আপনার গ্রন্থাবলী পড়িতেছিলাম। আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্ব্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন?…মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন। একবার 'কর্ণ' সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে

ক্ষুদ্রতা ও মহত্ভাবের সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয়, জয় অপেক্ষাও মহত্তর তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।[১০]

—রবীন্দ্রনাথ এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন কয়েক মাস পরে ১৫ ফাল্গুন [সোম 26 Feb] কাব্যনাট্য 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' [দ্র কাহিনী ৫। ১৫৪-৬২] লিখে। কবিপ্রতিভার সহানুভূতির স্পর্শে কর্ণ চরিত্র সেখানে সত্যই মহত্তর হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাব্য গ্রন্থাবলী-তে কোন্ পৌরাণিক কবিতা জগদীশচন্দ্রের 'সর্ব্বাংশে সুন্দর' বলে মনে হয়েছিল? তিনি কি 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায় অভিশাপ'-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন?

রবীন্দ্রনাথ যে জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় শিলাইদহ থেকে কলকাতায় চলে এসেছেন তা নিশ্চয়ই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জানা ছিল না। তিনি ৭ জ্যৈষ্ঠ [শনি 20 May] আলিপুর থেকে 'মন্দাক্রান্তা ছন্দ' নামে একটি সনেট লিখে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন 'মেঘদূতের উপর একটি সনেট' লিখে দিতে, তাঁর ইচ্ছা ছিল আষাঢ়-সংখ্যা প্রদীপ-এর প্রথম পৃষ্ঠায় 'বর্ষা-কাব্য' নামে এই যুগল-সনেট ছাপাবেন। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে তাঁর অনুরূপ অনুরোধ রক্ষা করলেও [দ্র ভারতী, ভাদ্র ১৩০৩] এবার তা করেন নি। পরে সাক্ষাৎকালে প্রভাতকুমার প্রদীপ-এর জন্য একটি গল্প প্রার্থনা করলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, তাতে সরলা দেবী অসন্তুষ্ট হবেন। প্রভাতকুমার সরলা দেবীকে লেখেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প প্রদীপের জন্য দান করলে প্রভাতকুমার ভারতী-র জন্য দু'টি গল্প দেবেন। প্রভাতকুমার এ-বিষয়ে ২৪ জ্যৈষ্ঠ [6 Jun] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'ও মহাশয়, তাহাতে ভয়ানক বিভ্রাট বাঁধিয়া গিয়াছে। শ্রীমতী সরলা চারপৃষ্ঠা ব্যাপী এমন একখানি পত্র আমাকে লিখিয়াছেন যে, আমি লেজ গুটাইয়া প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার পথ পাই নাই। পরন্তু এ প্রস্তাব না করিলে হয়ত মাঝে মাঝে আমার একটা গল্প ভারতীতে দিলে চলিত—এখন প্রতি মাসে গল্প না দিলে আর এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবার উপায়, দেখিতেছি না।'[১১] এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সূত্রে সরলা দেবীর সঙ্গে প্রভাতকুমারের একটি প্রণয়-সম্পর্কের সূচনা হয়, এই সম্পর্ক বিবাহ-সম্ভাবনার স্তরেও পৌঁছেছিল—কিন্তু প্রভাতকুমার-জননীর ধর্মীয় সংস্কার উভয়ের মিলনের প্রতিবন্ধক হয়। প্রসঙ্গটি পরেও কয়েকবার উত্থাপিত হবে।

প্রভাতকুমার এই সময়ে মাঝে মাঝে কবিতা লিখলেও তিনি এখন প্রধানত গল্পকারের ভূমিকায় খ্যাতিমান। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে ভূমিকা পরিবর্তন করে তাঁর 'বাঙ্গলা গদ্য লেখায়...প্রথম উদ্যম' 'বেনামী চিঠি' নামের একটি গল্প প্রেরণ করেন চার বছর আগে ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ [8 Jun 1895][১২] তারিখে এরপর তিনি ধীরে ধীরে গল্পকার হয়ে ওঠেন, প্রদীপ-এ প্রকাশিত তাঁর গল্প ভারতী-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করে। এই খ্যাতিলাভের পর্বেও রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ তাঁর কাছে বহুমূল্য ছিল। ৪ চৈত্র ১৩০৫ [17 Mar 1899] তিনি 'ভুল-ভাঙ্গা' [দ্র ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬। ১০১-২৭] গল্পটির সংক্ষিপ্তসার রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে তাঁর মতামত প্রার্থনা করেন; ৭ জ্যৈষ্ঠ লিখেছেন: 'আপনার পরামর্শমত পরিবর্তনাদি করিয়া দিয়াছি।' ২৪ জ্যৈষ্ঠের পত্রে তিনি লিখেছেন: 'আমাকে যত শীঘ্র পারেন একটি প্লট পাঠাইয়া দিবেন, ভাদ্রের জন্য সেটি এখন হইতে তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিব।' রবীন্দ্রনাথ এই প্রার্থনা পূরণ করেন; তাঁর প্রেরিত প্লট অবলম্বনে লিখিত গল্পটির নাম 'দেবী' [দ্র ভারতী, ভাদ্র। ৩৮৭-৪০৪]। 'নব-কথা' [প্রথম প্রকাশ: কার্তিক ১৩০৬] গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের [জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮] ভূমিকায় প্রভাতকুমার লিখেছেন: "দেবী" গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমায় দান করিয়াছিলেন —এ কথাটি প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করি নাই। এখন করিলাম।'[১৩] ৬ আশ্বিনের [শুক্র 22 Sep] পত্রে প্রভাতকুমার লিখেছেন: 'শুনিলাম আমার

'দেবী' গল্প পড়িয়া আপনি নিরাশ হইয়াছেন, তাহার সাইকলজি পরিস্ফুট হয় নাই দেখিয়া। পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া মানুষ করা বড়ই কঠিন দেখিতেছি; যতই যত্ন কর, তার মায়ের মন কিছুতেই উঠে না। তার মা বলিবেই বলিবে—ঐ আমার মেয়ের অযত্ন হইল।—রহস্য থাউক।' 'দেবী'র একটা ফাইল পাঠাইতেছি এই ডাকে। একটু touch করিয়া দিবেন অনুগ্রহ করিয়া? কিন্তু একটু শীঘ্র চাই।...কারণ প্রেসের লোকেরা পূজার মধ্যে আমার বহি বাহির করিয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।'[১৪] রবীন্দ্রনাথ বিশেষ-কোনো 'touch' করেছিলেন বলে মনে হয় না, ভারতী ও গ্রন্থের পাঠে সামান্যই পার্থক্য আছে।

রবীন্দ্রনাথ ২৪ জ্যৈষ্ঠের [মঙ্গল 6 Jun] পরে কোনো সময়ে শিলাইদহে ফিরে গিয়েছিলেন।৩০ জ্যৈষ্ঠ [সোম 12 Jun] তাঁর নিকট 'সিলাইদহার পত্র পাঠান'র হিসাব পাওয়া যায়।

'মঙ্গলবার' [৩১ জ্যৈষ্ঠ: 13 Jun] তিনি 'কুষ্টিয়ার বাজারের খবর' নিয়ে প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠি লেখেন। ঠাকুর কোম্পানির ব্যবসায়ের অবস্থা প্রিয়নাথ জানতেন, আমরা আগেই দেখেছি দেনা মেটানোর জন্য ঋণসংগ্রহের প্রচেষ্টায় তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার ব্যবসা শুরু করার জন্য রবীন্দ্রনাথের পরামর্শের শরণাপন্ন হয়েছেন। উভয়ের পরবর্তী কয়েকটি পত্রের অন্যতম বিষয়বস্তু এই ব্যবসা-সংক্রান্ত—৭ আষাঢ়ের [বুধ 21 Jun] পত্রে লোক-ব্যবহার বিষয়ে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতাও ব্যক্ত হয়েছে: 'মফস্বলের যাহা কিছু অবশ্যব্যবহার্য সামগ্রী তাহার কারবার ধীরভাবে করিলে লোকসান হইবে না ইহা common sense-এ বলে—কিন্তু সেই ধীরতা সেই বিবেচনা কর্মচারীদের সেই সততা দুর্লভ বলিয়াই অনেক সময় ঠকিতে হয়। আমি বারবার বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছিলাভ লোকসান লোকের উপরেই নির্ভর করিবে—সৎ অথচ কর্ম্মকুশল লোক সংসারে বিরল—যদি জোটাইতে পার তাহা হইলে তোমার ভাবনার কারণ নাই'[১৫]—প্রিয়নাথ সম্ভবত এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করেন নি, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কয়েকটি পত্রে এ-বিষয়ে কিছু উল্লেখ থাকলেও তা কার্যকরী রূপ গ্রহণ করে নি।

একটি ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বিশেষ বিচলিত ও বিব্রত হয়ে পড়েন। য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের চৈতালি কাব্যের সমালোচনা, 'গান্ধারীর আবেদন'-পাঠ উপলক্ষে উক্ত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তির্যক মন্তব্য, রমণীমোহন ঘোষের "চৈতালি"-সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য, সাহিত্য-তে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিদ্রুপ ইত্যাদি প্রসঙ্গ আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এরপর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে মিলিয়ে এবং কুৎসা ও ব্যঙ্গ মিশিয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'প্রণয়ের পরিণাম' নামে একটি গল্প লিখলেন ও সেটি মুদ্রিত হল বৈশাখ ১৩০৬-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ২৭-৩৯]. এমন মুনশিয়ানার সঙ্গে দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, এমন-কি ঠাকুরপরিবারের সেরেস্তার কর্মচারী বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা মৃণালিনী দেবীর প্রসঙ্গ এই গল্পে চিত্রিত হয়েছে যে, এই পরিবারের ইতিকথার সঙ্গে সামান্য-পরিচিত ব্যক্তির পক্ষেও গল্পের লক্ষ্যটি বুঝে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয়। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের বন্ধুমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' পত্রিকা পড়া বন্ধ করে দেন, সুতরাং তাঁর আত্মীয় বন্ধুরাই গল্পটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গল্পকার

প্রভাতকুমার গল্পটি পড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ‘একটি কুকুরের প্রতি’ শীর্ষক সনেটটি লিখে আষাঢ়-সংখ্যা প্রদীপ-এ [পৃ ২৪৬] স্বনামে প্রকাশ করেন:

চিরদিন পৃথিবীতে আছিল প্রবাদ
কুকুর চীৎকার করে চন্দ্রোদয় দেখি
আজি এ কলির শেষে অপরূপ একি
কুক্কুরের মতিভ্রম বিষম প্রমাদ
চিরদিন চন্দ্রপানে চাহিয়া চাহিয়া
এতদিনে কুক্কুর কি হইল পাগল?
ভাসিছে নবীনরবি নভঃ উজলিয়া
তাহে কেন কুক্কুরের পরাণ বিকল?
নাড়িয়া লাঙ্গলখানি উর্ধ্বপানে চাহি
ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ মরে ফুকারিয়া
তবু ত রবির আলো ম্লান হল নাহি,
নাহি হোল অন্ধকার জগতের হিয়া!
হে কুক্কুর ঘোষ কেন আক্রোশ নিস্ফল
অত উর্ধ্বে পৌঁছে কি কণ্ঠ ক্ষীণবল?

—স্পষ্টতই এখানে ‘রবি’ ও ‘ঘোষ’ শব্দ-দু’টি শ্লেষার্থে রবীন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে বুঝিয়েছে। কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণ প্রদীপ-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রুচিবিগর্হিত বলে মনে হওয়ায় তিনি ৩১ জ্যৈষ্ঠ [13 Jun] এলাহাবাদ থেকে প্রভাতকুমারকে লিখিত একটি পত্রে উক্ত কবিতাটি বাদ দিয়ে প্রদীপ-এর শেষ দু’টি পৃষ্ঠা নূতন করে ছাপার নির্দেশ দেন।’* এই নির্দেশ যথাযথ পালিত হয় নি; একটি টুকরো কাগজে অর্থহীন একটি ‘প্রশ্ন’ মুদ্রিত করে এমনভাবে সনেটটির উপর সেঁটে দেওয়া হয় যাতে সেটি পড়তে কোনো অসুবিধা না হয়। ‘প্রশ্ন’টি হল:

বঙ্গদেশে পদ্মপুরাণান্তর্গত যে বেহুলার উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা কোন স্থানে ঘটিয়াছিল? উদাসীন সত্যবাপ্রণীত ‘আসাম ভ্রমণ’ নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই, তিনি ধুবড়ীকে এই ঘটনার স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর বঙ্গের লোকেরা বলেন, বগুড়ার নিকটবর্তী মহাস্থানে চাঁদসদাগর ও লক্ষ্মীণধরের বাড়ী ছিল; এবং তথায়ই উহা ঘটিয়াছিল। আবার দার্জিলিং প্রবাসী কোন কোন বন্ধুর মুখে শুনিতে পাই, দার্জিলিঙের নিকটবর্তী রঙ্গিত নাম্নী স্রোতস্বতীর তীরে চাঁদসদাগর প্রভৃতির বাড়ী ছিল এবং রঙ্গিতের স্রোতেই বেহুলার ভেলা ভাসিয়াছিল। কোনটা ঠিক? কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ মহোদয় এই সংশয়টী ভঞ্জন করিয়া দিবেন কি?/ জিজ্ঞাসু

কিন্তু ‘প্রশ্ন’-এর এই ছলনা সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয় নি [বস্তুত সেরূপ উদ্দেশ্য প্রভাতকুমারের ছিল না], তিনি আষাঢ়-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ১৯৬] ‘মাসিক সাহিত্য সমালোচনা’য় এ-বিষয়ে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন:

…পাতা-ঢাকা ফুল, ঘোমটা-দেওয়া মুখ প্রভৃতির প্রতি কুতূহলী দৃষ্টি সহজে ও আগে আকৃষ্ট হয়, তাই প্রদীপ পাতলা কাগজে ছাপা প্রশ্নের আবরণ দিয়া কবিতাটির আকর্ষণীশক্তির বৃদ্ধি করিয়াছেন। …সাহিত্যসমাজে ‘মোসাহেবির’ এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত অতি বিরল। চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কুকুর চীৎকার করে কি না, তাহা আমাদের সাহিত্যিক ‘চন্দ্র’গণই বলিতে পারেন; এবং এই শ্রেণীর মোসাহেবগণ জীবতত্ত্বের কোন্ অধ্যায়ে নিবিষ্ট, তাহার মীমাংসার ভার শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়ের প্রতি অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু পার্বত্র সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ মোসাহেবি ও মেছুনীর ভাষার যুগপৎ আবির্ভাব দেখিয়া শঙ্কা হয়, আবার কি কবির গান বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইবে? ভগবান্ রবিবাবুকে এই ‘ভক্তের’ হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

—কিন্তু ‘প্রণয়ের পরিণাম’ গল্পের মধ্যে সূক্ষ্মদর্শী সুরেশচন্দ্র কোনো তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারেন নি, এইটিই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

জগদীশচন্দ্র ও প্রিয়নাথ সেনকে লেখা কয়েকটি পত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার পরিচয় আছে। জগদীশচন্দ্রকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের কথা জানিয়েছিলেন—সেই পত্রটি পাওয়া যায়নি—প্রত্যুত্তরে 21 Jun [বুধ ৭ আষাঢ়] জগদীশচন্দ্র দার্জিলিং থেকে লেখেন:

আপনি যে গল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বেই সম্পাদককে এতৎ সম্বন্ধে আমার কিছু মন্তব্য লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। তবে এরূপ বিষয়ে একান্ত উপেক্ষা করাই সমুচিত কিনা মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। আমি লিখিব, কিন্তু অধিক importance দিতে চাহি না। আপনি অনেক উচ্চে আছেন, এ সব কর্দ্দম আপনাকে স্পর্শ করিবে না।...যদি কেহ আপনার কবিতা হইতে বঞ্চিত হয় তাহাদিগকে করুণার পাত্র মনে করি। আর যাঁহারা আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পূর্ণতর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আশীর্বচন কি আপনার নিকট পৌঁছে না?[১৬]

প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ একই দিনে লিখিত একটি পত্রে লেখেন: 'ক্ষুব্ধ আত্মীয়দের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে সাহিত্যের কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত আক্রমণ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে।'[১৭] সম্ভবত জগদীশচন্দ্র ও প্রিয়নাথ উভয়েই সাহিত্য-সম্পাদককে উদ্দেশ করে লিখিত ব্যক্তিগত পত্রে তাঁদের ক্ষোভ ব্যক্ত করেন—প্রিয়নাথ সেই পত্রের কপি রবীন্দ্রনাথকে পাঠালে তিনি ১৮ আষাঢ় [রবি 2 Jul] তাঁকে লেখেন: 'তুমি তোমার অন্তরের আক্ষেপ যেরূপ আবেগের সহিত ব্যক্ত করিয়াছ তাহার মধ্যে বন্ধুবাৎসল্য ও কর্তব্যবোধ দুইই ব্যথিত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—সেই উদার বন্ধুপ্রীতিটি আমি আমার অংশ বলিয়া প্রেমানন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম—বাকিটা সম্পাদকের হস্তে এবং সেই সূত্রে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা সঙ্গত হইতেছে কি না বিচার্য্য। অবশ্য প্রাইভেট ভাবে সম্পাদকের নিকট গেলে ক্ষতি দেখি না।—কিন্তু ইহা লইয়া কাগজে পত্রে বিচার বিতর্ক উত্থাপিত করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। এই সকল কথার প্রকাশ্য অলোচনায় যে একটি অসম আছে তাহা সহ্য করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ হয়।'[১৮] প্রিয়নাথ বা জগদীশচন্দ্রের পত্র সম্ভবত 'প্রাইভেট ভাবে'ই প্রেরিত হয়েছিল—উক্ত 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'র মন্তব্য ছাড়া এ-বিষয়ে সাহিত্য-তে আর-কোনো লেখা মুদ্রিত হয় নি। এর পর কিছুদিন সুরেশচন্দ্র রবীন্দ্ররচনার সমালোচনায় কিঞ্চিৎ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন; এমনকি 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় [দ্র প্রদীপ, মাঘ। ৬১-৬৩] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কয়েকটি কবিতা অক্ষম সমালোচকদের উদ্দেশ্যে রচিত বলে মন্তব্য করলে সুরেশচন্দ্র তার প্রতিবাদে লেখেন:

...অক্ষয়বাবু সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, সমালোচকগণের মুণ্ডপাত করিবার জন্যই কবি 'কণিকা'র অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছেন। যদি সত্যই রবীন্দ্রবাবু সমালোচনায় অসহিষ্ণু হইয়া 'কণিকা'র মত রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলেও, সমালোচকগণের ক্ষোভের কারণ ঘটিত না। আমাদিগকেও কর্তব্যের অনুরোধে রবীন্দ্রবাবুর রচনা সম্বন্ধে ভাল-মন্দ অনেক কথা বলিতে হইয়াছে। প্রতিকূল সমালোচনার বাক্যবাণে যদি অমর কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের ভোগবতী উৎসারিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে স্নিগ্ধ সরস শ্যামল করে, তবে সমালোচকগণের তদপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?...কিন্তু সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিক অক্ষয় বাবু শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, স্বয়ং রবীন্দ্রবাবু অক্ষয়বাবুর কৃত 'কণিকা'র সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহার এরূপ কোনও গূঢ় অভিসন্ধি ছিল না। অক্ষয়বাবুর প্রচারিত 'কণিকা'-রচনার গূঢ় উদ্দেশ্য বিনা প্রতিবাদে রবীন্দ্রবাবুর স্কন্ধে আরোপিত হইতে দিলে সাহিত্যে ধৃষ্টতা ও নীচতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাই আমরা এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলাম। 'কণিকা'র জাতি-যূথী-মল্লিকাপুঞ্জ সঙ্কীর্ণতার নরকে ফুটিয়া হিংসাবিদ্বেষের পবনে সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে, যে লেখক সমালোচকগণের প্রতি নিজের বিদ্বেষবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অসঙ্কুচিতচিত্তে সাধারণের নিকট ইহা প্রচার করিতে পারেন, তিনিও যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, ইহা বিস্ময়কর।[১৯]

—অক্ষয়কুমার-বিদূষণের উদ্দেশ্যে এই রবীন্দ্র-প্রশস্তি কি না বলা শক্ত, কিন্তু 'প্রণয়ের পরিণাম' গল্পের প্রকাশকের পক্ষে অনুরূপ মুগ্ধতা সত্যই 'বিস্ময়কর'! অবশ্য আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা প্রদীপ-এ মুদ্রিত 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটির একটি সুন্দর রসগ্রাহী আলোচনা করেন সুরেশচন্দ্র কার্তিক-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ৪৫৮-৫৯]।

এই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প লেখার কথা জানা যায়। ৪ আষাঢ় [রবি 18 Jun] তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখেছেন: 'আত্মীয়দের পীড়া লইয়া প্রায় এক মাস কলিকাতায় ছিলাম—সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের সেই অর্দ্ধত গল্পটিতে হাত দিয়াছি। মাসিক পত্রিকার তাড়া নাই—আপন মনে আস্তে আস্তে লিখি।'[২০] প্রত্যুত্তরে 21 Jun [বুধ ৭ আষাঢ়] জগদীশচন্দ্র লেখেন: 'আপনার অসমাপ্ত গল্পটি শেষ হইলে আপনার নিকট পুনরায় শুনিবার জন্য উৎসুক আছি।'[২১] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১ আষাঢ় [বৃহ 15 Jun] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'আচ্ছা বেশ, আপনি মন দিয়া বড় গল্প লিখুন,...কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি—আপনি যে গল্প লিখিতেছেন, তাহার আদিম পাণ্ডুলিপিটা আমার। আদিম প্রেসের কাপি নহে।'[২২] এই পত্রাংশগুলি থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার কথা এঁরা পূর্বেই জানতেন—জগদীশচন্দ্র গল্পটির কিছু অংশ শুনেছিলেন তাঁরই মুখে। গল্পটি কী তার হদিশ মেলে প্রভাতকুমারের ২ শ্রাবণের [সোম 17 Jul] পত্রে: 'কাল ত সমস্ত রাত্রি আপনার মহিন্ আর আশা আর বিনোদিনীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি।'[২৩] এরপর তিনি কাহিনীর খুঁটিনাটি নিয়ে যেভাবে পরামর্শাদি দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায়, পূর্বদিন রবীন্দ্রনাথ'চোখের বালি' উপন্যাসের কাহিনী তাঁকে শুনিয়েছিলেন। অবশ্য রচনাকার্য চলে খুবই ধীরে—স্ব-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-এ বৈশাখ ১৩০৮ থেকে কার্তিক ১৩০৯ পর্যন্ত মোট সতেরোটি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়—প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্র থেকে জানা যায়, উপন্যাসটি শেষ হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯-এ।[২৪]

গোড়ায় গলদ নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ৩১ ভাদ্র ১২৯৯ [15 Sep 1892] তারিখে। বইটি পুনর্মুদ্রণের আয়োজন হয় বর্তমান সময়ে। ৫ আষাঢ় [সোম 19 Jun] রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ক্যাশবহির হিসাব: 'গোড়ায় গলদ বই বুক পোষ্ট পাঠান', সঙ্গে একটি পত্রও প্রেরিত হয়—হয়তো রবীন্দ্রনাথ নাটকটির সংস্কার প্রয়োজন কি না সেটি দেখতে চেয়েছিলেন। ২৬ আষাঢ়ের [সোম 10 Jul] হিসাবে দেখা যায় মুদ্রণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে: 'জায়/ হেমচন্দ্র চক্রবর্তী / গোড়ায় গলদ বইয়ের কাগজ ক্রয় ১৬৲', কাগজ, মুদ্রণ ও দপ্তরীর মজুরী নিয়ে বইটি ছাপানোর মোট খরচ ১০৩ টাকা ৩ পয়সার উল্লেখ পাওয়া যায় ৯ ভাদ্রের [শুক্র 25 Aug] হিসাবে। আবার একই দিনে বিক্রয়ের হিসাব আছে: 'গোড়ায় গলদ বই বিক্রী...° গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দং ১০০০ গোড়ায় গলদ বিক্রী...২৫০৲'।

বিশিষ্ট কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [1838-1903] ১৩০৪ বঙ্গাব্দের মাঝামাঝি অন্ধ হয়ে যান ও সুলভ জীবনযাত্রার জন্য উক্ত বছরের শেষে কাশীতে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ইতিপূর্বে দাতব্য চিকিৎসালয়ে মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু বাঙালিকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছিল, তাই 'চিত্তবিকাশ' [৯ পৌষ ১৩০৫: 22 Dec 1898] কাব্যে অন্ধকবি হেমচন্দ্রের দুঃখের কথা পড়ে শিক্ষিত বাঙালি তাদের পূর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সচেষ্ট হল। তাঁর দারিদ্র্য-কষ্টের কথা জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। হেমচন্দ্রের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন: "...'বান্ধব' সম্পাদক রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'হিতবাদী' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত, 'অনুসন্ধান' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি অনেকেই কবিবরের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে

লাগিলেন।'[২৫] তিনি দুর্গাদাস লাহিড়িকে লিখিত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের ১৯ আষাঢ়ের [3 Jul]একটি পত্র উদ্ধৃত করেছেন:

…একটা আনন্দ সংবাদ দিই,—এইমাত্র রবিবাবুর এক পত্র পাইলাম যে, স্বাধীন ত্রিপুরার সেই মাননীয় মহারাজ, হেমচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, হেমচন্দ্রকে তাঁহার জীবিত কাল পর্যন্ত ত্রিশ টাকা হারে মাসিক বৃত্তি ও নগদ দুইশত টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন।...আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ইহার মূলাধার। তাঁহার এই প্রকৃত কবিজনোচিত ব্যবহার স্মরণ করিয়া, আমার চক্ষে জল আসিতেছে।[২৬]

ত্রিপুরার মহারাজা এই দানের কথা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজবন্ধুর মহানুভবতা দেশবাসীকে না জানিয়ে থাকতে পারেন নি। তিনি এ-বিষয়ে মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লেখেন:

হেমবাবুর সাহায্যার্থে মহারাজ যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে এখানে চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়াছে। একথা গোপন রাখা আমার সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে হেমবাবুও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাবোধ করিতেছেন। মাঝে হইতে মহারাজার কল্যাণে যশের কিয়দংশ আমার কপালেও পড়িয়াছে। আমার পিতাঠাকুর, হেমবাবুর জন্য মাসিক ২০ এবং গগন ১০ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।[২৭]

রবীন্দ্রনাথ ৩ শ্রাবণ [মঙ্গল 18 Jul] জোড়াসাঁকো থেকে হেমচন্দ্রকে লেখেন:

বহুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আমার পিতাঠাকুর আপনাকে তাঁহার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাইতে বলিয়াছেন এবং প্রতিমাসে আপনার সাহায্যার্থে ২০ কুড়ি টাকা নিয়মিত পাঠাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখে এখান হইতে টাকা প্রেরিত হইবে। গত মাসের টাকা অত্রসহ পাঠাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসে ১০ টাকা করিয়া দিবেন এবং সেও এইসঙ্গে পাইবেন।/ আপনার পুত্র আপনার গ্রন্থাবলী হইতে সংকলন করিয়া যে বাল্যপাঠ্য গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, আমার নিকট তাহার একখণ্ড প্রেরণ করিলে বিদ্যালয়ে তাহা প্রচার করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইব। কৃতকার্য্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।/ আমরা যে সামান্য দান পাঠাইলাম, আমার পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদী স্বরূপ তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিলে আনন্দ লাভ করিব। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩০৬।/ অনুরক্ত/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[২৮]

হেমচন্দ্রের পাঠানো বই শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কাছে বুকপোস্টে পাঠানো হয় ২০ শ্রাবণ [শুক্র 4 Aug]। তার আগে সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর কাছ থেকে মাসিক দান দশ টাকা পেয়ে হেমচন্দ্র ১৪ শ্রাবণ [শনি 29 Jul] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: '...বুঝিলাম ইহাও আপনার দ্বারাই হইয়াছে।…আমার প্রতি আপনি যে উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার জন্য ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার আমার ক্ষমতা নাই।'[২৯]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি ২৫ আষাঢ়ের [রবি 9 Jul] তৃতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসকে স্বীকৃতি দান করেন:

৬। অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেশ্চন্দ্র সমাজপতি প্রস্তাব করেন কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ পরিষদেরও চেষ্টা করা উচিত এবং তজ্জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরাধিপতি বঙ্গীয় কবিকে মাসিক সাহায্য দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়ায় এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এই মাসিক সাহায্য সংগ্রহে বিশেষ যত্ন করায় পরিষদ্ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক।[৩০]

—লক্ষণীয়, প্রস্তাবটি এনেছেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সাহিত্য পরিষদের প্রস্তাবে বেঙ্গল গবর্মেন্টও হেমচন্দ্রের জন্য মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তি নির্ধারণ করেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের জীবনীকার জানিয়েছেন, তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তিই যথেষ্ট ছিল। সাহায্যস্বরূপ প্রেরিত অর্থের অনেকটাই তাঁর বিলাসী পুত্রদের দ্বারা অপব্যয়িত হয়।

লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বাংলায় যে জমিদার-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, মধ্যস্বত্বভোগী সেই সম্প্রদায়ের কৃষি ও হস্তশিল্প-প্রধান জমিদারির বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যোগ ছিল কম—

তাঁদের অধিকাংশই বাস করতেন শহরের আরামদায়ক পরিবেশে। ঠাকুরপরিবারের জমিদারিতেও এ প্রথার ব্যতিক্রম ছিল না—সাময়িক প্রজাশাসনের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে গেলেও দেবেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রমুখ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রধানত কলকাতা শহরেই বাস করেছেন। কিন্তু অগ্র° ১২৯৬ [Nov 1889]-এ জমিদারি-পরিদর্শনের দায়িত্ব পাবার পর রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সময় কেটেছে উত্তরবঙ্গের গ্রাম-সংলগ্ন নদীবক্ষে। প্রকৃতির আকর্ষণ এই পর্বে তাঁর কাছে মুখ্য হলেও গ্রামজীবনের দারিদ্র-সংকুল বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে তিনি যে অচেতন ছিলেন না, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে ছিন্নপত্রাবলী-র কিছু চিঠিতে ও সাধনা-র রাজনৈতিক রচনায়। স্বদেশপ্রেমের যে দীক্ষা তিনি পারিবারিক পরিবেশেই লাভ করেছিলেন, গ্রামভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে তাকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। দেশকে 'আত্মশক্তি'তে উদ্বুদ্ধ করার যে আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন, তাকে তত্ত্বরূপে না রেখে ব্যবহারিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন শিলাইদহে পরিবার সরিয়ে নিয়ে আসার পর। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট আদর্শ সন্তানদের শিক্ষাপদ্ধতিতে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন, কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন হল এরই সঙ্গে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী রেশম শিল্প বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ ও রেশমের গুটিপোকা চাষের ব্যাপক আয়োজনের কথা আমরা আগেই বলেছি। কালিগ্রাম থেকে দু'জন ছাত্রকে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাননা ও কালিগ্রামে গুটিপোকার চাষ প্রবর্তনের কথা যে তিনি শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন, তার মূল লক্ষ্য ছিল জীবিকার নূতন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়ে প্রজাদের কল্যাণসাধন। রাজশাহী ডায়মণ্ড জুবিলি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুলের 1899-1900-এর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বিদ্যালয়ের আঠারোটি বৃত্তির মধ্যে পাঁচ টাকা করে চারটি মাসিক বৃত্তি রবীন্দ্রনাথ প্রদান করতেন।[৩১] কৃষির ব্যাপারেও তিনি গতানুগতিক চাষ-আবাদের ক্ষেত্রটিকে বাড়াতে চাইলেন নূতন ধরনের ফসল উৎপাদনের দিকে। ১০ আষাঢ় [24 Jun] তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখেছেন: 'আমার চাষ-বাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম—তাহার গাছগুলা দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মান্দ্রাজি সরু ধান রোপণ করাইয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু সোমবারে সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।'[৩২]

এই 'দ্বিজেন্দ্রলালবাবু' হচ্ছেন কবি-নাট্যকার ও কৃষিতত্ত্ববিদ্ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। এর আগেও দ্বিজেন্দ্রলাল সস্ত্রীক শিলাইদহে এসেছেন, কিন্তু সে ছিল বন্ধু-সন্দর্শনে আগমন —এবার এলেন 'কৃষিতত্ত্ববিদ্'শস্যক্ষেত্র পর্যবেক্ষণে। বাংলা দেশে তখন আলুর চাষ হত না, নৈনিতাল আলু আসত উত্তরপ্রদেশ থেকে। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল বাংলার মাটিতে আলু চাষের পরীক্ষা করবেন। 'কবিকেশরী'-প্রণেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন:

> রবীন্দ্রনাথ বর্ষান্তে, শীতের প্রারম্ভেই নৈনীতাল আলুর চাষ করিবেন, মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম দেশে গিয়া এই আলুর চাষ দেখিয়া আসিয়া, নিজের দেশে প্রবর্ত্তিত করিবেন, অনেক দিন হইতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।...আলুর চাষের প্রণালী বিশেষরূপে জানা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, ভারতের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অন্যতম সহকারী ডিরেক্টর, তাঁহার অন্যতম সুহৃদ, বঙ্গের সুপরিচিত ব্যঙ্গ 'কবি' শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া শিলাইদহে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আলুর চাষের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি সমস্ত অবগত হইলেন।···লোকশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভেই আলুর চাষ আরম্ভ করিলেন। কলিকাতা এগ্রিকলচার আফিস হইতে আলুর চাষের উপযুক্ত 'বীজ' ও 'সার' আনয়ন করিয়া স্থানীয় কৃষকদিগকে আলুর ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত করতঃ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আলুর কৃষি-প্রণালী অর্থাৎ আলুর ক্ষেত্রকর্ষণ, সার দেওন, বীজ রোপণ, জলসেচন প্রভৃতির পদ্ধতি কর্ম্মক্ষেত্রেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন।...রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কৃষিক্ষেত্র মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া কৃষকদিগের আলুর চাষ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিল কি না, এক আধটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা অবগত হইতেন। আলুর গাছগুলি যথানিয়মে বর্দ্ধিত হইতেছে কি না, চাষের কার্য্য-প্রণালী-সিদ্ধ হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা এগ্রিকলচার অফিস হইতে

ইনস্পেক্টার লইয়া যাইতেন। আলুর চাষের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার পক্ষে তাঁহার যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম অসাধারণ। তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া এই বৎসর আলুর কৃষিতে লাভবান হইতে পারেন নাই। এগ্রিকলচার ডিপার্টমেন্টের অফিসারগণ বলেন, জলের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। যে পরিমাণ জল দেওয়া হইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ জল দেওয়া উচিত ছিল। আলুতে লাভ হয় নাই বটে—কিন্তু যে আলু জন্মিয়াছিল, তাহা নৈনীতাল আলু অপেক্ষা কথঞ্চিৎ আকারে বড়, এবং স্বাদও অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইয়াছিল। Land Records and Agriculture অফিস হইতে প্রকাশিত সন ১৮৯৯ সালের সাম্বৎসরিক রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথের আলুর চাষের উল্লেখ আছে।...

রবীন্দ্রনাথ আলুর চাষ বিস্তৃতির জন্য কলিকাতা এগ্রিকলচার অফিস হইতে আলুর বীজ আনয়ন করিয়া প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন, এবং আলুর কৃষিপ্রণালীর বিষয় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। তাঁহার একজন প্রজা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথমবারেই আলুর চাষ করিয়া লাভবান হইয়াছিল।[৩৩]

আলু-চাষের সূচনা ও তার পরিণতি কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের হলেও আমরা প্রসঙ্গটি এইখানেই আলোচনা করে নিচ্ছি। দ্বিজেন্দ্রলাল এ-ব্যাপারে কতখানি উৎসাহী হয়েছিলেন, তার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর 5 Sep [মঙ্গল ২০ ভাদ্র] তারিখের একটি চিঠি থেকে:

প্রিয়বরেষু/ কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না। ঠিক সময়ে বীজ ও সার পঁহুছিবে। আপনি ইত্যবসরে জমীতে চাষ দিবার বন্দোবস্ত করুন।...

আমি লায়ন সাহেবকে বলিয়াছি যে আপনি ২৫ একর জমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এবং একটা এইরো মোটর ক্রয় করিবার জন্য আমাকে বলিয়াছেন। তিনি আমার মত চাহিয়াছেন যে কি প্রকার ও কত দামের উক্ত যন্ত্র আপনার ফার্মে পাঠান উচিত। আমি তদবধারণার্থে ইহার মধ্যে একদিন উলুবেড়িয়া যাইব। সেখানে একটা উক্ত যন্ত্র আছে। তাহা দেখা আবশ্যক। বানর্জ্জি সাহেবও আমার সহিত যাইবেন। সেটা দেখিবার পূর্ব্বে আমি কোন মত না দেওয়ার সংকল্প করিছি। একটা কথা বলা ভালো যে আলিপুরের এইরোমোটরের দাম ৫০০্ এবং খাটানোর খরচ তদ[তি]রিক্ত ১৫০্। অতএব আমি ভুল বলিয়াছিলাম যে সর্ব্বশুদ্ধ খরচ ৫০০্। তাহাতে বড় যায় আসিবেনা বোধ হয়। আমেরিকা হইতে অনিবার খরচ আপাততঃ লাগে না। এইরোমোটর কোম্পানিকে এখনো লেখা হয় নাই। আপনার পত্র ও লায়নসাহেবের শেষ হুকুম পাইয়া তাহাকে লিখিব।...

পরীক্ষা কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে, আপনার বাটীর সম্মুখে পূর্ব্বনির্দিষ্ট জমি হইতে ধান কাটা হইয়া গেলে ২৫ একর মাপিয়া লইতে এবং তাহার বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রবিভাগ করিতে ওভার্সিয়ারকে পাঠাইব, ও আপনি ইচ্ছা করেন ত আমিও যাইব। ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রস্তাব এখনো লায়ন সাহেবকে দিই নাই। শিবপুরের কৃষিক্ষেত্রের ওভারসিয়রকে একটি প্ল্যান দিতে কহিয়াছি। তাহা পাইলে বানার্জ্জিসাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি সমীচীন প্রস্তাব লায়ন সাহেব সমক্ষে পেষ করিব। আপনি জমি নির্ব্বাচন করিবার ঠিক পূর্ব্বে আমাকে জানাইবেন সব ঠিক বন্দোবস্ত হইবে।

আলুর চাষ সম্বন্ধে যে পুস্তিকা পাইয়াছেন তদুনসারে জমি[তে] লাঙ্গলাদি দিতে আরম্ভ করুন ও জলসেচনের বন্দোবস্ত করুন। অক্টোবরের প্রথমেই বীজ বুনিতে হইবে। সার ও বীজ এই মাসের শেষে অর্থাৎ বীজ বুনিবার ঠিক পূর্ব্বে পাইবেন। নির্ব্বাচিত জমি যেন কাদা জমী না হয়। ও তাহা যেন আপনার বাটীর নিকট হয় যাহাতে সদা সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। এক একর ৪ সমান ভাগে অমরাগাছি আলুও সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করা যাবে। নৈনিতাল আলুর চেয়ে তার উৎপন্ন ফসল বেশী বোধ হয়। যাহা হউক দেখা যাইবে কোন রকম ফলে ভাল। ক্ষেত্র নিম্ন নক্সা মত বিভাগ করিবেন।[৩৪]

—এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল ছক কেটে 'বিনা সারে' ও 'সার দিয়া' নৈনিতাল ও অমরাগাছি আলু চাষ করার জন্য ক্ষেত্র বিভাগের পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন এবং বীজ ও সারের জন্য অগ্রিম ১০০্ টাকা পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। উপরে উদ্ধৃত দীর্ঘ পত্রটি থেকে এ-বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের আন্তরিকতা আমরা অনুভব করতে পারি। এরপর তিনি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে আরও চিঠিপত্র লিখেছেন ও কয়েকবার শিলাইদহে যাতায়াত করেছেন—কিন্তু তার হিসাব রক্ষিত হয় নি। 12 Mar 1900 [সোম ২৯ ফাল্গুন] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'কি বলেন? আপনাদের ওদিকে একবার যাব নাকি। আগামী সোমবার তাকাতাকি একবার কুষ্টিয়া অভিমুখে যাইবার অভিপ্রায় আছে। দেখে আসি আপনার আলু কেমন হোল?'[৩৪] পরের সোমবার তাঁর যাওয়া হয় নি, তিনি যান বুধবার 21 Mar [৮ চৈত্র] তারিখে। গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই হতাশ হয়েছিলেন, এত আয়োজন ও পরিশ্রম সত্ত্বেও আলুর ফলন আশানুরূপ হয় নি। রবীন্দ্রনাথ এই অব্যবসায় সম্পর্কে লিখেছেন:

শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্টারে যারা এগ্রিকালচারাল্ কলেজে পাস করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও

শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুন্ন রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্যে পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তাঁরও চেয়ে প্রবল অট্টহাস্য নীরবে ধ্বনিত হয়েছিল চামরু-নাম-ধারী এক-হাত-কাটা সেই রাজবংশী চাষির ঘরে, যে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল।'[৩৫]

জ্যৈষ্ঠের শেষে শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ প্রায় এক মাস সেখানে কাটান। এর অধিকাংশই কেটেছে ঠাকুর কোম্পানির দেনা মেটানোর জন্য অর্থচিন্তায়। এই সময় প্রিয়নাথ সেনকে লেখা তাঁর সাতটি চিঠিতেই প্রসঙ্গটি আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে কলকাতায় থাকার সময়ে এ-বিষয়ে প্রিয়নাথের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শুরু হয়েছিল। চঞ্চলের [চাঁচলের] রাজার কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনার কথা প্রিয়নাথ জানিয়েছিলেন। এই প্রস্তাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য তাঁর কয়েকটি পত্রেই ব্যক্ত হয়েছে। ৪ আষাঢ় তিনি প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'আজ সুরেন লিখিয়াছেন—ঘোষকররা ২০০০০্ টাকা সাত পার্সেন্ট সুদে আমার বাড়ি রাখিয়া ধার দিতে প্রস্তুত—৬ মাসের করারে দিতে পারেন।...ইতিমধ্যে এ টাকাটা লইয়া, পরে তোমার প্রস্তাবিত সেই টাকায় তাহা উদ্ধার করিয়া লওয়া কি শ্রেয় বিবেচনা কর?'[৩৬] অর্থচিন্তায় বিভ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ পত্রটিতে 'শ্রীপ্রিয়নাথ সেন' স্বাক্ষর করেন। প্রিয়নাথ নিশ্চয়ই এ নিয়ে ঠাট্টা করেছিলেন, প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ ৭ আষাঢ়ে লেখেন: 'যেরূপ গোলমালের মধ্যে আছি তাহাতে স্বাক্ষরের স্থলে তোমার নাম লিখিয়া ঠিকানায় যে আমার নাম লিখি নাই ইহাই আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করি।'[৩৭] ঠাকুর কোম্পানির সংকটের মীমাংসার জন্য সুরেন্দ্রনাথও শিলাইদহে যাতায়াত করছেন রবীন্দ্রনাথের পত্রে সে খবরও আছে।

২৩ আষাঢ় [শুক্র 7 Jul] তিনি শিলাইদহ থেকে কালিগ্রাম পরগণার পুণ্যাহে যোগ দেওয়ার জন্য যাত্রা করেন। ২১ আষাঢ় [বুধ 5 Jul] তিনি প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'আমি পশু দিন আমাদের কালিগ্রাম পরগনার পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে এখান থেকে রওনা হয়ে সেই দেশে যাত্রা করব। তার পর ২৬।২৭শে নাগাদ কলকাতা অঞ্চলে দুই একদিনের জন্য পদার্পণ করবার সঙ্কল্প আছে।'[৩৮] রবীন্দ্রনাথ ২৬ আষাঢ় [সোম 10 Jul]ই কলকাতায় আসেন, কিন্তু দুই একদিনের পরিবর্তে সেখানে অবস্থান করেন অন্তত ১০ শ্রাবণ [মঙ্গল 25 Jul] পর্যন্ত দুই সপ্তাহেরও উপর।

ঋণ সংগ্রহের জন্য প্রিয়নাথের সহযোগিতা রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন ছিল, তাই কলকাতায় আসার পরের দু'দিন ২৭ ও ২৮ আষাঢ় তাঁকে নিমতলা স্ট্রীটে যাতায়াত করতে দেখা যায়। শেষোক্ত দিন রাজাবাগানেও যান সম্ভবত জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য—তিনি তখন ৮৫ নং আপার সার্কুলার রোডে বাস করছেন। ৩১ আষাঢ় তাঁর 'সুখিয়া স্ট্রীট' যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছে যাওয়া এর উদ্দেশ্য হতে পারে। ৩ শ্রাবণ [মঙ্গল 18 Jul]ও তিনি সুকিয়া স্ট্রীটে গিয়েছেন, ৯ শ্রাবণ [সোম 24 Jul] যান 'নিমতলা হইতে সুখর [সুকিয়া'স] স্ট্রীট'। এই দিন তিনি বিডন স্ট্রীটেও যান; আর যান হাইকোর্টে, দুপুরে সেখানে তাঁকে হোটেলে খেতে হয়েছিল—এই হিসাবটি সরকারী ক্যাশবহির।

এছাড়া তিনি বালিগঞ্জ গিয়েছেন ৩ ও ৮ শ্রাবণ, ৪.শ্রাবণ 'ম্রেজাপুর' [মির্জাপুর স্ট্রীট] এবং ৭ শ্রাবণ [শনি 22 Jul] 'কাঁশারী পাড়া'—বালিগঞ্জে যাওয়ার কারণ আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু অপর দু'জায়গায় কি উদ্দেশ্যে যাতায়াত তা অনুমান করার মতো তথ্যও দুর্লভ।

এই সময়ে তাঁর কয়েকটি পত্র পাঠানোর হিসাবও আছে তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে—৪ শ্রাবণ 'সিলাইদহায় ২ খান ও আগরায় ১ খান', ১০ শ্রাবণ চিঠি পাঠানো হয় 'নীতুবাবুকে ও পূর্ণিয়ায়'—এর মধ্যে কোনো চিঠিই পাওয়া যায় নি।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কন্যা উমার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বসুর বিবাহ হয় শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি—'বাবু অক্ষয়কুমার [চন্দ্র] চৌধুরির কন্যার বিবাহের আইবড় ভাত' উপলক্ষে ২৯ টাকা দিয়ে একখানি বেনারসী শাড়ি [!] পাঠানো হয় ১২ শ্রাবণ [বৃহ 27 Jul] তারিখে। এই পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু সম্ভবত শমীন্দ্রনাথের অসুস্থতার কথা জেনে তাঁকে শিলাইদহ চলে যেতে হয়। ১২ শ্রাবণ তারিখেই তিনি প্রিয়নাথকে লেখেন: 'এখানকার খবর ভাল। ভাগ্যক্রমে আমার ছোট ছেলেটি জ্বর থেকে উঠেছে। গ্রামে চতুর্দ্দিকেই খুব জ্বর চল্‌চে।'[৩৯]

চোখের বালি উপন্যাস লেখা আগেই শুরু হয়েছিল, কলকাতায় যাওয়ায় তাতে বাধা পড়েছিল, শিলাইদহে ফিরে আবার সেটি লিখতে আরম্ভ করেন সেকথা কৌতুকের ভঙ্গিতে প্রিয়নাথ সেনকে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৬ শ্রাবণের [সোম 31 Jul] পত্রে: 'বিনোদিনীর খবর ভাল। গোলেমালে দিনকতক তার কাছ থেকে ছুটি নিতে হয়েছিল গতকল্য থেকে আবার নিয়মিত হাজ্‌রি দিচ্চি। পত্রের এই অংশটুকু যদি তুমি কারো কাছে প্রকাশ কর তাহলে আমার সম্বন্ধে দ্বিতীয় আর একটি উপন্যাসের সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।'[৪০]

এই পত্রেই তিনি লিখেছেন: 'কলকাতায় আমাদের একটা গুরুতর বৈষয়িক ব্যাপার চল্‌চে—সেজন্যে হঠাৎ কখন্ আমার কলকাতায় ডাক পড়ে তার ঠিকানা নেই'—এই 'বৈষয়িক ব্যাপার'টি হল দেবেন্দ্রনাথের 'Last Will and Testament'-সম্পাদন। এজমালি সম্পত্তি বিভাগের জন্য গগনেন্দ্রনাথদের সঙ্গে তাঁর আপোষ-মামলা শুরু হয় 1897-এ—এই মামলায় ইউসুফশাহী পরগণার অন্তর্গত জমিদারি [সদর সাজাদপুর] ও কয়েকটি ছোটো তালুক গগনেন্দ্রনাথ-প্রমুখ তিন ভাইয়ের অধিকারে আসে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি ও জমিও ভাগ হয়—বৈঠকখানা বাড়ি নামে কথিত বাড়িটি ও সংলগ্ন জমির অধিকারী হন তাঁরা। এইভাবে সম্পত্তি সুনির্দ্দিষ্টভাবে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেবার পর দেবেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব অংশটির বিলি-ব্যবস্থা করেন উক্ত উইলের মাধ্যমে। তিনি ইতিপূর্বে উইল করেছিলেন দু'বার—একটি ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬ [8 Jun 1869] ও অপরটি আশ্বিন ১২৯৭ [Sep 1890]-তে [দ্র রবিজীবনী ৩। ১৭১] স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু তখনও এজমালি সম্পত্তি যথাযথভাবে বিভক্ত হয় নি, সুতরাং উইল সম্পাদনে কিছু অস্পষ্টতা অনিবার্য ছিল। কিন্তু এখন সেই অস্পষ্টতা অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হয়েছে। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বার্থের দিক থেকেও এই বৈষয়িক ব্যাপার 'গুরুতর' ছিল।

উক্ত পত্র লেখার কয়েক দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন—২২ শ্রাবণ [রবি 6 Aug] তাঁর 'চৌরঙ্গি হইতে আসার' হিসাব পাওয়া যায়। এই যাত্রায় তিনি দেড় মাসের কিছু কম সময় কলকাতায় অতিবাহিত করেন। এর অনেকটা অংশই কেটেছে পিতার উইলের ব্যাপারে ব্যারিস্টার-অ্যাটর্নির সঙ্গে আলোচনায় ও হাইকোর্ট যাতায়াতে। অবশ্য এর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনও ছিল।

২৪ শ্রাবণ [মঙ্গল 8 Aug] তিনি 'মাণিকতলা ও ম্রেজাপুর [মির্জাপুর স্ট্রীট]' যান, একটি পত্র লেখেন ত্রিপুরাতে।

২৬ শ্রাবণ [বৃহ 10 Aug] যান সার্কুলার রোডে জগদীশচন্দ্রের বাড়ি, পত্র লিখেছেন জনৈক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় [?] ও 'হরিশ নেউগী'কে। এই হরিশ নেউগী সম্ভবত কবি হরিশচন্দ্র নিয়োগী [1854-1930], যাঁর 'দুঃখসঙ্গিনী' [1875] কাব্য রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রথম কাব্য-সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধের [জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, কার্তিক ১২৮৩। ৫৪৩-৫০] অন্যতম আলোচ্য ছিল। বয়সে বড়ো এই কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল, মজুমদার পুঁথি-র একটি পৃষ্ঠায় লিখিত নিমন্ত্রিতের তালিকায় এঁর নাম আছে—নামটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেটে দেওয়া হয়।

২৭ শ্রাবণ [শুক্র 11 Aug] তিনি বালিগঞ্জে গিয়েছিলেন; এই দিন তিনি লোকেন পালিতকে একটি টেলিগ্রাম করেন, পরদিন লেখেন একটি চিঠি। সুরেন্দ্রনাথ সম্ভবত ঋণসংগ্রহের জন্য খুলনায় যান, হয়তো সেই খবরই খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট লোকেন্দ্রনাথকে জানানো হয়। খুলনায় সুরেন্দ্রনাথকেও একটি টেলিগ্রাম করা হয় ১ ভাদ্র—এর খরচ অবশ্য সরকারী ক্যাশ থেকে দেওয়া হয়েছে।

সরকারী খরচেই রবীন্দ্রনাথ ২৮ শ্রাবণ [শনি 12 Aug] 'ঠনঠনে মোহিনীবাবুর বাটী যাতায়াত' করেন। দেবেন্দ্রনাথের শেষ উইল প্রস্তুতে মোহিনীমোহনের একটি গুরুতর ভূমিকা ছিল—হয়তো এই বিষয়ে আলোচনার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। ৩০ শ্রাবণ [সোম 14 Aug] তিনি বালিগঞ্জে তারকনাথ পালিতের বাড়ি যান, চিঠি লেখেন শিলাইদহে ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে।

ইতিমধ্যে বলেন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয় নি—অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী এই ত্রিবিধ চিকিৎসাপদ্ধতি তাঁর আরোগ্যের জন্য প্রযুক্ত হয়েছিল। ক্যাশবহিতে দেখা যায় ডাঃ হ্যারিস, ডাঃ স্যাণ্ডার্স, ডাঃ সালাজার, ডাঃ অঘোরনাথ ভাদুড়ি, ডাঃ উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিপিনচন্দ্র কোঙার, ডাঃ কেদারনাথ দাস, ডাঃ প্রতাপ মজুমদার, কবিরাজ বিজয়রতন সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট চিকিৎসক বিভিন্ন সময়ে বলেন্দ্রনাথের চিকিৎসা করেছেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে ৩ ভাদ্র [শনি 19 Aug]ভোরে ২৯ বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মা প্রফুল্লময়ী দেবী লিখেছেন:

> যেদিন সে জন্মের মত আমাকে তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া চলিয়া গেল, সেইদিন রবি (আমার ছোট দেওর) আসিয়া আমাকে বলিলেন তুমি একবার তার কাছে যাও, সে তোমাকে মা মা করিয়া ডাকিতেছে। আমি এক এক সময় তাহার যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। রবির কথা শুনিয়া যখন তার কাছে গিয়া তার পাশে বসিলাম তখন তার সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনে হইল আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, তাহার পর একবার বমি করিয়া সব শেষ হইয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। সূর্যদেব ধীরে ধীরে তাঁহার কিরণচ্ছটায় পৃথিবীকে সজীব করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় তাহার দীপ নিভিয়া গেল।[৩৯]

সুদর্শন সুসাহিত্যিক এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ খুবই ভালোবাসতেন। তিনি লিখেছেন: 'বলেন্দ্রনাথ কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার বিষয় প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন।'[৪০] শুধু আলোচনা নয়, বলেন্দ্রনাথের রচনা তিনি সংশোধন-পরিবর্ধনও করতেন 'পশুপ্রীতি' প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে[৪১] তার উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের নোটের উপর ভিত্তি করেই বলেন্দ্রনাথ তাঁর উড়িষ্যা-সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি [দ্র রবিজীবনী ৩। ২৫৩]। সুতরাং বলেন্দ্রনাথের এই অকালমৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে তা সহজেই বোঝা যায়। তিনি মৃণালিনী দেবীরও প্রিয়পাত্র ছিলেন, কাজেই তাঁর ব্যথাও কম নয়। মাধুরীলতা একটি চিঠিতে*

লিখেছেন: 'বলুদাদা কেমন আছেন? মা দিন চার পাঁচ থেকে কেঁদে কেটে অস্থির। নাওয়া খাওয়া একরকম বন্ধ করেছেন। মামা বোঝাচ্ছেন যে শুধু দুর্বল থাকলে কোন ভয়ের কারণ নেই। আজ তোমার চিঠি পেয়ে চুপ করে রয়েছেন।'[৪২] রবীন্দ্রনাথও একটি তারিখহীন পত্রে [? ৩ ভাদ্র] প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন: 'বলুর মৃত্যু হইয়াছে।/ কলিকাতায় থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। বিশেষতঃ আমার স্ত্রী শিলাইদহে অত্যন্ত শোক অনুভব করিতেছেন, বলুর প্রতি তাঁহার একান্ত স্নেহ ছিল।'[৪৩]

এই অবস্থায় তাঁর শিলাইদহে ফিরে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হলেও 'বিষয়জালের কর্ম্মফাঁস' তাঁকে আরো প্রায় একমাস কলকাতাতেই আবদ্ধ করে রেখেছে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কোম্পানির অন্যতম অংশীদার ছিলেন, তাঁর অবর্তমানে সম্পূর্ণ ঋণের বোঝা রবীন্দ্রনাথকেই বহন করতে হয়েছে—উপরে উল্লিখিত পত্র ও আরো একটি পত্রে তিনি ঋণসংগ্রহের জন্য প্রিয়নাথকে তাগিদ দিয়েছেন। অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত ঋণটি পাওয়া গেছে ৯ ভাদ্র [শুক্র 25 Aug] তারিখে; তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে জমা ও খরচ খাতে যথাক্রমে লেখা হয়েছে: 'মা° মোতিচাঁদ নাখতার/ দং উহার নিকট শতকরা বার্ষিক ৭ টাকা হিসাবে সুদ দিবার করারের কর্জ্জ লওয়া যায় ৪০০০০৲' ও '২৫ আগষ্ট ৯ ভাদ্র ব° ঠাকুর কোম্পানী দং উক্ত কোম্পানীকে ঐ ২৫ আগষ্ট ১৮৯৯ সাল তারিখে শতকরা ৭ টাকা হিসাবে সুদ পাওয়ার করারে কর্জ দেওয়া যায় ৪০০০০৲।' ঠাকুর কোম্পানির অপর এক মহাজন সত্যপ্রসাদ কোম্পানির অব্যবস্থা দেখে হয়তো টাকা ফেলে রাখতে আর সাহস পান নি, তাঁর হিসাব খাতায় ১৭ আশ্বিন [মঙ্গল 3 Oct] হিসাব লিখেছেন: 'Tagore & Coকে ১৩০৩ সালের ৯ই আষাঢ় ৪০০০৲ এবং ঐ সালের ১৮ই শ্রাবণ ৬০০০৲ =মোট ১০০০০৲ টাকা যাহা হাওলাত দেওয়া যায় তাহা আদায়'। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন কারণে আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম তিনি অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে বিপুল অর্থ ঋণ গ্রহণ করলেন, এই ধার তাঁকে শোধ করতে হয়েছে তারকনাথ পালিতের টাকায়—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তরিত সেই ঋণ তিনি শোধ করেন নোবেল প্রাইজ থেকে প্রাপ্ত অর্থে। কিন্তু তার পরেও ঋণ করা ও শোধ দেওয়ার ভাবনা থেকে তিনি অব্যাহতি পান নি।

ঋণের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে বলেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধের আগের দিন [১২ ভাদ্র সোম 28 Aug] স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে: 'নবোঠানের এক ছেলে, সংসারের একমাত্র বন্ধন নষ্ট হয়েছে। তবু তিনি টাকাকড়ি কেনাবেচা নিয়ে দিনরাত্রি যে রকম ব্যাপৃত হয়ে আছেন তাই দেখে সকলেই আশ্চর্য্য এবং বিরক্ত হয়ে গেছে—কিন্তু আমি মনুষ্যচরিত্রের বৈচিত্র্য আলোচনা করে সেটা শান্তভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করচি—এক এক সময় ধিক্কার হয়।'[৪৪] মনে হয়, বৈষয়িক চিন্তায় বিব্রত রবীন্দ্রনাথ এখানে মানবিক সহানুভূতি হারিয়ে প্রফুল্লময়ী দেবীর উপর কিছুটা অবিচার করেছেন। উন্মাদ স্বামীকে নিয়ে কষ্ট-পাওয়া এই গৃহবধূর একটিমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিল পুত্র বলেন্দ্রনাথ। চিররুগ্ন এই সন্তানটিকে নিয়েও তাঁর উদ্বেগের অবধি ছিল না। আদি ব্রাহ্মসমাজ-আর্যসমাজের মিলনের এবং ঠাকুর-কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্যের অর্থহীন প্রয়াসে যখন প্রফুল্লময়ীর সেই একমাত্র অবলম্বন অকালে ঝরে গেল, তখন প্রবল শোকের মধ্যেও উন্মাদ স্বামী, বিধবা অল্পবয়স্কা পুত্রবধূ ও নিজের স্বার্থরক্ষার জান্তব প্রয়োজনে বৈষয়িক হয়ে ওঠা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর ফলে দেবেন্দ্রনাথের শেষ উইলে বীরেন্দ্রনাথ সম্পত্তির অধিকার থেকে

বঞ্চিত হন ও তাঁর পরিবারের জন্য মাথাপিছু মাত্র ১০০ টাকা মাসোহারা নির্দিষ্ট হয় এবং মহর্ষির মৃত্যুর পর এই মাসোহারা পাওয়া গিয়েছে অবিবেচক ট্রাস্টীদের হাত থেকে, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন!

দেবেন্দ্রনাথের Last will and Testament স্বাক্ষরিত হয় ২৩ ভাদ্র [শুক্র 8 Sep] তারিখে ও তার পরিশিষ্ট Codicil স্বাক্ষরিত হয় ১ আশ্বিন [রবি 17 Sep]। এই উইলের executor হন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ। এইজন্য এই পুরো সময়টিতেই রবীন্দ্রনাথকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইতিপূর্বে ১ ভাদ্র তাঁর হাইকোর্ট যাওয়ার কথা আমরা উল্লেখ করেছি—এরপরেও তিনি হাইকোর্টে যাতায়াত করেন ৮, ১৩, ১৭, ২০, ২২, ২৩ ভাদ্র তারিখে; অ্যাটর্নি মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি বা অফিসে যান ১৫, ১৮, ২০, ২১ ও ২২ ভাদ্র তারিখে—কোনো-কোনো দিন দ্বিপেন্দ্রনাথ বা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গী হন; বসতবাড়ি ও জমি বিভাগের নকশা প্রস্তুতের জন্য ইঞ্জিনিয়ার প্রসন্নকুমার সেনের বাড়ি তাঁকে তিনবার যেতে হয় ২০ ভাদ্র তারিখে—৫্ টাকা পারিশ্রমিকে নকশাটি এঁকে দেন তাঁর বাল্যবন্ধু চিত্রশিল্পী হরিশ্চন্দ্র হালদার [হ. চ. হ.]।

কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি বাল্যবন্ধু অক্ষয়কুমার মিত্র, কেদার লাহিড়ি, চন্দ্রশেখর সেন, কুমার কমলানন্দ সিং (পুরুলিয়া), লরেন্স, ফটিকবাবুর স্ত্রী, ত্রিপুরায়, দেওঘরে ও শিলাইদহে অনেকগুলি চিঠি লেখেন —তার মধ্যে মৃণালিনী দেবীকে লেখা একটি ছাড়া আর কোনো পত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নি; আর প্রিয়নাথ সেনকে লেখা যে-ক'টি পত্র পাওয়া গেছে, ক্যাশবহিতে সেগুলি পাঠাবার খরচের উল্লেখ নেই।

ত্রিপুরায় যে পত্রটি প্রেরিত হয়েছিল সেটি মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত বলে জানা যায় ২ আশ্বিন [সোম 18 Sep] আগরতলা থেকে লেখা তাঁর পত্রে: 'আপনার ২ খানা পত্রই পাইয়াছি। দ্বারজিলিংএ আপনাকে পাইবেন যানিয়া মহারাজ বড় আনন্দীত হইয়াছেন। আমরা ২ টা বাড়ী নিয়াছি Woodvine Villa এবং Lounge. ৭ই চাঁটগাঁয় মেইলে কুষ্টিয়া হইয়া ৮ই দ্বারজিলিং পৌঁছিব। ৬ই বাড়ী ছাড়িব। কোথায় কোন সময় আপনাকে আমরা দেখিব?'[৪৫] একই দিনে রাধাকিশোর তাঁকে লেখেন: 'শ্রীমান্ মহিমের পত্রে আপনার দার্জ্জিলিং যাওয়ার সংবাদে প্রীত হইলাম। বিখ্যাত হিমালয়ে আপনাকে পাইলে তথাকার কয়েকদিনের বাস আমার পক্ষে যে কত সুখের হইবে বলিতে পারি না। কলিকাতার নানা অন্তরায় উচ্চ হিমশৃঙ্গে না থাকারই কথা।'[৪৬]

এই ভ্রমণ সম্ভব হয় নি, দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত লিখেছেন: 'মহারাজের এবারের প্রবাসযাত্রায় গোয়ালন্দের পথে বিষম ঝড়ের কারণে পথের প্রোগ্রাম বিপর্য্যস্ত হয়।'[৪৭] ১৪ বৈশাখ ১৩০৭-এ লিখিত এক পত্রে মহারাজ আবার দার্জিলিং যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এই যাত্রার কথা স্মরণ করে লিখেছেন: 'ভয়, পাছে সেবারকার মত পথে বিচিকিচ্ছে বাধা না পাই!'[৪৮]

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ৩ আশ্বিন [মঙ্গল 19 Sep] শিলাইদহে ফিরে যান। প্রিয়নাথ সেনেরও সেখানে যাবার কথা ছিল। পরদিন তাঁকে লিখেছেন: 'আমি যথাসময়ে যথাক্রমে কুষ্টিয়া ও শিলাইদহে আসিয়া দেখিলাম আপনার জন্য বিবিধ আহারাদি ও যানবাহনের আয়োজন রহিয়াছে।'[৪৯] প্রিয়নাথকে শিলাইদহে নিয়ে আসবার জন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু তাঁকে 'মথুর সেনের কুঞ্জপথ' থেকে নড়ানো তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। এই সময়ে লিখিত অনেকগুলি পত্রেই আহ্বান ও নিরাশা ব্যক্ত হয়েছে।

শিলাইদহ গৃহবিদ্যালয়ের অগ্রগতির একটি বর্ণনা আছে মাধুরীলতার পূর্বোক্ত চিঠিতে: '..."শকুন্তলার" তর্জ্জমা ভাল এগোচ্ছে না। অতীত ক্রিয়া ভাল করে না জানাতে অনেকক্ষণ "ব্যাকরণকৌমুদী" ঘাঁটতে হয়। রথী জব্বরের কাছে লাঠি খেলে। আমি ওর সঙ্গে রবিবারে ব্রাহ্মধর্ম পড়ি। রাণী কতকগুল রূপকথা লিখছে। অবিশ্যি স্বরচিত নয়। মীরা পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে "ক, খ, গ" পড়্ছে। শমীবাবু বড় বেশী পরের দিকে নজর রেখে কাজ করেন। তিনি "18" অবধি গুণ্‌তে শিখেছেন, এবং রোজ একখানি চিঠি লেখেন।'[৫০] রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন পরে শিলাইদহে ফিরে পুত্রকন্যার শিক্ষার দিকে নজর দেন। এই সময়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্ররোচনায় কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌' পাঠ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুসারে বইটির প্রকাশকাল 18 Oct [২ কার্তিক] হলেও ক্যাশবহির হিসাবে ১৭ আশ্বিন [মঙ্গল 3 Oct] 'শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দেওয়া শকুন্তলা বই ২ খান সিলাইদহায় পাঠান' হয়। এইদিন রবীন্দ্রনাথের জন্য 'মনুসংহিতা' ও 'বিষ্ণুপুরাণ' কেনা হয়। সুতরাং শিলাইদহে সংস্কৃত চর্চা ভালোই চলছিল। তিনি প্রিয়নাথকেও সেই কথা লিখেছেন: 'আমি ছেলেদের সংস্কৃত পড়া লইয়া ব্যস্ত আছি বলিয়া বিনোদিনীর প্রতি হস্তক্ষেপ মাত্র করিতে পারি নাই।'[৫১]

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর অবস্থান্তর ঘটেছে। প্রিয়নাথকে লিখছেন: 'আমার স্কন্ধে কবিতার পুরাতন জ্বর হঠাৎ চাপিয়াছে তাই বিনোদিনী উপেক্ষিতা।'[৫২] এই জ্বরের সূত্রপাত ১৮ আশ্বিন [বুধ 4 Oct], এইদিন তিনি ড রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সংকলিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* [1882]-এর অন্তর্গত অবদানশতক-এর ৫৪-সংখ্যক কাহিনী [p. 33] অবলম্বনে 'পূজারিণী' [দ্র কথা ৭। ২৪-২৭] কবিতাটি রচনা করেন। ১৩ জ্যৈষ্ঠ [26 May] তিনি জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন: 'কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে—যেমন করিয়া হৌক্‌ তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে'—সেই কাজ এতদিন পরে শুরু হল।

'পূজারিণী'-র মূল কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত:

ভগবান [বুদ্ধের] কাছ থেকে সত্যজ্ঞান লাভ করে রাজা বিম্বিসার তাঁর অন্তঃপুরের মধ্যে প্রভুর নখ ও চুলের উপর একটি বিরাট স্তূপ নির্মাণ করেন, এবং প্রত্যহ তাঁর অন্তঃপুরিকারা স্থানটি পরিমার্জনা করত। যখন অজাতশত্রু পিতৃহত্যা দ্বারা সিংহাসন লাভ করলেন, তিনি পুরনারীদের আদেশ দিলেন যে স্তূপ-পরিমার্জনার শাস্তি মৃত্যু। দাসী শ্রীমতী নিজের জীবন তুচ্ছ করে সযত্নে স্তূপটি ধুয়ে প্রদীপমালায় উজ্জ্বল করে তুলল। রাজা অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন। তার মৃত্যুর পর দেবপুত্রী রূপে সে বেণুকুঞ্জে প্রভুর সামনে উপস্থিত হল এবং "জ্ঞানবজ্রের দ্বারা মানবের পর্বতপ্রমাণ দুঃখ দূর করে" ["clearing the mountain of human misery by the thunderbolt of knowledge"] সর্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ করল। [অনুবাদ]

এই অত্যন্ত সরল কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র মানসিকতার আরও তিনটি নারীর প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষে নাটকীয় করে তুলেছেন। কাহিনীর নাট্যসম্ভাবনাটি আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে পরবর্তীকালে রচিত 'নটীর পূজা' [১৩৩২] নাটিকাটিতে।

১৯ আশ্বিন [বৃহ 5 Oct] রচিত হল 'অভিসার' [দ্র কথা ৭। ২৮-৩১] বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা-র অন্তর্গত ৭২-সংখ্যক কাহিনী 'উপগুপ্ত অবদান' [p. 67] অবলম্বনে। এর মূল কাহিনীটি হল:

উপগুপ্তের পিতা মথুরার গুপ্ত ইচ্ছা করেছিলেন যে তিনি যেন শোনবাসীর শিষ্য হন। শোনবাসীর প্রতি উপগুপ্তের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বারবণিতা বাসবদত্তা উপগুপ্তের সৌন্দর্য দেখে তাঁকে কামনা করে আহ্বান জানাল। উপগুপ্ত বললেন, "বারবণিতার কাছে যাওয়ার এখন উপযুক্ত সময় নয়। সময় হলেই আমি যাব।" কিছুদিন পরে বাসবদত্তা তার এক প্রণয়ীর প্ররোচনায় অপর এক প্রণয়ীকে বিষপ্রয়োগ করল। তার শাস্তি হল যন্ত্রণাদায়ক

মৃত্যু। ঘাতক তার নাক, কান ও চুল কেটে দিল এবং বস্ত্রাদি খুলে নিল। একজন বারবণিতার কাছে যাওয়ার উপযুক্ত সময় হয়েছে ভেবে উপগুপ্ত বাসবদত্তার সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং নিজের ধর্ম সম্পর্কে তাকে উপদেশ দিলেন, যা তাকে গভীর সান্ত্বনা দিল। [অনুবাদ]

রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা ও নাক-কান-কাটা শাস্তির বীভৎসতা থেকে মুক্ত করে বর্ষাভিসার ও বসন্তাভিসারের বৈপরীত্যে নাটকীয় রূপ দান করেছেন।

কয়েকদিন পরে ২৩ আশ্বিন [সোম 9 Oct] রবীন্দ্রনাথ মহাবস্তুবদান-এর অন্তর্গত শ্যামা ও বজ্রসেনের কাহিনী [p. 135] অবলম্বনে লিখলেন 'পরিশোধ' [দ্র কথা ৭। ৩১-৪০] কবিতা। এর মূল কাহিনীটি হল:

কেন বুদ্ধ তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী যশোধরাকে ত্যাগ করেছিলেন তার কারণ নিম্নলিখিত কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে।

অতীতকালে বজ্রসেন নামে তক্ষশীলার এক অশ্ববিক্রেতা ছিল; বারাণসীর মেলায় যাবার পথে তার ঘোড়াগুলি চুরি হয়ে গেল ও সে নিজেও গুরুতর আহত হল। বারাণসীর উপকণ্ঠে যখন সে একটি পরিত্যক্ত গৃহে নিদ্রিত ছিল, তখন সে চোর সন্দেহে প্রহরীগণ কর্তৃক ধৃত হল। তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হল। কিন্তু তার পুরুষোচিত সৌন্দর্য বারাণসীর সর্বশ্রেষ্ঠা বারনারী শ্যামাকে আকর্ষণ করল। সে পুরুষটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল এবং তার এক সহচরীকে অনুরোধ করল যে-কোনো ভাবেই হোক তাকে উদ্ধার করতে। ঘাতকদের প্রচুর পরিমাণ অর্থে বশীভূত করে সে বজ্রসেনকে মুক্ত এবং শ্যামার প্রতি অনুরক্ত এক বণিকপুত্রের উপর রাজদণ্ড প্রয়োগে প্ররোচিত করতে সক্ষম হল। শেষোক্ত ব্যক্তি তার ভাগ্য না জেনে বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হল ও ঘাতকদের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হল।

সেই রমণী [শ্যামা] বজ্রসেনের প্রতি যথার্থই অনুরক্তা ছিল। কিন্তু বণিকপুত্রের প্রতি তার অমানুষিক আচরণ বজ্রসেনের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। এইরূপ পাপাচারিণীর সঙ্গে প্রেমসম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার চিন্তাকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। একবার যখন তারা নৌভ্রমণে বহির্গত হল বজ্রসেন তাকে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করাল এবং যখন সে প্রায় অচৈতন্য তখন তার শ্বাসরুদ্ধ করে জলে ডুবিয়ে দিল। যখন বজ্রসেনের মনে হল শ্যামা মরে গেছে তখন তাকে ঘাটের সিঁড়ির উপর টেনে এনে সেই অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে পলায়ন করল। শ্যামার মা, যে কাছেই ছিল, তাকে বাঁচাতে এগিয়ে এল এবং অনেক চেষ্টায় তাকে বাঁচিয়ে তুলল। সুস্থ হয়ে শ্যামার প্রথম কাজ হল তক্ষশীলার এক ভিক্ষুণীকে খুঁজে বের করা, যার মারফৎ সে বজ্রসেনকে আহ্বান জানাল তার প্রেমালিঙ্গনে ধরা দিতে। বুদ্ধই হচ্ছেন সেই বজ্রসেন ও শ্যামাই যশোধরা। [অনুবাদ]*

বুদ্ধদেবের পক্ষে অগৌরবজনক এই স্থূল নিষ্ঠুর কাহিনী রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার নৈপুণ্যে মনস্তাত্ত্বিক ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ একটি ট্র্যাজিক প্রেমগাথা হয়ে উঠেছে। তিনি পরে এই কবিতাটি অবলম্বনে 'পরিশোধ' নাট্যগীতি [১৩৪৩] ও নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' [১৩৪৫] রচনা করেন।

পরের দিন ২৪ আশ্বিন [মঙ্গল 10 Oct] রবীন্দ্রনাথ আকস্মিকভাবে পৌরাণিক যুগ থেকে বাস্তবজগতে অবতীর্ণ হলেন 'বিসর্জন' [দ্র কাহিনী ৭। ১১১-১৫] কবিতা লিখে। কবিতাটি 'দেবতার গ্রাস'কে স্মরণ করিয়ে দেয় একই ধরনের অন্ধভক্তি-সংস্কার-জাত করুণ পরিণতির সাদৃশ্যে, কিন্তু নিছক বিবৃতি-ধর্মিতার জন্য 'দেবতার গ্রাস'-এর তীব্র নাটকীয় আবেদনের অভাব দেখা যায় এখানে।

২৫ আশ্বিনেই [বুধ 11 Oct] রবীন্দ্রনাথ আবার বৌদ্ধকাহিনীর জগতে প্রত্যাবর্তন করেছেন দিব্যাবদানমালা-র অন্তর্গত দশম কাহিনী 'Story of Syámaváti' [pp. 313-14] অবলম্বনে 'সামান্য ক্ষতি' [দ্র কথা ৭। ৪০-৪৪] রচনা করে। মূল কাহিনীটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, কিন্তু তার প্রথমাংশের সঙ্গে কবিতাটির কোনো যোগ নেই বলে আমরা কেবল প্রাসঙ্গিক অংশটি অনুবাদ করে দিচ্ছি:

···[রাজা] উদয়ন ভগবানের কাছে এই পাঁচশত স্ত্রীর ইতিহাস জানতে চাইলে ভগবান বলেন, পূর্বে কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্তের পাঁচশত স্ত্রী ছিল। একদিন মহিষীরা আমোদপ্রমোদের জন্য একটি উদ্যানে গিয়েছিল। নিকটবর্তী একটি নদীতে স্নান করার পর তারা শৈত্য বোধ করল, এবং প্রধানা মহিষী তীরবর্তী এক কুটীর দেখে তাঁর এক দাসীকে তাতে অগ্নিসংযোগ করতে বললেন, যাতে তিনি নিজেকে উত্তপ্ত করার জন্য যথেষ্ট আগুন পেতে পারেন। দাসী জানাল যে কুটীরটি একজন ঋষির। কিন্তু রানী সে কথা গ্রাহ্য করলেন না ও তাঁর আদেশ পালন করার জন্য চাপ দিতে লাগলেন, অন্য মহিষীরাও তাঁকে সমর্থন করল। যথানির্দেশ কুটীরটিতে আগুন লাগানো হল। কুটীর থেকে বহির্গত হয়ে ঋষি আকাশে উঠে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু সকলে প্রার্থনা করল তারা যেন তাদের পাপের জন্য উপযুক্ত শাস্তি পায়, কিন্তু পরে যেন পরম জ্ঞান লাভ করে।

শৈত্যনিবারণের জন্য রাজমহিষীর কুটীরে অগ্নিসংযোগ করা ছাড়া মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে 'সামান্য ক্ষতি' কবিতার আর-কোনো সাদৃশ্য নেই—কিন্তু এইটুকু বীজ অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ প্রচারধর্মী জাতক-কাহিনীকে মানবধর্মী কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন।

২৬ আশ্বিন [বৃহ 11 Oct] অবদানশতক-এর ষষ্ঠ কাহিনী [p. 20] অবলম্বনে লিখিত হল 'মূল্যপ্রাপ্তি' [দ্র কথা ৭। ৪৫-৪৬] কবিতা। মূল কাহিনীটি হল:

> বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে রাজা প্রসেনজিৎ তীর্থিকদের উপাসনা করতেন, কিন্তু সেই মহৎ প্রচারকের আগমনের পর তিনি মহান প্রভু ছাড়া আর কারোর কাছে নত হন নি। যখন প্রভু জেতবনে বাস করছিলেন, তখন শ্রাবস্তীর এক মালী রাজাকে উপহার দেবার জন্য একটি বিরাট পদ্মফুল নিয়ে এসেছিল। তীর্থিকদের এক ভক্ত তার দাম জানতে চাইল। সেই সময়ে অনাথপিণ্ডদ এসে দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাইলেন। পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অধিক মূল্য ঘোষণা করতে করতে দাম শতগুণ বর্ধিত হল। তখন মালী বুদ্ধ কোথায় আছেন জানতে চাইল এবং অনাথপিণ্ডদের কাছ থেকে তাঁর মহাশক্তির কথা শুনে ফুলটি প্রভুকেই উপহার দিল। তৎক্ষণাৎ পদ্মটি রথচক্রের আকার ধারণ করে বুদ্ধের মস্তকের উপর স্থিত হল। মালী এই ব্যাপার দেখে বিস্মিত হল ও পরমজ্ঞানের জন্য উপদেশ চাইল। প্রভু আনন্দকে বললেন, "এই ব্যক্তি পদ্মোদ্ভাব নামে এক মহৎ বুদ্ধে পরিণত হবে।" [অনুবাদ]

পাঠক এই কাহিনীর সঙ্গে কবিতাটি মিলিয়ে পড়লে দেখতে পাবেন, অতিপ্রাকৃত ঘটনা বর্জন ও অন্যান্য ছোটখাটো পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তত্ত্বের আবহ বজায় রেখেও কাহিনীটিকে কবিতা করে তুলেছেন।

২৭ আশ্বিন [শুক্র 13 Oct] রবীন্দ্রনাথ কল্পদ্রুমাবদান-এর ১৬-সংখ্যক কাহিনী 'Story of Supriyá' [pp. 298-99] অবলম্বনে লিখলেন 'নগরলক্ষ্মী' [দ্র কথা ৭। ৪৬-৪৮]। মূল কাহিনীটি অনেক দীর্ঘ এবং অলৌকিক কথায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তার সমস্তই বর্জন করে অনাথপিণ্ডদের কন্যা সুপ্রিয়ার দ্বারা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবার অংশটুকুকেই রত্নাকর শেঠ, সামন্ত জয়সেন ও ধর্মপালের মতো প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের অপরাগতার সঙ্গে প্রতিতুলনায় মহান করে তুলেছেন।

পরবর্তীকালে 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'চণ্ডালিকা' নাটকের আখ্যায়িকার জন্য রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত বৌদ্ধকাহিনীর শরণাপন্ন হলেও 'কথা' কাব্যের আর কোনো কবিতায় এই জাতীয় কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। 'নগরলক্ষ্মী' রচনার পরবর্তী দু'দিনে তিনি যে তিনটি কবিতা লেখেন তার অবলম্বন 'ভক্তমাল' গ্রন্থ—মধ্যযুগের সন্ত-সাধকদের প্রতি যে শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ আজীবন অনুভব করেছেন, সন্ত কবীরের কাহিনী অবলম্বনে ২৮ আশ্বিনে [শনি 14 Oct] রচিত 'অপমান-বর' [দ্র কথা ৭ | ৪৮-৫০] এবং ২৯ আশ্বিনে লেখা তুলসীদাসের মহিমা-আশ্রিত 'স্বামীলাভ' [দ্র ঐ ৭। ৫১-৫২] ও সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্যমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক 'স্পর্শমণি' [দ্র ঐ ৭। ৫৩-৫৪] কবিতা তার প্রথম উপচার।

আশ্বিন মাসের ১৮ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত বারো দিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দশটি কবিতা রচনা করেন। 'বিজয়ার [২৮ আশ্বিন শনি 14 Oct] প্রেমাভিবাদন' জানিয়ে পরদিন 'রবিবার' রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে এই খবর জানিয়ে লিখছেন: 'ঝড় বৃষ্টি চল্‌চে। আমি চতুর্দ্দিকে সাসি বন্ধ করে গরম হয়ে বসে লেখবার চেষ্টায় আছি। এবারে যখন আস্‌বে তোমাকে শোনাবার মত কিছু সংগ্রহ থাক্‌বে।···দেবী সরস্বতীর দ্বারে প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মুষ্টিভিক্ষা করচি মাত্র—এবং তিনি যখন অনুগ্রহ করে যা দেন আমি সে সম্বন্ধে কোনপ্রকার দ্বিরুক্তি মাত্র না করে ঝুলিটির মধ্যে পূরি। আর কিছু না হোক্ ঝুলিটি উত্তরোত্তর ভরে উঠ্‌চে।'[৫৩] এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন: 'ঝড়ের গর্জ্জন ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে—বৃষ্টিধারারও বিরাম নেই।' এর থেকে

রবীন্দ্র-জীবনী-কার অনুমান করেছেন, 'প্রকৃতির রুদ্রলীলা' দেখে এইদিন রবীন্দ্রনাথ হয়তো 'ঝড়ের দিনে' [দ্র কল্পনা ৭। ১৮৯-৯১] কবিতাটি লেখেন।[৫৪] কবিতাটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, মুদ্রিত গ্রন্থেও '১৩০৬' ছাড়া সময়-নির্দেশের অভাব—কিন্তু অনুমানটি যুক্তিসংগত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৫ আশ্বিন [বুধ 10 Oct] দিলদারনগর থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: "···'মন্দির' নামক গল্পটি সমাপ্ত করিয়াছেন কি? একটু যদি চটপট সারিয়া দেন তবে এ গরীব মাসখানেক ছুটি পাই।"[৫৫] এই পত্রাংশটি একটু সমস্যায় ফেলে। রবীন্দ্রনাথ 'মন্দির' নামে কোনো গল্প লেখেন নি এবং ১৩০৭ বঙ্গাব্দেও তাঁর যে-কয়টি গল্প মুদ্রিত হয়েছে তাদের কোনোটির 'মন্দির' নামান্তর সম্ভব বলে মনে হয় না। হয়তো এই নামের কোনো গল্পের প্লট রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে বলে বা লিখে থাকতে পারেন, কিন্তু গল্পটি অলিখিতই থেকে গেছে। পত্রোত্তরে রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি পাওয়া গেলে এ-বিষয়ে আলোকপাত করা যেত।

রবীন্দ্রনাথ ১৩ ভাদ্র [মঙ্গল 29 Aug] বলেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধদিবসে প্রিয়নাথকে লিখেছিলেন: 'ভারতী সম্পাদক তাগিদ করিতেছেন। দুই এক দিনের মধ্যেই চাই। তুমি কি সংক্ষেপে গুটিকতক ছত্রে বলুর সম্বন্ধে সাধারণভাবে ও বন্ধুভাবে শোক প্রকাশ করিয়া সত্বর লিখিয়া পাঠাইতে পার?'[৫৬] কিন্তু প্রিয়নাথ ভারতী-র জন্য কিছু লেখেন নি, তাঁর রচনা 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর' শিরোনামে আশ্বিন-কার্তিক-সংখ্যা প্রদীপ [পৃ ৩৪৫-৪৮]-এ মুদ্রিত হয়। এই সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ 'বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা' [পৃ ৩৪৮-৪৯] নামে বলেন্দ্রনাথের তিনটি গদ্য-প্রবন্ধ 'তাঁহার অসমাপ্ত লেখা ও সূচনাগুলির সাহায্য লইয়া যথাসম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায়...সংক্ষেপে সম্পূর্ণ করিয়া' একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা-সহ[৫৭] প্রকাশ করেন। এই সংখ্যায় [পৃ ৩২৩] তাঁর 'ভ্রষ্ট লগ্ন' [দ্র কল্পনা ৭। ১৩৮-৪০]-শীর্ষক ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ তারিখে লিখিত কবিতাটি মুদ্রিত হয়, কবিতাটির সঙ্গে ও বার্ষিক সূচীতেও রচয়িতার নাম ছাপা হয় নি। আমরা আগেই বলেছি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কার্তিক-সংখ্যা সাহিত্য-তে [পৃ ৪৫৮-৫৯] কবিতাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সুরেশচন্দ্র কি জানতেন যে, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা!

কার্তিক-সংখ্যা ভারতী-তে [পৃ ৬১৭-১৯] রবীন্দ্রনাথের ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ তারিখে লিখিত 'পসারিণী' [দ্র কল্পনা ৭। ১৩৭-৩৮] কবিতাটি মুদ্রিত হয়। রচয়িতার নাম ও তারিখ-সংবলিত এই কবিতার সমালোচনায় সুরেশচন্দ্র লেখেন: "পসারিণী" একটি সৌখীন কবিতা। ইহার ভাষার সৌন্দর্য্য প্রশংসনীয়, কিন্তু সমগ্র কবিতাটির উদ্দেশ্য বা অভিধেয় কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।'[৫৮]

কার্তিক মাসেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার ধারা বহমান থেকেছে, কিন্তু তার বিষয়ের পরিবর্তন ঘটল। বুদ্ধদেব, কবীর, তুলসীদাস বা সনাতন গোস্বামী ঐতিহাসিক পুরুষ হলেও তাঁদের জীবনের যে-ঘটনাগুলি কথা কাব্যে রূপায়িত হয়েছে সেগুলিকে ঠিক ঐতিহাসিক বলা যায় না। কিন্তু কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথ কথা-র যে কবিতাগুলি রচনা করলেন, তাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি অনেকটা সুনির্দিষ্ট—দশটি কবিতার মধ্যে ছ'টি রাজপুত ইতিহাস, তিনটি শিখ ইতিহাস ও একটি মারাঠা ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। রাজপুত ইতিহাসের কাহিনীগুলি রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন James Todd-রচিত *The Annals and Antiquities of Rajasthan* গ্রন্থ থেকে, শিখ ইতিহাসের কাহিনীগুলি সংগৃহীত হয়েছে J. P. Cunningham-রচিত *The*

History of The Sikhs গ্রন্থ থেকে এবং একটিমাত্র মারাঠা ইতিহাসাশ্রিত কবিতা 'বিচারক' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সূত্রনির্দেশ করেছেন: 'পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত চরিতমালা হইতে গৃহীত! অ্যাক্‌ওআর্থ সাহেব-প্রণীত Ballads of the Marathas-নামক গ্রন্থে রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ রাওয়ের হত্যা সম্বন্ধে প্রচলিত মারাঠি গাথার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।'

১ কার্তিক [মঙ্গল 17 Oct] রাজস্থানের সিরোহিপতি সুরতানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হল 'মানী' [দ্র কথা ৭। ৫৯-৬১] কবিতা। মূল কাহিনীতে আছে, সুরতানের মাথা আরংজেবের সামনে নত করার জন্য তাঁকে সংকীর্ণ প্রবেশদ্বারের সামনে নিয়ে গেলে সুরতান আগে দেহের নিম্নভাগ প্রবেশ করিয়ে পরে মাথা নিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ এই শারীরিক কসরতের বর্ণনা করেন নি।

শিখ ইতিহাস অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ২ কার্তিক [বুধ 18 Oct] লিখলেন 'প্রার্থনাতীত দান' [দ্র কথা ৭। ৬২]; এই কবিতাটির কাহিনী তিনি ইতিপূর্বেই আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২-সংখ্যা বালক-এ মুদ্রিত 'শিখ-স্বাধীনতা' প্রবন্ধে বিবৃত করেছিলেন [দ্র ইতিহাস। ৯৮-১০১]। কবিতাটি আষাঢ়-মাঘ ১৩০৬-সংখ্যা উৎসাহ [পৃ ৪৯]-তে প্রকাশিত হয়। এই একটি ছাড়া বর্তমান পর্বে লিখিত কথা-র আর কোনো কবিতা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় নি।

৪ কার্তিক [শুক্র 20 Oct] রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত হল 'রাজবিচার' [দ্র কথা ৭। ৬২-৬৩] কবিতা। মূল কাহিনীর সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ রতন রাও-এর রাজমাহাত্ম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছেন।

৬ কার্তিকে [রবি 22 Oct] লিখিত 'শেষ শিক্ষা' [দ্র কথা ৭। ৬৮-৭৩] শিখ ইতিহাস অবলম্বন করেছে। কানিংহামের গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত 'বীর গুরু' [বালক, শ্রাবণ ১২৯২। ১৬৭-৭২; ইতিহাস। ৮৯-৯৭] প্রবন্ধে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছিল।

৭ কার্তিক [সোম 23 Oct] রবীন্দ্রনাথ আবার রাজস্থান-এর কাহিনী অবলম্বন করলেন। এই দিনে লিখিত 'নকল গড়' [দ্র কথা ৭। ৭৩-৭৫], ৯ কার্তিকের 'হোরি খেলা' [দ্র ঐ ৭। ৭৫-৭৯] ও ১১ কার্তিকের 'বিবাহ' [দ্র ঐ ৭। ৮০-৮৩] রাজপুত-ইতিহাসের কাহিনীকে আশ্রয় করেছে। রাজস্থান-এর কাহিনী অবলম্বনে অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি কবিতা রচনা করেন 'পণরক্ষা' [দ্র কথা ৭। ৮৬-৮৮]—কথা কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা। বৌদ্ধ পুরাণাশ্রিত কবিতার [৯টি] পর রাজস্থান অবলম্বনে লিখিত কবিতার সংখ্যাই কথা কাব্যে সর্বাধিক [৬টি]। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' [1858]-এর পর বহু কবি-নাট্যকার রাজস্থান থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন—কিন্তু তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভেদটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী: 'রাজপুত ইতিহাসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নামগুলি, সবচেয়ে বিখ্যাত ঘটনাগুলিকে কবি এড়িয়ে গিয়েছেন। রাণা সঙ্গ, প্রতাপসিংহ, রাজসিংহ, রাঠোর দুর্গাদাস, মানসিংহ, মীর্জা জয়সিংহ, রানী পদ্মিনী বা ধাত্রী পান্না কাউকে পাই নে, তেমনি পাই নে আলাউদ্দিনের চিতোর-আক্রমণ বা হলদিঘাটের সংগ্রাম, এমন আরো অজস্র ইতিহাস-বিখ্যাত ঘটনা।···ইতিহাসের যে রাজপথটাতে ভাটচরণের জয়গানে এবং তূরী-ভেরীর নিনাদে চতুরঙ্গ বাহিনীর সমারোহ কবি তাকে এড়িয়ে গিয়েছেন, তিনি যেন খিড়কি দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছেন রাজপুতানার ইতিহাসের অভ্যন্তরে, যেখানে জীবনের সংগীত নিম্নগ্রামে

ধ্বনিত।’[৫৯] রাজপুতানার ইতিহাসে বীরত্বের কাহিনী দুর্লভ নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই-সব উপাদান-সংবলিত আখ্যায়িকা অবলম্বন করেছেন যার দ্বারা বীরজাতি গড়ে ওঠে।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ঠাকুর-এস্টেটের কর্মচারী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারিবারিক দুর্যোগেও কিভাবে সাহায্য করেছিলেন তার বিবরণ আমরা দিয়েছি। দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর চট্টগ্রাম থেকে ঠাকুরদাসের একটি পত্র পেয়ে ৭ কার্তিক [সোম 23 Oct] রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখলেন:

···আপনার সংবাদ লইবার জন্য আমার অনেক দিন ঔৎসুক্য ছিল কিন্তু আপনি কোথায় আছেন কিছুই জানিতাম না। আমাদের সম্বন্ধ পরিত্যাগের পর হইতে আপনার আর কোনও চিঠিপত্র পাই নাই এবং লোকমুখে শুনিয়াছিলাম আমাদের প্রতি আপনার মনের ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি সাধ্যমত আপনার হিত চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু যদি কোনও কারণে আপনার ক্ষোভের কোন হেতু ঘটিয়া থাকে তবে এক্ষণে তাহা বিস্মৃত হইবেন।···

—ঠাকুরদাস ১৩০৮ বঙ্গাব্দে আর-একবার কর্মপ্রার্থী হয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু সেই প্রার্থনা তিনি পূরণ করতে পারেন নি।*

সম্ভবত বৈষয়িক কার্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ দিন-চারেকের জন্য কলকাতায় আসেন ১৭ কার্তিক [বৃহ 2 Nov] তারিখে। সরকারী ক্যাশবহির ৫ অগ্র° তারিখের হিসাবে খবরটি আছে: ‘শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয় শিলাইদহ হইতে আসিবায় ১৭ না° ২০ কার্ত্তিক ৪ দিনের ঠিকা বিহারা ১ জনার মজুরী ॥o’| তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহি থেকে জানা যায় ১৭ কার্তিক তিনি নিমতলা স্ট্রীটে প্রিয়নাথ সেনের বাড়ি যান, ফিরে আসার দিন ২১ কার্তিক [সোম 6 Nov] তিনি আবার যান সেখানে; মাঝে ১৮ ও ২০ কার্তিকে তিনি যান বালিগঞ্জে, সম্ভবত সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শাদির জন্য। কলকাতায় তাঁর হয়ে বৈষয়িক কার্যাদি নিষ্পন্ন করার জন্য তিনি ইতিপূর্বেই সুরেন্দ্রনাথকে আমমোক্তারনামা [Power of attorney] প্রদান করেন—৩ আশ্বিন [মঙ্গল 19 Sep]ক্যাশবহিতে এ-সংক্রান্ত হিসাবটি পাওয়া যায়: ‘রবীন্দ্রবাবু যে পওয়ার সুরেন্দ্রবাবুকে দেন তাহার লেখাপড়ার ব্যয় ৯৮৲’ —প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত পত্রেও বিষয়টির উল্লেখ আছে।

২২ কার্তিক [মঙ্গল 7 Nov] রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ক্যাশবহিতে বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের নূতন সংস্করণের মুদ্রণ-ব্যয় ও বিক্রয়ের হিসাব লেখা হয়েছে: ‘ব° আদি ব্রাহ্মসমাজ দং বৌঠাকুরাণীর হাট ছাপান ব্যয় ২৩ ফরমা ৪৲ হিঃ ৯২৲ কাগজ ক্রয় ২৩ রিম মায় কবারিং ৮৯৲ [অন্যান্য খরচ] ৩/১৮১ ৩’ ও ‘মা° গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দং বৌঠাকুরাণীর হাট ১০০০ বিক্রী ⅟০ হিসাবে ৩১২ ।⅟০’। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অর্ধমূল্যে রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দিতেন বলে একসময়ে ঠাট্টাতামাসার অন্ত ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখক ও বিক্রেতার লাভের অঙ্ক নিতান্ত কম থাকত না জানতে পারলে হাস্যরসিকেরা বোধহয় বিমর্ষ হতেন!

কার্তিক মাসের শেষ দিনে ৩০ কার্তিক [বুধ 15 Nov] রবীন্দ্রনাথ শিখ ইতিহাস অবলম্বনে লিখলেন ‘বন্দী বীর’ [দ্র কথা ৭। ৫৫-৫৯] কবিতা। কানিংহামের গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বালক-এর জন্য তিনি যে ‘শিখ-স্বাধীনতা’ শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন বন্দার কাহিনীটি সেখানে আনুপূর্বিক বর্ণিত হয়েছিল।

৪ অগ্র° [রবি 19 Nov] পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-রচিত ‘চরিতমালা’ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে তিনি লিখলেন ‘বিচারক’ [দ্র কথা ৭। ৮৩-৮৬] কবিতা। মহারাষ্ট্রের সঙ্গে কৈশোরাবধি তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকলেও মহারাষ্ট্রের ইতিহাস তাঁর কবিকল্পনাকে বিশেষ উদ্দীপিত করে নি। অ্যাক্ওয়ার্থ-অনূদিত মারাঠি গাথা অবলম্বনে দু'বছর আগে ৬ কার্তিক ১৩০৪ তিনি ‘প্রতিনিধি’ কবিতা রচনা করেছিলেন, আর এতদিন পরে লিখলেন ‘বিচারক’ কবিতাটি। এর কারণ কি উপকরণের অভাব?

‘পণরক্ষা’ [দ্র কথা ৭। ৮৬-৮৮]কথা কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা—এখানে মারাঠা ও রাজপুত ইতিহাস একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে, কাহিনীটি রাজস্থান থেকে গৃহীত। কবিতাটির গ্রন্থে মুদ্রিত তারিখ ‘অগ্রহায়ণ ১৩০৬’, কিন্তু রবীন্দ্রজীবনী-কার তারিখ নির্দেশ করেছেন ‘৩ অগ্রহায়ণ’[৬০] —কিন্তু এরূপ নির্ধারণের কোনো কারণ বা যুক্তি উল্লেখ করেন নি।

১৮ আশ্বিন থেকে ৪ অগ্রহায়ণের মধ্যে লিখিত ২০টি কবিতা ও পূর্বলিখিত ‘শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা’, ‘প্রতিনিধি’, ‘দেবতার গ্রাস’ ও ‘মস্তকবিক্রয়’ নিয়ে কথা প্রকাশিত হয় ১ মাঘ ১৩০৬ [রবি 14 Jan 1900] তারিখে। পৌরাণিক কবিতাগুলি সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, গ্রন্থটি তাঁকেই উৎসর্গ করা হয়।

এই সময়ে দীর্ঘদিন পরে রবীন্দ্রনাথের নূতন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল ‘কণিকা’। ছোটো ছোটো ১১০টি কবিতাকণার সমষ্টি এই গ্রন্থ—এতে আছে ১২ ছত্রের ৪টি, ১০ ছত্রের ১১টি, ৮ ছত্রের ৭টি, ৬ ছত্রের ৪টি, ৪ ছত্রের ৬৪টি ও ২ ছত্রের ২০টি epigram-ধরনের শ্লোক-সদৃশ কবিতা। বাল্যকালে তিনি চাণক্য-শ্লোক পড়েছিলেন, পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের গল্প ও নীতিশ্লোকের সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন—সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কত ঘনিষ্ঠ ছিল এক বৎসর পরে রচিত চিরকুমার সভা-তে তার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং আদর্শের অভাব ছিল না। কিন্তু কত দীর্ঘদিন ধরে এই কবিতা কণাগুলি জমে উঠেছিল সে-বিষয়ে তথ্যের সম্পূর্ণ অভাব। আমরা আগেই বলেছি, কণিকা-র ‘চুরি-নিবারণ’ [দ্র ৬। ১৩] কবিতাটি ‘সুও রাণীর সোহাগ’ নামে কার্তিক ১৩০৫-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হয়েছিল। সুতরাং মনে করা যেতে পারে, অন্তত এক বৎসরের অধিক সময় ধরে কবিতাগুলি রচিত হয়েছে। এর কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, কোনো পত্রে এগুলি রচনা-সংক্রান্ত উল্লেখ নেই। রবীন্দ্র-রচনায় সারগর্ভতার অভাব নিয়ে যাঁরা সমালোচনা করতেন, তাঁরা এই বইটি পেয়ে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন—সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সন্তোষের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

কণিকা-র আখ্যাপত্রে আছে:

কণিকা।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/প্রণীত।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের/দ্বারা মুদ্রিত।/৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।/৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩০৬ সাল।/মূল্য আট আনা।

গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় সন্তোষের জমিদার কবি-নাট্যকার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীকে [1872-1949]:

সাদর উৎসর্গ/পরম প্রেমাস্পদ/শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী/মহাশয়ের করকমলে/শিলাইদহ/৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩০৬

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+৬+৪৫। ক্যাশবহির হিসাব অনুযায়ী কণিকা-র মুদ্রণসংখ্যা ৫৫০ ও মোট মুদ্রণব্যয় ৩৭ টাকা ১৩ আনা ৩ পয়সা। বইটি বাঁধিয়েছিলেন আহদ দপ্তরী।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কণিকা-র প্রথম সংস্করণের যে কপিটি আমরা দেখেছি, সেটি রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে 'পূজনীয়া শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী/স্বসৃকল্পাসু' লিখে উপহার দেওয়া। এইরূপ একটি উপহার পেয়ে চন্দ্রনাথ বসু ২ পৌষ [শনি 16 Dec] একটি পত্র লিখে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করেন।

গ্রন্থটির আখ্যাপত্রে প্রকাশের তারিখ ৪ অগ্রহায়ণ [রবি 19 Nov] মুদ্রিত হলেও বইটি সম্ভবত আরও কয়েকদিন পরে প্রকাশিত হয়। 20 Nov [সোম ৫ অগ্র°] রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে জানাচ্ছেন: "কণিকা" প্রায় ছাপা হয়ে এল। এবার আর একটা কাব্যগ্রন্থ ছাপতে দেব।'[৬১] এর থেকেই বিলম্বটি বোঝা যায়। তাছাড়া ৪ অগ্র° তারিখে তাঁর ক্যাশবহিতে 'জায়/কণিকা বই ছাপান কাগজ ক্রয়…২৪্' হিসাবটি লেখা হয়েছে —'কণিকা বই ডাকে পাঠান মাশুল ॥৬' হিসাবটি লেখা হয় ২৭ অগ্র° [মঙ্গল 12 Dec] তারিখে।

আমরা দেখেছি, ১৩০৬ বঙ্গাব্দের গোড়া থেকে রাজা ও রানী, বিসর্জন, গোড়ায় গলদ, রাজর্ষি ও বউঠাকুরানীর হাট গ্রন্থগুলি পুনর্মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে সিকি মূল্যে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। কিন্তু কণিকা ও তৎপরবর্তী নূতন কাব্যগ্রন্থাবলী সম্পর্কে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি। সেগুলি আগের মতোই তত্ত্ববোধিনী [ও অন্যান্য পত্রিকায়] বিজ্ঞাপন দিয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে বিক্রীত হয়েছে। পৌষ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-র মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে কণিকা-র বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত করছি:

> বিজ্ঞাপন।/কণিকা।/ (নূতন কাব্য গ্রন্থ)/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত/ মূল্য আট আনা।/ সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে ও ৫৫ নং অপার চিতপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজে আমার নিকট প্রাপ্তব্য। আমার নিকট লইলে ডাক্‌মাশুল লাগে না।/শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী/প্রকাশক

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মাঘ-সংখ্যা প্রদীপ-এ [পৃ ৬১-৬৩] কণিকা-র সমালোচনা করেন। তিনি আরও একটি বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন উৎসাহ পত্রিকার ২৩৪-৪৫ পৃষ্ঠায় [মলাট না থাকায় মাস ও সালের উল্লেখ করা যায় নি], এর পাদটীকায় লেখা হয়: '…এই প্রবন্ধ কণিকা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই লিখিত, তখন কথা প্রভৃতি প্রকাশিত হয় নাই।'

রবীন্দ্র-ভক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ ২৯ অগ্র° [বৃহ 14 Dec] ১০৯ গ্রে স্ট্রীট থেকে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'আপনার "কণিকা" বহুস্থান হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া কল্য আমার হস্তে পৌঁছিয়াছে।…এ গ্রন্থ কাগজে সমালোচনা করিতে আরও নিরস্ত রহিলাম কারণ সুরেশ সমাজপতির নিকট শুনিলাম যে ইহার ভার যোগ্যতর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয় "সাহিত্যে" "চিত্রা ও কণিকার" একত্রে সমালোচনা করিবেন।'[৬২] প্রিয়নাথ অবশ্য এরূপ কোনো সমালোচনা লেখেন নি।

মোতিচাঁদ নাখতারের কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যে স্বস্তি পেয়েছিলেন, তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি; ২ অগ্র° [শুক্র 17 Nov] মোতিচাঁদের অ্যাটর্নি অমরনাথ ঘোষের কাছ থেকে ঋণের দলিল রেজেস্ট্রি করানোর তাগিদ পেয়ে অস্থিরতা বোধ করেছেন। প্রিয়নাথের পরামর্শমতো অ্যাটর্নিকে চিঠি দিয়ে 20 Nov [সোম ৫ অগ্র°] তাঁকে লিখেছেন: 'যদি রেজেষ্ট্রি করতেই হয় তা হলেও আর কারো কাছ থেকে টাকা [নিয়ে] এই লোকটাকে শোধ করে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। এ রকম লোকের হাতে বদ্ধ হয়ে থাকা ভয়ঙ্কর। চঞ্চল কি আয়ত্তাতীত?' আবার এই চিঠিরই শেষে লিখছেন: 'মেজদাদা। অল্পদিনের মধ্যে এখানে আসবেন। মাঝে লোকেন দিন দুই তিন এখানে থেকে রাত তিনটে পর্য্যন্ত সাহিত্যচর্চ্চা করে গেছে। সে কটা দিন বৈষয়িক বিভ্রাট সমস্ত ভুলে একরকম ছিলুম ভাল।'[৬৩] বন্ধু-সংসর্গের জন্য তাঁর মন সব সময়েই

তৃষিত হয়ে থাকত। গত দেড় মাসে অনেকগুলি নূতন কবিতা লিখিত হয়েছিল, বন্ধুদের সেগুলি শুনিয়ে তাঁদের মতামত জানতে চাওয়ার ইচ্ছা স্রষ্টার পক্ষে স্বাভাবিক।

23 Nov [বৃহ ৮ অগ্র°] রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'জুরির আহ্বানে আমাকে ডিসেম্বরের প্রারম্ভে কলকাতায় ছুটতে হবে'[৬৪]—সেই জন্য তিনি কলকাতায় আসেন ১৮ অগ্র° [রবি 3 Dec]; ক্যাশবহির হিসাবে লেখা আছে: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু মহাশয় পরগণা হইতে এখানে আসায় তাঁহার ঘর পরিষ্কার প্রভৃতির জন্য ১টা বিহারা ১৮ অগ্রহায়ণ হইতে ২২ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ৫ দিনে···' ইত্যাদি। এইদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি ভোজসভার আয়োজন হয়, সরকারী ক্যাশবহির একটি হিসাব: 'দং ১৮ অগ্রহায়ণ ৫০ জন বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান ব্যায়···১৩০ ৴'—কিন্তু উপলক্ষটি কি বলার মতো তথ্য নেই।

তেমনি তথ্য নেই হাইকোর্টে কোন্ মামলায় জুরির দায়িত্ব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছিলেন। প্রিয়নাথকে তিনি লিখেছেন: 'আমি জুরিতে আবদ্ধ হয়ে অস্থিরভাবে আছি। তোমার সঙ্গে সেইজন্যে দেখা হয় নি। আদালতে দেখা হবে ভেবেছিলুম কিন্তু কই? কবে ছুটি পাব জানি নে। আজ সন্ধের সময় যদি পার ত এস —বইগুলো নিয়ে যেয়ো এবং Herbert Spencer ও নতুন গল্পের বইটা এনো।'[৬৫] এর থেকে মনে হয়, আগের চিঠিও এই সময়ে লেখা যাতে একটি লেখার জন্য তিনি *History of the Ottoman Poetry* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি চেয়েছেন।[৬৬] এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পাঠের জন্য 'ব্রহ্মৌপনিষদ' প্রবন্ধটি রচনা করছিলেন, উক্ত প্রবন্ধের জন্য কি তিনি বইটি চেয়েছিলেন? আর একটি চিঠিতে পুনশ্চ তিনি 'Herbert Spencer এবং Henry Harland' পাঠাতে লিখেছেন।[৬৭] রবীন্দ্রজীবনী-কার মনে করেছেন, আমেরিকান লেখক হেনরি হারল্যাণ্ডের [1861-1905] Comedies and Errors [1898] গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ পড়তে চেয়েছিলেন।[৬৮] বইদু'টি তাঁর ভালো লেগেছিল, একটি তারিখ-হীন পত্রে তিনি লিখেছেন: 'W[H]. Harlandএর বইখানিতে যৌবন এবং বসন্ত টগ্‌বগ্ করচে—H. Spencer-এর গ্রন্থে বার্দ্ধক্য পরিপক্ক পরিণত। দুটোই যে আমি একসঙ্গে পড়তে পারলুম তার থেকে প্রমাণ হচ্চে আমি এমন একটি বয়সে এসে পৌঁচেছি—যার এক সীমানায় যৌবনের রেখা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসচে এবং আর এক সীমানায় বার্দ্ধক্য ক্রমশ শুভ্র রেখায় স্ফুটতর হয়ে উঠ্‌চে।'[৬৯] পত্রটি কোন্ সময়ে লেখা নির্ধারণ করা শক্ত, কিন্তু শেষ বাক্যটিতে ক্ষণিকা-র মনোভঙ্গিটি অনুভব করা যায়।

কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথ শুধু জুরিতেই আবদ্ধ থাকেন নি, ২০ অগ্র° [মঙ্গল 5 Dec] বালিগঞ্জ, ২১ অগ্র° 'প্রিয়বাবুর বাটী' ও 'আলিপুর হইতে আসিবার' এবং ২২ ও ২৩ অগ্র° তাঁর 'বিডিন ষ্ট্রীট' যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। সম্ভবত ২৩ অগ্র° [শুক্র ৪ Dec] তিনি শিলাইদহে ফিরে যান।

এই যাত্রায় তিনি কথা-র মুদ্রণের ব্যবস্থা করে যান, তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে 'জায়/২০ অগ্রহায়ণ কথা পুস্তকের কাগজ ক্রয় ২৪' এইরূপ হিসাব পাওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১ মাঘ [রবি 14 Jan 1900] তারিখে।

অগ্রহায়ণ ১৩০৬-এ রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশ-সূচী:

ভারতী, অগ্র° ১৩০৬ [২৩। ৮]:

৬৭৩-৮১ 'উন্নতিলক্ষণ' দ্র কল্পনা ৭। ১৭২-৭৮

৭৬৫-৬৮ 'প্রকাশ' দ্র ঐ ৭। ১৬৯-৭১

'ধরা পড়া' নামে 'প্রকাশ' কবিতার প্রাথমিক খসড়া রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ [23 May 1897] তারিখে, কিন্তু বর্তমান পাঠটির রচনা-তারিখ নেই, মুদ্রিত গ্রন্থে শুধু '১৩০৪' উল্লিখিত হয়েছে। 'উন্নতিলক্ষণ' কবিতাটিরও রচনাকাল শুধু '১৩০৬' বলে উল্লিখিত।

প্রদীপ, অগ্র° ১৩০৬ [২ / ১২]:

৩৯৬-৯৭ 'মার্জ্জনা' দ্র কল্পনা ৭। ১৩২-৩৩

কবিতাটি ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ [21 May 1897] শান্তিনিকেতনে রচিত হয়, পত্রিকাতেও তারিখটি মুদ্রিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে যোগদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন ৫ পৌষ [মঙ্গল 19 Dec] তারিখে। এইদিনই তিনি বালিগঞ্জ ও নারিকেলডাঙ্গা যাতায়াত করেন। পরের দিন তিনি। শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন।

৭ পৌষ [বৃহ 21 Dec] শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকা তত্ত্ববোধিনী-র বর্ণনায় উল্লিখিত হয় নি। বেদিগ্রহণ করে উপাসনা, ভোজ্যোৎসর্গ ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উদ্বোধন সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। সন্ধ্যায় 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বেদি গ্রহণ করিলেন।' সংগীত, উদ্বোধন ও স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হলে রবীন্দ্রনাথ 'উপদেশ' পাঠ করেন। এই উপদেশ মাঘ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-র ১৬৪-৭২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়, 'ব্রহ্মৌপনিষদ' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ৭ মাঘ [শনি 20 Jan 1900] তারিখে। 'কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত' এই পুস্তিকাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪। পরে এটি শ্রাবণ ১৩০৮-এ প্রকাশিত 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসবে প্রাতঃকালীন উপাসনাতেও পাঠ করেন।

গ্রন্থে তত্ত্ববোধিনী-র [মাঘ ১৮২১ শক। ১৬৭] একটি বাক্য বর্জিত হয়েছে, আমরা সেটি উদ্ধৃত করছি:

> ···কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুরী তীর্থ-যাত্রীর জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে দেখা গিয়াছিল ভাসমান মৃতদেহের মধ্যে অনেকগুলি রমণী আপন সন্তানকে বক্ষের মধ্যে দৃঢ়বাহুপাশে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে; যে মাতৃস্নেহ প্রলয়-বিক্ষুব্ধ অকূল সমুদ্রের মৃত্যুবিভীষিকার মধ্যেও আপনাকে জয়ী ও জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করে, সেই মৃত্যুঞ্জয় স্নেহের পূর্ণ পরিচয় কোন সন্তান প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্মের মধ্যে পায় না—অথচ সেই অসম্পূর্ণ পরিচয়ের অন্তরালে অপরিমেয় মাতৃস্নেহের একটা আভাস সন্তানের মনে অলক্ষ্য ভাবেও বিরাজ করিতে থাকে।...

—এই বাক্যটি সচেতন পাঠককে অবশ্যই মানসী-র 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতার কথা মনে করিয়ে দেবে। রবীন্দ্রনাথের মনোলোকে উপনিষদ ও বাস্তব জীবন একত্রে মিশে ছিল—তাই কোথাও তিনি উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংবাদপত্রের বিবরণকে ব্যবহার করেছেন, আবার কোথাও শিক্ষাতত্ত্ব বা রাজনীতির আলোচনায় টীকাকারদের ব্যাখ্যা বা ব্যাকরণকে তুচ্ছ করে উপনিষদের শ্লোক উদ্ধার করেছেন।

৮ পৌষ [শুক্র 22 Dec] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা ফিরে আসেন। ৯ পৌষ তিনি যান। সংগীত-সমাজে, এই দিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' [1880] গীতিনাট্যের পুনর্লিখিত সংস্করণ 'পুনর্বসন্ত' [১ চৈত্র ১৩০৫: 14 Mar 1899]সমাজের সদস্যদের দ্বারা অভিনীত হয়। মানময়ী-তে রবীন্দ্রনাথ-রচিত তিনটি

গান ব্যবহৃত হয়েছিল, পুনর্বসন্ত-তে ঐ তিনটি ছাড়া আরও আঠারোটি গান সামান্য পরিবর্তিত বা অপরিবর্তিত আকারে ব্যবহার করা হয়:

১. এসো এসো বসন্ত এ কাননে।
২. এ কি আকুলতা ভুবনে।
৩. কোথা ছিলি সজনি লো
৪. সেই তো বসন্ত ফিরে এল
৫. বনে এমন ফুল ফুটেছে
৬. ওকি কথা বল সখি
৭. হা সখি, ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা
৮. সখা, সাধিতে সাধাতে কত সুখ
৯. দে লো সখি দে পরাইয়ে গলে
১০. এত ফুল কে ফুটালে।
১১. দেখো, ঐ কে এসেছে, চাও সখী চাও।
১২. সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে।
১৩. আহা জাগি পোহাল বিভাবরী
১৪. তুমি যেও না এখনি, এখনো আছে রজনী
১৫. হৃদয়ের মণি, আদরিণী মোর
১৬. সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার
১৭. মধুর মিলন
১৮. আজ আঁখি জুড়াল হেরিয়ে (আহা)

এছাড়া 'ঢের ঢের জানি, ঢের ঢের জানি,/ বোকো না বোকো না মিছে—যাও যাও রূপসীর কাছে' ছত্রগুলি বাল্মীকিপ্রতিভা-র দস্যুদের গানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

১১ পৌষ [সোম 25 Dec]ও রবীন্দ্রনাথের সংগীত-সমাজে যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়। অমৃতবাজার পত্রিকা [23 Dec] লেখে: 'H. H. Maharaja of Kooch Behar will pay a visit to the Samaj on the 25th instant.' হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন: "সংগীত সমাজ" কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নূতন বাড়ীতে (২০৯ নম্বর) স্থানান্তরিত হইলে তিনি [হেমচন্দ্র মল্লিক] প্রসিদ্ধ ইংরেজ কোম্পানীকে তাহার রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণের ভার দেন। অবশ্য তাহার ব্যয় কুচবিহারের মহারাজা বহন করিয়াছিলেন।'[৭০] হয়তো এই কারণেই তাঁকে বিশেষভাবে আপ্যায়নের আয়োজন করা হয়েছিল। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: '[রবীন্দ্রনাথ] পুনর্বসন্ত নাটকের রিহার্সালে কোমরে চাদর বাঁধিয়া হাতে তালি বাজাইয়া সখিদের নাচ দেখাইয়া দেন।'[৭১] সংগীত সমাজের উদ্যোগে পুনর্বসন্ত কয়েকবার অভিনীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ কবে শিলাইদহে প্রত্যাবর্তন করেন, তা নিয়ে একটু সংশয় আছে। তিনি শিলাইদহ থেকে আসায় ঘর পরিষ্কার প্রভৃতির জন্য একজন ঠিকা বেহারাকে '৫ পৌষ হইতে ১২ পৌষ পর্য্যন্ত ৮ দিনের মধ্যে ১ দিন কাটা বাদে' পারিশ্রমিক দেওয়ার হিসাব সরকারী ক্যাশবহিতে আছে। আবার তাতেই ১৪ পৌষ [বৃহ 28 Dec] 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের বালীগঞ্জে ত্রিপুরার মহারাজার বাটী যাওয়ার' হিসাব পাওয়া যায়। এইদিন তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে 'মিঃ [? চিত্তরঞ্জন] দাশের নিকট পত্র পাঠান'র হিসাব আছে।

শিলাইদহে ফিরে যাবার সপ্তাহ-দুয়েক পরে ২৯ পৌষ [শুক্র 12 Jan 1900] তিনি সপরিবারে কলকাতা আসেন এবং প্রায় দেড় মাস এখানে অবস্থান করেন। এ-সংক্রান্ত সরকারী হিসাবটি হল: 'দং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু

মহাশয়ের স্বপরিবারে সিলাইদহ হইতে এ বাটীতে আসিয়া থাকায় আহারাদির ব্যয় ২৯ পৌষ হইতে ১৫ ফাল্গুন পর্য্যন্ত ব্যায় শোধ ২৫৬ৗর্ল০'।

আখ্যাপত্র অনুযায়ী কথা-র প্রকাশ-তারিখ ১ মাঘ [রবি 14 Jan]। গ্রন্থটির আখ্যাপত্র:

কথা।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত।/৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।/১লা মাঘ, ১৩০৬ সাল।/মূল্য এক টাকা।

উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছে:

উৎসর্গ।/সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানাচার্য্য/করকমলেষু—
সত্যরত্ন তুমি দিলে,—পরিবর্ত্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।
শিলাইদহ,/অগ্রহায়ণ,/১৩০৬।

গ্রন্থকারের 'বিজ্ঞাপন'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

বিজ্ঞাপন।/এই গ্রন্থে যে সকল বৌদ্ধ কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই একটি ইংরাজি শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে—আশা করি সেই পরিবর্ত্তনের জন্য সাহিত্যনীতি-বিধানমতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।/গ্রন্থকার

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+২+২ [সূচীপত্র]+১১০। ক্যাশবহির হিসাব অনুযায়ী কথা-র মুদ্রণসংখ্যা ৬০০ ও মোট মুদ্রণব্যয় ৭৪ টাকা ২ আনা ৩ পয়সা।

কথা-র প্রথম সংস্করণে চব্বিশটি কবিতা ছিল—'দেবতার গ্রাস' ও 'বিসর্জন' তাদের অন্যতম। মোহিতচন্দ্র সেন তাঁর সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ পঞ্চম ভাগে [১৩১০] বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত করার জন্য কথা থেকে এই দু'টি কবিতা বর্জন করে মানসী-র 'গুরু গোবিন্দ' ও চিত্রা-র 'ব্রাহ্মণ' কবিতা কথা-র অন্তর্ভুক্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থের জন্য প্রবেশক কবিতা 'কথা কও, কথা কও' লিখে দেন। বর্জিত কবিতা-দু'টি ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আহরিত কয়েকটি কবিতা নিয়ে 'কাহিনী' ভাগ গঠিত হয়। পরে দু'টি ভাগ একত্রিত করে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস 'কথা ও কাহিনী' গ্রন্থ প্রকাশ করে। বর্তমানে গ্রন্থটি এই ভাবেই প্রচলিত ও রবীন্দ্র-রচনাবলী-তে এই সজ্জাটিই গৃহীত হয়েছে।

কথা প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-কৃত গ্রন্থ-সমালোচনা ভাদ্র ১৩০৮-সংখ্যা প্রদীপ-এ [পৃ ৩৫১-৫৫] মুদ্রিত হয়। ইতিহাস ও কাব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ভারতী-তে ও ব্যক্তিগত পত্রে দুই বন্ধুর বিতর্কের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিজ্ঞাপন'-এর শেষ বাক্যটি রচনা করার সময়ে এই বিতর্কের কথাই মনে রেখেছিলেন। এ-বিষয়ে অক্ষয়কুমার তাঁর সমালোচনায় লিখলেন:

ঐতিহাসিক চিত্রচয়নে কবিকল্পনা যে সর্ব্বথা নিরঙ্কুশ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে একবার কর্ত্তব্যানুরোধে তীব্রভাষা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ এই নূতন কবিতাপুস্তকের ভূমিকায় যেন তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়াই লিখিয়াছেন:—"মূলের সহিত...দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।" আমি কবিকুলকে ঐতিহাসিক হইবার জন্য তাড়না করি নাই; কিন্তু ঐতিহাসিক আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সকলকেই সাগ্রহে অনুরোধ করিয়াছিলাম। যাহার যে চরিত্র তাহার মূল প্রকৃতি অক্ষুন্ন রাখিয়া গল্পাংশ সরল সরস বা সহজে বোধগম্য করিবার জন্য অবান্তর বিষয়ের কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিলে ইতিহাসের ক্ষতি নাই—সাহিত্যের বিলক্ষণ লাভ। কবি বর্তমান পুস্তকে ঐতিহাসিক চরিত্রের মূল প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই; সুতরাং কেহ তাঁহাকে দণ্ডার্হ মনে করিতে পারিবেন না।[৭২]

১ মাঘ [রবি 14 Jan] রবীন্দ্রনাথ বালিগঞ্জ ও নারকেলডাঙ্গা যান। ৩ মাঘ [মঙ্গল 16 Jan] আগরতলায় ও মিস [অমলা] দাসকে পত্র লেখেন। এরপর মাঘোৎসবের আগে পর্যন্ত তাঁর গতিবিধি বা চিঠিপত্র লেখার কোনো হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায় না। মনে হয়, এই সময়ে তিনি মাঘোৎসবের জন্য গান রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই বৎসর ১১ মাঘ [বুধ 24 Jan] সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত তেইশটি ব্রহ্মসংগীত গীত হয়, তার মধ্যে 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে' গানটি পূর্বরচিত [দ্র কাব্য গ্রন্থাবলী। ৪৬৮]—তাছাড়া বাইশটি গান নূতন। উল্লেখ্য, এর আগের মাসে বিখ্যাত গায়ক ও স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক হিসেবে যোগদান করেন। এবারে রচিত অনেকগুলি গানের মূল উদ্ধার করা না গেলেও গানগুলি শুনলে বোঝা যায় তাদের কয়েকটি হিন্দি গান ভেঙে রচিত। আমাদের অনুমান, গানগুলি রবীন্দ্রনাথ কাঙালীচরণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ গানের স্বরলিপি কাঙালীচরণ করেছিলেন এবং সেগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি গ্রন্থের বিভিন্ন ভাগে ও সঙ্গীত-প্রকাশিকা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, একথাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য।

প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথের রচিত ছ'টি গান গীত হয়:

[১] আশা-ভৈঁরো—তেওরা। তোমারি নামে নয়ন মেলিনু দ্র গীত ১। ২০০-০১; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৬; স্বর ২২।

[২] দেও গান্ধার—চৌতাল। আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কিবা শোভা দেখালে দ্র গীত ১। ১৮৪-৮৫; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৬; স্বরলিপি নেই।

[৩] আসায়োরি-চৌতাল। রক্ষা কর হে দ্র গীত ৩। ৮৪৭; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৮; স্বরলিপি নেই।

[৪] খট্—ঝাঁপতাল। সদা থাক আনন্দে দ্র গীত ১। ১৩৬; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৮; স্বর ৪। সম্ভবত কোনো হিন্দি গান ভেঙে রচিত।

[৫] ভৈরবী—ঝাঁপতাল। জানি হে যবে প্রভাত হবে দ্র গীত ১। ১২৬; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৮; স্বর ৪; কল্পনা ৭। ২০২ ['পরিণাম']।

[৬] বিভাস—একতালা। (আজি) প্রণমি তোমারে চলিব নাথ দ্র গীত ১। ১৯৬; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৮-৭৯; স্বর ২৭।

সায়ংকালীন উপাসনায় প্রথমে গীত হয় পূর্বরচিত গান 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে' ইমনকল্যাণ-তেওরা সুর-তালে [কাব্য গ্রন্থাবলী-তে ছিল 'কল্যাণ-পটতাল']। এছাড়া আর ষোলোটি গান হল:

[৭] পূরবী—একতালা। দিনের বিচার কর দ্র গীত ২। ৬১৫; তত্ত্ব, ফাল্গুন। ১৮১; স্বরলিপি নেই। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'গানটি কবির রচনা নয় বলিয়া অনুমিত।'[৭৩] শান্তিদেব ঘোষ, অনুমান নয়, সিদ্ধান্তের ভঙ্গিতে লিখেছেন: '"দিনের বিচার কর" দুই নম্বর গানটি গুরুদেবের নয়।'[৭৪] প্রভাতকুমারের অনুমানের ভিত্তি শান্তিদেবের এই লেখা। কিন্তু এরূপ অনুমান বা সিদ্ধান্তের কোনো যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। এই গানটিরই রূপান্তর 'আমার বিচার তুমি করো' [দ্র গীত ১। ৫১-৫২] ১৩০৮ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয় এবং ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী [পৃ ১৬৯] ও মাঘ-ফাল্গুন-সংখ্যা সমালোচনী-তে [পৃ ২] 'নিবেদন'

শিরোনামে মুদ্রিত হয়। সুতরাং বর্তমান গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা এ-বিষয়ে সংশয়িত হওয়ার কারণ নেই।

[৮] খাম্বাজ—একতালা। তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে দ্র গীত ১। ১৯৮; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮২; স্বর ৪; মূল গান: আজ শ্যাম মোহলিয়ে দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২৭।

[৯] কেদারা—ধামার। হৃদি মন্দির দ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ দ্র গীত ১। ১২৮; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮২; স্বর ২৩।

[১০] ভূপালি—কাওয়ালি। আজি এ ভারত লজ্জিত হে দ্র গীত ১। ২৬২-৬৩; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮২-৮৩; স্বর ৪৭; স্বরলিপি: সরলা দেবী দ্র ভারতী, মাঘ ১৩০৬। ৯০৬-০৮।

[১১] ছায়ানট—চৌতাল। তোমারি সেবক করহে আজি হতে আমারে দ্র গীত ১। ৫৪; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৭; স্বর ৪।

[১২] গৌড়মল্লার—কাওয়ালি। সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে দ্র গীত ১। ১৭৬; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৭; স্বর ৮; মূল গান: দারাদীম্ দারা দীম্ দারা দীম্ দারা দ্র গবেষণা গ্রন্থমালা ৩। ৯২-৯৩।

[১৩] পিলু—মধ্যমান। দিন যায়রে দিন যায় বিষাদে দ্র গীত ১। ১৭৬-৭৭; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৭; স্বর ৬২; মূল গান: বেনিজা রয়ননদ দ্র ত্রিবেণীসংগম। ২৭।

[১৪] দেশ—একতালা। প্রভু খেলেছি অনেক খেলা দ্র গীত ৩। ৮৪৭; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৭, স্বর ২২।

[১৫] কীর্তন। কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে [আখর-সহ] দ্র গীত ৩। ৮৪৯; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৭-৮৮; স্বরলিপি নেই।

[১৬] আড়ানা—চৌতাল। বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে দ্র গীত ১। ১৮৫; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৮; স্বর ২৪; মূল গান: বেণী নিরখত ভুজঙ্গ পতাল দ্র গবেষণা গ্রন্থমালা ৩। ২১-২৩

[১৭] সিন্ধুড়া—ঝাঁপতাল। কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে দ্র গীত ১। ২০১-০২; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৮; স্বর ২৬; এইটিও সম্ভবত হিন্দি গান ভাঙা।

[১৮] বড় হংস সারঙ্গ—একতালা। ভুবন হইতে ভুবনদাসী এস আপন হৃদয়ে দ্র গীত ১। ১১১-১২; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৮; স্বর ২৩।

[১৯] বেহাগ—চৌতাল। ভয় হতে তব অভয় মাঝে দ্র গীত ১। ৫৭; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৮; স্বর ২২; কল্পনা ৭। ২০১ ['জন্মদিনের গান']। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'অনুমান ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শিলাইদহে বাসকালে জন্মদিন স্মরণে রচিত।'[৭৫] এই অনুমান সম্পর্কে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ২৫ বৈশাখও শিলাইদহে ছিলেন—বরং প্রথমাবধি প্রায় পুরো জ্যৈষ্ঠ মাস তিনি কলকাতায় অবস্থান করেন!

[২০] কালাংড়া—ঠুংরি। ইচ্ছা যবে হবে লইয়ো পারে দ্র গীত ১। ১৭৮; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৮; স্বর ২৬।

[২১] সিন্ধু—একতালা! প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমারে দিবসরাত দ্র গীত ১।১৬২; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৮; স্বর ২৩।

[২২] কীর্তন। আমি সংসারে মন দিয়েছিনু [আখর-সহ] দ্র গীত ৩। ৮৪৮; তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৮-৮৯; স্বর ২৭; আখর-ছাড়া পাঠটি কল্পনা-য় 'পূর্ণকাম' নামে [দ্র ৭। ২০১-০২] মুদ্রিত হয়।

প্রাতঃকালীন উপাসনায় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে '...ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বেদিগ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া একটী বক্তৃতা পাঠ করিলেন।'[৭৬] বক্তৃতাটি উদ্ধৃত হয় নি, সুতরাং অনুমান করা যায় ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে তিনি যে বক্তৃতাটি পাঠ করেন সেটিই এখানে পুনঃপঠিত হয়। মাঘ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১৬৪-৭২] মুদ্রিত এই ভাষণটি 'ব্রহ্মোপনিষদ' নামে ২৪ পৃষ্ঠার স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ৭ মাঘ [শনি 20 Jan] তারিখে। পুস্তিকাটির আখ্যাপত্র এইরূপ:

ব্রহ্মৌপনিষদ। শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দ্বারা মুদ্রিত। ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড। ৭ই মাঘ, ১৩০৬ সাল।[৭৭]

মাঘোৎসবের পরদিন ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথ বন্ধু-সন্দর্শনে যান 'নীমতলা স্ট্রীট'-এ প্রিয়নাথ সেনের বাড়ি। কিন্তু তার পরের দিন ১৩ মাঘ [শুক্র 26 Jan] প্রায় ৫০০ জন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা 'মহর্ষি সন্দর্শন'-এ আসেন, সেই সম্মিলন সভায় সংগীতের দায়িত্ব নিতে হয় রবীন্দ্রনাথকেই। শিবধন বিদ্যার্ণব সভার বিবরণে লিখেছেন:

ত্রয়োদশ মাঘের সুশীতল প্রভাতে ব্রাহ্মগণ যোড়াসাঁকোস্থ ভবনের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিলেন।···তখন কাব্যগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বীণাবিনিন্দিত মোহন-কণ্ঠে তাঁহারই রচিত 'তোমারি নামে নয়ন মেলিনু···' এই নবসঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।...প্রার্থনার পরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু তাঁহার নবরচিত সুমধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—'আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু···'/আদি সমাজের কয়েক জন গায়ক এই কীর্ত্তনে যোগ দান করিলেন এবং সঙ্গে মৃদঙ্গকরতাল বাজিতে লাগিল; শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হারমোনিয়ম্ বাজাইয়া সঙ্গীত এবং কীর্ত্তনের মাধুর্য্যকে মধুরতর করিয়াছিলেন।[৭৮]

১৪ মাঘ [শনি 27 Jan] রবীন্দ্রনাথ আবার 'প্রিয়নাথ সেনের বাটী' যাতায়াত করেন, ১৫ মাঘ যান বালিগঞ্জে। এই সময়ে মহর্ষির প্রপৌত্র দিনেন্দ্রনাথের বিবাহের আয়োজন চলছে মহাসমারোহে। সেই বিবাহের হিসাবে 'রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের হোটেলে খাবার জন্য' ৩ টাকা ব্যয় হয় ১৯ মাঘ তারিখে। ২১ মাঘ তিনি যান বিডন স্ট্রীটে।

২২ মাঘ [রবি 4 Feb] সরস্বতী পূজার দিনে রবীন্দ্রনাথ সংগীত-সমাজে যান সারস্বত সম্মিলনে যোগদান করতে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন: 'সারস্বত সম্মিলনে নিমন্ত্রণপত্র বাসন্তী বর্ণের কাগজে মুদ্রিত হইত এবং সমাজের সভ্যগণকে বাসন্তী বর্ণে রঞ্জিত ধুতি, জামা ও চাদর পরিধান করিয়া সমাজে আসিতে অনুরোধ করা হইত।'[৭৯]

২৩ মাঘ [সোম 5 Feb] রবীন্দ্রনাথ আবার প্রিয়নাথ সেনের বাড়ি যান। এই দিনই দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের ছোটবোন সুনয়নী দেবীর কন্যা বীণাপাণির বিবাহ হয়।

দিনেন্দ্রনাথের বিবাহের পরদিন ২৪ মাঘ [মঙ্গল 6 Feb] রবীন্দ্রনাথের 'সিয়ালদহ ষ্টেসন যাইবার' ও ২৭ মাঘ [শুক্র 9 Feb] 'সিয়ালদহ হইতে বাটী আসার' গাড়িভাড়ার হিসাব পাওয়া যায় তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে। এর সঙ্গে ৭ ফাল্গুনে লিখিত 'খোদ বাবু মহাশয়ের যশোর যাইবার সময় ষ্টেসনের মুটে' হিসাবটি মিলিয়ে আমাদের অনুমান, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত যশোহরে লোকেন্দ্রনাথ পালিতের কাছে গিয়েছিলেন। আমরা আগেই বলেছি, চল্লিশ হাজার ঋণ নেওয়ার পরও তাঁর ঋণের প্রয়োজন মেটে নি। তাই কিছুদিন থেকে লোকেন্দ্রনাথও তাঁর অন্যতম উত্তমর্ণ। '৮ ফেব্রুয়ারির জমা' হিসেবে লেখা হয়: 'মা° বাবু লোকেন্দ্রনাথ পালিত দং হাওলাত

লওয়া যায়...৪০০০৲'—হয়তো এই টাকা আনার জন্যই রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন। আবার ২২ ফাল্গুন [সোম 5 Mar] 'মা° বাবু লোকেন্দ্রনাথ পালিত দং হাওলাত লওয়ায় গুঃ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০০০৲' হিসাব পাওয়া যায়। এই ঋণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে একটি পত্রে [Aug 1900] লিখেছেন: 'আমার বাড়ি তৈরি বাবদ্ লোকেনের কাছে আমি ৫০০০৲ টাকা ঋণী ঐ সম্বন্ধে খুচ্‌রো ঋণ আরো কিছু আছে।'[৮০] এই ঋণ শোধ করার জন্য গ্রন্থস্বত্ব বিক্রি করা প্রভৃতি বিচিত্র পরিকল্পনা তিনি সেই সময়ে করেছিলেন।

মাঘ ১৩০৬-এ বিভিন্ন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হয়। শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত 'উপদেশ' মুদ্রিত হয় তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১৬৪-৭২] ও মাঘোৎসবের 'আজি এ ভারত লজ্জিত হে' গানটির সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি ভারতী-তে [পৃ ৯০৬-০৮] মুদ্রিত হয়, একথা আমরা আগেই বলেছি। উৎসাহ পত্রিকার আষাঢ়-মাঘ সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হয়, তার ৪৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় ২ কার্তিকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'প্রার্থনাতীত দান' [দ্র কথা ৭। ৬২] কবিতাটি। এছাড়া মাঘ ১৩০৬ [পৃ ৪১-৪৮]-সংখ্যা প্রদীপ-এর জন্য তিনি লেখেন 'কাদম্বরী চিত্র' [দ্র প্রাচীন সাহিত্য ৫। ৫৩৭-৪৮] প্রবন্ধটি। তরুণ শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়-অঙ্কিত তৈলচিত্র 'শূদ্রকের রাজসভা'র প্রতিলিপি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়; রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা হয় চিত্রটি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লিখে দেবার জন্য। এই অনুরোধের ফলেই বাণভট্টের অপূর্ব গদ্যকাব্য কাদম্বরী সম্পর্কে এই অসামান্য প্রবন্ধটি আমরা লাভ করেছি। অবশ্য অনেকটা বাণভট্টেরই মতো রবীন্দ্রনাথ উপলক্ষিত বিষয়কে অতিক্রম করে রামায়ণ-মহাভারত থেকে জয়দেব পর্যন্ত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রবণতাটি সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। এরূপ অন্তর্দৃষ্টি অন্যত্র দুর্লভ।

এখানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে দেশীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন সেটিও উল্লেখযোগ্য:

> এ কথা নিশ্চয়, সংস্কৃত-সাহিত্যে আঁকিবার বিষয়ের অভাব নাই। কিন্তু শিল্প-বিদ্যালয়ে আমাদিগকে অগত্যা য়ুরোপীয় চিত্রাদির অনুকরণ করিয়া আঁকিতে শিখিতে হয়। তাহাতে হাত এবং মন বিলাতি ছবির ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহার আর কোনো উপায় থাকে না। সেই অভ্যস্ত পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেশী চক্ষু দিয়া দেশী চিত্রবিষয়কে দেখা আমাদের পক্ষে কঠিন।

সৌভাগ্যক্রমে ই. বি. হ্যাভেল [Ernest Binfield Havell, 1861-1934] কলকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে আসার পর [6 Jul 1896: ২৩ আষাঢ় ১৩০৩] স্কুলে পাশ্চাত্য-রীতিতে শিল্পশিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। এরপর অবনীন্দ্রনাথের সহযোগে চিত্রকলায় 'বেঙ্গল স্কুল'-এর উদ্ভব। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা স্মরণ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ: 'রবিকাকা আমায় বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে। রবিকাকা আমাকে এই পর্যন্ত বাতলে দিলেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে। লেগে গেলুম পদাবলী পড়তে। প্রথম ছবি করি ভারতীয় পদ্ধতিতে গোবিন্দদাসের দু-লাইন কবিতা'।[৮১]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ২/২ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে শোভাবাজার রাজবাড়িতে ৮ শ্রাবণ ১৩০০ [রবি 23 Jul] 1893] তারিখে দি বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার নামে, পরে পুনর্গঠিত হয় ১৭ বৈশাখ ১৩০১ [রবি 29 Apr 1894] তারিখে। পরবর্তী কালে ঠিকানাটি পরিবর্তিত হয়ে ১০৬/১ গ্রে স্ট্রীট হলেও পরিষদের আশ্রয়দাতা ছিলেন রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব। এটি যে কিছু সদস্যের পছন্দ হচ্ছিল না। 'মান্যবর শ্রীযুক্ত সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু' ২৩ মাঘের [সোম 5 Feb 1900] এই চিঠি তার প্রমাণ:

সবিনয় নিবেদন,/পরিষদের অধিবেশন ও কার্য্যালয় যাহাতে কোন সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং তৎসম্পর্কে নিয়মাবলীর আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিবার জন্য, আপনি যথাসম্ভব শীঘ্র পরিষদের একটী বিশেষ সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করেন, আমাদের এই বিনীত অনুরোধ জানিবেন। ইতি—/ভবদীয়

—এর পর পত্রটি স্বাক্ষরিত হয় যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রজনীকান্ত গুপ্ত, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ এগারোজন সদস্যের দ্বারা। বোঝা যায়, অনেক আলোচনার পর এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল এবং এ-ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির বিশেষ ভূমিকা ছিল—কারণ এগারোজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে চারজনই ঠাকুরপরিবারের ও প্রথম স্বাক্ষরদাতা হলেন রবীন্দ্রনাথ।

সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে অন্যতর সহকারী সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৩ ফাল্গুন [বুধ 19 Feb] বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময়ে পরিষদ-কার্যালয়ে একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করেন। পরিষদের সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রস্তাব করেন, পরিষদের কার্য্যালয় কোন সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত হউক, পরিষদের অধিবেশন সেখানেই হইবে। তদ্ভিন্ন পরিষদের তৃতীয় নিয়ম হইতে "সভাবাজারস্থ ১০৬। ১ নং গ্রে ষ্ট্রীট" ও "রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে" এই দুইটী অংশ ত্যক্ত হউক। তিনি বলিলেন, পরিষদ্ যদি আপনার শক্তিতে আপনি স্বতন্ত্র স্থানে স্থানান্তরিত হইতে পারে, তবে তাহাতে তাহার হিতার্থী রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সকলের অপেক্ষা অধিক আনন্দ; আর তিনি যখন শুনিবেন যে অদ্যকার এই আলোচনায় নানা ব্যক্তিগত কথা উঠিয়াছে, তখন তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইবেন। তবে আশা করা যায়, বঙ্গসাহিত্যের মুখ চাহিয়া আমরা এসকল ভুলিব। পরিষদ্ সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার সময় আসিয়াছে, এই বিশ্বাসে আমি ত পূর্ব্বেও একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম।'[৮২]

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এই প্রস্তাব সমর্থন করলে কিছু তর্কের পর বিরুদ্ধবাদীরা সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। তখন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

প্রস্তাব অনুযায়ী পরিষদের কার্যালয় পরদিনই [৪ ফাল্গুন: 20 Feb] উঠে আসে ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে। 'এই স্থানপরিবর্তনের কাজে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্যক্তিগতভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন।'[৮৩]

সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম তিন বৎসর [১৩০১-০৩] রবীন্দ্রনাথ সহকারী সভাপতি থাকলেও পরিষদের কাজকর্মে তাঁর যথেষ্ট সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া গেছে এমন বলা যায় না। কলকাতায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন বা মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত হন নি, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অবশ্য বাৎসরিক বারো টাকা চাঁদা তিনি নিয়মিত পরিশোধ করেছেন। কিন্তু শোভাবাজার রাজবাড়ির আশ্রয় থেকে 'সাধারণ স্থানে স্থানান্তরিত' হবার পর থেকে পরিষদ অনেক বেশি পরিমাণে তাঁর সহযোগিতা লাভ করতে থাকে। পত্রিকা-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২১ চৈত্র [বুধ 3 Apr] তাঁকে লেখেন: '···একটি ভিক্ষা আছে। পরিষৎ পত্রিকার বৈশাখের সংখ্যার জন্য একটি প্রবন্ধ; ব্যাকরণ বা ভাষাতত্ত্ব ঘটিত প্রবন্ধ হইলেই ভাল হয়।···বর্ষারম্ভে আপনার হাত হইতে এই কার্য্যের সূচনা হয় এইরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি।'[৮৪] রবীন্দ্রনাথ অবিলম্বে এই প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন, তাঁর 'বাঙ্গালা শব্দদ্বৈত' [দ্র শব্দতত্ত্ব ১২। ৩৭১-৭৩] প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-র বৈশাখ ১৩০৭ [পৃ ৬০-৬২]-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকলেও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন স্থানে গতায়াত অব্যাহত ছিল। যশোহর থেকে ফিরে ২৮ মাঘ [শনি 10 Feb] তিনি বালিগঞ্জে যান। এছাড়া তিনি বালিগঞ্জে গিয়েছেন ২, ৭, ১৪ ও ১৫ ফাল্গুনে। ১ ফাল্গুন [সোম 12 Feb] জোড়াগির্জা ও সংগীতসমাজ, ৩ ফাল্গুন নিমতলা স্ট্রীট ও বাগবাজার, ৬ ফাল্গুন নারিকেলডাঙ্গা ও সংগীতসমাজ, ৮ ফাল্গুন বিডন স্ট্রীট ও নিমতলা, ১২ ফাল্গুন জোড়াগির্জা, ১৩ ফাল্গুন প্রিয়বাবুর বাটী ও সংগীতসমাজ—এই সব জায়গায় যাতায়াতের হিসাব তাঁর নিজস্ব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, জগদীশচন্দ্রের বাড়ি সার্কুলার রোডে বা ধর্মতলায় যাওয়ার কোনো হিসাব এর মধ্যে নেই। তাহলে কি জগদীশচন্দ্রই তাঁর কাছে আসতেন? কথা গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করায় তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া লিখিতভাবে প্রকাশিত হয় নি।

৪ অগ্র° [রবি 19 Nov] 'বিচারক' [ও 'পণরক্ষা'] কবিতা লেখার পর রবীন্দ্রনাথের দু'টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও দু'টি গদ্যরচনা ও মাঘোৎসবের জন্য কিছু গান লেখা ছাড়া তাঁর সাহিত্যচর্চা স্তব্ধ। এদিকে 'কাহিনী' মুদ্রণের আয়োজন শুরু হয়ে যায় ১৮ মাঘ [বুধ 31 Jan] তারিখে, এই দিন 'জায়' খাতে 'কাহিনীর কাগজ ৪ রিম ৫।০ হিসাবে ২১৲' টাকা খরচের হিসাব পাওয়া যায়। ১৫ ফাল্গুন [সোম 26 Feb] তিনি লিখলেন কাহিনী-র শেষ রচনা 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' [দ্র কাহিনী ৫। ১৫৪-৬২]। জগদীশচন্দ্র তাঁকে কর্ণ-সম্পর্কে লিখতে অনুরোধ করেছিলেন, প্রথমে মৌখিকভাবে ও পরে 20 May 1899 [৮ জ্যৈষ্ঠ] তারিখে লিখিত পত্রে। সেই অনুরোধ এতদিনে পূর্ণ হল। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রাক্-সন্ধ্যায় স্বল্পকালীন অবকাশে কর্ণ ও কুন্তীর সংলাপের মধ্য দিয়ে—'কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবন···ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয়, জয় অপেক্ষাও মহত্তর'[৮৫]—কর্ণের সমগ্র জীবনের ট্র্যাজেডির এই নাটকীয় উপস্থাপনা অপূর্ব শিল্পকৌশলের পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ কাহিনী গ্রন্থ ত্রিপুরার রাজ-বন্ধু রাধাকিশোর মাণিক্যকে উৎসর্গ করবার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, এর উত্তরে রাধাকিশোর ১৫ ফাল্গুন [সোম 26 Feb] লেখেন: 'কাহিনী গ্রন্থের সহিত আমার নাম সংস্রব রাখিতে আপনি ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহাতে আমার অমত হইতে পারে কি? ছাপা হইবামাত্র ১০/১২ কপি পাঠাইয়া সুখী করিবেন। এখানকার বন্ধুবান্ধবদিগকে বিতরণ করিব।'[৮৬] বই পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৪ চৈত্র [মঙ্গল 27 Mar] তাঁকে লেখেন: 'গতকল্য মহারাজের ঠিকানায় একখানি কাহিনী পাঠাইয়াছি—আশা করিতেছি তাহা মহারাজের কথঞ্চিৎ প্রীতিকর হইতে পারে। কাব্যের গুণে যদি বা না হয় ত, ঔদার্য্যগুণে।'[৮৭]

ত্রিপুরার যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ হয় ২৪ ফাল্গুন [বুধ 7 Mar] তারিখে। উল্লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানিয়ে রাধাকিশোর লিখেছেন: 'বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহাদের পাইলে এ শুভ ব্যাপার আনন্দে সম্পন্ন হয় তাঁহাদের কয়েকজনকে পাইলেই সুখী হইতে পারি। তাই আপনি, জ্যোতিবাবু, গগনবাবু, আশুবাবু [আশুতোষ চৌধুরী] ও যদি সুবিধা থাকে জগদীশবাবুকে এখানে দেখিতে ইচ্ছা করি। জগদীশবাবুর বিজ্ঞানশালা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আমার স্মরণ আছে। ভরসা করি উপরি উক্ত শুভ ব্যাপারে আপনি ত নিশ্চয়ই আসিবেন; সেই সময় আলাপ করিয়া যাহা সাব্যস্ত হয় সেরূপ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।'[৮৮]

শেষোক্ত প্রসঙ্গটির একটু টীকা আবশ্যক। এই বৎসর পৌষ মাসে রাধাকিশোর কলকাতায় অবস্থান করছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৪ পৌষ [বৃহ 28 Dec] 'বালীগঞ্জে ত্রিপুরার মহারাজার বাটী' যান। এই সময়ে রাধাকিশোরের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা লিখেছেন:

একবার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র, রবিবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে স্বীয় গবেষণার ফলাফল দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তখনো রাধাকিশোরের সহিত জগদীশবাবুর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। মহারাজ এ খবর পাইয়া বিনা নিমন্ত্রণে উক্ত কলেজের বিজ্ঞানাগারে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। জগদীশবাবু ইংরাজিতে স্বীয় গবেষণার ফলাফল ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। মহারাজ ইংরাজিতে সুশিক্ষিত ছিলেন না বলিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহার বক্তব্য বুঝিয়াছেন কি না অতি সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজ স্বয়ং দু-একটি Experiment নিজেই সম্পন্ন করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, "বাংলাতে আপনার আবিষ্কার সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা আমি পড়িয়াছি এবং বিজ্ঞান আলোচনায় আমি বিশেষ আনন্দ পাই, আমিও একজন আপনার ছাত্র।"...তারপর একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্য্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। রবিবাবু ইহাতে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন; বিশেষতঃ বুঝিলেন, জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নূতন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০্ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, ১০,০০০্ হাজার টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুর রাজ দরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন। মহারাজ রাধাকিশোর তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। কবিকে ভিক্ষুকবেশে আসিতে দেখিয়া বলেন, "এ বেশ আপনাকে সাজে না, আপনার বাঁশী বাজানই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব। প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমার রাজভোগ যোগায়। আমাদের অপেক্ষা জগতে কে আর বড় ভিক্ষুক আছে? এ ভিক্ষার ঝুলি আমাকেই শোভা পায়, আমাকেই ইহা পূর্ণ করিতে হইবে।" তখন যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ উপস্থিত। মহারাজ বলিলেন—"বর্ত্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দুএক পদ অলঙ্কার নাই বা হইল, তৎপরিবর্ত্তে জগদীশবাবু সাগরপার হইতে যে অলঙ্কারে ভারতমাতাকে ভূষিত করিবেন, তাহার তুলনা কোথায়!"[৮৯]

—জগদীশচন্দ্রের নিজস্ব বিজ্ঞানাগারের এই সময়ে প্রয়োজন হয় নি, অবশ্য তাঁর বিদেশ-বাস দীর্ঘায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের দায়িত্ব রাধাকিশোর গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু যুবরাজের বিবাহে যোগদানের জন্য রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা যাওয়া হয় নি। কিছুদিন পূর্বে তিনি পরিবারবর্গ শিলাইদহে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে পুত্রের অসুখের সংবাদ পেয়ে সম্ভবত ১৬ ফাল্গুন [মঙ্গল 27 Feb] তিনি শিলাইদহে চলে যান। 2 Mar [শুক্র ১৯ ফাল্গুন] জগদীশচন্দ্র তাঁকে লিখেছেন: 'শুনিলাম পরিবারের অসুখ বলিয়া আপনাকে শিলাইদহ যাইতে হইয়াছে।···আপনি ত্রিপুরা যাইতেছেন। মহারাজাকে আমার সসম্মান সম্ভাষণ জানাইবেন। আমি ছুটী পাইলে আসিতাম, ছুটী পাইলাম না।'[৯০] রবীন্দ্রনাথও ছুটি পান নি, পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ বাচস্পতি [দ্র রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪২৮, পাদটীকা ২] মারফৎ বস্ত্রোপহার পাঠিয়ে দেন। রাধাকিশোর এ-সম্পর্কে ১১ চৈত্র [শনি 24 Mar] তাঁকে লেখেন: 'আপনার পুত্রটির হঠাৎ অসুস্থতার দরুন আপনি বিবাহ উৎসবে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত আছি। যাহা হৌক শ্রীমানের সুস্থ সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।···পণ্ডিত মহাশয়ের যোগে আপনার বস্ত্রোপহার পাইয়াছি। বস্ত্রখানা শ্রীমতী বধূমার উপযুক্তই হইয়াছে। আপনার আশীর্ব্বাদস্বরূপ শ্রীমতী বধূমাকে দিয়াছি। ইহা শ্রীমতীর ব্যবহারে লাগিয়াছে।'[৯১]

অন্য প্রসঙ্গে যাবার আগে আমরা 25 Feb]* [রবি ১৪ ফাল্গুন] তারিখে লেখা মাধুরীলতার একটি চিঠি উদ্ধৃত করছি, শিলাইদহের সংসার ও গৃহ-বিদ্যালয়ের কিছু-কিছু খবর এতে পাওয়া যাবে:

···আমাদের highly interesting মনুসংহিতা নিয়মিত চল্‌চে। দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত দাগ দেওয়া ছিল তাই পণ্ডিত মহাশয় এখন কি পড়াবেন ভেবে পাচ্ছেন না। তৃতীয় অধ্যায় থেকে বেছে বেছে পড়া দিচ্ছেন। বিমান কাকা [রবীন্দ্রনাথের মামা ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র বিমানেন্দ্রনাথ] আসাতে

পণ্ডিত মহাশয় খুসী আছেন। সাহেব, আমরা যেদিন এলুম, আমার সামনে এসে পড়েছিল। আমাকে দেখে মনে করেছিল যে মা, তাই সরে যাচ্ছিল,···

আমাদের খাওয়া দাওয়ার বড় অসুবিধে হয়েছিল। আমাদের দুর্দ্দশা দেখে মা চামরুকে পাখী শীকার করে আনতে বলে দিয়েছেন। তাও ভাজ্‌তে হয়, ডিম না দিয়ে।···মিস্ পার্সন্‌স্ দীর্ঘ ছুটির পর একটু বিমর্ষ হয়ে রয়েছেন। উনি মনে করেছিলেন যে এবার নতুন বাড়ী হয়ে যাওয়াতে আর আমরা এখানে ফিরে আস্‌ব না।'[৯২]

মনুসংহিতা-য় প্রচারিত বিভিন্ন মত রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার লক্ষ্য হলেও এটিকে মেয়েদের পাঠ্য করতে তাঁর আপত্তি ছিল না, এই চিঠিতেই তার প্রমাণ রয়েছে। ১৭ আশ্বিন মনুসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণ খরিদের হিসাব পাওয়া যায়, ২২ পৌষ কেনা হয়েছে 'পণ্ডিত ভিম সেনের মনুভাষ্য ২ খান'। মৃণালিনী দেবীর লেখা একটি খাতা রবীন্দ্রভবনে আছে [Ms. 114], তাতে মহাভারত, উপনিষদ প্রভৃতির সঙ্গে মনুসংহিতার কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ পাওয়া যায়।

মিস্ পার্সন্‌স্ মাধুরীলতার গৃহশিক্ষিকা। আর দু'টি চিঠিতে জনৈকা Miss Algeo-র উল্লেখ আছে [পত্র ১৫, ১৬]। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর জন্যও রবীন্দ্রনাথ মিস্ বুর্ডেট প্রভৃতি বিদেশিনী সহচরী ও শিক্ষিকা নিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, ইংরেজি ইংরেজের কাছেই শেখা ভালো, সেইজন্য লরেন্সকে রথীন্দ্রনাথের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। মেয়েদের শিক্ষয়িত্রীর কাছে ইংরেজি ভাষাশিক্ষা ছাড়াও তাঁর দাবি ছিল আরো বেশি। পিয়ানো বাজাতে ও জামাকাপড় শেলাই করতে শেখানো হোক তাও তিনি চাইতেন। প্রিয়নাথ সেনকে তিনি ২৪ শ্রাবণ ১৩০৭ [8 Aug 1900] লিখেছেন: 'বেলাকে Nursing সম্বন্ধে দুই একটা বই পড়াতে ইচ্ছা করি—যদি সে সম্বন্ধে কোন ভাল বই চক্ষে পড়ে তাহলে আমার হয়ে অর্ডর দিয়ো—একটা Nursingএর বই সে পড়েছে—একটু বড়সড় গোছের রীতিমত শিক্ষার উপযোগী বই যদি পাও তাহলে ভাল হয়।'[৯৩] Sanitation সম্বন্ধে একটা বইয়ের শেষ অধ্যায়ে এসে পৌঁছানো গেছে, এটি ২৬ শ্রাবণের চিঠির খবর। সম্ভবত লণ্ডনে ডাঃ স্কটের বাড়িতে থাকার সময়ে স্কট-কন্যাদের শিক্ষাদীক্ষার যে বৈশিষ্ট্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি মেয়েদের শিক্ষার এই আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন।

আখ্যাপত্রে প্রদত্ত তারিখ অনুযায়ী কাহিনী প্রকাশিত হয় ২৪ ফাল্গুন [বুধ 7 Mar] তারিখে। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি এইরূপ:

কাহিনী।/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও/প্রকাশিত।/৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।/২৪ ফাল্গুন, ১৩০৬ সাল।/মূল্য ১্ টাকা।

উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছে:

সাদর উৎসর্গ।/শ্রীলশ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেবমাণিক্য/মহারাজ ত্রিপুরেশ্বর/করকমলে।/২০শে ফাল্গুন,/১৩০৬।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+১৬৪।

ক্যাশবহির হিসাব অনুসারে কাহিনী ছাপা হয়েছিল ৬০৯ কপি; মুদ্রণ ব্যয়: কাগজ ক্রয় ৬৩/০, ছাপান ব্যয় ৪৩।।০, বাঁধান দপ্তরীর মজুরী ব° কালু দপ্তরী ১১/৬ বাদ ৩ খানা বহি কম হওয়ায় ৩্ অর্থাৎ মোট ১১৪।।ল৬।

কাহিনী রবীন্দ্রনাথ অনেককে উপহার পাঠিয়েছিলেন। রাধাকিশোর বইটির অর্ধেক পড়েই ২১ চৈত্র [বুধ 3 Apr] তারিখে লিখেছেন:

···বাস্তবিক কবিতার গাম্ভীর্য্য রক্ষা বিষয়ে আপনি সিদ্ধহস্ত। অথবা ইহা আপনার স্বাভাবিক শক্তির নৈপুণ্য। এই গাম্ভীর্য্যের সহিত মধুরভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইয়াছি। নায়ক নায়িকার পদোচিত ভাব ও ভাষা অতি পরিপাটি হইয়াছে। পৌরাণিক প্রস্তাব প্রসঙ্গাদি অবলম্বন করিয়া আধুনিক সময়ে যে কয়খানি কাব্যাদি রচিত হইয়াছে সেগুলিতে প্রায় উক্ত পদোচিত সম্মান ও গাম্ভীর্য্য রক্ষার্থে ভাষা ও ভাবের বিশেষ কোন নৈপুণ্য দেখিতে পাই না। আপনার গ্রন্থসকল সে দোষ বর্জ্জিত। আমার বিশ্বাস ঐ সকল যথাযথ রক্ষিত হইলেই গ্রন্থের জীবন্যাস করা হইল।[৯৪]

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একই দিনে লিখেছেন:

···'গান্ধারীর আবেদন' পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, এবার পড়িয়াও আনন্দের মাত্রা কমিল না। আমাদের পুরাতন মহাকাব্যের জীবন্ত রক্তমাংসময় চরিত্রগুলিকে আরও সতেজ ও আরও জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য যে ক্ষমতার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা বিস্ময়কর।···অমাবাইয়ের ঐতিহাসিক কথা ও সোমকের পৌরাণিক কথা আমাদের বর্তমান কালের অবস্থায় পথ্যস্বরূপ হইয়াছে, বলিলে বোধ হয় আপনি সন্তুষ্ট হইবেন না, কেননা কবির প্রতিভা নৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া বদ্ধ থাকিতে চায় না ও কালাকালের অপেক্ষা করে না, কিন্তু তথাপি কাহিনীর এই অংশ এবং পূর্ব্বপ্রকাশিত 'কথা'র কথাগুলি আমাদের কঙ্কালবর্জ্জিত শরীরে অস্থি গঠনে সহায়তা করিবে বলিয়া আমি কতকটা আশা করি। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অন্য কাহিনীগুলির সহিত নিশ্চয় যুক্ত হয় নাই; স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে বাহির হইলে মন্দ হইত না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্রাহ্মণের প্রতি আপনার মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ শর প্রয়োগ দেখিয়া আমি অনেক সময় ব্যথা পাইয়াছি বটে, কিন্তু একবার সাধনায় প্রকাশিত জাবালি সত্যকাম সংবাদ পড়িয়া সে দুঃখ গিয়াছিল, এবার 'কর্ণকুন্তী সংবাদে' তাহা অন্তর্হিত হইল, কর্ণ চরিত্রের মাহাত্ম্য যিনি এরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কর্ণ চরিত্রের সৃষ্টিকর্তা ব্রাহ্মণের মাহাত্মে তিনি অজ্ঞাতসারে অভিভূত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।[৯৫]

ড গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 29 Mar [বৃহ ১৬ চৈত্র] চিঠি লিখেছেন একত্রে কথা এবং কাহিনী-র প্রাপ্তিস্বীকার করে:

···আপনার "কথা"য় দর্শনবিজ্ঞানের অনেক সার কথা মধুর কাব্যরসে সিক্ত হইয়া সরসভাবে বিবৃত হইয়াছে; এবং আপনার "কাহিনী"তে মানবপ্রকৃতির অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব কল্পনার কমনীয় প্রতিভায় বিভাসিত হইয়া বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ কাব্যপাঠে একদা জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করা যায়।[৯৬]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮ চৈত্র [শনি 31 Mar] রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন:

"কর্ণ ও কুন্তী সংবাদ"—যেটির রচনাকালে একদিন গিয়া আপনাকে বিরক্ত করিয়াছিলাম—অতি সুন্দর লাগিল। সাইকলজিক্যাল ইন্টারেস্টটুকু এমন সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন, পাঠকালে বুকের ভিতর গুর গুর করিয়া উঠে।[৯৭]

এই চিঠিরই পরিশিষ্টে কিঞ্চিৎ ভিন্ন হস্তাক্ষরে একটি উদ্ধারযোগ্য সমালোচনা 'কস্যচিৎ ভক্তস্য' স্বাক্ষর-যুক্ত:

তাজমহলের উপর কারিকুরি, যে সে কারিকরের কর্ম্ম নয়। কাহিনীর প্রথম গল্প পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি [1] মহাভারতের চিত্র কিম্বা চরিত্র—মহাভারতে যাহা আছে তাহার অপেক্ষা যে সুন্দর ও সুগম্ভীর করিতে পারা যায় আপনার "বিদায় অভিশাপ" পড়িবার পূর্ব্বে সে জ্ঞান ছিল না। কাহিনীতে আগা ও গোড়ার দুটি সুগম্ভীর চিত্রের মধ্যে ক্ষীরো নিরোর কথা কেন আনিলেন বুঝিতে পারিলাম না। রাজারাণী আঁকিতে যেরূপ চিত্রবিদ্যার দরকার, ধাঙরের ছেলে আঁকিতেও সেইরূপ শিল্পচাতুর্য্যের দরকার—তবে রাজরাণীর কোলে ধাঙরের ছেলে এইরূপ কোন চিত্র দেখিলে কেমন বিসদৃশ বোধ হয়।

"কথা", "কণিকা" ও "কাহিনী" আপনার এই ৩টি পিটোপিটি সন্তানের মধ্যে কণিকাটিকে আমি বড় সুন্দর দেখি। এরূপ ধাঁচের সুন্দর মুখ বাঙ্গলায় কুত্রাপি দেখি নাই। সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা পড়িয়া ধারণা হইয়াছিল যে আদিরস ভিন্ন ছোট কবিতা মজিতে পারে না। নিরামিষ তরকারী এমন সুন্দর অন্য কোথাও খাই নাই।[৯৮]

চন্দ্রনাথ বসুকেও কাহিনী পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সম্ভবত ডাকের গোলমালে তিনি বইটি পান নি। ৩০ শ্রাবণ, ১৩০৭ [14 Aug 1900] একটি পত্রে তিনি কণিকা কথা কল্পনা ও ক্ষণিকা-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

করেছেন, অথচ তাতে কাহিনী-র উল্লেখ নেই দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনের কাছে এইরূপ আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছিলেন [দ্র চিঠিপত্র ৮। ১২৩, পত্র ১২১]।

ভারতী-সম্পাদিকা সরলা দেবীর তাগিদে সম্ভবত চৈত্র মাসের গোড়ার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ চিরকুমার সভা লিখতে আরম্ভ করেন। প্রভাতকুমার ৬ চৈত্র [সোম 19 Apr] তাঁকে লিখেছেন:

বৈশাখে আপনার সামাজিক গল্প আরম্ভ হইবে, তাহা বঙ্গবাসী সঞ্জীবনী হিতবাদী বসুমতী সময় এবং প্রদীপে উচ্চৈঃস্বরে announced হইয়াছে। চৈত্রের ভারতীর বিজ্ঞাপনে ব্যাপারটা এইরূপে announce করা হইতেছে:—

বৈশাখে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “ ” শীর্ষক একটি ধারাবাহিক গল্প আরম্ভ করিবেন। উহা উপন্যাস ও প্রহসনের মধ্যজাতীয়। বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন সামগ্রী হইবে।[৯৯]

নষ্টনীড় লেখার জন্য ‘খুব শক্ত তাগিদ এবং প্রলোভন’ আসার কথা রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লিখেছেন [দ্র চিঠিপত্র ৮। ১৭৭], এবারও তা ছিল। ২৯ চৈত্র তাঁর ক্যাশবহিতে লেখা হয়েছে: ‘মা° শ্রীমতী সরলাসুন্দরী দেবী দং ভারতী কার্য্যালয় হইতে প্রাপ্ত গিণি ৫ থান ৭৫৲’। এর আগেই চিরকুমার সভা-র প্রথম কিস্তি ভারতী কার্যালয়ে পৌঁছে গিয়েছিল; প্রভাতকুমার পূর্বোক্ত ১৮ চৈত্রের [শনি 31 Mar] পত্রে লিখেছেন:

দেবী “ভারতীর” পুরোহিতাকে উৎকোচ দিয়া, “চিরকুমার সভা” পাণ্ডুলিপিতেই পড়িয়া লইয়াছি। উহা মধু এবং গুড় কোনও কোটাতেই পড়ে নাই বটে,—কারণ উহা নেবু দেওয়া বরফ দেওয়া সরবৎ। আপনার অকারণ শঙ্কা দেখিয়া হাসি পাইতেছে। আমি দেখিতেছি, আমি আপনার চেয়ে ভাল tester—আমি চাখিয়া বলিতেছি পাঠক সাধারণ “তৃপ্তহস্মি” বলিয়া আপনাকে আশীর্বাদ করিবে।[১০০]

চৈত্র ১৩০৬-সংখ্যা ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথের দু’টি কবিতা মুদ্রিত হয়:

১০৫৯ ‘চৈত্রপূর্ণিমা’ দ্র কল্পনা ৭। ১৩৩-৩৪ [‘চৈত্ররজনী’]

১০৯০-৯২ ‘বসন্ত’ দ্র ঐ ৭। ১৯৩-৯৫

‘চৈত্ররজনী’ কবিতা ১৯ বৈশাখ ১৩০৪ [শনি 1 May 1897] তারিখে রচিত; ‘বসন্ত’ কবিতার রচনা-কাল জানা নেই, এটি সমকালীন রচনাও হতে পারে। এই কবিতাগুলি যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তখন কল্পনা কাব্যগ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভে—২৬ ফাল্গুন [শুক্র 9 Mar] ‘জায়/কল্পনার কাগজ ২ রিম ১০।।০’ খরচ দিয়ে গ্রন্থমুদ্রণের সূচনা হয়।

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত [1861-1940] এই সময়ে লাহোরের *Tribune* পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব ত্যাগ করে কলকাতায় অবস্থান করছেন। প্রদীপ-এর মাঘ-সংখ্যা সম্পাদনার পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দায়িত্ব ত্যাগ করলে নগেন্দ্রনাথ সেই পদে নিযুক্ত হন। কলকাতাতেই তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়, এবং অবধারিতভাবেই লেখার জন্য তিনি দরবার জানিয়েছেন। বিশিষ্ট বাঙালিদের ছবি ইতিপূর্বেই প্রদীপ-এ মুদ্রিত হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথের ছবির জন্যও নগেন্দ্রনাথ আগ্রহ দেখালে তিনি শিলাইদহ থেকে ছবি পাঠিয়ে দেন এবং সম্ভবত ২৩ ফাল্গুন [মঙ্গল 6 Mar] তাঁকে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রটি পাওয়া যায় নি, কিন্তু ২৪ ফাল্গুনে ৪৮ গ্রে স্ট্রীট থেকে লেখা নগেন্দ্রনাথের পত্রটি রক্ষিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন: ‘ছবি কয়েক দিন হইল পাইয়াছি, চিঠি আজ পাইলাম। একখানি নূতন ছবি হইলে ভাল হইত, আপনি কলিকাতায় অত দিন থাকিবেন জানিলে তুলাইয়া লইতাম। কিন্তু আমাদের বড় তাড়া, যাহা পাইয়াছি তাহাতেই চালাইতে হইবে।’ চিঠির শেষ দিকে তিনি লিখেছেন: ‘প্রদীপকে শুধু উস্কান কেন, প্রদীপে নূতন সলিতা দিতে হইবে।’ তাঁর অন্য দাবিও ছিল।

বৈশাখ ১৩০৭ থেকে 'প্রভাত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন তিনি করছিলেন। এই পত্রিকারও লেখক হিসেবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পেতে চেয়েছিলেন: 'নিত্য প্রভাতে রবির উদয় এই ত জানি। যদি সে নিয়মের অন্যথা হয় ত রবির নামের সার্থকতা রহিল কি? প্রভাত নামটা বোধ হয় নানা দিক হইতে অর্থযুক্ত হইয়াছে। গল্প কোথায়? ···আপনার কতকগুলি লেখা পাইলে অনেকটা ভরসা হয়।'[১০১] পত্রিকা প্রকাশে দেরি থাকা সত্ত্বেও লেখা সংগ্রহের এই আগ্রহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কিছু ঠাট্টা ও প্রদীপ সম্পর্কে কুমারসম্ভব-এর 'পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' শ্লোকাংশটি উদ্ধার করেছিলেন—প্রত্যুত্তরে 'সোমবার' (২৯ ফাল্গুন: 12 Mar] নগেন্দ্রনাথ লেখেন:

বয়সের হিসাবে অধৈর্য্য দোষের স্বীকার করি। কিন্তু যে দায়গ্রস্ত তাহার ধৈর্য কেমন করিয়া থাকিবে? প্রসারিত হাত কিছু পাইলে চাঞ্চল্য যাইবে না।

প্রদীপে তৈলদান স্বরূপে আপনাকে ডাকিতেছি—পতঙ্গবৎ কেন? অবশেষে নির্বাণোন্মুখ প্রদীপে কিছু তৈল দানং না হয়। তবে ভারতী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর কোন কথা নাই। অর্ঘ্যভাগের দাবী করিতে পারিনা, কিন্তু দুই চারিটা উড়ো খই প্রদীপকে নমঃ বলিয়া দিবেন না?[১০২]

নগেন্দ্রনাথ মাত্র চার মাস [ফাল্গুন ১৩০৬–জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭] প্রদীপ-এর সম্পাদক ছিলেন—এর মধ্যে প্রিয়নাথ সেনের একটি সনেটের উত্তরে লিখিত 'প্রত্যুপহার' [দ্র প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। ১৮৫; উৎসর্গ-সংযোজন ১০। ৮৭] নামে একটি সনেট ছাড়া প্রদীপ-এ তাঁর আর-কোনো রচনা প্রকাশিত হয় নি; অবশ্য প্রভাত-এ তিনি কয়েকটি গল্প ও প্রবন্ধ দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত পত্রিকাটির ফাইল উদ্ধার না হওয়ায় কয়েকটি রচনার পরোক্ষ উল্লেখ ও অনুমান ছাড়া আমাদের কিছু করবার নেই।

6 Mar [মঙ্গল ২৩ ফাল্গুন] জগদীশচন্দ্র একটি পত্রে তাঁর গবেষণা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খবর দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'আমার শরীর মন একটু অবসন্ন আছে—আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সুখী হইব। আপনি যদি শিলাইদ থাকেন তবে শুক্রবার দিন রাত্রে এখান হইতে রওয়ানা হইব। শনিবার দিন সকালে পৌঁছিব। রবিবার দিন বৈকালে ফিরিয়া আসিব। সোমবার দিন যদি ছুটী পাই তাহা হইলে আর একদিন থাকিব।'[১০৩] তাঁর 16 Mar [শুক্র ৩ চৈত্র]-এর চিঠি থেকে জানা যায়, শনিবার [২৭ ফাল্গুন: 10 Mar] তাঁর শিলাইদহ যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। উক্ত পত্রে তিনি লিখেছেন:

আমি এই দুই দিন অতি সুখে কাটাইয়াছি। আপনারা যদি আমার আসাতে কিঞ্চিন্মাত্র উৎকণ্ঠিত না হইয়া আপনাদেরই বাড়ীর একজন বলিয়া মনে করেন (এবং এইবার যেন তাহা বোধ করিয়াছি) তাহা হইলে যখন তখন আসিব। বন্ধুজায়ার অমায়িক ব্যবহারে অতিশয় সুখী হইয়াছি, এবং আপনাদের স্নিগ্ধ পারিবারিক জীবন, সহরের গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া পুত্রকন্যা পরিবেষ্ঠিত হইয়া, নীরবে অথচ কর্ম্মঠভাবে যেরূপ কাটাইতেছেন তাহা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে।···দেখিবেন, সদরের অনুগ্রহে যেন আমি অন্দরের বিরাগভাজন না হই![১০৪]

—শেষ বাক্যটি থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ 'সদর ও অন্দর' [দ্র প্রদীপ, আষাঢ় ১৩০৭। ২৩২-৩৪; গল্পগুচ্ছ ২২। ১৭৫-৭৮] গল্পটি তাঁকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে গল্প শোনানোর ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, পরে প্রসঙ্গক্রমে তার আলোচনা করা হবে।

উল্লিখিত পত্রে একটি অমীমাংসিত সমস্যার কথা আছে। জগদীশচন্দ্র লিখছেন:

'আপনার চিঠি ও পুস্তক পাইলাম। সেই লেখাটা ইতিমধ্যেই পড়িয়াছি,···আপনার লেখাতে অনেক বিজ্ঞানসম্মত মত দেখিলাম—sympathetic vibration কতদূর পাঠান যাইতে পারে তাহা বলা যায় না। এতদিন জড়জগতে এই নিয়ম আবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমার নূতন কার্য্যে জানিতেছি যে চেতন ও অচেতনের মধ্যে রেখা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। আমার নিকট অনেকবার শুনিয়া থাকিবেন যে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে

শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবির্ভূত হন নাই। কারণ যত দিন একাধারে উক্ত দুই জ্ঞানের সমাবেশ না হইবে, ততদিন উভয়ই অসম্পূর্ণ থাকিবে। তবে কবির জ্ঞান যতই সীমাহীন হইবে, যতই বিস্তারিত হইবে, কবিত্ব ততই অনন্ত কালের হইবে।'

জগদীশচন্দ্রের মধ্যে কবির কল্পনাশক্তি ছিল, যে শক্তি দিয়ে তিনি জড় ও জীবের মধ্যে সম্পর্ক অনুভব করে তাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক বিজ্ঞানশিক্ষা না থাকলেও বিজ্ঞানের বই পড়তে তিনি ভালোবাসতেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণতত্ত্বের মতো বিজ্ঞানের শাখাতেই তাঁর সঞ্চরণ ছিল বেশি যেখানে কবিকল্পনার পাখা মেলায় কোনো বাধা ছিল না। জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম্য ছিল এই ক্ষেত্রে। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার মধ্যে আছে এই সাধর্মের কথা:

বিজ্ঞান ও রসোহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুই দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে। তাঁর কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ যেখানে ছিল তাঁর অতি নিবিড় দেশপ্রীতি।[১০৫]

কিন্তু জগদীশচন্দ্রের পত্রে উল্লিখিত রবীন্দ্র-রচনাটি কী? হয়তো প্রভাত পত্রিকায় রচনাটি মুদ্রিত হয়েছিল, যার খবর আমরা এখনও পর্যন্ত জানতে পারি নি।

এই সময়ে শিলাইদহে আলুর চাষ চলছে। মাধুরীলতা ১৪ ফাল্গুন [25 Feb] জানিয়েছেন: 'আলুর বেড়া কুসুম ফুলের গাছ দিয়ে করাতে আমরা রোজ অনেক কুসুম ফুল পাই। মা সেগুলকে শুকিয়ে রং কর্‌ছেন।'[১০৬] আলু চাষের এই একটি পরোক্ষ লাভই হয়েছিল। এ-বিষয়ে প্রধান উৎসাহ ও পরামর্শদাতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 12 Mar [সোম ২৯ ফাল্গন]-এর পত্রে 'আলু কেমন হোল' দেখবার জন্য পরের সোমবার [৬ চৈত্র: 19 Mar] শিলাইদহে যাবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন। পরে তারিখ বদলে তিনি আসেন ৮ চৈত্র [বুধ 21 Mar], এ-সব কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু উক্ত অপ্রকাশিত পত্রের শেষাংশটি আমরা উদ্ধার করছি, দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র ও প্রবণতার কিছু হদিশ পাওয়া যাবে তাতে:

···এই দিকে কারুর কোন সংবাদ নেই। কাল সন্ধ্যায় বালিগঞ্জ অভিমুখে গিয়ে বড় অপ্রতিভ হলাম। কেউ কোথাও নেই। শেষে সস্ত্রীক শকটারোহণে একেবারে পালিতদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। আমার সঙ্গে কেউ আর কথা কচ্ছে না বড়। কেবল অপমান কর্ব্বার যোগাড়ে আছে।

আপিসের কার্য্যের নিষ্পেষণে বসে' গিইছি। আর ত পেরে উঠিনে। চাকরি ঢের ঢের করিছি। কিন্তু কৃষিকার্য্যবিভাগের চাকরি—বাপরে!

আপনি ত বেশ সুখে আছেন। আমার ঐ রকম একটা সুবিধা কোরে দিতে পারেন?

শারীরিক অবস্থা আমার নেহাইৎ মন্দ নয়। কিন্তু মানসিক তা আর বোলে কাজ নেই। যেরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে কার ওপর রাগটা ঝাড়ি বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে।[১০৭]

—দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গান ও প্রহসনে অনেক 'রাগ ঝেড়েছেন', কিন্তু তা ছিল অসূয়াবর্জিত—কিন্তু কয়েক বছর পরে তিনি যখন নীতির ধ্বজা তুলে রবীন্দ্রনাথের উপর 'রাগ ঝাড়তে' আরম্ভ করেন তখন তার মধ্যে অসূয়ার অবস্থিতি অস্পষ্ট নয়। উল্লেখযোগ্য, 17 Mar 1900 [শনি ৪ চৈত্র]-এর পরবর্তী দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো চিঠি রবীন্দ্র-সংগ্রহে পাওয়া যায় নি।

Acme Printing and Processing প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী প্রেমতোষ বসুকে [?—1912] রবীন্দ্রনাথ ২১ চৈত্র [বুধ 3 Apr] তারিখে লিখছেন:

একটি নূতন ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থ আপনার প্রেসে ছাপিতে দিতে ইচ্ছুক আছি। ছোট সাইজ, ৩২ পেজি—অর্থাৎ ভারতীকে দুই ভাঁজে মুড়িলে যেমন হয়—রয়াল ডবল ক্রাউনের ক্ষুদ্রতম ভাঁজ। উক্ত সাইজের ভাল গোছের বিলাতী কাগজ ডিকিন্সন্‌রা কত দরে বিক্রয় করে খবর পাইলে কাগজ কিনিবার টাকা ও পাণ্ডুলিপি আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

প্রতি পেজে আট দশ লাইনের অধিক ধরাইতে চাই না। ভাল বর্জয়িস অক্ষরে কিরূপ দেখিতে হইবে?...জিনিসটা কণিকার ধরণে স্বল্পায়তন হইবে। সবসুদ্ধ হয়ত গুটি কুড়িক কবিতা। ৬০০ খণ্ডের অধিক ছাপিব না। আপনার উত্তর পাইলে প্রস্তুত হইতে পারিব।[১০৮]

এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থটি হল 'ক্ষণিকা'। উপরের চিঠি থেকে বোঝা যায়, এই সময়ের মধ্যে গোটা কুড়ি কবিতা লেখা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই কুড়িটি কবিতা কোন্‌গুলি বোঝা শক্ত। ক্ষণিকা কাব্যের ৬২টি কবিতার মধ্যে ২৩টি কবিতার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে [Ms. 120] এবং তারিখ-সংবলিত কবিতাগুলির তারিখ পাওয়া গেছে এই পাণ্ডুলিপি থেকেই—কিন্তু সেগুলিও এত এলোমেলোভাবে সাজানো যে, তারিখ-হীন কবিতাগুলির মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা অনুমান না করাই ভালো। আমাদের ধারণা, ক্ষণিকা-র কবিতাগুলি অন্তত তিনটি খাতায় লেখা হয়েছিল, যার মধ্যে মাত্র একটি এখনো পর্যন্ত উদ্ধার করা গেছে।

যাই হোক্, প্রেমতোষ বসুকে পূর্বোক্ত ২১ চৈত্রের চিঠিটি লেখার পর রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ ২৩ চৈত্র [শুক্র 5 Apr] তাঁকে লিখেছেন:

আপনার পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত আছি। কাপি ইতিমধ্যেই পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু দুই চারিদিনের মধ্যে এখানে বন্ধু সমাগম প্রত্যাশা করিতেছি—নব রচিত কবিতাগুলি তাঁহাদিগকে শোনাইবার প্রলোভনবশতঃ এগুলি এখনো মুদ্রাযন্ত্রের লৌহজঠরে সমর্পণ করিলাম না।···একেবারে কাগজের মূল্য এবং কাপি এক সঙ্গে পাঠাইব। বইখানির নাম হইবে—ক্ষণিকা। বিষয়গুলিও তদ্রুপ। এইজন্যই ছাপাটা কাগজটা কিছু অতিরিক্ত ভাল হওয়া চাই।[১০৯]

রবীন্দ্রনাথ যে বন্ধুর সমাগমের প্রত্যাশা করছিলেন, তিনি হচ্ছেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত। লোকেন্দ্রনাথ শুধু যে ক্ষণিকা-র এতাবৎ-রচিত কবিতাগুলি শুনেছিলেন ও মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন তাই নয়, প্রত্যাবর্তনের সময়ে তার পাণ্ডুলিপিও নিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেকথাই জানিয়েছেন প্রেমতোষ বসুকে লিখিত ৩ বৈশাখ ১৩০৭ [রবি 15 Apr]-এর পত্রে:

লোকেন পালিত আমার "ক্ষণিকা"র সমস্ত কাপি এখান হইতে দস্যুবৃত্তি করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেছেন। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছি আপনার ঠিকানায় যেন কাপি পাঠাইয়া দেন। পাইলে আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইবেন আমি কাগজের বন্দোবস্ত করিয়া দিব। জিনিসটি ছোট, আশা করি ছাপিতে অধিক দেরী হইবে না।'[১১০]

ছাপতে অনেকই দেরি হয়েছিল, কিন্তু সে পরবর্তী বৎসরের কথা।

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ২৪ চৈত্র [শনি 6 Apr] তারিখে লিখিত একটি পত্রে [পত্রটি পাওয়া যায় নি] প্রিয়নাথ সেনকেও ক্ষণিকা-র বিষয়ে লিখেছিলেন; প্রিয়নাথ পরদিন তাঁকে লেখেন:

'ক্ষণিকা'র উল্লেখে বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। তুমি এমন সুন্দর নামকরণ করিতে জান। তোমার অমর প্রতিভার অক্ষয় ভাণ্ডারে আর কত অসংখ্য মণি-মাণিক্য আছে তাহা কোন বৈজ্ঞানিকও বলিতে পারে না—তুমিও পার না।[১১১]

এই পত্রেই তিনি কল্পনা চৈত্রসংক্রান্তির মধ্যে প্রকাশ করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন, 'তাহা হইলে ১৩০৬ সাল ইতিহাসে তোমার চারিখানি কাব্যগ্রন্থের চারি-হারা আলোকে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে।' কল্পনা যে এই সময়ে মাত্র চার ফর্মা ছাপা হয়েছে, এই খবরটিও চিঠিটি থেকে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ 'বৈশাখ' [দ্র কল্পনা ৭। ১৯৬-৯৮] কবিতাটি সম্ভবত চৈত্র মাসের মাঝামাঝি লিখে দেন, এটি বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী-র প্রথমেই [পৃ ১-৩] মুদ্রিত হয়।

কল্পনা-র ২৬টি কবিতা ছাড়া অন্যগুলির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, গ্রন্থেও কেবলমাত্র সাল উল্লিখিত। '১৩০৬' লিখিত এইরূপ ইতিপূর্বে অনুল্লেখিত কবিতাগুলি হল:

'অসময়' [দ্র কল্পনা ৭। ১৯১-৯৩],'রাত্রি' [দ্র ঐ ৭। ১৯৮-২০০] ও একটি সনেট 'অনবচ্ছিন্ন আমি' [দ্র ঐ।২০০]-এর মধ্যে 'অসময়' কবিতাটি ছন্দ, ভাষায় ও ভাবে 'দুঃসময়' কবিতাটিকে মনে করিয়ে দেয়। এমনও হতে পারে, এই কবিতাটি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ কাব্যটিকে সমাপ্ত করতে চেয়েছিলেন।

আমরা তারিখটি উদ্ধার করতে পারি নি, কিন্তু সম্ভবত এই বৎসরই ভারত সংগীতসমাজে রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ প্রহসনটি অভিনীত হয়। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর জামাতা যতীন্দ্রনাথ বসু বৈশাখ ১৩০৭-এর মাঝামাঝি সময়ে শিলাইদহে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর এক বন্ধুর [? লোকেন্দ্রনাথ পালিত] সঙ্গে কথোপকথনের বিবরণ দিয়ে 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' [দ্র সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০৭। ১৪৪-৪৯] নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লিখেছেন:

'···বন্ধু সঙ্গীত-সমাজের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন। রবীন্দ্র বাবু বলিলেন, "আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা সকল সময়ে নাটকের wit and humour বুঝিয়া অভিনয় করিতে পারেন না। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নাটকের পাত্রের অবস্থায় ফেলিয়া ঠিক তাহারই মত অভিনয় করা বড় দুরূহ। তদ্ব্যতীত মানুষের এমন খুঁটি নাটি অভ্যাস আছে যে, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে অভিনয় আন্তরিকতাশূন্য হইয়া পড়ে।" ইহার উদাহরণস্বরূপ তিনি বলিলেন, "আমি সঙ্গীতসমাজে 'গোড়ায় গলদ' অভিনয়ের সময় অভিনেতৃগণকে এক একটি বাজে কাজ দিয়াছিলাম। কেহ গল্প করিতে করিতে গোঁফে তা দিতেছিলেন, কেহ ফ্যাঁস্ করিয়া খবরের কাগজের কোণ ছিঁড়িয়া শলাকা পাকাইয়া কাণ চুলকাইতেছিলেন, ইত্যাদি। এ সব খুঁটিনাটিগুলিতে অভিনেতাকে স্বাভাবিক দেখায়, নহিলে নিতান্তই যেন অভিনয় হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।"[১১২]

এই ঘটনা সম্ভবত কিছুদিন আগেকার বলেই মনে হয়। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারত সংগীতসমাজে গোড়ায় গলদ অভিনয়ের বর্ণনার সঙ্গে পূর্ববর্তী কোনো পারিবারিক অভিনয়ের ঘটনা মিশিয়ে ফেললেও [দ্র রবিজীবনী ৩। ২২০-২১] কিছু-কিছু বিবরণ নির্ভরযোগ্য বলেই আমাদের ধারণা। তিনি লিখেছেন: 'সভ্যেরা উৎসাহভরে···তাঁহার কাছে শিক্ষা লইতে লাগিলেন ও প্রকাশ্য অভিনয়ে যথাকালে যথেষ্ট যশ-লাভ করেন। এক এক দিন শিক্ষাবৈঠকে রিহার্স্যালে (Rehearsal) রাত্রি দেড়টা, দুইটা বাজিয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথ পদব্রজে তখন সংকীর্ণ গলিপথ ধরিয়া কাঁশারিপাড়ার মধ্য দিয়া বাটি ফিরিতেন।'[১১৩] তিনি আরও লিখেছেন, অভিনয়ে স্বাভাবিকত্ব সৃষ্টির জন্য শিবু ডাক্তারের চরিত্রাভিনেতা অটলকুমার সেন সামনের গোটা দুই দাঁত তুলে ফেলেছিলেন—'অভিনেতারা যাহাতে দর্শকের মন হইতে সকল প্রকার কৃত্রিমতার আভাস বিলুপ্ত করিতে পারে, ও কথাবার্তায় হাবভাবে চালচলনে গলার স্বরে ও শব্দের উচ্চারণে অভিনয়ে বেশ সহজ ঘরোয়া ভাব-ভঙ্গি ফুটাইতে পারে, ইহাই ছিল সমাজের অভিনয়-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদানের বিশেষ লক্ষ্য।'[১১৪] অভিনয়ের প্রত্যক্ষদর্শী বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল বসু লেখেন:

আঁখি-মন-অভিরাম "গোড়ায় গলদ" নাম
প্রহসন লোকমন প্রফুল্লিত করে
হেমচন্দ্র বেণী সঙ্গে, প্রকাশ প্রকাশ রঙ্গে
অঙ্গভঙ্গী রঙ্গ দেখে হইল বিস্ময়
সবে সখে অভিনেতা, কে জানি এদের নেতা
প্রতিভা যে শিক্ষাদাতা বুঝি পরিচয়॥[১১৫]

—হেমচন্দ্র মল্লিক 'নিবারণ', বেণীমাধব দত্ত 'নিমাই' ও প্রকাশচন্দ্র দত্ত 'বিনোদ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন, ব্যারিস্টার ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র বসু অভিনয় করেন যথাক্রমে 'ললিত চাটুর্যে' ও 'চন্দ্রবাবু'র চরিত্রে। খগেন্দ্রনাথ লিখেছেন:

চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় শেষ গানটি শ্রীশবাবুর গেয় ছিল, কিন্তু তিনি গাইতে অক্ষম থাকায়, 'রবিবাবু' নিজ নামেই ষ্টেজে বাহির হইয়া উহা গাহিয়া দিলেন। তাঁহার অবতারণার জন্য নাটকীয় কথোপকথনে কিছু যোগ করিয়া দেওয়া হয়। 'চন্দ্রবাবু' তাঁহার বন্ধুদের রবিবাবুর গান শুনিবার জন্য একটু বসিতে বলেন, কারণ সেইদিনই তাঁহার দেখা করিতে আসিবার কথা আছে। পরে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশে সকলের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয় ও তাঁহাকে গাহিতে অনুরোধ করায় পুস্তকের সেই গীতখানি তিনি গাহিলেন।[১১৬]

ভারত সংগীত সমাজ-এর উদ্যোগে গোড়ায় গলদ-এর আর একটি অভিনয় হয় ৬ শ্রাবণ ১৩০৭ [শনি 21 Jul 1900] তারিখে। *The Bengalee* পত্রিকায় [24 Jul] এই অভিনয়ের একটি বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়:

On last Saturday evening there was a splendid dramatic entertainment given at the Samaj, which, notwithstanding the inclemency of the weather, was well attended. The piece selected was Babu Robindranath Tagore's well-known serio-comic *Gorai Galad* or "A False Start." The piece hardly affords scope for the display of histrionic talents of a high order but we are using no conventional language when we say that the acting was in almost every case as free, natural and life-like as we remember to have seen on the boards of any Indian theatre. The sceneries were, we must say, rather commonplace and the stage-management left room for improvement though the size of the stage was a rather serious and unsurmountable disadvantage.

এই অভিনয়ে কুমার মন্মথনাথ মিত্র 'নিবারণ' ও রায় অমরনাথ বসু 'বিনোদ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

মহর্ষির প্রপৌত্র দিনেন্দ্রনাথের বিবাহের আয়োজন গত বৎসর থেকেই শুরু হয়েছিল। গগনেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী সুনয়নী দেবী ও রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বীণাপাণিকে আশীর্বাদ করা হয় ৫ বৈশাখ [সোম 17 Apr] তারিখে। মহাসমারোহে বিবাহটি হয় ২৩ মাঘ [সোম 5 Feb 1900]—দিনেন্দ্রনাথের বয়স তখন আঠারো বৎসর মাত্র। বিবাহের পূর্বে মহর্ষি-পরিবারের প্রথানুযায়ী তাঁর দীক্ষা হয় ১ মাঘ [রবি 14 Jan]। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, এই বিবাহে ১২৪৯৩ টাকা সাড়ে বারো আনা খরচ হয়েছিল। এই উপলক্ষে 'এফ. ডি. বারোস সাহেব বায়োস্কোপ' দেখিয়েছিলেন, ক্যাশবহিতে তারও উল্লেখ আছে—এই প্রমোদ-উপকরণটি তখন সবেমাত্র এই দেশে এসেছে। গগনেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'বোধহয় ওদের বিয়ের সময় হঠাৎ একদিন বিদ্যেসুন্দরের যাত্রা হয়েছিল। সুন্দরের সন্ন্যাসী বেশে সেজে আসা দেখে আমি ভয়ে পালিয়ে গিয়ে মায়েরা যেখানে চিকের আড়ালে ছিলেন, সেইখানে লুকিয়েছিলুম।'[১১৭] বাল্যবিবাহ বলে কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তির পর 'ফুলশয্যা' হয় ১২ বৈশাখ ১৩০৮ [বৃহ 25 Apr 1901]। কিন্তু তাঁদের বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ঐ বৎসর ১৮ চৈত্র [মঙ্গল 1Apr 1902] বীণাপাণি দেবীর ডিপথেরিয়া রোগে মৃত্যু হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর একমাত্র পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে নিযুক্ত হন। কুচবিহারের রাজকুমারী সুকৃতি দেবীর সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ হলে এই অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে কিছু সামাজিক গুঞ্জন সৃষ্টি হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী ছিল। এই নিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতী-র ২৯ বৈশাখ [বৃহ 11 May]-সংখ্যায় লেখা হলে আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম উপাচার্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রী যে চিঠি পাঠান, তা ৫ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 18 May]-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। তিনি লেখেন: 'এই অসবর্ণ বিবাহে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের বা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বা তাঁহার পরিবারবর্গের কাহারও সহানুভূতি বা অনুমোদন নাই।'[১১৮] তিনি 15 Apr [শনি ৩ বৈশাখ] মহর্ষিকে লেখা জ্যোৎস্নানাথের একটি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধার করেন: '''এমন কি আমার পিতা মাতাও এবিবাহের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিতেছেন না,...অতঃপর আমাদের পরিবারের সহিত সেরূপ ঘনিষ্ঠ সামাজিক বন্ধন রক্ষিত হইবার আমি আশা রাখি না, কারণ তাহাতে কতক পরিমাণে পরিবারের ক্ষতির কারণ হইতে পারে।' কিন্তু বাস্তবে সেরূপ হয় নি। ৩০ জ্যৈষ্ঠতেই [12 Jun] 'শ্রীযুক্ত কর্ত্তাবাবু মহাশয়ের আদেশ মতে শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না বাবুকে উপহার দিবার দ্রব্য ক্রয়' করা হয়, ১৭ অগ্র° [শনি 2 Dec] 'জ্যোৎস্নাবাবু মহাশয় ও উঁহার স্ত্রী ২ ডিসেম্বর তারিখে এ বাটীতে আসায় উঁহাদের খাওয়ান ব্যয়' বা ১৬ পৌষ [শনি 30 Dec] 'শ্রীমতী জ্যোৎস্না বাবুর স্ত্রী এবাটীতে আসায় জলখাবার'-জাতীয় হিসাব ক্যাশবহিতে কিছু-কিছু দেখা যায়। জ্যোৎস্নানাথ বোম্বাই-প্রবাসী ছিলেন, সুতরাং এর চেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্ভব ছিল না।

৩ জ্যৈষ্ঠ (মঙ্গল 16 May] মহর্ষির এ্যশীতিতম জন্মোৎসব পালিত হয়। 'অপরাহ্ন ছয় ঘটিকার পর পরিবারস্থ সকলে যোড়াসাঁকোর বাটীতে সমবেত হইলে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রহ্মোপাসনা করিয়া···প্রার্থনা করিয়াছিলেন।' নিবেদিতা 'Wednesday' মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখেছেন: 'Yesterday was Devendra Nath Tagor's birthday. I took a branch of the Dukhineswar Bo Tree with Swami's pranams.'[১১৯]

বলেন্দ্রনাথের অসুস্থতা ও চিকিৎসা বিষয়ে আমরা জীবনকথা অংশে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে ঊনত্রিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই ৩ ভাদ্র [শনি 19 Aug] ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৩ ভাদ্র [মঙ্গল 29 Aug] তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধে দিনেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন [দ্র তত্ত্ব°, আশ্বিন। ১০২-০৩]।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই ৬ ভাদ্র [মঙ্গল 22 Aug] দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা ও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী উষাবতী দেবীর মৃত্যু হয়।

২৩ ভাদ্র [শুক্র 8 Sep] মহর্ষি তাঁর Last Will and Testament-এ স্বাক্ষর করেন, এই উইলের ক্রোড়পত্র Codicil স্বাক্ষরিত হয় ১ আশ্বিন [রবি 17 Sep] তারিখে। পৌত্রদ্বয় দ্বিপেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ এবং পুত্র রবীন্দ্রনাথ এই উইলের executor নিযুক্ত হন। অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধ করতে সম্মত জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্রকে দশ হাজার টাকা দিতে নির্দেশ করেন তিনি। অব্যয়িত অর্থ, গুণেন্দ্রনাথের এস্টেট থেকে প্রাপ্য অর্থ থেকে মাসিক ২০০ টাকা ও নিজ সম্পত্তি থেকে মাসিক ৩০০ টাকা তিনি শান্তিনিকেতনের ট্রাস্টীদের জন্য বরাদ্দ করেন। আমরণ মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্য ১২৫০ টাকা, সোমেন্দ্রনাথের জন্য ২০০ টাকা, বীরেন্দ্রনাথ প্রফুল্লময়ী দেবী ও সাহানা দেবীর জন্য মাথাপিছু ১০০ টাকা এবং জ্যেষ্ঠ পৌত্র

দ্বিপেন্দ্রনাথের জন্য ৫০০ টাকা। দ্বিপেন্দ্রনাথ জুয়েলারি, বাসন-কোসন, গাড়িঘোড়া প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট হন। তাঁর কন্যাদের মধ্যে কেউ দুঃস্থা হয়ে পড়লে তাঁকে বা তাঁদের সর্বাধিক ৪০০ টাকা মাসিক ভাতা দেওয়া যেতে পারে। বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম পরগণার জমিদারি সমান অংশে দেওয়া হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ বা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের। মৃত হেমেন্দ্রনাথের তিন পুত্র হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ বা তাঁদের উত্তরাধিকারীরা পান উড়িষ্যার পাণ্ডুয়া পহরাজপুর ও বালিয়া-র জমিদারি। ভদ্রাসন বাড়ির ঠাকুর দালানে পরমব্রহ্মের উপাসনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিপেন্দ্রনাথ বা তাঁদের পুরুষ উত্তরাধিকারীগণ সেবাইত নিযুক্ত হন, এই কাজে বার্ষিক ২০০০ টাকা বরাদ্দ হয়। ভদ্রাসন বাড়ির বিভিন্ন অংশ সুনির্দিষ্টভাবে পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। যাতায়াতের সুবিধার জন্য সিঁড়ি প্রভৃতি তৈরি করার জন্য হেমেন্দ্রনাথের পুত্রগণ ও রবীন্দ্রনাথ ২০০০ টাকা করে পান। দ্বিজেন্দ্রনাথের নামে কেনা ২/১ চাষাধোপাপাড়া লেনের বাড়িটি মহর্ষি শ্যালক ব্রজেন্দ্রনাথ রায়কে দান করেন।

কিন্তু মূল উইলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বসবাসের জন্য ভদ্রাসন বাড়ির কোনো অংশ বরাদ্দ হয় নি, Codicil-এ এই ত্রুটি সংশোধিত হয় সৌদামিনী দেবীর ব্যবহৃত অংশটির জীবনস্বত্বে তাঁকে দিয়ে।

সলিসিটার মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় উইলটি পড়ে শোনানোর পর তাঁর, ডাঃ এম. এন. ব্যানার্জি, ইঞ্জিনিয়ার প্রসন্নকুমার সেন ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর সাক্ষাতে মহর্ষি উইলটিতে স্বাক্ষর করেন। Codicil স্বাক্ষরিত হয় মোহিনীমোহন, সত্যপ্রসাদ ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর সাক্ষাতে।

২৪ ফাল্গুন [বুধ 7 Mar 1900] হেমেন্দ্রনাথের সপ্তম কন্যা সুষমা দেবীর বিবাহ হয় ব্যারিস্টার যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এঁর ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ বিবাহ করেন শোভনা দেবীকে। বর্তমান বিবাহে মহর্ষি পাত্রকে ৪০০০ টাকা যৌতুক দেন। লক্ষণীয়, সুষমার জ্যেষ্ঠা সুনৃতা দেবীর তখনও বিবাহ হয় নি। ট্রিনিটি কলেজের পিয়ানো পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সুষমার আকর্ষণীয়তা তখন অনেক বেশি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের বিবাহের আয়োজনও এই বৎসর শুরু হয়। নির্বাচিত পাত্রী সুকেশী দেবীকে আশীর্বাদ করা হয় অগ্রহায়ণে। বিবাহ হয় অবশ্য পরের বছর ১৭ আষাঢ় ১৩০৭ [রবি 1 Jul 1900] তারিখে।

দেবেন্দ্রনাথের শ্যালক ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু হয় মধুপুরে, তাঁর মৃত্যুসংবাদ জোড়াসাঁকোয় পৌঁছয় ২৪ চৈত্র [শুক্র 7 Apr]। এঁর পুত্র বিমানেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ; ১ বৈশাখ (বৃহ 13 Apr] থেকে ক্ষিতীন্দ্রনাথের স্থানে সুরেন্দ্রনাথ ঐ পদে নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল রাজনারায়ণ বসু সমাজের সভাপতি ছিলেন। ২ আশ্বিন [সোম 18 Sep] তাঁর মৃত্যু হলে ১ অগ্র° [বৃহ 16 Nov] থেকে 'আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সভাপতি' নিযুক্ত হন আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ।

শ্যামসুন্দর মিশ্র ২৫ টাকা বেতনে আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক নিযুক্ত হন বৈশাখ মাস থেকে। প্রসিদ্ধ স্বরলিপিকার কাঙালীচরণ সেন গায়ক হিসেবে সমাজে যোগ দেন এই বৎসরের পৌষ মাসে।

১২ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 25 May] বৈশাখীপূর্ণিমা তিথিতে মহাবোধি সভার মহোৎসব হয়। 'এই সংবাদ সূচিত করিবার নিমিত্ত তৎপূর্ব্ব ৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার প্রাতঃকালে এই মহাবোধি সভার নেতা ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক অনাগরিক এইচ ধর্ম্মপাল মহাশয়...পূজ্যপাদ ব্রাহ্মসমাজ-গুরু শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট সমাগত হইলে মহর্ষি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।'[১২০] ধর্মপাল মহর্ষির অনুমতি নিয়ে 'রত্নসুত্তং' নামক গাথা পাঠ করেন। আষাঢ়-সংখ্যা [পৃ ৫৪-৫৬] তত্ত্ববোধিনী-তে মূল ও অনুবাদ-সহ এই গাথা প্রকাশিত হয়।

সরলা দেবীকে ভারতীয় নারীসমাজের প্রতিভূ-স্বরূপ য়ুরোপে গিয়ে 'ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচার' করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ আহ্বান জানিয়েছিলেন 24 Apr 1897 [১২ বৈশাখ ১৩০৪] তারিখে লেখা পত্রে। স্বামীজীর প্রস্তাবিত পাশ্চাত্য-সফর তখন সংঘটিত হয় নি, সরলাদেবীও তখন সংকোচে চুপ করে ছিলেন। বর্তমান বৎসর 20 Jun [মঙ্গল ৬ আষাঢ়] 'গোলকুণ্ডা' জাহাজযোগে স্বামীজী নিবেদিতা, তুরীয়ানন্দ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও স্বামী সারদানন্দের ভাইকে নিয়ে আমেরিকার পথে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে নিবেদিতার সঙ্গে সরলা দেবী যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। সুতরাং তিনিও চেষ্টা করেছেন সরলাকে সঙ্গী করার জন্য। তিনি 'Wednesday' [১১ জ্যৈষ্ঠ: 24 May] মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন: 'I spent several hours with her yesterday. But she could not dream of going within a month or two of Swami. Also there is a chance of the Maharani of Cooch Behar going this year, and she might go with her. So my part will simply be to go and talk to the old grandfather about it and try to extort a promise of money for s.'[১২১] কিন্তু তা হয় নি, সরলা দেবী লিখেছেন: 'আমার নিজের মনের অপ্রস্তুততা, সঙ্কোচ এবং অভিভাবকদের অমত এই দুইই প্রবলভাবে বাধা দিলে।'[১২২]

'৭ পৌষ [বৃহ 21 Dec] প্রাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উষাকীর্ত্তনকারিগণ মহর্ষিদেবের এই দীক্ষার দিনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহার যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ভবনস্থ প্রাঙ্গণে কীর্ত্তন ও পারিবারিক উপসনামণ্ডপে উপাসনা সমাধা করিয়া পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন।'[১২৩]

একই দিনে শান্তিনিকেতনে নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হয়। প্রাতঃকালীন উপাসনায় প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর উদ্বোধন, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের ব্যাখ্যান ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের প্রার্থনার 'পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইলে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনাথ দীন দরিদ্রদিগের জন্য সমন্ত্রক ভোজ্য উৎসর্গ করিলেন।'

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল 'দলবলসহ' 'গাও আনন্দে সবে জয় ব্রহ্মনাম' গান করতে করতে উদ্যান প্রদক্ষিণ করেন।

ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বলেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি গৃহনির্মাণ শুরু করেন ও এই বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মাবলীও প্রণয়ন করেছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তাঁর অকালমৃত্যুতে পরিকল্পনাটি বাধাগ্রস্ত হলেও পরিত্যক্ত হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ এই বৎসর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বারোদঘাটন করেন। তত্ত্ববোধিনী-র প্রতিবেদক লিখেছেন:

এবারে উদ্যানভূমিতে ইষ্টকনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত একটী গৃহ দেখিতে পাইলাম। তাহা ব্রহ্মবিদ্যালয়। তাহার সোপানে পূর্ণকুম্ভ। নানাবিধ পত্রে পুষ্পে তাহার শ্রী সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ দিন ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য গৃহপ্রতিষ্ঠা হইবে। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এইরূপ কহিলেন—

"প্রভাতে ঈশ্বরোপাসনা সমাপণ করিয়া এক্ষণে আমরা এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি। এদেশে ব্যায়াম শিক্ষার স্থান আছে, জ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়াদি আছে, কিন্তু যেখানে অধ্যাত্মবিদ্যা অধীত হইতে পারে, এরূপ কোন স্থান নাই।···সেইজন্যই এই অনুকূল স্থানে এই ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, এবং যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদত্ত হয়, তজ্জন্য সুনিয়ম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতেছে।

এদেশের শাস্ত্র নিচয়ে আধ্যাত্মিক সত্য প্রচুর পরিমাণে নিহিত। প্রাচীন ঋষিগণ আমাদের জন্য অক্ষয় অমূল্য সম্পত্তি বেদ উপনিষদের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ সমুদায়ের জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দেশীয় সত্য সম্বন্ধে অগ্রে অভিজ্ঞতা লাভ হইলে পরে বিদেশের সত্য আলোচনা করা যাইতে পারে।···ব্রাহ্মধর্ম নিরবচ্ছিন্ন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সত্য দেশ কাল বা মনুষ্য বিশেষে আবদ্ধ নহে।...সেই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের গুরুত্ব এত অধিক। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা ও প্রচারের জন্য এই ব্রহ্মবিদ্যালয় নির্মাণ করিয়া দিলেন, তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র; তাঁহার নিকটে সকলেরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

...ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া আমি এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রমুক্ত করিয়া দিলাম। ইহার উপরে তাঁহার প্রসাদবারি অবতীর্ণ হউক, এই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সংসিদ্ধ হউক। ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি আমাদের এই সাধুসংকল্প সুসিদ্ধ করুন।[১২৪]

লক্ষণীয়, নাম না করেও এখানে মহর্ষির কাছেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে—বলেন্দ্রনাথের কাছে নয়। দু'বছর পরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে বা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও বলেন্দ্রনাথের প্রয়াসকে স্বীকৃতি জানান নি।

দ্বিপ্রহরে যাত্রাভিনয় হয়—'অভিনয়ের বিষয় কবিগুরু বাল্মীকি'।

সায়ংকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদিগ্রহণ করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধন ও স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনার পর রবীন্দ্রনাথ যে 'উপদেশ' দেন, সেটি ৭ মাঘ [শনি 20 Jan 1900] 'ব্রহ্মৌপনিষদ' নামে ২৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এরপর যথারীতি বাজি-পোড়ানো হয়। ক্যাশবহি থেকে জানা যায়, এই উৎসবের জন্য ২৩৪২ টাকা সাড়ে চার আনা ব্যয়িত হয়।

১১ মাঘ [বুধ 24 Jan] সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে প্রাতঃকালীন উপাসনায় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদি গ্রহণ করার পর 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া একটী বক্তৃতা ['ব্রহ্মৌপনিষদ'] পাঠ করিলেন।' প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন, দ্বিজেন্দ্রনাথ উপদেশ পাঠ ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনা করেন।

সায়ংকালীন উপাসনা হয় মহর্ষিভবনে। 'শিল্পনিপুণ শ্রীযুক্ত বাবু নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মহোৎসব উপলক্ষে গৃহটী সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবোধ অতি অদ্ভুত। যেখানে যাহা যোজনা করিলে গৃহশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠে তিনি বহু পূর্ব্ব হইতে সেইরূপই যোজনা করিয়া ছিলেন। যখন আলোক জ্বলিয়া উঠিল তখন গৃহশোভা দর্শন করিয়া মোহিত না হইয়া ছিলেন এমন লোকই বিরল।'[১২৫] দ্বিজেন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদিগ্রহণ করলে 'প্রিয়নাথ শাস্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া স্ববক্তব্য' পেশ করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন, শম্ভুনাথ গড়গড়ি প্রার্থনা ও দ্বিজেন্দ্রনাথ উপদেশ পাঠ করেন।

১৩ মাঘ [শুক্র 26 Jan] 'মহর্ষি সন্দর্শন' উপলক্ষে 'ত্রয়োদশ মাঘের সুশীতল প্রভাতে ব্রাহ্মগণ যোড়াসাঁকোস্থ ভবনের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিলেন।' প্রায় ৫০০ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গাওয়া গানগুলির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ উদ্বোধন ও সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন। 'উপাসনার পরে ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় হৃদয়গ্রাহী

ভাষায় সরলভাবে ভক্তিভরে সকলের হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন’ পরে সকলে ত্রিতলে মহর্ষির ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ও আশীর্বাদ লাভ করেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

ঢাকায় অনুষ্ঠিত দশম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী বৎসরের সম্মেলন আহ্বান করেন চব্বিশ পরগণায়। কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের একাদশ অধিবেশন হয় বর্ধমান শহরে 19-21 May [শুক্র ৬-৮ জ্যৈষ্ঠ] অম্বিকাচরণ মজুমদারের [1851-1922] সভাপতিত্বে। অমৃতবাজার পত্রিকা-র 17 May-সংখ্যার সংবাদে প্রকাশ, Northern Metropolitan Electoral Division থেকে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। কিন্তু এঁরা কেউ নিকটবর্তী বর্ধমানের সম্মেলনে উপস্থিত হন বলে জানা যায় না। অধিবেশনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতাতেই ছিলেন, অবশ্য বলেন্দ্রনাথের অসুস্থতা নিয়ে তিনি তখন খুবই বিব্রত।

ড রমেশচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশন লখ্নৌতে অনুষ্ঠিত হয় 27-29 Dec [বুধ-শুক্র ১৩-১৫ পৌষ]। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনের জন্যও প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

হীরা সোনা প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ দ্রব্য-সমৃদ্ধ আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল বহু দিন থেকেই য়ুরোপীয় জাতিসমূহের রসনা সিক্ত করে তুলেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে পর্তুগীজ নাবিকেরা য়ুরোপীয় স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম পা রেখেছিল এই অঞ্চলে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে অন্য ভাগীদারদেরও আগমন ঘটল একে একে। কিন্তু এদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম বসতি স্থাপন করল হল্যাণ্ডের অধিবাসী ওলন্দাজেরা [Dutch]। কয়েকজন মহিলা-সহ ১৩০ জন ওলন্দাজ জোহানভান রাইবিকের নেতৃত্বে 1652-তে এই অঞ্চলে এসে চাষবাস শুরু করে দিল। স্থানীয় অধিবাসী হটেনটট মেয়েদের সঙ্গে বিয়েও হল কারুর কারুর। এদেরই বলা হয় বুয়র [Boer]। ধর্মীয় অত্যাচারের ভয়ে দেশ-ছাড়া কিছু ফরাসী, জার্মান, সুইডিশও এদের মধ্যে ছিল। য়ুরোপীয় রাজনীতির টানাপোড়েনে ইংরেজরা সেখানে ঘাঁটি বসাল উনিশ শতকের গোড়ায়। স্বাধীনতাপ্রিয় বুয়ররা 1830-তে দীর্ঘ পদযাত্রা করে আরও উত্তরে সরে এসে স্থাপন করল নূতন বসতি ‘অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট’ ও ‘ট্রান্স্ভাল’। বুয়রদের দুর্ভাগ্যক্রমে 1867-এ অরেঞ্জ রিভারের কাছে পাওয়া গেল একখণ্ড হীরে, 1884-এ ট্রান্স্ভালে আবিষ্কৃত হল সোনার খনি। ভাগ্যান্বেষীরা দলে দলে ভিড় করল সেখানে। বহিরাগত এই ‘আউটল্যাণ্ডার’দের বুয়ররা অভিহিত করল ‘উইটল্যাণ্ডার’ [Uitlander] নামে। স্বাভাবিক কারণেই উভয়পক্ষে মাঝেমাঝেই সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। গ্রেট ট্রেকের পরিচালক পল ক্রুগার তখন বুয়র প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। তিনি চাইছিলেন প্রজাতন্ত্রের স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে, আর বিরাট ব্যবসায়ী ও কেপ কলোনির প্রধানমন্ত্রী সিসিল রোড্স্ [1853-1902] চাইছিলেন ব্রিটিশ আধিপত্যের বিস্তার। তাঁর চক্রান্তে ডাঃ জেম্সনের বাহিনী 29 Dec 1895 [১৫ পৌষ ১৩০২] ট্রান্স্ভাল আক্রমণ করল। জেম্সন পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন 2 Jan 1896 তারিখে। জার্মান সম্রাট কাইজার ক্রুগারকে অভিনন্দন জানালেন, স্বভাবতই জামান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। ইংরেজদের কাছ থেকে বড়ো আক্রমণের আশঙ্কায় ক্রুগার অস্ত্রশস্ত্র

সংগ্রহ করতে লাগলেন, যার অধিকাংশই জার্মানদের কাছ থেকে। নানা নিষ্ফল আলোচনার পর যুদ্ধ বাধল Oct 1899-এ। প্রাথমিকভাবে জয় হল বুয়রদের। ইংরেজ বাহিনীর বিপর্যয়ে ইংলণ্ডে কালা সপ্তাহ পালন করা হল [9.17 Dec 1899] এর পরে কম্যাণ্ডার-ইন চীফ নিয়োগ করা হল লর্ড রবার্টকে, চীফ অব স্টাফ হলেন লর্ড কিচেনার। যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল—বুয়ররা একের পর এক লড়াইয়ে পরাজিত হতে লাগল। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে লাগল ইংরেজরা। ১ আশ্বিন ১৩০৭ রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে জগদীশচন্দ্রকে লেখেন: 'কাউকে রেয়াৎ কর্‌বেন না—যে হতভাগ্য surrender না কর্‌বে, লর্ড রবার্টসের মত নির্ম্মমচিত্তে তাদের পুরাতন ঘর-দুয়ার তর্কানলে জ্বালিয়ে দেবেন—আপনি এক সৈন্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সৈন্য-সম্প্রদায় গেঁথে যে-রকম ব্যূহ রচনা করেচেন তাতে প্রিটোরিয়ায় ক্রিস্ট্‌মাস্‌ কর্‌তে পার্‌বেন ব'লে আমার বিশ্বাস'[১২৬], তখন তিনি বুয়র-যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহকে অনুসরণ করার প্রমাণ রাখেন। বুয়ররা অবশ্য পুরোপুরি surrender করে নি, গেরিলা যুদ্ধের পথ অবলম্বন করে তারা ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে লাগল। কিচেনার তার প্রতিশোধ তুললেন ক্ষেতখামার জ্বালিয়ে, নর-নারী-শিশুদের কন্‌সেনট্রেশান ক্যাম্পের খোঁয়াড়ে আটকে রেখে। হাজার হাজার মানুষ মারা গেল। 23 Mar 1902 বুয়ররা শান্তির আবেদন জানাল। 31 May [শনি ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯] সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল উদার শর্তে।[১২৭]

বুয়র-যুদ্ধে বৃটিশকে সাহায্য করার জন্য 29 Jan 1900 তারিখে টাউন হলে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভা হয়। এই সভায় ৬৫,৩০১ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল বুয়র যুদ্ধ-তহবিলে।[১২৮] দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে যুদ্ধক্ষেত্রে বৃটিশের পক্ষে সেবাকার্য করাকে তাঁর কর্তব্য বিবেচনা করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

ভারত সংগীত-সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি দুর্ভাগ্যজনক মামলায় জড়িয়ে পড়ে ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের আস্তানা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, একথা আমরা আগেই বলেছি। সমাজ প্রথমে ১৩ নং ও পরে ২০৯ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ভারত সংগীত সমিতি নামে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানটি ৩০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে অনুষ্ঠানাদি করতে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান প্রথম থেকেই অমৃতবাজার পত্রিকা ও পরে বেঙ্গলী প্রভৃতি প্রধান সংবাদপত্রগুলির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে—এর ফলে পত্রিকাগুলি সংগীত-সমাজ সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশে কার্পণ্য দেখাতে থাকে। এই কারণে ভারত সংগীত-সমাজের কার্যাবলীর বিবরণ প্রস্তুত করা দুঃসাধ্য। তবু যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, তা হারিয়ে যাওয়ার আগে লিপিবদ্ধ করে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

৩ আষাঢ় [শনি 17 Jun] vernal Union-এর অপেশাদার অভিনেতারা সমাজের প্রেক্ষাগৃহে 'বুদ্ধদেব চরিত' অভিনয় করেন।

২১ শ্রাবণ [শনি 5 Aug] ভারত সংগীত-সমাজের প্রধান সভ্যদের উপস্থিতিতে রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' অভিনীত হয়।[১২৯]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' নাটিকার রূপান্তর 'পুনর্বসন্ত' অভিনয়ের আয়োজন করে সংগীত-সমাজ। নাটকের ড্রেস রিহার্সাল হয় ৭ পৌষ [বৃহ 21 Dec]। প্রথম অভিনয়ের তারিখটি নিশ্চিত ভাবে নির্ধারণ করা যায় নি, কিন্তু অনুমান করা যায়, অভিনয়টি হয়েছিল 25Dec [সোম ১১ পৌষ] বড়োদিনে—এইদিন সংগীত-সমাজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কুচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ সমাজ পরিদর্শনে যাওয়ার খবর অমৃতবাজার পত্রিকায় পরিবেশিত হয়েছে।

২৩ পৌষ [শনি 6 Jan 1900] দ্বারভাঙ্গার মহারাজার সংগীতসমাজে অভ্যর্থনা উপলক্ষে 'পুনর্বসন্ত' পুনরভিনীত হয়। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, নশিপুরের রাজা রণজিৎ সিং, নাড়াজোল-রাজ শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পুটিয়া-রাজ বিশ্বেশ্বর সান্ন্যাল প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় [10 Jan] লিখিত হয়:

> The new piece, *Punarbasanta*, was put on the boards, and kept up the interest of the audience to the last. The dresses and scenes were of the best, the most notable among the latter being the Waterfall in the Nandan Kanan. All the parts were represented by males, these being scions of some of the most respectable families in the town.

১ ফাল্গুন [সোম 12 Feb] দ্বারভাঙ্গার মহারাজার কলকাতা-স্থিত প্রাসাদে লর্ড ও লেডি কার্জনকে আমন্ত্রণ করা হয়। এই উপলক্ষেও ভারত সংগীত-সমাজ 'পুনর্বসন্ত' অভিনয় করে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশনের সভাপতি ড রমেশচন্দ্র দত্তকে সংগীত-সমাজ সংবর্ধনা জানায় ৭ মাঘ [শনি 20 Jan] তারিখে।

পুনার বিখ্যাত বীণকর আন্না ঘোড়পাড়ে উদাহরণ-সহ একটি বক্তৃতা দেন ১৩ মাঘ [শুক্র 26 Jan] তারিখে।

আমরা আগেই বলেছি, এই বৎসরের শেষ দিকে সংগীতসমাজ-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' অভিনীত হয়, কিন্তু অভিনয়ের তারিখটি উদ্ধার করা যায় নি।

উল্লেখপঞ্জী

১ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৬৫, পত্র ৪৩

২ দ্র 'জগদীশচন্দ্র বসু', কল্পনা ৭। ১৫৭

৩ দ্র পত্রাবলী। ৭-৮, পত্র ৪

৪ পত্রাবলী। ৮, পত্র ৪

৫ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৬ 'আমাদের কথা', বলেন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ। ৩০

৭ চিঠিপত্র ৬। ১, পত্র ১

৮ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত মাধুরীলতার চিঠি। ৪০-৪৩, পত্র ১০

৮ক বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১। ৪২৯

৯ চিঠিপত্র ৬। ১-২, পত্র ১

১০ পত্রাবলী। ৯-১০, পত্র ৫

১১ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৬৫, পত্র ৪৪

১২ দ্র ঐ। ১৪৮-৪৯, পত্র ১১

১৩ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সা-সা-চ ৫। ৫৪ [১৩৭০]। ১৬

১৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৬৭, পত্র ৪৮

১৫ চিঠিপত্র ৮। ৫৯-৬০, পত্র ৭৩

১৬ পত্রাবলী। ১১, পত্র ৬

১৭ চিঠিপত্র ৮। ৬০, পত্র ৭৩

১৮ ঐ ৮। ৬৩, পত্র ৭৫

১৯ সাহিত্য, ফাল্গুন। ৭১৭

২০ চিঠিপত্র ৬। ৩-৪, পত্র ২

২১ পত্রাবলী। ১২, পত্র ৬

২২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

২৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৬৬, পত্র ৪৭

২৪ দ্র চিঠিপত্র ৮। ২০১, পত্র ১৬৯

২৫ হেমচন্দ্র ৩ [১৩৩০]। ২৩৬-৩৭

২৬ ঐ ৩। ২৪৪

২৭ দেশীয় রাজ্য। ২১৬

২৮ হেমচন্দ্র ৩। ২৪৬-৪৭

২৯ বি. ভা, প., শ্রাবণ ১৩৪৯। ২৯

৩০ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার খাতা'

৩১ *The Bengalee*, 16 Sep 1900

৩২ চিঠিপত্র ৬। ৬, পত্র ৩

৩৩ জন্মভূমি, ভাদ্র ১৩০৮। ৪০-৪৩

৩৪ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৩৫ 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা', আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ২৭। ৩২৮-২৯

৩৬ চিঠিপত্র ৮। ৫৭, পত্র ৭২

৩৭ ঐ ৮। ৬০, পত্র ৭৩

৩৮ ঐ ৮। ৬৬, পত্র ৭৭

৩৯ ‘আমাদের কথা’, বলেন্দ্রনাথ শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ। ৩১

৪০ ‘বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা’, প্রদীপ, আশ্বিন। ৩৪৯

৪১ দ্র ছিন্নপত্রাবলী। ২৫২, পত্র ১১৭

৪২ মাধুরীলতার চিঠি। ৪৬, পত্র ১৪

৪৩ চিঠিপত্র ৮। ৭০, পত্র ৮১

৪৪ ঐ ১। ৩৯, পত্র ১৭

৪৫ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৪৬ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪২৭

৪৭ ‘তথ্যক্রমপঞ্জী’, ঐ।১৬৫

৪৮ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪৩০

৪৯ চিঠিপত্র ৮। ৭২, পত্র ৮৪

৫০ মাধুরীলতার চিঠি। ৪৬-৪৭, পত্র ১৪

৫১ চিঠিপত্র ৮। ৭৩, পত্র ৮৫

৫২ ঐ ৮। ৭৫, পত্র ৮৭

৫৩ ঐ ৮। ৮০, পত্র ৯২

৫৪ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৯১, পাদটীকা ৩

৫৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৬৯, পত্র ৪৯

৫৬ চিঠিপত্র ৮। ৭১, পত্র ৮৩

৫৭ দ্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ। ১৭৬-৭৭

৫৮ সাহিত্য, অগ্র°। ৫২৩

৫৯ ‘রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার’, রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিচিত্রা [১৩৯১]। ৩৮

৬০ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৯১, পাদটীকা ৩

৬১ চিঠিপত্র ৮। ৮২, পত্র ৯৪

৬২ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৬৩ চিঠিপত্র ৮। ৮২-৮৩, পত্র ৯৪

৬৪ ঐ ৮। ৮৪, পত্র ৯৫

৬৫ ঐ ৮। ৮৫, পত্র ৯৭

৬৬ ঐ ৮। ৮৫, পত্র ৯৬

৬৭ ঐ ৮। ৮৬, পত্র ৯৮

৬৮ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৯২

৬৯ চিঠিপত্র ৮। ১৩২, পত্র ১২৫

৭০ ‘সঙ্গীত-সমাজ’, মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০। ২৪০

৭১ রবীন্দ্র কথা। ২২৬

৭২ প্রদীপ, ভাদ্র ১৩০৮। ৩৫২

৭৩ গীতবিতান: কালানুক্রমিক সূচী ১। ১৭৭

৭৪ ‘রবীন্দ্রজীবনে গীতরচনার একটি অজ্ঞাত যুগ’, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা [1983]। ২৩১

৭৫ গীতবিতান: কালানুক্রমিক সূচী ১। ১০৪

৭৬ তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৫

৭৭ র°র°, অ-২-গ্রন্থপরিচয়। ৭১৯

৭৮ তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৮৯

৭৯ ‘সঙ্গীত সমাজ’, মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০। ২৩৯

৮০ চিঠিপত্র ৮। ১০২, পত্র ১১৩

৮১ জোড়াসাঁকোর ধারে [১৩৭৮]। ১৫৩

৮২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণ [১৩০৬] ।ল০- ।ল০

৮৩ ঐ [১৩৪৮]; বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত ‘রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ’ [দেশ, সাহিত্য ১৩৯৪। ১৮২] প্রবন্ধে উদ্ধৃত

৮৪ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ২৫, পত্র ২

৮৫ পত্রাবলী। ১০, পত্র ৫

৮৬ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪২৮

৮৭ ঐ। ৪০৪

৮৮ ঐ। ৪২৭-২৮

৮৯ ‘ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ’, দেশীয় রাজ্য। ২১৭-১৯

৯০ পত্রাবলী। ১৩-১৫, পত্র ৭

৯১ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪২৮

৯২ মাধুরীলতার চিঠি। ৩৯

৯৩ চিঠিপত্র ৮। ১১২-১৩, পত্র ১১৮

৯৪ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪২৯

৯৫ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ২৫, পত্র ২

৯৬ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

৯৭ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৭০, পত্র ৫২

৯৮ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র
৯৯ দেশ, সাহিত্য ১৩৭৫। ১৬৯, পত্র ৫১
১০০ ঐ। ১৭০, পত্র ৫২
১০১ বি. ভা. প.শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮। ৭৭, পত্র ১
১০২ ঐ। ৭৭-৭৮, পত্র ২
১০৩ পত্রাবলী। ১৯, পত্র ৮
১০৪ ঐ। ২০-২১, পত্র ৯
১০৫ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৪; চিঠিপত্র ৬। ১২৪-২৫ থেকে উদ্ধৃত
১০৬ মাধুরীলতার চিঠি। ৩৯, পত্র ৯
১০৭ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র; বক্রাক্ষর আমাদের।
১০৮ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮। ট, পত্র এক
১০৯ ঐ। ট, পত্র দুই
১১০ ঐ। ট, পত্র তিন
১১১ চিঠিপত্র ৮। ২৪৬, পত্র ৭
১১২ সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০৭। ১৪৮
১১৩ রবীন্দ্র কথা। ২১৮
১১৪ ঐ। ২২৩
১১৫ ঐ। ২২১-এ উদ্ধৃত
১১৬ ঐ। ২২৬-২৭
১১৭ পূর্ণিমা দেবী [চট্টোপাধ্যায়], ঠাকুরবাড়ীর গগনঠাকুর [১৩৮১]। ১৬
১১৮ তত্ত্ব°, জ্যৈষ্ঠ। ৩৯
১১৯ *Letters of Sister Nivedita,* vol. I, p. 145, Letter No. 43
১২০ তত্ত্ব°, আষাঢ়। ৫২-৫৩
১২১ *Letters of Sister Nivedita,* vol. I, p. 148-49, Letter No. 44
১২২ জীবনের ঝরাপাতা। ১৬২
১২৩ তত্ত্ব°, মাঘ। ১৫৩
১২৪ ঐ। ১৫৯-৬০
১২৫ ঐ, ফাল্গুন। ১৭৯
১২৬ চিঠিপত্র ৬। ৭, পত্র ৪

১২৭ দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত [2 May-1 Aug 1987] সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'দানব ও দেবতা' প্রবন্ধের কাছে বিভিন্ন তথ্যের জন্য ঋণী।

১২৮ দ্র ড দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি: বুয়র যুদ্ধ', রবীন্দ্র-চর্যা। ১৪২-৪৩

১২৯ দ্র শঙ্কর ভট্টাচার্য, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান। ১১৫

---

* পুলিনবিহারী সেন-সম্পাদিত 'পত্রাবলী' [1958]। ৫, পত্র ৩; 'জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর পত্রগুলি জ্যৈষ্ঠ-পৌষ ১৩৩৩-সংখ্যা প্রবাসী-তে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র অবলম্বনে পত্রগুলির পূর্ণতর পাঠ মুদ্রিত হয় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত 'পত্রাবলী' গ্রন্থে। আমরা প্রবাসী ও উক্ত গ্রন্থের পাঠ উভয়ই ব্যবহার করলেও উল্লেখপঞ্জীতে গ্রন্থের পৃষ্ঠা ও পত্র-সংখ্যা ব্যবহার করেছি। প্রয়োজনমতো গ্রন্থে বর্জিত পাঠও ব্যবহৃত হবে।

* রামানন্দ লেখেন: '..."সাহিত্য" রবিবাবুকে যখন তখন কোনও উপলক্ষ্য পাইলেই গালি দেয়। "প্রণয়ের পরিণাম" গল্পটি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত বলিয়াই বোধ হয়। তথাপি "একটি কুক্কুরের প্রতি" কবিতাটি প্রকাশ সম্বন্ধে আমি আপনার ও বৈকুণ্ঠবাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না।···আমি কল্য অপরাহ্ণে কবিতাটি বাদ দিয়া প্রদীপের শেষ দুই পৃষ্ঠা আবার ছাপিবার জন্য বৈকুণ্ঠবাবুকে টেলিগ্রাফ করিয়াছি।...আমার বিশ্বাস কবিতাটি প্রকাশিত হইলে রবিবাবুর, আপনার এবং প্রদীপের গৌরবের হানি হইবে; অধিকন্তু নিন্দুকদের মুখও বন্ধ হইবে না। আমরা আপনাদের কর্তব্য করিয়া যাই; প্রতিশোধের ভার ভগবানের উপর থাকুক।' প্রভাতকুমার তাঁর মন্তব্য-সহ পত্রটি ১ আষাঢ় রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দেন: 'রামানন্দবাবুর ইচ্ছা মত, শেষ পৃষ্ঠা দুইটি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। সনেটটির উপর অন্য একটা শ্লিপ ছাপিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আলোতে ধরিলে বেশ পড়া যায়। যাহার জন্য ইহা সে যে পড়িবে, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।' ১৮ আষাঢ়ের পত্রে তিনি লিখেছেন: 'একটা মজা হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ বাবু আমাকে লিখিয়াছেন—"হেমেন্দ্রপ্রসাদ সেই শ্লিপ টুকু খুলিয়া (কুক্কুরের প্রতি সনেট) পড়িয়াছে এবং আপনার সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া বেড়াইতেছে।"—প্রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র

* মাধুরীলতার এই চিঠির তারিখ 'সোমবার ২১। ৮। ৯৯' [৫ ভাদ্র ১৩০৬], তার আগেই বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে। তাহলে কি মৃত্যুসংবাদটি কয়েকদিনের জন্য মৃণালিনী দেবীর কাছে গোপন করা হয়েছিল?

* এর মূলটি শ্যামা [গ্রন্থপরিচয়] ২৫। ৪৩১-এ উদ্ধৃত হয়েছে।

* ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৪। ৭৫৫, পত্র ৬; মুদ্রিত পত্রে তারিখ আছে '৭ কার্ত্তিক ১৩১৬'—সেটি অবশ্যই ভুল, ঠাকুরদাসের মৃত্যু হয় ১১ কার্তিক ১৩১০ [28 Oct 1903] তারিখে।

* চিঠিটিতে তারিখ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রভবনে SHELIDA 25 FE 00 পোস্টমার্ক দেওয়া একটি খাম পেয়ে আভ্যন্তরীণ প্রমাণে আমরা এটিকে 'মাধুরীলতার চিঠি' গ্রন্থের ৯-সংখ্যক পত্রের [পৃ ৩৮-৪০] খাম বলে মনে করেছি!

চত্বারিংশ অধ্যায়

১৩০৭ [1900-01] ১৮২২ শক ॥ রবীন্দ্রজীবনের চত্বারিংশ বৎসর

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে 'নববর্ষের প্রিয়সম্ভাষণ' জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ ১ বৈশাখ [শুক্র 13 Apr] যে পত্রটি লিখেছেন, সেটি তাঁর সমসাময়িক জীবনচর্যা ও মানসিক অবস্থার একটি যথার্থ চিত্র:

> কখনো দায়ে পড়িয়া কখনো সখের উৎপীড়নে এটা ওটা সেটা লেখা চলিতেছেই। যতটা কাজ করিয়াছি এখন পেন্সন্ লইবার অধিকার জন্মিয়াছে। সরস্বতী মহারাণীর অধীনে ২৫ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল সার্ভিস হইয়া গেছে—কিন্তু খাটুনি ক্রমেই বাড়িতেছে।…এখন হয় লিখি পড়ি কাজ করি, নয় বিশ্রাম করি—এই বহুল কাজ এবং স্বল্প বিশ্রামের কোনো অংশ আমি বাজে খরচ করিতে পারিব না। বরঞ্চ কাজ ফাঁকি দিয়া বিশ্রাম বাড়াইতে রাজি আছি কিন্তু বিশ্রাম ফাঁকি দিয়া কাজ বাড়াইতে পারিব না।…নগেন্দ্রবাবু "প্রভাত" কাগজটার জন্য আমাকে সর্ব্বদাই তাড়া দিতেছেন। ভারতীরও তাগিদ আসিতেছে। এদিকে নিজের অন্তঃকরণলক্ষ্মীও নিস্তব্ধ নাই। সকলকেই সন্তুষ্ট রাখা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছে।[১]

শ্রীশচন্দ্র তাঁর কোনো বন্ধুর 'বহি সংশোধনের ভার' রবীন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করতে চেয়েছিলেন, তার থেকে অব্যাহতি চেয়েই এই কৈফিয়ৎ রচনা—কিন্তু এই সময়ের দুটি প্রধান রচনা ক্ষণিকা ও চিরকুমার সভা এই অলস মনের ক্ষণিক লীলাবিলাসেরই সগোত্র। কল্পনা কাব্যের সংস্কৃত সাহিত্যগন্ধী গুরুগম্ভীর চলন ক্ষণিকা কাব্যে যেমন চটুল ছন্দে ও সরস কৌতুকময়তার সাবলীল ভঙ্গীতে একটি বিচিত্র আত্মপ্রকাশ রূপে আবির্ভূত হয়েছে, উপন্যাসরীতিমিশ্রিত নাটকোচিত সংলাপনির্ভর চিরকুমার সভাও [হিতবাদী-র উপহার রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (১৩১১)-তে নাম 'চিরকুমার সভা', কিন্তু গদ্যগ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ডে (১৩১৪) 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' নামে গ্রন্থিত] তাই। 'কাজ ফাঁকি দিয়া বিশ্রাম' বাড়ানোর মানসিকতা উভয় গ্রন্থের মধ্যেই বর্তমান—কেবল কল্পনা-র অবশেষ হিসেবে উভয়তই সংস্কৃত প্রেমসাহিত্যের সুরভি পরিবেশটিকে মধুর করে তুলেছে।

৩ বৈশাখ [রবি 15 Apr] রবীন্দ্রনাথ প্রেমতোষ বসুকে লিখেছেন, 'লোকেন পালিত আমার "ক্ষণিকা"র সমস্ত কাপি এখান হইতে দস্যুবৃত্তি করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেছেন।' এইটিই ক্ষণিকা-র প্রথম পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রনাথেরই সাক্ষ্য অনুযায়ী তাতে 'গোটা কুড়িক কবিতা' ছিল। এই কবিতাগুলি নির্ণয় করা সহজ নয়, কিন্তু অনুমান করা চলে যে ভাষা ও ছন্দের বিশেষ মেজাজ প্রথম থেকেই দেখা দিয়েছে। যার সম্পর্কে তিনি পরবর্তীকালে লিখেছেন:

> 'ক্ষণিকা'য় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগাঁয়ের টাটুঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য-ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।[২]

—এই অভিনবত্বই হয়তো লোকেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল।

জগদীশচন্দ্র চৈত্র ১৩০৫-এর শেষদিকে শিলাইদহ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। এরপর আবার তাঁর সেখানে যাওয়া হয় ২৭ ফাল্গুন ১৩০৬ [শনি 10 Mar 1900], মধ্যবর্তী সময়ে তিনি আর কখনও গিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। আবার তিনি সেখানে যান বর্তমান বৎসর বৈশাখের প্রথমে, হয়তো ১ বৈশাখ তারিখে। ফিরে এসে 18 Apr [বুধ ৬ বৈশাখ] তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন:

আসিবার দিন সুন্দর জ্যোৎস্না ছিল [পূর্ণিমা ছিল ২ বৈশাখ]; আপনাদের দেশ ও এ দেশে অনেক প্রভেদ।

আপনার লেখা ও গল্প মাঝে মাঝে পাঠাইবেন। প্রথম কয়টা দিন আপনি ফাঁকি দিয়াছেন। অন্ততঃ সে কয়টা গল্প আমার পাওনা আছে।[৩]

এ-প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্রের জীবনী-কার Patrick Geddes লিখেছেন:

Once, on receiving an invition from the poet to stay with him at his house at Silaida on the river Padma, Bose accepted it with the demand of the fullest and highest hospitality his friend could render him—that of a new story to be written every day, and render to him every evening![৪]

—রথীন্দ্রনাথও তাঁর পিতৃস্মৃতি-তে এরূপ কথা লিখেছেন।[৫] এর আগে রবীন্দ্রনাথ 'সদর ও অন্দর' গল্পটি জগদীশচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এই বৎসর ভারতী ও প্রদীপ-এর [এবং হয়তো প্রভাত-এরও] বিভিন্ন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল, এদের মধ্যে কতকগুলি হয়তো জগদীশচন্দ্রের তাগিদেই রচিত।

রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের সঙ্গেও জগদীশচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমার সঙ্গে তিনি গল্প করতেন, নানারকম খেলা শেখাতেন—ছোটো বলে উপেক্ষা করতেন না। আমি তাঁর স্নেহপাত্র হতে পেরেছি বলে আমার খুব অহংকার বোধ হত।'[৬] পদ্মার বালিচরে কচ্ছপের ডিম খুঁজে বের করার কাহিনী তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

ছ-বছরের মীরা দেবীর সঙ্গেও জগদীশচন্দ্রের বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাঁর অনেক চিঠিতেই এই 'ক্ষুদ্র বন্ধু'র উল্লেখ আছে। পূর্বোল্লিখিত 18 Apr-এর পত্রে তিনি লিখছেন: 'আমার ক্ষুদ্র বন্ধুর খবর দিবেন। শ্রীযুক্তা রবীন্দ্রাণী দেবীর ভয়ে তাহার সহিত আমার সখ্য নিশ্চয় করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না।'[৭] 21 Jun [বৃহ ৭ আষাঢ়]-এর পত্রে উল্লেখটি বিস্তৃততর:

···আপনার ও অঞ্চলে| ২।১| দিন যাইয়া সুস্থ মন লইয়া আসিতে অতিশয় ইচ্ছা হয়। বিশেষতঃ আমার ভাবী বৈবাহিকার সহিত অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলিবার আছে। আপনার বৈষয়িক বুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার মতের সহিত আমার মত সম্পূর্ণ মিলে। আপনার সহিত সে সম্বন্ধে কথাবার্তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাঁহার সহিত আদান প্রদানের বন্দোবস্ত এখন হইতেই করিতে চাহিয়াছিলাম—এখন লাভ লোকসানের অনিশ্চিত বলিয়া সস্তা মূল্যে হইবে। কিন্তু পরে যতখানা 'পাশ' হইবে মূল্য ততই বাড়িবে। আর যদি সিবিল হইতে পারে তবে অন্য কথা, তখন বাজার দর যাচাই করিয়া দেখিব। আর যদি আপনার ভবিষ্যত জামাতাকে বৈজ্ঞানিক করিতে চাহেন তবে তাহার খোরপোষাকের ভার লইতে হইবে। কারণ বিজ্ঞান ও অন্ন সম্পূর্ণ দুই ধাতু [দিয়া] গঠিত,···।[৮]

এই পত্রাংশ থেকে রবীন্দ্র-পরিবারের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সম্পর্ক ও তাঁর সরস-মধুর প্রকৃতিটির একটি অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। মীরা দেবী সম্পর্কে অনুরূপ রসিকতা তাঁর অনেক পত্রের বর্জিত অংশে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথও এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছেন। রেণুকার আকস্মিক বিবাহের [২৪ শ্রাবণ ১৩০৮: 9 Aug

1901] পরও তিনি জগদীশচন্দ্রকে আশ্বস্ত করে লিখেছেন: 'ভয় নাই—তোমার বন্ধুটিকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিব। ফস্ করিয়া তাহাকে হস্তান্তর করিব না।'[৯]

রবীন্দ্রনাথের অনেক অপ্রকাশিত কবিতার শ্রোতাও ছিলেন জগদীশচন্দ্র, ৪ Jun [২৬ জ্যৈষ্ঠ]-এর পত্রে তিনি যখন 'হতেম যদি কালিদাসের সময়ের একজন কবি' কবিতার উল্লেখ করছেন[১০], তখন ক্ষণিকা কাব্য প্রকাশের অনেক দেরি।

রথীন্দ্রনাথ উভয়ের সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করেছেন বিচক্ষণতার সঙ্গে:

একজন বিজ্ঞানী, অন্যজন কবি—এঁদের মধ্যে যে আকর্ষণ ছিল সে কেবল বন্ধুত্ব বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না। পরস্পরের মধ্যে একটি গভীর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল। কথাবার্তা গল্প করার মধ্যে ভাব-বিনিময়ের চেষ্টা যেন সর্বদাই চলত। নতুন গল্পের প্লট বা যে প্রবন্ধ লিখছেন তার বিষয়বস্তু নিয়ে বাবা আলোচনা করতেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর উদ্ভাবিত নতুন যন্ত্রের কথা বলতেন, নতুবা বলতেন জড় ও জীবের মধ্যে কি সব অদ্ভুত মিল তিনি সেই যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কার করেছেন। দুজনের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চললেও তাঁরা যেন যথেষ্ট খোরাক পেতেন পরস্পরের কথাবার্তা আলোচনা থেকে।[১১]

ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই সময় থেকে দেখা যায়, রাধাকিশোর বিভিন্ন ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও সাহায্যপ্রার্থী। সম্ভবত সহচর কর্নেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা মারফৎ রাধাকিশোর যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর ও যুবরানীর শিক্ষার্থে উপযুক্ত শিক্ষক মনোনীত করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর জামাতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. যতীন্দ্রনাথ বসুকে মনোনীত করে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দেন। রাধাকিশোর ১৪ বৈশাখ [বৃহ 26 Apr] এ-বিষয়ে লেখেন:

যতীন্দ্রবাবুকে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আলাপে সুখী হইয়াছি। আপনি যখন স্বয়ং বাছনি করিয়া শ্রীমান ও শ্রীমতীর জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন তখন আমার আর কি বলিবার আছে। যতী ও তাহার স্ত্রী মিলিয়া একই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থাকিলে আশানুরূপ ফল প্রত্যাশা করা যায়। যতীন্দ্রবাবু চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত শেষ আলাপ হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই সস্ত্রীক ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহাদের বাসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আসিবামাত্রই তাঁহার কার্য্যারম্ভ হইবে।[১২]

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে ২১ বৈশাখ [বৃহ 3 May] তাঁকে লেখেন:

যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞীর জন্য যে লোক নির্ব্বাচন করিয়াছি তাঁহারা ভদ্রবংশীয় এবং সচ্চরিত্র—একান্তমনে আশা করিতেছি তাঁহাদের জন্য কোন কারণে মহারাজের নিকট আমাকে অপরাধী ও লজ্জিত হইতে না হয়। তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকে বারম্বার উপদেশ দিয়াছি তথাপি যদি প্রকৃতিগত কোন ত্রুটিবশতঃ তাঁহারা স্বপদের লেশমাত্র অযোগ্য হন তবে মহারাজ যেন তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত না হন। ইহা নিশ্চয় মনে জানিবেন ইঁহাদের সহিত আমার যেটুকু বন্ধুত্বের বন্ধন আছে যুবরাজের মঙ্গল আমার নিকট তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর।···যাহা হউক আমি এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে যথোচিত উপদেশ দিয়াছি।[১৩]

সম্ভবত এই উপদেশ নেওয়ার জন্য যতীন্দ্রনাথ বৈশাখের মাঝামাঝি কোনোদিন প্রত্যুষে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ তিনি 'শিলাইদহে রবীন্দ্রবাবু' [দ্র সাহিত্য, আষাঢ়। ১৪৪-৪৯] প্রবন্ধে স্ব-অঙ্কিত 'গোরাই ও পদ্মার সঙ্গমে' ও 'রবীন্দ্রবাবুর পল্লীগৃহ' দু'টি চিত্র-সহ বিবৃত করেন। এতে উপরোক্ত বিষয়ে কোনো কথা না থাকলেও অন্যান্য কারণে প্রবন্ধটি মূল্যবান। প্রবন্ধটি থেকে দু'-একটি উদ্ধৃতি আমরা আগেই দিয়েছি, আরও কয়েকটি উদ্ধারযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের পাঠগৃহ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

সে গৃহে বহুমূল্য গৃহসজ্জা ছিল না, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা রবীন্দ্রবাবুর উপযুক্ত। একটি কাঁঠাল কাঠের টেবিল, তাঁহার নিজের ফরমাইসমত শিলাইদহের এক জন সূত্রধর নির্ম্মাণ করিয়াছে। তদুপরি অনেকগুলি কাগজপত্র, দুই একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশি, একটি রৌপ্যাধারে দোয়াত, আঠার শিশি ও বল্-পয়েন্টেড নিবের বাক্স, বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত। তিনখানি সংযুক্ত আয়নার মধ্যস্থলে একটি দেশীয় মৃন্ময়ঘট পুষ্পাধাররূপে অবস্থিত হইয়া টেবিলের শোভাসম্পাদন করিতেছিল। তৎপশ্চাতে দেওয়ালের গায়ে রবীন্দ্র বাবুর বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের অঙ্কিত চুণার দুর্গের চিত্র বিলম্বিত।...এতদ্ব্যতীত টেবিলের পৃষ্ঠে রবীন্দ্রবাবুর অনেক পরিচিত বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির ঠিকানা লিখিত আছে। টেবিলের দুই পার্শ্বে দুটি ছোট শ্বেতপ্রস্তরের সাইড-টেবিল। তাহার একটির উপরে একটি কাগজপত্র রাখিবার বাক্স, এবং অপরটির উপরে একটি ডেস্প্যাচ-বাক্স। বসিবার চেয়ারের দুই ধারে দুইটি ছোট হোয়াটনট, তদুপরি অনেক রকমের পুস্তক। দুইখানি আরাম-চেয়ার...একটি মোটা গদী-আঁটা ভাইভান [? ডিভান, divan], তাহার উপর ছোট বড় তাকিয়া। বাম পার্শ্বে একটি সোফা, পশ্চাতে একটি দেরাজ। হর্ম্মাতলে একটি মুলতানী গালিচা।[১৪]

রবীন্দ্রনাথের পাঠাগার বা রচনাগারের এই নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাপদ্ধতিরও একটি বিশেষ রূপ চিত্রিত করেছেন:

রবীন্দ্রবাবুর হাতে প্রায়ই একখানি অতি ক্ষুদ্র লাল খাতা থাকে, তিনি ইচ্ছামত তাহাতে লিখিয়া যান। গুণ গুণ করিয়া গান করা তাঁহার খুব অভ্যাস! তিনি যখন ঢিলা ইজার ও ঢিলা পাঞ্জাবী পরিয়া গুণ গুণ করিতে করিতে এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া বেড়ান, তখন লিখিবার কিছু মনে হইলে ঘড়ীর চেনে সংলগ্ন সোনার পেন্সিলটি দিয়া সেই ছোট লাল খাতায় লিখিয়া ফেলেন।[১৫]

বস্তুত ক্ষণিকা-র যে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে, সেটিও একটি 'অতি ক্ষুদ্র খাতা' [Ms. 120]—সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পৃষ্ঠা অভঙ্গুর স্বচ্ছ পত্রাবরণে আচ্ছাদিত [Laminated] হবার পর তার আয়তন 7.5x12.5 cm—মলাটের রঙ এখন নীল। ক্ষণিকা-র তেইশটি কবিতার খসড়া এতে আছে, সবগুলিই পেনসিল দিয়ে লেখা—কিন্তু সেখানে ক্ষণিকা-র প্রথম কবিতাটির তারিখ ২ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 15 May], গ্রন্থে কবিতাটির নামকরণ হয় 'সম্বরণ' [দ্র ক্ষণিকা ৭ | ২৮১-৮২]। এর আগে নৈবেদ্য-এর অন্তর্গত 'তোমারি বীণা [রাগিণী] জীবনকুঞ্জে' [দ্র নৈবেদ্য ৮। ৯-১০] গানটি ও আরও একটি গান 'কমলবনের মধুপরাজি' [দ্র গীত ২। ৫৪৬-৪৭] লিখিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির সর্বপ্রথম রচনা চারটি ছত্র—

> এখন ভুলিব সকল কর্ম্ম
> সকল দিনের ক্লান্তি
> সব সুখ দুখ সব লাভ ক্ষতি
> তোমাতে লভিব শান্তি।

—হয়তো 'নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে' [দ্র নৈবেদ্য ৮। ৯; গীত ১। ৮১] গানটির সঞ্চারী অংশের প্রাথমিক রূপ। যতীন্দ্রনাথ যদি এই খাতাটিতেই রবীন্দ্রনাথকে রচনা-নিরত অবস্থায় দেখে থাকেন, তাহলে এই তিনটি গানের রচনাকালের একটা হদিশ পাওয়া যায়।

যতীন্দ্রনাথ ক্ষণিকা-র মুদ্রণ-ব্যাপারেও আমাদের কিছু সংবাদ দিয়েছেন:

তখন ডাক আসিল। একখানি চিঠি রবীন্দ্র বাবুর মুদ্রাকর লিখিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "এবার আমি অনেক কবিতা থলি-ঝাড়া করিয়াছি। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক একটু ভাল করিয়া ছাপাইতেছি, তাহার নাম 'ক্ষণিকা'।"[১৫]

এছাড়া 'তাম্রকূটঘনধূমবিলাসী' এক সুরসিক রবীন্দ্র-বন্ধুর শিলাইদহে অবস্থিতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। 'বন্ধুর পক্ষে উহাই সান্ত্বনার সামগ্রী' এই ইঙ্গিত থেকে অনুমান করা যায়, তিনি হয়তো লোকেন্দ্রনাথ পালিত। য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র মতো ক্ষণিকা-ও তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল—দু'টি গ্রন্থের সঙ্গেই লোকেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে।

ক্ষণিকা-র মুদ্রাকর প্রেমতোষ বসুকে রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ মাসে অন্তত ন'টি চিঠি লিখেছেন—তার মধ্যে ৩ বৈশাখেরটি বাদে বাকি সবগুলির প্রধান বিষয় দ্রুত মুদ্রণের জন্য ক্রমাগত তাগিদ। ১০ বৈশাখেই [রবি 22 Apr] এই তাগিদের শুরু:

কিন্তু মহাশয় মুদ্রাঙ্কন ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতা করিবেন না। খুব করিয়া হাত চালাইয়া লইবেন। ফর্মা পাঁচেকের বেশী হইবে না, অতএব ধরিতে গেলে এক সপ্তাহের কাজ বিশেষতঃ কম্পোজ করিবার ম্যাটার অতি অল্প, অক্ষর অল্পই জুড়িবে।[১৬]

এই চিঠিতে ক্ষণিকা-র দু'টি কবিতার রচনা-কাল সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে:

[কাপি] ঘাঁটিয়া দেখিবেন "প্রগল্‌ভতা" নামক একটি কবিতা আছে; প্রথমতঃ তাহার নাম বদলাইয়া "ভীরুতা" করিয়া দিবেন, তাহার পরে উপরিলিখিত শ্লোক দুটি তাহার সব শেষে বসাইয়া দিবেন। পরপৃষ্ঠায় "উদাসীন" বলিয়া যে কবিতাটা লিখিয়া দিলাম সেটা শেষ কবিতার আগে ছাপিতে হইবে।

এ থেকে অন্তত এইটুকু জানা যায় যে, 'প্রগল্‌ভতা' বা 'ভীরুতা' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ২৩৬-৩৮] ক্ষণিকা-র প্রথম 'গোটা কুড়িক' কবিতার অন্তর্গত এবং প্রাথমিক রূপের তিনটি স্তবকে গঠিত কবিতাটির চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবক পরে লেখা; আর 'উদাসীন' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ৩০৮-১১] কবিতাটি ১০ বৈশাখের কাছাকাছি সময়ের রচনা, যদিও মোট ৬২টি কবিতার মধ্যে ৫২-সংখ্যক 'উদাসীন' শেষ কবিতার আগে ছাপানো হয় নি, এর আগে-পরে পরবর্তী সময়ে লেখা কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে; শেষ কবিতা কোন্‌টি ছিল সেটি নির্ণয় করা সহজ নয়—তারিখ-হীন 'যৌবনবিদায়', 'শেষ হিসাব' বা 'সমাপ্তি' এর মধ্যে যে-কোনো একটি শেষ কবিতা হিসেবে ব্যবহৃত হবার যোগ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'শেষ' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ৩১৫-১৮] কবিতাটির প্রথম কয়েকটি ছত্রের প্রাথমিক খসড়া মজুমদার-পুঁথির 81 পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়:

থাক্‌বনা ভাই থাক্‌ না—
  থাক্‌বেনা ভাই কিছু
সেই আনন্দে চল্‌রে ধেয়ে
  কালের পিছু পিছু।
বইতে কভু হবেনা ভাই
  শুধু একই প্রাণ

মজুমদার-পুঁথিতে এর পরেই আছে তিনটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুলিপি ও পরপৃষ্ঠায় চিরকুমার সভা-র নবম পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত 'অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ' ইত্যাদি শ্লোকের বঙ্গানুবাদের খসড়াটি 'কুঞ্জকুটীরের স্নিগ্ধ অলিন্দের পর' [দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪। ২৯৩-৯৪] প্রভৃতি। এ থেকে 'শেষ' কবিতাটির রচনা-কালের নির্ভরযোগ্য কোনো হদিশ পাওয়া না গেলেও মনে হয় কবিতার খসড়াটি ক্ষণিকা-র প্রথম পর্বের, যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রহসনটিতে ব্যবহার্য শ্লোকের সন্ধান ও অনুবাদের কাজটি এগিয়ে রাখছিলেন।

১০ বৈশাখের নির্দেশ ও তাগিদ ১২ বৈশাখে অনুযোগে পরিণত হয়েছে:

কৈ মশায়, আপনার ত সাড়াই নাই! শীঘ্র ছাপা হইবে আশা করিয়াই পুরাতন সমাজপ্রেসকে বঞ্চিত করিয়া আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি—কিন্তু দোহাই যেন তপ্তটাহ হইতে অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া না হয়। যদি কোন কারণে সত্বরতার কোন ব্যাঘাত থাকে তবে এইবেলা খবর দিবেন। উৎকণ্ঠিত আছি।[১৭]

১৪ বৈশাখ (বৃহ 26 Apr] প্রেমতোষ বসুর অনুকূল উত্তরে আশ্বস্ত হয়ে তিনি লিখলেন:

২৫শে বৈশাখ আমার জন্মদিন—ইচ্ছা ছিল সেই নাগাদ বইটা প্রকাশ করিয়া আত্মীয় স্বজনকে বিতরণ করি কিন্তু ততটা আশা করিতে সাহস হয় না। যাহা হউক আমি আগামীকল্য অর্থাৎ শুক্রবারে চাঁদপুর মেলে কলিকাতায় পৌঁছিব। শনিবার প্রাতে যোড়াসাঁকো বাড়িতে কাপি প্রুফ ইত্যাদি সহ যদি উপস্থিত হইতে পারেন তবে মোকাবিলায় আধঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কথাবার্তা বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হইয়া যাইতে পারে। চাই কি গোড়াকার প্রুফটা দেখিয়া দিয়া আসিতে পারি।[১৮]

আশা করা যায়, শনিবার ১৬ বৈশাখ [28 Apr] প্রাতে উভয়ের দেখা হয়েছিল এবং ১৮ বৈশাখ [সোম 30 Apr] রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ প্রত্যাবর্তনের সময়ে শিয়ালদহ স্টেশনে প্রেমতোষ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে 'সেই রাত্রের ডাকেই একটা কি ব্যাপার' তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু 'পঞ্চরাত্রি কাটিয়া যাওয়াতে' চিন্তিত রবীন্দ্রনাথ ২৩ বৈশাখ [শনি 5 May] তাঁকে লিখলেন [এর মধ্যে আরও দু'টি চিঠি লেখা হয়েছে প্রায় একই বক্তব্য প্রকাশ করে]:

আমি দেখিতেছি আপনি নীরবে কাজ করিতে ভাল বাসেন, তাহা প্রশংসনীয় বটে কিন্তু কাজ যে চলিতেছে এটা জানিতে যাহাদের স্বার্থ বা ঔৎসুক্য আছে তাহাদের পক্ষে বড় মুস্কিল ···বইটার সৌন্দর্যসঞ্চারের দিকে আপনি যে এত উৎকট মনোযোগ দিবেন আমি গোড়ায় আশঙ্কা করি নাই। দেখিতেছি ক্রমেই আপনার নেশা চড়িয়া যাইতেছে। আমি চাহিয়াছিলাম মধ্যম রকমের সৌষ্ঠব কিন্তু চটপট সমাধা আপনি সর্বোত্তমের দিকে মন দিলেন এবং [ভাবি]লেন "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ।"—মহাকাল নিরবধি বটে কিন্তু মানুষের কারবার খণ্ডকাল লইয়া—"ক্ষণিকা" সম্বন্ধে সেটা আপনাকে বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে।...অতএব প্রসাধন কার্যের নেপথ্যবিধানে অতিরিক্ত কালাতিপাত না করিয়া ক্ষণিকাকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিয়া দিন। আমি স্বল্পে সন্তুষ্ট।[১৯]

মুদ্রণের এই বিলম্ব রবীন্দ্রনাথকে আরও কবিতা রচনার সুযোগ করে দিয়েছে। ২১ বৈশাখেই তিনি লিখেছিলেন: 'আর একটি কবিতা আছে এইটে বইয়ের সবশেষে যাইবে কপি করিয়া পাঠাইতেছি। পরপৃষ্ঠা দেখুন।'[২০] মূল পত্র দেখার সুযোগ আমাদের হয় নি এবং সংকলক অনবধানবশত কবিতাটি উদ্ধৃত করেন নি, ফলে কবিতাটি কি ছিল বলা শক্ত। একই ব্যাপার হয়েছে ২৮ বৈশাখের [বৃহ 10 May] পত্রের সঙ্গে পাঠানো কবিতা সম্বন্ধে! এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

আপনাদের ছাপার বিলম্বে অধীর হইয়া শেষকালে কবিতা রচনায় হাত দিতে হইয়াছিল। সুতরাং ক্ষণিকার আরও কয়েকটি লেখা বাড়িয়া গেছে। এইবার কিন্তু পজিটিভলি দি লাস্ট—আশা করি বিলম্ব সম্বন্ধে আপনারাও সেইরূপ আশ্বাস দিতে পারিবেন। পরপৃষ্ঠা দেখুন।[২১]

মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সময়ে শিশু-কবিতাগুচ্ছ লেখার ক্ষেত্রেও এইভাবে কবিতার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল—৬ ভাদ্র ১৩১০ [23 Aug 1903] তারিখের চিঠিতে 'পজিটিভ্‌লি দি লাষ্ট্' বাক্যাংশটিও আছে—কিন্তু সেখানে রচনার তাগিদই ছিল মুখ্য। আমাদের অনুমান, এই অতিরিক্ত কবিতাগুলি দ্বিতীয় কোনো পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হয়েছিল। প্রথমটি নিশ্চয়ই লোকেন্দ্রনাথ হস্তগত করেছিলেন, তৃতীয়টি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে—রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে ক্ষণিকা-র স্বতন্ত্র সংস্করণগুলিতে কোনো কবিতাই তারিখ-চিহ্নিত নয়, তৃতীয় পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তম খণ্ডে [আষাঢ় ১৩৪৮] তেইশটি কবিতায় স্থান-কাল নির্দেশিত হয়।

প্রেমতোষ বসু 'তিনটে চারটে পাঁচটারকমের কালী', আর্ট পেপার ইত্যাদির সাহায্যে ক্ষণিকা-য় সৌন্দর্যসঞ্চার করতে চেয়েছিলেন—'গ্রন্থের পত্রে পত্রে বর্ডার' দিয়ে প্রথম প্রুফও পাঠান, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা অনুমোদন করেন নি। ১ জ্যৈষ্ঠ [সোম 14 May] তিনি লেখেন:

সাজসজ্জা সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র চিন্তা ও বিলম্ব না করিয়া আপনি এইভাবেই ছাপাইয়া যান। দোহাই আপনার এবারে আর দেরী না—বৈশাখ গেল জ্যৈষ্ঠ আসিল—মনে আশা ছিল বসন্তে বাহির হইবে, গ্রীষ্মে হইলেও চলে কারণ তখনও দখিণ বাতাস থাকে কিন্তু পুবে বাতাসের আমলে

গিয়া যদি পড়ি তবে আষাঢ়ের ধারার সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য কবির মুষলধারে অশ্রুপতন হইবে।[২২]

—কবির অশ্রুপতন হয়েছিল কিনা জানা যায় না, কিন্তু বিলম্বের সুযোগে তিনি ১০ আষাঢ় [রবি 24 Jun] পর্যন্ত কবিতা লিখে গেছেন—প্রিয়নাথ সেন একখণ্ড ক্ষণিকা উপহার পেয়েছেন 'আষাঢ়স্য শেষদিবসে' [৩১ আষাঢ় রবি 14 Jul]। ১ জ্যৈষ্ঠের পর রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই প্রেমতোষ বসুকে আরও কয়েকটি তাগিদপত্র লিখেছিলেন, কিন্তু ৩১ জ্যৈষ্ঠের [বুধ 13 Jun]-এর একটি ছোটো চিঠি ছাড়া এ-বিষয়ে আর কোনো চিঠি প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু 'বিলম্বিত' 'চিরায়মানা' ও 'আবির্ভাব' কবিতায় প্রেমের ছদ্মবেশ পরিয়ে পূর্বোদ্ধৃত পত্রোল্লিখিত ক্ষোভকেই ভাষা দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রসঙ্গটি পরেও আলোচিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ ১৫ বৈশাখ [শুক্র 27 Apr] শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসেন। পরের দিন তিনি ১৩৯ ধর্মতলা স্ট্রীটে জগদীশচন্দ্রের বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে না পেয়ে একটি চিঠি লিখে রেখে আসেন:

সুহৃৎ/আসিয়াছিলাম—চলিলাম।

সোমবারে শিলাইদহে যাইব। ইহার মধ্যে সে অঞ্চলে যাইবার ইচ্ছা আছে কি? সার্কুলার রোডের বাড়ীতেও গিয়াছিলাম, সেখানে দ্বার জালানা [যদ্দৃষ্টং] রুদ্ধ—এখানে দ্বার জালানা উন্মুক্ত, কিন্তু ফলে তফাৎ হইল না। কিন্তু চলুন পদ্মাতীরে—সেখানে চমৎকার ঝড়বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ চলিতেছে—এইরূপ দুর্য্যোগে ম্যাকবেথের তিন উইচ্ মাঠের মাঝখানে সম্মিলিত হইয়াছিল—অধিক আর কি বলিব।[২৩]

কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা ও আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। রাধাকিশোর মাণিক্য ১৪ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: 'জগদীশবাবুর কথা আমার স্মরণ আছে। তাঁর বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বকথিত সাহায্য করিব। জগদীশবাবুর সহিত এ বিষয়ে কোনও আলাপ হয় নাই। অতএব আপনার বরাবরে মণিঅর্ডার করিতে ইচ্ছা করি।'[২৪] এই চিঠি কলকাতায় যাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের বিদেশযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৮ বৈশাখ [সোম 30 Apr] শিলাইদহে ফিরে যান। সেখান থেকে ২১ বৈশাখ [বৃহ 3 May] রাধাকিশোরকে লেখেন:

জগদীশবাবুর সেই টাকা আমার নিকট পাঠাইলে আমি আনন্দ সহকারে যথাস্থানে যথাসময়ে পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে দিনদুয়েকের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম—সেখানে জগদীশবাবুর সহিত অনেক আলাপ আলোচনা হইল। তিনি সম্প্রতি বিলাতের পণ্ডিতদের নিকট হইতে মহোৎসাহপূর্ণ যে সমস্ত পত্র পাইয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। তাঁহারা লিখিয়াছেন—"আপনার নূতন আবিষ্কারগুলি পরমাশ্চর্যজনক।"[২৫]

—নিজের প্রতিভার বিশ্বখ্যাতি লাভের সম্ভাবনা তখন রবীন্দ্রনাথের কল্পনারও অতীত ছিল, কিন্তু বন্ধুর বিদেশী খ্যাতি তাঁর মনে যথোচিত গর্বের সঞ্চার করেছে।

২৪ বৈশাখ [রবি 6 May] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন পরিষদের নূতন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কার্যালয় স্থানান্তরে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং এই অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তিনি আসেন নি। এ-প্রসঙ্গে তিনি প্রিয়নাথ সেনকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি পাওয়া যায় নি। তবে তার উত্তরে প্রিয়নাথ ঐদিনই লেখেন: 'আঃ বাঁচলেম—পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে আর যেতে হ'ল না। তুমি আসবে না—তবে আর আকর্ষণ কি—অন্ততঃ আমার পক্ষে?' বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী-তে

চিরকুমার সভা-র প্রথম কিস্তি পড়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি লিখেছেন; 'তোমার মনের কোনখানে এত রস লুকান ছিল—গল্পটি বলিবার ধরণ সমস্ত হাব ভাব Gautier-এর উপযুক্ত। তোমার ফরাসীভাষা জানা থাকলে অনেক মহাত্মা তোমার মৌলিকতায় সন্দেহ কর্ত্ত। আমাদের বাঙ্গালী মহাশয়েরা এসব বিষয়ে বড়ই উদার।' এরপর তিনি ক্ষণিকা-র উদ্দেশ্যে একটি সনেট ['অচির বসন্ত হায়, এল—গেল চলে'] লিখে তাঁকে প্রেরণ করেন।[২৬] কবিতাটি প্রদীপ-এর প্রকাশক বৈকুণ্ঠনাথ দাস দাবি করলে প্রিয়নাথ ২৬ বৈশাখের পত্রে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি চেয়ে লেখেন: 'কবিতাটির "বসন্ত-অন্তে" এই নাম দিয়া তোমার নামে উৎসর্গ করিলে তোমার কি তাহাতে কিছু আপত্তি আছে।'[২৭] এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ২৭ বৈশাখ [বুধ 9 May] একটি পত্র লেখেন, তাতে 'প্রত্যুপহার' নামে একটি সনেট লিখে পাঠান, যার মধ্যে একটি ছত্র কম পড়েছিল [পত্রটি পাওয়া যায় নি]। প্রিয়নাথ এ-বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ২৯ বৈশাখ [শুক্র 11 May] সেই ফাঁকি' 'পরিশোধ করতে বসে আগাগোড়া কতক কতক বদলে গেল'। এই পাঠান্তরিত সনেটটি পাঠিয়ে তিনি লিখেছেন: 'আর কিছু না, একটা লাইন লিখে শেষকালে লেখবার নেশা জেগে উঠ্‌ল—খুন চড়ে যাওয়ার মত—একেবারে কলম হাতে ভীষণবেগে ran amuck। যদি ভাল লাগে ত এই পাঠান্তর রেখো নইলে নূতন লাইনটুকু যোগ করে পুরানো পাঠ চালিয়ে দিতে পার। যথাভিরুচি।'[২৮] এই দু'টি সনেট জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা প্রদীপ-এর ১৮৫ পৃষ্ঠায় বাম দিকে 'বসন্ত অন্তে।/ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রিয়বরেষু' ও ডান দিকে 'প্রত্যুপহার।/ (পূর্বোক্ত কবিতা-প্রসঙ্গে রচিত)/ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের করকমলে উপহৃত।'—শিরোনামে উভয়ের স্বাক্ষরের প্রতিলিপিসহ যুগ্মভাবে মুদ্রিত হয়। এই যুগ্ম-কবিতার সামনে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (তরুণ বয়সে)।'—পরিচয়-সহ কুন্তলীন প্রেসে ছাপা একটি আলোকচিত্র সংযোজিত হয়। পাঠকের মনে থাকতে পারে, এই চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে ফাল্গুন ১৩০৬-এর শেষ দিকে শিলাইদহে থেকে পাঠিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, চিঠির সঙ্গে প্রেরিত কবিতার পাঠের সঙ্গে প্রদীপ-এ মুদ্রিত পাঠের [দ্র উৎসর্গ-সংযোজন ১০। ৮৭] পার্থক্য আছে—সম্ভবত প্রাথমিক পাঠ অবলম্বনে প্রিয়নাথই এই সম্পাদনা করেছিলেন, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি তো আগেই পাওয়া গিয়েছিল।

বৈশাখ-সংখ্যা সাহিত্য-এর Frontispiece হিসেবে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ (বিভিন্ন বয়সে)' পরিচিতি দিয়ে অলংকরণ-সহ তাঁর চারটি ছবি মুদ্রিত হয়; এটিও U. Roy [উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী] কর্তৃক প্রস্তুত ব্লকে কুন্তলীন প্রেসে ছাপা হয়। এরই সঙ্গে পত্রিকাটির ৪১ পৃষ্ঠায় প্রিয়নাথ সেনের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ।/ ১৩০৬ |'-শীর্ষক একটি সনেট ['তোমার সঙ্গীত-রবে স্পন্দিত বরষ'] মুদ্রিত হয়, যার শেষ চারটি ছত্র হল:

> প্রতিভার চিরোজ্জ্বল অমর প্রভায়
> সমুজ্জ্বল চারি যুগ নয়নে উদিত!
> কল্পনা-কাহিনী-কথা-কণিকা হীরার
> চারি দিকে চারি রবি চতুষ্ক শোভার।

এইটি দেখে ৬ আষাঢ় [বুধ 20 Jun] রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লেখেন:

> "সাহিত্যে" কবিতায় এবং আলেখ্যে আমি চিত্র-বিচিত্রিত হয়ে উঠেছি—তাতে তোমারি প্রণয়চেষ্টা প্রস্ফুটিত হয়েছে—আমি সে সম্বন্ধে নীরব।[২৯]

—এতে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির প্রণয়চেষ্টাও ব্যক্ত হয়েছে; আষাঢ়-সংখ্যায় তিনি যতীন্দ্রনাথ বসুর 'শিলাইদহে রবীন্দ্রবাবু' প্রবন্ধও ছাপেন। বস্তুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'প্রণয়ের পরিণাম' গল্পটি ছাপার পর সুরেশচন্দ্র সম্ভবত কিছুটা অপ্রতিভ হয়েছিলেন, এর পরে তাঁর 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'য় রবীন্দ্র-রচনার সমালোচনার সুর খুবই কোমল। কার্তিক ১৩০৭-সংখ্যা সাহিত্য-তে রবীন্দ্র-গ্রন্থের বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথও অনেক নরম হয়ে এসেছেন। গল্পগুচ্ছ সুরেশচন্দ্র ছাপাতে চান ও রবীন্দ্রনাথের মনোভাবও অনুকূল, এমন একটা ইঙ্গিত প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি পত্রে [দ্র চিঠিপত্র ৮। ১০৪, পত্র ১১৪] পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যাশিত সম্মিলনটি শেষ পর্যন্ত ঘটে নি।

কল্পনা কাব্যগ্রন্থ ছাপার আয়োজন শুরু হয়েছিল ২৬ ফাল্গুন ১৩০৬ [9 Mar 1900] তারিখে সাড়ে দশ টাকায় দু'রিম কাগজ কিনে। প্রায় ৭৬ টাকা ব্যয়ে ৬০০ খণ্ড কল্পনা প্রকাশিত হল আখ্যাপত্রে প্রদত্ত তারিখ অনুযায়ী ২৩ বৈশাখ ১৩০৭ [শনি 5 May 1900] তারিখে। গ্রন্থের আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত হল:

কল্পনা।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রণীত।/ কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও/ প্রকাশিত।/ ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।/ ২৩ বৈশাখ ১৩০৭

বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়:

উৎসর্গ/ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার/ সুহৃৎকরকমলে/ বৈশাখ ১৩০৭

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+২+১১৪; মূল্য এক টাকা।

এই গ্রন্থটি বাস্তবিকই 'থলি-ঝাড়া' করে সংকলিত। পৌষ ১৩০৩-এ রচিত 'ভারতলক্ষ্মী' ['অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'] গান থেকে আরম্ভ করে বৈশাখ ১৩০৬-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত 'বৈশাখ' কবিতা পর্যন্ত মোট ৫০টি কবিতা ও গান এই গ্রন্থে আছে, তার মধ্যে গানের সংখ্যাই ১৮টি—দু'টি কবিতায় পরে সুরযোজনা হয়েছিল।

প্রিয়নাথ সেন ২৭ বৈশাখ (বুধ 9 May] গ্রন্থটি পেয়ে পরের দিন রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন:

'কল্পনা' কাল অপরাহ্নে পাইয়াছি—এবার দেখছি আমিই তোমার এই অমূল্য উপহার সর্ব্বাগ্রে পাইলাম, তজ্জন্য আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর—এই ক'টা দিনে তুমি যে এই কবিতার দান-সাগর করিলে আমাদের দেশের দুর্ভাগারা কি তার আদর জানিবে? তোমার মুক্ত-প্রাণ, অবচ্ছল, দানভারানন্দ-পীড়িত আমি—এই কয়টি কথা লিখিতে, আমার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিতেছে।[৩০]

বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের তিনটি রচনা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়।

ভারতী, বৈশাখ ১৩০৭ [২৪। ১]:

২-৪ 'বৈশাখ' দ্র কল্পনা ৭। ১৯৬-৯৮

৯৫-১০৮ 'চিরকুমার সভা'/ প্রথম পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪। ২১৯-২৮

সাহিত্য -পরিষৎ- পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩০৭ [৭। ১]:

৬০-৬২ 'বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত' দ্র শব্দতত্ত্ব ১২। ৩৭১-৭৩

চৈত্র ১৩০৬-এই রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধটি পরিষৎ পত্রিকা-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তা তাঁকে লেখা রামেন্দ্রসুন্দরের ২১ চৈত্রের [3 Apr] পত্র থেকে জানা যায়। প্রবন্ধের

শুরুতেই তিনি ব্রুগমান্-এর যে ইণ্ডোজর্মানীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণের উল্লেখ করেছেন, সেই *Elements of the Comparative Grammar of the Indo-Germanic Languages*...by Karl Brugmann [1888] গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত-সংগ্রহে রক্ষিত। গ্রন্থটি থেকে সূত্র সন্ধান করে তিনি বাংলা শব্দদ্বৈতের যে নিয়ম আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন, বাংলা শব্দতত্ত্বের আলোচনায় তা সম্পূর্ণ অভিনব। এর ফলে নূতন আলোচনার পথেও অনেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। প্রদীপ-এর ফাল্গুন ১৩০৭-সংখ্যায় [পৃ ১০৪-০৯] 'বাঙ্গলা শব্দ-দ্বৈত' প্রবন্ধে শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ-নির্ধারিত অর্থের সমালোচনা করলে পত্রিকাটির জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮-সংখ্যায় [পৃ ২২১-২৩] 'শব্দদ্বৈত' প্রবন্ধে চন্দ্রশেখর কর রবীন্দ্রনাথের লেখা না পড়েও শ্রীনিবাসবাবুর বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথও এইরকমই চেয়েছিলেন। তিনি প্রবন্ধটি শেষ করেন এ আহ্বান জানিয়ে: 'মহারাষ্ট্রি হিন্দি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্যভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ বাংলাভাষার সহিত তৎতৎ ভাষার শব্দদ্বৈতবিধির তুলনা করিলে একান্ত বাধিত হইব।'

আমরা আগেই বলেছি, ক্ষণিকা মুদ্রণে বিলম্ব হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ নূতন একগুচ্ছ কবিতা লিখতে শুরু করেন। এবারে যে খাতায় কবিতা লেখা হল তার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি গানের পর প্রথম লিখিত কবিতাটি হল 'সম্বরণ' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ২৮১-৮২], এটি শিলাইদহে ২ জ্যৈষ্ঠে [মঙ্গল 15 May] লেখা।

এর পরেই তিনি কলকাতায় আসেন। ৪ জ্যৈষ্ঠ [বৃহ 17 May] তিনি বিডন স্ট্রীট ও বালিগঞ্জ যাতায়াত করেন, পরের দিন যান ধর্মতলায় সম্ভবত জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে। দু'দিনে তিনি চিঠি লিখেছেন ৭টি, তার মধ্যে ৫ জ্যৈষ্ঠ শিলাইদহ, যশোর [লোকেন পালিত], ত্রিপুরা [রাধাকিশোর বা মহিম দেববর্মা] ও ঘোড়ামারায় [অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়]—কিন্তু কোনো চিঠিটিই পাওয়া যায় নি।

৬ জ্যৈষ্ঠ [শনি 19 May] তিনি বালিগঞ্জ ও সংগীতসমাজে যান, পত্র লেখেন জে ঘোষাল [? জ্যোৎস্নানাথ], জগদীশবাবু, সিলাইদহ ও টি পালিতকে। ৭ জ্যৈষ্ঠও তিনি তিনটি চিঠি লেখেন ও সংগীতসমাজে যান।

এই দিন [৭ জ্যৈষ্ঠ রবি 20 May] সত্যেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে শরচ্চন্দ্র দাস 'ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ' ও আনন্দনাথ রায় 'লালা জয়নারায়ণ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। তার আগে রবীন্দ্রনাথ সিকদার কোম্পানির প্রসন্নকুমার সেনকে সভ্যরূপে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করেন ও প্রস্তাবটি সমর্থন করেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সিকদার কোম্পানির প্রসন্নকুমার সেন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মমন্দির নির্মাণ ও জোড়াসাঁকো বাড়ির মেরামত ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

রাধাকিশোর মাণিক্য তাঁর ১৪ বৈশাখের [বৃহ 26 Apr] পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: 'একবার দার্জ্জিলিং অঞ্চলে যাইতে ইচ্ছা করি। ভয় পাছে সেবারকার মত পথে বিচিকিচ্ছে বাধা না পাই। একটা দিন স্থির হইলে অবশ্য আপনাকে লিখিব।'[৩১] এর আগে ৮ আশ্বিন ১৩০৬ [রবি 24 Sep 1899] তাঁদের দার্জিলিঙে মিলিত হবার কথা ছিল, কিন্তু পথে ঝড়ে বিপর্যস্ত হওয়ায় রাধাকিশোরের সেবারে যাওয়া হয় নি। এবারেও সেই সুযোগ এসেছিল কিনা নিশ্চিত করে বলার মতো উপকরণের অভাব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিং যাত্রার প্রমাণ আছে ক্যাশবহিতে ও কবিতার খাতায়। তিনি শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দার্জিলিং যাত্রা

করেন ৮ জ্যৈষ্ঠ [সোম 21 May] তারিখে। এই দিনও তিনি পাঁচটি চিঠি লেখেন, কিন্তু কাকে লেখা হয় তার উল্লেখ নেই।

এই দিন 'রেলগাড়ি/ দার্জিলিং পথে' তিনি লেখেন 'স্থায়ী-অস্থায়ী' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ৩০৭-০৮] কবিতা। পাণ্ডুলিপিতে কবিতার নাম নেই, মুদ্রণের সময়ে নামকরণ হয়। ক্ষণিকা-র মূল সুরে বিবাদী স্বর লাগছে, 'সম্বরণ' ও 'স্থায়ী-অস্থায়ী' দু'টি কবিতাতেই তা অনুভব করা যায়।

৯ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 22 May] দার্জিলিং পৌঁছে তিনি লিখলেন Ms. 120-তে লেখা ক্ষণিকা-র তৃতীয় কবিতা 'ক্ষণেক দেখা' [দ্র ঐ ৭। ২৮৫-৮৬], এটিরও পাণ্ডুলিপিতে নামকরণ হয়নি। ক্ষণিকা-র সুর ফিরে এসেছে এই কবিতাতে।

রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন: "মাঝে জ্যৈষ্ঠমাসের গোড়ায় দিন দশ দার্জিলিঙে জগদীশচন্দ্রের সহিত 'আনন্দেল হাউসে' কাটাইয়া আসেন।'[৩২] এই সিদ্ধান্তও অবশ্য কিছুটা অনুমান-নির্ভর। তবে রবিবার [১৪ জ্যৈষ্ঠ: 27 May] দার্জিলিং Annandale House-এ জগদীশচন্দ্রের ভগিনীপতি ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসুর কন্যা নলিনী নাগের অটোগ্রাফ-খাতায় রবীন্দ্রনাথ 'পাষাণে পাষাণে তব শিখরে শিখরে' প্রথম ছত্র-যুক্ত আট লাইনের একটি কবিতা লিখে দেন, তার প্রমাণ রয়েছে [দ্র প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮| ১; ফুলিঙ্গ ২৭। ৩৪], তিনি কবিতাটির প্রথম খসড়া করেন ক্ষণিকা-র পাণ্ডুলিপিতে।

রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন সম্ভবত ১৬ জ্যৈষ্ঠ [মঙ্গল 29 May] তারিখে। এই দিনই তিনি নিমতলা স্ট্রীট যাতায়াত করেন প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গে দেখা করতে।

একটি তারিখ-হীন [? ১৭ জ্যৈষ্ঠ বুধ 30 May] পত্রে রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে দার্জিলিং-ভ্রমণের সংবাদ দিয়ে লিখেছেন: 'আমি হপ্তাখানেক দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করে কাল ফিরে এসেছি। আবার আগামীকল্য প্রাতে শিলাইদহ যাত্রা কর্‌চি।···তোমাকে মোটা কাগজে ছাপা কল্পনা একখণ্ড পাঠান গেল। ইচ্ছামত বাঁধাবে বলে মলাট দেওয়া হয়নি।'[৩৩] শ্রীশচন্দ্র তাঁর পত্রে কন্যা মৈনুর বিবাহের আয়োজনের কথা লিখেছিলেন, সেটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'মৈনু ত বেলার বয়সী। বেলাও খুব মস্ত হয়েছে।' আর কিছুদিন পরে কবিভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেনের মেয়ের বিয়ের খবরও তাঁর কাছে পৌঁছয়। এইসব ঘটনার কার্যকারণে দেখা যাবে কিছুদিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও মাধুরীলতার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

মিস্ মুখার্জি, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও ত্রিপুরার মহারাজকেও রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি পাওয়া যায় নি।

১৭ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 30 May] সংগীতসমাজের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি পরদিন শিলাইদহ যাত্রা করেন।

শিলাইদহ পৌঁছনোর পরের দিনই ১৯ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র 1 Jun] আবার ক্ষণিকা-র কবিতা লেখা শুরু হয়েছে। এই দিন তিনি লিখলেন 'দুই বোন' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ২৮৯-৯০]।

২০ জ্যৈষ্ঠ [শনি 2 Jun] তিনি লিখলেন দু'টি কবিতা 'আষাঢ়' [দ্র ঐ। ২৮৭-৮৯] ও 'নববর্ষা' [ভারতী, আষাঢ়। ২৯৭-৩০০; ক্ষণিকা ৭। ২৯১-৯৩]। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, 'নববর্ষা' কবিতার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও অষ্টম স্তবক প্রথমে রচিত হয়—পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তবক পরে রচনা করে। 'পূর্ব্বপৃষ্ঠায়' মন্তব্য-সহ যোগ করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষণিকা-র মুদ্রণে বিলম্ব দেখে রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা হয়েছিল গ্রন্থটি 'দখিণ বাতাস'

থেকে ‘পূবে বাতাসের আমলে’ গিয়ে পড়তে পারে—সে আশঙ্কা তো সত্য হয়েছিল, উপরন্তু বর্ষার কবিতা পর্যন্ত তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে!

২১ জ্যৈষ্ঠ [রবি 3 Jun]ও রচিত হল দু'টি কবিতা—‘বিরহ’ [দ্র ক্ষণিকা ৭। ২৮২-৮৪] ও ‘অকালে’ [দ্র ঐ। ২৮৬-৮৭]। ক্ষণিকা উপহার পেয়ে চন্দ্রনাথ বসু মুগ্ধ হয়ে ৩০ শ্রাবণ [14 Aug] রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন, তার মধ্যে বিশেষ করে ‘বিরহ’ সম্বন্ধে লেখেন: ‘কিন্তু, কি জানি কেন, “বিরহের” সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে উহা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ।’[৩৪] রবীন্দ্রনাথ পুরো চিঠিটি উদ্ধৃত করে ৩১ শ্রাবণ প্রিয়নাথকে লিখেছেন: “বিরহ” কবিতাটা আমার নিজের কিছু বিশেষ প্রিয়—সেইটে উনি বিশেষরূপে নির্ব্বাচন করাতে আমিও একটু বিশেষ খুসি হয়েছি।’[৩৫]

এরপর কয়েকদিন বিরতি দিয়ে ২৬ জ্যৈষ্ঠ [শুক্র ৪ Jun] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘বিলম্বিত’ [দ্র ক্ষণিকা ৭। ৩১৯-২০]। আমাদের অনুমান, এইটি প্রেমতোষ বসুকে কবিতায় লেখা চিঠি:

অনেক হল দেরি,
আজো তবু দীর্ঘ পথের
অন্ত নাহি হেরি।

ধূয়ার আকারে ব্যবহৃত এই অনুযোগের সঙ্গে তিনি লিখেছেন:

হল কালের ভুল,
পুবে হাওয়ায় ধরে দিলেম
দখিন হাওয়ার ফুল।

এই ছত্রগুলির সঙ্গে প্রেমতোষ বসুকে ১ জ্যৈষ্ঠে লেখা পূর্বোদ্ধৃত পত্রাংশটি পাঠক মিলিয়ে নিতে পারেন।

পরের দিনে লেখা ‘চিরায়মানা’ [দ্র ক্ষণিকা ৭। ৩২৩-২৪]ও একইরকম কবিতায় লেখা চিঠি। ক্ষণিকা-প্রসঙ্গে প্রথম চিঠিতেই [২১ চৈত্র ১৩০৬:3 Apr 1900] ‘বন্ধুদের মধ্যে খুঁৎ খুঁৎ সহ্য করিতে না পারিয়া’ রবীন্দ্রনাথ প্রেমতোষ বসুর উপর ‘সাজাইবার ভার’ অর্পণ করেন, কিন্তু তাঁর ‘বই সাজাইবার জন্য উত্তরোত্তর···উৎসাহমত্ততা’ ‘তিনটে চারটে পাঁচটারকমের কালী’ ‘গ্রন্থের পত্রে পত্রে বর্ডার দিয়া ছাপা’ প্রভৃতি ‘প্রসাধন কার্যের নেপথ্যবিধানে অতিরিক্ত কালাতিপাত’ লেখকের অনুযোগের কারণ যে হয়েছে বিভিন্ন পত্র থেকে উক্ত বাক্যাংশগুলির উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ। এরই কবিজনোচিত প্রকাশ হল এই কবিতায়:

এসো হেসে সহজ বেশে,
আর কোরো না সাজ।
গাঁথা যদি না হয় মালা
ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা
ভূষণে নাই কাজ।
মেঘে মগন পূর্ব-গগন
বেলা নাই রে আজ—
এসো হেসে সহজ বেশে,
নাই বা হল সাজ।

২৭ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথও আরও একটি কবিতা লেখেন—'মেঘমুক্ত' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ৩২০-২২]—এটি 'চিরায়মানা'র আগে লেখা।

জগদীশচন্দ্র 8 Jun[শুক্র ২৬ জ্যৈষ্ঠ] কলকাতা থেকে লিখেছেন: 'আপনার পৌঁছতত্ত্ব পাই নাই। ভাল আছেন ত? আমার বিদেশ যাত্রার আর কিছু সংবাদ এখনও পাই নাই।' এরপর তাঁদের পারস্পরিক আলোচনার কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে রহস্য করে লিখেছেন:

আমাদের বলিতে লজ্জা হয় 'অখ্যাত অজ্ঞাত'* এক কবি এই চোরের প্রধান।···'হতেম যদি কালিদাসের সময়ের একজন কবি' এই নামের এই কবিতায় সে রমণীর পদাঘাতে প্রস্ফুটিত অশোকতলে মুখরা চিত্রলেখা নামের কাহার পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া পরমুহূর্ত্তে শঙ্কিতভাবে গ্রামে লালিতা, সরমে ভূষিতা পুত্রকন্যা-পরিবৃতা কোন মহিয়সীর পবিত্র মুখপানে চাহিয়াছিল—লোলুপ মার্জ্জারের দৃশ্যপটে যেরূপ মৎস্য ও লগুড়ের প্রতিমূর্ত্তি যুগপৎ এবং পৌনপৌনিক ভাবে প্রতিভাসিত হয়।[৩৬]

জগদীশচন্দ্রের ইঙ্গিত ও রসিকতা 'সেকাল' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ২৪৩-৫০] কবিতাটি ঘিরেই আবর্তিত, কিন্তু 'পুত্রকন্যা-পরিবৃতা কোন মহীয়সীর পবিত্র মুখ' ২৮ জ্যৈষ্ঠ [রবি 10 Jun] রবীন্দ্রনাথকে 'কল্যাণী' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ৩২৭-২৯] কবিতাটি রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল কিনা তা কে বলতে পারে। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির নাম কিন্তু 'সর্ব্বশেষ' এবং 'এখন শুধু বাকি আছে সর্ব্বশেষের গান' ছত্র-দু'টি দিয়ে শুরু হয়েছিল, অবশ্য ছত্রগুলি লিখেই কেটে দেওয়া হয়েছে।

৩১ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 13 Jun] স্নানযাত্রার দিন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন দু'টি কবিতা—'র্ভৎসনা' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ২৯৯-৩০১] ও 'সুখদুঃখ' [দ্র ঐ ৭। ৩০২-০৩]—শেষোক্ত কবিতাটিতে তারিখের সঙ্গে 'স্নানযাত্রা' কথাটিও উল্লিখিত হয়েছে, কবিতাটিও এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে রচিত।

এইদিন একটি তারিখ-হীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রেমতোষ বসুকে লিখেছেন: লক্ষ্মী সবিসর্গ নহে। ২য় ফর্মার পেজ প্রুফটাও পাঠাইবেন—কারণ, ছোট অক্ষর, নির্ভুল হইল বলিয়া মনে প্রত্যয় হয় না। আজ স্নানযাত্রা – পোষ্ট্ আপিস বন্ধ কিনা জানিনা।/ তাড়াতাড়ি আছে'[৩৭]—এই পত্র থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে ক্ষণিকা-র তৃতীয় ফর্মার প্রুফও পেয়ে গেছেন, কারণ সবিসর্গ লক্ষ্মী বলতে তিনি সম্ভবত 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' কবিতাটিকেই লক্ষ্য করেছেন, তৃতীয় ফর্মার শেষে এই কবিতাটির কিয়দংশ রয়েছে—যদিও প্রথম সংস্করণ থেকে আজ পর্যন্ত শিরোনামে 'লক্ষ্মী' শব্দটি 'সবিসর্গ' মুদ্রিত হয়ে আসছে। পরের দিন [*14 Jun বৃহ ৩২ জ্যৈষ্ঠ] রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'ক্ষণিকার চতুর্থ ফর্ম্মার প্রথম প্রুফ আজ দেখে দিলুম—বোধ হয় পঞ্চম ফর্ম্মায় সমাপ্ত হবে—কবিতার সংখ্যা গোটা ৫৫।'[৩৮] শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি অবশ্য ৩২ পেজী ৭ ফর্ম্মাও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, কবিতার সংখ্যা হয়েছিল ৬২।

৩২ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন 'খেলা' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ৩০৩-০৪]। পাণ্ডুলিপিতে নাম-হীন এই কবিতাটি শুরু হয়েছিল পরে কেটে দেওয়া এই ছত্রগুলি দিয়ে:

যে আছে ঐপারের ঘাটে
তারে চিনিস কেউ?
সকাল থেকে আপন মনে
গুণ্‌চে বসে ঢেউ।

—দ্রুত-পরিবর্তনশীল কবিমন কিভাবে ভাঙাগড়া করে তার একটি নমুনা হয়তো এখানে পাওয়া যাবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে রবীন্দ্র-রচনার সাময়িকপত্রে প্রকাশ-সূচীটি এইরকম:

প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ [৩। ৬]:

১৮৫ 'প্রত্যুপহার' দ্র উৎসর্গ-সংযোজন ১০। ৮৭

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ [২৪। ২]:

১০৯-১০ 'ক্ষণিকের গান' দ্র ক্ষণিকা ৭ | ২০৭-০৮ ['উদ্‌বোধন']

১১১-২৩ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' দ্র প্রাচীন সাহিত্য ৫। ৫৪৮-৫৫

১৭৯-৯৪ 'চিরকুমার সভা' ২য় পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪। ২৩১-৪১ [তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা'-য় এই রচনাগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন:

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ক্ষণিকের গান" হয় নিতান্তই ক্ষণিক, নয় আমরা রসগ্রহ করিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার "কাব্যের উপেক্ষিতা" পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। উর্ম্মিলাচরিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য্য লেখকের রচনায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কবির কবিতা ও ভাবুকতার পুণ্য সম্মিলনেএই রচনাটি পরম রমণীয় হইয়াছে।···"চিরকুমার সভা" এখনও সমাপ্ত হয় নাই। "সব ভাল যার শেষ ভাল,"—আমরা প্রতীক্ষা করিতেছি।[৩৯]

আষাঢ় মাসেও রবীন্দ্রনাথ ক্ষণিকা-র আটটি কবিতা লেখেন। ১ আষাঢ় [শুক্র 15 Jun] লিখলেন দু'টি কবিতা—'দুর্দিন' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ২৯৩-৯৫] ও 'অবিনয়' [দ্র ঐ ৭। ২৯৫-৯৭]। বহুকাল পরে 'তাসের দেশ' অভিনয়ের সময়ে [১৩৪০: 1933] 'অবিনয়' কবিতাটিতে সুরারোপ করা হয়। শান্তিদেব ঘোষ জানিয়েছেন: 'কলকাতার প্রথম অভিনয়ের জন্য "হে নিরুপমা" কবিতাটির প্রথম তিনটি কলিতে গুরুদেব সুর যোজনা করেছিলেন, রাজপুত্রের গান হিসেবে। চতুর্থ কলিতে সুর দিলেন পরে, দ্বিতীয় বারে বম্বেতে অভিনয়ের সময়।'[৪০] গীত-রূপে কবিতার একটি স্তবক বাদ গেছে ও স্তবকগুলির বিন্যাসে পার্থক্য ঘটেছে [দ্র গীত ২। ২৮৬-৮৭; স্বর ৫৯]।

২ আষাঢ় [শনি 16 Jun] রচিত হল 'কৃতার্থ' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ৩০৪-০৭]। পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির স্তবক-বিন্যাস: ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৫—৭ম স্তবকটি লেখার পর তারিখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ৫ম স্তবকটি লেখেন।

৩ আষাঢ় [রবি 17 Jun] তিনি 'অন্তরতম' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ৩৩০-৩১] কবিতাটি লেখেন। পাণ্ডুলিপিতেই শিরোনাম-যুক্ত কবিতাটি অনেক গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে।

৪ আষাঢ় [সোম 18 Jun] রচিত হল 'কৃষ্ণকলি' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ২৯৭-৯৯]। শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন: "১৯৩১ সালে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষ্যে 'ক্ষণিকা'র 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটিতে সুর দিলেন কীর্তন ও নানা রাগিণী মিশিয়ে—বর্তমান লেখককে দিয়েই সেই পরীক্ষা চালালেন। গানের বাঁধা ছন্দকে ভেঙে আবৃত্তির ধরনটিকে বজায় রেখে আমাকে সর্বসমক্ষে প্রথম গাইতে হল।"[৪১] লক্ষণীয়, কাব্যরূপ ও গীতরূপে [দ্র গীত ২। ৫৭৬-৭৭; স্বর ১৩] কোনো পার্থক্যই নেই।

৫ আষাঢ়ের [মঙ্গল 19 Jun] কবিতা 'কর্মফল' [দ্র ক্ষণিকা ৭। ২৫৬-৫৮] ও ৬ আষাঢ়ের 'কবি' [দ্র ঐ ৭। ২৫৮-৬০]-তে ক্ষণিকা-র প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতার ভাব-রূপটি আবার ফিরে এসেছে বলে রবীন্দ্রনাথ কালানুক্রম বিপর্যস্ত করে কবিতা-দু'টিকে গ্রন্থের আগের দিকে স্থান দিয়েছেন। এর জন্য মুদ্রণকার্যেও পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। এই কবিতাদ্বয় প্রথম সংস্করণের তৃতীয় ফর্মার অন্তর্গত, অথচ ৩২ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ

'ক্ষণিকার চতুর্থ ফর্ম্মার প্রথম প্রুফ' দেখে দেওয়ার কথা প্রিয়নাথ সেনকে জানিয়েছেন। 'কর্মফল' এই শিরোনামটি পাণ্ডুলিপিতেই আছে, সেখানে প্রথমে তৃতীয় স্তবকের পর তারিখ লিখে কবিতাটি শেষ করা হয়েছিল, পরে তারিখটি কেটে দিয়ে চতুর্থ স্তবক লিখে আবার তারিখ বসানো হয়; পঞ্চম স্তবকটি লিখিত হয় 'কবি' লেখার পর অর্থাৎ ৬ আষাঢ় বা তার পরে। 'কবি'-র প্রথম নাম ছিল 'পরিচয়', সেটি কেটে দিয়ে পাণ্ডুলিপিতেই নাম দেওয়া হয় 'কবি'।

৬ আষাঢ় [বুধ 20 Jun] রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'ক্ষণিকা সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়ে পড়চি। ৪ ফর্ম্মা গেলি প্রুফ হয়েছে—অদ্য কেবল দ্বিতীয় ফর্ম্মার অর্ডর প্রুফ পাওয়া গেল।'[৪২] লেখকও যে এই বিলম্বের দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না তা তো আমরা এখনই দেখলাম! ৮ আষাঢ় তিনি লিখেছেন: 'আজ ক্ষণিকার ৩য় ফর্ম্মার প্রুফ দেখে দিলুম।'[৪৩]

এর দু'দিন পরে ১০ আষাঢ় [রবি 24 Jun] রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ক্ষণিকা-র শেষ কবিতা 'আবির্ভাব' [দ্র ৭। ৩২৫-২৭]—এই আবিভাব, অবশ্যই কোনো মানসী বা বাস্তব নায়িকার নয়, ক্ষণিকা-র মুদ্রিত প্রথম ফর্মাটির। ক্ষণিকা-র মলাটটি হলুদ ও নীল বর্ণে ছাপা হয়—বিদ্যুদ্দীপ্ত ঘনমেঘের হলুদ বর্ণে ছাপা ছবির উপর নীল রঙে লেখা 'ক্ষণিকা' দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

দূরে এক দিন দেখেছিনু তব
  কনকাঞ্চল-আবরণ,
  এ নবচম্পক-আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে
  করিছ চরণ বিচরণ।

—পাঠ্যগ্রন্থে অনুপ্রাসের উদাহরণ হিসেবে শেষ দু'টি ছত্রের ব্যাপক ব্যবহার ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রেমের কবিতা রূপে 'আবির্ভাব' ['বিলম্বিত' বা 'চিরায়মানা' ও] বহু পাঠক ও আবৃত্তিকারের প্রিয়—এঁরা নিশ্চয়ই কবিতাটির এই ব্যাখ্যায় পীড়া বোধ করবেন!

প্রিয়নাথকে লেখা চিঠি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ১৫ আষাঢ় [শুক্র 29 Jun] কলকাতায় আসেন। ১৭ আষাঢ় দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুকেশী দেবীর বিবাহ হয়। এই বিবাহ উপলক্ষে এসে। রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন কলকাতায় থেকে যান এবং যথারীতি তাঁর ১৯ আষাঢ় 'বিডিন স্ট্রীট ও নোনপুকুর' ও ২১ আষাঢ় 'বিডিন স্ট্রীট, তালতলা ঝামাপুকুর' যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। ২১ আষাঢ় [বৃহ 5 Jul] তিনি প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন: 'ক্ষণিকার প্রুফ আসবার কথা ছিল বলে তোমার ওখানে যেতে পারিনি—প্রুফও আসেনি।'[৪৪]

এর দু'দিন পরে অর্থাৎ ২৩ আষাঢ় [শনি 7 Jul] কালিগ্রাম পরগণার পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য তিনি পতিসর রওনা হন। ২৮ আষাঢ়ের [বৃহ12 Jul] মধ্যেই তিনি যে ফিরে এসেছেন, এই দিনের 'ডাকের পত্র'-এর হিসাব থেকে তা বোঝা যায়। এই সময়ে ক্ষণিকা-র মুদ্রণকার্যও প্রায় সমাপ্ত, একটি তারিখ-হীন [৩০ আষাঢ় শনি 14 Jul] চিঠিতে তিনি প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'তোমার স্বপ্নলোক এবং কর্ম্মচক্র থেকে শীঘ্র নেমে এস। কাল ত রবিবার আছে কাল্ কখন্ আসবে লিখে পাঠিয়ো।···কাল সকালে নিশ্চয়ই একখণ্ড ক্ষণিকা

পাবে। আষাঢ়স্য শেষ দিবসে।'[৪৫] এই পত্র থেকে মনে হয়, ৩১ আষাঢ় [রবি15 Jul]-এর মধ্যেই ক্ষণিকা-র মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হয়েছিল—যদিও বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ 26 Jul [বৃহ ১১ শ্রাবণ]।

ক্ষণিকা-র আখ্যাপত্রটি সংক্ষিপ্ত: *ক্ষণিকা/শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।* চতুর্থ মলাটের নিম্নাংশে: *ভারত যন্ত্র, ১১৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।* এছাড়া মূল্য, মুদ্রাকরের ও প্রকাশকের নাম, প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি কোনো কিছুর উল্লেখ গ্রন্থে নেই।

গ্রন্থটি উৎসর্গীকৃত হয় লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি দু'টি খণ্ডের পর এইটি তৃতীয় গ্রন্থ যা তাঁকে উৎসর্গ করা হল:

উৎসর্গ:/শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত সুহৃত্তমের প্রতি—/.../শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'ক্ষণিকারে দেখেছিলে/ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,/সাজিয়ে তারে এনে দিলেম/ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়!' ইত্যাদি ষোলো ছত্রের একটি কবিতা এই উৎসর্গপত্রের অঙ্গীভূত।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+৪+২২৫। মুদ্রণসংখ্যা: ৬০০।

মুদ্রণব্যয়ের হিসাবটি পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহির ১১ কার্তিকের [শনি 27 Oct] হিসাবে: 'ব°বাবু প্রেমতোষ বসু দং ক্ষণিকা ৬০০ খানা পুস্তক ছাপান প্রভৃতি ব্যয় ১৩২্'।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রনাথ বসুকে ক্ষণিকা উপহার দেওয়ার কথা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতেই পাওয়া যায়। আমরা আগেই বলেছি, ৩০ শ্রাবণ [মঙ্গল 14 Aug] কণিকা, কথা, কল্পনা ও ক্ষণিকা-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লেখেন [দ্র বি. ভা. প., বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২। ৪৩০-৩১]।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'প্রভাত' প্রকাশিত হয় ১৩০৭ বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকে। রবীন্দ্রনাথ বন্ধুত্বের খাতিরে এই পত্রিকায় বেশ কিছু লেখা দিয়েছেন, কিন্তু পত্রিকাটির ফাইল না পাওয়ায় তাঁর অনেক রচনা এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। ৮ আষাঢ় [শুক্র 22 Jun] তিনি প্রিয়নাথকে লিখেছেন:

'প্রভাতটা ঠিকমত চল্‌চে না। ওর মধ্যে না আছে ঝাঁজ, না আছে রস, না আছে উজ্জ্বলতা না আছে নূতনত্ব। আমি ত প্রায়ই একটা করে লিখ্‌চি। কেবল গেলবারে লিখিনি।···নগেন্দ্রবাবু গল্প চান কিন্তু আমি প্রভাতের নানাজাতীয় পাঠকের কাছে শুন্‌লুম যে খবরের কাগজের স্তম্ভে যে গল্প বেরয় গল্পানুরাগ সত্ত্বেও তা তাঁরা পড়েন না;—খবরের সঙ্গে Politics-এর সঙ্গে গল্প অস[ঙ্গত] লাগে। এ অবস্থায় লেখককে খবরসাগরে তাঁর সাধে[র] রচনাগুলিকে বিসর্জন দিতে বলা, গঙ্গাসাগরে ছেলে দিতে মা'কে অনুরোধ করার মতো। গল্পগুলো ভারতী সম্পাদক সম্পূর্ণ আদায় করে নিয়ে বসে আছেন।'[৪৬]

শ্রাবণ মাসে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত দু'টি তারিখহীন চিঠিতে তিনি প্রভাতের জন্য 'তৈলাক্ত শীর্ষে তৈলসেক' [দ্র চিঠিপত্র ৮। ১০৩, পত্র ১১৪] ও 'চুম্বকশৈল' [দ্র ঐ ৮। ১০৯, পত্র ১১৬] নামে দু'টি প্রবন্ধ লিখে পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। 'প্রতিবেশিনী' গল্প গল্প-গুচ্ছ প্রথম খণ্ডে [১ আশ্বিন ১৩০৭: Sep 1900] এবং 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' ও 'উলুখড়ের বিপদ' উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে [4 Mar 1901:২১ ফাল্গুন ১৩০৭] মুদ্রিত হয়, অথচ কোনো পরিচিত সাময়িকপত্রে গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় না—এইজন্য রবীন্দ্রজীবনী-কার গল্পগুলি প্রভাত-এ মুদ্রিত হয়েছিলে বলে অনুমান করেছেন।[৪৭] সম্ভবত এই গল্প

তিনটি এবং ভারতী ও প্রদীপ-এ মুদ্রিত কয়েকটি গল্প জগদীশচন্দ্রের গল্পক্ষুধা মেটানোর জন্য দ্রুত রচিত— সেইজন্য গল্পগুলি কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও অনলঙ্কৃত। আরও কিছু রচনা রবীন্দ্রনাথ প্রভাত-এর জন্য লিখেছিলেন কিনা উক্ত পত্রিকার ফাইল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়।

আষাঢ় মাসে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়:

প্রদীপ, আষাঢ় ১৩০৭ [৩। ৭]:

২৩২-৩৪ 'সদর ও অন্দর' দ্র গল্পগুচ্ছ ২২। ১৭৫-৭৮

ভারতী, আষাঢ় ১৩০৭ [২৪। ৩]:

২৮৪-৯৭ 'চিরকুমার সভা' তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪। ২৪২-৪৯ [চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

২৯৭-৩০০ 'নববর্ষা' দ্র ক্ষণিকা ৭। ২৯১-৯৩

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য চিরকুমার সভা-র কিছু সংস্কার করেন। এই কারণে তৃতীয় পরিচ্ছেদের কিয়দংশের বর্ণনাকে [পৃ ২৮৭-৮৯] শ্রীশ ও বিপিনের সংলাপে পরিবর্তিত করে প্রজাপতির নির্বন্ধ উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ গঠিত হয়।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহটি রবীন্দ্রনাথ কলকাতাতেই কাটান। ২ ও ৩ শ্রাবণ তাঁর বিডন স্ট্রীটে যাওয়ার হিসাব পাওয়া যায়। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা কয়েকটি চিঠি থেকে জানা যায়, উভয়ের মধ্যে এই সময়ে কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে এবং সদ্যোপ্রকাশিত গ্রন্থ ক্ষণিকা, কুষ্টিয়ার ব্যবসা প্রভৃতি প্রসঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াও আলোচনার একটি নূতন বিষয় হয়েছে মাধুরীলতার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান। প্রিয়নাথ এই সময়ে ঘটকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

ঠাকুরবাড়িতে গত কয়েক বছর ধরে অনেকগুলি বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, এর মধ্যে পরিবারের কর্তাদের কিছু সূক্ষ্ম হিসাববুদ্ধি কাজ করেছে। ইন্দিরা দেবীর বিবাহ হয় ১৭ ফাল্গুন ১৩০৫ [28 Feb 1899]—বাঙালি মেয়ের স্বাভাবিক বিয়ের বয়স তিনি অনেক আগেই অতিক্রম করেছিলেন, সুতরাং অতি-বিলম্বিত বিবাহানুষ্ঠানটি আকাঙিক্ষতই ছিল। কিন্তু লক্ষণীয়, বহুব্যয়সাপেক্ষ বিবাহের খরচটি এসেছে সরকারী ক্যাশ থেকে—তাঁর বাসাবাড়ির ভাড়াও দেওয়া হয়েছে মহর্ষির তহবিল থেকে দীর্ঘকাল। অপ্রাপ্তবয়স্ক দিনেন্দ্রনাথের প্রায় রাজকীয় বিবাহ সরকারী খরচেই অনুষ্ঠিত হয়। মহর্ষির জীবৎকালে তাঁর পরিবারে এইটিই রীতি ছিল। সুতরাং তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা ও ২৩ ভাদ্র ১৩০৬ [8 Sep 1899] তারিখে তাঁর শেষ উইলে সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পরিবারভুক্ত কেউ কেউ যদি কন্যাদায় থেকে অসময়েই উদ্ধার পেতে চান তাহলে তাঁদের বৈষয়িক বিচক্ষণতার প্রশংসা করতেই হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চৌদ্দ বছরেরও কমবয়সী মাধুরীলতার বিবাহের জন্য রবীন্দ্রনাথের ব্যস্ত হওয়াতে আশ্চর্যবোধ না করে পারা যায় না। 'হিন্দু বিবাহ' 'অকাল বিবাহ' প্রভৃতি প্রবন্ধে ও চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বিতর্কে তিনি বাল্যবিবাহরোধে আইন-প্রণয়নের যৌক্তিকতা স্বীকার না করলেও তাঁর স্পষ্ট সমর্থন ছিল যৌবনবিবাহের প্রতি। সেক্ষেত্রে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, এমন-কি সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁদের অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যাদের বিবাহ দিতে ব্যস্ত হলেও তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অবস্থানের পার্থক্য ছিল।

কেবল কবি নয়, বাঙালি সমাজে তাঁর ভূমিকা ছিল চিন্তানায়কের। তাই ব্যক্তিস্বার্থে তাঁর সামাজিক ভূমিকা বিস্মরণের ইতিবৃত্তটি কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর।

৭ শ্রাবণ [রবি 22 Jul] রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শিলাইদহে যান। এর আগের দিন ৬ শ্রাবণ [শনি 21 Jul] ভারত সংগীত-সমাজের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' অভিনীত হয়েছিল, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। পরের দিন সকালে তিনি প্রিয়নাথকে লিখছেন: "সেই শাণ্ডিল্য গোত্রটিকে ছাড়লে চল্‌চে না। কারণ সত্যর মেয়ে শান্তার জন্যে একটি পাত্রের দরকার।···সত্য বোধ হয় কাল সকালে তোমার ওখানে যাবে।'[৪৮] ঠাকুর-পরিবার শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ছিলেন, সুতরাং পাত্র অন্য গোত্রীয় হওয়া আবশ্যিক ছিল।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রিয়নাথের প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁর প্রথম দুই পুত্র অবিনাশ ও ঋষিবরের [হৃষীকেশ] সঙ্গে প্রিয়নাথ ও রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। সেই সূত্রে প্রিয়নাথ বিহারীলালের তৃতীয় পুত্র শরৎকুমারের [1870-1942] সঙ্গে মাধুরীলতার বিবাহ-প্রস্তাব আনয়ন করেন। শরৎকুমারের ছাত্রজীবন অত্যন্ত গৌরবময়। 1894-এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজি ও দর্শন বিষয়ে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন—*The Indian Mirror* পত্রিকার 12 Jun 1894-সংখ্যা থেকে জানা যায়, তিনি এই পরীক্ষায় ঈশান স্কলারশিপ, হেমন্তকুমার মেডাল ও কেশবচন্দ্র সেন মেডাল লাভ করেন। 1895-এ তিনি এম. এ. পরীক্ষায় 'মেন্টাল অ্যাণ্ড মর‍্যাল সায়েন্স'-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। 1896-এ বি. এল. ডিগ্রি লাভ করে তিনি পরের বৎসর মজঃফরপুরে যান ওকালতি করতে। সেখানে মোটামুটি পসারও জমে। সুতরাং বিয়ের বাজারে পাত্র হিসেবে শরৎকুমার যথেষ্ট মূল্যবান ছিলেন। তাঁর মা কবি বিহারীলালের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিনাশ যে দর-কষাকষিতে যথেষ্ট পটু ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ-প্রিয়নাথ পত্রাবলীতে তার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। পিরালী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্ম হওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের দিক দিয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ছিল। কিন্তু শরৎকুমারেরা যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন তাও খুব উচ্চস্তরের ছিল না। ফলে এই বিবাহের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো-কোনো কুটুম্ব-স্বজনের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, ইন্দিরা দেবীর রচনায় এমন সংবাদ রয়েছে।[৪৯]

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে এই বিবাহ বিষয়ে তাগিদ দিতে আরম্ভ করেছেন। ১৫ শ্রাবণ [30 Jul] নাগাদ একটি তারিখ-হীন পত্রে তিনি প্রিয়নাথকে লিখছেন: 'এইবার কথাটাকে তার শুভ পরিণামের দিকে সত্বর অগ্রসর করিয়ে দাও।...শরৎ কবে কলকাতায় আস্‌বেন জান কি?'[৫০] ১৮ শ্রাবণ [বৃহ 2 Aug] তিনি লিখেছেন: 'মার কাছ হইতে তাঁহার ছেলেটিকে দরবার করিয়া লইবার উপযুক্ত উকীল কে? সে কাজ ছেলে নিজে করিতে পারিতেন—তদভাবে অবিনাশ ছাড়া ত লোক দেখি না।'[৫১] প্রিয়নাথ অন্য আর একটি পাত্রেরও সন্ধান দিয়েছিলেন,[৫২] কিন্তু শেষ পর্যন্ত শরৎকুমারকে ঘিরেই কথাবার্তা আবর্তিত হয়েছে।

কন্যার জন্য পাত্রসন্ধান ছাড়া অন্যান্য কাজও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কলকাতার 'ঔপায়িক' বন্ধু প্রিয়নাথের উপর অর্পণ করেছেন। একটি পত্রে তিনি লিখছেন: 'আমার বাড়ি তৈরি বাবদ্ লোকেনের কাছে আমি ৫০০০্ টাকা ঋণী ঐ সম্বন্ধে খুচ্‌রো ঋণ আরো কিছু আছে। আমার গ্রন্থাবলী এবং ক্ষণিকা পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্যের Copyright কোন ব্যক্তিকে ৬০০০্ টাকায় কেনাতে পার?'[৫৩] তাঁর আরও কয়েকটি পত্রে এই কপিরাইট বিক্রয়ের প্রসঙ্গ

আছে, প্রিয়নাথও এ-বিষয়ে তাঁকে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার খবর জানিয়েছেন—কিন্তু বর্তমান সময়ে কপিরাইট বিক্রয়ের প্রয়োজন হয় নি।

ক্ষণিকা প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছ প্রকাশে ব্রতী হন। ১৫ শ্রাবণের [সোম 30 Jul] হিসাবেই 'গল্প বইয়ের কাগজ' বাবদ ৬৮ টাকা ১০ আনা খরচ দেখা যায়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, প্রিয়নাথকে লেখা তারিখ-হীন ১১৪-সংখ্যক চিঠি [দ্র চিঠিপত্র ৮। ১০৪] থেকে তা জানা যায়। এই প্রস্তাব অবশ্য কার্যকরী হয় নি। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসেই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়, অমূল্যনারায়ণ রায় কর্তৃক 'মজুমদার এজেন্সী' বা 'মজুমদার লাইব্রেরী' থেকে গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়—শ্রীশচন্দ্রের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদার প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম স্বত্বাধিকারী ছিলেন, অবশ্য তখনও তিনি কালিগ্রাম পরগণার সাব-ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। কিন্তু মুদ্রণব্যয় রবীন্দ্রনাথই বহন করেন।

এই ব্যাপারেও তিনি প্রিয়নাথের সহায়তা নিয়েছেন। সম্ভবত ২৩ শ্রাবণ [মঙ্গল 7 Aug] তিনি লিখেছেন:

তুমি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র Chander Brothersদের [Chunder & Brothers: 98, Radha Bazar] একটা অনুরোধ করবে? ইংরাজি ২৪ পাউণ্ড ডিমাই সাইজ কাগজ ১০ রীম, সমাজ প্রেসে আমার অ্যাকাউন্টে তাঁরা পাঠিয়ে দেবেন? এবং যে রকম কাগজে ক্ষণিকা ছাপা হয়েছে, সেই রকম ৩৫ পাউণ্ড ডিমাই সাইজ কাগজ ২ রীম তৎসহ ঐ ঠিকানাতেই পাঠাতে পারবেন?...আমার গল্পাবলী ছাপতে সবসুদ্ধ বোধহয় ৭০/৭৫ রীম ২৪ পাউণ্ড ও আট রীম ৩৫ পাউণ্ড দরকার হবে।···এটা একটু জরুরী—ছাপা বন্ধ হয়ে আছে। তুমি সত্বর এর বন্দোবস্ত করে দিয়ো।[৫৪]

যদিও ইতিপূর্বে খণ্ড আকারে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলি তখনও নিঃশেষিত হয় নি, তবু গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গল্পগুলিকে স্থান করে দেওয়ার আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছ প্রকাশের আয়োজন করেন। ২৪ শ্রাবণ [বুধ 8 Aug] তিনি প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'কাগজের নৌকা বোঝাই করে আমার গল্পগুলিকে কালসাগরে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছি—অতএব ২৪ পাউণ্ড্ ডিমাই কাগজের বন্দোবস্ত করে দিয়ো।'[৫৫]—আখ্যাপত্রে মুদ্রিত তারিখ অনুযায়ী গল্পগুচ্ছ-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১ আশ্বিন [সোম 17 Sep]।

বৃহস্পতিবার ২৫ শ্রাবণ [9 Aug] প্রিয়নাথের পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব-সহযোগে শিলাইদহে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আধিব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে তাঁর যাওয়া হয় নি। পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ সেদিন ভোরে বোটে করে কুষ্টিয়া যান সেখানকার হাইস্কুল সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আলোচনা করতে। ২৬ শ্রাবণ তিনি প্রিয়নাথকে লিখেছেন:

কাল কুষ্টিয়ায় যাতায়াতে সমস্ত দিন বোটে কেটেছে—সেটা মহা লাভ। প্রাতে বেরিয়েছি যখন, তখনো পথের তৃণে প্রভাতের শিশির লেগে আছে—শিলাইদহের ঘাটে যখন ফিরলেম তখন চতুর্দ্দশীর চাঁদ মধ্যগগনে। আমার সেই জ্যোৎস্নাজড়িত নদীটি স্মিত বিষণ্ন হাস্যে বল্লেন, আমাদের সেই কলহংসমুখর নির্জ্জন বালুতটে বহু শরতের মৌন মিলনসুখ একেবারে বিস্মৃত হয়ে তুমি এখন ডাঙার মথুরায় রাজত্ব করতে গেছ! আমি তার একটি অক্ষর জবাব দিতে পারলুম না—একেবারে নির্ব্বোধের মত নিঃশব্দে চৌকিটিতে বসে রইলুম।[৫৬]

—পাঠক স্মরণ করতে পারেন, উদ্ধৃতিটির প্রথমাংশের মতো অজস্র বর্ণনা ছিন্নপত্রাবলী-তে সংকলিত ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে ছড়িয়ে আছে; কিন্তু পদ্মা-প্রকৃতির সঙ্গে তখন রবীন্দ্রনাথের উত্তর প্রত্যুত্তরের যে সম্পর্ক ছিল, সেই অবস্থা থেকে এখন তিনি অনেকটা দূরে সরে এসেছেন!

সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীকে [1872-1949] রবীন্দ্রনাথ কণিকা কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু উভয়ের ঘনিষ্ঠতার ইতিবৃত্তটি তথ্যাভাবে ধূসর। প্রিয়নাথকে ২৮ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

সন্তোষের প্রমথবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? তাঁর হল কি বল দেখি? হঠাৎ যেন দূরে চলে গেছেন—সে জন্যে আমি আন্তরিক ক্ষুণ্ণ। তাঁর প্রতি আমার বিশেষ একটি স্নেহ জন্মেছে—আমার আত্মীয়চক্র থেকে তাঁর তিরোধান আমি কোনমতেই ইচ্ছা করি নে। যদি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাঁকে একবার নাড়া দিয়ে দিয়ো।[৫৭]

—প্রিয়নাথকে লেখা পত্রেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পত্রালাপের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 3 Dec 1940 [১৭ অগ্র° ১৩৪৭] তারিখে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের প্রতিলিপি ছাড়া উভয়ের সম্পর্কের দিগ্‌দর্শন করার মতো কোনো উপকরণ আমরা পাই নি। পাঠকেরা কি কিছু উপাদান সরবরাহ করতে পারেন?

চিরকুমার সভা-র কিস্তি লেখা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ২০ শ্রাবণ [শনি 4 Aug] লিখলেন একটি কবিতা 'দীন দান' [দ্র ভারতী, আশ্বিন। ৫৭৩-৭৫; কাহিনী ৭। ১০৯-১১]—কবিতার কাহিনীটি সম্ভবত তাঁর স্বরচিত। এই কবিতাটি মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ [১৩১০]-এর 'কাহিনী' অংশে প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। রচনার তারিখটি ভারতী-তে মুদ্রিত হয়েছিল।

শ্রাবণ-সংখ্যা ভারতী-তে [২৪। ৪] রবীন্দ্রনাথের দু'টি রচনা মুদ্রিত হয়:

৩০৪-০৮ 'উদ্ধার' দ্র গল্পগুচ্ছ ২২। ১৭৮-৮১

৩৫৬-৬৭ 'চিরকুমার সভা' চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪। ২৫০-৫৮ [পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

কবি নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র নির্মলচন্দ্র এই সময়ে ব্যারিস্টার হবার জন্য বিলাত যাত্রার মুখে। নবীনচন্দ্রের রানাঘাটের বাসায় গভীর সৌহার্দ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি দিন [? ১৮ ভাদ্র ১৩০১] অতিবাহিত করেছিলেন, তখন নির্মলচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর একটি প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। নবীনচন্দ্র পুত্রের জন্য কয়েকটি পরিচয়-পত্র চাইলে রবীন্দ্রনাথ ২৬ শ্রাবণ [শুক্র 10 Aug] তাঁকে লেখেন: 'আমার দলের লোক বিলাতে এখন আর কই? পরিচিতবর্গের মধ্যে একমাত্র অমি [আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা অমিয়নাথ] আছে, সে সিভিল সার্ভিস পড়িতেছে—এই আগষ্ট মাসে পরীক্ষা দিবে। সে ত আপনারও পরিচিত। তবু তাহাকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিলাম।…আর, জগদীশ বসু অল্পকালের জন্য গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীকেও একখানি পত্র দিলাম। কোন ভাল ইংরাজ পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেই আমার মতে সব চেয়ে ভাল হয়।'[৫৮] ডাঃ স্কটের বাড়ির প্রীতিস্নিগ্ধ পরিবেশের কথা নিশ্চয়ই তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল।

লোকেন্দ্রনাথ পালিত তখন যশোহর-খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি বারেবারেই রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন সেখানে যাওয়ার জন্য। ২৮ শ্রাবণ [রবি 12 Aug] তিনি প্রিয়নাথকে লিখছেন: 'আমি এই পুণ্যতোয়া পদ্মার দিকে মুখ করে ডাকযোগে তোমার গা ছুঁয়ে শপথ করে বল্‌তে পারি যে তুমি যদি এস তাহলে আমি খুলনায় যাই নে—কিন্তু এই হপ্তার মধ্যে তুমি যদি না এস তা হলে যদি আমি না যাই ত আমার নাম নেই'[৫৯] —প্রিয়নাথ আসেন নি, কাজেই ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথই খুলনায় গেছেন। সেই সম্ভাবনার কথা তিনি নবীনচন্দ্রকেও লিখেছিলেন: 'সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঘটনাক্রমে আমি কলিকাতায় যাইতেও পারি কিন্তু এখন হইতে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।'

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তার আগেই কলকাতায় যান ৯ ভাদ্র [শনি 25 Aug] রাত্রে। ১০ ও ১১ ভাদ্র তিনি 'প্রিয়বাবুর বাটী' যাতায়াত করেন। ১০ ভাদ্র [রবি 26 Aug] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় বিশেষ

অধিবেশন উপলক্ষে য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে সত্যেন্দ্রনাথ 'বৌদ্ধধর্ম,—দর্শন, নীতি, পরকাল ও মুক্তি'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সভায় সুরেন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আত্মীয় ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বন্ধুগোষ্ঠীর অন্তর্গত হেমেন্দ্রমোহন বসু, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র বসুমল্লিক, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতিরাও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথের নাম উপস্থিতির তালিকায় নেই। ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু তিনি রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুরাগী ছিলেন—কয়েকদিন পরে স্ব-সম্পাদিত সাপ্তাহিক *Sophia* পত্রিকার 1 sep [শনি ১৬ ভাদ্র]-সংখ্যায় প্রকাশিত 'The World-Poet of Bengal'-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করেই রচনা করেন। প্রসঙ্গটি আমরা পরে আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথ কবে খুলনায় গিয়েছিলেন তার তারিখ নির্ধারণ করা শক্ত। তাঁর ক্যাশবহিতে ১৫ ভাদ্র [শুক্র 31 Aug] হিসাব দেখা যায়: 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের খুলনায় যাতাতের ব্যয় ১৬্'—এর আগে 'ডাকে পত্র' হিসাবে তাঁর ১০ ভাদ্র তিনটি, ১৩ ভাদ্র একটি এবং পরে ১৬ ভাদ্র দু'টি ও ১৮ ভাদ্র তিনটি পত্র লেখার খবর পাওয়া যায়—সুতরাং অনুমান করতে পারি, ১৩ ভাদ্র খুলনায় গিয়ে ১৫ বা ১৬ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। কয়েকদিন পরে ২০ ভাদ্র [বুধ 5 Sep] তিনি রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখেছেন: 'সম্প্রতি লোকেন্দ্র পালিতের নিমন্ত্রণে খুলনায় গিয়াছিলাম সেইজন্য মহারাজের প্রীতিপরিপূর্ণ পত্র বিলম্বে পাইয়াছি।' এখানে যে-পত্রটির উল্লেখ আছে সেটি রাধাকিশোর লেখেন ১৩ ভাদ্র [বুধ 29 Aug] তারিখে। তিনি লিখেছেন:

> ···শ্রীমতী বধূর শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যতীর শাশুড়ী ও পরিবারকে [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী 'লাহোরিনী' শরৎকুমারী চৌধুরানী ও তাঁর কন্যা উমারানী] বেশ উৎসাহী দেখিলাম। ভরসা করি ইহাদের দ্বারা উত্তম ফল লাভ হইবে। এমন ভদ্রপ্রকৃতি এবং বুদ্ধিমতী মহিলাদের উপর বধূর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া অবশ্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।···যতীর নিকট আপনার একখানা পত্র দেখিয়াছি। শ্রীমানের উন্নতিকল্পে আপনি যেরূপ বিশদভাবে শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে আপনার ঐকান্তিকতা প্রতিফলিত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বন্ধুরূপে যিনি এমন সহৃদয়তা দেখাইতে পারেন তাঁহার মত বন্ধু দুর্ল্লভ। আপনার, ন্যায় বন্ধুর অবিশ্রান্ত সহায়তার সহিত যতী ও তাঁহার পরিবারকে এসময়ে এইভাবে পাওয়া বাস্তবিক চিরস্মরণীয়। আপনার উপদেশগুলি যাহাতে যথাযথ প্রতিপালিত হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীমান যতীবাবুকে সাহায্য করিব।[৬০]

রাজকুমার ও রাজবধূর জন্য বিশেষ ধরনের কোন্ শিক্ষাপ্রণালী রবীন্দ্রনাথ সুপারিশ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ বসুকে লেখা তাঁর পত্রটি পেলে তা জানা যেত, কিন্তু রাধাকিশোরের মুগ্ধতা থেকেই তার যাথাযথ্য অনুভব করা যায়। প্রত্যুত্তরে ২০ ভাদ্র [বুধ 5 Sep] রবীন্দ্রনাথ লেখেন:

> আমাকে যে অল্পকালের পরিচয়ে রাজপরিবারের একান্ত আত্মীয়ভাবে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন তাহা মহারাজের নিজ সহৃদয়তার গুণেই। মহারাজের মঙ্গল এবং ত্রিপুরার উন্নতি আমার যে কিরূপ অভিলষিত তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিলে পাছে অত্যুক্তি মনে করেন এইজন্য তাহা নীরবে হৃদয়ে পোষণ করি কেবল মাঝে মাঝে মহিম ঠাকুরকে পাইলে আলোচনা করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকি।

এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রাধাকিশোরের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ করেন:

> অনতিকালপূর্ব্বে যতীর শাশুড়ীর অবস্থা ভাল ছিল, ইহারা সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশীয়, অবস্থান্তর হওয়ার পরেও চাকরী লওয়া সম্বন্ধে অনেক বড় ঘরের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন—কেবল আমার মুখে মহারাজের পরিচয়ে আশ্বস্ত হইয়া সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য মহিমঠাকুরের সহিত পরামর্শক্রমে ২০০ টাকা স্থির করি। এই রাজপ্রসাদটি যদি মহারাজ যতীর নামে করিয়া দেন এবং মহিলাদিগের নাম সংযোগ হইতে মুক্তি দেন তবে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ রক্ষা পায় এবং তাঁহাদের নিকট আমি কড়ার হইতে মুক্তি পাই।[৬১]

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁর পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার প্রতি এই আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু পত্রটি সম্ভবত 'শিলাইদহ' থেকে লেখা নয়, ২১ ভাদ্র [বৃহ 6 Sep] রবীন্দ্রনাথের 'হিরেন্দ্রনাথ দত্তর বাটী' যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় [1861-1907] এক আশ্চর্য গতিশীল চরিত্র। হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, পরে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে হন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণের পর বাংলার বিপ্লববাদের অন্যতম প্রবক্তা রূপে তাঁর জীবনাবসান—সংক্ষেপে এই হল ব্রহ্মবান্ধবের জীবনচিত্র। ভারতের বিভিন্ন স্থানে কর্মব্যস্ত জীবনযাপনের পর আমাদের আলোচ্য পর্বে তিনি কলকাতার অধিবাসী—ক্যাথলিক-প্রধানদের বিরাগভাজন হয়ে একদা-ছাত্র কার্তিকচন্দ্র নানের আর্থিক সহায়তায় সাপ্তাহিক *Sophia*পত্রিকার সম্পাদনা করছেন। এই পত্রিকারই 1 sep 1900-সংখ্যায় সম্পাদকীয় হিসেবে তিনি লিখলেন 'The World-Poet of Bengal' প্রবন্ধ—যার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। ব্রাহ্ম-কুলপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের র‍্যাফেল বা মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর চিত্রাঙ্কনের উপযোগী রূপের বর্ণনা দিয়ে তিনি প্রবন্ধটি আরম্ভ করেছেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষকাল থেকে তাঁর বিকাশের বিচিত্র পর্যায় কত সচেতনভাবে ব্রহ্মবান্ধব অনুসরণ করেছেন তার পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন: 'Rabindra is not only a poet of nature and love but he is a witness to the unseen.' তরুণ বয়সে প্রভাতসংগীত-এর 'স্রোত' কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি লেখেন: 'If ever the Bengali language is studied by foreigners it will be for the sake of Rabindra. He is a world-poet.'* রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ লাভ [1913] পর্যন্ত ব্রহ্মবান্ধব বেঁচে ছিলেন না, তাই তিনি দেখে যেতে পারেন নি তাঁর দেওয়া অভিধা কিভাবে বিশ্ববাসী দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল।

ব্রহ্মবান্ধব July 1901-সংখ্যা *Twentieth Century* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব-প্রসঙ্গে কয়েকবার এই প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন। চার অধ্যায় [1934] উপন্যাসের বিতর্কিত উপক্রমণিকা 'আভাস'-এ তিনি লেখেন:

> একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিক পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি। সেই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

শেষ বাক্যটি মেনে নিতে আমাদের একটু দ্বিধা আছে। বৈশাখ ১৩০৮-এ রবীন্দ্রনাথ যখন নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সেই সংখ্যাতেই ব্রহ্মবান্ধবের 'হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা' [পৃ ৮-১৩] প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়, যার সূচনাতেই নৈবেদ্য-এর 'হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর' [দ্র নৈবেদ্য ৮। ৪৭-৪৮, ৫৭-সংখ্যক] কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে—যেটি তখনও পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়-সূত্রে ব্রহ্মবান্ধব কবিতাটি সংগ্রহ করেছিলেন। বস্তুত, *Sophia*-র প্রবন্ধে তিনি যেভাবে রবীন্দ্রনাথের রূপ-বর্ণনা করেছেন, তাতে তিনি যে পূর্বেই রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন সেটি স্পষ্ট বোঝা যায়। সুতরাং *Sophia*-র প্রবন্ধও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দেখা সম্ভব—হয় ব্রহ্মবান্ধবই তাঁকে সেটি পাঠিয়ে দেন অথবা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতো কোনো সাংবাদিক বন্ধু প্রবন্ধটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উল্লেখ্য,

ব্রহ্মবান্ধব ও নগেন্দ্রনাথের যুগ্ম-সম্পাদনায় *Twentieth Century* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। *Sophia*-য় মুদ্রিত প্রবন্ধের কর্তিকা রবীন্দ্রনাথ আশ্বিন [Oct] মাসের মধ্যেই বিলাতে জগদীশচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেন, এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগের প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল, তাঁর সাহায্য ছাড়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত বলে মনে হয় না।

এই বৎসর [1900] প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়, তার অঙ্গ হিসেবে যে-সব সম্মেলনের আয়োজন করা হয় তার অন্যতম ছিল পদার্থবিজ্ঞানীদের সম্মেলন [International Congress of Physicists]। জগদীশচন্দ্রকে এই সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান জানানো হলেও তাঁকে ছুটি দেবার ব্যাপারে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষাবিভাগের ইংরেজ কর্মকর্তারা নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করেন। এ-বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের উদ্বেগ রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠিতে [2 Mar, 6 Mar, 16 Mar, 21 Jun 1900] ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার লেফটেনান্ট গবর্নর স্যার জন উডবার্নের আনুকূল্যে শেষ পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর হলে জগদীশচন্দ্র 29 Jun [শুক্র ১৫ আষাঢ়] রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'সেক্রেটরী [অব্] ষ্টেটের মঞ্জুর টেলিগ্রাম পাইয়াছি। আমাকে সত্বরই রওনা হইতে হইবে, হয়ত এই বৃহস্পতিবার কিম্বা তার পরের বৃহস্পতিবার।'[৬২] সমুদ্রপীড়ার কৌতুকময় বর্ণনা দিয়ে তিনি এডেন থেকে পত্র লেখেন 19 Jul [বৃহ ৪ শ্রাবণ]। এই চিঠিতেই তিনি জামসেদজী টাটা-র প্রস্তাবিত পোস্টগ্র্যাজুয়েট য়ুনিভার্সিটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'বোম্বাই একদিন ছিলাম। সেখানে অধ্যাপক গজবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম; তাঁহার নিকট টাটা ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম তাহা বড় নিরাশাজনক।'[৬৩] অগ্র° ১৩০৫-সংখ্যা ভারতী-র 'প্রসঙ্গ কথা'-য় টাটা-র প্রস্তাবিত দানের সুযোগ নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রের চিঠি পড়ে মনে হয়, তাঁর সঙ্গেও এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটি রক্ষিত হয় নি। প্রত্যুত্তরে জগদীশচন্দ্র 31 Aug [শুক্র ১৫ ভাদ্র] লণ্ডন থেকে লিখিত এক দীর্ঘ পত্রে তাঁর প্যারিসের বিজয়কাহিনী বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পত্রে কিছু নৈরাশ্যের সুর ও সংবাদ ছিল, জগদীশচন্দ্র সে-প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'পারিসে যা যা দেখিলাম তাহাতে যেমন নূতন বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তেমন দেশের কথা মনে করিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছি।···আমাদের ন্যায় উদ্যমহীন, অকর্ম্মঠ জাতি আর কত কাল বাঁচিয়া থাকিবে। তাহার পর গোয়ালিয়রের কথা যাহা লিখিয়াছেন —আমাদের আন্তরিক যে অবনতি কে তাহার প্রতিকার করিবে?'[৬৪] পত্রের শেষে তিনি লিখেছেন: 'এবার সপ্তরথীর হস্তে অভিমন্যু বধ হইবে, আপনারা আমোদ দেখিবেন "বাহবা জান্টিপি, বাহবা সক্রেটিস" কিন্তু আপনাদের গরীব প্রতিনিধির প্রাণ ওষ্ঠাগত। /কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধি রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না। সে মনশ্চক্ষুতে দেখিবে যে তাহার উপর অনেক স্নেহদৃষ্টি আপতিত রহিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে 'চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ' ওল্টাবার সময়ে ১ আশ্বিন [সোম 17 Sep] পত্রটি পেয়ে 'মৃত ভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার হ'য়ে খুব ধড়ফড়' করে উঠেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজদের সঙ্গে বুয়রদের যুদ্ধের খবরে প্রতিটি সংবাদপত্র পূর্ণ, রবীন্দ্রনাথ তার থেকেই উপমা সংগ্রহ করে বন্ধুকে লিখলেন:

যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিন্। কাউকে রেয়াৎ কর্‌বেন না—যে হতভাগ্য surrender না কর্‌বে, লর্ড রবার্টসের মত নির্ম্মম চিত্তে তাদের পুরাতন ঘর-দুয়ার তর্কানলে জ্বালিয়ে দেবেন—আপনি এক সৈন্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সৈন্য-সম্প্রদায় গেঁথে যেরকম ব্যূহ করেচেন তাতে প্রিটোরিয়ায় ক্রিষ্টমাস্ করতে পারবেন ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপরে আপনি জয় ক'রে এলে আপনার সেই বিজয়গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা মিলে ভাগ ক'রে নেব—···এদিকে আপনার জন্যে কারো সিকি পয়সার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যখন জগৎ থেকে যশের ফসল ঘরে আনবেন তখন আপনি আমাদের;—চাষের বেলা আপনি একা, লাভের বেলা আমরা সবাই; অতএব আপনি জয়ী হ'লে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিৎ।[৬৫]

এই পত্রে তিনি নিজের অনেক সংবাদও বন্ধুকে দিয়েছেন: 'শুনে আশ্চর্য্য হবেন, একখানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আঁক্‌চি। বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্যে তৈরী কর্‌চিনে, ··· কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ব্ব স্নেহ জন্মে তেমনি যে বিদ্যাটা ভাল আসে না সেইটের উপর অন্তরের একটা টান থাকে। সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম, এবারে যোল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে।' শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শিল্পী মুকুল দে একটি স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 1909-এ এক গরমের দুপুরে ছাত্রাবাস বীথিকাঘরে বসে তিনি য়ুরোপীয় রীতিতে যখন একটি ছবি আঁকছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের ডাকে 'তাঁকে অনুসরণ করে শান্তিনিকেতন বাড়ির দোতলায় গেলুম। সেখানে দেরাজ খুলে একটি মোটা চামড়াবাঁধাই কালো খাতা বার করলেন। দেখালেন, তাতে হেড ও ফিগার স্টাডি করা রয়েছে পেন্সিলে, এবং কয়েকটি আলঙ্কারিক নক্‌শাও আছে। সেই পেন্সিল স্কেচগুলির মধ্যে আমি দেখতে পেলুম, তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর একটি পোর্ট্রেট্ এবং ডিজাইনের মধ্যে কয়েকটি দৃশ্য রয়েছে। যেমন, সমুদ্রের উপর একটি নৌকো এবং তাতে একটি সুন্দর মেয়ে শুয়ে আছে, এইগুলি সবই তাঁর নিজের আঁকা। সেই ড্রয়িং খাতাটি স্কেচগুলি সমেত তিনি আমাকে দিলেন'।[৬৬] রবীন্দ্রনাথের আঁকা নৌকায় শায়িতা নারী ও দু'টি আলঙ্কারিক নক্‌শা রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে; মূল চিত্রগুলি পৃথ্বীসিং নাহারের সংগ্রহে থাকায় রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু সেগুলির অনুলিপি করে আনেন, পরে মূল চিত্রগুলিও রবীন্দ্রভবনে আসে। এগুলির স্থান-কাল অনুমিত হয়েছে শিলাইদহ 1895, কিন্তু এগুলি 1900-এও আঁকা হওয়া সম্ভব। তবে মৃণালিনী দেবীর পোর্ট্রেটটি পাওয়া যায় নি।

উক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথ আরও জানিয়েছেন: 'লোকেন আমার যে কাব্যচয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল মাঝখানে বিলাতে গিয়ে তার উদ্যম কিছু যেন ক'মে এসেছে। সে যদি কিছু না মনে করে তা'হলে আমি নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি।' প্রস্তাবটি পত্রিকাতেও বিজ্ঞাপিত হয়; কার্তিক-সংখ্যা সাহিত্য-তে 'বিজ্ঞাপন'-এ লেখা হয়:

রবীন্দ্র বাবুর সমুদয় কবিতা হইতে বাছিয়া মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিত একখানি সিলেক্‌সন সম্পাদন করিতেছেন। এই গ্রন্থ, সুন্দর চিত্র সম্বলিত। বঙ্গে এ উদ্যম নূতন। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্যাদি পরে প্রকাশিত হইবে।

ইতিপূর্বে 1 Jun 1895 [১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২] স্বয়ং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এইরূপ প্রস্তাব করে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন, সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু দু'টি পরিকল্পনার একই পরিণতি ঘটেছিল। মোহিতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় আরও বৃহদাকারে 'কাব্যগ্রন্থ' প্রকাশিত হয় ১৩১০-এ।

21 Jun [বৃহ ৭ আষাঢ়] জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন: 'পুরীর বর্ণনা শুনিয়া আমার মন সেখানে আছে, সমুদ্রগর্জ্জন ও বাতাস ও ঢেউ আমাকে ঘেরিয়া আছে। এই সংকীর্ণ নগর ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজকে হারাইতে চাহি।'[৬৭] 'পুরীর বাড়ী ক্রয় জন্য কটকের উকীল পরমানন্দ বাবুর নিকট পাঠান হয়' ৬০০ টাকা ৩ চৈত্র ১৩০৪ [16 Mar 1898] তারিখে, একই সময়ে 'কটকে বাটী ক্রয় জন্য ১০০৲' টাকা পাঠানো

হয়—সেও একই উদ্দেশ্যে; এর পর 'পুরীর সমুদ্রতীরবর্ত্তী জমির জন্য' পুরীর কালেক্টরের কাছে এপ্রিল ও নভেম্বর মাসে ৫০ টাকা করে সদর খাজনা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ১৩১১ [1904-05] বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। জগদীশচন্দ্রের পত্র থেকে বোঝা যায়, দুই বন্ধু সেখানে বাড়ি তৈরি করে অবকাশযাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু বাধা এসেছে পুরীর কালেক্টরের কাছ থেকেই। রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত পত্রে জগদীশচন্দ্রকে লিখেছেন:

মশায়, আপনার জন্যে পুরীর জমীটি ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব ব'লে আশা হচ্ছে না, তার প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টি পড়েচে। কর্ত্তা আমাকে লিখেচেন, পুরী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আমার ঐ ভূখণ্ডটুকুতে ভারি প্রয়োজন হয়েচে। জোর যার মুল্লুক তার যদি সত্য হয় তা'হলে ও জমিটুকু রক্ষা হবে না। আপনি যদি এখানে থাক্‌তে থাক্‌তেই বাড়ী আরম্ভ ক'রে দিতে পার্‌তেন তা'হলে ও লোকটা দাবী কর্‌তে পার্‌ত না।[৬৮]

সমীর রায়চৌধুরী বিপিনচন্দ্র পাল-সম্পাদিত সাপ্তাহিক *New India* পত্রিকার 31 Jul 1902 [বৃহ ১৫ শ্রাবণ ১৩০৯]-সংখ্যা থেকে পত্রটি উদ্ধৃত করেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিতর্কিত পুরীর বাড়ি' প্রবন্ধে:

To

Babu Rabindranath Tagore

Dear Sir,

I am to inform you that the Board of Revenue have made allocation of sites in Balukhanda Govt. estates Puri for European and native Quarters and that separate plots drawn out to distinguish one from the other. The site you have in the estate consequently falls in the European Quarters. So the Board desire to take it back from you, giving you equal good site in exchange in the native Quarters. I request you to be so good as to waive your claims to the land leased out to you and engage somebody here on your behalf to select site with me for you in the native Quarters. An early reply is solicited.

Yours truly

Sd. A. Garrett

Collector[৬৯]

রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জমিদারির উকিলদের দিয়ে কালেক্টরের ইচ্ছাপূরণে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন, পরে বিষয়টির রাজনৈতিক মোকাবিলা করেন বিপিনচন্দ্র পাল। জগদীশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অনেক পত্রই রক্ষিত হয় নি। মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যুচ্ছায়ায়-আচ্ছন্ন অবস্থায় Aug 1903-তে আলমোড়া থেকে লিখিত এইরূপ একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জমিটি জগদীশচন্দ্রকে দিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে 18 Aug [১ ভাদ্র ১৩১০] জগদীশচন্দ্র লেখেন:

তুমি যে পুরীর জায়গা আমাকে দিতে চাহিয়াছ! তুমি কি মনে কর আমার কোন স্থানের উপর কোন মাত্র টান আছে? কেবল একসময় মনে করিয়াছিলাম যে, দুজনে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মাঝে মাঝে যাইয়া থাকিব। তোমারই জায়গা থাকুক; তুমি যদি এরূপ নিরাসক্ত হও, আর তুমি যদি পুরীতে সঙ্গী না হও, তবে আমার নিকট ওরূপ নির্জ্জনবাস অসহ্য হইবে।[৭০]

জমিটি শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ক্ষুধা মেটানোর জন্য Apr 1905 [বৈশাখ ১৩১২]-এ কুমার নগেন্দ্রনাথ মল্লিককে তিন হাজার টাকায় বিক্রয় করে দিতে হয়। প্রসঙ্গটি যথাস্থানে আরও আলোচিত হবে।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের ১ আশ্বিনের [সোম 17 Sep] পত্রটি পাবার আগেই 10 Sep [সোম ২৫ ভাদ্র] জগদীশচন্দ্র তাঁকে লিখলেন: 'গত পত্রে আপনাদের প্রতিনিধিকে মুমূর্ষ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। শুনিয়া সুখী হইবেন, সে সমস্ত সঙ্কট অতিক্রম করিয়া আপনাদের আশা অক্ষুন্ন রাখিয়াছে।'[৭১] এরপর তিনি যথারীতি তাঁর

বিজয়বার্তা দিয়ে ইংলণ্ডে অধ্যাপনার কাজ নেওয়া সম্বন্ধে বন্ধুর মত জানতে চেয়েছেন। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে পত্রটি লেখেন [সম্ভবত ১৬ আশ্বিন মঙ্গল 2 Oct তারিখে লেখা] সেটি পাওয়া যায় নি, কিন্তু তাঁর মত অন্য একটি তারিখ-হীন পত্রেও জানিয়েছেন: 'আপনি দ্বিধামাত্র করিবেন না। আপনার সফলতার পথে যদি আপনার স্বদেশও অন্তরায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় দিতে হইবে।'[৭২] উল্লিখিত নিরুদ্দিষ্ট পত্রটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত *Sophia*-তে প্রকাশিত ব্রহ্মবান্ধবের 'The World-Poet of Bengal' প্রবন্ধটির কর্তিকা পাঠিয়ে দেন। এটি পেয়ে জগদীশচন্দ্র 2 Nov [শুক্র ১৭ কার্তিক] তাঁকে লেখেন:

তুমি যে cutting পাঠাইয়াছ তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট হই নাই। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্ব্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs. Knightকে অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে।[৭৩]

বলা শক্ত, চিঠিপত্র ৬-এ সংকলিত ৫-সংখ্যক চিঠিটি এই পত্রের উত্তরে লেখা কিনা, কিন্তু এই পত্রেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

···আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে প্রথম খণ্ডই পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডেই অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তর্জ্জমার যোগ্য গল্প বোধ হয় নিম্ন কয়েকটি হইতে পারে:—পোষ্টমাষ্টার, কঙ্কাল, নিশীথে, কাবুলিওয়ালা এবং প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knight-এর রচনানৈপুণ্যের প্রতি আমার বড় একটা আস্থা নাই।[৭৪]

জগদীশচন্দ্রের 'প্রথমোক্ত বন্ধু' সম্ভবত নিবেদিতা। নিবেদিতা যে এই সময়ে অনুবাদের কাজে—এবং রবীন্দ্রনাথের গল্প অনুবাদের কাজে—নিযুক্ত আছেন, তা তাঁর কয়েকটি চিঠি থেকে জানা যায়। 22 Nov [বৃহ ৭ অগ্র°] তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লিখছেন: 'Whole days pass in Science and in translating and talking India.'[৭৫] একই দিনে [? নিবেদিতা লিখেছেন, Friday evening-Nov.22, 1900] তিনি মিসেস ওলি বুলকে লিখেছেন: 'I must not stay writing long—for I have finished the Cabuliwallah and must have the introduction ready tonight.'[৭৬] কয়েকদিন পরে 29 Nov [বৃহ ১৪ অগ্র°] তিনি মিসেস বুলকেই লিখলেন: 'The Cabuliwallah and Leave of Absence are both Englished now, and I have "Giving and Giving in Return" ready for the last finish. So we are doing something.'[৭৭] এই গর্ব নিবেদিতা করতেই পারেন, কারণ মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি' এবং 'দান প্রতিদান' গল্প তিনটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা সহজ কাজ নয়। কোনো সন্দেহ নেই যে, জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র 23 Nov [শুক্র ৮ অগ্র°] রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছেন: 'তোমার লেখা তরজমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন না।'[৭৮] এ-বিষয়ে বিস্তৃতভাবে তিনি লিখেছেন 16 Jan 1901 [বুধ ৩ মাঘ]-এর পত্রে:

প্রথম খণ্ড হইতে ৩টি গল্প তরজমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য্য ত আছে।···তিন শ্রেণীর বন্ধুগণের মত জানাইতেছি।

প্রথম। এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান মহিলা [সম্ভবত মিসেস ওলি বুল]—সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ আছে। "ছুটি" শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল।

দ্বিতীয়।—Typical John Bull। ছুটী শুনিয়া বলিলেন যে local colour ত কিছু দেখিলাম না।—ফটিক যে আমাদের দেশী ছেলে, এরূপ দুএকজনকে আমি জানি—true to life। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষীয় ছেলেদের স্বভাব অন্যরূপ।

তৃতীয়। আমার এই বন্ধুটির সম্বন্ধে দেখা হইলে বলিব, ইহার জীবন অতি আশ্চর্য্য। ইনি একজন বিশেষ সম্ভ্রান্তবংশীয়—ইউরোপীয় বহু ভাষায় পণ্ডিত [সম্ভবত Prince P. A. Kropotkin, 1842-1921]*| He has not seen such a fine touch in any European Literature.[৭৯]

জগদীশচন্দ্র 22 May 1901 [বুধ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮] তাঁর এই প্রয়াসের পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'তোমার লেখা translate করিয়া কোন magazineএ পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহারা দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন গল্প অতি সুন্দর, কিন্তু original ব্যতীত translation আমরা বাহির করি না।'[৮০] জগদীশচন্দ্র নিবেদিতাকে দিয়ে যে তিনটি গল্পের অনুবাদ করিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি 'The Cabuliwallah' নিবেদিতার মৃত্যুর [13 Oct 1911 শুক্র ২৬ আশ্বিন ১৩১৮] পর *The Modern Review* পত্রিকার Jan 1912 [pp. 50-56] -সংখ্যায় মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যে প্রাপ্ত নন্দলাল বসু-কৃত 'The Cabuliwallah' চিত্রের সঙ্গে। নিবেদিতা আরও দু'টি গল্পের অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেগুলির সন্ধান পাওয়া যায় নি। আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি—কিন্তু কালানুক্রমিকতায় ফিরে যাবার আগে এই ঐতিহাসিক তথ্যের স্বীকৃতি রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রথম অনুবাদিকার সম্মান নিবেদিতারই প্রাপ্য।

ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথের দু'টি রচনা ভারতী [২৪। ৫]-তে মুদ্রিত হয়:

৩৯১-৯৭ 'দুর্ব্বুদ্ধি' দ্র গল্পগুচ্ছ ২২। ১৮১-৮৫

৪৪৭-৬০ 'চিরকুমার সভা' পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪। ২৫৮-৬৮ [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে শিলাইদহে ফিরে যান। এরপর পুরো আশ্বিন মাসটি তিনি সেখানেই থাকেন। এই মাসে তাঁর জীবনবৃত্ত প্রিয়নাথ সেনকে লেখা কয়েকটি চিঠির মধ্যে আবদ্ধ। জগদীশচন্দ্রকে তিনি ১ আশ্বিন [সোম 17 Sep] একটি পত্র লেখেন, সেটি নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এরপর জগদীশচন্দ্রের 10 Sep [২৫ ভাদ্র]-এর চিঠিটি [দ্র পত্রাবলী।৩৯-৪২ পত্র ১৬] পেয়ে 2 Oct [মঙ্গল ১৬ আশ্বিন] তিনি প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'আজ জগদীশ বসুর এক চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দে আছি। এবারে তিনি সেখানে খুব বড় রকমের জয়লাভ করে আসবেন তার সূত্রপাত হয়েছে।' এরপর পত্রটির বিষয়বস্তু বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন:

ওঁকে সেখানকার একটা বড় য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপকপদে নিযুক্ত করবার জন্যে তাঁরা অনুরোধ করচেন—তিনি জন্মভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ ইতস্ততঃ করচেন। আমি তাঁকে মিনতি করে লিখেছি, যে জন্মভূমির মোহ যেন তাঁর চিত্তকে তাঁর কাজের সফলতা থেকে বিক্ষিপ্ত করে না দেয়। সেখানে অবসর এবং বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সহায়তা ও সহানুভূতির মধ্যে না থাকলে তাঁর হাতের সুবৃহৎ কাজ সমাধা করতে পারবেন না। তাঁর কৃতকার্য্যতাতেই তাঁর মাতৃভূমির গৌরব।[৮১]

—জগদীশচন্দ্রকে পত্রটি রবীন্দ্রনাথ এই দিনই লেখেন, কিন্তু আমরা আগেই বলেছি এটি পাওয়া যায় নি।

আখ্যাপত্রে প্রদত্ত তারিখ অনুযায়ী গ ল্প গু চ্ছ প্রকাশিত হয় ১ আশ্বিন ১৩০৭ [সোম 17 Sep 1900] তারিখে:

গল্পগুচ্ছ। (প্রথম খণ্ড)/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।/ শ্রীঅমূল্যনারায়ণ রায় দ্বারা "মজুমদার এজেন্সী"/হইতে প্রকাশিত।/কলিকাতা/ আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।/ ৫৫নং চিৎপুর রোড।/ ১লা আশ্বিন ১৩০৭ সাল।/ মূল্য ২ দুই টাকা।

পৃষ্ঠাসংখ্যা: ২+২+৪৪৮; মুদ্রণসংখ্যা: ১১০০।

এই খণ্ডে ৩২টি গল্প গৃহীত হয়, এক্ষেত্রে কোনোরকম কালানুক্রম অনুসরণ করা হয় নি। আখ্যাপত্রে গ্রন্থের নাম 'গল্পগুচ্ছ' হলেও পরে সর্বত্র 'গল্প' মুদ্রিত হয়েছে। ২১টি গল্প নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় 4 Mar 1901 [সোম ২১ ফাল্গুন] ধারাবাহিক পৃষ্ঠাঙ্কে। ড সুকুমার সেন লিখেছেন:

> মিনার্ভা থিয়েটারে শিক্ষিত দর্শকদের টানিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে স্বত্বাধিকারী-অধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তখন বিবিধ গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া শুরু করিয়াছিলেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের 'গল্প'এর অনেক কপি কিনিয়া নেন এবং ইঁহার সুবিধার জন্য প্রকাশক (মজুমদার এজেন্‌সি বা মজুমদার লাইব্রেরী) প্রায় সাড়ে নয় শ পৃষ্ঠার বইটি চারটি খণ্ডে স্বতন্ত্র মলাট দিয়া বাঁধাইয়া দেন। এই খণ্ডীকৃত বইটির নাম দেওয়া হয় 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ'। প্রত্যেক খণ্ডে খণ্ডসংখ্যা ও সূচী না দিয়া মলাটে সেই সেই খণ্ডের গল্পগুলির নাম দেওয়া ছিল।[৮২]

ড সেনের কাছেই এইরূপ একটি খণ্ড দেখে তার বিবরণ দিয়েছেন পুলিনবিহারী সেন:

> …আখ্যাপত্র নাই; মলাটে মুদ্রিত আছে—
>
> রবীন্দ্রনাথের/ গল্পগুচ্ছ/ (দানপ্রতিদান, জয় পরাজয়, প্রতিহিংসা,/ ঠাকুর্দ্দা, স্বর্ণমৃগ, প্রতিবেশিনী, ফেল,/ অনধিকার প্রবেশ,/ ত্যাগ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত/ প্রকাশক—মজুমদার লাইব্রেরী। ২০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহা গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ডের একটি অংশ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩১৭-৪৪৮।[৮৩]

কিন্তু এসব নিশ্চয়ই অনেক পরের কথা।

রবীন্দ্রনাথ ১২ আশ্বিন [শুক্র 28 Sep] প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে—দেখেছ বোধ হয়। দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ হয়নি।'[৮৪] প্রিয়নাথ বই পান নি, তিনি পরের দিন লিখেছেন: 'শ্রীমান প্রবোধচন্দ্রকে বিশেষ করে দুটা সংস্করণেরই কথা বলে দিয়েছি—শ্রীমানও অঙ্গীকার করে গিয়েছিল—এই গত রবিবারে—যে সর্ব্বাগ্রে আমি পাব—শৈলেশচন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া তাহাতে খুব জোরে সায় দিয়াছিল—পণ্ডিত মহাশয় (অর্থাৎ বিদ্যার্ণব ঠাকুর) তাঁহাদের-না-তোমার সমাজের সেই কাদের বলে দিয়েছিল কিন্তু কই এত লোকের পুচ্ছ মলিয়াও গল্পগুচ্ছ আজও পেলেম না।'[৮৫]

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন পত্রে সমসাময়িক কয়েকজন লেখক-লেখিকার রচনা সম্পর্কে কিছু উল্লেখযোগ্য মন্তব্য আছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের উপন্যাস 'তমস্বিনী' প্রিয়নাথ সেনকে উৎসর্গ করা হয়। বইটি রবীন্দ্রনাথকে পড়তে দিলে ১২ আশ্বিনের পত্রে তিনি মন্তব্য করেন:

> নগেন্দ্র গুপ্তর তপস্বিনী [তমস্বিনী] পড়ে দেখ্‌লুম। ঠিক হয়নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realism এর অবতারণা করতে চাচ্চেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এ রকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এই বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্ব্বক সব কথা পরিষ্কারভাবে শেষ পর্য্যন্ত বল্‌তে পারেননি, সেইজন্য তাঁর self-conscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটাকে লজ্জিত করে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্ব্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্চে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি করেচেন। ফর্ ইন্‌ষ্ট্যান্স্, সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোক্‌রার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপন করলেন তবে তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার না করে ছাড়লেন কেন? ও রকম স্থলে যা হতে পারে সেটাকে সরলভাবে তার সম্পূর্ণ বীভৎসমূর্ত্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন? এসব জিনিষ তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্যে সব কথা ভাল করে প্রকাশ করতেও পারেন নি, ভাল করে গোপন করতেও পারেন নি।[৮৬]

এই বহুল ব্যবহৃত উদ্ধৃতিটিতে কেবল শ্লীলতা-অশ্লীলতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিই ব্যক্ত হয় নি, বিধবা যুবতীর প্রণয়চিত্র অঙ্কনের যে ঢেউ সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল তার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সতর্কবাণী বলেও এটিকে গ্রহণ করা যায়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ নিজেও তখন বিধবা বিনোদিনীর প্রণয়োপাখ্যান

রচনায় ব্যাপৃত, যার কিছুটা সম্ভবত ইতিমধ্যেই লেখা হয়ে গিয়েছিল, যেটুকু পড়ে বা শুনে প্রিয়নাথ তাঁর ৩ আশ্বিনের [19 Sep] পত্রে মন্তব্য করেছিলেন: "'বিনোদিনী'র ভাষা ও চিত্রসকলের মধ্যে একটা লেলিহ রুক্ষ জ্বালা, তীব্র নেশার দাহিকা আছে"।[৮৭] রবীন্দ্রনাথ অপরিতৃপ্ত প্রেমের তীব্র দাহিকা শক্তির লীলা চোখের বালি উপন্যাসে পুরোপুরি দেখিয়েছেন—কিন্তু শিল্পের সংযমেও তাঁর বিশ্বাস ছিল, সেই সংযমই নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তমস্বিনী' বা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা' উপন্যাসের সঙ্গে চোখের বালি-র পার্থক্য রচনা করেছে।

এই সময়ে Tolstoy-এর *What is Art*বইটি রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ল। 5 Oct [শুক্র ১৯ আশ্বিন] তিনি প্রিয়নাথকে লিখছেন: 'Tolstoyএর What is Art নামক একখানি বই পড়বার জন্যে সুরেন আমাকে পাঠিয়েছেন। আজ হস্তগত হল—এখনো পড়িনি। বোধ হচ্চে Art সম্বন্ধে তিনি একটা কোন নূতন পথে গেছেন।[৮৮] 9 Oct [মঙ্গল ২৩ আশ্বিন] বইটি পড়ে লিখেছেন:

> সকাল বেলায় Tolstoy-র বইখানা দেখছিলুম ওর সঙ্গে মতে মিলিনে কিন্তু খুব suggestive। আমার ইচ্ছে করচে ওর বিস্তৃত সমালোচনা করে একটা বড় প্রবন্ধ লিখি—তার মধ্যে আমার মতটা বেশ বিস্তৃত করে বল্‌তে পারি। তুমি রস্কিনে যে তর্ক তুলেচ এতেও তর্কটা তাই—তবে অনেকগুলো বিশেষত্ব আছে। সৌন্দর্য্য ও আর্ট সম্বন্ধে ইস্তক নাগাদ যত মতামতের সৃষ্টি হয়েছে টলষ্টোয়া তার একটা চুম্বক দিয়ে তার উপরে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেচেন। এ বইটা যদি না পড়ে থাক ত পড়া আবশ্যক।[৮৯]

John Ruskin [1817-1900]-এর জীবন ও শিল্পতত্ত্ব নিয়ে প্রিয়নাথের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'রস্কিন/ললিতকলা এবং রচনা-শিল্প' প্রদীপ-এর বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র ও অগ্র° চারটি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠিতে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু টলস্টয়ের বই সম্বন্ধে তাঁর কোনো সমালোচনা চোখে পড়েনি।

জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করবার জন্য প্রয়াস করেছেন। এর আগে Victor Hugo-র *Les Contemplations*-এর কবিতা অনুবাদ-প্রসঙ্গে তাঁর ফরাসী-চর্চার কিছু বিবরণ আমরা দিয়েছি [দ্র রবিজীবনী ২। ১৪৭-৫০]। বর্তমানেও নতুন করে তিনি এই ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন। ১ আশ্বিন [17 Sep] তিনি জগদীশচন্দ্রকে যে চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যে 'চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ' নিয়ে ওল্‌টানোর খবর আছে। কিন্তু ব্যাকরণ অবলম্বন করে ভাষা-শিক্ষা তাঁর স্বভাবেরও অনুকূল ছিল না, তাঁর শিক্ষাদর্শেরও বিরোধী ছিল। তাই উক্ত 9 Oct-এর পত্রে প্রিয়নাথকে লিখেছেন:

> ব্যাকরণ ঘেঁটে ফরাসী শেখা আমার কর্ম্ম নয়—একটা বই দিয়ো। আমার লাইব্রেরীতে যে যে ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে তারই কোন একটার original. পেলে সুবিধা হয়। Gautierএর Capitane Fiacase, Daudetএর Jack, Maupassantএর Pierre & Jean, No Relation, Goncourtএর Sister Philomene, ইত্যাদি।[৮৯]

এর আগে 5 Oct তিনি প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'Le crime de Sylvestre Bonard নামক Anatole Franceএর ফরাসী বই যদি তোমার কাছে বা কোন দোকানে থাকে আমাকে পাঠাতে পার?"[৯০] রবীন্দ্রজীবনী-কার জানিয়েছেন: 'আমরা জানি *No Relation (Sans Familli)* ও *Crime of S. Bonard* কবির বিশেষ প্রিয় বই ছিল; *Crime* বইটা এককালে কবি পড়িয়া শোনান। *No Relation* তেজেশচন্দ্র সেন 'কুড়ানো ছেলে' নামে অনুবাদ করেন। নগেন্দ্রনাথ আইচ সন্ধ্যার বিনোদনপর্বে এই গল্পটি খুব রঙাইয়া ছেলেদের বলিতেন।'[৯১] এখানে রবীন্দ্রনাথের পড়া অনেকগুলি গ্রন্থের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এর আগেও তিনি 'Moliere রচিত L'Avare নামক একটি নাটক Fasnach দ্বারা Edited বেলার পড়ার জন্যে' চেয়েছেন, *Choice Works of*

Mark Twain, Mark Twain's Library of Humour বই দুটি চন্দ্র ব্রাদার্সদের অর্ডার দিতে বলেছেন। তাঁর প্রয়োজনটিও অত্যন্ত গুরুতর ছিল; ৪ ভাদ্র [20 Aug] প্রিয়নাথকে লিখেছিলেন:

সায়াহ্নে পরিজনমণ্ডলীকে চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট করে দীপালোকে একটা কিছু পড়ে শোনাতে হয়। পরীক্ষা করে দেখ্‌লুম মার্ক টোয়েনের হাস্যরস আমার অপত্যকলত্রের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকজনক বোধ হয়—বিশেষত বেলা এবং বেলার মা অত্যন্ত আমোদ পান। আমার কাছে Tramps Abroad এবং Innocents Abroad আছে সে দুটোর হাস্যকর অংশ প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছি। ...ছোট ছোট দু তিন দৃশ্যের ইংরাজি প্রহসন Thackerদের ওখানে বহুকাল পূর্ব্বে অনেক দেখেছিলুম—তারি এক ঝুড়ি চালান করে দিতে পার?...আমার রসদ ফুরিয়ে এসেছে, আর দু তিন দিনের মত আছে অতএব শীঘ্র কিছু খোরাক না পাঠিয়ে দিলে—Pekin legationএর দশা হবে, তখন সন্তানসন্ততিবর্গের আক্রমণ কিছুতেই ঠেকাতে পারব না।'[৯২]

চীনে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের তাণ্ডবের প্রতি যে ইঙ্গিত এখানে আছে তা রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে উন্মুখ সচেতনতার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ, কিন্তু এখানে লক্ষণীয় পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত তাঁর শিক্ষাদর্শ, যা বৎসরাধিককাল পরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রথা রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করেছেন ১২৯৪ [1887]-এর শরৎকালে দার্জিলিং-ভ্রমণের [দ্র রবিজীবনী ৩। ৭৪] সময় থেকে, পরে তা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পঠন-সূচীতে 'বিনোদন পর্ব' নামে আখ্যাত হয়। বইপত্র কেনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কেমন অকৃপণ ছিলেন তার কিছু-কিছু হিসাব আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি, এবছর ২৮ আষাঢ় [বৃহ 12 Jul] 'থ্যাকার স্প্রিং কোম্পানী ২ বিল ১২২'টাকার হিসাব পাওয়া যায়। এছাড়া ২২ চৈত্র ১৩০৫ [4 Apr 1899] থেকে 'ব° হেমিল্টন কো° দং বিশ্বকোশ বই ক্রয়ের সবস্কৃপসন···২০্'-জাতীয় একটি হিসাব প্রতি মাসে দেখা যায়—বোঝা যায়, মাসিক কিস্তিতে তিনি *Encyclopaedia Britannica* বইটি সংগ্রহ করছেন; এই গ্রন্থের কিস্তি শোধ হয়ে যাবার পর Oct 1900 [কার্তিক ১৩০৭]-এ তিনি গ্রাহক হন The Standard International Library of Famous Literature সংস্থার—দীর্ঘকাল মাসিক দশ টাকার কিস্তি মিটিয়ে ৫ বৈশাখ ১৩০৯ [18 Apr 1902] মোট ১৯০ টাকা শোধ করা হয়। হিসাবগুলি সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু জ্ঞানসাধনার কী বিস্তীর্ণ পথ রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে আসতে হয়েছে তার আভাস দেওয়ার পক্ষে এগুলি মূল্যবান।

আশ্বিন মাসে সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত রচনাগুলি মুদ্রিত হয়:

ভারতী, আশ্বিন ১৩০৭ [২৪। ৬]:

৪৯৩-৯৮ 'ফেল' দ্র গল্পগুচ্ছ ২২। ১৮৬-৮৯

৫৪৪-৫৪ 'চিরকুমার সভা' ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪। ২৬৮-৭৫ [সপ্তম পরিচ্ছেদ]

৫৭৩-৭৫ 'দীন দান' দ্র কাহিনী ৭। ১০৯-১১

প্রদীপ, আশ্বিন ১৩০৭ [৩। ১০]:

৩১৬-১৯ 'শুভদৃষ্টি' দ্র গল্পগুচ্ছ ২২। ১৯০-৯৫

প্রদীপ-এ গল্পটি 'বালিকা হাঁস দুটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া ত্রস্ত সতর্ক স্নেহে তাহাদের আগ্‌লাইবার চেষ্টা করিতেছে' Kuntaline Press-এ ছাপা একটি চিত্র-সহ প্রকাশিত হয়। প্রিয়নাথ সেন তাঁর ১৬ আশ্বিনের [মঙ্গল 2 Oct] পত্রে অবশ্য মন্তব্য করেছেন: 'সংশ্লিষ্ট ছবিখানি পটুয়ার অপটুত্বের চূড়ান্ত।'

সম্ভবত আশ্বিনের শেষে বা কার্তিকের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন নীতীন্দ্রনাথের অসুস্থতা উপলক্ষে। সম্ভবত ৯ কার্তিক [বৃহ 25 Oct] তিনি বিলাতে জগদীশচন্দ্রকে লেখেন:

আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি—প্রায় আট রাত্রি ঘুমাইতে অবসর পাই নাই। তাই আজ মাথার ঠিক নাই—শরীর অবসন্ন। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাইয়াছি এখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। মনে করিয়াছি দুই-চারি দিন বোলপুর শান্তিনিকেতনে যাইব।[৯৩]

এই চিঠির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড পাঠিয়ে দেন। এইদিন ক্যাশবহি হিসাবে 'ডাঃ জে সি বসুর নিকট বিলাতে বুক পোষ্ট ল৬ পর্ত্র০' খরচ দেখা যায়।

নীতীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিবারের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ ছিল 'মাধুরীলতার চিঠি'তে তার অজস্র নিদর্শন আছে। বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথ দুজনের চেয়েই মৃণালিনী দেবী বয়সে অনেক ছোটো ছিলেন, কিন্তু দুজনকেই তিনি ভালোবাসতেন পুত্রের মতো। বলেন্দ্রনাথের মরণান্তিক পীড়ার সময়ে তাঁর উদ্বেগের কথা আছে মাধুরীলতার কয়েকটি চিঠিতে। নীতীন্দ্রনাথের অসুখের সময়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ:

তুমি করচ কি? যদি নিজে দুর্ভাবনার কাছে তুমি এমন করে আত্মসমর্পণ কর তা হলে এ সংসারে তোমার কি গতি হবে বল দেখি? বেঁচে থাক্‌তে গেলেই মৃত্যু কতবার আমাদের দ্বারে এসে কত জায়গায় আঘাত করবে—মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা ত নেই—শোকের বিপদের মুখে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বন্ধু জেনে যদি নির্ভর করতে না শেখ তাহলে তোমার শশাকের অন্ত নেই।[৯৪]

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ক্যাশবহিতে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ৯ কার্তিকের মধ্যে ১, ২, ৩, ৬ ও ৮ কার্তিক মৃণালিনী দেবীকে পাঁচটি চিঠি লিখেছেন—তার মধ্যে অবশ্য মাত্র একখানি চিঠিই রক্ষিত হয়েছে। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে আরও চিঠি লিখেছেন—২ কার্তিক তারকনাথ পালিতকে, ২ ও ৬ কার্তিক লোকেন্দ্রনাথকে, ৯ কার্তিক কেদার লাহিড়ী ও শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে ছাড়া ৪ ও ৫ কার্তিক তিনটি করে চিঠি লেখার হিসাব ক্যাশবহিতে আছে। এই চিঠিগুলির একটিও অবশ্য পাওয়া যায় নি। নীতীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ সুস্থ হবার পর ৭ কার্তিক [মঙ্গল 23 Oct] রবীন্দ্রনাথ বিডন স্ট্রীটে ও ৮ কার্তিক বালিগঞ্জ ও সংগীতসমাজে যান এবং ১০, ১১ ও ১৩ কার্তিক সুকিয়া স্ট্রীট ও ১৪ কার্তিক যান নিমতলা স্ট্রীটে প্রিয়নাথ সেনের কাছে।

১৫ কার্তিক [বুধ 31 Oct] তিনি এলাহাবাদ রওনা হন বলেন্দ্রনাথের বিধবা স্ত্রী সাহানা দেবীকে নিয়ে আসার জন্য। রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'বলেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার শ্বশুর সার্জন-মেজর ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া যান এবং তাহার পুনরায় বিবাহের কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় মহর্ষির ব্যবস্থায় পৌত্রবধূকে আপনাদের কাছে আনিয়া রাখাই স্থির হয় এবং রবীন্দ্রনাথকে সেই দৌত্যে পাঠান হইল।'[৯৫] কিন্তু ফকিরচন্দ্রের মৃত্যু হয় আশ্বিন ১৩০৫ [Sep 1898]-এ; ঐ বৎসর সরকারী ক্যাশবহির ৯ আশ্বিনের [24 Sep] হিসাবে আছে: 'বলেন্দ্রবাবু মহাশয়ের স্ত্রীর পিতা ঁ ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় চতুর্থীর শ্রাদ্ধের ব্যয়...১১ ´০'। রবীন্দ্রজীবনী-কারের হিসাব অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের এলাহাবাদ-যাত্রার তারিখ 7 Feb 1900 [বুধ ২৫ মাঘ ১৩০৬]—কিন্তু এই তথ্যটিও ঠিক নয়। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের সরকারী ক্যাশবহির ১৫ কার্তিকের [বুধ 31 Oct] হিসাব থেকে এই যাত্রার তারিখটি নির্ধারণ করা যায়: 'ব° বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দং এলাহাবাদ শ্রীমতী সুশীলা দেবীকে আনিবার জন্য লইয়া যান ৩৫০্

দং টেলিগ্রাফ করার ব্যায় ২ দফায় ৩ /৩৫৩'। পরদিন [১৬ কার্তিক বৃহ 1 Nov] রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবীকে লিখছেন:

আজ এলাহাবাদে এসে পৌঁচেছি। সুসি এবং তার মার সঙ্গে দেখা হয়েচে। সুসি যেতে রাজি হয়েছে, তার মাও সম্মতি দিয়েচেন। কলকাতা হয়ে শিলাইদহে যাওয়াই স্থির হল। যে রকম বাধা পাব মনে করেছিলুম তার কিছুই নয়। ভাল করে বুঝিয়ে বলতেই উভয়েই রাজি হল। পর্শু অথাৎ শনিবারে এখান থেকে ছাড়ব। ভাগ্যি সুরেন মোগলসরাই থেকে আমার সঙ্গ নিলে নইলে একা একা এই হোটেলে পড়ে পড়ে ক'টা দিন কাটান আমার পক্ষে ভারি কষ্টকর হত।'[৯৬]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখন এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ। সিভিল লাইন্‌সের সাউথ রোডে একটি বাংলো বাড়িতে তাঁর বাসা ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে একদিন সেখানে যান। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা রামানন্দ-কন্যা শান্তা দেবী [1893-1984] ও সীতা দেবীর [1895-1974] রচনায় পাওয়া যায়, তা কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর। শান্তা দেবী লিখেছেন:

সাউথ রোডের বাসায় থাকিতে একদিন বিকাল বেলা পাচক মহারাজ আসিয়া খবর দিল 'রাজা-উজীর' জাতীয় দুইটি ব্যক্তি বাবুজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তখন সবে তিনি কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিয়াছেন। এই ঘটনার কথা তিনি লিখিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাইপো বলেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ী ছিল এলাহাবাদে। উভয়েই মোগলাই বা ইরাণী পোষাক ও পাগড়ী পরে এসেছিলেন। আমার রাঁধুনী বিশ্বেশ্বর মহারাজ উভয়কে দড়ির খাটিয়ায় বসিয়ে এসে খবর দিলেন দুটি 'আমীর আদমী' এসেছেন। আমি বেরিয়ে গিয়েই চিনতে পারলাম। রবিবাবু বলেছিলেন মনে পড়ছে, 'এই পোষাকে চিনতে পারছেন না বোধ হয়।' তাঁর সঙ্গে সে সময় অন্য কি কথা হয়েছিল···মনে পড়ছে না।"[৯৭]

সীতা দেবীও তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি'-তে একই বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন: 'তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর বাবা আমাদের বলিয়া দিলেন যে, কালো-পোশাকপরা যিনি তিনিই রবীন্দ্রনাথ ও ধূসর-পোশাক-পরা ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ।'[৯৮] সেই সময় তাঁর বয়স চার-পাঁচ বৎসর।

দু'টি বর্ণনাতেই বলেন্দ্রনাথের উল্লেখ সঠিক হলে ঘটনাকাল ১৩০৫ বঙ্গাব্দের শেষভাগের পরবর্তী হতে পারে না, কারণ এর পরেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ৩ ভাদ্র ১৩০৬ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু উক্ত সময়ে বা তার আগে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এলাহাবাদ-ভ্রমণের কোনো উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। সম্ভবত এ-বিষয়ে রামানন্দ ও তাঁর কন্যা সীতা দেবী উভয়েরই স্মৃতি বিভ্রান্ত হয়েছিল।

১৮ কার্তিক [শনি 3 Nov] সাহানা দেবীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় রওনা হন। ১৯ কার্তিক তাঁর সুকিয়া স্ট্রীট যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। সম্ভবত ২০-২২ কার্তিকের মধ্যে তিনি সাহানা দেবীকে শিলাইদহে রেখে আসেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 22 Nov [বৃহ ৭ অগ্র°] ডালটনগঞ্জ থেকে তাঁকে লিখেছেন: 'তুমি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিলে তার পর শিলাইদহে গিয়া আবার রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছ, শৈলেশচন্দ্রের পত্রে তাহা জানিয়াছি। পশ্চিমে কোথায় কতদিন ছিলে তাহা জানিতে পারি নাই।'[৯৯] এই চিঠি ও মৃণালিনী দেবীকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত পত্র থেকে আমরা এরূপ অনুমান করেছি, ক্যাশবহি বা অন্যান্য সূত্রে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে যাওয়া বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

২৩ কার্তিক [বৃহ 8 Nov] থেকে রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় অবস্থিতির বিভিন্ন হিসাব ক্যাশবহিতে আছে। এইদিন তিনি নিমতলা স্ট্রীটে প্রিয়নাথ সেনের বাড়ি যান। পরের দিন যান সুকিয়া স্ট্রীটে। ২৭ কার্তিক নিমতলা স্ট্রীট ও 'হেদুয়াতলা', ২৮ সুকিয়া স্ট্রীট, ২৯ নিমতলা স্ট্রীট, ৩০ সুকিয়া স্ট্রীট—এই হল তাঁর কার্তিক মাসের অবশিষ্ট দিনগুলির ভ্রমণ-সূচীর ক্যাশবহি-প্রদত্ত বিবরণ।

কার্তিক মাসের ভারতী-তে রবীন্দ্রনাথের দু'টি রচনা মুদ্রিত হয়:

৬২০-২৪ 'মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গলা শিক্ষা'

৬৪৭-৬৪ 'চিরকুমার সভা' ৭ম পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪। ২৭৬-৮৮ [অষ্টম পরিচ্ছেদ]

'গত বৎসর মুসলমান শিক্ষাসম্মিলন উপলক্ষ্যে খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ্ নবাবআলি চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি উর্দ্দু প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহারই ইংরেজী অনুবাদ ['Vernacular Education in Bengal'] সমালোচনার্থে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে' —এই মন্তব্য-সহ উক্ত ভাষণের সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ 'মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গলা শিক্ষা' প্রবন্ধটিতে। রচনাটিতে চিন্তার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু এটি এখনও গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

বাংলার অনেক অঞ্চলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক হলেও স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশেষরূপে হিন্দুছাত্রদের পাঠোপযোগী করে রচিত হয়, বক্তার এই অভিযোগ সম্বন্ধে সহানুভূতি জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ এর কারণ নির্দেশ করে লিখেছেন: 'এতদিন বিদ্যালয়ে হিন্দুছাত্র সংখ্যাই অধিক ছিল এবং মুসলমান লেখকগণ বিশুদ্ধ বাঙ্গলা সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন নাই।' কিন্তু যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, তখন মুসলমান বালকদের উপযোগী করে তাদের 'স্বধর্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতীয়ের সাধুদৃষ্টান্ত' পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক একথা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ এইসব বিষয় হিন্দুছাত্রদের জন্যও সুপারিশ করেছেন। তাঁর যুক্তি হল:

> বাঙ্গলা দেশে হিন্দুমুসলমান যখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখদুঃখ নানাসূত্রে বিজড়িত, একের গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্যকে যখন জল আনিতে ছুটাছুটি করিতে হয়, তখন শিশুকাল হইতে সকল বিষয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস, এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দুর শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা তাহারা কেহই আপন জীবনের কর্ত্তব্য ভাল করিয়া পালন করিতে পারিবে না।

কিন্তু ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষার দৌলতে বহুদূরদেশী ইংরেজের ইতিহাস সমাজতত্ত্ব আচারবিচার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মালেও, যে স্বদেশীয় মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের বহুদিন থেকে রীতিনীতি পরিচ্ছদ ভাষা ও শিল্পের আদানপ্রদান চলে আসছে সেই আত্মীয়-প্রতিবেশীর সম্বন্ধে অজ্ঞতা দুঃখজনক: 'বাঙ্গালী মুসলমানের সহিত বাঙ্গালী হিন্দুর রক্তের সম্বন্ধ আছে, এ কথা আমরা যেন কখন না ভুলি।'

তাছাড়া বাংলা পাঠ্যপুস্তকে মুসলমান শাস্ত্র ও ইতিহাসের যে বিকৃত বিবরণ সম্পর্কে সৈয়দসাহেব অভিযোগ করেছেন, সেগুলি ইংরেজ-প্রণীত গ্রন্থেরই প্রতিধ্বনি। পরীক্ষা দিতে গেলে ইংরেজ লেখকদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কারকে শিরোধার্য করতেই হয়, নইলে নম্বর জোটে না। আর গবেষণার দ্বারা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি যাঁরা সত্য ইতিহাস উদঘাটন করছেন, তাঁদের রচিত গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে মনোনীত হবার সম্ভাবনা নেই। তবু রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ও মুসলমান লেখকদের ইতিহাসের সংস্কারব্রত গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, বিশেষত ইতিহাসের অনেক উপকরণ ফারসি বা উর্দ্দু ভাষায় আবদ্ধ যা উদ্ধার করার জন্য মুসলমান লেখকদের সহায়তা অত্যাবশ্যক।

সৈয়দসাহেব তাঁর গ্রন্থে বাংলা সাহিত্য থেকে মুসলমান-বিদ্বেষের যে উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের মতে, তা 'অনাবশ্যক ও অসঙ্গত'। বস্তুত সাহিত্য থেকে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব—ইংরেজ ঔপন্যাসিক থ্যাকারের গ্রন্থে পদে পদে ফরাসীবিদ্বেষ দেখা যায়, 'কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যপ্রিয়

ফরাসীপাঠক থ্যাকারের গ্রন্থকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন না।' তাই বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে মুসলমানবিদ্বেষের পরিচয় পেলে দুঃখিত হতে হয়, কিন্তু এরূপ হওয়া প্রায় অনিবার্য: 'বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দার্হ তাহা সমালোচক কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হউক, কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোন সাহিত্যকে রক্ষা করা অসাধ্য। মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গসাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দুপাঠকদিগকে কোনরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।'

৯ অগ্র° [শনি 24 Nov] পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ছিলেন, ক্যাশবহিতে তাঁর যাতায়াতের হিসাব থেকে তা জানা যায়। ১ ও ২ অগ্র° দু'দিনই তিনি যান সুকিয়া স্ট্রীট ও নিমতলা স্ট্রীটে। এছাড়া ৭ অগ্র° [বৃহ 22 Nov] তিনি সুকিয়া স্ট্রীটে ও ৯ অগ্র° নিমতলা স্ট্রীটে যান। নিমতলা স্ট্রীটের কাছে ৮ মথুর সেন'স্ গার্ডেন লেনে ছিল প্রিয়নাথ সেনের বাড়ি, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নিমতলা স্ট্রীটে যাতায়াতের উদ্দেশ্য বোঝা শক্ত নয়। ২১।২ নং সুকিয়া স্ট্রীটে [সম্ভবত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আশ্রয়ে] এইসময় শিল্পী শশীকুমার হেশ সস্ত্রীক বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যই ঘন ঘন সুকিয়া স্ট্রীটে গিয়েছেন। শশীকুমার ইতিপূর্বেই [May 1900][১০০] মহর্ষির একটি তৈলচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। বর্তমানে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি তৈলচিত্র অঙ্কন করছেন, যার পারিশ্রমিক দেওয়ার সংবাদ আছে ২ পৌষ [সোম 17 Dec] তারিখে ক্যাশবহির হিসাবে: 'ব° শশীকুমার হেস দং শ্রীযুক্ত বড় বাবু মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তী তৈয়ারীর মূল্য শোধ ৫০০্'। শশীকুমার রবীন্দ্রনাথেরও একটি তৈলচিত্র প্রস্তুত করেন।

রবীন্দ্রনাথ ২ অগ্র° [শনি 17 Nov] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই দিন অন্যান্যদের সঙ্গে শশীকুমার হেশ ও মোহিতচন্দ্র সেনকে [1870-1906] পরিষদের সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। মোহিতচন্দ্রের এই সময়ের ঠিকানা ১২।১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, শশীকুমারের ঠিকানাটিও আমরা পরিষদের কার্যবিবরণ থেকে লাভ করেছি।

৩ অগ্র° [রবি 18 Nov] রবীন্দ্রনাথ যান সংগীত সমাজে। ত্রিপুরার মহারাজার সংবর্ধনার জন্য ভারত সংগীতসমাজ ১ পৌষ [রবি 16 Dec] 'বিসর্জন' অভিনয়ের আয়োজন করে। তার প্রাথমিক প্রস্তুতি এই সময়ে আরম্ভ হয়েছে।

ত্রিপুরার মহারাজা শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই উপলক্ষে ৪৩৬ ́০ ব্যয়ের হিসাব ৪ অগ্র° সরকারী ক্যাশবহিতে লিখিত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর যাওয়া হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ৫ ও ৬ অগ্র° তাঁর বাড়ি যাতায়াত করেছেন। জগদীশচন্দ্রের 2 Nov [শুক্র ১৭ কার্তিক] তারিখে লিখিত পত্র তিনি এই সময়ে পেয়েছেন। এই পত্রে ইংলণ্ডে তাঁর কাজের অগ্রগতির বর্ণনা করে জগদীশচন্দ্র লিখেছেন:

> আমার নিজের আশা ও দুরাশা অনেক কাল পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তোমাদের স্নেহের প্রতিদান করিতে আমি অসমর্থ। আমি অনেক সময়ে একেবারে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি, কিন্তু তোমাদের জন্য আমি বিশ্রাম করিতে পারি না। তোমরা আমাকে এরূপ বাঁধিয়াছ। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসনপরিহিতা মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতে পাই।[১০১]

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার অন্তরালে এই স্বদেশপ্রীতিই রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করত বেশি। এই পত্রে তারই পরিচয় পেয়ে ৫ অগ্র° [মঙ্গল 20 Nov] তিনি লিখেছেন:

এক এক সময় সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে হৃদয় অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, কাজ করবার শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ করে এলে কর্ত্তব্যের গৌরব পুনর্ব্বার নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারি—সংসারের সমস্ত জটিল বাধা তুচ্ছ করবার মত বল মনের মধ্যে সঞ্চয় করি। তোমার চিঠিতেও আজ অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও আমার সংসারবন্ধন লঘু হল।[১০২]

জগদীশচন্দ্রের চিঠি রবীন্দ্রনাথ এইদিনই ত্রিপুরার মহারাজকে পড়ে শোনান। বিদেশে অধিককাল অবস্থান করতে পারলে গবেষণার সুবিধা হয়, এমন কথা জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন। এই নিয়ে নিশ্চয়ই ত্রিপুরারাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা হয়েছিল। তাই এ-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পূরিয়ে দিতে না পারি তা হলে আমাদের ধিক্। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি—সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুরূহ হবে তা আমি মনে করি নে।

জগদীশচন্দ্র সরকারী চাকরির নিশ্চয়তা ত্যাগ করতে চান নি—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরারাজের মাধ্যমে তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করে গিয়েছিলেন।

নৈবেদ্য গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান রবীন্দ্রনাথ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে লিখতে শুরু করেন, একথা আমরা আগেই বলেছি। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নি, মুদ্রিত গ্রন্থেও রচনাকাল অনুল্লেখিত—সুতরাং বর্তমান সময়ে কতগুলি কবিতা লেখা হয়েছিল বলা শক্ত। প্রিয়নাথ সেনকে রবীন্দ্রনাথ 27 Feb 1901 [বুধ ১৬ ফাল্গুন] তারিখে জানিয়েছেন: 'গোলমালের মধ্যেও গোটা ৯০ নৈবেদ্য লিখেচি'[১০৩]; ৫ চৈত্র [সোম 18 Mar] তাঁকে লিখেছেন: 'আমার নৈবেদ্য ১০০ পেরিয়ে গেছে। ওদিকে আদি সমাজ প্রেসে ছাপাও আরম্ভ হয়েছে। ভেবেছিলুম ৫০টার বেশি হবে না—হতে হতে জম্‌তে জম্‌তে দ্বিসংখ্যক অঙ্ক থেকে ত্রিসংখ্যক অঙ্কে এসে পৌঁচেছি।'[১০৪] নৈবেদ্য-রচনার প্রেরণাটি তিনি জগদীশচন্দ্রকে ব্যাখ্যা করেছেন উল্লিখিত পত্রে:

আমি আজকাল নানা গোলমালের মধ্যে "নৈবেদ্য" বলে এক একটি কবিতা প্রত্যহ আমার কোন এক অবসরে লিখে ফেলে আমার অন্তর্য্যামীকে নিবেদন করে দিই। আমার জীবনের সমস্ত কৃত কর্ম্মের সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখ-সুখের কেন্দ্রস্থলে যিনি ধ্রুব নিশ্চলভাবে বিরাজ করচেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত অনুপরমাণু সমস্ত বিরাট জগৎমণ্ডলের যিনি একটিমাত্র ঐক্যস্থল—তাঁর কাছে নির্জ্জনে গোপনে প্রত্যহ জীবনের একটি একটি দিন সমর্পণ করে দিচ্চি। সে দিনগুলিকে যদি কর্ম্মের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অন্তত তাতে পত্রপুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমুদ্রের উদ্দেশ্যে ভাসিয়ে দিয়েও সুখ আছে।[১০৫]

নৈবেদ্য কাব্যের প্রথম একুশটি রচনাই হল গান—তার মধ্যে অবশ্য ছ'টিতে সুরারোপ করা হয় নি, কিংবা সুর দিলেও সেগুলি সংরক্ষিত হয় নি। ১০০-সংখ্যক শেষ রচনাটিও একটি গান—এছাড়া বাকি ৭৮টি কবিতা চতুর্দশপদী। এগুলি বিচিত্র বিষয়ের ও স্বাদের কবিতা। মণ্ডনকলা-বিবর্জিত সংহত চতুর্দশপদীর আকার নেওয়ায় এগুলির বক্তব্য সরাসরি পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। প্রায় প্রতিদিন একটি করে সনেট লিখিত হওয়ায় কয়েকটিতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উল্লেখও দুর্লভ নয়। আর এই কারণেই মধ্যাহ্নে নগরের উচ্ছলিত কর্মবন্যা [২২ নং], বন্ধুজন-সনে হাস্যে পরিহাসে অর্ধরাত্রি যাপন [৩৫ নং], জনশূন্য ক্ষেত্র-মাঝে ব্যাপ্ত হেমন্তের শান্তি [২৩ নং], বাংলার দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে বিরাজিত উদার শান্তির প্রতি ভালোবাসা [৭৩ নং] স্বচ্ছন্দে কিছু-কিছু কবিতার ভাব-দেহ রচনা করেছে। এমনও হতে পারে, নীতীন্দ্রনাথের কঠিন পীড়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর' [নৈবেদ্য ৮। ২০-২১, ১৭ নং] গানটি রচনা করেছিলেন।

আর পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর্লীন স্বার্থলোভ বা মনুষ্যত্বমর্যাদাগর্বহীন নিরর্থ আচারে কর্মকে পঙ্গু করা শাস্ত্রকারাগারে বদ্ধ দেশীয়দের প্রতি যে ধিক্কার তাঁর অনেক গদ্য-প্রবন্ধের বিষয় তা অবধারিতভাবে এই সনেটগুলিতেও ধ্বনিত হয়েছে। দেশ ও বিদেশের বর্তমান সংকটের সমাধান তিনি খুঁজেছেন প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক আদর্শের মধ্যে। প্রাচীন ভারতের প্রতি তাঁর মোহমুগ্ধ আকর্ষণের কাব্যরূপ চৈতালি-র সনেটের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন ভারতের যে রূপ সেখানে প্রকাশিত হয়, তা কালিদাসের কাব্য-নাটকের ভাবকল্পনায় অনুরঞ্জিত। নৈবেদ্য-এর কবিতায় সেই প্রাচীন ভারত প্রধানত উপনিষদের ভাবাবহকে আশ্রয় করেছে। পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেই রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ উপাসনাই বেদ ও উপনিষদের মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যামাত্র। কিছু দিন ধরেই রবীন্দ্রনাথ কোনো-কোনো উপাসনায় ভাষণ দেওয়ার দায়িত্ব লাভ করছিলেন। সেই 'ব্রহ্মৌপনিষদ' বা 'ব্রহ্মমন্ত্র' নামে প্রকাশিত ভাষণগুলি উপনিষদের মন্ত্র ও রবীন্দ্র কল্পনায় ঔপনিষদিক ভারতবর্ষের আদর্শকে প্রচার করার চেষ্টা করেছে। নৈবেদ্য-এর অনেকগুলি সনেট বস্তুত উপনিষদের শ্লোকের বাংলা কাব্যানুবাদ বা সেই আদর্শের কাব্যরূপ।

সেইজন্যই এই কাব্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> তিনি [মহর্ষি] যখন শুনলেন বাবা ভক্তিরসাশ্রিত অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন, একদিন বাবাকে ডেকে সেগুলি তাঁকে পড়ে শোনাতে বললেন। একটির পর একটি কবিতা বাবা পড়ে চললেন, আর মহর্ষি নিবিষ্ট হয়ে শুনতে লাগলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পড়া শেষ হয়ে গেলে বাবা যখন নৈবেদ্য থেকে একটি ভক্তিরসাশ্রিত গান গাইলেন, মহর্ষির চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। কবিতাগুলি পুস্তক-আকারে প্রকাশ করার জন্য তিনি তখনই বাবার হাতে টাকা তুলে দিলেন; সেই কবিতাগুলি একত্রে 'নৈবেদ্য' নামে বই হয়ে প্রকাশিত হয়।[১০৫ক]

সম্ভবত এই কারণেই নৈবেদ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কিঞ্চিৎ বিলাসিতা পরিলক্ষিত হয়। দামী মোটা কাগজে বইটি ছাপা, যথেষ্ট ফাঁক রেখে কবিতাগুলি মুদ্রিত—এমন কি, সনেটগুলিও দুই ভাগে বিভক্ত করে একটি সনেট দু'টি পৃষ্ঠাতে ছাপা হয়েছে। ক্ষণিকা ছাড়া এই পর্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অন্য গ্রন্থগুলিতে এ পরিমাণ বিলাসিতা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন 'পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে'।

৭ অগ্র° [বৃহ 22 Nov] রবীন্দ্রনাথ সুকিয়া স্ট্রীটে যান, ৯ অগ্র° যান নিমতলা স্ট্রীটে প্রিয়নাথ সেনের বাড়ি। এরপর ২৪ অগ্র° [রবি 9 Dec] পর্যন্ত ক্যাশবহিতে তাঁর যাতায়াত সংক্রান্ত কোনো হিসাবাদি না থাকায় মনে হয়, এই সময়ে তিনি শিলাইদহে অবস্থান করছিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসের ভারতী [২৪। ৮]-তে চিরকুমার সভা-র কিস্তি মুদ্রিত হয় নি; পরিবর্তে ৬৭৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় 'গান' 'তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে' [দ্র গীত ১। ৪৭-৪৮, নৈবেদ্য ৮। ৯-১০; স্বর ৪]। তাছাড়া 'ভারতীর জনৈক গ্রাহকের অনুরোধে' 'সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল' [দ্র গীত ১। ২১২; স্বর ২৩] গানটির সরলা দেবী-কৃত স্বরলিপি মুদ্রিত হয় পৃ ৭৩০-৩১]।

২৫ অগ্র° [সোম 10 Dec] রবীন্দ্রনাথকে আবার কলকাতায় দেখা যায়। এই দিন তিনি ত্রিপুরার মহারাজের বাড়ি যান, প্রিয়নাথ সেনের বাড়ি ও সংগীতসমাজে যাওয়ার হিসাবও ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। তাঁর ত্রিপুরার মহারাজের বাড়ি যাওয়ার আরও হিসাব আছে ২৮ ও ২৯ অগ্রহায়ণে। ২৬ অগ্র° সুকিয়া স্ট্রীটে,

২৭ অগ্র° 'গ্যাঁড়াতলা' ও ২৯ অগ্র° রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি যাওয়ার কথাও আমরা ক্যাশবহি থেকে জানতে পারি।

এবারে তাঁর কলকাতায় আসার উপলক্ষ ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সংবর্ধনার জন্য ভারত সংগীতসমাজের উদ্যোগে বিসর্জন নাটকের অভিনয়। এই অভিনয়ে তিনি রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সংবাদ তিনি জগদীশচন্দ্রকে জানিয়েছেন 12 Dec [বুধ ২৭ অগ্র°] তারিখে লেখা পত্রে:

পীড়িত ছিলাম বলিয়া কিছুদিন পত্র বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ঘুরপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রঘুপতি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীতসমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি।[১০৬]

পত্রের শেষে লিখেছেন: 'বিসর্জ্জন নাটকের রিহার্সাল আমাকে তাগিদ করিতেছে—অতএব বিদায়।'

১ পৌষ [রবি 16 Dec] সংগীতসমাজে বিসর্জন-এর অভিনয় হয়। এইদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবীকে লেখেন:

কাল [৩০ অগ্র° শনি 15 Dec] নগেন্দ্রকে [শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী] প্রিয়বাবু নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেই-সঙ্গে আমাদেরও ছিল। কাল প্রায় ১টা থেকে রাত্রি সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত রিহার্সাল ছিল, তার পরে প্রিয়বাবুর ওখানে গিয়ে নিমন্ত্রণ খেয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি আস্‌তে হল।···আজ বিকালে আমাদের অভিনয়।'[১০৭]

অনুষ্ঠানটির একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্র-ভক্ত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী [1878-1948]-র স্মৃতিকথায়। ছাত্রজীবন থেকে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সভায় যোগদান করলেও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই তাঁর সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়। তিনি লিখেছেন: 'ঐ উদ্যোগপর্ব্বের আয়োজনকালে একদিন অপরাহ্নে প্রেক্ষাগৃহে বসিয়া রঙ্গমঞ্চের 'সীন' খাটানো দেখিতেছি, এমন সময় কবির প্রিয় ভক্ত ও অন্তরঙ্গ আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রেমতোষ বসু মহাশয় সহসা তথায় কবির সহিত আগমন করিলেন এবং আমারই কিয়দ্দূরে আসন গ্রহণ করিলেন। আমার মনোগত অভিলাষের কথা প্রেমতোষ বাবুর অজ্ঞাত ছিল না। তিনি কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া তাঁহার বন্ধু বলিয়াই কবির সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন।'···[রবীন্দ্রনাথ] কথাবার্ত্তা-শেষে আমাকে তাঁর গৃহে একদিন সাক্ষাৎ করিবার আদেশ দিলেন।'[১০৮] রবীন্দ্র-বিরোধীদের সঙ্গে সংগ্রামে যতীন্দ্রমোহন পরে গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

অনুষ্ঠানটির বর্ণনা দিয়ে যতীন্দ্রমোহন লিখেছেন:

মহারাজের শুভাগমন দিনে যথাবিধি অভিনন্দনান্তে প্রথমেই কবি-রচিত নিম্নলিখিত গানখানি মহারাজের অভ্যর্থনা উদ্দেশ্যে গীত হইল।
রাজ-অধিরাজ তব ভালে জয়মালা।:-[দ্র গীত ৩। ৭৮৪; স্বর ৬২]
ইহার পর মহারাজ তাঁহার পদোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত সুযোগ্য ভাব ও ভাষায় অভিনন্দনের যথোচিত উত্তর দিলেন।
তৎপরেই বিসর্জ্জনের অভিনয়। সে আমার জীবনের এক অপূর্ব্ব উন্মাদনী অভিজ্ঞতা। কবির রঘুপতি [চরিত্রে] অভিনয় দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেলাম। সেই প্রিয়-দর্শন সুকুমার-তনু রবীন্দ্রনাথ রুক্ষ কঠিন রঘুপতিরূপে রূপান্তরিত। রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্রে দেহ বিমণ্ডিত, কুঞ্চিত কেশদাম ললাটোর্ধ্বে চূড়াকারে সংবদ্ধ, কপালে ত্রিপুণ্ডক ও রক্তচন্দনের ফোঁটা। আয়ত উজ্জ্বল নেত্রদ্বয়, পৌরুষব্যঞ্জক সুকঠোর দৃঢ়সংকল্পসিদ্ধির তেজে উজ্জ্বল দেখাইতেছে—সে এক অপূর্ব অলৌকিক মূর্ত্তি।[১০৯]

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

তিনি "রঘুপতি"র অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। তাঁহার অভিনয় সঙ্গী কুশীলব ছিলেন "জয়সিংহে"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র [বসু] মল্লিক। ...অটলবাবু [অটলকুমার সেন] ও বেণীবাবু [বেণীমাধব দত্ত], রাজা ও সেনাপতি [নয়নরায়] সাজিয়াছিলেন, আর ইঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ সভ্য, রায় পশুপতিনাথ বসুর পুত্র শ্রীমান অমরনাথ বসু "নক্ষত্র রায়ে"র ভূমিকায় গুণপনা দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।[১১০]

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন: "তিনি 'বিসর্জ্জনে রঘুপতির অভিনয়কালে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, খাঁড়া ব্যবহারকালে তাহা যে সত্য সত্যই তীক্ষ্ণধার তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন; অভিনেতাদিগের মধ্যে আর একজন তাঁহার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ধ্রুবকে (অশ্বিনী) তাড়াতাড়ি সরাইয়া না লইলে হয়ত একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিত।"[১১০ক]

অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন—মন্ত্রী: অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ, চাঁদপাল: ভূতনাথ মিত্র, গুণবতী: মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। অভিনয়-পত্রীতে পূর্বোক্ত বন্দনাগীতিটি ছাড়া 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে' [দ্র গীত ৩। ৭৮৪] ও 'থাকতে আর তো পারলি নে মা' [দ্র ঐ ৩। ৭৮৪] গান-দু'টি মুদ্রিত হয় [দ্র ঐ, গ্রন্থপরিচয় ৩। ৯৮৬]।

রবীন্দ্রজীবনী-কার লিখেছেন: 'অভিনয় হইল পার্ক স্ট্রীটস্থ সত্যেন্দ্রনাথের প্রাসাদোপম গৃহে।'[১১১] কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ পার্ক স্ট্রীটের ভাড়াবাড়ি ত্যাগ করে অনেক আগেই বালিগঞ্জে 1 Rainey Park-এর বাড়িতে উঠে গেছেন। বস্তুত অমৃতলাল গুপ্ত-লিখিত 'পরিবারস্থ যুবকদিগকে লইয়া' বিসর্জন অভিনয়ের যে বর্ণনা তিনি উদ্ধৃত করেছেন, সেটি 1890-তে বিসর্জন-এর প্রথম অভিনয়-সম্পর্কিত, যাতে ত্রিপুরা- রাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য উপস্থিত ছিলেন।

সংগীতসমাজের উদ্যোগে বিসর্জন দ্বিতীয়বার অভিনীত হয় ১২ পৌষ [বৃহ 27 Dec]। মজুমদার লাইব্রেরির অন্যতম কর্মকর্তা সুবোধচন্দ্র মজুমদার ভ্রাতুষ্পুত্র শৈলেশচন্দ্রকে 28 Dec তারিখে লিখেছেন: 'কাল সঙ্গীত সমাজে আবার "বিসর্জন" অভিনয় হইয়াছিল অতি চমৎকার ব্যাপার। টিকিট পাই নাই। একরকম করিয়া গিয়াছিলাম।'[১১২] রবীন্দ্রজীবনী-কার কোনো প্রমাণ ছাড়াই অভিনয়টি মাঘমাসে পুনরভিনীত হয় বলে মন্তব্য করেছেন, সংবাদপত্রাদিতে এ-সম্পর্কে কোনো খবর আমাদের নজরে পড়ে নি, ফলে তারিখটি নির্ধারণ করা শক্ত ছিল; সুমিত মজুমদার 'রবীন্দ্রনাথ, একটি প্রকাশন সংস্থা এবং' [দ্র প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩। ২৫-৩২] প্রবন্ধে উক্ত পত্রটি উদ্ধৃত করে এই গ্রন্থি মোচন করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই অভিনয়ের উল্লেখ করে 1 Jan 1901 [মঙ্গল ১৭ পৌষ] রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন: 'সঙ্গীত সমাজে বিসর্জ্জনের প্রথম অভিনয় দেখিয়া বিস্ময় ও তৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছিলাম; শরীরের অসুস্থতায় সমাজের দ্বিতীয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি নাই।'[১১৩] এই পত্র থেকেও উল্লিখিত তারিখটির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

উক্ত পত্রে সুবোধচন্দ্র আরও লিখেছেন: '...শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর "সংস্কৃত-পাঠ" আমাদের ছাপাইবার ভার দিয়াছেন।···এখন ৫/৬...ফর্মা হইবে। ছাপাইতে আরম্ভ করা সম্বন্ধে আপনার মতের অপেক্ষায়—এখন প্রেসে দেওয়া হয় নাই। পত্রপাঠ এ বিষয় অনুমতি দিবেন। রবিবাবু বোধ হয় এখনও ৪/৫ দিন এখানে আছেন।'[১১৪] এটি 'সংস্কৃত শিক্ষা'-এর কোন্ ভাগ তার উল্লেখ নেই। আমরা জানি, ইতিপূর্বেই গ্রন্থটির চারটি ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল।

বিসর্জন নাটকের রিহার্সাল অভিনয় ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ততা ছাড়া নীতীন্দ্রনাথের অসুখ নিয়েও রবীন্দ্রনাথকে বিব্রত থাকতে হয়েছে। ১ পৌষ তিনি মৃণালিনী দেবীকে লিখেছেন: 'নীতু কাল রাত্রে ঘুমিয়েছে। তার লিভারের বেদনা প্রায় গেছে। জ্বর আজ ১০০°র কাছাকাছি আছে। লিভারটা পরীক্ষা করে ডাক্তার বল্‌চেন অনেক কমেচে।'[১১৫] পরের দিনের চিঠি: 'আজ নীতু ভাল আছে। অল্প জ্বর আছে—প্রতাপবাবু বলেন অমাবস্যাটা গেলে সেটা ছেড়ে যেতেও পারে। জ্বরটা গেলেই তাঁর মতে বিলম্ব না করে মধুপুরে পাঠিয়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

তাই ঠিক করেছি।'[১১৬] বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপ মজুমদার তাঁর চিকিৎসা করছিলেন, সরকারী ক্যাশবহিতে আছে: 'শ্রীযুক্ত নীতীন্দ্র বাবুর পীড়া হওয়ায় প্রতাপ মজুমদার ডাক্তারের ২৭ অগ্র° আসিবার গাড়ীভাড়া'। সরলা রায়কে একটি তারিখ-হীন [? ২৯ অগ্র°: 14 Dec] পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:

নীতুর অসুখ লইয়া পুনর্ব্বার কাল প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আজ প্রাতঃকালে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় আছি। রাত্রে আবার আশুর নিমন্ত্রণে সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে—আজ মধ্যাহ্নে যদি না যাইতে পারি মাপ করিবেন—রাত্রের ঋণ দিনে পরিশোধ না করিলে আজ সন্ধ্যার সময় সভ্যসমাজে দর্শন দিবার যোগ্যতা থাকিবেনা।[১১৭]

শনি অথবা সোমবারে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি একই কারণে তা রক্ষা করতে পারেন নি। কলকাতায় এলে কত বিচিত্র ধরনের সামাজিকতার দায় তাঁকে বহন করতে হত পত্রটিতে তার আভাস রয়েছে।

শান্তিনিকেতনে ৭ পৌষ [শনি 22 Dec] দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের একটি উপদেশ পাঠ করার কথা ছিল। কিন্তু নানা গোলমালে লেখা হচ্ছে না সেকথা 17 Dec [সোম ২ পৌষ] স্ত্রীকে জানিয়েছেন: 'আজ সমস্ত সকাল ধরে লোকসমাগম হয়েছিল—ভেবেছিলুম ৭ই পৌষের লেখাটা লিখ্‌ব তা আর লিখ্‌তে দিলে না। সকালে নাবার ঘরে দুটো নৈবেদ্য লিখ্‌তে পেরেছিলুম।'[১১৮] 20 Dec [বৃহ ৫ পৌষ]ও লেখাটি সমাপ্ত হয় নি: '৭ই পৌষের লেখাটা নানা বাধার মধ্যে লিখ্‌চি এখনো শেষ হয় নি।'[১১৯] পরের দিন তিনি লিখেছেন: 'আজ বোলপুর যেতে হবে। বাবামশায়কে আমার লেখা শোনালুম তিনি দুই একটা জায়গা বাড়াতে বল্লেন—এখনি তাই বস্‌তে হবে—আর ঘণ্টাখানেকমাত্র সময় আছে।'[১২০]

উক্ত রচনাটি 'ব্রহ্ম মন্ত্র' নামে মুদ্রিত হয়ে ৮ মাঘ ১৩০৭ [সোম 21 Jan 1901] পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় [দ্র অ-২। ১৮১-৯৪]। এই রচনাটিই রবীন্দ্রনাথ ১১ মাঘ [বৃহ 24 Jan] একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় পাঠ করেন। উল্লেখ্য, 'শান্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব' -শীর্ষক প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রচনাটি ইতিপূর্বেই তত্ত্ববোধিনী-র মাঘ-সংখ্যায় [পৃ ১৫৪-৬৩] মুদ্রিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে নবম ও দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে পঠিত দু'টি উপদেশ একত্রিত হয়ে শ্রাবণ ১৩০৮-এ 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' নামে প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন ৬ পৌষ [শুক্র 21 Dec] বিকেলে। ৭ পৌষ [শনি 22 Dec] প্রাতঃকালীন উপাসনায় রবীন্দ্রনাথকে কোনো ভূমিকায় দেখা যায় না। সায়ংকালে মন্দিরে আলোকসমূহ প্রজ্বলিত হলে 'অনন্তর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়িকে সঙ্গে লইয়া বেদি গ্রহণ করিলেন। সর্ব্ব প্রথম সঙ্গীত হইল।' চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন-ভাষণ দেওয়ার 'পরে সাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।' আমরা আগেই বলেছি, উপদেশটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র মাঘ সংখ্যায় [পৃ ১৫৪-৬৩] ও 'ব্রহ্ম মন্ত্র' নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। শম্ভুনাথ গড়গড়ির প্রার্থনা ও সংগীত হয়ে উপাসনা সমাপ্ত হয়। মেলা, বহ্ন্যুৎসব ইত্যাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ পরদিন ৮ পৌষেই কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন, সম্ভবত সকালবেলায়। এই দিনই তিনি নিমতলা স্ট্রীটে ও বালিগঞ্জে যান। ৯ পৌষ যান সুকিয়া স্ট্রীট, জোড়াগির্জা ও ঠন্‌ঠনে মোহিনীমোহন

চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। পুনরায় তিনি নিমতলা স্ট্রীটে প্রিয়নাথ সেনের বাড়ি যান ১২, ১৪ ও ১৫ পৌষে। বন্ধুত্বের আকর্ষণ ছাড়া অন্য প্রয়োজনও যে ছিল, তা জানা যায় 30 Dec [রবি ১৫ পৌষ] তারিখে লেখা এই খসড়া দলিলটিতে:

Panchanan Banerji/&/Judah Esq

Dear Sirs,

I hereby authorize you to raise a loan of Rs. 20,000/- on the joint Promissory note of myself and Babu Surendranath Tagore repayable with interest at the rate of 9% per cent per annum by 4 yearly instalments of Rs. 5000/- each and I agree to pay you Rs. 1200/- as brokerage for negotiating the loan, but I shall not pay any other costs save & except the cost of the necessary stamps, nor will you be entitled to get the brokerage of any portion thereof, if on any account after you shall have negotiated the loan, the transaction falls thro.

Yours faithfully

Rabindranath Tagore[১২১]

Dec, 30
1900

—পত্রটির ভাষা দেখেই বোঝা যায়, এটি প্রিয়নাথেরই মুসাবিদা। রবীন্দ্রনাথ ঘন ঘন তাঁর বাড়ি যাচ্ছিলেন প্রধানত এই কারণেই। টাকা ধার করা নিয়ে প্রিয়নাথের বাড়ি যাতায়াত বা পত্রে তাঁকে তাগিদ দেওয়ার কাজ রবীন্দ্রনাথকে আরও অনেকদিন চালিয়ে যেতে হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র 30 Nov [শুক্র ১৫ অগ্র°] একটিপত্রে Society of Artsএ 'ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চা আধুনিক ব্যাপার নহে' বিষয়ে বক্তৃতা করার জন্য জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠানোর জন্য লিখেছিলেন। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন:'আমাকে তুমি কি এক দিগ্‌গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ?'[১২২] পত্রটিতে তারিখ নেই, কিন্তু সম্ভবত ১২ পৌষ [বৃহ 27 Dec] এটি প্রেরিত হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ক্যাশবহিতে এইদিন 'জে সী বসুর নিকট বিলাতে ১ পত্র। ৬' হিসাব আছে। ইংলণ্ডে চিঠি পাঠাতে তখন এক আনার ডাকটিকিট লাগত, বাকি মাশুল লেগেছে দ্বিজেন্দ্রনাথের গণিতগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রেজিষ্ট্রি করে পাঠাতে। দ্বিজেন্দ্রনাথের গণিত-প্রতিভা এদেশের মাপকাঠিতে অসামান্য ছিল, কিন্তু তার পরিমাপ ও প্রচার যথেষ্ট হয় নি। সম্প্রতি ড দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর: গণিতের উপেক্ষিত প্রতিভা' [দ্র দেশ, শারদীয় ১৩৯৪। ৪৩-৫৪] প্রবন্ধে এ-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

১৫ পৌষের [রবি 30 Dec] পর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ফিরে যান। নিশ্চিত করে বলা যায় না, হয়তো 31 Dec 1900 [সোম ১৬ পৌষ] শিলাইদহে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সূর্যাস্ত দেখে তিনি নৈবেদ্য-এর ৬৪-সংখ্যক 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে অস্ত গেল' কবিতাটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আফ্রিকার মূল্যবান খনিজ-সমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চল ও চীনের ঐশ্বর্যের বাঁটোয়ারা নিয়ে য়ুরোপীয় জাতিদ্বন্দ্বের স্বরূপ তাঁর কাছে গোপন ছিল না। তাই বুয়র-যুদ্ধে ইংরেজের সহায়তার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যারিস্টার মোহনদাস গান্ধী যখন সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবকের ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন করে রাজভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ কাইজার-ই-হিন্দ্‌ পদক লাভ করছেন, কলকাতার গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ টাউন হলে সভা ডেকে ব্রিটিশের যুদ্ধ-তহবিলে হাজার হাজার টাকা দান করছেন—রবীন্দ্রনাথ তখন তাকে ধিক্কার দিয়ে লিখেছেন:

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি-মাঝে দারুণ আঘাত
বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কালঝঞ্ঝাঝংকারিত দুর্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।[১২৩]

ভারতী, পৌষ ১৩০৭ [২৪। ৯]:

৮২০-৩৮ 'চিরকুমার সভা' অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪। ২৮৮-৩০১ [নবম]

উৎসাহ, পৌষ-মাঘ ১৩০৭

৮১ 'গৃহলক্ষ্মী' ['যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে, হে নারি,'] দ্র উৎসর্গ ১০। ৪৭-৪৮

সনেটটির পরে কাব্যগ্রন্থ [১৩১০] দ্বিতীয় ভাগ প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত 'নারী' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পৌষ মাসের বাকি দিনগুলি শিলাইদহে কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসেন মাঘের প্রথমে—৩ মাঘ [বুধ 16 Jan] তাঁকে শিলাইদহ ও ত্রিপুরায় দু'টি পত্র প্রেরণ করতে দেখা যায়। ৪ মাঘ তিনি যান নাটোরের মহারাজার বাড়ি ও সংগীতসমাজে। সম্ভবত ৫ মাঘ [শুক্র 18 Jan] তিনি মৃণালিনী দেবীকে লিখেছেন:

কাল যখন বাড়ি ফিরে এলুম তখন ঢংঢং করে দুপুর বেজে গেল। সকালে গান শেখাবার কাজ সেরে খেয়ে দেয়ে নাটোরের বাড়িতে যাওয়া গেল—অমলার সন্ধানে। দেখি হেশ নাটোরের ছবি আঁকচে—রাণীর ছবিও খানিকটা আঁকা পড়ে আছে। অমলার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করা গেল—অমলা বল্লে যখন হাতে পেয়েছি তখন ছাড়ব কেন, আমাদের বাড়িতে যাবেন সেখানে গান সম্বন্ধে আলোচনা হবে। আজ তিনটের সময় তাদের সেই বির্জ্জিতলার বাড়িতে গিয়ে মিষ্টান্ন ভোজন ও মিষ্ট কথার আলোচনা করতে হবে। ওখান থেকে সরলার সন্ধানে গেলুম—সরলা বাড়িতে নেই—তারকবাবু আর নদিদি—অনেকক্ষণ সরলার জন্যে অপেক্ষা করা গেল এল না—নদিদি বল্লেন কাল সকালে এসে খেয়ো সেই সঙ্গে সরলাকে গান শিখিয়ে নিয়ো—তাতেই রাজি। তারকবাবু বল্লেন খাবার আগে আমার ওখানে যেয়ো পুরীর বাড়ি সম্বন্ধে কথা আছে—তাই সই। আজ সকালে স্নান করে প্রথমে তারকবাবু, পরে নদিদি, পরে সুরেন, পরে অমলাকে সেরে বাড়ি এসে ১১ই মাঘের গান শিখিয়ে রাত্রে সঙ্গীতসমাজ সেরে ১২টার সময় নিদ্রার আয়োজন করতে হবে।[১২৪]

—বিবরণটি রবীন্দ্রনাথ হাল্কাভাবে দিয়েছেন, কিন্তু এইরকম ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই কলকাতায় তাঁর দিন কাটত। '১১ মাঘের হিসাবে রবীন্দ্রবাবু মহাশয়ের যাতায়াত' এইরূপ হিসাব সরকারী ক্যশবহিতে ৫, ৬ ও ৭ মাঘ দেখা যায়। সরলা দেবীও ৬, ৭ ও ৮ মাঘ একই উপলক্ষে যাতায়াত করেছেন। কিন্তু এই আয়োজন ও ব্যস্ততার তুলনায় মাঘোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন অনেক কম।

মাঘোৎসবের গান শেখাবার জন্য ঘোরাঘুরি ছাড়াও তিনি এই সময়ে অন্যবিধ ঘোরাঘুরিও করেছেন। ৬ মাঘ নিমতলা স্ট্রীট, 'হেদুয়াতলা' ও সংগীত-সমাজ এবং ৮ মাঘ বালিগঞ্জ ও হেদুয়াতলা যাতায়াতের হিসাব ক্যাশবহিতে পাওয়া যায়। 19 Jan [শনি ৬ মাঘ] রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে লিখছেন:

কালও রাত দুপুরের সময় এসেছি—সমস্তদিন উৎপাত গেছে। আজ সকাল বেলায় এক চোট সাক্ষাৎকারীদের সমাগম এবং গানশিক্ষার হাঙ্গাম শেষ করে আহারটি করেই তোমাকে লিখ্‌তে বসেছি—এখনি সঙ্গীতসমাজওয়ালারা তাদের রিহার্সালের জন্যে আমাকে ধরতে আসবে—সেখানে ৪টে পর্যন্ত চেঁচামেচি করে সুরেনকে দেখ্‌তে বালিগঞ্জে যাব—সেখান থেকে সরলাকে তুলে নিয়ে এসে গান শেখানর ব্যাপারে রাত নটা বেজে যাবে—তার পরে সঙ্গীতসমাজে আবার রিহার্সালে রাত দুপুর হয়ে যাবে।[১২৫]

সংগীত-সমাজে কোন্ নাটকের মহড়া দেওয়া হচ্ছিল বলা শক্ত, কিন্তু ৯ মাঘ [মঙ্গল 22 Jan] 'ভারত-সাম্রাজ্ঞী' ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটায় বেশ কিছুদিনের জন্য এদেশে সমস্ত আনন্দানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। কালো বর্ডারে ঘেরা সংবাপত্রগুলিতে প্রকাশিত অজস্র শোকসভার বিবরণ দেখে মনে হয়, সারা দেশে শোকপ্রকাশের যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথও ভারত সাম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-উপলক্ষে শোকজ্ঞাপন করে একটি প্রবন্ধ লেখেন ও ১১ মাঘের সায়ংকালীন অধিবেশনে 'প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া' সেটি পাঠ করেন। রচনাটি 'একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তত্ত্ববোধিনী-র ফাল্গুন-সংখ্যায় [পৃ ১৬৮-৭০] এবং 'সাম্রাজ্যেশ্বরী' নামে ভারতী-র ফাল্গুন-সংখ্যায় [পৃ ৯৫৭-৫৯] মুদ্রিত হয়। দু'টি পাঠে অল্পবিস্তর প্রভেদ আছে—কিন্তু পার্থক্যটি গুরুতর নয়। ভারতবাসীর কাছে রাজারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও মাতৃপূজক এই দেশে ভিক্টোরিয়ার নারীত্ব মাতৃত্বে মহিমামণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 1858-এ সিপাহিবিদ্রোহের পর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে Queen's Proclamation প্রচার বা 1877-এ দিল্লি-দরবারে ভিক্টোরিয়াকে Empress of India বা ভারত-সাম্রাজ্ঞী অভিধায় ভূষিত করার পিছনে ইংরেজ-কূটনীতির যে চাল ছিল, ভারতবর্ষীয়দের স্বভাববৈশিষ্ট্যের জন্য তা সহজেই ফলপ্রসূ হয়েছে। তাই ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুসংবাদে ভারতে মাতৃবিয়োগের হাহাকার উঠেছে। রবীন্দ্রনাথও শোক প্রকাশ করে বলেছেন:

> ভারত সাম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া—যিনি সুদীর্ঘকাল তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের জননীপদে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, যিনি তাঁহার রাজশক্তিকে মাতৃস্নেহের দ্বারা সুধাসিক্ত করিয়া তাঁহার অগণ্য প্রজাবৃন্দের নত মস্তকের উপর প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ক্ষমা, শান্তি এবং কল্যাণ যাঁহার অকলঙ্ক রাজদণ্ডকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল, সেই ভারতেশ্বরী মহারাণী যে মহান্ পুরুষের নিয়োগে এই পার্থিব রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রসাদে সুচিরকাল জীবিত থাকিয়া অনিন্দিতা রাজশ্রীকে দেশে কালে ও প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ের মধ্যে সুদৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—অদ্য সমস্ত রাজসম্পদ পরিহার পূর্ব্বক ললাটের মাণিক্যমণ্ডিত মুকুট অবতারণ করিয়া একাকিনী সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের নিস্তব্ধ মহাসভায় গমন করিয়াছেন। পরমপিতা তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন![১২৬]

—পরবর্তী দু'টি অনুচ্ছেদ মৃত্যু সম্পর্কে সাধারণ কথাবার্তায় পূর্ণ, নিছক কর্তব্যবোধে লিখিত ফরমায়েশি রচনার অধিক মর্যাদালাভের অযোগ্য। প্রাতের উপাসনায় প্রদত্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণ ও রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদ 'Prayers for the Late Queen-Empress at the Adi Brahmo Samaj' নামে তত্ত্ববোধিনী-র জ্যৈষ্ঠ ১৮২৩ শক [১৩০৮] সংখ্যার 8-10 পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। সম্ভবত এটিই ইংরেজিতে অনূদিত কোনো রবীন্দ্র-রচনার প্রথম প্রকাশ।*

একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে কতকগুলি ব্রহ্মসংগীত পরিবেশিত হয়েছিল বলার উপায় নেই, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী-র প্রতিবেদনের সঙ্গে যে ছ'টি গান মুদ্রিত হয়েছে তার সবগুলিই রবীন্দ্রনাথের লেখা:

[১] ইমন কল্যাণ-একতলা। হৃদয়শশী হৃদিগগনে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন।১৭৭; গীত ১। ২০৬-০৭; স্বর ৪; এই গানের প্রথম অংশটি ২৯ কার্তিক ১৩০২ তারিখে মজুমদার-পুঁথিতে রচিত হয়েছিল, কিন্তু কাব্যগ্রন্থাবলী-তে সংকলিত হয় নি—সেখানে প্রথম ছত্রটির পাঠও ভিন্নতর: হৃদয়চন্দ্র হৃদিগগনে উদিলরে শুভ লগনে। অন্য ছত্রগুলিতেও পাঠান্তর আছে।

[২] জিলফ্ বারোয়াঁ—সুরফাঁকতাল। প্রতি দিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৭; গীত ১। ৮০-৮১; আলাপিনী, কার্তিক-অগ্র°; স্বর ২৩; নৈবেদ্য ৮। ২২, ১৯-সংখ্যক।

[৩] ইমন—তেওরা। তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৭; গীত ১। ৪৭-৪৮; স্বর ৪; নৈবেদ্য ৮। ৯-১০, ৪-সংখ্যক; গানটি ক্ষণিকা-র পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হয়েছিল, প্রথম ছত্রের পাঠ: তোমারি বীণা জীবনকুঞ্জে।

[৪] তিলক কামোদ-তেওরা। মহানন্দে হের গো সবে গীতরবে দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৭-৭৮; গীত ৩। ৮৪৭; স্বর ৪।

[৫] ছায়ানট-একতালা। [হে] সখা মম হৃদয়ে রহ দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৮; গীত ১। ১৬৮; স্বর ৪; মূল গান: এ সখি অব কৈসে করুঁ দ্র ত্রিবেণীসংগম। ৩৫।

[৬] কাফি—ঝাঁপতাল। প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী দ্র তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৭৮; গীত ১। ৮১; স্বর ২৪; নৈবেদ্য ৮| ৭, ১-সংখ্যক।

মাঘোৎসবের পর রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ১৫ মাঘ [সোম 24 Jan] পর্যন্ত কলকাতায় থাকেন। ১২ মাঘ গোলতলা, বালিগঞ্জ, নিমতলা ও সুকিয়া স্ট্রীট, ১৩ মাঘ ভবানীপুর, ১৪ মাঘ সুকিয়া স্ট্রীট এবং ১৫ মাঘ তাঁর বালিগঞ্জ যাতায়াতের হিসাব পাওয়া যায়। এর পর তিনি শিলাইদহ যাত্রা করেন।

মাঘ মাসের রবীন্দ্র-রচনার প্রকাশ-সূচী:

ভারতী, মাঘ ১৩০৭ [২৪ । ১০]:

৯২৮-৪৫ ‘চিরকুমার সভা’ নবম পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪।৩০১-১৪ [দশম পরিচ্ছেদ]

বনমালী ঘটকের অংশটি ভারতী-তে নেই, গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৭ । ৪]:

২৫২-৫৯ ‘বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ’ দ্র শব্দতত্ত্ব ১২। ৩৭৪-৮২

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের একটি বিস্তৃত তালিকা তৈরি করে পুনরায় প্রকৃত বাংলা অভিধান ও ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিষয়টির প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল বহুকাল পূর্বে—17 Nov 1888 [৩ অগ্র° ১২৯৫] পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এর ২২-সংখ্যক প্রস্তাব ‘Stray Thoughts about Philology’-র শেষাংশে তিনি বর্ণানুক্রমিক ভাবে ‘ক’ থেকে ‘ঝ’ পর্যন্ত অনেকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ সংকলন করেছিলেন [দ্র রবিজীবনী ৩। ১০৩]। এই তালিকাটিই পরিবর্তিত, সম্পূর্ণতর ও ব্যাখ্যাত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। প্রবন্ধের শেষে তিনি ‘খাঁটি বাংলাশব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকাসংকলনে’র জন্য পাঠকদের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, শীঘ্রই তার ফল পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের বিখ্যাত অভিধান-কার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস [? 1872-1939] একটি তালিকা প্রেরণ করেন, ‘বাঙ্গালা শব্দ-তত্ত্ব’ নামে সেটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-র পরবর্তী সংখ্যায় [বৈশাখ-আষাঢ় ১৩০৮। ২২-২৯] প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি দ্বারা প্রভাবিত হন।

রবীন্দ্রনাথ 19 Jan [শুক্র ৬ মাঘ]-এর পত্রে মৃণালিনী দেবীকে লিখেছিলেন: 'আমরা এবার বোটে গিয়ে থাক্‌ব—সেখানে চাকরের অভাব তুমি তেমন অনুভব করবে না—তপ্‌সি থাকবে, অন্যান্য মাঝিও থাকবে, তোমার ফটিক থাকবে পুঁটে থাক্‌বে, বিপিন থাক্‌বে, মেথর থাক্‌বে—অনায়াসে চলে যাবে—ল্যাম্পের ল্যাঠা নেই, জল তোলার হাঙ্গাম নেই, ঘর ঝাঁড় দেওয়ার ব্যাপার নেই—কেবল খাবে স্নান করবে, বেড়াবে এবং ঘুমবে।'[১২৭] শিলাইদহে গিয়ে তিনি এই সংকল্প কার্যে পরিণত করেন। ৪ ফাল্গুন [শুক্র 15 Feb] প্রিয়নাথ সেনকে সঙ্গী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখছেন: 'যেখানে এবার আড্ডা নিয়েছি এখানে ঝড়ের প্রবেশাধিকার strictly prohibited। স্থানটি দেখ্‌লে রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর প্রতি আর তোমার কখনো ঈর্ষ্যার উদয় হবে না।…আমি এখন আর শীঘ্র পদ্মার কোল ছাড়চি নে। অন্ততঃ বর্ষা পর্য্যন্ত এখানে কাটাব বলে মন স্থির করে নোঙর ফেলে শিকল বেঁধে ঘরকন্না ফেঁদে বসেছি।'[১২৮] ৩ ফাল্গুন ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে 'Pabna Camp' থেকে লিখেছেন:

> আমরা এখানে পদ্মায় বোটে বাস করিতেছি। নির্জন পদ্মাতীর আমার কাছে অত্যন্ত মনোহর বোধ হয়। যতীর নিকট হইতে এ স্থানের বর্ণনা নিশ্চয় শুনিয়া থাকিবে। যতী এখানকার অনেকগুলি ফোটো তুলিয়াছেন—কেমন হইয়াছে বলিতে পারি না।[১২৯]

একই দিনে তিনি মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখেছেন: 'যত দিন পারি জলেই বাস করিব—…আগামী কল্য নাটোর আসিতেছেন—এই সময় আপনি আসিলে জমিত ভাল।[১৩০]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ-প্রবাসী হওয়ার জন্য প্রদীপ-এর সম্পাদনা ত্যাগ করেছিলেন ফাল্গুন ১৩০৬-সংখ্যা থেকে—কিন্তু জন্ম-সম্পাদক রামানন্দ বেশি দিন কেবল শিক্ষকতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি, নিজের স্বত্বাধিকারে 'প্রবাসী' নামক একটি মাসিক পত্রিকা বৈশাখ ১৩০৮ থেকে প্রকাশ করার আয়োজন করতে থাকেন। প্রথম সংখ্যায় একটি কবিতা প্রকাশের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হন। ৩ ফাল্গন [বৃহ 14 Feb] রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'প্রবাসী' ['সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি']-শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা,সেইটিই পাঠিয়ে দেন রামানন্দকে। ৫ চৈত্র [সোম 18 Mar] তিনি প্রিয়নাথ সেনকে লেখেন: 'রামানন্দবাবু প্রবাসী বলে একখানা পত্র বের করচেন—আরম্ভ সংখ্যায় একটা কবিতা লিখে দেবার জন্যে আমাকে খুব চেপে ধরেছিলেন—খান চারেক চিঠি উপ্‌রি উপ্‌রি লিখেচেন—আমার নৈবেদ্যের শেষ কবিতাটি তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেটা সনেট নয়—একটি বড় সড় ব্যাপার—তার নামও "প্রবাসী"।'[১৩১] 'প্রবাসী' কবিতাটি [দ্র উৎসর্গ ১০। ২৬-২৯, ১৪-সংখ্যক] বৈশাখ ১৩০৮-সংখ্যা [পৃ ২২-২৪] প্রবাসী-তে মুদ্রিত হয়, কিন্তু এটি নৈবেদ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি—মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থ [১৩১০] প্রথম খণ্ডের 'বিশ্ব' অংশে গ্রন্থভুক্ত হয়।

২৩ ফাল্গুন [বুধ 6 Mar] রবীন্দ্রনাথ লেখেন একটি সনেট—'দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে, করুণানিলয়' [দ্র উৎসর্গ-সংযোজন ১০। ৮৩-৮৪, ৪-সংখ্যক]—এটিও সম্ভবত নৈবেদ্য গ্রন্থের জন্য লেখা হলেও শেষ পর্যন্ত গ্রন্থভুক্ত হয় নি, এটি প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩১৫-সংখ্যা [পৃ ৪৮] ভারতী-তে 'প্রশ্রয়' শিরোনামে, তারিখটি ভারতী থেকে পাওয়া।

কাব্যগ্রন্থ-এর 'নৈবেদ্য' অংশের অন্তর্ভুক্ত 'রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিনু জাগি' [দ্র উৎসর্গ-সংযোজন ১০। ৮৪, ৫-সংখ্যক], 'কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে' [দ্র ঐ ১০। ৮৪-৮৫, ৬-সংখ্যক] ও 'নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয়' [দ্র ঐ ১০। ৮৫, ৭-সংখ্যক] সনেট-ত্রয়ও হয়তো নৈবেদ্য গ্রন্থের জন্য লেখা—

প্রথমোক্ত সনেটটিতে তো স্পষ্টই নীতীন্দ্রনাথের রোগশয্যার পাশে রাত্রিযাপনের অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটেছে। আমরা আগেই বলেছি, হয়তো 'অল্প লইয়া থাকি তাই মোর' গানটিও এই পটভূমিকায় লেখা।

মহিমচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত পত্রানুযায়ী নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের অতিথি হন ৪ ফাল্গুন [শুক্র 15 Feb] তারিখে। তিনি সম্ভবত পক্ষকাল সেখানে অবস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথ 27 Feb [বুধ ১৬ ফাল্গুন] প্রিয়নাথকে লিখছেন: 'কিছুদিন থেকে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থায় অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। প্রাতঃকাল থেকে রাত দেড়টা পর্য্যন্ত লেশমাত্র অবসর পাইনে—গৃহিণীর অবস্থা ততোধিক।'[১৩২] কিন্তু রাজঅতিথিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী বিব্রত হলেও রথীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গ উপভোগ করেছেন পূর্ণমাত্রায়; তিনি লিখেছেন:

> পদ্মার ধারে বোটে থাকতে একবার কয়েকদিনের জন্য নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ এসেছিলেন বেড়াতে।···তাঁর সঙ্গে যাদের ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি তারা জানে না—তাঁর কিরকম সরল স্বভাব ছিল, তিনি কিরকম অবিচারে সকলের সঙ্গে সমভাবে মিশতে পারতেন। আর তাঁর প্রধান গুণ ছিল মজলিস জমানো··· মহারাজা আসতেই পদ্মার চরের নির্জনতা মুহূর্তের মধ্যেই যেন ঘুচে যেত। হাসিঠাট্টা গল্পগুজবে জমে উঠত দিনগুলি। আমাদের মজা লাগত তাঁর কাছে শুনতে—মহারাজা হবার যোগ্যতা কি কঠিন পরিশ্রমে তাঁকে অর্জন করতে হয়েছিল।···আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন, 'রথী রে, মহারাজা যেন কখখনো হতে যাস নে।'[১৩৩]

'আতিথ্যের হাঙ্গামে' চিরকুমার সভা-র কিস্তি লেখার অসুবিধা হলেও বন্ধুসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উপকার হল। একটি তারিখ-হীন চিঠিতে তিনি প্রিয়নাথকে লিখছেন:

> নাটোরকে সেই বিনোদিনীর গল্পাংশ একদিন শোনান গেল—তাঁর খুব ভাল লাগল। শোনাতে গিয়ে সেটা লিখে ফেলবার জন্যে আমারও একটু উৎসাহ হয়েছে—কিন্তু অন্য সমস্ত খুচরো লেখা শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে সেটায় হাত দিতে ইচ্ছা আছে। এদিকে খুচরো লেখা রক্তবীজের ঝাড়, একটা যেতে না যেতে আর দশটা এসে উপস্থিত হয়—অথচ সেগুলো মাথা থেকে ঝেটিয়ে না ফেল্লে মনটা কোন বড় লেখা লেখবার মত শান্তি ও অবসর হয় না।[১৩৪]

আমাদের জানা নেই, এই সময়ে চিরকুমার সভা ছাড়া আর কোন্ 'খুচ্‌রো লেখা তাঁকে বিব্রত করছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা যায়, বঙ্গদর্শন-এর সম্পাদনার ভার হাতে এলে অজস্র 'খুচ্‌রো লেখা' লিখেও তিনি বিনোদিনী অর্থাৎ চোখের বালি ও নষ্টনীড়-এর মতো 'বড় লেখা'র জন্য অবসর করে নিয়েছেন!

ভারতী, ফাল্গুন ১৩০৭ [২৪ / ১১]:

৯৫৭-৫৯ 'সাম্রাজ্যেশ্বরী' দ্র অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ [১৩৯৩]। ২২৯-৩১

১০৩৬-৬০ 'চিরকুমার সভা' ১০ম পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪। ৩১৪-৩১ [একাদশ পরিচ্ছেদ]

২৮ ফাল্গুন [সোম 11 Mar] রবীন্দ্রনাথের ক্যাশবহিতে 'খোদ বাবু মহাশয়ের নিকট মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষস পাঠান'র হিসাব পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকদু'টির জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ যথাক্রমে 4 Mar ও 10 Mar প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী নাটক' [ভাদ্র ১৩০৭] দিয়ে এই অনুবাদকর্মের সূচনা হয়েছিল, পরবর্তী অনুবাদ ভবভূতির 'মালতী-মাধব' [29 Sep 1900]। রবীন্দ্রনাথ একটি তারিখ-হীন পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখেন:

> মুদ্রারাক্ষস পড়ছি। মুদ্রারাক্ষসের শ্লোকগুলি ঠিক কবিত্বরসপূর্ণ নয় সেইজন্যে আমার বোধ হয়, ওগুলো অমিত্রাক্ষর ছন্দে করলে ওর গাম্ভীর্য্য এবং কঠিনতা বেশ পরিস্ফুট হত। অন্য নাটকের মত এর শ্লোকগুলি বেশ স্বচ্ছ এবং চেষ্টালক্ষণহীন হয়নি। এর গদ্য অংশ বেশ লাগচে। সংস্কৃত

মূলটা আনিয়ে নিয়ে অনুবাদের সাহায্যে সেটা পড়ব বলে অপেক্ষা করে আছি। পূর্ব্বে একবার পড়বার চেষ্টা করে খট্‌মটে বলে ছেড়ে দিয়েছিলুম।[১৩৪ক]

মুদ্রারাক্ষস নাটক ও তার অনুবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যথাযথ। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান অপ্রধান অনেক রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, এই চিঠির বাকি অংশ থেকে তা জানা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইচ্ছায় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে বঙ্গদর্শন-সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর সহায়তায় চারটি সংখ্যা [কার্তিক-মাঘ ১২৯০] প্রকাশের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে বঙ্গদর্শন-কে পুনর্জীবিত করার উদ্যোগ নিলেন শ্রীশচন্দ্রের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি কয়েকমাস পূর্বে মজুমদার এজেন্সি [পরবর্তী নাম 'মজুমদার লাইব্রেরি'] নামে একটি পুস্তকপ্রকাশন-সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১ আশ্বিন ১৩০৭ [17 Sep 1900]-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড এই সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। শৈলেশচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশের আয়োজন করেন। মাঘ ১৩০৭-এ একটি তারিখ-হীন পত্রে রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে শ্রীশচন্দ্রকে লেখেন: 'তোমার বঙ্গদর্শনের প্রস্তাব শৈলেশের কাছে পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। শৈলেশ আজকাল এই সমস্ত সাহিত্য সম্পর্কীয় ব্যবসায়ে খুবই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে! তাহার উদ্যম যথেষ্ট আছে ব্যবসায় বুদ্ধিরও অভাব নাই, সহায়ও যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছে সুতরাং সফলতার আশা করা যাইতে পারে।'[১৩৫] স্বভাবতই তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছেন সহায়তার জন্য। বিব্রত হয়ে ৩০ ফাল্গুন [বুধ 13 Mar] তিনি প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে জাগাইবার আয়োজন করিতেছেন—সে জন্যে আমাকেও যথেষ্ট ঠেলাঠেলি লাগাইয়াছেন। এখন দিবাবসানে আমার বিশ্রামের সময় আসিয়াছে—এখন কি সাহিত্যের হাটের মাঝখানে আর বেসাতি লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে?'[১৩৬] তখনও সম্ভবত সম্পাদকের দায়িত্ব নেবার অনুরোধ আসে নি। কিন্তু সেটিও এল কয়েকদিনের মধ্যে। ১১ চৈত্র [রবি 24 Mar] প্রিয়নাথকে লিখলেন: 'কাল চিরকুমারসভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি—এমন সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদকী লইবার জন্য শ্রীশ শৈলেশ দুই ভাইয়ের নিকট হইতে বন্দুকের দুই চোঙ ভরা অনুরোধ আমার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছে—কিন্তু ধরাশায়ী হই নাই। তোমাকে সম্পাদক পাকড়াও করিবার জন্য শৈলেশকে উত্তেজিত করিয়া পত্র লিখিয়াছি।'[১৩৭] তিনি আরও কিছুদিন আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে গেছেন; 'বসন্তশুক্লরজনী উত্তরোত্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত' [পূর্ণিমা—২২ চৈত্র: 4 Apr] হওয়ার কাছাকাছি একটি তারিখ-হীন পত্রে প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'আজ শৈলেশ আসবার কথা আছে—তাকে সবিনয়ে বঙ্গদর্শন থেকে বিরত করবার [জন্যে] ডেকে পাঠিয়েছি—হতভাগ্য দেশে প্লেগ বাড়চে এর উপর কাগজ বাড়তে দেওয়া গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।'[১৩৮] 3 Apr [বুধ ২১ চৈত্র] তাঁকে লিখছেন: 'শৈলেশরা বঙ্গদর্শনের সম্পাদক কাকে ঠিক করলে এখনো খবর পাইনি। তার আসবার কথা ছিল—আসেনি, এবং কেন আসেনি তারও কোন কৈফিয়ৎ দেয় নি। তুমি, নগেন্দ্র গুপ্ত, এবং চন্দ্রশেখর মুখুয্যের মধ্যে তারা দোদুল্যমান। তোমার নিত্য অব্যবস্থিত ব্যস্ততার জন্যে তারা শঙ্কিত—নগেন্দ্র গুপ্তকে শৈলেশ ভয় করে এবং চন্দ্রশেখরের উপরেও বড় ভরসা নেই—অতএব আপাততঃ বঙ্গদর্শনের রাজসিংহাসন শূন্য আছে বলেই বোধ হচ্চে—তুমি টপ্‌ করে চড়ে বস না।'[১৩৯] আর-একটি চিঠিতে শৈলেশচন্দ্রের আসার খবর দিয়ে লিখেছেন: 'বঙ্গদর্শনের সম্পাদক আমি হব এমন আশঙ্কামাত্র নেই।'[১৪০]

বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশের জন্য 'চোখের বালি' উপন্যাসটি সংগ্রহ করতে পারলেও শৈলেশচন্দ্র সম্ভবত এবারে রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত করতে পারেন নি। 18 Apr [বৃহ ৫ বৈশাখ ১৩০৮] ও 29 Apr [সোম ১৬ বৈশাখ] *The Bengalee* পত্রিকায় *বঙ্গদর্শন*-এর যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাতে 'A highly interesting novel by Babu Ravindra Nath Tagore will appear from the first month' বলে বিজ্ঞাপিত হলেও সম্পাদকের নাম সম্পর্কে কোনো ঘোষণা করা হয় নি। অবশ্য সম্ভবত ৮ বৈশাখে [রবি 21 Apr] লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের উত্তরে ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য যা লেখেন, তাতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকের পদ গ্রহণের জন্য প্রায় রাজি হয়ে গেছেন:

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রকাশের সংবাদ অতি সুসংবাদ। প্রসিদ্ধ লেখকদের উৎসাহ আরো সুসংবাদ। আমার মতে আপনি অগৌণে এবং অবিচারিত চিত্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করুন এবং আমাকে কি কি করিতে হইবে বলুন। আমি সর্ব্বতোভাবে ইহার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।[১৪১]

বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়15 May 1901 [বুধ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮] তারিখে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'সূচনা'র পাদটীকায় শৈলেশচন্দ্র লিখেছেন:

বঙ্গদর্শন-প্রচারের সংকল্প-সময়ে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই ইহার সম্পাদক হইবেন কথা ছিল। কিন্তু তিনি এক্ষণে সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় আমাদের সানুনয় অনুরোধে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই ভার গ্রহণ না করিলে, সে সংকল্প এত সত্বর কার্য্যে পরিণত হইত কি না, সন্দেহ। তাঁহাকে সম্পাদকরূপে পাইয়া আমরা অধিকতর উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

ভারতী-র জন্য রবীন্দ্রনাথ চিরকুমার সভা [প্রজাপতির নির্বন্ধ] লিখতে শুরু করেছিলেন ১৩০৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের গোড়ায়। এর পর তিনি মাসিক কিস্তিতে উপন্যাসটি লিখতে লিখতে ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। 3 Apr [বুধ ২১ চৈত্র] প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'চিরকুমার গরমের সময় আরম্ভ করেছিলুম ভেবেছিলুম এই ভাবেই তোড়ের মুখে লিখে যাব—কিন্তু ক্রমে যখন হেমন্তের হিম এবং শীতের কুয়াশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ধরল তখন কল্পনার ডানা প্রতিদিনই জড়িয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল—তখন নিজের উপর এবং লেখার উপর নিতান্তই জুলুম চালাতে হল।'[১৪২] ১০ চৈত্র [শনি 23 Mar] তাঁকে লিখেছিলেন: 'চিরকুমার সভাটা, মনে করচি, আজই লিখে একেবারে ইতি করে দেব। তাহলে একটা বড় ভূত আমার কাঁধ থেকে নেমে যাবে।'[১৪৩] এই সংকল্প তিনি রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এইভাবে শেষ করার জন্য তাঁর মনে আশঙ্কাও ছিল: 'যেখানে থামা উচিত এবং যেরকম ভাবে থামা উচিত তা হয়েছে কি না নিজে বুঝ্‌তে পারচি নে। একবার সমস্ত জিনিষটা একসঙ্গে ধরে দেখ্‌তে পারলে তবে ওর পরিমাণ-সামঞ্জস্য বিচার করা যায়—সেইজন্যে বৈশাখের ভারতীর অপেক্ষায় আছি। যখন বই বেরবে তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরবে।'[১৪৪] চিরকুমার সভা বৈশাখে শেষ হয় নি, অন্তিম কিস্তি প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায়। চৈত্র মাসেই একটি তারিখহীন ছিন্ন পত্রে তিনি প্রিয়নাথকে লিখেছেন: 'কাল চিরকুমারটাকে আদ্যোপান্ত সংশোধন ও সংক্ষেপ করিয়া ছাপিতে দিবার আকারে তৈয়ার করিয়া তুলিয়াছি। অপব্যয়ের ভয়ে ছাপাখানায় দিতে সাহস হইতেছে না।'[১৪৫] 'হিতবাদীর উপহার' রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী [১৩১১]-তে 'চিরকুমার সভা' নামে *ভারতী*-র পাঠটিই পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু গদ্যগ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ডে 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' নামে প্রকাশের সময়েও 'অনেকটা বদল' হয় নি, ঘটক বনমালী চরিত্র ও কিছু-কিছু সংলাপ ও বর্ণনা পুনর্বিন্যস্ত ও সংযোজিত হয় মাত্র।

উপরে উল্লিখিত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'ভারতীর জন্যে আজকালের মধ্যেই একটা লেখা সুরু করতে হবে—আজ খুব শক্ত তাগিদ এবং প্রলোভন এসেছে।' প্রসঙ্গটি আরও কয়েকটি চিঠিতে আছে। চোখের বালি-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বড়ো গল্প নষ্টনীড়-ও ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন, গল্পটির প্রথম পরিচ্ছেদ চিরকুমার সভা শেষ হওয়ার আগেই বৈশাখ ১৩০৮-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হয়।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র শরৎকুমারের সঙ্গে মাধুরীলতার বিবাহের সম্বন্ধ এনেছিলেন প্রিয়নাথ সেন। বর্তমান বৎসরের শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে রবীন্দ্রনাথের লেখা অনেকগুলি চিঠিতে এই প্রসঙ্গে তাঁর আশা-নিরাশা প্রকাশ পেয়েছে। ১ ভাদ্র [17 Aug] তিনি লিখেছিলেন: 'শরতের আশা তুমি এখনো ছাড় নি? আমি ত সে অনেকদিন উৎপাটিত করে ফেলেছি।'[১৪৬] কিন্তু আবার একটি চিঠিতে লিখছেন: 'শরতের শেষ চিঠি কি আশাপ্রদ? অবিনাশের ভাবটা কি রকম? শরৎ নিজে যদি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ না করে তাহলে কি তার মা সহজে সম্মত হবেন? কিন্তু শরতই বা বেলার কোনপ্রকার পরিচয় না পেয়ে কিসের জোরে মার কাছে প্রবল ইচ্ছা জ্ঞাপন করবে? এই সমস্ত নানা কারণে বিশেষ আশা করবার কোন হেতু দেখা যায় না।'[১৪৭] প্রস্তাবটি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে স্থগিত রাখলেও প্রিয়নাথ নিশ্চয়ই চেষ্টা ত্যাগ করেন নি। সাক্ষাতে উভয়ের মধ্যে এবিষয়ে কথাবার্তা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু লিখিতভাবে এর উল্লেখ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ১০ চৈত্রের [23 Mar] পত্রে:

> বেলার যৌতুক সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত। মোটের উপর ১০,০০০ পর্য্যন্ত আমি চেষ্টা করতে পারি। সেও সম্ভবতঃ কতক নগদ এবং কতক instalmentএ।···সাধারণতঃ বাবামহাশয় বিবাহের পর দিন ৪/৫ হাজার টাকা যৌতুক দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে থাকেন—সেজন্যে কাউকে কিছু বল্‌তে হয় না। বিশ হাজার টাকার প্রস্তাব আমি তাঁর কাছে উত্থাপন করতেই পারব না।[১৪৮]

কালিগ্রাম পরগণার জমিদারিতে দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হয়ে কয়েক বছর ধরেই জমিদারির আয় কমে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই দিকে ইঙ্গিত করে পরের দিনের চিঠিতেও লিখেছেন: 'বাবামশায়কে বিরক্ত ও পরিবার-সুদ্ধ সকলকে অসন্তুষ্ট করিয়া আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নই। এ সময়ে তাঁহাকে উৎপীড়ন করা আমি কিছুতেই পারিব না।' তা সত্ত্বেও আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা যাচাই করে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তিনি ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদকে লেখেন। তাঁর কাছ থেকে উত্তর পেয়ে একটি তারিখ-হীন পত্রে প্রিয়নাথকে লেখেন: 'সে লিখ্‌চে এখন বাবামশায়ের কাছে দরবার করার অনেক বিঘ্ন—বৈশাখের আরম্ভে বিঘ্ন দূর হলে কথাটা উত্থাপন করা তার মত—আমিও তাই যুক্তিসঙ্গত বোধ করলুম। অতএব আপাততঃ ন যযৌ ন তস্থৌ থাকা যাক্।'[১৪৯] তখন প্রিয়নাথ তাঁকে কলকাতায় এসে কথাবার্তা চালানোর জন্যে লিখলে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে জানালেন: 'বৈশাখের আরম্ভে কলিকাতায় হাজির হতে চেষ্টা করব। দেখি অদৃষ্টে কি আছে। কিন্তু সেই সময়টা আমার লেখার হিসাবে অত্যন্ত নষ্ট হবে।'[১৫০] অবশ্য অধৈর্যে ও আশায় সেই ক্ষতিও তিনি মেনে নিয়েছেন: 'তোমারি জিত। কলকাতায় চল্লুম। ৩১শে চৈত্র শনিবার অপরাহ্নে পৌঁছব।'[১৫১] ৩১ চৈত্র [শনি 13 Apr] তাঁর 'বিরাহিমপুর হইতে আসিয়া সিয়ালদহ হইতে বাটী আসিবার' গাড়িভাড়ার হিসাব পাওয়া যায়।

বহুকাল পরে বৎসরের এই শেষ দিনটিতে 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকটি অভিনীত হয়, এবারের অভিনয়-স্থল মিনার্ভা থিয়েটার। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি তখন মিনার্ভার প্রধান অভিনেতা। *The Bengalee*-তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি এইরকম:

MINERVA THEATRE/6, Beadon Street, Calcutta./ SATURDAY, the 13th April at 9 p. m./Babu Rabindra Nath Tagore's Historical/Tragedy./ RAJA BASANTA RAY/ Dramatised by late Kedar Nath Roy/ Chowdhury/ Full of Pathetic Situations./ Thrilling Decapitation of the Grey headed/uncle Raja Basanta Roy by Maharaja/Pratapaditya.

—১৩০৮ বঙ্গাব্দেও নাটকটি কয়েকবার অভিনীত হয়েছিল।

ভারতী, চৈত্র ১৩০৭ [২৪ । ১২]:

১১২৮-৪০ 'চিরকুমার সভা' একাদশ-দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্র প্রজাপতির নির্বন্ধ

৪ । ৩৩২-৪২ (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ১

দ্বিপেন্দ্রনাথের কন্যা নলিনী দেবীর সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুহৃৎনাথ চৌধুরীর বিবাহ হয়েছিল ১৪ বৈশাখ ১৩০৩ [শনি 25 Apr 1896] তারিখে। বিবাহের অব্যবহিত পরেই ঠাকুরপরিবারের খরচে উচ্চতর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়। এরপর প্রায় চার বৎসর ধরে প্রতি মাসে বিভিন্ন অঙ্কের ড্রাফ্‌ট্‌ ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়েছে। বর্তমান বৎসরের গোড়াতে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। সরকারী ক্যাশবহির ২৫ বৈশাখের [সোম 7 May] হিসাবে দেখা যায়: 'সুহৃৎনাথ চৌধুরী/উঁহার বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আগমনের জন্য দেওয়া যায় ১৫০্'।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুকেশী দেবীর বিবাহ হয় ১৭ আষাঢ় [রবি 1 Jul] তারিখে।

রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আন্দুলমৌরীর প্রিয়নাথ রায়ের কন্যা নির্মলনলিনী [নলিনীবালা] দেবীর বিবাহ হয় সম্ভবত শ্রাবণ মাসে। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ক্যাশবহির ১২ শ্রাবণের [শুক্র 27 Jul] হিসাব: 'বাবু নগেন্দ্রনাথ রায়ের বিবাহে যৌতুক দিবার স্বর্ণ বোতাম ১৫্ ব্রেশলেট ১০্'। কিন্তু এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহে থাকায় মনে হয়, বিবাহটি শ্রাবণের গোড়াতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ও লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার দ্বিতীয়া কন্যা অরুণার জন্ম হয় ২ অগ্র° [শনি 17 Nov], কিন্তু ঐ মাসেরই ২০ তারিখে [বুধ 5 Dec] ডিপথেরিয়া রোগে তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরভির মৃত্যু হয়। লক্ষ্মীনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: 'তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে এবং কলকাতায় তাদের সম্পর্কীয় অন্যান্য জায়গায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে এত সুন্দরী মেয়ে ছিল না। সেজন্য বোধ হয় সুরভি সবারই খুব প্রিয়পাত্রী ছিল। ঠিক পাঁচ বছর বয়সেই মৃত্যু হয় সুরভির।'[১৫২] সুরভির অকালবিয়োগে ইন্দিরা দেবী যে কবিতা লিখেছিলেন, সেটি আছে তাঁর 'আমার খাতা' নামক পাণ্ডুলিপিতে [Ms. 409] ">—লক্ষ্মীনাথও কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন।

সরোজা দেবী ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীমোহনের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা হয় ২২ অগ্র° [শুক্র 7 Dec] তারিখে। ১৫ মাঘ [সোম 28 Jan 1901] মনীষা দেবী ও ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা সরস্বতীর জাতকর্ম হয়। সত্যপ্রসাদের একমাত্র পুত্র সুপ্রকাশের উপনয়ন হয় ১৭ মাঘ [বুধ 30 Jan]। 1900-এর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুপ্রকাশ ইতিপূর্বেই প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ৯

ফাল্গুন [বুধ 20 Feb] প্রতিভা দেবী ও আশুতোষ চৌধুরীর পুত্র আর্যকুমার ও অশ্বিনীকুমারের উপনয়ন ও সমাবর্তন হয়।

ইন্দিরা দেবী বিবাহের পর নবাব সৈয়দ আহম্মদালির ১৪ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ভাড়াবাড়িতে বাস করছিলেন, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। বাড়ির ভাড়া ১০০ টাকা সরকারী ক্যাশ থেকেই মেটানেনা হত। এরপর সত্যেন্দ্রনাথ ১/১/২ ব্রাইট স্ট্রীটে তাঁর জন্য বাড়ি কিনে দেন, নাম হয় 'কমলালয়'। এই বাড়িতে 'ইন্দিরা দেবীর গৃহ প্রতিষ্ঠা' হয় ১৬ পৌষ [সোম 31 Dec 1900] তারিখে।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সাহানা দেবীকে তাঁর মা এলাহাবাদে পিতৃগৃহে নিয়ে যান। তিনি তরুণী কন্যার পুনর্বিবাহের আয়োজন করছেন শুনে দেবেন্দ্রনাথ বিচলিত হন। ব্রাহ্মসমাজের অপর দু'টি শাখা বিধবাবিবাহ সম্পর্কে উৎসাহী হলেও আদি ব্রাহ্মসমাজ এর সমর্থন করে নি। দেবেন্দ্রনাথ পৌত্রবধূকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করলে তিনি ১৫ কার্তিক [বুধ 31 Oct] এলাহাবাদ যাত্রা করে ১৮ কার্তিক [শনি 3 Nov] তাঁকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনিই পরে কন্যা রেণুকার মৃত্যু হলে জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বিধবাবিবাহ দেন, পুত্র রথীন্দ্রনাথেরও তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন বালবিধবা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। বলেন্দ্রনাথের মা প্রফুল্লময়ী দেবী লিখেছেন: 'আমার পুত্রবধূ সাহানাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম, ভাবিলাম লেখাপড়ায় নিজের মনকে নিয়োগ করিতে পারিলে মনে অনেকটা শান্তি পাইবে, শিক্ষার দ্বারা মনের উন্নতি লাভ হওয়া সম্ভবপর—অবশ্য যদি প্রকৃত শিক্ষা পায়। কিছুদিন পরে সে বিলাতে ট্রেনিং পড়িবার জন্য গিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন থাকিবার পর শরীর অসুস্থ হওয়ায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।'[১৫৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র নীতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের খুব অনুগত ছিলেন। তাঁর পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে নীতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কিছু চিত্র আছে পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'মাধুরীলতার চিঠি'-তে ও রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়। মহর্ষি-প্রদত্ত জমির উপর রবীন্দ্রনাথের যে 'লালবাড়ি' নির্মিত হয়, তার স্থপতি ছিলেন নীতীন্দ্রনাথ। বর্তমান বৎসরের গোড়ার দিকে এই বাড়ি নির্মাণ প্রায় সমাপ্ত হয়, ১৫ বৈশাখ [শুক্র 27 Apr] পর্যন্ত মোট ব্যয়ের হিসাব ২২৫৯৮ টাকা সাড়ে দশ আনা। এই গৃহনির্মাণের একটি কৌতুকজনক প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন রথীন্দ্রনাথ:

> বাবা প্রস্তাব করলেন, বাড়ি হবে দোতলা এবং দুই তলাতেই থাকবে একটি করে প্রকাণ্ড হলঘর। তা হলে কাঠের তৈরি স্থানান্তরযোগ্য পার্টিশন খাটিয়ে হলঘরের মধ্যে যদৃচ্ছা ছোটো-বড়ো নানা আয়তনের কামরা বানানো যায়। এই পরিকল্পনা অনুসারে বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। আমরা যখন গৃহপ্রবেশ করতে যাব, দেখা গেল একতলা আর দোতলায় একটি করে প্রকাণ্ড হলঘর ঠিকই তৈরি হয়েছে, কিন্তু এই দুই তলার মধ্যে যোগাযোগের সিঁড়িটাই নেই![১৫৪]

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দু'টি তলার যোগসাধন করা হয়। ২ আশ্বিন [মঙ্গল 18 Sep] 'নুতন বাটীতে দ্রব্যাদি লইয়া যাওয়ার মুটে ভাড়া' দেওয়া হলেও রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে এই বাড়িতে 'গৃহ প্রতিষ্ঠা' করেন মাধুরীলতার বিবাহের প্রাক্কালে ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ [বৃহ 30 May 1901]।

লিভারের রোগে নীতীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন বর্তমান বৎসরের কার্তিক মাস থেকে। হোমিয়োপ্যাথি, কবিরাজী, অ্যালোপ্যাথি প্রভৃতি বিচিত্র চিকিৎসার পর তাঁর মৃত্যু হয় ২৭ ভাদ্র ১৩০৮ [বৃহ 12 Sep 1901] তারিখে।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ২

বৎসরের শুরুতেই আদি ব্রাহ্মসমাজকে একটি বেদনাদায়ক মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। ২২ বৈশাখ [শুক্র 4 May] সমাজের প্রাক্তন গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী ৯৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। 'বার্দ্ধক্য নিবন্ধন' তিনি অবসর গ্রহণ করেন মাঘ ১২৮৯ [Jan 1883] থেকে [দ্র রবিজীবনী ২। ২২৩]। তার পরে তাঁকে নিয়মিত পেন্‌সন দিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তত্ত্ববোধিনী-তে [জ্যৈষ্ঠ।৩২] লেখা হয়: 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ইনি ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত করিতেন। ইঁহার ন্যায় সুকণ্ঠে তাল মান রাগ রাগিণী রক্ষা করিয়া ব্রহ্ম সঙ্গীত গাহিতে আর কেহই রহিলেন না।'

৩ জ্যৈষ্ঠ [বুধ 16 May] 'শ্রীমৎ মহর্ষিদেবের চতুরশীতি বর্ষের জন্মোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। উপাসনা শেষ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী···প্রার্থনা করেন'।[১৫৫]

৭ পৌষ মহর্ষির দীক্ষাদিন স্মরণে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মোৎসব শুরু হয়েছিল ১২৯৮ [1891] বঙ্গাব্দ থেকে। তার পর থেকে প্রত্যেক বৎসরই ঐ বিশেষ দিনে সেখানে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। কিন্তু গত বৎসর থেকে দিনটি কলকাতাতেও বিশেষরূপে পালিত হতে থাকে প্রধানত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে। এই বৎসরও ৭ পৌষ [শনি 22 Dec] 'পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিনের শুভ স্মৃতিকে সম্বর্ধনা করিবার জন্য:···সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উষাকীর্ত্তন-সম্প্রদায় সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মহর্ষিদেবের বাসভবনে আসিয়া কীর্ত্তন ও উপাসনান্তে তৃতীয় তলে মহর্ষিসন্দর্শনের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।'[১৫৬]

এই দিন শান্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে প্রাতঃকালীন উপাসনায় বেদিগ্রহণ করে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী উদ্বোধন, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনা ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ব্যাখ্যান করেন। 'পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে মহর্ষিদেবের সাধনস্থান সপ্তপর্ণমূলে উপস্থিত হইলেন।' কিছুদিন আগে এই স্থানটি বিশেষরূপে সজ্জিত হয়েছিল, ১৪ অগ্র° [বৃহ 29 Nov] সরকারী ক্যাশবহির হিসাব: 'শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলার বেদীর চতুর্দিকে ও গায়ে মিল্টন টালী বসান ব্যয়...২৩২ ল০'।

সায়ংকালীন উঁপাসনায় রবীন্দ্রনাথ, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদি গ্রহণ করেন। সংগীত ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধনের পর 'সাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ দিলেন।' আমরা আগেই বলেছি, এই উপদেশটি 'ব্রহ্মমন্ত্র' নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়। শম্ভুনাথ গড়গড়ির প্রার্থনার পর 'পরিশেষে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল'। যথারীতি মেলা ও বহ্ন্যুৎসব হয়। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, এই উৎসবের জন্য ২৭২২ টাকা সাড়ে ছ'আনা ব্যয়িত হয়েছিল।

১১ মাঘ [বৃহ 24 Jan 1901] একসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রাতঃকালীন উপাসনায় হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শম্ভুনাথ গড়গড়ি ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদিগ্রহণ করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধনী ভাষণে মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। 'পরে ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ব্রহ্মমন্ত্র" পাঠ করিলেন। তিনি যখন ভাবে উত্তেজিত হইয়া

উহা পাঠ করিতে ছিলেন তখন একটী ভদ্রলোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। পরে তিনি আমাদিগের যত্নে ও সেবায় সংজ্ঞা লাভ করিলে এইরূপ মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়া ছিলেন রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় আমি এমন বিচলিত হইয়াছিলাম যে শেষে আমাকে সংজ্ঞাশূন্য হইতে হইয়াছিল। বস্তুত সভাস্থ সকলেই তৎকালে স্তম্ভিত হইয়া রবীন্দ্র বাবুর ঐ বক্তৃতা শুনিয়া ছিলেন।'[১৫৭]

সায়ংকালীন উপাসনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদিগ্রহণ করলে 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া' মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ক্যাশবহিতে দেখা যায়, এই উৎসবের জন্য ২৫৬০ টাকা খরচ হয়েছিল।

'এবার ১৫ই মাঘের [সোম 28 Jan] মঙ্গলপ্রভাতে শ্রীমন্মহর্ষি দেবের যোড়াশাঁকোস্থ ভবনে বার্ষিক ব্রাহ্মযজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়াছিল।' মাঘোৎসবের পরিসমাপ্তি হিসেবে এই 'মহর্ষি সন্দর্শন' অনুষ্ঠানটি গত কয়েক বৎসর যাবৎ একটি প্রথায় পরিণত হয়েছিল।

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর [২৫ পৌষ ১২৯০: 8 Jan 1884] নববিধান সমাজের কর্তৃত্ব নিয়ে কেশব-শিষ্যদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তার কিছু-কিছু বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি। এই দ্বন্দ্বে কেশবচন্দ্রের প্রধান শিষ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অবস্থাই সবচেয়ে করুণ হয়েছিল। নববিধান সমাজের কর্তৃত্ব-পদ না পেয়ে তিনি তিন সমাজের মিলন প্রচেষ্টা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখেছি, এক সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ সংযোগ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রতাপচন্দ্রের খ্রীষ্টভক্তি এই সম্পর্কে যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি করে। 'প্রতাপ বাবু ও তাঁহার দলস্থ সকলকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অনুরোধ করিয়া' 'মোক্ষমূলরের পত্র' সমালোচনাত্মক মন্তব্য-সহ কার্তিক ১৮২১ শক [১৩০৬]-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী-তে [পৃ ১১২-১৩] মুদ্রিত হয়। বর্তমান বৎসরেও আষাঢ়-সংখ্যায় 'শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের খ্রীষ্টভক্তি' [পৃ ৪২-৪৪] ও তার ইংরেজি অনুবাদ 'Babu Pertab Chunder Mazoomdar's Christolatrý' প্রবন্ধে এই বিষয়টিকে সমালোচনা করা হয়। এই সময়ে প্রতাপচন্দ্র আমেরিকায় অবস্থান করছিলেন, তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ৭ অগ্র° [বৃহ 22 Nov] তারিখে। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সম্পাদক হয়েও রবীন্দ্রনাথ প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। প্রতাপচন্দ্রকে কেন্দ্র করে প্রমথলাল সেন [1866-1930], বিনয়েন্দ্রনাথ সেন [1868-1913] ও মোহিতচন্দ্র সেন [1870-1906] প্রমুখ নববিধান সমাজের শিক্ষিত প্রতিভাবান যুবকেরা সম্মিলিত হয়েছিলেন">—রবীন্দ্রনাথ এঁদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কেশবচন্দ্রের পুত্র করুণাচন্দ্র, কন্যা সুনীতি দেবী ও সুচারু দেবী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আগেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই সব যোগাযোগ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতা ও অন্য কয়েকজনকে নিয়ে য়ুরোপ যাত্রা করেছিলেন 20 Jun 1899 [৬ আষাঢ় ১৩০৬] তারিখে; ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও য়ুরোপের কয়েকটি ঐতিহাসিক শহর এবং কায়রো সফর করে কলকাতায় ফিরে আসেন 9 Dec 1900 [রবি ২৪ অগ্র°] তারিখে। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা করা ছাড়াও প্যারিস আন্তজাতিক প্রদর্শনীর আনুষঙ্গিক Congress of the History of Religions-এ ভাষণ দেন 7 Sep [শুক্র ২২ ভাদ্র]। এই সময়ে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রও সেখানে ছিলেন, উভয়ের মধ্যে এই সুযোগে একটি হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই বছর স্বামীজীর অন্যান্য কাজের মধ্যে প্রধান ছিল 30 Jan 1901

[বুধ ১৭ মাঘ] বেলুড় মঠের জন্য একটি ট্রাস্ট-ডীড সম্পাদন। ট্রাস্টডীডটি রেজেস্ট্রি করা হয় 6 Feb [বুধ ২৪ মাঘ] তারিখে।

রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম ব্রাহ্মসমাজের অনেকেরই পছন্দসই ছিল না, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজ নানাভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিরোধিতা করেছে, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থে তার ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রচারমুখী ছিল না বলে এই সমাজের বিরোধিতার পরিমাণ কম। কিন্তু বর্তমান বৎসরে তত্ত্ববোধিনী-র অন্তত দু'টি রচনায় কিঞ্চিৎ বিরোধী সুর শোনা যায়। রাজনারায়ণ বসুর পুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসু 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ' [আশ্বিন। ৮৭-৯১] প্রবন্ধে লেখেন: 'আদি ব্রাহ্মসমাজ একদিকে যেমন শিক্ষিত হিন্দু সাকারবাদীগণকেও আহ্বান করিতেছেন, অপর দিকে তেমনি নবোদিত হিন্দু অদ্বৈতবাদী যুবকগণকেও আহ্বান করিতেছেন। অদ্বৈতবাদ একটী দার্শনিক মত মাত্র, উহা ধর্ম্ম নামের বাচ্য হইতে পারে না।' ইতিপূর্বে 'A Proposal For United Work In The Brahmo Samaj' প্রবন্ধে [বৈশাখ, pp. 21-22] 'Adwaitism, or the philosophical Pantheism of Sankaracharya'-র বিরুদ্ধে সমবেত আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৩

বৎসরের প্রথম দিনটিতে [শুক্র 13 Apr] রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে ভাগলপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভাগলপুর তখন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশন হয় এন. জি. চন্দ্রভারকরের সভাপতিত্বে লাহোরে 27-29 Dec [বৃহ-শনি ১২-১৪ পৌষ]। 23 Dec [রবি ৮ পৌষ]-এর *The Bengalee* পত্রিকা থেকে জানা যায়, Northern Metropolitan Electoral Division থেকে রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই অধিবেশনে যোগ দেবার কথা তিনি একবার ভেবেছিলেন। অগ্রহায়ণের শেষে শিলাইদহ থেকে একটি তারিখহীন পত্রে তিনি এলাহাবাদে গগনেন্দ্রনাথকে লেখেন: 'মনে করচি এবার কনগ্রেসে লাহোরে যাব—পথের মধ্যে থেকে তোমরা কেউ এলে বড় ভাল হয়। চল না। পঞ্জাব বেড়াবার এই এক মস্ত সুবিধা। অমৃতসরের গুরুদরবার দেখে নিশ্চয় খুসি হবে।'[১৫৮] এই ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয় নি—কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় রবীন্দ্রনাথ কলকাতাতেই ছিলেন।

গত বৎসরের বুয়র-যুদ্ধের মতো য়ুরোপীয় বর্বরতার আর একটি দৃষ্টান্ত বর্তমান বৎসরে রচিত হল চীন দেশে। চীনে য়ুরোপীয় তাণ্ডব শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে। ভারত থেকে আফিম রপ্তানী করে মুনাফা লোটায় অগ্রণী ছিল ইংরেজরা। এই বাণিজ্যস্বার্থ বাধাপ্রাপ্ত হলে 1839–এ যে যুদ্ধ বাধে, ইতিহাসে তা 'অহিফেন যুদ্ধ' [Opium War] নামে বিখ্যাত। এই যুদ্ধে চীন পরাজিত হলে 1842-র নানকিং-চুক্তির বলে ইংরেজ হংকং গ্রাস করে ও চীনের পাঁচটি বন্দরে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। আমেরিকা ও ফ্রান্সও এই সুযোগে চীনে আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হয়। 1857-60-র দ্বিতীয় অহিফেন-যুদ্ধের ফলে রাশিয়া চীনের বিস্তৃত ভূখণ্ড দখল করে; পিকিঙের কাছে বিখ্যাত Summer Palace ইংরেজ ও ফরাসীরা লুণ্ঠন ও ধ্বংস

করে। প্রথমাবধি খ্রীস্টান মিশনারীরাও ধর্মান্তর ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে সহায়তা করতে থাকে। য়ুরোপের এশীয় শিষ্য জাপানও চুপ করে বসে ছিল না, 1894-এর যুদ্ধে চীনকে পরাজিত করে ফরমোজা দ্বীপও ক্ষতিপূরণ দাবী করে। এর সঙ্গে ক্ষমতাসীন মাঞ্চু-শাসকদের অন্তর্কলহ তো ছিলই। এই অবস্থায় বক্সার অভ্যুত্থান [Boxer Uprising] হয় 1898-এ। মুষ্টিযুদ্ধের এক রহস্যময় পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে আধা-ধর্মীয় আধা-সামরিক এই সম্প্রদায় য়ুরোপীয়দের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভুত্বের বিরোধী হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক শোষণে পর্যুদস্ত মাঞ্চু-রাজশক্তিও বক্সারদের সাহায্য করে। প্রদেশসমূহের ও পিকিঙের বিদেশী লিগেশন [legation]গুলি আক্রান্ত হয়। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, আমেরিকান প্রভৃতির সম্মিলিত শক্তিকে চীনারা বাধা দিতে সমর্থ হয় না। ধ্বংস ও হত্যালীলার মাধ্যমে বক্সার-অভ্যুত্থান দমিত হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চীনের উপর ক্ষতিপূরণের বিশাল আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ সমকালীন ইতিহাসের সচেতন পাঠক ছিলেন। তাঁর তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে নৈবেদ্য-এর সনেটে ও বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে।

৯ মাঘ [মঙ্গল 22 Jan 1901] ব্রিটিশ-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয় ও তাঁর পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে বসেন। উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভিক্টোরিয়ার জীবনাবসান এক আশ্চর্য সমাপতনের মতো মনে হয়। তাঁর শাসনকালেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সূর্যাস্ত না হওয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছেছিল। ভারতে তাঁর নারীত্ব মাতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে ব্রিটিশ ন্যায়বিচারের প্রতীক রূপে বিবেচিত হত। কিন্তু তাঁর মৃত্যু, কার্জনের উদ্ধত অবিমৃশ্যকারী সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের উত্তরোত্তর প্রকাশ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্রমিক সংসক্তি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনকথার পরিপ্রেক্ষিতেই এই বিবর্তনের ইতিহাসটি বুঝে নেওয়া শক্ত নয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য: ৪

বর্তমান বৎসরে ভারত সংগীত-সমাজ সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নি প্রধানত সংবাদপত্রগুলির সংবাদ পরিবেশনে কার্পণ্যের জন্য। গোষ্ঠী-সচেতনতা এইভাবেই ইতিহাসের ক্ষতি করে। রবীন্দ্রনাথের জীবনকথাতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়।

২৩ আষাঢ় [শনি 7 Jul] সংগীতসমাজ পুনর্বসন্ত পুনরভিনয়ের আয়োজন করে।

আমরা আগেই বলেছি, ৬ শ্রাবণ [শনি 21 Jul] রবীন্দ্রনাথের ‘গোড়ায় গলদ’ অভিনীত হয়। সম্ভবত এটিও পুনরভিনয়।

৩০ ভাদ্র [শনি 15 Sep] শেক্স্পীয়রের *Julius Caesar* অভিনীত হয় ইংরেজি ভাষায়। 18 Sep-এর *The Bengalee*-তে অভিনয়টির একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, সীজারের ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, ব্রুটাসের ভূমিকায় হেমচন্দ্র মল্লিক, ক্যাসিয়াসের ভূমিকায় প্রকাশচন্দ্র দত্ত, ক্যাসকার ভূমিকায় অটলকুমার সেন, লুসিয়াসের ভূমিকায় মনুজেন্দ্র মল্লিক, দেসিয়াসের ভূমিকায় এন. সি. মল্লিক এবং অ্যান্টনির ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনয় করেন। সত্যেন্দ্রনাথের অভিনয় উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছিল।

ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সংবর্ধনার জন্য 'বিসর্জন' অভিনীত হয় ১ পৌষ [রবি 16 Dec] তারিখে। নাটকটি ১২ পৌষ [বৃহ 27 Dec] পুনরভিনীত হয়।

সংগীতসমাজের বার্ষিক সারস্বত সম্মিলন উৎসব হত সরস্বতী পূজার দিনে। এই বৎসর ১২ মাঘ [শুক্র 26 Jan 1901] উক্ত উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। এই উৎসবে 'সভ্যগণকে বাসন্তী বর্ণে রঞ্জিত ধুতি, জামা ও চাদর পরিধান করিয়া সমাজে আসিতে অনুরোধ করা হইত'-৭৫ টাকা দিয়ে 'রবীন্দ্র বাবু মহাশয়ের জন্য বসন্তী রঙ্গের দোরোকা সাল' হয়তো এই কারণেই কেনা হয়েছিল। এই সময়ে মৃণালিনী দেবীকে লেখা কয়েকটি পত্রে সংগীতসমাজে রিহার্সালের কথা লিখেছেন তিনি। কিন্তু কোন্ নাটকের রিহার্সাল হচ্ছিল বলা শক্ত—তবে তা রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটকও হতে পারে। সুমিত মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ, একটি প্রকাশন সংস্থা এবং' প্রবন্ধে শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দু'টি পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন—'বৌঠাকুরানীর হাট লিখচ্ ত? সেটার জন্যে সঙ্গীতসমাজ খুব ব্যস্ত হয়ে আছে—সর্বদাই তাগিদ করচে। ওটা শীঘ্র লিখে ফেল্লে সুবিধা হবার সম্ভাবনা। এক এক পাতা ফাঁক রেখে লিখো—যাতে আমি সংশোধন করতে পারি' এবং 'তোমাকে দিয়ে "মুক্তির উপায়" গল্পটা প্রহসন আকারে লেখাতে ইচ্ছা করি। সে গল্পটা পড়ে একবার ভেবে দেখো দিকি।'[১৫৯] চিঠিগুলির তারিখ উল্লিখিত হয় নি, তারিখের হদিশ পেলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুবিধা হত।

কিন্তু মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর জন্য সারস্বত সম্মিলন বাতিল করা হয়। পরিবর্তে ২০ মাঘ [শনি 2 Feb] তাঁর অন্ত্যেষ্টির দিনে সংগীতসমাজের উদ্যোগে অসংখ্য লোক 'মাতৃবিয়োগের সমান শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া, অর্থাৎ সাদা কাপড় পরিয়া, সাদা উত্তরীয় গলায় দিয়া এবং খালি পায়ে, গড়ের মাঠে রাণীর আত্মার মঙ্গল উদ্দেশে সঙ্কীর্ত্তন'[১৬০] করেন। এইদিন বিকেলে বিডন স্ট্রীট থেকে মেছুয়াবাজার পর্যন্ত কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের একদিকের ফুটপাথ জুড়ে কয়েক সহস্র দরিদ্রকে খাওয়ানো হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান বৎসরে সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ৫ ফাল্গুন [শনি 16 Feb] পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে তিনি নূতন একটি প্রথা প্রবর্তন করেন। যদিও ইতিপূর্বে কবি অক্ষয়কুমার বড়াল স্বরচিত কবিতা 'কল্যাণী' পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে [২৮ পৌষ: 12 Jan] পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, তবু স্বয়ং সভাপতি কর্তৃক স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' [দ্র কথা ৭। ৮৩-৮৬] গাথা ঐতিহাসিক পটভূমিকার বিবৃতি-সহ পাঠ করে শোনানো যথেষ্ট অভিনব। 'রামেন্দ্র [সুন্দর ত্রিবেদী] বাবু সভাপতি মহাশয়কে এজন্য ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন, এ বিষয়ে তিনিই উপযুক্ত লোক, আর সেইজন্যই আমরা এত আনন্দিত হইলাম। যতীন্দ্র [সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী] বাবু বলিলেন, সভাপতি মহাশয় আজ এই এক নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আবৃত্তিতে আমরা বাস্তবিক আনন্দিত হইলাম।' উৎসাহী সত্যেন্দ্রনাথ ২৮ চৈত্র [বুধ 10 Apr] পরিষদের একাদশ মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'বিবাহ' [দ্র কথা ৭। ৮০-৮৩] কবিতাটি ব্যাখ্যা-সহ পাঠ করে শোনান। হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' পাঠসংক্রান্ত মনোমালিন্যের কথা স্মরণ করেই অন্যতম সহকারী-সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই দু'টি অধিবেশনেই অনুপস্থিত ছিলেন। কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কয়েক বছর পরে এই বিষয়ে অভিযোগ করলে রবীন্দ্রনাথ ২৩ বৈশাখ ১৩১২ [6 May 1905] তাঁকে লেখেন:

মেজদাদা আমার রচিত কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে advertize করে বেড়িয়েছেন এ কথা আপনারই মুখে শোনা গেল—তার কারণ আপনি অপ্রিয় কথা বলবার ভার নিয়েছেন—আর কারো মুখে শুনি নি তার কারণ এ নয় যে আপনি ছাড়া আর কেউ সত্য বলে না। আপনি অতি সহজেই এমন কথা মনে করতে পারতেন যে আমার কবিতা তাঁর কাছে পরিচিত এবং প্রিয়, সেইজন্যেই তিনি একথা ভুলে যান যে আমার কবিতা আবৃত্তি করলে আর কারো মনে বেদনা লাগতে পারে।[১৬১]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ি থেকে ১৩৭।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ভাড়াবাড়িতে উঠে এসেছিল গত বৎসরের শেষ দিকে। নিজস্ব গৃহের ভাবনা তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। এই বৎসরের শুরুতে ১ বৈশাখ [শুক্র 13 Apr] রজনীকান্ত গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নগেন্দ্রনাথ বসু ও চারুচন্দ্র ঘোষ কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে গৃহনির্মাণের উপযুক্ত ভূমি ভিক্ষা করার জন্য গমন করেন। প্রার্থনা মাত্রই মহারাজ আপার সার্কুলার রোডের উপর পাঁচ কাঠা জমি দান করতে সম্মত হন। পরে তারও কিছু জমির প্রার্থনায় তিনি তদতিরিক্ত দু'কাঠা জমি দিতে রাজি হয়ে যান। ২৮ চৈত্র [বুধ, 10 Apr] পরিষদের একাদশ মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমার শরৎকুমার রায়, সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ও টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীকে পরিষদের ট্রাস্টী নিয়োগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 20 Aug 1901 [মঙ্গল ৪ ভাদ্র] দলিল লেখাপড়া হয়। নবনির্মিত বাড়িতে গৃহপ্রবেশ হয় ১৯ অগ্র° ১৩১৫ [শুক্র 4 Dec 1908] তারিখে।

উল্লেখপঞ্জী

১ বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৮। ২-৩

২ 'ভাষার কথা', সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২৩; বাংলা শব্দতত্ত্ব। ৩

৩ পত্রাবলী। ২২, পত্র ১০

৪ *The Life and Work of Sir Jagadis C. Bose*, p. 222; চিঠিপত্র ৬। ১৭৮-এ উদ্ধৃত

৫ দ্র পিতৃস্মৃতি। ৩৫-৩৬

৬ ঐ। ৩৬

৭ পত্রাবলী। ২২, পত্র ১০-এর বর্জিত অংশ

৮ ঐ। ২৬, পত্র ১২-এর বর্জিত অংশ

৯ চিঠিপত্র ৬। ৩৭, পত্র ১৬

১০ দ্র পত্রাবলী। ১২, পত্র ১১

১১ পিতৃস্মৃতি। ৩৭

১২ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪৩০

১৩ ঐ। ৪০৪-০৫

১৪ সাহিত্য, আষাঢ়। ১৪৫-৪৬

১৫ ঐ। ১৪৭

১৬ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮। ট, পত্র চার
১৭ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লিপিচিত্র [photocopy]
১৮ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮। ট, পত্র ছয়
১৯ ঐ। ট, পত্র সাত
২০ ঐ। ট, পত্র ছয়
২১ ঐ। ট, পত্র আট
২২ ঐ। ট, পত্র নয়
২৩ সংযোগ, আশ্বিন ১৩৬৪—রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি থেকে উদ্ধৃত
২৪ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪৩০
২৫ ঐ। ৪০৫
২৬ দ্র চিঠিপত্র ৮। ২৪৮-৫০, পত্র ৮
২৭ ঐ ৮। ২৫১, পত্র ৯
২৮ ঐ ৮। ৮৭, পত্র ১০০
২৯ ঐ ৮। ৯১, পত্র ১০২
৩০ ঐ ৮। ২৫৪, পত্র ১০
৩১ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪৩০
৩২ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৯৬
৩৩ বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩। ১, পত্র ১
৩৪ ঐ, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫১। ৪৩০
৩৫ চিঠিপত্র ৮। ১২৩, পত্র ১২১
৩৬ পত্রাবলী। ২৫, পত্র ১১
৩৭ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত প্রতিলিপি
৩৮ চিঠিপত্র ৮। ৮৯, পত্র ১০১
৩৯ সাহিত্য, আষাঢ়। ১৯২
৪০ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য [১৩৯০]। ৯০
৪১ রবীন্দ্রসংগীত [১৩৭৬]। ১৭০
৪২ চিঠিপত্র ৮। ৯২, পত্র ১০২
৪৩ ঐ ৮! ৯৪, পত্র ১০৩
৪৪ ঐ ৮। ৯৪, পত্র ১০৪
৪৫ ঐ ৮। ৯৫, পত্র ১০৫

৪৬ ঐ ৮। ৯৩-৯৪, পত্র ১০৩

৪৭ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১। ৫০৩

৪৮ চিঠিপত্র ৮। ৯৬, পত্র ১০৭

৪৯ দ্র রবীন্দ্রস্মৃতি। ৫৭

৫০ চিঠিপত্র ৮। ৯৮, পত্র ১১০

৫১ ঐ ৮। ১০০, পত্র ১১২

৫২ দ্র ঐ ৮। ১০১, পত্র ১১৩

৫৩ ঐ ৮। ১০২, পত্র ১১৩

৫৪ ঐ ৮। ১১০-১১, পত্র ১১৭

৫৫ ঐ ৮ ১১৩, পত্র ১১৮

৫৬ ঐ ৮। ১১৫-১৬, পুত্র ১১৯

৫৭ ঐ ৮। ১১৯-২০, পত্র ১২০

৫৮ বি. ভা, প., মাঘ-চৈত্র ১৩৫৪। ১১৭

৫৯ চিঠিপত্র ৮। ১১৮, পত্র ১২০

৬০ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪৩১

৬১ ঐ। ৪০৫-০৬

৬২ পত্রাবলী। ২৮, পত্র ১৩

৬৩ ঐ। ২৯, পত্র ১৪

৬৪ ঐ। ৩১, পত্র ১৫

৬৫ চিঠিপত্র ৬। ৭-৮, পত্র ৪

৬৬ 'চিত্রশিল্পে কবিগুরুর দান', কথাসাহিত্য, বৈশাখ ১৩৬৮। ৮২৮

৬৭ পত্রাবলী। ২৬, পত্র ১২

৬৮ চিঠিপত্র ৬। ১১, পত্র ৪

৬৯ মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৯৩। ১০

৭০ পত্রাবলী। ১৬২, পত্র ৫৮

৭১ ঐ। ৩৯, পত্র ১৬

৭২ চিঠিপত্র ৬। ১৪, পত্র ৫

৭৩ পত্রাবলী। ৫৪-৫৫, পত্র ১৯

৭৪ চিঠিপত্র ৬। ১৩, পত্র ৫

৭৫ *Letters of Sister Nivedita,* vol. I, p. 400, No. 155

৭৬ Ibid, p. 402, No. 156

৭৭ Ibid, p. 403, No. 157

৭৮ পত্রাবলী। ৫৬, পত্র ২০

৭৯ ঐ। ৬৬-৬৭, পত্র ২৪

৮০ ঐ। ৮২-৮৩, পত্র ২৮

৮১ চিঠিপত্র ৮। ১৪৩, পত্র ১৩০

৮২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৩ [১৩৭৬]। ৩২৪

৮৩ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, তথ্যপঞ্জী। ৪

৮৪ চিঠিপত্র ৮। ১৩৮, পত্র ১২৮

৮৫ ঐ ৮। ২৬৭-৬৮, পত্র ১৫

৮৬ ঐ ৮। ১৩৮-৩৯, পত্র ১২৮

৮৭ ঐ ৮। ২৬৫-৬৬, পত্র ১৪

৮৮ ঐ ৮। ১৪৫, পত্র ১৩১

৮৯ ঐ ৮। ১৪৯, পত্র ১৩৩

৯০ ঐ ৮। ১৪৫, পত্র ১৩১

৯১ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৫০৮

৯২ চিঠিপত্র ৮। ১২৭-২৮, পত্র ১২৩

৯৩ ঐ ৬। ১৩, পত্র ৫

৯৪ ঐ ১। ৪২, পত্র ১৯

৯৫ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৪৯৩

৯৬ চিঠিপত্র, ১। ৫৬, পত্র ২৮

৯৭ ভারত-মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা। ৬৬-৬৭

৯৮ পুণ্যস্মৃতি। ৯

৯৯ রবীন্দ্রবীক্ষা ৪। ৭৮

১০০ দ্র কমল সরকার, ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। ১৯৮

১০১ পত্রাবলী। ৫১, পত্র ১৯

১০২ চিঠিপত্র ৬। ১৫, পত্র ৬

১০৩ ঐ ৮। ১৫৬, পত্র ১৩৫

১০৪ ঐ ৮। ১৬২, পত্র ১৩৯

১০৫ ঐ ৬। ১৬-১৭, পত্র ৬

১০৫ক পিতৃস্মৃতি। ২১৯
১০৬ চিঠিপত্র ৬। ১৮, পত্র ৭
১০৭ ঐ ১। ৪৫, পত্র ২১
১০৮ রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য [১৩৫৬]। ১১-১২
১০৯ ঐ। ১৩
১১০ রবীন্দ্র কথা। ২৩০
১১০ক 'সঙ্গীত সমাজ', মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৬০। ৫৭৬
১১১ রবীন্দ্রজীবনী ১। ৫১০
১১২ প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩। ৩১
১১৩ দেশ, সাহিত্য ১৩৮৫। ২৫, পত্র ৩
১১৪ প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩। ২৯
১১৫ চিঠিপত্র ১। ৪৫, পত্র ২১
১১৬ ঐ ১। ৪৭, পত্র ২২
১১৭ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৫ [১৩৯৩]। ৬, পত্র ৫
১১৮ চিঠিপত্র ১। ৪৭, পত্র ২২
১১৯ ঐ ১। ৪৮, পত্র ২৩
১২০ ঐ ১। ৪৯, পত্র ২৪
১২১ ড দেবীপদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র-চর্যা [১৩৯২]। ৬৯-৭০
১২২ চিঠিপত্র ৬। ২০, পত্র ৮
১২৩ নৈবেদ্য ৮। ৫২, ৬৫-সংখ্যক
১২৪ চিঠিপত্র ১। ৫০, পত্র ২৫
১২৫ ঐ ১। ৫৩, পত্র ২৬
১২৬ তত্ত্ব°, ফাল্গুন। ১৬৮-৬৯
১২৭ চিঠিপত্র ১। ৫২-৫৩, পত্র ২৬
১২৮ ঐ ৮। ১৫১-৫২, পত্র ১৩৪
১২৯ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল পত্র
১৩০ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূলপত্র
১৩১ চিঠিপত্র ৮। ১৬২-৬৩, পত্র ১৩৯
১৩২ ঐ ৮। ১৫৪, পত্র ১৩৫
১৩৩ পিতৃস্মৃতি। ৩৯

১৩৪ চিঠিপত্র ৮। ১৫৭, পত্র ১৩৬

১৩৪ক ঐ ৫। ৯-১০, পত্র ১

১৩৫ বি. ভা, প., শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩। ৩, পত্র ৪

১৩৬ চিঠিপত্র ৮। ১৬০, পত্র ১৩৭

১৩৭ ঐ ৮। ১৬৯, পত্র ১৪৩

১৩৮ ঐ ৮। ১৭৮, পত্র ১৪৯

১৩৯ ঐ ৮। ১৮১, পত্র ১৫০

১৪০ ঐ ৮। ১৮৪, পত্র ১৫২

১৪১ রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ৪৩২

১৪২ চিঠিপত্র ৮। ১৮০, পত্র ১৫০

১৪৩ ঐ ৮। ১৬৭, পত্র ১৪২

১৪৪ ঐ ৮। ১৭৬, পত্র ১৪৮

১৪৫ ঐ ৮। ২২৩, সংযোজন পত্র ১২

১৪৬ ঐ ৮। ১২৪, পত্র ১২২

১৪৭ ঐ ৮। ১৩১, পত্র ১২৪

১৪৮ ঐ ৮। ১৬৬-৬৭, পত্র ১৪২

১৪৯ ঐ ৮। ১৭৮, পত্র ১৪৯

১৫০ ঐ ৮। ১৮৪, পত্র ১৫২

১৫১ ঐ ৮। ১৮৫, পত্র ১৫৩

১৫২ আমার জীবনস্মৃতি। ১৬১

১৫৩ বলেন্দ্রনাথ শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ। ৩৩-৩৪

১৫৪ পিতৃস্মৃতি। ২১৯

১৫৫ তত্ত্ব°, আষাঢ় ১৮২২ শক। ৪৭

১৫৬ ঐ, মাঘ। ১৪৫

১৫৭ ঐ, ফাল্গুন। ১৬৮

১৫৮ রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪ [১৩৯২]। ৩৫, পত্র ৭

১৫৯ প্রতিক্ষণ, শারদীয় ১৩৯৩। ২৯

১৬০ ‘মহারাণীর অন্ত্যেষ্টি-সমারোহ’, ভারতী, বৈশাখ ১৩০৮। ৫৮

১৬১ রবীন্দ্রজীবনী ২ [১৩৮৩]। ৩৭৩-এ উদ্ধৃত

* উল্লেখ্য, মাঘ ১৩০৪-সংখ্যা প্রদীপ-এ মুদ্রিত 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি' [দ্র কল্পনা ৭। ১৫৭ 'জগদীশচন্দ্র বসু'] কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে এই বিশেষণ-দু'টি প্রয়োগ করেছিলেন।

* দুষ্প্রাপ্য *Sophia* পত্রিকা থেকে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি সজনীকান্ত দাস তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' [পৃ ১১৯-২২] গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

* জগদীশচন্দ্রের জীবনীকার Patrick Geddes লিখেছেন:'···So during his second visit to England, in 1900, he had one of his stories, 'The Kabuilawalla', translated into English. Prince Kropotkin—a good critic in letters as well as science—declared it to be the most pathetic story he had ever heard, reminding him of the greatest writers among his countrymen; and Bose submitted it to *Harper's Magazine*. It was declined, because the West was not sufficiently interested in Oriental life!—*The Life and Work of sir Jagadis c. Bose* [1920], p. 223—চিঠিপত্র ৬। ১৭৮-এ উদ্ধৃত।

* রবীন্দ্রনাথের রচনানুবাদের মুখপাতে লেখা হয়: 'The Evening service was commenced with the following Exhortation by Baboo Rabindra Nath Tagore, which contains fervent expressions of grief at the Queen Empress' death and deals with the spiritual lessons we may derive therefrom.'

নির্দেশিকা

ব্যক্তি

গ্রন্থ ও পত্রিকা

[পত্রিকার নাম বক্রাক্ষরে]

শিরোনাম

কবিতা ও গানের প্রথম ছত্র

বিবিধ

ভ্রম সংশোধন

১০৮ ও ১০৯ পৃষ্ঠায় ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে ভ্রমক্রমে ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।